নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৭
মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০

সম্পাদনা
আশা দেবী
অরিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

আলোকচিত্র-পরিচিতি
লেখক ও তাঁর পুত্র

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : গৌতম রায়
মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার কলিকাতা ৯ হইতে বি. সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

উপন্যাস

উপনিবেশ (দ্বিতীয় খণ্ড) ১
মন্ত্র-মুখর ৮৫
মহানন্দা ১৫৯

গল্পগ্রন্থ

ভাঙ্গাবন্দর

ভাঙ্গাবন্দর ৩৫৩
কবর ৩৬৫
তীর্থযাত্রা ৩৭৪
ছলনাময়ী ৩৮৬
লুচির উপাখ্যান ৩৯৭
পাণ্ডুলিপি ৪০৪
নক্র-চরিত ৪১১
আত্মহত্যা ৪২৫

দুঃশাসন

দুঃশাসন ৪৩৭
কালো জল ৪৪৫
পুষ্করা ৪৫৬
ভাঙা চশমা ৪৬৫
বন-বিড়াল ৪৭৩
খড়্গ ৪৮৫
মমি ৪৯৬
ডিম ৫০৫
পাইপ ৫১৩

উপনিবেশ

দ্বিতীয় খণ্ড

উৎসর্গ

জটিল অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপনা যাঁর
পেশা, দুরূহ রাজনীতি যাঁর নেশা এবং
পরম সাহিত্যরসগ্রাহী যাঁর মন, সেই

সুহৃদ্বর বীরেন্দ্রলাল লাহিড়ীকে—

বিভ্রান্ত বসন্ত

১

মানুষই কি কেবল রচনা করে ইতিহাসকে? ইতিহাস মানুষকে রচনা করে না কোনোদিন?

ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী। দুশো বছর ধরিয়া পর্তুগীজেরা কী না করিয়াছে ভারতবর্ষের উপরে। ঝড়ের রাত্রে বাসুকির ফণার মতো নীল সমুদ্র যখন দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে, বোম্বেটে জাহাজের পালগুলি তখন ঝড়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডানার মতো তাহারি উপর দিয়া উড়িয়া গেছে। অন্ধকার—স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল হইতে অন্ধকার ঠেলিয়া উঠিতেছে, সমুদ্র আর্তনাদ করিতেছে পিঁজরায় বাঁধা বন্য-জন্তুর মতো। আর সেই সমুদ্র আছড়াইয়া পড়িতেছে পৌরাণিক যুগের অতিকায় দৈত্যের মতো গ্র্যানাইট পাথরের খাড়া পাহাড়ের গায়ে। মৃত্যুর প্রতীক কালো অ্যাল্‌বাট্রসের কান্না ছাপাইয়া উঠিতেছে সমুদ্রের মত্ত হুংকারকে।

আর তাহারই নিচে এই ঝড়ের মধ্যেও অনেকগুলি আলো মিট্ মিট্ করিতেছে—সুরাটের বন্দর। অকস্মাৎ মশালের আলো—আর্তনাদ—বন্দুকের শব্দ। পর্তুগীজেরা বন্দর লুঠ করিতেছে। অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়িয়া ছবির মতো দেখা দেয় আর একটি দৃশ্য। বঙ্গোপসাগর। সপ্তগ্রামের বণিকদের বহর চলিয়াছে সিংহলে বাণিজ্য করিতে। হার্মাদদের জাহাজ হইতে কামান গর্জন করিয়া উঠিল। সকালের আলোয় উদ্ভাসিত নির্মল নীল সমুদ্র লাল হইয়া গেল মানুষের রক্তে…

সময়ের চাকা ঘুরিয়া চলে অবিশ্রান্ত। স্বার্থে স্বার্থে দ্বন্দ্ব চলে। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার। নবাবের রত্নসিংহাসন চূর্ণ হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়ে। বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদণ্ড হইয়া। পলাশীর জনশূন্য প্রান্তরে, ঘন নিবিড় আমের বনের বিষণ্ণ ছায়ায়, গঙ্গার পরপারে যখন মলিন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, তখন সমুদ্রের ওপারের সাম্রাজ্যবাদের নতুন সূর্য দেখা দেয়।

ভাস্কো-ডা-গামার জাতি। ভারতবর্ষকে প্রথম যাহারা অপরিচিত প্রাচীর নির্ণিরীক্ষ্য অন্ধকার হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল, আজ ভারতবর্ষের কয়েক ইঞ্চি জমিতে তাহাদের অধিকার আছে মাত্র। তাহাদের দিগ্বিজয়ী নৌবহর আজ ইতিহাসের পাতা আশ্রয় নিয়া আত্মগোপন করিয়াছে, ইংরেজের ম্যান্-অফ্-ওয়্যারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে এমন সাধ্য কি! চক্রবর্তী ইংরেজের ছত্রছায়ায় আশ্রয় লইয়া সেই দুর্ধর্ষ হার্মাদেরা

আজ পায়জামা গুটাইয়া জমিতে লাঙ্গল ঠেলিতেছে, বিড়ি টানিতেছে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে চোখ-মুখ বুজিয়া কুইনাইন গিলিয়া চলিয়াছে।

ইতিহাস রচনা করিয়াছে মানুষকে। ঘুমের দেশ এই ভারতবর্ষ। কোথায় ককেসাস্ পাহাড়ের তলা হইতে প্রথম আসিয়াছিল যাযাবর মানুষের দল। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্যের মধ্যে তাহাদের সমস্ত পশুশৌর্য গেল তলাইয়া। শক আসিল, হূণ আসিল, গ্রীক্ আসিল, মুসলমান আসিল—কুম্ভকর্ণের মাটিতে পা দিয়া তিন দিনের বেশি কেউ তাহাদের জাগিয়া থাকিতে পারিল না। পর্তুগীজেরাই বা সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে কি করিয়া? বর্তমানের সূর্যও তো একদিন অস্তে নামিবে, সেদিন ইতিহাসের এই ক্ষুধা যে তাহাকেও গ্রাস করিবে না—এমন ভবিষ্যদ্বাণী আজ কে করিতে পারে?

* * * *

সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের বংশধর স্যামুয়েল গঞ্জালেস্। শুঁটকী মাছের ব্যবসা করে সে। সন্দীপ হইতে স্টিমারে করিয়া সে চট্টগ্রামে ফিরিতেছিল। বাংলা দেশের একেবারে তলার দিকে নদী আর সমুদ্র একাকার হইয়া আছে একেবারে—শাদা আর নীলের একটা বিচিত্র সৌন্দর্য। বহুদূরে বাতাসে সবুজ বন মাথা নাড়িতেছে—জলের প্রান্তরেখার সঙ্গে একেবারে মিলিয়া গেছে বিচিত্র ভাবে। মাথার উপর দিয়া পাখী উড়িয়া চলিয়াছে—স্টিমারের চোঙ্গা হইতে ধোঁয়া উড়িতেছে, আর জলের উপর তাহার ছায়া কাঁপিতেছে আঁকাবাঁকা ছবির মতো।

রেলিং ধরিয়া গঞ্জালেস্ দাঁড়াইয়াছিল। সামনে পিছনে নৌকা নাচিতেছে, ওপারে তীরের গায়ে স্টিমারের ঢেউ যে একরাশ ফেনা লইয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে, এতদূর হইতেও সেটা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নদীর দিকে চাহিয়া নানা রকমের অর্থহীন অলস ভাবনা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে পাক খাইয়া চলিয়াছিল। ভাবনার সুর কাটিয়া দিল এমন সময় ডি-সুজা আসিয়া।

সে-ও এই স্টিমারের যাত্রী। অনেকক্ষণ হইতে কৌতূহলী চোখ মেলিয়া স্যামুয়েলকে লক্ষ্য করিতেছিল সে—মানুষে মানুষে এত সাদৃশ্যও সম্ভব! যেন ডেভিড গঞ্জালেস্ এতদিন পরে যৌবন লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখা দিল।

—কোথায় যাওয়া হবে?

প্রশ্ন শুনিয়া গঞ্জালেস্ বিরক্ত হইয়া তাকাইল, কিন্তু স্বজাতি। কহিল, চিটাগাং। তুমি কোথায় যাবে?

ডি-সুজা দন্তহীন মুখে হাসিল, একই পথের পথিক। তুমি বুঝি ওখানেই থাকো? কী করো?

—মাছের ব্যবসা।

মেরীর নাম করিয়া ডি-সুজা শপথ করিল একটা।

—চিনেছি তোমাকে। তুমি স্যামুয়েল গঞ্জালেস্ তো?

স্বীকার করিয়া স্যামুয়েল বিস্মিত চোখে তাকাইয়া রহিল।

—তোমার বাপের সঙ্গে আমার খাতির ছিল খুব। একসঙ্গে দুজনে গোয়াতে হোটেল খুলেছিলুম, তারপর সেখান থেকে ম্যাড্রাসে। কিন্তু বেশিদিন চলল না—পুলিস পিছে লাগল কি না।

বাচন-ভঙ্গির অন্তরঙ্গতায় উত্তরোত্তর বিস্ময় বোধ করিতেছিল গঞ্জালেস্। কিন্তু পিতৃবন্ধু, সুতরাং সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, হোটেল খুললে কিন্তু তাতে পুলিস পেছন লাগল কেন?

—বাঃ, লাগবে না? মদের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু লাইসেন্স তো ছিল না। পুলিস অবশ্য সবই জানত, ভাগ-বাঁটোয়ারাও ছিল—কিন্তু ওই টাকাপয়সার ব্যাপারেই শেষ পর্যন্ত আর বনল না। ব্যাটাদের পেট তো আর সহজে ভরাবার নয়। কাজেই—বাকিটা যে সম্পূর্ণ বলা বাহুল্য, এমনি একটা ভাব দেখাইয়া খানিকটা দন্ত-বিকাশ করিল সে।

গঞ্জালেসের লোকটাকে নেহাৎ মন্দ লাগিল না। মুখের দিকে চাহিলেই বোঝা যায়, খালি বাতাসেই তাহার বয়স বাড়ে নাই; বহু ঝড় পাড়ি-দিয়া-আসা নৌকার ছেঁড়া পাল আর ভাঙা-দাঁড়ের সঙ্গে কোথায় কী যেন সামঞ্জস্য আছে তাহার। সর্বাঙ্গে যুদ্ধের চিহ্ন। নিরুত্তাপ নিস্তেজ জীবনে দুঃসাহসী যে পর্তুগীজের রক্ত গঞ্জালেসের ধমনীতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডি-সুজার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকাইয়াই সে রক্তে যেন দোলা লাগিয়া গেল। আর তা ছাড়া পিতৃবন্ধু। নিজের বাপকে অবশ্য সে খুব ভালো করিয়া মনে করিতে পারে না, মনে করিবার মতো কোনো স্মৃতি কখনো সে রাখিয়াও যায় নাই। অতি শিশুকালে গঞ্জালেস্ দু-একবার দেখিয়াছে লোকটাকে। কোথায় কোথায় থাকিত, কী যে করিত, কেউ বলিতে পারিত না। গঞ্জালেসের মা এক মিশনারীর বাড়িতে রাঁধুনিগিরি করিত, সেই অন্নেই বহু দুঃখে তাহারা মানুষ। বাপের মাঝে মাঝে দেখা পাইত—তবে তাহার আবির্ভাব ঘটিত মূর্তিমান একটা দুর্যোগ বা দুঃস্বপ্নের মতো। এক মুখ দাড়ি, ছেঁড়া পায়জামা, মুখে অশ্রাব্য শপথ এবং কদর্য গালাগালি। যে কয়েকটা দিন থাকিত তাহাদের মাকে ধরিয়া বেধড়ক প্রহার করিত, শিশুদের ধরিয়া আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিত। আর সমস্ত দিন মদ গিলিত অশ্রান্তভাবে। যেন তাহার পেটের মধ্যে সাহারা মরুভূমির মতো কী একটা বিরাট ব্যাপার রহিয়াছে; পৃথিবীতে যত মদ আছে, একটানে চোঁ চোঁ করিয়া শুষিয়া লইতে পারে।

এই তো বাপের সম্পর্কে তাহার স্মৃতি। শুধু এইটুকুই অবশ্য নয়, চুলের তলায় অনেকখানি কাটা চিহ্নও পিতারই সস্নেহ অবদান। তবু বড় হইয়া গঞ্জালেস্ তাহাকে

শ্রদ্ধা করিয়াছে। দুঃসাহস ছিল তাহার রক্তে, ছিল বিদ্রোহ। সব ভাঙিয়া চুরিয়া বেপরোয়া ছন্দে জীবনটা বহিয়া গিয়াছে তাহার, প্রয়োজনের গণ্ডীতে নিজের দুর্দান্ত মনটাকে সে মারিয়া ফেলে নাই। ইংরেজের আইন তাহাকে ধরিবার বহু চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই—ছুঁইয়া গেছে মাত্র। নবাব আলীবর্দী খাঁর কামানের পাল্টা জবাব দিয়াছিল সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের দুরন্ত বাহিনী। ডেভিডের কানের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে পুলিসের রাইফেলের গুলি, কিন্তু তাহার পিস্তলের লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই।

আর গঞ্জালেসের মুখের দিকে চাহিয়া ডি-সুজাও এমনি কিছু একটাই ভাবিতেছিল বোধ হয়। সন্ধ্যা আসিতেছে। নদীর খাদ-মিশানো সমুদ্রের জল ধূসর হইয়া আসিতেছে। তাহারি উপর ঝল্‌মল্ করিতেছে দিনান্তের লাল আলো। দূরের সবুজ বনরেখা সে আলোয় রঙীন হইয়া উঠিয়াছে—সমুদ্রের শাড়িতে কেউ যেন জরির পাড় বসাইয়া দিয়াছে। আর সেই আলো জ্বলিতেছে গঞ্জালেসের বড় বড় দুটি পিঙ্গল চোখের ওপর—একটা উগ্র দীপ্তি তাহা হইতে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে যেন। সুগঠিত দীর্ঘ দেহ—সেদিকে চাহিলেই তাহার বাপকে মনে পড়িয়া যায়। আম্বালা স্টেশনের সেই শিখ স্টেশন মাস্টারটা। গঞ্জালেসের সেই ঘাতক-মূর্তিটা ডি-সুজা আজো ভুলিতে পারে নাই। গঞ্জালেস্‌ই তো তাহার মাথায় ঠাসিয়া কুড়ালের কোপ বসাইয়া দিয়াছিল—আর সেই সুযোগে সে ভাঙিয়া নিয়াছিল অফিসের ক্যাসবাক্স। কুড়ালের শাদা পুরু ফলাটা রক্তে রাঙা—সেই সঙ্গে চূর্ণ মস্তিষ্কের খানিকটা ঘিলু ছিটকাইয়া আসিয়া কপালে লাগিয়াছে গঞ্জালেসের। পকেট হইতে একটা রুমাল বাহির করিয়া সেগুলি মুছিতে মুছিতে কী একটা রসিকতা করিয়াছিল সে।

হাসিলে কী উজ্জ্বল যে দেখাইত ডেভিডের দাঁতগুলি।

স্যামুয়েলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আজ আবার তাহার বাপকে মনে পড়িল। সেই প্রশস্ত কপাল, সেই তীক্ষ্ণ উদ্ধত চোয়াল, ভুল হইবার কারণ নাই কোনোখানে। কেবল মুখে সে বিদ্রোহ নাই—আছে শান্ত খানিকটা দুর্বলতা মাত্র।

কয়েক মিনিট দুজনেই দুজনের দিকে চাহিয়া রহিল নীরবে। পায়ের নিচে এঞ্জিনের ছন্দে ছন্দে কাঠের মেজেটা দ্রুত লয়ে কাঁপিতেছে, প্যাডেলের গায়ে জলের হু হু শব্দ। মাঝে মাঝে শাদা ফেনা বিকালের রোদে জাপানী বলের মতো রঙীন হইয়া ছিট্‌কাইয়া উঠিতেছিল আকাশের দিকে।

প্রশ্নটা গঞ্জালেস্‌ই করিল প্রথম।

—চিটাগাংয়ে কেন চলেছ তুমি?

ডি-সুজা বকের পাখার মতো শাদা ভুরু দুইটাকে দুই দিকে প্রসারিত করিয়া একটু হাসিল মাত্র—জবাব দিল না।

—ব্যবসা-ট্যাবসা আছে বুঝি?

—ব্যবসা ? সতর্কভাবে ডি-সুজা চারিদিকে তাকাইল একবার। ডেকের একদিকটা একেবারে নির্জন—একটু দূরে কতকগুলি মুসলমান চিঁড়া আর আম লইয়া অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ফলারে বসিয়াছে। নিচে প্যাডেলের আঘাতে বিচূর্ণ বিক্ষুব্ধ জল হইতে একটানা গর্জন উঠিতেছে। এঞ্জিনের যান্ত্রিক শব্দ বাজিতেছে ক্রমাগত, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ তাহাদের চারিদিকে একটা ধ্বনির যবনিকা টাঙাইয়া দিয়াছে।

—ব্যবসা ?—দন্তহীন মুখে হাসিটাকে প্রকটিত করিয়া ডি সুজা বলিল, হাঁ, ব্যবসা আছে বটে। তবে সেটা নিতান্ত আইনসঙ্গত নয়—এই যা।

—তার মানে ?—গঞ্জালেস্ চমকিয়া উঠিল। ডি-সুজার সমস্ত অবয়ব ঘিরিয়া যে বিচিত্র রহস্যের আবরণ, সেটা একটু একটু সরিতেছে যেন।

—তুমি ডেভিডের ছেলে তো ? তোমাকে বলতে ভয় নেই তা হলে। আফিং কোকেনের কিছু কারবার আছে, তবে ডিউটি দেবার হাঙ্গামাটা আর পোয়াই না। বুঝেছ তো ?

—বুঝেছি।—শান্ত নিরুত্তাপ রক্তে আবার দোলা লাগিল গঞ্জালেসের। ডি-সুজার বয়স হইয়াছে, চুলগুলিতে শাদার নিষ্কলঙ্ক আস্তর। চোখ দুটি ম্লান—কিন্তু ঝড় পার-হইয়া-আসা নৌকার ছেঁড়া পাল আর ভাঙা দাঁড়ের মতো একটা নির্ভীক দৃঢ়তা তাহাকে ঘিরিয়া আছে।

—কোথায় গিয়ে উঠবে চিটাগাংয়ে ?

ডি-সুজাকে চিন্তিত দেখাইল : তাই তো ভাবছি। আড্ডা যেটা ছিল সেটার ওপর ওদের নজর পড়েছে, কাজেই সেখানে ওঠা ঠিক হবে না। তা ছাড়া আধ মণ মাল আছে সঙ্গে—হোটেলে গিয়েও ওঠা যাবে না।

—আধ মণ !

—হাঁ, অন্তত এক হাজার টাকার জিনিস। তা ছাড়া ধরা পড়লে হেঁ—হেঁ—ডি-সুজা হাসিল : স্রেফ দশ বছর ঠুকে দেবে। তা এই বুড়ো বয়সে ওটা আর পারব না।

গঞ্জালেসের চোখে মুখে আন্তরিকতা প্রকাশ পাইল।

—কিছু যদি মনে না করো, আমার একটা আস্তানা আছে। সেখানে বেশ থাকতে পারা যাবে।

—মনে করব—বিলক্ষণ !—আপ্যায়নের হাসি হাসিল ডি-সুজা : তুমি ডেভিডের ছেলে ! কিন্তু তোমার জায়গাটা, কি বলে, কোন ভয়টয় নেই তো ?

—না, কোনো ভয়টয় নেই—আশ্বাস দিল গঞ্জালেস্।

অতএব পথেই দুজনের অন্তরঙ্গতা অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। আরো কয়েক ঘণ্টার পথ চট্টগ্রাম। ইহারই মধ্যে ডি-সুজা দিব্যি গল্প জমাইয়া লইল গঞ্জালেসের সঙ্গে। সে

আর ডেভিড্ কী না করিয়াছে দুইজনে, পৃথিবীর কোন্ বৈচিত্র্য পরখ করিতে তাহারা বাকী রাখিয়াছে। তবে এখন আর সেদিন নাই। ইংরেজের আইন বড় বেশি কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছে—তা ছাড়া সেই সব দিনের দুঃসাহসী মনই বা আজকাল কোথায়! বাংলা দেশে যে সব পর্তুগীজ উপনিবেশ বাঁধিয়া আছে, ডাকাতি রাহাজানির চাইতে তাহারা এখন জমিতে লাঙল ঠেলিতে ভালোবাসে, সাহেবী রেস্তোর'াঁয় বাবুর্চি হইতে চায়। 'জেণ্টুর'-দের সঙ্গে তাহারা এক পংক্তিতে নামিয়া বসিয়াছে—ইহার চাইতে অসম্মান ও অগৌরবের ব্যাপার সমগ্র পর্তুগীজ সমাজে আর কী হইতে পারে!

বলিতে বলিতে ডি-সুজা উদ্দীপ্ত হইয়া ওঠে, মুঠা করিয়া ধরে গঞ্জালেসের হাতটা। কব্জির তলায় তামাটে চামড়ার নিচে তাহার ঠেলিয়া-ওঠা মোটা নীল শিরাগুলির রক্তের আন্দোলনে থর থর করিয়া কাঁপে, নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে দ্রুত তালে।

সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ বহিয়া যায় গঞ্জালেসের—যেন ডি-সুজার উত্তেজিত চাঞ্চল্যটা তাহার মধ্যেও সংক্রামিত হইতে শুরু করিয়াছে। বলে, ঠিক কথা।

—ঠিক কথা নয়?—স্বপ্নাতুর হইয়া ওঠে ডি-সুজার চোখ: পর্তুগীজদের দিগ্বিজয়ী নৌবহর ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাগুলি পার হইয়া আবার কি আসিয়া দেখা দিতে পারে না? আগুন জ্বলিতেছে সপ্তগ্রামের বন্দরে। বন্দুকের শব্দে রাত্রির ভয়ার্ত হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিতেছে থর থর শব্দে। বিবাহ-বাসর হইতে সুন্দরী মেয়েদের ছিনাইয়া আনিয়া বজরার অন্ধকারে সেই রাক্ষস-বিবাহ। আলীবর্দীর কামানের গোলাগুলির লাল আগুনের পিণ্ডের মতো সমুদ্রে আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু হার্মাদদের জাহাজকে তাহা স্পর্শও করিতেছে না।

শুধু কি তাই? বীররস হইতে ডি-সুজার মন মাঝে মাঝে বর্তমান পৃথিবীতেও ফিরিয়া আসে। ইহারই মাঝে মাঝে ডি-সুজা নিজের পরিবারের গল্পও বলে। লিসিকে সে অত্যন্ত ভালোবাসে—ওই মা-মরা নাত্নীটার জন্যই তাহার যা কিছু দুর্বলতা। ও না থাকিলে আবার হয় তো সমস্ত ভারতবর্ষটায় সে আর একবার অভিযান করিতে বাহির হইয়া পড়িত—কিন্তু লিসিকে ছাড়িয়াই থাকিতে পারে না। তাহার ঘর সংসার যাহা কিছু লিসিই আগলাইয়া রাখিয়াছে। নিজে ডি-সুজা সামান্য যা কিছু টাকা-পয়সা করিয়াছে তা ওই লিসির জন্যই। ভালো দেখিয়া একটা ছেলে জোটাইতে পারিলে তবে নিশ্চিন্ত।

•

ডি-সুজাকে গঞ্জালেসের ভালো লাগিয়া গেল।

চট্টগ্রামে আসিয়া ডি-সুজা গঞ্জালেসের আতিথ্য লইল। শুধু আতিথ্যই লইল না—চর ইস্মাইল হইতে একটি বার ঘুরিয়া আসার সনির্বন্ধ অনুরোধও জানাইল তাহাকে গঞ্জালেস্ রাজী হইল। তারপর একদিন চাঁদপুর হইতে নৌকায় পাড়ি দিয়া চর ইস্মাইলে আসিয়া দর্শন দিল।

প্রকৃতির একেবারে কোল ঘেঁষিয়া সদ্যোজাত শিশু চর ইস্‌মাইল। অবশ্য একেবারে সদ্যোজাতও নয়। ইতিহাসের দিক দিয়া খুঁজিতে গেলে গত তিনশো বছর ধরিয়া সমুদ্রচারী জলদস্যুদের সে সযত্নে আশ্রয় দিয়াছে—এককালে এখানে তাহাদের বিরাট উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। সে উপনিবেশ অবশ্য নদীগর্ভে অনেকখানি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু মাটির মধ্যে পুঁতিয়া যাওয়া মরিচা-পড়া কামান সেদিনের স্মৃতি বহিয়া আজও মুখ তুলিয়া আছে আকাশের দিকে।

তবু চর ইস্‌মাইল শিশু। শিশুর মতো অপরিণত—শিশুর মতো নিজেকে ভাঙিয়া চলে। চূর্ণ খেলনার ধুলি ভাঁটার টানে নামিয়া যায় বঙ্গোপসাগরে। দেহ আর মনের ক্ষুধা আদিম অমার্জিত রূপ লইয়া দেখা দেয়। অতীত নাই—কিন্তু বাতাসে বাতাসে তাহার নিশ্বাস এখনো ফুলের গন্ধের মতো ছড়াইয়া আছে।

এমনি একটা পটভূমিতে গঞ্জালেস্ দেখিল লিসিকে।

আরাকানী-খাদমিশানো তামাটে মুখে ছোট ছোট চোখ দুটিকে আরো ছোট করিয়া লিসিও তাহাকে পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। নির্ভয় নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি। বলিল, তুমি কে?

ভাব দেখিয়া গঞ্জালেসের হাসি পাইল। বলিল, দেখতেই পাচ্ছ।

—ওঃ, তুমি স্তামুয়েল গঞ্জালেস্, তাই না? ঠাকুর্দা তোমার খুব গল্প করছিল।

—তা হবে।

লিসি আর একবার ভালো করিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল: তুমি গাছে উঠতে পারো?

—গাছে?—বিস্মিত হইয়া গঞ্জালেস্ বলিল, গাছে কেন?

—গাছে কেন কী?—লিসিকে ততোধিক বিস্মিত মনে হইল: নারকেল পাড়তে হবে যে।

—নারকেল পাড়তে! না, সে আমি পারবো না।

অসীম অবজ্ঞা ও অনুকম্পায় লিসি চোখ মুখ কুঞ্চিত করিল: গাছে উঠতে পারো না তো অমন চেহারাখানা রেখেছ কেন? আমি গাছে উঠতে পারি তা জানো?

—সত্যি নাকি!

—ওঃ, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

কথাটা বলিবার অপেক্ষামাত্র, তারপরেই কিছু আর করিতে হইল না। চট্ করিয়া কাপড়-চোপড় একটু সামলাইয়া দা হাতে লিসি কাঠবেড়ালীর মতো তর্ তর্ করিয়া নারিকেল গাছে চড়িয়া বসিল। তারপর সেখান হইতে বিজয়িনীর মতো গলা বাড়াইয়া গঞ্জালেস্‌কে ডাকিয়া কহিল, এই দেখলে তো?

গঞ্জালেস্ দেখিল এবং দেখিবামাত্র ভাবান্তর ঘটিয়া গেল তাহার।

লিসি গাছ হইতে ঝুপঝাপ্‌ করিয়া গোটাকয়েক ঝুনো নারিকেল নিচে ফেলিয়া আবার তেমনি অবলীলাক্রমে নামিয়া আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। আর সেই মুহূর্তে গঞ্জালেসের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। পরিশ্রমে লিসির তামাটে মুখখানা চমৎকার রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কপালের প্রান্তে প্রান্তে ঘামের বিন্দু। তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া গঞ্জালেসের নেশা ধরিয়া গেল।

দু পা আগাইয়া আসিয়া হঠাৎ গঞ্জালেস্‌ লিসির একখানা হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, বাঃ, তুমি তো দেখতে বেশ।

লিসি ভ্রূভঙ্গী করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু খুব যে এমন একটা ভয় পাইয়াছে তাহা মনে হইল না। বলিল, বেশ তো, তাতে তোমার কী?

—কিছু কাজ আছেই তো। আচ্ছা, পছন্দ হয় আমাকে?

হাত ছাড়াইয়া লিসি প্রস্থানের উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া সোজা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—কেন পছন্দ হবে তোমাকে? নারকেল গাছে উঠতে পারো না, খালি লম্বা চওড়া চেহারা থাকলেই চলে?

ব্যাপারটা গঞ্জালেস্‌ আরো সোজা করিয়া আনিল : আচ্ছা, নারকেল গাছে চড়াটা না হয় রপ্ত করে নেব। কিন্তু আমাকে বিয়ে করবে তুমি?

—বিয়ে! তোমাকে! লিসি তাহার মঙ্গোলিয়ান মুখখানাকে এমনভাবে বাঁকাইল যে গঞ্জালেস্‌ একেবারে সংকোচে জড়োসড়ো হইয়া গেল : তার চাইতে ভুঁড়ো ডি-সিল্‌ভাকে বিয়ে করলে ক্ষতি কী?

ভুঁড়ো-ডি-সিল্‌ভা ব্যক্তিটি কে, সে সংবাদটা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবার আগেই বেগে লিসি গেল অদৃশ্য হইয়া। দূরে কোথা হইতে চমৎকার বাঁশির সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল—বাজাইতেছিল জোহান।

•

লিসির কাটা-ছাঁটা স্পষ্ট জবাবে গঞ্জালেস্‌ কিন্তু খুশি হইয়া গেল। চর ইস্‌মাইলের এই রুক্ষতায় লিসির এমনি বন্যতাই তো স্বাভাবিক। আরো বিশেষ করিয়া পর্তুগীজদের রক্ত তাহার শরীরে। তাহার ঠাকুর্দা ইংরেজের আইনকে অস্বীকার করিয়া আফিঙের ব্যবসা চালাইয়া চলিয়াছে।

কথাটা শেষ পর্যন্ত ডি-সুজার কাছে সে পাড়িল।

ডি-সুজা এক রকম মুখিয়া ছিল বলিলেই হয়। দন্তহীন মুখে প্রাণপণে যে মুরগীর ঠ্যাংটাকে সে কায়দা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কথাটা শোনা মাত্র সেটা ঠকাস্‌ করিয়া প্লেটের উপর খসিয়া পড়িল। ঝোলমাখা পাকা গোঁফ জোড়া খাড়া করিয়া ডি-সুজা

বলিল, বটে বটে !

—যদি আপত্তি না থাকে—

—আপত্তি ! কী বলছ তুমি !—ডি-সুজা মুরগীর ঠ্যাং সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেল, বলিল, আমি তো সেই কথাই ভাবছিলাম। ডেভিডের ছেলে তুমি, তোমার মতো যোগ্যপাত্র আর কোথায় মিলবে। বললে বিশ্বাস করবে না, প্রথম যেদিন তোমাকে দেখেছি, সেদিন থেকেই ভাবছি লিসিকে তোমার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব।

বিনয়ে গঞ্জালেস্ মাথা নত করিয়া রহিল।

ডি-সুজা কহিল, এর মতো সুখের কথা আর কী আছে। দাঁড়াও লিসিকে আমি এক্ষুনি ডাকছি।—বলিয়া ঝোল-মাখা গোঁফজোড়া ফুলাইয়া চিৎকার করিয়া সে লিসিকে ডাকিল।

লিসি আসিয়া উপস্থিত হইল। ডি-সুজার মুখের অবস্থাটা লক্ষ্য করিয়া কহিল, কী হয়েছে ? কেন মিছামিছি চ্যাঁচাচ্ছ অমন করে ?

—বাঃ, চ্যাঁচাব না ? এই—একে চিনিস তো ? ডেভিড গঞ্জালেসের ছেলে ?

বাঁকা কটাক্ষে গঞ্জালেসের দিকে চাহিয়া লিসি বলিল, হুঁ, খুব চিনি।

—খালি চিনলেই চলবে না।

—কি করতে হবে তবে ?

—ওকে বিয়ে করতে হবে তোর।

—বিয়ে ! কী সব যা তা বলছ ঠাকুর্দা ! লিসি ঠাকুর্দাকে ধমকাইয়া উঠিল এক রকম। ডি-সুজা লিসির কথার সুরে থতমত খাইয়া গেল। তাহার আকস্মিক উৎসাহে মস্ত একটা আঘাত লাগিয়াছে।

—বিয়ে ! যাকে তাকে ধরে বিয়ে করলেই হয় বুঝি !

—যাকে তাকে কিরে ! ডেভিডের ছেলে যে ও—ডি-সুজা বিস্মিত শ্রদ্ধায় থামিয়া গেল। ইহার চাইতে বড় পরিচয় কী আর হইতে পারে মানুষের ? অন্তত সে তো জানে না।

কিন্তু এ পরিচয়ে লিসি বিচলিত বা বশীভূত হইল না। বলিল, হলেই বা ডেভিডের ছেলে, নারকেল গাছে যে উঠতে পারে না সে খবর রাখো ?

ডি-সুজা চটিয়া গেল : কেন, নারকেল গাছে ওঠাটা এমন কী ভয়ানক ব্যাপার ? জানিস, এমন ছেলে আজকালকার দিনে দেখা যায় না ? কত বড় ব্যবসা, কত টাকা—কেমন সুখে রাখবে বল্ দিকি ?

—ছাই !

ডি-সুজা তাতিতেছিল, আগুন হইয়া গেল একেবারে। চীৎকার করিয়া কহিল, এ

সব কথা কার কাছে শুনেছিস তুই ? জোহান বুঝি ?

—তুমি আবার পাগলের মতো চ্যাঁচাচ্ছ ঠাকুর্দা !

—নাঃ, চ্যাঁচাব না ! ঝোল-মাখা গোঁফজোড়া শিকারী বিড়ালের মতো ফুলাইয়া ডি-সুজা সরোষে কহিল, পাজী, নচ্ছার, হতভাগা ! মেরীর নাম করে বলছি, একদিন ওর সব কটা দাঁত উড়িয়ে দেব আমি।

গঞ্জালেস্ বোকার মতো বসিয়াছিল এতক্ষণ। বড় বেশি বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে বোধ করিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, আহা-হা, কেন মিথ্যে মাথা গরম করছ !

—না, মাথা গরম করব না, একেবারে ঠাণ্ডা জল হয়ে থাকব। জোহানের মতলব আমি কিছু বুঝি না আর ? কেবল আমার বড় মোরগটা ? লিসিকে সুদ্ধ বাগাবার চেষ্টায় আছে ও।

লিসি খানিকক্ষণ চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া ডি-সুজার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল নির্নিমেষ দৃষ্টিতে—অনেকটা যাদুকরেরা যেভাবে সম্মোহন-বিদ্যা প্রয়োগ করে সেই রকম। ফলও পাওয়া গেল অবিলম্বেই।

ডি-সুজা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে স্বর নরম হইয়া আসিল তাহার। কহিল, বাঃ, অমন করে তাকিয়ে আছিস যে ! আমি—আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি ?

লিসি গম্ভীর গলায় বলিল, হুঁ। ফের যদি তুমি ওই সব আবোলতাবোল বকবে, তা হলে আমি ঠিক ওই জোহানের সঙ্গে সোজা চলে যাব।

একবার আঁত্‌কাইয়া উঠিয়াই ডি-সুজা থামিয়া গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা গঞ্জালেসের কিন্তু ভারী ভালো লাগিয়া গিয়াছিল। লিসির বন্যতাটা তাহার চোখে যত বেশি করিয়া পড়িতে লাগিল, ততই সে দিনের পর দিন প্রলুব্ধ বোধ করিতে লাগিল নিজেকে। মদটা তীব্র না হইলে নেশা জমিতে চায় না—একপাত্র হুইস্কির মতোই লিসি আকর্ষণ করিতেছিল তাহাকে। নারিকেল গাছে উঠিতে না পারিলেও সে প্রতীক্ষা এবং প্রত্যাশা করিয়া রহিল।

কিন্তু চর ইস্‌মাইলে পড়িয়া থাকিলেই গঞ্জালেসের চলে না। তাহার বিরাট ব্যবসা আছে—দায়িত্ব এবং কাজের অভাবও নাই। সুতরাং একদিন তাহাকে আবার চট্টগ্রামে ফিরিতে হইলই। যাইবার আগে সে আশা লইয়া গেল যে লিসির কৃপাদৃষ্টি শেষ পর্যন্ত তাহার উপরে নিশ্চয়ই পড়িবে।

ডি-সুজা কহিল, ডেভিডের ছেলে তুমি—আমাদের গৌরব। বাপের নাম বাঁচিয়ে

রাখা চাই। শুভেচ্ছাটা গঞ্জালেস্ মাথা পাতিয়া লইল বটে কিন্তু বাপের নাম বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য খুব প্রবল একটা উৎসাহ বোধ করিল না। ডেভিডের চরিত্রের দুঃসাহসিক দিকটাকেই সে শ্রদ্ধা করিয়াছে শুধু, তাহার কার্য-তালিকা খুব অনুকরণযোগ্য বলিয়া ভ্রম তাহার কখনো হয় নাই।

২

ইহার পরে ছয় মাসের মধ্যে গঞ্জালেস্ আর চর ইস্‌মাইলের খোঁজখবর নিতে পারে নাই।

নদীতে জোয়ার-ভাঁটা চলিতে লাগিল অব্যাহত নিয়মে, বসন্তের স্পর্শে নদীর জল আরো বেশি করিয়া লবণাক্ত হইয়া আসিল। বিলে কলমীর ফুল ফুটিল—শ্যাওলার মধ্যে বুনো-হাঁস চোখ বুজিয়া রোদ পোয়াইতে লাগিল, আর নদীর স্রোতে বহিয়া আনা প্রচুর পলি-মাটির সহায়তায় জীবন-কীটেরা নূতন উপনিবেশের বীজ রচনা করিয়া চলিল।

এমনি একদিনে—এক বৈশাখী অপরাহ্ণে উপনিবেশের উপর দিয়া কালো ঝড় ঘনাইয়া আসিল।

তাণ্ডব শুরু হইল নদীতে—ফেনার মুকুট তুলিয়া কালো কালো ঢেউ আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল তীরের গায়ে। ধ্বংসাবশিষ্ট গীর্জাটার পাশে যেখানে রাশি রাশি গাছের শিকড় জলের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ওখানে ঝর্ ঝর্ করিয়া মাটি জলে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তও চোঁয়াইতে লাগিল—জোহানের রক্ত।···

বর্মীদের বজরাটা ইহার মধ্যে কতদূরে চলিয়া গেছে কে বলিবে। ঝড়ের মুখে পাল তুলিয়া দিয়াছে তাহারা। তেঁতুলিয়ার মোহনা পার হইয়া সমুদ্রের দোলায় দুলিতে দুলিতে তাহারা চলিয়াছে ইরাবতীর দেশে। সেখানে এখন পাহাড়ে পাহাড়ে ফুল ফুটিতেছে, প্যাগোডা হইতে ধূপের গন্ধ উঠিতেছে, শত শতাব্দীর নশ্বর-চিহ্নকে অস্বীকার করিয়া বরাভয় বিতরণ করিতেছে ধ্যানমগ্ন শিলামূর্তি। ম্লান আলোয় চকিতের জন্য তাহাদের বজরায় লিসির ভয়ার্ত মুখখানা দেখা গেল, তারপরেই হয়তো তাহা দৃষ্টির বাহিরে চিরদিনের মতো বিলীন হইয়া গেল।···বর্মীটা হাসিতেছে। পর্তুগীজদের বীরত্বের আদর্শ হইতে যে শিক্ষা সে লাভ করিয়াছে—সে শিক্ষা এমনি করিয়াই কাজে লাগাইল শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু ঝড় চলিতেছে তেঁতুলিয়ায়। কালো অন্ধকারে ঈগলের মতো পাখা মেলিয়া বজরার দুর্দম গতি দিকচক্রবালে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল।

আর হরিদাস সাহার পান্‌সী নৌকা? এই প্রলয়-তুফানে তাহা নির্বিঘ্নেই পাড়ি জমাইতেছে কি? অথবা সৃষ্টিছাড়া যাযাবরের সমস্ত যাত্রা আসিয়া শেষ হইয়া গেছে রাক্ষসী-নদীর মৃত্যু তাণ্ডবে? কেরামদ্দীর ভাবনা কোথাও যেন কূল পাইতেছিল না।

কিন্তু সব চাইতে কঠিন সমস্যা বোধ করিতেছিলেন কবিরাজ বলরাম মণ্ডল ভিষক্‌রত্ন।

মুক্তো উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতেছে। খোলা জানলা দিয়া জলের ছাট তাহার সমস্ত মুখে ছড়াইতেছে, চুল কপাল বাহিয়া বৃষ্টির জল গড়াইয়া পড়িতেছে, আর তাহার সঙ্গে মিশিতেছে চোখের জল। বৃষ্টিতে কাপড়টা ভিজিয়া দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া গেছে —শরীরের রেখায় রেখায় নির্ভুল ভাবে আসন্ন মাতৃত্ব।

বাইরে ঝড়ের বিরাম নাই। ঘরের মধ্যে ক্ষিপ্ত বাতাস ঢুকিয়া তাণ্ডব করিতেছে যেন—কিন্তু মুক্তোর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই বিন্দুমাত্রও। আর বলরাম তাকাইয়া আছেন বজ্রাহতের মতো! ব্যাপারটা অসম্ভব কিছু নয়, বরং এর চাইতে সঙ্গত এবং সম্ভব কিছুই নাই। তবু বলরাম কী বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না, কেবল মুক্তোর কাতর মুখটা তাঁহার দৃষ্টির সামনে জাগিতে লাগিল দুঃস্বপ্নের মতো।

বলরাম কহিলেন, কেঁদে কী হবে মুক্তো। ব্যবস্থা একটা তো করতেই হবে।

মুক্তোর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, ব্যবস্থা! ব্যবস্থা আবার কী করবে! এই জন্যেই তুমি এত আদর করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে, আমার সর্বনাশ করবার জন্যে?

—সর্বনাশ! তাই তো।

বলরাম ঘাড় এবং মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। সর্বনাশ—তা বটে। বংশরক্ষা করাটা দেহধর্মের প্রধান কর্তব্য; বংশধরের মুখ দেখিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে মানুষের মন। কিন্তু সেই বংশধর যে সময়বিশেষে কী ভয়ানক শত্রু হইতে পারে সেটা অনুভব করিয়া বলরাম অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা বোধ করিতে লাগিলেন।

চর ইস্‌মাইলের এই নির্জন সমাজহীন দেশ—এখানে অনেক কিছুই সম্ভব হইতে পারে, কাজেই মোটের উপর একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার কিছু নয়। কিন্তু—

মুক্তো আবার বিলাপ করিয়া কহিল, আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার সর্বনাশ করাই তোমার মতলব। তবুও বিশ্বাস করেছিলুম। ভেবেছিলুম—

বলরাম চটিয়া গেলেন—পৌরুষটা বেশ সজাগ হইয়া উঠিতেছে এতক্ষণে। সব দোষ বুঝি তাঁহার ঘাড়ে গিয়া পড়িল শেষ পর্যন্ত। এই সর্বনাশের জন্য মুক্তোর যেন কোনো

দায়িত্বই নাই। গঙ্গাজলে ধৌত বিশুদ্ধ একটি তুলসীপত্র আর কি! তবু যদি সব কথা বলরাম না জানিতেন। দেশে থাকিতে সে যে কতগুলি ছেলের মাথা খাইবার উপক্রম করিয়াছিল সেটা তো আর জানিতে বাকি নাই কাহারও। ইহাকেই বলে কলিকাল!

বলরাম চটিয়া গেলেন—শুধু মুক্তোর উপরে নয়, সমস্ত পৃথিবীর উপরেই। কাহারো ভালো করিতে নাই জগতে, ভালোবাসিতে নাই কাহাকেও। এতদিন বেশ তো কাটিতেছিল, দয়া-পরবশ হইয়া মুক্তোকে আশ্রয় দিয়াই না এই বিভ্রাট ঘটিল। কী অন্যায় তিনি করিয়াছেন? শুধু আশ্রয় দিয়াছেন বলিলে কম বলা হয়—মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছেন বলিলেও যথেষ্ট বলা হয় না। কাপড়চোপড়, ভালো খাবারদাবার, এমন কি দু-চারখানা গয়না পর্যন্ত। বলরাম তো আর দেবতা নন যে কেবল দিয়াই চলিবেন, তাহার পরিবর্তে একটুকু দাবি তাঁহার থাকিবে না। মুক্তোর এমন রূপ-যৌবনও বৃথাই তো নষ্ট হইতেছিল।

ঝড় চলিতেছে সমানে। একটা অশ্রান্ত সোঁ সোঁ শব্দ আর ঘনাইয়া আসা তরল অন্ধকারের অতি তীব্র গতিশীলতা। হুড়মুড় করিয়া একটা নারিকেল গাছ ভাঙিয়া পড়িল বুঝি। তেঁতুলিয়ার জলে যে মাতন চলিতেছে, এখান হইতেও তাহা যেন অনুভব করা যায়।

কিন্তু এই অবাঞ্ছিত আগন্তুক। মুক্তোর গর্ভে যে শিশু আসিতেছে তাহাকে লইয়া কী করা যাইতে পারে? বলরাম ভাবিতে লাগিলেন। মনের সামনে অনেকগুলি শিকড়-বাকড়ের নাম খেলিয়া গেল, বলরামের কবিরাজী প্রতিভা জাগিয়া উঠিতেছে। এখন এই একটা মাত্র পথ খোলা আছে—কিছু হয় তো এতেই হবে।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনাইতেছে। ঝড়টা এইবারে থামিবে বোধ হয়—মুক্তো এখন একটা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেলে পারিত। কিন্তু আজ আলো জ্বালিবার উৎসাহ নাই তাহার।

দরজায় জোর ধাক্কা পড়িল কয়েকটা।

বলরাম উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই রাধানাথ প্রবেশ করিল। ভিজিয়া ভূত হইয়া আসিয়াছে। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দাঁড়াইতেই ছোটখাটো একটা নদী বহিয়া গেল যেন।

বলরাম বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কোত্থেকে এলি?

রাধানাথ কহিল, কোত্থেকে আবার আসব! দিদিমণি পাঠিয়েছিলেন—পথে আসতে আসতেই ঝড়ে ধরে নিলে। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলুম—হুড়মুড় করে একটা মস্ত ডাল আমার গা ঘেঁষে পড়ল বাবু। আর দু হাত এদিকে পড়লেই রাধানাথের আর পাত্তা মিলত না।

—পাত্তা না মিললেই ভালো হত। কুঁড়ের বাদশা কোথাকার।

—আজ্ঞে আপনি তো বলছেন ভালো হত, কিন্তু রাধানাথের রাধা যে বিধবা হত সে

খেয়াল নেই বুঝি ?

উত্তর-দায়ক ভৃত্যের রসিকতার দুশ্চেষ্টা দেখিয়া আরও ক্ষেপিয়া গেলেন বলরাম। কহিলেন, যা, যা, ফ্যাক্ ফ্যাক্ করিসনি। কিন্তু দিদিমণি কোথায় পাঠিয়েছিল ?

রাধানাথের স্বরেও এবার অসন্তোষ প্রকাশ পাইল, তুমি যে সদরের উকিলের মতো জেরা শুরু করলে বাবু, ভিজে কাপড়ে কতক্ষণ জবাব দেব শুনি ? ওষুধ আনতে পাঠিয়েছিল।

—ওষুধ ! কী ওষুধ ?

—এই দেখ না—রাধানাথ কোঁচড়টা খুলিয়া দেখাইয়া দিল। আধো অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল, একরাশ সবুজ উজ্জ্বল ফল বৃষ্টিতে ভিজিয়া তাহার কাপড়ের মধ্যে চিক চিক করিতেছে।

—কী ফল রে ওগুলো ?—বলিয়া একটা ফল হাতে তুলিয়া লইতেই ভয়ে ও বিস্ময়ে বলরাম কথা কহিতে পারিলেন না। করবী ফুলের একরাশ গোটা। এগুলি ওষুধই বটে—ভবরোগের ওষুধ—কয়েকটা বাটিয়া খাইলেই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে নশ্বর দেহযন্ত্রণাটা বেশিক্ষণ ভোগ করিতে হয় না। বিসূচিকার লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিছুটা রক্তবমি হইয়া তারপরেই—ব্যস্ ! মুক্তোর মতলব তাহা হইলে—

কথাটা ভাবিতে গিয়াও বলরামের মস্তিষ্কের সমস্ত কোষগুলি একসঙ্গে যেন ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া বাজিয়া উঠিল। আত্মহত্যার মতলব আঁটিতেছিল মুক্তো ! ব্যাপারটা কি এত দূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে যে আত্মহত্যা না করিয়া তাহার হাত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই ! কিন্তু পুলিসে একবার খবর পাইলে ফাঁসির দড়ি তাঁহারই গলায় আঁটিয়া বসিবে যে !

ব্যাপারটার সূচনামাত্র অনুধাবন করিয়াই রোষে বলরাম বিদীর্ণ হইয়া পড়িলেন।

—আমাকে ফাঁসিতে চড়াবি তোরা ! হতভাগা উজবুক কোথাকার !—যাইবার জন্য পা বাড়াইতেছিল রাধানাথ, কিন্তু বলরামের এই আকস্মিক বিস্ফোরণে থমকিয়া দাঁড়াইল।

—কী হয়েছে ?

—কী হয়েছে ? কী হয়নি তাই শুনি ? উঃ, কী ভয়ানক লোক সব ! তলে তলে এই কাণ্ড চলেছে !

—বক্ বক্ করে মরো গে তুমি, আমি চললুম—রাধানাথ সত্যি সত্যিই চলিয়া গেল।

অন্ধকারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন বলরাম। ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত রূপ লইতেছে। সন্তান আসিতেছে—আসুক না। যদি কোনমতেই ঠেকানো না যায় তাহা হইলে গলা টিপিয়া মারিয়া তেঁতুলিয়ার জলে ফেলিয়া দিলেই চলিবে। এ তো ফরিদপুর নয় যে চৌকিদার হইতে আরম্ভ করিয়া একেবারে বড়লাট পর্যন্ত ইংরেজের আইন সঙ্গীন্

খাড়া করিয়া আছে।

কিন্তু মুক্তো? জীবন সম্বন্ধে কেন সে এত তিক্ত হইয়া উঠিতেছে, কেন এমন আকস্মিক ভাবে সে নিজেকে শেষ করিয়া দিতে চায়? দেশে গাঁয়েও তো এমন কত ঘটনা হয় বলরাম কি তাহা জানে না? ডাক্তার কবিরাজের পিছনে কয়েকটা টাকা খরচ করিলেই তো যথেষ্ট। দিনকয়েক কানাঘুষা, সামান্য কিছু আলোচনা—তাহার পরেই আর কোন কলরব নাই। যেমন চলিতেছিল—তেমনি ভাবেই কাটিয়া চলে যথানিয়মে।

অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মুক্তোর বৃষ্টিসিক্ত করুণ মুখখানির কথা ভাবিয়া বলরাম এই মুহূর্তে কেন যেন অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন। হাজার হউক, মুক্তো তাঁহার আশ্রিত, একেবারে অতটা না' করিলেও চলিত। কিন্তু সেই সব মুহূর্ত—রক্ততরঙ্গিত স্নায়ুতে সেই মূঢ় বিহ্বলতা। কতদিন যে বলরামের কাটিয়াছে শুষ্ক নিঃসঙ্গতায়, নারীসঙ্গহীন তীব্র একাকিত্বে। বলরাম ভীরু, বলরাম কাপুরুষ।

সেই ভীরু যখন তাহার চাইতেও ভীরুকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাইয়াছে, তখন তাহার মধ্যে অত্যাচারী পশুশক্তিটা দেখা দিয়াছে দ্বিগুণ রূপ লইয়া। যে দুর্বল চিরদিন সকলের কাছে লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াই আসিয়াছে, সে যখন তাহার চাইতে দুর্বলকে আয়ত্তের মধ্যে পায়, তখন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো হইয়া উঠে তাহার মূর্তি। সকলের কাছ হইতে যাহা সে পাইয়াছে, সে বস্তু একজনকেই সম্পূর্ণ ভাবে বর্ষণ করিয়া মানসিক ক্লীবত্বের ঋণমুক্ত হইতে চায় সে।

ঝড় থামিয়া গেছে সম্পূর্ণ ভাবে। শুকনো পাতার উপর থাকিয়া থাকিয়া ঝর্ ঝর্ শব্দে এক এক পশলা জল ঝরিয়া পড়িতেছে মাত্র। তেঁতুলিয়ার গর্জন আর শোনা যায় না। শুধু ঘরের মুক্তো এখনো নিতান্ত অকারণে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। আর কাচভাঙা দেওয়াল ঘড়িটা ক্রমাগত টক্ টক্ করিতেছে—যেন অত্যন্ত জোরে, অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবেই।

৩

উৎসব শেষ হইয়া গেল।

আকাশের প্রান্তে যাহারা কালো কালো মৃদঙ্গে ঘা মারিয়া নদীর উপর নাচিতে শুরু করিয়াছিল, তাহাদের আর খুঁজিয়া পাইবার জো নাই। কোঁকড়ানো চুলের মতো নদীর জল এখনও ফুলিয়া উঠিতেছে—দিক-দিগন্তে ফস্‌ফরাসের উজ্জ্বল দীপ্তিকণিকা ফুটিয়া পড়িতেছে, ফাটিয়া পড়িতেছে এখনও। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া আর ভয় করে না। ওপার

হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিতেছে : নদীর মুখের উপর হইতে কে একখানা কালো ঘোমটা সরাইয়া নিল যেন। জলের হাসি দেখিলে এখন কাহার মনে হইবে যে একটু আগেই পাতাল হইতে একশোটা রাহু পৃথিবীর সমস্ত আলো গিলিয়া খাইবার জন্য ইহার তলা হইতে ঠেলিয়া উঠিয়াছিল।

উৎসব শেষ হইয়া গেল—যাহারা উৎসবে যোগ দিয়াছিল, ঝোড়ো হাওয়ায় পাখা মেলিয়া উড়িয়া গেছে তাহারা। শুধু চাঁদ নয়, মেঘের আড়াল সরিয়া ধোঁয়াটে তারাগুলি ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সপ্তর্ষি নামিতেছে একেবারে জলের কোল পর্যন্ত। কেবল উৎসবের সাক্ষী হইয়া আছে ভূলুণ্ঠিত কতকগুলি সুপারী গাছ—আর নাচের সময় কাহার হাত হইতে একটা সোনার বালা যে খসিয়া পড়িয়াছিল তাহারি উত্তাপে দীর্ণদগ্ধ একটা তালগাছ হইতে এখনো উৎকট গন্ধকের গন্ধ উঠিয়া আকাশ-বাতাসকে ছাইয়া ফেলিতেছে—মুমূর্ষুর খানিক বিষাক্ত নিশ্বাসের মতো।

ঝড় থামিতেই ডি-সিল্‌ভার মনে হইল, গোরুগুলির একবার খোঁজ লইলে ভালো হয়। ঝড় শুরু হইবার আগে তাহাদের সবগুলি ফিরিয়া আসে নাই, গাছ চাপা পড়িয়া দু-একটা মরিয়াছে কিনা কে বলিবে। বিশেষত শাদা-কালোয় মিশানো যে বড় গোরুটা দু বেলায় পাঁচ সের করিয়া দুধ দেয়, তিন-চার দিনের মধ্যেই বাচ্চা হইবে সেটার। এই দুর্বৎসরে সেটা খোয়া গেলে বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া যাইবে।

একটা লণ্ঠন লইয়া ডি-সিল্‌ভা বাহির হইয়া পড়িল। বৈশাখ আসিতে অবশ্য দু মাস দেরি, তবু ইহাকে চরের প্রথম কালবৈশাখী বলা যাইতে পারে। জোরটা নেহাৎ কম হয় নাই। নদীতে কতগুলি নৌকা যে মারা পড়িয়াছে কে জানে! দু-একটা মড়া আসিয়া চরে ঠেকিলে হয়তো সেটা সঠিকভাবে জানিতে পারা যাইবে। গাছ অনেকগুলি পড়িয়াছে। জোহানের চালা হইতে তিন-চারখানা টিন আসিয়া উড়িয়া নামিয়াছে রাস্তায়।

চাঁদ উঠিয়াছে বটে, কিন্তু নানা গাছের ছায়ায় খানিকটা ঘন অন্ধকার। পায়ের তলায় জল ছপ্‌ ছপ্‌ করিয়া উঠিতেছে, ওপাশ দিয়া ওটা কী চলিয়া গেল? বাপ্‌রে—প্রকাণ্ড একটা খ'য়ে জাতি! চার হাতের কম লম্বা হইবে না। ডি-সিল্‌ভা লাফাইয়া তিন পা সরিয়া গেল। কিন্তু লিসির মতোই সাপটাও ডি-সিল্‌ভাকে নগণ্য বোধ করিল কিনা কে জানে—অন্তত লক্ষ্য করিল না।

ঝড়ের পরে চর ইস্‌মাইল ঘুমাইয়া আছে শিশুর মতো শান্ত হইয়া। কোথাও কোনো কলরব নাই, সব যেন রহস্যময় ভাবে নীরব। অন্ধকার গ্রামের পথে ডি-সিল্‌ভার ভয় করিতে লাগিল। এখানে ওখানে জমাট বাঁধা জোনাকীর পুঞ্জ—আলোগুলো যেন ভূতের মতো দেখিতে। নূতন বৃষ্টির জল পড়িয়া ভিজা ঝরা পাতা আর কাদার গন্ধ উঠিতেছে।

ডি-সিল্‌ভা চিৎকার করিয়া ডাকিল, জোহান, জোহান!

পাত্তা মিলিল না।

—এই সন্ধ্যেবেলায় ঘুমিয়ে পড়লে নাকি ? জোহান !

তবুও সাড়া মিলিল না।

ওপাশেই ডি-সুজার বাড়ি। এও যেন একটা ঘুমন্ত পুরী হইয়া আছে। কোনোখানে একটা সাড়াশব্দ পাইবার যদি আর জো থাকে। অবশ্য, ডি-সিল্‌ভা প্রাণ গেলেও ডি-সুজার সঙ্গে যাচিয়া আর আলাপ করিতে রাজী নয়—বিশেষত সেদিনের সেই ব্যাপারের পর। সে ভুঁড়ো, সে অকর্মা—এসব অপবাদ এবং অপমান ডি-সিল্‌ভা মরিয়া গেলেও ভুলিবে না কোনোদিন। বরং যেমন করিয়া হোক ইহার শোধ লইবে। মেরীর নাম করিয়া সে শপথ করিয়াছে, চালাকি নয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এমন সময়—এইরকম অন্ধকারের মধ্যে ডি-সুজার এক-আধটা কাশির আওয়াজ শুনিতে পাইলেও খুশি হইত মনটা।

তিন-চারটা গাছ পড়িয়াছে ডি-সুজার। দরজাটা হাঁ করিয়া খোলা। বাড়িতে মানুষ নাই নাকি ? ডি-সিল্‌ভার আরো খারাপ লাগিতেছে। পথ চলিতে চলিতে ডি-সিল্‌ভা নিজের মনে গুন্ গুন্ করিয়া বাইবেল আওড়াইতে লাগিল। কিন্তু অস্থির চঞ্চল মন—ঈশ্বর আর শয়তানের মধ্যে বারে বারেই গণ্ডগোল বাধিয়া যাইতেছে। ঈশ্বরের কৃপা চাহিতে গিয়া সে বারে বারেই চাহিতেছে শয়তানের কৃপা।

দুত্তোর শয়তান ! একেবারে মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি তাহার ? চুলোয় যাক গোরু—এমন রাত্রে সেটাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিলেই হইত। তা ছাড়া যে সাপ সে দেখিয়াছে, ওই রকম আর একটা ফণা তুলিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেই তো—

ডি-সিল্‌ভা ফিরিয়া যাইবার প্রেরণা বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু জঙ্গলের আড়ালটা সরিয়া গেছে—এতক্ষণে মাথার উপর তারা-ভরা আকাশ ও চাঁদ ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। আর ওদিকে পোস্ট অফিসের জানালায় একটা বড় আলো জ্বলিতেছে, তবে আর ভয়টা কিসের ?

ভাঙা গির্জার ওদিকটায় একবার খুঁজিয়া আসিতেই হইবে।

ভয়টা অবশ্য ওদিকেই—একসময়ে ওখানে গোরস্থান ছিল। লোকে বলে, জায়গাটা জিন-পরীর আস্তানা। তবে গোরস্থান বলিতে বিশেষ কিছু আর অবশিষ্ট নাই। ডি-সিল্‌ভার চোখের সামনেই তো প্রতিবছর একটু একটু করিয়া ভাঙিতে ভাঙিতে তাহা প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেছে। তবুও—

সাহসে ভর করিয়া ডি-সিল্‌ভা আগাইয়া চলিল।

গাছের ছায়ায় শাদা মতো কী পড়িয়া আছে ওটা ? তাহার গোরুটাই নয় তো ? বসিয়া বসিয়া জাবর কাটিতেছে বোধ হয়। সমস্ত গ্রামটা খুঁজিয়া খুঁজিয়া সে হয়রাণ, আর এদিকে—

কিন্তু কয়েক পা আগাইতেই ভয়ে ডি-সিল্‌ভার মাথার চুলগুলি খাড়া হইয়া গেল। গলা হইতে একটা চিৎকার বাহির হইতে আসিতে না আসিতেই থামিয়া গেল অর্ধপথে! হাত হইতে লণ্ঠনটা মাটিতে পড়িয়া বার কয়েক দপ্‌ দপ্‌ করিল, তারপরেই নিবিয়া গেল সেটা। যা দেখিয়াছে তা যেন এখনো বিশ্বাস হইতেছে না।

জোহানের রক্তাক্ত কবন্ধ দেহটাই চোখে পড়িয়াছিল ডি-সিল্‌ভার।

বর্মী মেয়েই শেষ পর্যন্ত দরজা খুলিয়া দিল। বলিল, বড় বেশি অন্ধকার, তাই না?

কথা কহিবার প্রেরণা ছিল না। তবু মণিমোহন জবাব দিল, তা হোক, টর্চ আছে আমার সঙ্গে।

বর্মী মেয়ে তাহার টুকটুকে ঠোঁট দুটিতে মিষ্টি একটুখানি হাসি ফুটাইয়া তুলিল।

—আর কোনোদিন এদিকে আসবে না বোধ হয়?

—না।

—আমার ওপর রাগ করেছ তুমি?

—কারো ওপর কোনো রাগ নেই আমার—মণিমোহন আর কথা বাড়াইতে চাহিল না। বড় বড় পা ফেলিয়া সে চলিতে লাগিল। সমস্ত শরীর মনে অসহ্য গ্লানি আর বিরক্তি। স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে সে। এই ঝড়ের সন্ধ্যা তাহার জীবনে থাকিবে একটা দুঃস্বপ্ন হইয়াই।

দূর হইতে বর্মী মেয়ের গলা ভাসিয়া আসিল, আবার এসো।

মণিমোহন জবাব দিল না।

ঝরা পাতা, কাদা আর অন্ধকার। টর্চের আলোয় পথটা জ্বলিয়া উঠিতেছে তরল কাদায়। রবারের জুতা বারে বারে পিছলাইয়া পড়িতে চায়। কিন্তু মণিমোহনের মনটা নিজের মধ্যেই তলাইয়া গিয়াছিল।

ক্ষুধা কত তীব্র হইতে পারে মানুষের, আর কেমন অসংকোচেই সেটা যে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। দ্বিধা নাই, সংশয় নাই, ভাবনা নাই। কী হইতে পারে এবং কী যে হইতে পারে না তাহা লইয়া বিচলিত হওয়া অসম্ভব এবং অবান্তর। রূপকে যদি আগুন বলা যায় তাহা হইলে সে রূপের দাহিকা-শক্তি সম্বন্ধে আর এতটুকু সংশয় নাই মণিমোহনের মনে।

কিন্তু এ কথা কি কখনো ভাবিতে পারিত রাণী? বর্ধমানের সেই গ্রাম। আমের জামের ছায়ায় ঝিমাইয়া-আসা সন্ধ্যা। এখন ফাল্গুন মাস—অজস্র মুকুল ধরিয়াছে চারিদিকে, মহুয়ার গন্ধের মতো অত্যুগ্র একটা মাদক-সৌরভে মাঠ-ঘাট-বন ছাইয়া গেছে। তুলসী-মঞ্চের তলায় ছোট একটা মাটির প্রদীপে শিখাটা কাঁপিতেছে মৃদু মৃদু। দূরের স্টেশনে সন্ধ্যার লোকাল আসিয়া থামিল কলিকাতা হইতে—অলস ভাবে হুইশিল বাজাইয়া আবার চলিয়া

গেল। রাণী উৎকর্ণ হইয়া কান পাতিয়া আছে। এখনই বাহিরে কাহার জুতার শব্দ শোনা যাইবে বোধ হয়।

মৃদু জীবন—শান্ত আর মন্থর। একশো বছর আগে যাহা ছিল তাহাই। গ্রামের তলা দিয়া যে নদী বহিয়া গেছে, এক বর্ষাকাল ছাড়া সব সময়েই হাঁটু অবধি কাপড় তুলিয়া সে নদী পার হইয়া যাওয়া চলে। দুই পারে ভাঁটফুল ফুটিয়াছে, কখনো কখনো তাহার দু-চারটি কেউ বা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। সে নদীতে প্রদীপ ভাসিয়া চলে, ভাসিয়া যায় কাগজ আর মোচার খোলার নৌকা। শুক্‌নার সময় শ্যাওলার মধ্যে হাত বাড়াইয়া গুগ্‌লি আর চিংড়ি মাছ ধরে গ্রামের বাগ্দীরা।

আর এখানে? যেটুকু মাটি তাহা তো নদীর করুণাতেই নিজেকে সঁাপিয়া দিয়া বসিয়া আছে। নূতন চর জাগিতেছে প্রত্যহ—নূতন মানুষ আসিয়া দেখা দিতেছে নূতন পেশী আর নূতন হিংস্রতা লইয়া। মাটিকে বিশ্বাস নাই—আছে আকাশের কোণে কোণে ঝড়ের মুখবন্ধ। আর এই জগতের প্রেম? রাণীর মতো তাহা উৎকণ্ঠ এবং উৎকর্ণ হইয়া প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে না—কাড়িয়া লয়—ছিনাইয়া লয়।

এখানকার যোগ্য নয় মণিমোহন। এই হিংসা আর পশুত্বকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় জাগে, কিন্তু শ্রদ্ধা আসে না। আদিম অমার্জিত যাহা—তাহার মধ্যে বিশালত্ব আছে, কিন্তু রূপ নাই। তাহা আগুন লাগাইতে পারে, আলো জ্বালাইতে পারে না।

সমস্ত দেহটা বিশ্রী ভাবে বিস্বাদ আর কুৎসিত লাগিতেছে। ওই বর্মী মেয়েটাকে ভাবিতে গিয়াই তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে। নিজেকেই কি সে আর বিশ্বাস করে? পাত্র যখন কানায় কানায় ফেনাইয়া উঠিতেছে, তখন সে কতক্ষণ ধরিয়া নিজেকে রাখিতে পারিবে শান্ত এবং সংযত করিয়া?

যা থাকে কপালে, এখানকার চাকরি সে ছাড়িয়াই দিবে। তারপর কলিকাতা। ট্রাম বাস মোটরের কলিকাতা। পরিচিত মুখ, চেনা রেস্তোরাঁ। লেকে পার্কে আর সিনেমায় সেই সব মেয়ের মুখ: যাহারা মোহ জাগাইয়া দেয়, কল্পনাকে প্রসারিত করে। আগুন নয়, খোলা জানালার ফাঁকে বিদ্যুতের আলোর মতো। রাত্রির চৌরঙ্গী মেট্রো সিনেমা। ফ্লাওয়ার মার্কেট। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের গা হইতে পাউডারের গন্ধ।

চটকা ভাঙ্গিয়া গেল। কোথায় কলিকাতা! উপনিবেশের নারিকেল বীথিতে বাতাসের মর্মর। নদী হইতে ঠাণ্ডা বাতাসে শীত করিতেছে। শিয়াল ডাকিতেছে দূরে। বৃষ্টি-ভেজা বন হইতে উড়িয়া-আসা একদল পোকা টর্চের আশ্চর্য আলোটার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছে। সামনেই তাহার বোট।

টর্চের আলো দেখিয়া গোপীনাথ একটা লণ্ঠন লইয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নামিয়া আসিল। বলিল, আমরা ভেবে ভেবে হয়রাণ। এই ঝড়ের মাঝখানে কোথায়

ছিলেন বাবু ?

মণিমোহন সংক্ষেপে কহিল, গাঁয়ের মধ্যে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া গোপীনাথ বলিল, আমরা তো ভেবে কূল পাই না। সবাই মিলে আপনাকে খুঁজতে বেরোচ্ছিলুম। কী ভয়ানক ঝড—দেখেছেন! একটু হলেই বোটটাকে উড়িয়ে নিত আর কী!

রবারের জুতোটা কাদায় ভরিয়া গেছে। নদীর জলে জুতা-সুদ্ধ পা দুইটা ধুইয়া মণিমোহন বোটে উঠিয়া আসিল।

গোপীনাথ বলিল, তা হলেও ছাড়িনি। মুরগী দুটো বানিয়েছি বেশ করে। টাকা না দিক, বুড়ো মজঃফর মিঞা মাঝে মাঝে এ-রকম দু-চারটে মুরগী খাওয়ালে মন্দ হয় না নেহাৎ।

ক্লান্তভাবে মণিমোহন বিছানাটার উপর গড়াইয়া পড়িল। বলিল, বেশ তো, ভালো করে খেয়ে নাও। আমি আর রাত্রে কিছু খাব না।

খাবেন না? গোপীনাথের কণ্ঠস্বর বিস্মিত এবং আহত শুনাইল, এত ভালো করে রান্না করলুম বাবু, আপনি না খেলে—

—আমি খেয়ে এসেছি।

—খেয়ে এসেছেন! এই গাঁয়ের মধ্যে!

—হুঁ।

গোপীনাথ আরো বিস্মিত হইয়া গেল: এই সব মুসলমানেরা! এরা আবার আপনাকে কী খেতে দিলে বাবু?

—সে অনেক কথা। মণিমোহন গম্ভীর হইয়া রহিল।

অতএব গোপীনাথ চুপ করিয়া গেল, কিন্তু তাহার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। এই গ্রামে এমন কোন লোক আছে যে আদর আপ্যায়ন করিয়া সরকারীবাবুকে খাইতে দিবে! সন্ধ্যার সময় এক এক কাঁসি পান্তা ভাত গিলিয়াই তো ইহারা নিশ্চিন্তে রাত কাটাইয়া দেয়। আরো এই ঝড়—

সে যাই হোক, অত ভাবিয়া গোপীনাথের কাজ নাই। বারো টাকা মাহিনার কর্মচারী সে। ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া মণিমোহন তাহাকে কিছুটা সম্মান দেখায়, কাগজপত্র লেখায় মাঝে মাঝে। কিন্তু আসলে সে তো মণিমোহনের আর্দালী ছাড়া আর কিছুই নয়। উপরওয়ালা মনিবের চালচলন লইয়া সে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিতে যাইবে কী জন্য?

তবু একটা জিনিস বড় খচ্ খচ্ করিতেছে। হাজার হোক, হিন্দুর ছেলে। মুরগী খাওয়াটা না হয় সমর্থন করা যাইতে পারে—পেটে গঙ্গাজল আছে, ওটা শুদ্ধ হইয়া

যাইবেই। কিন্তু মুসলমানের রান্না ! সাতবার প্রায়শ্চিত্ত করিলেও পাপ হইতে আর নিষ্কৃতি নাই, নির্ঘাৎ ম্লেচ্ছলোক প্রাপ্তি।

৪

বর্মীটা মিথ্যা বলিয়াছিল লিসিকে। ডি-সুজা কিন্তু মরে নাই।

ঝড়ের পরদিন সে ফিরিল গ্রামে। সমস্ত চর ইস্মাইলে হুলুস্থুল শুরু হইয়াছে। জোহানকে যেন খুন করিয়াছে কাহারা। আর লিসি ? কোনোখানে তাহার এতটুকু স্বাক্ষর চিহ্ন ডি-সুজা খুঁজিয়া পাইল না—সে যেন ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গেই দিগন্তে গেছে বিলীন হইয়া।

ডি-সুজা ক্রমেই ক্লান্ত হইয়া উঠিতেছিল। আফিমের ব্যবসায়ে ইহাই অবশ্য তাহার প্রথম হাতে-খড়ি নয়। জীবনের ত্রিশটি বৎসর ইহারই মধ্যে কাটাইয়া দিল, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে সে নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সব ব্যাপার লইয়া যাহারা কারবার করে, সমাজে কেহই তাহারা সাধু অথবা সচ্চরিত্র নয়—সাধু সাজিবার ভান সে-ও করে না। বরং সাধুত্ব জিনিসটা যে ক্লীব ও দুর্বলের লক্ষণ, এটাও সে ভালো করিয়াই জানে।

প্রথম যৌবন।

কলিকাতায় কর্মক্ষেত্র করিয়া সে তখন পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবসা চালাইতেছিল। ঔষধগুলি সেই সব জাতের—যে-সমস্ত রোগের নাম ভদ্রসমাজে কখনো করিতে নাই এবং ভদ্রসমাজই যাহাদের প্রধান খরিদ্দার। পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় চটকদার বিজ্ঞাপনগুলি কয়েক বছর যেন ছপ্পর ফুঁড়িয়া টাকা বৃষ্টি করিয়া গেল। ইচ্ছা করিলেই ডি-সুজা তখন লাল হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু পারিল না। লাল দামী মদ এবং গড়ের মাঠের পাশে পাশে সন্ধ্যার সময় দরজা জানালা বন্ধ যে সব রহস্যময় ল্যাণ্ডো ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারাই সে ব্যাপারে বাদ সাধিল।

প্রতিযোগিতার বাজার। দেখিতে দেখিতে যত্রতত্র অসংখ্য ঔষধের কোম্পানী গড়িয়া উঠিল এবং তাহাদের প্রচণ্ড বিজ্ঞাপন কোলাহলে ডি-সুজার কণ্ঠস্বর চাপা পড়িয়া গেল। অতএব বাড়িওয়ালাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া জাল গুটাইতে হইল। কিন্তু কেবল জাল গুটাইলেই তো চলে না, ব্যবসা উপলক্ষে যে অংশীদারটি প্রাণপণে তাহার জন্য ঢাক পিটাইতেছিল, তাহাকেও বঞ্চিত করিলে ধর্মে সহিবে কেন ? ডি-সুজা ধার্মিক লোক।

সুতরাং একদিন প্রভাতে সমস্ত রাত্রির নেশা কাটাইয়া যখন তাহার সহকারী জার্ডিন উঠিয়া বসিল তখন তাহার রূপবতী স্ত্রী হিল্ডাকে এবং সেই সঙ্গে ঘরের বহু মূল্যবান জিনিসপত্র কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বলা বাহুল্য, ডি-সুজাকে তো নয়ই!

সেই প্রথম হাতে খড়ি। তাহার পর কত হিল্ডা আসিল গেল। জীবন এবং জগৎ-টাকে আরো ভালো করিয়া জানিয়া নিবার জন্য সমস্ত ভারতবর্ষটাই পরিভ্রমণ করিল সে। সঙ্গী জুটিল যোগ্যতম ব্যক্তি—ডেভিড গঞ্জালেস্।

অর্থ-রোজগারের চেষ্টায় যে সব পথ তাহারা তখন ধরিয়াছিল, তাহার ইতিহাস প্রকাশ পাইলে তিরিশ বছর পরে আজো অনায়াসেই দ্বীপান্তর হইতে পারে। ডাকাতি, নোট-জাল. দ্রুতগামী মেল ট্রেনের কামরায় একাকিনী মহিলাযাত্রীকে আক্রমণ—সভ্যতার আলোকিত রঙ্গমঞ্চটার নেপথ্যে যে অন্ধকার অংশটা—সেখানকার কোনো গলিঘুঁজি চিনিয়া লইতেই তাহার বাকি নাই।

মাতাল অবস্থায় মোটর চাপা পড়িয়া মরিল ডেভিড। আর ডি-সুজা চট্টগ্রামের বন্দরে খালাসীদের কাছ হইতে বিপ্লববাদীদের জন্য রিভলভার সংগ্রহ করার ব্যাপারে এই নূতন পথটার সন্ধান পাইয়া গেল। যেমন অল্প পরিশ্রম, তেমনিই আয়। ঝক্কি অবশ্য আছেই, রোজগারের পথ কবে আর কুসুমাস্তৃত হইয়া থাকে!

আজই না হয় চর ইস্‌মাইলের বন্দর শোভায় সমৃদ্ধিতে ফাঁপিয়া উঠিতেছে, কিন্তু সেদিন কি এম্‌নি অবস্থা ছিল? সেদিনও তেঁতুলিয়া এমন করিয়া নিজের বহিয়া-আনা পলিমাটিতে নিজেরই মৃত্যুশয্যা রচনা করে নাই। চৈত্রের অসহ্য রৌদ্রে যখন আকাশটায় শুদ্ধ চিড় খাইবার উপক্রম করিত, তখনও এই নদীতে বাঁও মিলিবার কল্পনাই করিতে পারিত না কেউ। আর-এস-এন কোম্পানির নূতন লাইনে তো দূরের কথা, জল-পুলিসের নৌকা তখন ভোলা বা চাঁদপুরের কূল ছাড়াইয়া এদিকে পাড়ি জমাইবার দুঃসাহসিক কল্পনাকে মনের কোণেও স্থান দিত না। ব্যবসার পক্ষে কী দিনগুলাই যে গিয়াছে।

তারপর তিরিশ বৎসর কাটিয়া গেল—সম্পূর্ণ তিরিশটা বৎসর। নদীতে চড়া পড়িল, পড়িল মানুষের মনেও। সেই দুঃসাহসিক ডি সুজার প্রখর রক্তধারাও মন্থর হইয়া আসিল বুঝি। কয়দিন হইতেই ভয় করিতেছে। নিজের সুদীর্ঘ জীবনে পাশবিকতা আর বিশ্বাস-ঘাতকতার এত দৃষ্টান্তের সহিত তাহাকে মুখোমুখি করিতে হইয়াছে যে সাপের চাইতেও মানুষ নামক জীবটিকে সে অবিশ্বাস করে বেশি।

লিসির সম্পর্কে বর্মীটার মনোভাব কী কে জানে? হয় তো ভালোই—কিন্তু বহুদিন পরে ডি-সুজার কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছে এ পথে প্রথম নামিবার সময় যেমনটা হইয়াছিল তেমনিই। এই যে এতগুলি টাকা সে জমাইয়াছে বা জমাইতেছে এ কেবল লিসির জন্যেই তো। কিন্তু ইহার জন্য শেষ পর্যন্ত লিসিকেই যদি হারাইতে হয়,

তাহা হইলে—

নাঃ, এ সবের কোন অর্থ হয় না। নিজেই কি পরোয়া রাখে কাহারো? বয়স হইয়াছে—তা হোক, বর্মীর চাইতে তাহার পর্তুগীজ বাহুতে কিছু কম শক্তি ধরে না। তেমন তেমন ঘটিলে সে-ও তাহার মহড়া লইতে জানে। আর টাকা? টাকা যে কাহারো বেশি হয় এ কথা কেউ কখনো শুনিয়াছে নাকি? সারাজীবন ভরিয়া উপবাসী থাকিয়া জমাইয়া যাও—ঘোড়-দৌড়ের মাঠে তিনটা দিন বাজি ধরিয়াই একদম ফতুর। নিজের চোখেই তো এ সব সে কতবার দেখিল।

কাজেই সন্ধ্যার মুখে ভাঙা গীর্জাটার তলা হইতে ডিঙি খুলিয়া দিতে হইল। আগে হইলে কি এত সব বালাই ছিল নাকি! দিনকাল এখন সত্যিই খারাপ পড়িয়াছে। শুধু খারাপ বলিলেই যথেষ্ট হয় না—যতদূর খারাপ হইতে হয়। এমন দিনও গিয়াছে যখন প্রকাশ্যে হাটে বসিয়া—হাঁ, এই গাজীতলার হাটে বসিয়াই দাঁড়ি পাল্লা দিয়া কালো খয়েরের সঙ্গে আফিং বিক্রি করিয়াছে ডি-সুজা। তখনকার দিনে তো সে এ তল্লাটে একরকম রাজত্বই করিত বলা চলে।

কিন্তু সে-সব এখন নিতান্তই স্বপ্ন-কল্পনা। আবগারী লোকের জ্বালায় এখন আর কোনোদিক সামলাইবার জো নাই। গ্রামে গ্রামে, হাটে বাজারে তাহাদের লোক নিতান্ত নিরীহ ভালো মানুষটির মতো ঘুরিয়া বেড়ায়, খোঁজ-খবর সংগ্রহ করে। তারপর কিছু সূত্র সংগ্রহ করিতে পারিলেই গলাটি টিপিয়া ধরিতে যা দেরি। এই তো সেদিন খোকা মিঞার পাঁচটি বৎসর শ্রীঘর হইয়া গেছে।

ডি-সুজা ধীরে ধীরে দাঁড় টানিতে লাগিল, কিন্তু টানিবার কিছু দরকার ছিল না। ভাঁটার মুখে নোনা জল খরস্রোতে নামিয়া চলিয়াছে তর্ তর্ করিয়া। নারিকেল বনের মাথায় জাগ্রত একখণ্ড চাঁদ হইতে বুনো হাঁসের পাখার মতো নদীর জলে আলো-অন্ধকারের বিচিত্র রঙ ছড়াইয়া পড়িতেছে। গাজীতলার হাট পার হইলেই মুসলমানদের বস্তি, ছোট ছোট ঘরগুলি বাগানের আড়ালে আড়ালে একেবারে জলের ধার অবধি নামিয়া আসিয়াছে, আর তাহারই কোল ঘেঁষিয়া চলিতেছে নৌকা। নিবিড় দীর্ঘ ঘাসের বন সমস্ত তীরভূমিটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ইচ্ছা করিয়াই এ দেশের লোক বাড়িতে দিয়াছে ওদের। ঝড়-তুফান কিংবা জোয়ারের সময় যখন বড় বড় ফেনার মুকুট-পরা ঢেউ আসিয়া কূলকে আঘাত করিতে চায়, তখন এই ঘাসগুলিই বুক পাতিয়া সর্ব-প্রথমে সে আঘাত গ্রহণ করে, ডাঙা পর্যন্ত পৌঁছিতে দেয় না। এই ঘাসবন ভাঙিয়া ডিঙিটা খস খস করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। কী একটা ছোট মাছ অন্ধের মতো লাফাইয়া উঠিয়া ছলাৎ শব্দে একেবারে আসিয়া পড়িল নৌকার খোলের মধ্যেই।

গলুইয়ের উপর অলস-ভাবে গা এলাইয়া দিয়া বর্মীটা সিগারেট টানিতেছে। অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় তাহাকে ভালো করিয়া যেন চেনা যাইতেছে না। ডি সুজার মনে হইতে লাগিল : ম্লান জ্যোৎস্নার আলোয় সমস্ত দিগ্‌দিগন্ত যেন অদ্ভুতভাবে রহস্যময়—আশে-পাশে কী আছে এবং কী যে নাই—দূরের তটরেখা যেমন সম্ভব অসম্ভবের অসংখ্য ছায়ামূর্তি রচনা করিয়া একটি অজ্ঞাত জগতের রূপ লইয়া বসিয়া আছে—বর্মীর সঙ্গে ইহাদের সব কিছুরই কী একটা সামঞ্জস্য আছে হয়তো। পুরানো-হইয়া-আসা হাতীর দাঁতের মতো তাহার মুখের রঙ—সিগারেটের আলোয় থাকিয়া থাকিয়া সেই মুখটা আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

অস্বস্তি লাগিতেছিল। নীরবতাটা যেন পীড়িত করিতেছে ডি-সুজাকে। কিছু একটা বলিবার জন্যই সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের আসামের খবর কী?

অনাসক্ত গলায় জবাব আসিল, খুব খারাপ।

—খুব খারাপ? কেন?

—পার্বতীপুরের রেল-ইস্টিশনে তিনজনকে ধরে ফেলেছে। সাত-আট হাজার টাকাই জলে গেল। ওদিকের ও পথটায় আর সুবিধে হবে না মনে হচ্ছে।

ডি-সুজা ভীত হইয়া উঠিতেছিল।

—বলো কী! আসামের কাজ বন্ধ হয়ে গেলে তো সবই গেল।

—প্রায় গেলই তো। এদিকেও পুলিস খুব জোর দেবে বোধ হচ্ছে। যতটা সম্ভব সাবধান হয়ে থেকো, কোনরকম কিছু আঁচ না পায়।

ভয়টা মনের ভিতর হইতে আবার ঠেলিয়া উঠিতেছে। গঞ্জালেস্ কবে আসিবে কে জানে। জোহানকে আর বিশ্বাস নাই, সবই যখন জানিয়া ফেলিয়াছে, তখন যে ইচ্ছা তাই সে অনায়াসে করিয়া বসিতে পারে।

উত্তেজিতভাবে ডি-সুজা বলিয়া ফেলিল, যথেষ্ট হয়েছে, এবার আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। আমি আর এসব গোলমালের মধ্যে থাকতে চাই না।

মুখ হইতে সিগারেট নামাইয়া বর্মী উঠিয়া বসিল। সে যে খুব বিস্মিত হইয়াছে মনে হইল না, যেন এমন একটা কথার জন্যই সে এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। সংক্ষেপে বলিল, তুমি তো পর্তুগীজ। তোমার পূর্বপুরুষেরা সারা দুনিয়া লুঠতরাজ করে বেড়াত—সুন্দরী মেয়েমানুষ পেলেই ছিনিয়ে নিয়ে আসত, তাদের বংশধর হয়ে তোমার এত ভয় কিসের?

পূর্বপুরুষদের গৌরবময় কীর্তিকলাপ স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার মতো কথার সুরটা তাহার নয়; বরং ইহার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা আছে। বহুদিন ধরিয়াই ডি-সুজা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে, শাদা জাতিগুলির

উপর ইহার অতি-প্রকট খানিকটা ঘৃণা যখন-তখন আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। হয়তো স্বাধীন ব্রহ্মের স্মৃতিটা এখনো ভুলিতে পারে নাই; শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু মান্দালয়ের রাজশক্তি যে আবার একদিন জাগিয়া উঠিবে গৌরবের পূর্ণ রূপ লইয়া—একথা ইহারা আজও বিশ্বাস করে হয়তো। তাই শ্বেত জাতিগুলি ইহাদের ঘৃণার বস্তু। একদিন—এবং সে তো আর খুব বেশিদিন আগেই নয়—ভারতবর্ষের কূল উপকূল ধিরিয়া তাহার পূর্বপুরুষেরা যে ভাবে অত্যাচারের আগুন জ্বালাইয়াছিল, বিবাহের রাত্রে চন্দন-চর্চিতা কন্যাকে যে ভাবে ছিনাইয়া আনিয়া বজরার অন্ধকারে রাক্ষসমতে নিজেদের অঙ্কশায়িনী করিয়াছিল, গর্বোজ্জ্বল এই সমস্ত কাহিনী শুনিয়া ওর চোখ প্রশংসায় উজ্জ্বল হইয়া ওঠে না; হাতীর দাঁত যেন কালো হইবার উপক্রম করে গ্রানাইটের মতো। ডি-সুজার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ভারতবর্ষের উপর এই হলদে মানুষটির বেশ খানিকটা তীব্র সহানুভূতি জাগিয়া আছে হয়তো।

তিক্ত ভাবে ডি-সুজা কহিল, ভয় নয়। বুড়ো হয়ে গেছি, শরীরে এখন আর এসব পোষায় না। আর যে কটা দিন বাঁচব, কোনো ঝক্কির ভেতরে থাকতে চাই না।

সিগারেটটাকে জলে ফেলিয়া দিল বর্মী। আস্তে আস্তে বলিল, সে একটা কথা বটে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, এ পথে ঢোকা সহজ, কিন্তু বেরোনো সহজ নয়। তাই যতদিন বাঁচবে, ততদিন এই কাজই করে যেতে হবে তোমাকে। আজ দলের থেকে বেরিয়ে গিয়ে কালই যে তুমি সবাইকে ধরিয়ে দেবে না—তার কোনো প্রমাণ আছে?

ডি-সুজা ম্লান হইয়া গেল।

—আমাকে বিশ্বাস করো না তোমরা?

একটু হাসিল সে। তারপর আবার আধশোয়ার ভঙ্গিতে গলুইয়ে গা এলাইয়া দিয়া জবাব দিল, বিশ্বাস করা কি এতই সহজ?

ডি-সুজা চুপ করিয়া রহিল। সত্যিই বিশ্বাস করা সহজ নয়। অবিশ্বাস, মিথ্যা আর অন্যায় লইয়াই যে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কারবার চালাইল, বুড়ো বয়সে দলকে দল ধরাইয়া দিয়া সে যে মোটারকম একটা কিছু পাইবার প্রত্যাশা করিবে সেটা তাহার পক্ষে কিছু অস্বাভাবিক হয় না। ঠিকই বলিয়াছে, রাগ করিয়া লাভ নাই।

নারিকেল বনের চূড়ায় খণ্ড চাঁদ। ডি-সুজা অন্যমনস্কের মতো দাঁড় টানিয়া চলিল। কিন্তু ইহারই মধ্যে হঠাৎ খানিকটা ঢোল ও করতালের শব্দ উঠিয়া মথিত করিয়া দিল আকাশকে। দূরে নদীর মাঝখানে নূতন জাগা ছোট বালুচরটার উপরে নোঙর ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে একখানা বড় নৌকা। ঘোলাটে জ্যোৎস্নাতেও দেখা যায়, তাহার দুদিকে ছোট ছোট দুটি পতাকা উড়িতেছে; দুই-একটা আলো জ্বলিতেছে মিট মিট করিয়া, আর তাহারই সঙ্গে ঝমর ঝমর করিয়া বাজনা বাজিতেছে।

সজোরে দাঁড়ে কয়েকটা টান দিয়া ডি-সুজা নৌকাখানাকে আনিয়া ফেলিল একেবারে কূলের কাছে। ঝোপ-জঙ্গলের এলোমেলো ছায়ায় জ্যোৎস্না এখানে তেমন স্পষ্ট হইয়া পড়ে নাই। তাহারই আড়ালে নৌকা বাহিতে বাহিতে ডি-সুজা বলিল, জলপুলিস!

—জলপুলিস!—বর্মী সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল।

ডি-সুজা বলিল, ভয় নেই, আমাদের ধরবার জন্যে নয়। এখানে কয়েকদিন আগে মস্ত একটা ডাকাতি হয়ে গেছে, তারই খোঁজ-খবর নিতে এসেছে ওরা।

—ডাকাতি? কারা করেছে?

—কারা করবে আর? আমাদের গাজী সাহেবের দল নিশ্চয়ই।

—চালাক লোক গাজী সাহেব। এদিকে তো ঢের জমিদারী আছে, আফিঙের কাজেও রোজগার একেবারে মন্দ হয় না, আবার ডাকাতির ব্যবসাও চলেছে বেশ।

জলপুলিসের নৌকাটা ডি-সুজার মনটাকে বদলাইয়া দিয়াছে আকস্মিক ভাবে। বর্মীটাকে যেন এই মুহূর্তে আর ততটা খারাপ বলিয়া বোধ হয় না। দুঃসাহসিক—বেপরোয়া ডি-সুজা। জীবন ভরিয়া কীই না করিল সে। আজই না হয় খুনাখুনির ব্যাপারে চিত্তটা চমকিয়া ওঠে—পুলিসের নামে তটস্থ হইয়া উঠে সর্বাঙ্গ, কিন্তু কর্মমাতাল জীবনে যেদিন জোয়ার আসিয়াছিল, সেদিন মৃত্যুর চাইতে সহজ আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় নাই। আম্বালা স্টেশনে সেই শিখ স্টেশনমাস্টারটার কথা মনে পড়িতেছে। ডেভিডের কুড়ুলের একটি কোপে তাহার মাথার গোলাপী পাগড়ি উড়িয়া পড়িয়াছিল—আর খুলিটা চুরমার হইয়া রক্ত আর ঘিলু ছিটকাইয়া দেওয়ালে গিয়া লাগিয়াছিল। ফিন্‌কি দিয়া খানিকটা রক্ত আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ডি-সুজার নাকে-মুখে।

ডি-সুজা নড়িয়া চড়িয়া ঠিক হইয়া বসিল। একটু আগেই কী দুর্বলতা যে পীড়িত করিতেছিল তাহাকে। লোকটাকে এমন অবিশ্বাস করিবার কী আছে! এতদিন ধরিয়াই তো লিসিকে দেখিয়া আসিতেছে সে। কিছু একটা করিবার মতলব থাকিলে কি এর মধ্যেই করিতে পারিত না?

বর্মীর কথার কোনো স্পষ্ট উত্তর না দিয়া ডি-সুজা নীরবে দাঁড় টানিতে লাগিল। জলপুলিসের নৌকাটা একেবারে কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, হোগ্‌লাবন ঘেঁষিয়া অত্যন্ত সাবধানে চলিল ডিঙিটা। আফিঙের বাণ্ডিলটাও সঙ্গেই আছে। চ্যালেঞ্জ করিলে কেবল যে হাতে দড়ি পড়িবে তাই নয়, অনেকগুলো টাকাই বরবাদ হইয়া যাইবে একেবারে।

জলপুলিসের তখন এদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার মতো মনের অবস্থা নয়। নিরালা নদীর বুকে বসন্তের রাত্রি। বাতাসে বাতাসে স্নিগ্ধ পেলবতা দূর পশ্চিম হইতে বাংলাদেশের এই প্রত্যন্ত সীমায় এমন অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে আসিয়া রীতিমতো রঙীন হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের মন। যুক্তপ্রদেশের কোন্ এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে সর্বাঙ্গে রূপার গয়না পরিয়া

যেখানে তাহার প্রেয়সীরা ঘর্ ঘর্ করিয়া জাঁতায় গম ভাঙিতেছে, সেখানকার স্মৃতি মানসচক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাদের উদাস করিয়া দিতেছে। একজন দস্তুর মতো গান জুড়িয়া দিয়াছে :

"আরে সাত সমুন্দর পারে পিয়া বাসে
আহা আওনে মোরা পাস্ তাকত্ নেহি—"

সঙ্গে সঙ্গে ঢোল এবং করতালও চলিতেছে সমান উৎসাহে। বোঝা যাইতেছে, সাত সমুদ্র তের নদীর পারে যে প্রেয়সীটি বিগুমান আছে এবং যাহার বিরহে গায়কের বিক্ষোভের সীমা নাই—সে প্রেয়সীটির সম্বন্ধে কেহই নিতান্ত উদাসীন নয়। ঢোলকের উপর যেভাবে উদ্দাম আক্রমণ চলিতেছিল, তাহাতেই সেটা বোঝা যাইতেছিল।

নীরবে খানিকটা পথ পার হইয়া গান ও করতালের শব্দটা যখন ক্ষীণ হইয়া আসিল তখন বর্মী প্রশ্ন করিল, আর কতটা যেতে হবে ?

ডি-সুজা জবাব দিল, দূর আছে। সামনের অন্ধকারে ওই যে কালো বাঁকটা—ওটা পেরোলে আরো প্রায় এক কোশ।

—গাজী সাহেব কী বলে আজকাল ?

—কোকেনের কথা বলছিল। বলছিল, কিছু কোকেন আনতে পারলে সুবিধে হয়।

বর্মী হাসিল : খাঁই আর মিটছে না। ডাকাতির ব্যবসাও তো চলছে।

—তা চলছে ! গাজী মানুষ কিনা, তাই রক্তের থেকে লড়াইয়ের নেশা আজো মেটেনি।

—গাজীরা কি লড়ায়ে জাত নাকি ?

—তা বই কি। গাজী মনেই তো তাই। যুদ্ধ আর ধর্ম-প্রচার একসঙ্গে যারা করে তারাই গাজী।

বর্মী হালকা ভাবে একটা মন্তব্য করিল, সেইজন্তেই শাদা জাতের সঙ্গে তাদের এতটা মেলে বোধ হয়।

কথাটা অনাবশ্যক ভাবে টানিয়া আনা—ডি-সুজা আবার গম্ভীর হইয়া গেল। আলো-আঁধারে মিশানো এই বিচিত্র কালো রাত্রির তলায় কেমন যেন মনে হইতেছে লোকটাকে। এই রাত্রিকে, এই মুহূর্তকে যেন বিশ্বাস করা চলে না। বাতাসের ছন্দটা অত্যন্ত লঘু, যেন অস্ফুট ভাষায় কী একটা কথা ক্রমাগত বলিয়া চলিয়াছে। চিত্র-বিচিত্র পাখা মেলিয়া বুনো হাঁসের মতো নদীর জল ভাঁটার মুখে সমুদ্রের নীড়ে চলিয়াছে বিশ্রামের সন্ধানে। দাঁড়ের মুখে জল ভাঙিয়া লবণ মিশানো ফস্ফরাস্ থাকিয়া থাকিয়া চিক্ চিক্ করিয়া উঠিতেছে। এমন একটি রাত্রে—এমন একটি মুহূর্তে কত কী যেন অঘটন ঘটিতে পারে। ডি-সুজা মাথার উপরে আকাশের দিকে তাকাইল—নিশি-

সমুদ্রে স্নান করিয়া অত্যন্ত উজ্জ্বল ভাবে তারাগুলি দপ্ দপ্ করিতেছে। অন্তত বারোটার কম হইবে না। রাত্রির প্রহরী কাল-পুরুষ যেন সজাগ সতর্ক চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে আকাশে-অরণ্যে জলে-স্থলে একাকার স্বপ্নাচ্ছন্ন পৃথিবীর দিকে।

বর্মী আবার একটা সিগারেট ধরাইল। কাজের লোক সে। এলোমেলো চিন্তা মনের মধ্যে একের পর এক আসিয়া ভিড় করিতেছে। কালই নৌকা ছাড়িয়া হয়তো বা যাত্রা করিতে হইবে আকিয়াবের পথে। এদিককার ব্যবস্থা দিনের পর দিন জটিল হইয়া উঠিতেছে—আর বেশিদিন এখানে কাজ চালাইলে সব মাটি হইয়া যাওয়া আশ্চর্য নয়। নুরুল গাজী অত্যন্ত হুঁশিয়ার ও স্বার্থপর—তাহাকে কোনোদিনই বিশ্বাস করা যায় নাই। ডি-সুজা কাজের লোক, কিন্তু বয়স হইয়াছে, অনেক দিক দিয়া সে পড়িয়াছে পিছাইয়া। এখন তাহাকে রাখাও যায় না, ছাড়াও যায় না। এ অবস্থায়—

এ অবস্থায় যা করা যাইতে পারে সে তাহা আগেই ভাবিয়া রাখিয়াছে। কাজটা নানাদিক দিয়া তেমন ভালো হয় তো দেখাইবে না, কিন্তু এ ছাড়া উপায় নাই আর। তা ছাড়া এই পর্তুগীজের দল। সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস্ই যাহাদের আদর্শ পুরুষ, নৃশংসতাই যাহাদের বীরকীর্তির চরম নিদর্শন, তাহাদের সঙ্গে এ ছাড়া আর কী করা যাইতে পারে? শুধু পর্তুগীজ কেন, যে কোন শ্বেত জাতিকেই যে সে সত্যি সত্যি দেখিতে পারে না, এ কথা তো আর অস্বীকার করা চলে না।

নৌকা চলিয়াছে। বৈশাখী নদী—চেহারায় কৃশতা আসিলেও টের পাইবার জো নাই এর রাত্রিতে। তবু যে রূপটা তাহার এই আলো অন্ধকারে অতি বিচিত্র ও অতি বিশাল বলিয়া বোধ হইতেছে সে রূপটা পুরাপুরি সত্য নয়। নদীর অনেকটা ভিতর দিয়াই নৌকা চলিতেছে। তবু যে তলায় খস্ খস্ শব্দ করিয়া বালি বাজিতেছে সেটা টের পাওয়া গেল। চর জাগিতেছে। দাঁড়ে বালি ঠেলিতে ঠেলিতে ডি-সুজা নৌকাটাকে একপাশে বেশি জলের মধ্যে নামাইয়া আনিল।

চর জাগিতেছে। ঠিক এবারে নয়—দু-এক বছরের মধ্যেই তাহার সম্পূর্ণ চেহারাটা জলরেখার উপরে বেশ খানিকটা ঠেলিয়া উঠিবে—এমনি একটা অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাত্রিতে দূর হইতে তাহাকে দেখাইবে একটা উবুড় করা অতিকায় জেলেডিঙ্গির মতো। তারপরেই আবার চলিবে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। নূতন উপনিবেশ—নূতন মানুষ। নব নব বর্বরতা—আদিমতার প্রায়ান্ধকারে সৃষ্টি-শতদলের প্রথম উন্মেষ সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, ঘাত-প্রতিঘাতের নানা তরঙ্গে উপনিবেশ সার্থক হইবে, সেদিন আবার আসিবে তাহাকে লইয়া কাহিনী রচনার অবকাশ।

বর্মী কথা কহিল। হঠাৎ কেমন করিয়া তাহার স্বর বদলাইয়া গেছে অনেকটা। ঠিক বদলাইয়া গেছে বলা চলে না—তাহার অনাসক্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বরে কিছুটা অনুভূতির ছোপ

ধরিয়াছে যেন। শব্দের যদি রঙ থাকিত, তাহা হইলে বলা যাইত কালো রঙ; অথবা চর ইস্‌মাইলের দিগন্তে বৈশাখের যে আসন্ন-প্রলয় মেঘচ্ছবি ফুটিয়া ওঠে তাহার রঙ। সে কহিল, পথ আর কতটা?

ডি-সুজা তখন তীরের দিকে পাড়ি ধরিয়াছে। দাঁড়ের টানে টানে ফস্‌ফরাস্ মিশানো জলে যেন লক্ষ লক্ষ জোনাকির অগ্নিবিন্দু জলিতেছে। নারিকেল বনের মাথায় চাঁদের মুখের উপর একরাশ মেঘ বেশ খানিকটা আবরণ বিছাইয়া দিয়াছে। তীরের জঙ্গলগুলি দেখিলে এখন হয়তো বা হঠাৎ মনে হইতে পারে সারি সারি ঝাঁকড়া মাথা লইয়া অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আছে কাহারা—আর অসংখ্য জোনাকি পিট পিট করিতেছে তাহাদের রাশি রাশি চোখের মতো: ঠিক সেই সব চোখের মতো—পাথরের মতো ছিদ্রহীন আর জমাট রাত্রিতে যাহারা বত্রিশ দাঁড়ের ছিপ লইয়া সমুদ্রে কালো মোহনায় শিকারের সন্ধান করিয়া বেড়ায়।

ডি-সুজার আবার ভয় করিতেছে। অথচ ভয়টা অর্থহীন—সম্পূর্ণই অর্থহীন। তবুও এই রাত্রি। এমন রাত্রিকে বিশ্বাস করা চলে না।

কিন্তু ভরসা এই, পথটা ফুরাইয়াছে এতক্ষণ।

ডি-সুজা বলিল, এসে পড়েছি প্রায়।

বর্মী চুপ করিয়া রহিল।

নৌকা খালের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। এই খালে লগি ঠেলিয়া আরো খানিকটা পথ। কচুরিপানা খালের বুক জুড়িয়া ঘন হইবার উপক্রম করিতেছে। এই নোনার দেশে আসিয়াও তাহাদের জীবনীশক্তিতে এতটুকু নোনা ধরে নাই—বংশ-বিস্তৃতি চলিতেছে অপ্রতিহত ভাবে। এমন একদিন হয়তো আসিবে যখন সমস্ত বঙ্গোপসাগর জুড়িয়া কচুরিপানার দুর্ভেদ্য আবরণ পড়িবে—আর হাজার হাজার মাইল জুড়িয়া বেগুনি ফুলগুলি হাওয়ায় হাওয়ায় মাথা দুলাইবে।

কচুরি বন ভাঙিয়া আগাইয়া চলিয়াছে নৌকা। খস্-খস্-খস। কেমন একটা শব্দ—কানের মধ্যে সির সির করিতে থাকে। হঠাৎ নৌকাটা কিসে আটকাইয়া গেল। তলা হইতে বিশ্রী দুর্গন্ধের একটা প্রবল উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। কোনো কিছুর একটা মড়া লাগিয়াছে নিশ্চয়ই।

টর্চের আলো ফেলিল বর্মী। মড়াই বটে। ফুলিয়া অস্বাভাবিক রকমের শাদা প্রকাণ্ড একটা ঢোলের মতো দেখাইতেছে। পেটের মাংস কাহারা খুবলাইয়া খুবলাইয়া খাইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কালো একরাশ নাড়ীভুঁড়ি দুইপাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এক মাথা চুল জলে ভাসিতেছে—তরুণী স্ত্রীলোকের দেহ। নারীঘটিত আসক্তি হইতে মুক্তি লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে চায় যাহারা—এই নগ্ন বিকৃত দেহটাকে একবার দেখিলেই তাহাদের

পক্ষে যথেষ্ট।

শিহরিয়া সে টর্চটা নিভাইয়া দিল। অন্ধকারের মধ্যে দুর্গন্ধটা যেন পুরু ক্যানভাসের পর্দার মতো জুড়িয়া আছে। জোরে জোরে লগি ঠেলিয়া ডি-সুজা জায়গাটা পার হইয়া গেল। একটু দূরের ঝোপের মধ্যে হঠাৎ আলো জ্বলিয়াই নিবিয়া গেল—আলেয়া! যে শেয়ালগুলি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া মড়া খাইতেছিল তাহারাই কি হাই তুলিতেছে? এ দেশের লোক হইলে নিশ্চয় মনে করিত পেত্নী। অথবা সেই তাহারা—যাহাদের মাথা নাই অথচ ঘাড়ের উপর দুইটা বড় বড় চোখ ভাঁটার মতো জ্বলিতেছে; অন্ধকারে পঞ্চাশগজী দুইটা হাত দুই দিকে প্রসারিত করিয়া জীবজন্তু হাতড়াইয়া বেড়ায়।

শেয়ালের কোলাহল শোনা গেল। মড়াটাকে লইয়া নিশ্চয়ই। ওই মড়াটা বর্মীর সমস্ত দ্বিধা-সংশয়কে যেন সমতল করিয়া দিয়াছে। গাজীকে বিশ্বাস করা আর নিরাপদ নয়। ডি-সুজার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে—তা ছাড়া লিসি! পর্তুগীজদের ঘৃণা করা যাইতে পারে, তাই বলিয়া তাহাদের মেয়েদেরও যে ঘৃণা করিতে হইবে তাহার কি মানে আছে। সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস্‌ও তো জেন্টুদের ঘৃণা করিত—কিন্তু তাহাদের সুন্দরী মেয়েদের উপর তাহার আসক্তিও কিছুমাত্র কম ছিল না।

গাছপালার ঘন অন্ধকার। কচুরিপানা ঠেলিয়া একঘেয়ে শির শির শব্দে চলিয়াছে নৌকাটা। অন্ধকারে কাহারো মুখ দেখা যায় না। চকিত পোকামাকড়ের দল উড়িয়া নৌকায় আসিয়া পড়িতেছে।

কাঠ-ফেলা বড় একটা ঘাটের গায়ে ডি-সুজা নৌকাটাকে ভিড়াইয়া দিল। কহিল, এসে পড়েছি।

নুরুল গাজী তাহাদের জন্য প্রতীক্ষাই করিতেছিলেন।

বাহিরের একটা ঘরে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া একটা দেশী চৌকোণা লণ্ঠন জ্বলিতেছে। অনুজ্জ্বল রক্তাভ আলো, ঘরময় পোড়া কেরোসিনের গন্ধ ভাসিতেছে। টিনের চালে সুপারির আড়া হইতে কালো কালো একরাশ ঝুল দুলিতেছে ঝালরের মতো। আর নিচে একখানা মাদুর পাতিয়া কী যেন পড়িতেছেন গাজী সাহেব—রীতিমতো সুর করিয়াই।

ডি সুজা এবং বর্মীটি ঘরে ঢুকিতেই গাজী সাহেব সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ফকিরের মতো চেহারা। শাদা দাড়ি বুক অবধি ঝুলিয়া পড়িয়াছে সুদীর্ঘ চামরের মতো। পাকা গোঁফ দাড়ির দুইটি সীমান্তরেখা তামাকের রঙে অনুরঞ্জিত। গলাতে কাচ এবং কড়িতে মিশানো দুই ছড়া মালা—থাকিয়া থাকিয়া খট্‌ খট্‌ শব্দে বাজিয়া ওঠে।

হাত দুটি সামনে বাড়াইয়া দিয়া গাজী সাহেব বলিলেন, এসো, এসো। তোমাদের জন্যই বসে ছিলাম।

দুজনে মাদুরে আসিয়া বসিল। গাজী সাহেব শশব্যস্তে তাহাদের দিকে গোটা দুই তাকিয়া আগাইয়া দিলেন। তারপর ডাকিলেন, আবদুল্লা!

মালকোঁচা করিয়া লুঙ্গি পরা একটা ছোকরা চাকর তন্দ্রাজড়িত চোখ লইয়া দেখা দিল।

—জী!

—তামাক।

এক কোণে একটা গড়গড়া হইতে কল্‌কেটা তুলিয়া লইয়া আবদুল্লা বাহির হইয়া গেল।

গাজী সাহেব হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাল কতটা?

—পাঁচ সের।

—পাঁচ সের? বড্ড কম। গাজী সাহেবের স্বরে নৈরাশ্য প্রকাশ পাইল।

বর্মী সামান্য একটু ভ্রূকুটি করিল, কী করা যাবে? বাজার বড় গরম। এমন যদি চলে তো এদিকের সব কাজ-কারবার তুলে দিতে হবে। পথে জলপুলিস দেখে এলাম।

—জলপুলিস? গাজী সাহেব একটু হাসিলেন। ভালো করিয়া তাকাইলে দেখা যায়, গাজী সাহেবের চোখ দুইটা ঠিক কালো নয়। কিছুটা নীল্‌চে, কিছু পিঙ্গল—যেন বিড়ালের চোখ। হাসির ছন্দে সেই নীলাভ-পিঙ্গল চোখ দুটি চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল একটু।

—জলপুলিসের ভয় কিছু নেই। ওরা হাতের লোক—খাইয়ে-দাইয়ে মোটা করে দিয়েছি। নেমকহারামী বোধ হয় করবে না। তবে—

ডি-সুজা বলিল, আবগারী?

গাজী সাহেব কহিলেন, তাই ভাবছি। এখানে সুলেমান বলে একটা লোক আছে, তার চাল-চলন সুবিধে বোধ হচ্ছে না। ও লোকটা বোধ হয় খোঁজখবর দেয়। ভালোমত একটা হদিস একবার পেলে হয়, তারপর ধরে ঠিক জবাই করে দেব।

এরা দুইজনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইল একবার। প্রায় একসঙ্গেই জোহানের কথা মনের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহাদের। জবাই। বর্মী নীচের ঠোঁটটাকে কামড়াইল শুধু।

আবদুল্লা ফুঁ দিতে দিতে কল্‌কেটা লইয়া আসিল, তারপর সেটাকে গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া একেবারে সভার মাঝখানে আনিয়া রাখিল। বর্মী গড়গড়াটা নিজের দিকে টানিয়া আনিয়া কাঠের নলটায় মৃদু মৃদু টান দিতে শুরু করিল। কী একটা ভাবনায় চোখ দুইটা মুখর হইয়া উঠিয়াছে তাহার।

আফিঙের বাণ্ডিলটা বারকয়েক নাড়াচাড়া করিয়া গাজী সাহেব সেটাকে তুলিয়া রে চলিয়া গেলেন, তারপর থানকয়েক নোট আনিয়া তাহাদের সামনে রাখিলেন।

বারকয়েক গণিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বর্মী সেগুলিকে ট্রাউজারের পকেটস্থ করিল।

গড়গড়াটা অধিকার করিয়া গাজী সাহেব বলিলেন, আমি ভাবছিলাম কিছু কোকেনের কথা। কলকাতা থেকে আমাদের যে লোক এসেছে সে বলছিল চালাতে পারবে।

বর্মী জিজ্ঞাসা করিল, সে লোক আছে এখানে?

—আছে। ডাকব তাকে? আবদুল্লা!

আবদুল্লা তন্দ্রাজড়িত চোখ লইয়া আবার দেখা দিল। মুখের ভাবে স্পষ্ট অপ্রসন্নতা। সারা রাত কি তাহাকে ঘুমাইতে দিবে না এরা?

—ইয়াসিন, ইয়াসিন কোথায় রে?

—গণিমিঞার বাড়িতে।

—গণিমিঞার! গাজী সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, বলিলেন, আর মোতালেব?

—সেও।

—বুঝেছি। গাজী সাহেব উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাও মৃদু হাসিল।

ডি সুজা প্রশ্ন করিল, কী হয়েছে?

—আর বলো কেন সাহেব! কোত্থেকে একটা জেলের মেয়ে নিয়ে এসেছে, তাকে নিয়ে রেখেছে গণিমিঞার বাড়িতে। তাই—কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া গাজী সাহেব আবার হাসিলেন।

আবদুল্লা লোভীর মতো ঠোঁট চাটিল। বলিল, খুব মৌজ হচ্ছে সেখানে। আমি মালিকের হুকুম পেলাম না, নইলে—সক্ষোভে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আবদুল্লা চুপ করিল, অত্যন্ত ক্ষুধার্ত মনে হইল তাহাকে।

গাজী সাহেব ধমক দিয়া উঠিলেন, হয়েছে, থাম্। সবগুলো এবার জেলে যাবি তোরা, আমাকে সুদ্ধ ডোবাবি। যা, এখন খানা-পিনার ব্যবস্থা কর্ গে। আর ইয়াসিন কিংবা মোতালেব ফিরলেই আমাকে খবর দিবি।

ডি-সুজা হাসিতেছিল, কিন্তু বর্মীর মুখের দিকে চোখ পড়িতেই তাহার হাসি গেল বন্ধ হইয়া। শুধু বিবর্ণ নয়—অদ্ভুতভাবে রেখাঙ্কিত আর অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার মুখশ্রী। একটা ভয়ের শিহরণ উঠিয়া আসিয়া তাহার পা হইতে শুরু করিয়া সমস্ত মাথা পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিল। নৌকায় আসিতে কালো জল আর দিগন্তপ্লাবী অন্ধকারের মধ্যে যে অর্থহীন ভীতির শিহরণ তাহাকে আন্দোলিত করিয়াছিল—সেই অনুভূতি আবার যেন ফিরিয়া আসিতেছে। ডি-সুজা অনুভব করিল তাহার বুকের লোমগুলি জামার তলায় ঘামে ভিজিয়া উঠিতেছে।

গল্প-গুজবের পর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইল। গাজী সাহেব আয়োজন মন্দ করেন

নাই। বনিয়াদী বড়লোক, লোককে কী করিয়া খাওয়াইতে হয় সেটা জানেন। ভালো পোলাও, মাংস, আস্ত মুরগীর রোস্ট। পায়েসের বন্দোবস্তও আছে।

সব শেষে আসিল বোতল। গাজী সাহেব নিষ্ঠাবান ব্যক্তি, মদ স্পর্শ করেন না। বর্মীটা বেশি খাইল না, অতএব বোতলটা শেষ করার ভার ডি-সুজার উপরেই পড়িল।

বয়স হইয়াছে—মদ খাওয়াটা ছাড়িয়াই দিয়াছে প্রায়। ডি-সুজা সামান্য আপত্তি তুলিল। গাজী সাহেব অনুযোগ করিয়া কহিলেন, ডি-সুজার পূর্বপুরুষেরা পিপার পর পিপা মদ টানিয়া পাচার করিয়া দিত আর সামান্য একটা বোতলের জন্য ডি-সুজা ভয় পাইতেছে!

পূর্বপুরুষ! যাদুমন্ত্রের কাজ করিল কথাটা, চন্ করিয়া মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল ডি-সুজার। দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ হইয়া গেল বোতলটা, তারপর ডি-সুজা টলিয়া পড়িল মেঝেতে—

নেশা ছুটিল পরের দিন—শেষ বেলায়।

আচ্ছন্ন চোখ দুটি কচ্‌লাইয়া লইয়া ভারি গলায় ডি-সুজা বর্মীর সন্ধান করিল।

গাজী সাহেব বলিলেন, চলে গেছে। ইয়াসিনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে যেতে সকালেই চলে গেল।

—চলে গেছে! আমাকে ফেলে! অকৃত্রিম বিস্ময়ে ডি-সুজা সোজা উঠিয়া বসিল।

—হাঁ, কী একটা জরুরী কাজ ছিল তার।

সন্দেহে ডি-সুজার মনটা মুহূর্তে ঘোলা হইয়া উঠিল। বর্মী চলিয়া গেল—তাহাকে একলা ফেলিয়াই!

লিসি বাড়িতেই আছে—আর—আর—

বিদ্যুৎ-চকিতের মতো ডি-সুজা কহিল, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে সাহেব। নৌকা আছে না?

—তা আছে। কিন্তু এখন তুমি কী করে যাবে? আকাশের অবস্থা দেখেছ?

আকাশের অবস্থা—হাঁ, সেটা দেখিবার মতোই বটে! শিকারী বাজের মতো আকাশের প্রান্তে প্রান্তে কালো মেঘ উড়িয়া আসিতেছে। ঋজু দীর্ঘ সুপারির বন প্রত্যাশায় নিস্তব্ধ। সামনে প্রকাণ্ড একটা নিমগাছের মাথায় অসংখ্য বক আসিয়া বসিতেছে রাশি রাশি, শাদা ফুলের মতো। চারিদিকে নিস্তব্ধ সমারোহ।

ঝড় আসিতেছে।

অতএব ঝড় না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। বাতাস, বৃষ্টি। সমস্ত মনটায় তোলপাড় চলিতে লাগিল। এমন ঝড় এ বৎসর আর হয় নাই। ঘর বাড়ি কিছু পড়িয়া গেল কিনা কে জানে। তা ছাড়া লিসি একলা আছে বাড়িতে। জোহান—বর্মী—বিশ্বাস

নাই কাহাকেও।

ঝড়ের পরে নৌকা লইয়া ডি-সুজা ফিরিল চর ইস্‌মাইলে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। চোখের সামনেই জ্বলিতেছে শুকতারা। বাড়ির সামনে দু-তিনটা সুপারি গাছ পড়িয়া—দরজাটা খোলা।

—লিসি!

কেহ সাড়া দিল না।

ডি-সুজা প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল, লিসি!

এবার সাড়া আসিল। তবে লিসি নয়। একটা পরিচিত তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকারে চারিদিক যেন চিরিয়া ফাটিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল। ডি-সুজা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, বাড়ির প্রাচীরের উপর বীরের মতো গলা ফুলাইয়া তাহার সেই বড় মোরগটা তীব্র কণ্ঠে প্রভাতী ঘোষণা করিতেছে। গ্রামের কেহ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—বোধ হয় সুযোগ পাইয়া সে যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে।

মোরগটা যথাস্থানেই ফিরিয়াছে, কিন্তু লিসি আর ফিরিল না। খবরটা সমস্ত চর ইস্‌মাইলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিল। জোহানকে খুন করিয়া বর্মীটা লিসিকে লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। ডি-সিল্‌ভা তিন দিন যাবৎ শয্যাগত। ভয়ানক ভয় পাইয়াছে লোকটা, আছাড় খাইয়া নিজের পা-ও ভাঙ্গিয়াছে।

৫

আর ওদিকে বলরাম ভিষকরত্ন আবার সামাজিক হইয়া উঠিতেছেন। কিছুদিন তিনি তো একেবারে অসূর্যম্পশ্য হইয়াছিলেন বলিলেই হয়। মুক্তো—মুক্তো—মুক্তো! তাহার শাড়ির খস্ খস্ শব্দ শুনিবার জন্য তিনি উৎকর্ণ হইয়া থাকিতেন, তাহার চুড়ির শব্দ তাঁহার কানে জল-তরঙ্গ বাজাইত। মুক্তোর পায়ের শব্দ শুনিয়া তাঁহার হাতের তালু হইতে ক্রমগোলায়মান বটিকা টুপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইত এবং অসাবধানে ছাগলাদ্য ঘৃতের পাত্রটা উল্টাইয়া স্রোত বহাইয়া দিত! আর রাত্রি! সেগুলি যেন বাস্তব নয়—স্বপ্ন আর অনুভূতির ঘনত্ব।

কিন্তু আকস্মিক ভাবে বলরাম আবার আদি ও অকৃত্রিম হইয়া উঠিলেন, বাহিরের জগৎটাকে আবার তিনি নিজের করিয়া লইলেন। নির্বিঘ্নে সুখ-শান্তি তিরোহিত হইয়া গেল রাধানাথের—দিনের মধ্যে তিরিশ বার করিয়া আবার তামাক যোগানো শুরু হইল। তাসের আসরে যথাযোগ্য উৎসাহ এবং উদ্দীপনা প্রকাশ পাইতে লাগিল বলরামের।

তাস খেলার সঙ্গীদের তিনি আবার জোটাইয়া লইয়াছেন। এবার আর হরিদাস সাহা নাই, তা তিনি নাই থাকিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার কথা মনে পড়িলেই শুধু বলরাম অস্বস্তি বোধ করেন। অলক্ষণে আর মুখফোঁড় হইলেও লোকটা তাঁহাকে ভালোবাসিত— হয়তো তিনিও তাহাকে সত্যই ভালোবাসিতেন। তা ছাড়া তাসের আসরে এমন জমাট গল্প বলিতে আর কেউ পারে না। কিন্তু কোথায় হরিদাস! ঝড়ের রাত্রে তেঁতুলিয়ার সেই তাণ্ডব—হরিদাসের এক মাল্লাই নৌকা কি সে ধাক্কা সামলাইতে পারিয়াছে!

তাসের আসরে বসিয়া বলরাম অন্যমনস্ক হইয়া যান, ভুল করিয়া বসেন। সঙ্গীর সক্ষোভ চিৎকারে চেতনা ফিরিয়া আসে।

—আহা-হা, তুরুপ করলেন না কবিরাজমশাই! পিঠটা শুধু শুধুই গেল!

নূতন পোস্টমাস্টারও বেশ মজলিস জমানো লোক। তা ছাড়া খাসমহল অফিসের যোগেশবাবুও আসেন, মোটের উপর আড্ডাটা মন্দ জমে না।

তাস বাঁটিতে বাঁটিতে যোগেশবাবু বলেন, বুড়ো ভি-সুজা বোধ হয় পাগল হয়ে গেছে।

কবিরাজ বলেন, তাই নাকি!

—হুঁ। সারাদিন চুপ করে বসে থাকে। কারো সঙ্গে কথা কয় না। রাত্রে চিৎকার করে কাঁদে। বড্ড শোক পেয়েছে লোকটা।

কবিরাজ বলেন, বদলোকের অম্‌নিই হয়! মগ-টগগুলোর স্বভাবই ওই রকম।

যোগেশবাবু হাসেন, শয়তানের বন্ধুত্ব যে! তা ছাড়া বিশ্বাস করার নিয়মই এই। যে তোমাকে বেশি বিশ্বাস করবে, তাকেই তুমি বেশি করে ঠকাবে, তত বেশি করে সর্বনাশ করবে তার! এ নইলে আর কলিকাল বলে কেন!

খচ্‌ করিয়া কথাটা তীরের মতো আসিয়া বলরামের পাঁজরে বিঁধিয়া যায়। মুক্তোও তাহাকে বিশ্বাস করিত, খুব বেশি করিয়াই বিশ্বাস করিত। বলরাম তাহার যথাযোগ্য প্রতিদানই দিয়াছেন বটে। করবীর গোটা খাইয়া মুক্তো এখন তাহার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চায় বুঝি।

বলরাম জোর করিয়া হাসেন। মৃদু মৃদু হাসেন—তারপর হো হো করিয়া অট্টহাসি। যোগেশবাবু খানিকটা বিস্ময় বোধ করেন। তাঁহার কথার মধ্যে হাসাইবার এতটা উপাদান যে আছে সে কথা তিনি জানিতেন না। তাঁহার চোখের দিকে চোখ পড়িতেই আকস্মিক ভাবে বলরাম থামিয়া যান—আরো বিস্ময়কর বলিয়া যোগেশবাবুর মনে হয় সেটাকে।

—কবিরাজমশাই এই সাত সকালেই কিছু মোদক খেয়েছেন বুঝি?

—মোদক! না তো—অকারণেই কবিরাজের চোখ মুখ রাঙা হইয়া উঠে।

তারপর সভা ভাঙিয়া যায়। সকলে বাহির হইয়া গেলে কবিরাজ একা বসিয়া থাকেন

চুপ করিয়া। ফরশীর আগুন আপনা হইতেই নিবিয়া আসে, হাওয়ায় হাওয়ায় ঘরময় ছাই উড়িয়া বেড়ায়। দেওয়ালে কাচভাঙা ঘড়িটা কাঠঠোকরার মতো রুক্ষভাবে ঠক্ ঠক্ করে! বাজনাটায় কেমন করিয়া টান লাগিয়াছে—নটার সময় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া যায়। কবিরাজের একবার মনে হয় উঠিয়া বাজনাটা ঠিক করিয়া দিবেন কিন্তু দেহে মনে কোথাও কোনো প্রেরণা আসিতে চায় না। চীনা ছবির অনাবৃতাঙ্গ মেয়েটির মোহিনী হাসির উপর মাকড়সারা নিঃশব্দে জাল বুনিয়া চলে।

ওদিকে অন্তঃপুরে খোলা জানালার সামনে মুক্তোও নীরবে বসিয়া থাকে। দূরে দেখা যায় নদী—একটা মরুভূমির মতো ধূ ধূ করে যেন। বাতাসে মুক্তোর রুক্ষ চুলগুলি মুখের উপর পড়িয়া কাঁপে। সমস্ত চেহারায় রুক্ষ পাণ্ডুরতা, কেবল চোখ দুটি কিসের স্পর্শে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেহের পরিবর্তন অতিশয় সুস্পষ্ট।

মুক্তো কী ভাবে কে জানে। বলরাম তাহার মনের কোনো সন্ধান পান না, তলও পান না আজকাল। মুক্তো যথাসাধ্য এড়াইয়া চলে তাঁহাকে। রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। আশ্চর্য এই যে, চরম যাহা কিছু তাহা ঘটিবার পরেই সে বলরামকে ভয় করিতে শুরু করিয়াছে।

আগে দরজা বন্ধ করিত না। কিন্তু দু'দিন আগে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেছে।

ঝড়ের পর হইতে বলরাম আলাদাই থাকেন। নিজের মধ্যে কেমন একটা অপরাধীর ভাব আসিয়াছে তাঁর, মুক্তোকে স্পর্শ করিতেই তিনি সংকোচ বোধ করেন। তা ছাড়া সেও যে তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতে পারিলেই খুশি থাকিবে, ইহাও বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হয় নাই।

কিন্তু মধ্যরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া বলরাম অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিলেন। সেই নিঃসঙ্গতা—মুক্তো চর ইস্‌মাইলে আসিবার পূর্বেকার সেই অনুভূতি। দেহ এবং মন একটা সুতীব্র বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। বলরাম বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। জানালার ওপারে চাঁদ উঠিয়াছে। বাতাসে চামেলির গন্ধ। নদীর হাওয়ায় শীত করিতেছে—অত্যন্ত খানিকটা দেহের উত্তাপ পাইবার জন্য যেন লালায়িত হইয়া উঠিলেন বলরাম। স্বপ্নচারণার মতো নিঃশব্দে দরজা ঠেলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। পাশের ঘরে মুক্তো অঘোরে ঘুমাইতেছে। দরজাটা ভেজানো, ধাক্কা দিতেই খুলিয়া গেল।

বিড়ালের মতো সতর্ক পা ফেলিয়া বলরাম আসিয়া দাঁড়াইলেন মুক্তোর পাশে। নিদ্রিত শান্ত মুখের উপর জ্যোৎস্নার পত্ররচনা। চোখের কোণে জল শুকাইয়া আছে—বাঁ গালের উপর উজ্জ্বল একটা সরল রেখা। নাকের সোনার ফুলটা করুণভাবে জ্বলিতেছে। পূর্ণায়মান দেহশ্রী অসম্বৃত বস্ত্রের অবকাশে উদ্‌ঘাটিত হইয়া আছে—যেন আত্মসমর্পণ করিতেছে নিজেকে। একটা অহেতুক করুণায় বলরামের মনটা ভরিয়া

ধীরে ধীরে নত হইয়া বলরাম মুক্তোকে স্পর্শ করিলেন।

ঘুমের মধ্যে ঠিক যেন সাপে কামড়াইয়াছে ঠিক এমনিভাবে চমকিয়া মুক্তো উঠিয়া বসিল। খোলা চুলগুলি তাহার ঘাড়ে বুকে ছড়াইয়া পড়িল, তাহার চোখের দৃষ্টি মনে হইল যেন পাগলের মতো। তারপর বলরাম কিছু ভাবিবার বা বলিবার আগেই মুক্তো তারস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল, যাও তুমি, যাও!

বলরাম হতচকিত হইয়া পিছাইয়া আসিলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন, মুক্তো!

মুক্তো কান্নায় প্রায় ভাঙিয়া পড়িল, না—না—যাও তুমি।

বলরামের স্বর করুণ হইয়া উঠিল, আহা-হা, কেন তুমি—

—তুমি যাও, নইলে আমি চেঁচিয়ে সব জাগিয়ে তুলব বলছি—উত্তেজনায় মুক্তো সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল একেবারে। তাহার সর্বাঙ্গ তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

বলরাম কয়েক মুহূর্ত নির্বোধের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে অপরাধীর মতো বাহির হইয়া গেলেন। মুক্তো দিনের পর দিন যেমন দুর্বোধ্য, তেমনি দুরধিগম্য হইয়া উঠিতেছে। জ্বরাতিসারের লক্ষণগুলিও এমন জটিল নয় বোধ হয়। নিদানেরও অতীত।

বলরাম বাহির হইয়া গেলে মুক্তো সজোরে দরজায় খিল আঁটিয়া দিল। বলরাম সম্পর্কে সম্প্রতি কেন যে এই অহেতুক ভয় তাহার মনে জাগিয়াছে সে তাহা নিজেও বুঝিতে পারে না।

প্রথম মনে হইয়াছিল সে আত্মহত্যা করিবে। রাত্রির সেই কুৎসিত মোহগ্রস্ত আত্মসমর্পণগুলি মাঝে মাঝে তাহাকে পীড়া দিত বটে, কিন্তু মোটের উপর সেগুলিকে সে সহজ করিয়াই লইয়াছিল একরকম। তারপর যখন সন্তান আসিয়া সাড়া দিল, তখন ঘৃণা এবং লজ্জায় মুক্তো আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল একেবারে। হইলই বা পাণ্ডববর্জিত দেশ, লোক-লজ্জা না হয় না থাকিল, কিন্তু মনকে সে বুঝাইবে কী বলিয়া এবং কী করিয়া?

অতএব সে আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিল। কিন্তু ভয় করে আত্মহত্যা করিতে। মনে পড়িয়া যায় গ্রামের বলাই পালকে, গলার নলীতে একটা ভোঁতা ক্ষুর বসাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। তবুও একবার সে শাড়িটাকে বেশ করিয়া দড়ির মতো পাকাইয়া চালের পাটাতনের উচ্চতাও হিসাব করিয়াছিল পর্যন্ত। কিন্তু ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত কৌতূহল তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

সন্তান আসিতেছে। তাহার দেহের অভ্যন্তরে ছোট একটি মাংসপিণ্ডের আকারে একটা নূতন বিস্ময় রূপ পাইতেছে। নিজের রক্ত দিয়া, আয়ু দিয়া মুক্তো পালন করিতেছে তাহাকে—গড়িয়া তুলিতেছে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তাহাকে পূর্ণ করিয়া। নিজের মধ্যে এই বিরাট শক্তি—এই বিশাল সৃষ্টি-ক্ষমতার কথা ভাবিয়া আজ আর মুক্তোর বিস্ময়ের

সীমা রহিল না। স্বামী-পরিত্যক্ত বিড়ম্বিত তাহার জীবন—গ্রামের মেয়ের পরম কাম্য এবং একান্ত লোভের বস্তু সন্তানকে পাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা সে ভুলেও করিতে পারে নাই। অন্যের শিশুকে লোভীর মতো বুকে টানিয়া লইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ব্যথাই বাড়িয়াছে শুধু, কিছুমাত্র কমে নাই। সেই সন্তান! সেই সন্তানের জননী হইতে চলিয়াছে সে! অকস্মাৎ নিজের জীবনের প্রতি মুক্তোর অত্যন্ত মমতা হইল। সে বাঁচিতে চায়, নিজের সৃষ্টিকে সে স্থায়ী করিয়া যাইতে চায় এই পৃথিবীর বুকে। কিন্তু পিতৃ-পরিচয়? না—অত কথা অত ভবিষ্যতের ভাবনা সে ভাবিতে চায় না। একমাত্র মাতৃত্বেই তাহার লোভ—দুর্বার এবং প্রচণ্ড।

বলরামকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া মুক্তো যখন জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে, হৃৎপিণ্ড দুইটায় আন্দোলন চলিতেছে প্রমত্তভাবে। এতক্ষণে—এতক্ষণে সে বুঝিয়াছে বলরামকে কেন সে এত ভয় করিতেছে। এই পিতৃত্ব বলরাম চায় না—এই পিতৃত্ব তাহার পক্ষে অভিশাপ। তাই বলরামের ভীরু দৃষ্টির মধ্যে মুক্তো দেখিয়াছে হত্যাকারীর চোখ—তাহার সন্তানকে হত্যা করিয়া কাপুরুষ দায়মুক্ত হইতে চায়। নির্বোধ সারল্যের নেপথ্যে ঝক্ ঝক্ করিতেছে তীক্ষ্ণাগ্র ছুরি ফলক।

তড়িৎগতিতে একটা তীব্র বেদনা পেটের মধ্য হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া ব্যথায় যেন সর্বাঙ্গ অবশ করিয়া দিল মুক্তোর। দেহের নিভৃত রহস্যলোক হইতে একটা জীবনসত্তা কিসের যেন ক্ষুব্ধ আক্রোশে থাকিয়া থাকিয়া তাহার পাঁজরে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে। ব্যথায় মুক্তোর সমস্ত শরীর আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, চোখ দুটি বুজিয়া আসিল। জানালার শিক ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে।

মণিমোহনের দিনগুলি কাটিতে লাগিল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিয়া। প্রজাদের ডাকাইয়া আনা, টাকার জন্য তাগিদ দেওয়া। অপরিচ্ছন্ন অমার্জিত নানা স্তরের লোকের ভিড়। অশ্রান্ত বকুনি শোনা এবং অবিশ্রামভাবে বকিয়া যাওয়া।

দেখা গেল—দেনাটা মজাঃফর মিঞারই সব চাইতে বেশি এবং সেই জন্য তোষামোদটাও তাহার দৈনন্দিন হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা গোপীনাথই অনুধাবন করিল সব চাইতে আগে এবং আর যাই হোক, মণিমোহনের নৌকায় মুরগীর অভাব রহিল না।

মজাঃফর মিঞা অনুতপ্ত বোধ করিতে লাগিল। শৃগালকে ভাঙা বেড়া দেখানোর সম্পর্কে প্রচলিত প্রবচনটি মনে পড়িল তাহার। এইভাবে প্রতিদিন মন যোগাইবার চেষ্টা না করিয়া কয়েকটা টাকা ফেলিয়া দিলেই তো চুকিয়া যাইত। কিন্তু যাহা হইবার

তাহা হইয়া গিয়াছে—এখন প্রায়শ্চিত্ত চলিবে।

গোপীনাথের তাহাতে তৃপ্তি নাই—তাহার উদরে ভুমা আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। বলে, রোজ রোজ আর মুরগী খেতে ভালো লাগে না মিঞা, খাসী-টাসী খাওয়াও একটা।

—খাসী! জাফরাণ রাঙানো দাড়ির মধ্যে মজাঃফর মিঞার বিপন্ন আঙুলগুলি শক্ত হইয়া আসে: তাই তো, খাসী!

গোপীনাথ অধৈর্য হইয়া উঠে, হাঁ-হাঁ, খাসী। বেশ তেল চুকচুকে। আমরা হিঁদুর ছেলে, আমাদের ওই কুঁকড়ো-মুকড়ো আর কতদিন সহ্য হয়! জুৎসই একটা খাসী পেলে বেশ প্রেমসে—গোপীনাথ জিভ দিয়া একটা অর্থপূর্ণ সলোভ শব্দ করে।

—তাই তো বাবু, খাসী কোথায় পাওয়া যাবে?

কোথা হইতে কাসেম খাঁর ব্যাটা আসিয়া ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া নেয় কথাটা। মজাঃফর মিঞাকে বিপন্ন করিবার জন্যই যেন সে সব সময়ে খাপ পাতিয়া আছে।

বলে, কেন চাচা, অমন ইয়া ইয়া তোমার খাসী, দশ-পনেরো সের গোস্ত হবে এক একটায়। তারই একটা দিয়ে দাও না বাবুদের।

গোপীনাথ সোৎসাহে বলে, বটে, বটে!

দুই চোখে আগুন জ্বলিয়া ওঠে মজাঃফর মিঞার। এই হতভাগা ছোকরাটাই তাহাকে ডুবাইবে। কবে সে তাহার ক্ষেতে মহিষ নামাইয়া জোর করিয়া ধান খাওয়াইয়াছে, তাহার শোক আজও ভুলিতে পারিল না। কোথায় থাকে কে জানে—ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া দেয় নির্ঘাৎ।

মজাঃফর করুণ কণ্ঠে বলে, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, বিশ্বাস করবেন না। ও চ্যাংড়া ভয়ানক মিথ্যেবাদী। দিনকে রাত করতে পারে ও।

ছোকরাও ছাড়িবার পাত্র নয়। সে সভাস্থ সকলকে তৎক্ষণাৎ সাক্ষী মানিয়া বসে। বলে, আমি মিথ্যে বলছি? তা হলে হুজুর নিজেই যাচাই করে নিন। এই ইয়াকুব রয়েছে, এই আনিসুদ্দীন আছে, ওই জাফর—সবাইকে জিজ্ঞেস করুন মজাঃফর চাচার তিনটে বড় বড় খাসী আছে কিনা।

এসব কথা আর আলোচনা করিয়া খুব বেশি করিয়া সাড়া তোলে না মণিমোহনের মনে। তাহার সমস্ত চেতনায় কেমন একটা আলোড়ন শুরু হইয়াছে। এই জল, এই আকাশ বাতাস—উপনিবেশের এই সব বিচিত্র মানুষের দল। ইহারা ক্রমেই মণিমোহনের ভাবনায় প্রেতচ্ছায়া ফেলিতেছে, যেন কী একটা অদ্ভুত জিনিস সঞ্চার করিতেছে তাহার রক্তে! বিদ্রোহী প্রমিথিয়ুস যেদিন আগুন আনিয়াছিল, সেদিন সে আগুনের ব্যবহার কাহারো জানা ছিল না—সে আগুন নিজেদের ঘরে লাগাইয়া দিয়া অন্ধ-উল্লাসে তাহারা উৎসব করিয়াছিল হয় তো। সেই মূঢ় আনন্দ আসিয়া যেন

তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চায়, নিজের শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুকে বিদ্রোহের আগুনে দগ্ধ করিয়া—

বোটে বসিয়া মণিমোহন দেখে জল বহিয়া চলিয়াছে। অবিশ্রান্ত—অতলস্পর্শ। পাল তুলিয়া মাঝে মাঝে নৌকা যায়। মহাজনী নৌকার দীর্ঘ মাস্তুলের আগায় কাক বসিয়া থাকে ধ্বজার মতো।

মণিমোহনের মাঝিরা আলাপ করিতে চায়। ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে, নৌকা কোথা থেকে আসছে ভাই ?

হয়তো জবাব আসে, লালমোহন।

—কোথায় যাবে ?

—ওপারে আমতলী হয়ে বগার বন্দরে।

বগা। নামটা অপরিচিত নয় একেবারেই। পটুয়াখালি মহকুমার স্বনামধন্য বন্দর আর গঞ্জ। এত বড় প্রকাণ্ড ধান আর চাউলের আড়ত বাংলা দেশের শস্যভাণ্ডার, এই জেলাতেও খুব বেশি নাই। লক্ষপতি। মহাজনেরা ওখানে ধান চাউলের পাহাড়ের উপর বসিয়া দেশের ক্ষুধার্ত অঞ্জলিতে মুষ্টিভিক্ষা বর্ষন করিতেছে—অবশ্য মূল্য বিনিময়ে। আর—সেই সঙ্গে ভাবিয়া বিস্ময় লাগে যে বরিশাল জেলায় দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। সরকার হইতে বীজধান কিনিবার ও আবাদ করিবার জন্য চাষীদের যে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, সে টাকা আদায় করিবার জন্যই তাহার এই অভিযান।

গোপীনাথ আসিয়া বলে, এবার তো খুব ভালো ধান হয়েছিল বাবু। তবু দেশের অবস্থা যে কে সেই।

ভালো ধান হইয়াছিল সত্য। মণিমোহন নিজের চোখেই তো দেখিয়াছে। এই কালুপাড়া—শুধু কালুপাড়া কেন—আশেপাশের যে কোনো চরের দিকে তাকাইলে লক্ষ্মীশ্রীতে চোখ ভরিয়া তুলিত একেবারে। বৃষ্টি হইয়াছে, নিয়মিত বর্ষার বানে নতুন পলি পড়িয়া ধানের ক্ষেত উর্বর হইয়াছে। আর ধানের শীষগুলি শাঁসে সমৃদ্ধ হইয়া বাতাসে দোল খাইতেছে। ধীরে ধীরে মেঘ-বরণ সেই ধানে সোনার আভা লাগিল। দুদিন পরেই কাস্তে পড়িবে—দেশ ও জাতির সমস্ত স্বপ্ন আর আশা উদ্‌গ্রীব চোখ মেলিয়া তাকাইয়া আছে এই ধানের দিকেই।

কিন্তু স্বপ্ন আর আশা। কতটুকু তাহার ফলিল, সার্থকতা লাভ করিল কী পরিমাণে। পৃথিবীর খনি হইতে যাহারা জীবনমূল্যে এই সোনা আহরণ করিল, তাহাদের বুভুক্ষু চোখের সামনে দিয়া তাহা চলিয়া গেল বগায়, সাহেবগঞ্জে, টর্কীতে আর ঝালকাঠির বন্দরে। মহাজনের গোলায় বস্তা ভরিয়া সেই ধান আশ্রয় পাইল। তারপর—তারপর ?

তারপর যাহা চিরকাল ঘটিয়া আসিতেছে। দুর্ভিক্ষ—ওটা তো লাগিয়াই আছে—

গাছে পাতা এবং মাঠে ঘাস থাকিতে কোনো দুশ্চিন্তা নাই সেজন্য। সরকার? সরকারের দোহাই দিলে শিয়াল কুকুরেও হাসিয়া উঠিবে।

কিন্তু এ সব ভাবিয়া মণিমোহনের বিশ্রী লাগে। কেন সে ভাবিতে চায় এত কথা? চাকরি করিতে আসিয়াছে, চাকরিই করিয়া যাইবে।

গোপীনাথ আসিয়া মাঝে মাঝে গল্প করিতে চায়। দেশের কথা, বৌয়ের কথা। মণিমোহনকে সে সমব্যথী বলিয়াই জানে।

বলে, এবার বিশে ফাল্গুন দোলযাত্রা।

মণিমোহন হাসিয়া বলে, তাই নাকি? কী করে জানলে?

—বাঃ জানব না? গোপীনাথ চোখ বড বড় করিয়া বলে, হিন্দুর ছেলে।

—কিন্তু জেনে কী লাভ?

—লাভ? তাই বটে। সব সময়ে সে কথা মনে থাকে না।—গোপীনাথ বিষণ্ণ আর গম্ভীর হইয়া যায়। যা দেশ! দোল-দুর্গোৎসব যাহা কিছু, কাহারো কোনো মূল্য নাই! চাকুরির দুর্ভাগা জীবন। খাতা খুলিয়া হিসাব লেখা, প্রজাদের সঙ্গে বকাবকি করা, টাকা পয়সা গুনিয়া লওয়া আর মাঝে মাঝে এক-আধটা মুরগীর ঠ্যাং চর্বণ। ইহাই আদি এবং ইহাই অন্ত।

—গত বছর দোলের সময়—বলিয়াই থামিয়া যায় গোপীনাথ। মনটা ব্যাকুল হইয়া ওঠে তাহার। এ-ও তো বাংলা দেশ—কিন্তু কি বাংলা দেশ? এ যেন আর এক পৃথিবী। এখানকার মানুষগুলি প্রক্ষিপ্ত। দোল ইহাদেরও আছে, কিন্তু মানুষের রক্তে। জমি লইয়া, ধান কাটা লইয়া।

গোপীনাথ বসিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ দেশের গল্প করে, বৌয়ের কথা বলে, নিজের পাঁচ বছরের ছেলেটার কথা ভাবিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর উঠিয়া যায় রান্না চাপাইতে। বজরার বাহিরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, ডায়েরীর লেখাগুলো ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া মিলাইয়া যায়, মণিমোহন আসিয়া দাঁড়ায় বজরার ছাদের উপর। নদী অসম্ভব শান্ত। যেন ঘুম-পাড়ানি গান গাহিয়া চলিয়াছে।

বর্মী মেয়েকে ক'দিন ধরিয়া আর দেখা যায় নাই। তার জন্য দোষ অবশ্য বর্মী মেয়ের নয়। সেদিনকার সেই ব্যাপারের পর মণিমোহন আর গ্রামের দিকে পা বাড়ায় নাই।

সমস্ত মনটা তাহার দিন কয়েক কেমন আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, অত্যন্ত অশুচি বোধ হইয়াছিল নিজেকে। কিন্তু ধীরে ধীরে আত্মস্থ হইয়া উঠিতেছে মণিমোহন। গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে বজরার জানালা দিয়া যখন হলদে চাঁদের আলো আসিয়া মুখে পড়ে, আর নদীর উপর দিয়া গাঙ-শালিকের চিৎকার তীক্ষ্ণ আর করুণ হইয়া ভাসিয়া যায়, তখন মণিমোহনের যাহাকে মনে পড়ে, আশ্চর্য এই যে রাণী সে নয়। অর্ধতন্দ্রায়

মধ্যে মণিমোহন যেন দেখিতে পায় কাহার দুটি নীল গভীর চোখ আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সাপের মতো বেণী-করা কাহার চুল তাহার চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। একটা স্বেদাক্ত দেহের দৃঢ় কোমল বন্ধন তাহার সর্বাঙ্গ নিবিড় করিয়া ঘিরিয়া আছে যেন—তাহার চুলের গন্ধ, তাহার মুখের মিষ্টি গন্ধ, তাহার ঘামের গন্ধ তাহাকে ক্লোরোফর্মের মতো অচেতন করিয়া ফেলিতেছে।

তন্দ্রা টুটিয়া যায়। বজরার মধ্যে লঘু অন্ধকার। গোপীনাথের নাক ডাকিতেছে। চুলের গন্ধ নয়—জল ও ভিজা মাটির সোঁদা গন্ধ ছড়াইয়া যাইতেছে বাতাসে। দূরে তেঁতুলিয়ার বুকে পাড়ি ধরিয়া কোনো মাঝি ভাটিয়ালির সুর তুলিয়াছে :

"রজনী আন্ধার ঘোর মেঘ আসে ধাইয়া,
পার কর নাইয়া—"

৬

গঞ্জালেস্ চাটগাঁয়ে ফিরিল বটে, কিন্তু কবির ভাষায়, গোটা মনটা লইয়া সে ফিরিতে পারিল না। আধখানা তাহাকে রাখিয়া আসিতে হইল চর ইস্‌মাইলে। গঞ্জালেস্‌কে শনিতে পাইল বলিলেই কথাটা ঠিক করিয়া বলা হয়।

এতদিন তো কাটিতেছিল বেশ। আর যাই হোক নারী-সম্পর্কিত অভাব বোধটা গঞ্জালেসের ছিল না। অর্থশুল্কেই দৈহিক দাবিটা মিটিতেছিল; দেহের নিতান্ত স্থূল দিক ছাড়া মেয়েদের আর কোনো প্রয়োজন আছে এ কথা গঞ্জালেসের কখনো মনে হয় নাই। অন্তত উত্তরাধিকার-সূত্রে আর কিছু না পাইলেও পৈতৃক এই মনোভাবটা সে আয়ত্ত করিয়াছিল। বিবাহ করিয়া তাহার দায় টানিয়া চলা—এটাকে নির্বোধের বিড়ম্বনা বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল এতকাল, কিন্তু অকস্মাৎ যেন গঞ্জালেসের ভ্রম ভাঙিল।

আর সেটাকে প্রথম আবিষ্কার করিল তাহার বন্ধু পেরিরা।

শহরের বাহিরে ছোট একটা বাড়ি করিয়া লইয়াছিল গঞ্জালেস্। নারিকেলের কুঞ্জে ঘেরা—নিরালা এবং নিভৃত। একটু দূরেই কর্ণফুলী। জাহাজ-ঘাটের কালো কালো ধোঁয়াগুলি এখান হইতে দেখা গেলেও মোটের উপর জায়গাটি নিরিবিলি এবং শান্তিপূর্ণ।

দুপুর-বেলায় পেরিরা আসিয়া দেখিল, বাহিরের ঘর খোলা, কিন্তু গঞ্জালেস্ নাই। পেরিরা ভিতরে ঢুকিল, কিন্তু গঞ্জালেস্ সেখানেও নাই। এই দুপুর-বেলায় ঘর-দুয়ার সব খোলা রাখিয়া লোকটা গেল কোথায় ?

এমনি সময় মুসলমান বাবুর্চিটির সঙ্গে দেখা হইল। পেরিরা তাহাকে প্রশ্ন করিল, সাহেব কোথায় ?

বাবুর্চি মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, বাগানে।

—বাগানে ? বাগানে কী করছে ?

বাবুর্চির মৃদু হাসিটা আর একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দাড়ির ফাঁকে শাদা দাঁতগুলি ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল তাহার। বলিল, গাছে চড়ছে।

—গাছে চড়ছে ! সে কী !

—যান—দেখুন না।—বাবুর্চি প্রস্থান করিল।

গাছে চড়িতেছে এই ভর দুপুর-বেলায় ! লোকটার কি মাথা খারাপ হইয়াছে নাকি ! না অতিরিক্ত খানিকটা ব্র্যাণ্ডি গিলিয়া যা খুশি তাই করিতে শুরু করিয়াছে ! পেরিরা ছুটিয়াই বাগানে গেল।

কোথাও কেহ নাই। পেরিরা চিৎকার করিয়া ডাকিল, স্যামুয়েল !

অন্তরীক্ষ হইতে সাড়া আসিল, এই যে !

—অ্যাঁ, তাই তো ! পেরিরা নিজের চোখ দুইটাকে বিশ্বাস করিতে পারিল না—বাবুর্চি তাহা হইলে বানাইয়া বলে নাই এক বিন্দুও ! নারিকেল গাছের মাথায় বসিয়া আছে গঞ্জালেস্। মুখের ভাব অত্যন্ত গর্বিত এবং প্রসন্ন—যেন কেহ তাহাকে দিল্লীর তখ্‌ত-তাউসে বসাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া পেরিরার শূলে চড়ানোর মতোই বোধ হইল।

—আরে পাগল নাকি ! এই দুপুরবেলা নারকেল গাছে ? নামো, নামো।

স্যামুয়েল সামান্য অপ্রতিভ বোধ করিল। বহু কষ্টে টানা-হেঁচড়া করিয়া মাটিতে পদার্পণ করিল সে। অনভ্যাসের ফলে শার্টটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে অনেকখানি। ছাল ছড়িয়া তিন-চার জায়গা হইতে রক্ত পড়িতেছে। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, মুখে পরিতৃপ্ত প্রসন্নতার হাসিটি আঠার মতো লাগিয়া আছে।

পেরিরা হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল, ব্যাপার কী তোমার ? হঠাৎ এই ভাবে গাছে চড়তে শুরু করেছ, গাঁজা খাচ্ছ নাকি আজকাল ?

—না, গাঁজা খাচ্ছি না। স্যামুয়েলের কণ্ঠস্বর অপ্রসন্ন শুনাইল, অভ্যাস করছি।

—অভ্যাস করছ ! এত অভ্যাস থাকতে গাছে চড়া ?

—ওসব তুমি বুঝবে না—পেরিরার কাঁধে একটা থাবড়া দিয়া গঞ্জালেস্ তাহাকে বাড়ির মধ্যে লইয়া আসিল : কী বলে, একটু ব্যায়াম করে নিলাম আর কি। গাছে চড়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভালো জিনিস।

—কিন্তু এই দুপুরবেলা ?

—এসো এসো, চা খাওয়া যাক এক পেয়ালা।

নারিকেল গাছে ওঠা লইয়াই ব্যাপারটা আরম্ভ হইল, কিন্তু শেষ হইল না। দিনের পর দিন গঞ্জালেসের পরিবর্তন শুরু হইল। বাহির আর নয়—এবার ঘর। লিসির তামাটে আরাকানী মুখখানা যখন-তখন আসিয়া স্বপ্ন-সঞ্চার করিয়া যায়। কাজকর্মে আলস্য আসিয়াছে। জাহাজের খোল বোঝাই করিয়া শুটকি মাছ তুলিয়া দিতে গিয়া গঞ্জালেস্ লিসির কথা ভাবিতে শুরু করে, বস্তা গণিতে ভুল হইয়া যায়। পেরিরা আসিয়া সন্ধ্যার আড্ডায় যাওয়ার জন্য টানাটানি করে কিন্তু তাহাকে নড়াইতে পারে না।

বলে, কী ব্যাপার ? যাবে না ?

গঞ্জালেস্ সংক্ষেপে বলে, উঁহু !

—কেন ? রাতারাতি সুবুদ্ধি চাড়া দিল নাকি ? সেন্ট জন হওয়ার মতলবে আছ ? জেরুজালেম রওনা হচ্ছ নাকি ?

পরিহাসে বর্মচর্ম ভেদ হয় না। ততোধিক সংক্ষেপে গঞ্জালেস্ জবাব দেয়—হুঁ।

পেরিরা নিরাশ হইয়া যায়। কী যেন হইয়াছে লোকটার। আধিব্যাধি কিছু নয় তো ? কিন্তু ভাব দেখিয়া তা তো মনে হয় না। খাওয়ার সময় বরং ডবল পরিমাণে গিলিতে শুরু করিয়াছে আজকাল। তবে কি মাথা খারাপ হইয়া গেল ? ভাবিয়া অত্যন্ত মনঃকষ্ট বোধ করে পেরিরা।

নাঃ, আর দেরি করা ঠিক নয়। গঞ্জালেস্ অধীর হইয়া উঠিল, যেমন করিয়া হোক লিসিকে আনিতেই হইবে। কাজকর্ম সব গোল্লায় যাইতেছে—লোকজন যাহারা কাজ করে তাহারা চুরি-চামারি করিতেছে আপ্রাণ। সর্বোপরি তাহাকে পাগল ভাবিয়া পেরিরা যে সব কাণ্ড করিতে শুরু করিয়াছে, তাহাতে গঞ্জালেসের মাথায় খুন চাপিয়া যায় একরকম।

কথা নাই বার্তা নাই, পেরিরা আসিয়া গঞ্জালেস্‌কে টানিয়া বাহির করিল। বলিল, আজ রবিবার, চলো গীর্জায় যাই।

—গীর্জা ? এবার হাঁ করিবার পালা গঞ্জালেসের। পেরিরা গীর্জায় যাইতে চায়—ইহাও এ জন্মে তাহাকে দেখিতে হইল ! গঞ্জালেস্ বলিল, গীর্জায় !

—হাঁ, হাঁ, গীর্জায়। চল না।

খানিকটা বিস্ময় এবং কিছুটা কৌতুক বোধ করিয়া গঞ্জালেস্ গীর্জায় আসিল। প্রার্থনা ইত্যাদির ব্যাপার শেষ হইলে ফাদার আসিয়া গঞ্জালেস্ ও পেরিরাকে পাশের একটা ছোট ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

গঞ্জালেসের সবই কেমন রহস্যময় বোধ হইতেছিল। রহস্যটা আরো বেশি প্রগাঢ়

হইয়া আসিল তখনই—যখন পাদ্রী সাহেব খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। তারপর বিড়বিড় করিয়া কী খানিকটা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, শয়তান, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও। মুক্তি দাও এর আত্মাকে।

গঞ্জালেস্ বোবার মতো চাহিয়াই রহিল। পাদ্রী সাহেব আবার কহিলেন, শয়তান, পৃথিবীতে অনেক পাপীর আত্মা আছে, যাদের তুমি ইচ্ছে করলেই নরকে টেনে নিয়ে যেতে পারো। কিন্তু এর পবিত্র আত্মা ভগবানের দাসত্বে নিয়োজিত, একে তুমি হরণ করতে পারো না।

মুহূর্তে গঞ্জালেসের অধিগম্য হইল ব্যাপারটা। পেরিরার দিকে তাকাইল, দেখিল সে মিটিমিটি হাসিতেছে। গঞ্জালেসের মেজাজ সঙ্গে সঙ্গে বেঠিক হইয়া গেল। তাহাকে বেকুব বানাইয়া তাহার খরচায় খানিকটা হাসিয়া লইবার চেষ্টা। অশ্রাব্য ভাষায় সে পাদ্রী সাহেব এবং পেরিরাকে একটা গালি বর্ষণ করিয়া বেগে বাহির হইয়া গেল। পাদ্রী সাহেব চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া সখেদে কহিলেন, হায়, শয়তান এর আত্মাকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে।

শয়তান আত্মাকে থাক্ বা না থাক্, গঞ্জালেস্ বাহির হইয়া আসিয়া আর বিলম্ব করিল না। নৌকা সাজাইয়া লইয়া সে চর ইস্‌মাইলের পথে পাড়ি জমাইল। এবারে লিসিকে লইয়া তবেই সে ফিরিবে।

সন্দীপ হইয়া আসিলে অনেকটা ঘুরিতে হয়, কাজেই সোজাসুজি পাড়ি ধরিল সে।

হাতিয়ার মোহনায় নদী আর সমুদ্রে যেখানে একাকার হইয়া গিয়াছে—সেখান দিয়া নীল জলের উপর নৌকা চালাইয়া সে আসিল সাহাবাজপুরের নদীতে। এম্‌নি সময় ঝড় উঠিল রুদ্র-মূর্তি লইয়া। ভোলার দ্বীপের এক প্রান্তে আশ্রয় লইয়া গঞ্জালেসের নৌকা সে ঝড় হইতে আত্মরক্ষা করিল—তারপর ভোলার কূলে কূলে নৌকা বাহিয়া তেঁতুলিয়া পার হইয়া সে চর ইস্‌মাইলে আসিয়া দেখা দিল।

সকালের আলোয় স্নান করিতেছে চর ইস্‌মাইল। কোথাও এতটুকু কোনো পরিবর্তন নাই। চৈত্রের স্পর্শে জলের নীল রঙ একটু একটু শাদা হইয়া উঠিতেছে, উপরের কোনো কোনো নদীতে ঢল্ নামিতেছে বোধ হয়। পর্তুগীজদের ভাঙা-গীর্জার ওখানে ঝির্‌ঝির্ করিয়া তেমনই মাটি ভাঙিতেছে।

নৌকা হইতে নামিয়া কয়েক পা হাঁটিতেই ডি-সিল্‌ভার সঙ্গে দেখা হইল তাহার।

ডি-সিল্‌ভা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিতেছিল। এক হাতে লাঠি। এক পায়ে বেশ করিয়া ন্যাকড়া জড়ানো। সুডোল ভুঁড়িটা কয়দিনের মধ্যেই কেমন চুপসাইয়া ছোট হইয়া গেছে।

গঞ্জালেস্‌কে দেখিয়া ডি-সিল্‌ভা থামিল। তাহার চোখে মুখে এক ধরনের আত্ম-

প্রমাদ প্রকাশ পাইল। সে নিজে বুড়ো এবং ভুঁড়ো—এই কার্তিকটিকে জামাই করিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিল ডি-সুজা। সকলের আশায় ছাই দিয়া লিসিকে কে লইয়া গেছে।

বলিল, আরে, এই যে স্যামুয়েল সাহেব! কী মনে করে?

—বেড়াতে এলাম।

—বেড়াতে? বেশ, বেশ। কিন্তু একটা ভারী দুঃসংবাদ আছে যে।

—দুঃসংবাদ? গঞ্জালেস্ থমকিয়া থামিয়া দাঁড়াইল, কিসের দুঃসংবাদ?

—আর বলো কেন। লিসিকে বর্মীরা চুরি করে নিয়ে গেছে। আর তার শোকে বুড়ো ডি-সুজা পাগল। দিনরাত কাঁদছে আর—!

বলিয়াই আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, গঞ্জালেসের উপর আশাতীত ফল হইয়াছে। তাহার সমস্ত মুখ মুহূর্তে শাদা হইয়া গিয়াছে—পা দুইটা কাঁপিতেছে থর থর করিয়া, চোখের দৃষ্টি শূন্য আর অর্থহীন।

অত্যন্ত ভালো মানুষের মতো খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ডি-সিল্‌ভা চলিয়া গেল।

ডি-সুজা সংক্রান্ত খবরটা যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিল মুকুল গাজীর কানে।

ব্যাপারটা শুনিয়া গাজী সাহেব বিস্মিত হইলেন না। লিসিকে দেখিয়া তাঁহারই এক সময়ে কিছু চিত্তচাঞ্চল্য জাগিয়াছিল, কাজেই অন্যে যে তাহার উপর ছোঁ মারিয়াছে এটা এমন কিছু অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়! কিন্তু এই উপলক্ষে তাঁহাদের ব্যবসায়-গত ব্যাপারটা ফাঁস না হইয়া যায় সেটা ভালো করিয়া দেখিবার জন্য তিনি চর ইস্‌মাইলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ডি-সুজা চুপ করিয়া রোয়াকে বসিয়াছিল। এই কয়দিনেই অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়াছে তাহার চেহারায়। পাড়ার কে একটি মেয়ে আসিয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিয়া যায়, কিন্তু ওই পর্যন্তই। সমস্ত দিন সে নীরবে বাড়ির রোয়াকে বসিয়া থাকে, কাহারো সঙ্গে কথা বলে না। তারপর রাত্রি যখন আসে—রাত্রি আসে নয়—রাত্রি যখন গভীর হয়, সে অদ্ভুত অমানুষিক স্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদে। সে কান্না শুনিলে সারা গা ছম্ ছম্ করিয়া ওঠে।

গাজী সাহেব ডাকিলেন, বুড়া সাহেব!

এই নামেই ডি-সুজা পরিচিত। কিন্তু বুড়া সাহেব জবাব দিল না।

গাজী সাহেব আবার কহিলেন, বুড়া সাহেব!

ডি-সুজা কট্‌মট করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। তাহার চোখ দেখিয়া গাজী সাহেব শিহরিয়া পিছাইয়া আসিলেন। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন চোখে আসিয়া জমা হইয়াছে

তাহার। খুন করিবার আগে মানুষের চোখ এম্‌নি হইয়া ওঠে বোধ হয়।

—বিস্‌মিল্লা!

স্বগতোক্তি করিয়া গাজী সাহেব বাহির হইয়া আসিলেন। ডি-সুজার সম্পর্কে আর কোনো ভরসাই নাই। একেবারে গোল্লায় গিয়াছে—উন্মাদ পাগল।

রাস্তায় নামিয়া গাজী সাহেবের মনে হইল, একবার কবিরাজের সঙ্গে দেখা করিয়া গেলে নেহাৎ মন্দ হয় না ব্যাপারটা।

কবিরাজের সঙ্গে গাজী সাহেবের পরিচয় অনেকদিনের। মাঝে কিছুদিন উদরীতে পেটে জল হইয়া বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছেন। সেই সময় পটপটি খাওয়াইয়া কবিরাজ রোগমুক্ত করিয়াছিল তাঁহাকে। সেই জন্য কবিরাজের প্রতি গাজী সাহেব কৃতজ্ঞ হইয়া আছেন। গুটিগুটি পায়ে তিনি বলরাম ভিষক্‌রত্নের ডিস্পেন্‌সারীর দিকে অগ্রসর হইলেন।

বলরাম তখন কিছু পারিবারিক ব্যাপারে বিপন্ন ও বিব্রত হইয়াছিলেন।

মুক্তোকে লইয়া কী করা যায় এখন? আরো বিশেষ করিয়া এই সন্তানের দায়িত্ব। অবাঞ্ছিত এই পিতৃত্বের বোঝা মাথায় করিয়া চলা কোনোমতেই সম্ভব নয়—লোকলজ্জার কথা না হয় না-ই ধরিলাম।

বলরামের চিন্তার মধ্যে অনেকগুলি কবিরাজী ওষুধ ও শিকড়-বাকড় আসিয়া ঝিলিক দিয়া গেল। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন মুক্তো বসিয়া অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছে।

বলরাম কহিলেন, ও কী করছ তুমি?

মুক্তোর চোখে ভয়ের ছায়া পড়িল। বলিল, কাঁথা।

—কেন?

মুক্তো জবাবই দিল না।

বলরাম বিছানাটার একপাশে বসিলেন। বলিলেন, ছাখো অনেক ভেবে দেখলাম ওটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে। নইলে তোমারও কলঙ্ক—আমারও একটা বিশ্রী—সপ্রতিভ ভাবে বলরাম একটু হাসিবার চেষ্টা করিলেন।

মুক্তো ভয়ার্ত চোখ মেলিয়া কয়েক সেকেণ্ড তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার হাত হইতে সেলাইটা খসিয়া পড়িল। তারপর সেদিনকার সেই রাত্রির মতোই সে চিৎকার করিয়া উঠিল, না—না!

—না, না? বলরাম হতবাক হইয়া গেলেন: কেন, এতে তোমার আপত্তির কী থাকতে পারে? এ ছাড়া তো উপায় নেই আর। আমার কাছে ভালো ওষুধ আছে, যদি বলো তো আজকেই চেষ্টা করে দেখি। তোমার কোনো—

—না, কিছুতেই নয়। মুক্তো উঠিয়া দাঁড়াইল—যেন বলরামকে স্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতেছে। বলরাম খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তারপর টাক চুলকাইতে চুলকাইতে পুনর্মূষিক হইয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন।

মুক্তো—নাঃ, মুক্তো দুঃসাধ্য। এমন জানিলে দুদিনের সখের জন্য বলরাম এমন একটা কাণ্ড করিতেন নাকি! বেশ ছিলেন—কিন্তু এখন সামলাও ঠ্যালা! সুখে থাকিতে ভূতে কিলানো আর কাহাকে বলে!

রাধানাথ আসিয়া একখানা চিঠি দিল।

চিঠি? চিঠি আসিল কোথা হইতে? বলরাম চিঠিখানা তুলিয়া লইলেন। হাতের লেখাটা চেনা চেনা ঠেকিতেছে—হাঁ, হরিদাসের চিঠিই তো।

হরিদাস লিখিয়াছেন:

ভায়া হে, জানিয়া নিরাশ হইবে যে আমি মরি নাই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এখনও বাহাল তবিয়তেই বাঁচিয়া আছি, এক হাঁপানির টান ছাড়া আর বিশেষ কোনো অসুবিধা হইতেছে না।

পথে নদী কিঞ্চিৎ ভারতীয় নৃত্য দেখাইয়াছে। ডুবাইয়া মারিবার মতলব করিয়াছিল, কিন্তু পারিয়া ওঠে নাই। আমার গৃহিণী বহু শিবপূজার ফলে আমার মতো ভৃঙ্গীকে পতিরূপে লাভ করিয়াছেন, এত সহজেই তাঁহার বৈধব্য ঘটিবে কেন? তাই আর একবার শুকনা মাটিতে পা দিয়াছি।

ভাবিতেছ, আমি গৃহিণীর মুখ-চন্দ্রমা দর্শন করিয়া মধুযামিনী যাপন করিতেছি? সেটা ভাবিয়া থাকিলে মহা ভ্রম করিয়াছ। আমি অন্ধকারের জীব—প্যাঁচাই বলিতে পারো, তাই অতটা চন্দ্র-ফন্দ্র আমার তেমন সহ্য হয় না। আমি এখন ঘরে নয়—পথে!

মণিপুর রোড দিয়া হাঁটিতেছি। দু পাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে অতীতের কঙ্কালগুলি ইট পাথরের রূপ লইয়া আমার দিকে তাকাইয়া আছে। বহু দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা হাতীর পাল দেখিতেছি—কাছে নয় এইটাই রক্ষা। বুনো ফুলের গন্ধে ভরিয়া আছে বাতাস। ওদিকে কুকীদের কী একটা উৎসব চলিতেছে যেন—বাজনার আওয়াজ কানে আসিতেছে।

পথ চলিয়াছি। কোথায় যাইব জানি না। হয় তো মণিপুর হইয়া বর্মা, তার পরে চীন। তার পরে? তার পরে কোথায় গিয়া থামিব কে জানে? যদি চর ইস্‌মাইলে কখনো ফিরিতে পারি, তাহা হইলে রোমাঞ্চকর অনেকগুলি গল্প শুনাইয়া দিতে পারিব।

তোমার দিন আশা করি ভালোই কাটিতেছে। সেই মেয়েটির কী সংবাদ! ইতি—

হরিদাস

চিঠিটা পড়িয়া বলরামের মনটা কেমন উদাস আর আচ্ছন্ন হইয়া গেল। হরিদাস —বিধাতার অদ্ভুত সৃষ্টি এই যাযাবর-লোকটা। ঘর নাই, আত্মীয় স্বজন নাই—পৃথিবীকে একমাত্র চিনিয়াছে, আর পথকে। যে পথ দিয়া যায় সে পথ দিয়া আর কখনো ফেরে না, কিন্তু এমনই দাগ রাখিয়া যায় যে কাহারো সাধ্য নাই তাহাকে ভুলিতে পারে।

এই সময়—এই সময় যদি এখানে হরিদাস থাকিতেন! বলরামের মনে হইল, কেন কে জানে তাঁহার মনে হইল, এই সময় হরিদাস এখানে থাকিলে তাঁহার সমস্ত সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত। বলরাম হরিদাসকে সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করিতেন।

—কবিরাজ আছো হে?

বলরামের চমক ভাঙিল। চাহিয়া দেখিলেন, এক মুখ শাদা দাড়ি লইয়া প্রসন্ন মূর্তি নুরুল গাজী দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

—আরে গাজী সাহেব যে! আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন—বলরাম সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন: আজ আমার কী সৌভাগ্য যে এখানে গাজী সাহেবের পায়ের ধুলো পড়ল।

গাজী সাহেব সহাস্যে বলিলেন, দেখা করতে এলাম।

ঘরে ঢুকিয়া তিনি ফরাসের উপর বসিতেই বলরাম ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, রাধানাথ, ওরে রাধানাথ! গাজী সাহেবকে তামাক দে।

তামাক আসিল। গাজী সাহেব ফরশীতে টান দিয়া বলিলেন, তোমাদের বুড়ো সাহেব তা হলে পাগল হয়ে গেল?

বলরাম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই তো দেখছি। তবে লোকটা নেহাৎ খারাপ ছিল না।

—না, না, বেশ লোক। গাজী সাহেব সমর্থন করিলেন, একটু রগচটা ছিল তাই যা। ওর নাত্‌নীটাকে বুঝি চুরি করে নিয়ে গেছে?

—সেই কথাই তো শুনেছি।

—হবে, যে পাজী ব্যাটারা। ওই জাতটাই বদ। যত ভালোই তুমি করো, ঘ্যাচাং করে দা চালিয়ে দেবে গলায়। আমার এলাকায় যত মগ ছিল, সবগুলোকে আমি ভিটেমাটি ছাড়া করে তাড়িয়ে দিয়েছি।

বলরাম কহিলেন, তাই উচিত।

গাজী সাহেব হঠাৎ গলাটা নামাইয়া আনিলেন। বলিলেন, আচ্ছা কবিরাজ, আমাকে একটা ওষুধ দিতে পারো?

—ওষুধ? কী ওষুধ?

গাজী সাহেব দ্বিধা করিলেন, কাশিলেন একটু। কহিলেন, এই যাতে—মানে—জীবনী-শক্তিটা একটু—মানে বাকিটা তিনি চাপা স্বরে বলরামের কানে কানে কহিলেন।

বলরাম হাসিলেন।

বলিলেন, সে তো তৈরি করতে সময় লাগবে। নানারকম জিনিস দিয়ে পাক করতে হবে কিনা। তা তিন-চারদিন বাদে আপনি লোক পাঠাবেন, তারই হাতে দিয়ে দেব না হয়।

গাজী সাহেব প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, খরচ যা লাগে—

বাতাসে বলরামের অন্দরের দরজাটা হইতে পর্দা সরিয়া গেল, আর সেই সঙ্গে গাজী সাহেব দেখিলেন মুক্তোকে। চোখের দৃষ্টিটা তাঁহার তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

—আচ্ছা কবিরাজ, তোমার বাড়িতে মেয়েদের দেখলাম না? এতদিন তো একাই থাকতে, তা—

গাজী সাহেবের চোখ বলরামের ভালো লাগিল না—বিশেষত মেয়েদের সম্বন্ধে সুখ্যাতি তাঁহার নাই। বলরাম দ্বিধা করিয়া কহিলেন, ও আমার এক দূর-সম্পর্কের—তিন কুলে কেউ নেই, তাই—

—ওঃ তাই।

আর একবার অন্দরের দিকে চোরা চাহনি ফেলিয়া গাজী সাহেব বলিলেন, আচ্ছা আসি তা হলে, আদাব।

—আচ্ছা।

গাজী সাহেব বাহির হইয়া গেলেন। ভারী জুতা আর গলার কড়ির মালার খট্‌খট্‌ শব্দ মিলাইয়া আসিল দূরে। আর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা হরিদাসের পোস্টকার্ডখানা বাতাসে বলরামের পায়ের কাছে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল শুধু।

চৈতালী

১

[মণিমোহনের ডায়েরী হইতে]

"থাকিয়া থাকিয়া মনে হয় প্রকৃতিটাই একমাত্র সত্য, আর মানুষ এর মাঝখানে প্রক্ষিপ্ত।

প্রক্ষিপ্ত নয় তো কী! তারায় ভরা আকাশ আর ছায়া-ভরা জল লইয়া এই যে পৃথিবী—এর মাঝখানে আমাদের দাবি কতটুকু! দয়া করিয়া যাহা দিতেছে, তাহাই লইতেছি—যাহা দিতেছে না, আপ্রাণ আকাঙ্ক্ষা করিলেও তাহা মিলিবে না। তবু যাহা দিবার তাহাই কি সহজে দেয়! ল্যাবরেটারীর অ্যাসিডের গন্ধ আর বুন্‌সেন বার্নারে অশ্রান্ত সাধনা, কারখানার ডায়নামো আর লোহা-লক্কড় লইয়া তিলে তিলে জীবন পণ করিয়া চলা! তারপরে কৃপণ বর্ষণ। তবুও মনে হয় সব পাইয়াছি।

কী পাইয়াছি। মাথার উপরে নীহারিকা আর নক্ষত্রের জগৎ—রহস্যের তল নাই, কূল নাই, কিনারা নাই। ওদের পংক্তিতে পৃথিবীর আসন কোথায়। শুধু কি ওখানেই? তিন ভাগ জলের মাঝখানে এক ভাগ মাটি জাগিয়া আছে—আর সেই মাটিতে আছে পাহাড়ের শৃঙ্গ—সাহারার মরুভূমি, সাইবেরিয়ার তুষার-প্রান্তর, আর আফ্রিকার কালো অরণ্য। কে কাকে জয় করিয়াছে!

আর মানুষ? মানুষের কয়জনই বা প্রকৃতিকে ছাড়াইতে পারিয়াছে? এক হইয়া আছে তাহারা, জড়াইয়া আছে পরস্পরকে, অবলীন হইয়া আছে পরস্পরের মধ্যে। আর সেইখানেই তো সত্যিকারের জীবনের রূপ। জীবনকে যদি প্রকৃতির দান বলা যায় তবে প্রকৃতি হইতে জীবনকে তো বিচ্ছিন্ন করা যায় না—তাহার নিয়মের সঙ্গে সঙ্গেই সে যে ঘুরিয়া চলিবে। তাই এই চর ইস্‌মাইলে, এই কালুপাড়ায়—তেঁতুলিয়ার মোহানায় এই সবটা জুড়িয়া মানুষ আর পৃথিবী এক হইয়া আছে।

মানুষ আর পৃথিবী এক হইয়া আছে। মানুষ পৃথিবীর বুদ্‌বুদ। তবু পৃথিবী লইয়া মানুষ আর মানুষ লইয়া পৃথিবী।

অথচ মানুষ প্রক্ষিপ্ত। শরীর-ধর্মের দিক হইতে নয়। যে মন তাহাকে দিক্ হইতে দিগন্তে, শূন্য হইতে শূন্যান্তরে নব নব অভিযানের পথে লইয়া চলিয়াছে, প্রক্ষেপ তাহার সেই মনে। দেহের মধ্যে মন আসিয়া দ্বন্দ্ব শুরু করিয়াছে। তাই যাত্রা চলিতেছে রকেটের গতিতে আকাশটাকে বিদীর্ণ করিয়া—সৌর জগৎ, নক্ষত্র জগৎ, লাখো কোটি কোটি নীহারিকাকে ছাড়াইয়া।

প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই তো বিঘ্ন। মূলকে ভুলিতে চায়—কিন্তু ভুলিয়া যাওয়া কি সহজ? ইচ্ছা আর দেহ প্রতি পদে পদে পরস্পরকে আঘাত করে—কল্পনা চলিয়া যায় সম্ভাবনার দিক্‌দিগন্ত পার হইয়া, আর দেহ ছড়াইয়া পড়িতে চায় পৃথিবীর সনাতন মৃত্তিকায়।

*　　*　　*　　*

তবু এই প্রক্ষিপ্ত মনোময় মানুষটা একসময় শরীর-ধর্মের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। তখন ল্যাবরেটারী থাকে না, বয়লারের আগুনের রক্তশিখা তখন মিথ্যা হইয়া যায়। নীহারিকা আর নক্ষত্র-জগতের স্বপ্ন মিলাইয়া যায় ভাব-বিলাসের মতো। তখন আর মানুষ পৃথিবীকে ছাড়াইতে চায় না—পৃথিবীতে লীন হইয়া যায়, জড়াইয়া ধরে তাহাকে কালো অরণ্য, ঝড়ের তুফান, বিদ্যুতে বজ্রজিহ্বা আর অমার্জিত আদিমতায়।

…নিজের কথা ভাবিতেছি।

বর্মী মেয়েটিকে আর দেখিতে পাই নাই। প্রথম প্রথম তাহাকে ভয় করিয়াছিলাম, তাহার চোখের দিকে তাকাইতে সাহস হয় নাই। তারপর সেই ঝড়ের রাত্রি। সে এক অনুভূতি। মনে হইয়াছিল আমার মৃত্যু হইয়াছে—আমার আত্মার, আমার পৌরুষের! একটা বিশ্রী বিস্বাদ, একটা কটু তিক্ততা সমস্ত চেতনাকে রাখিয়াছিল আচ্ছন্ন করিয়া।

কিন্তু কদিন হইতে মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। আশ্চর্য, আমি সেই বর্মী মেয়েটিকে ভাবিতেছি। তাহার নীল সাপের মতো চোখ, তাহার সেই বাঘের মতো দৈহিক ক্ষুধার্ততা। আমার অলস ভাবনার মধ্যে সে আসিয়া তাহার চিহ্ন আঁকিয়া যায়।

আমার প্রক্ষিপ্ত মন—সভ্যতার আলোকে মার্জিত মন—তাহার কি মৃত্যু হইতেছে? চারিদিকের পৃথিবী প্রতিদিন তাহার জারক-রসে আমাকে লইতেছে জীর্ণ করিয়া? আমি কি অনুভব করিতেছি আমার আদিম সত্তা ধূসর ধরিত্রীতে আমাকে আহ্বান করিতেছে?

সব চাইতে বিস্ময়কর বস্তু এই, আমি কি বর্মী মেয়েকে ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছি?”

*　　*　　*　　*

গঞ্জালেস্ অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কথাটা বিশ্বাস করা দূরে থাক, সে যে এখনো তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া গঞ্জালেসের চোখের সামনে খানিকটা হলদে রঙের ধোঁয়া যেন ঘুরপাক খাইতে লাগিল—আর সামনের জগৎটা গেল আচ্ছন্ন হইয়া। মাথা হইতে সমস্ত রক্ত গলিয়া আসিয়া যেন হৃৎপিণ্ডে জমা হইয়াছে, নিশ্বাস ফেলিতেও কষ্ট হইতেছে তার। দুই কানের মধ্যে একটানা একটা তীব্র ধ্বনি-তরঙ্গ—যেন এই দিবা-দ্বিপ্রহরেই প্রচণ্ড রবে ঝিঁঝিঁ ডাকিতে শুরু করিয়াছে।

তারপর আস্তে আস্তে চেতনা ফিরিয়া আসিল তাহার। ডি-সিল্‌ভার কথাগুলি মনের উপর ছুরির দাগের মতো কাটিয়া বসিয়াছিল—এইবার সেই ছুরির দাগ রক্তাক্ত হইয়া

আসিল। গঞ্জালেস্ ধীরে এবং দৃঢ়পদে ডি-সুজার বাড়ির মধ্যে আসিয়া পা দিল।

ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইল বৃদ্ধ ডি-সুজা। বকের পাখার মতো শাদা ভ্রূ-জোড়াকে কপালে তুলিয়া তীক্ষ্ণ চোখে তাকাইল গঞ্জালেসের মুখের দিকে। গঞ্জালেসের মনে হইল সে তাহার দিকেই তাকাইয়া আছে সত্য, কিন্তু সে দৃষ্টি তাহাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেছে বহুদূরে—যেন দুরবীনের কাচের মধ্যে দিয়া সে আকাশের কোনো একটা গ্রহ বা নক্ষত্রকে বৈজ্ঞানিকের মতো পর্যবেক্ষণ করিতেছে।

তারপর বলিল, কে?

তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া গঞ্জালেস্‌ও পিছাইয়া আসিল, কিন্তু গাজী সাহেবের মতো চলিয়া গেল না। জবাব দিল, আমি।

—তুমি? তুমি জোহান? শার্টের আস্তিন গুটাইয়া ডি-সুজা দু-এক পা আগাইতে লাগিল, কেন এসেছো এখানে?

—আমি জোহান নই, আমি গঞ্জালেস্।

—গঞ্জালেস্! মিথ্যে কথা। ডি-সুজা চিৎকার করিয়া উঠিল। তারপর অকস্মাৎ একটা প্রবল অট্টহাসিতে সে ফাটিয়া পড়িল: তুমি ধরা পড়েছ জোহান, ধরা পড়েছ। আমি ঠিক চিনে ফেলেছি তোমাকে।

—সত্যি বলছি আমি জোহান নই, আমি গঞ্জালেস্।

—সত্যি বলছ! হাঃ হাঃ হাঃ—জোহানও সত্যি বলছে আজকাল। এমন হাসির কথা কেউ কখনো শুনেছে নাকি?

এমন হাসির কথা যে বাস্তবিকই কেহ কখনো শোনে নাই, ডি-সুজার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া সেটা আর বুঝিতে বাকি রহিল না গঞ্জালেসের। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে অকারণে খানিকটা হা-হা করিয়া হাসিল, দন্তহীন মুখের হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধ থুথুর কণা ছিটকাইয়া গঞ্জালেসের চোখে মুখে পড়িতে লাগিল। তারপর কী ভাবিয়া মুহূর্তে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল।

—আচ্ছা জোহান, তোমার মাথাটা ওরা কেটে ফেলেছিল—জোড়া লাগালে কী করে?

গঞ্জালেস্ কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না। ডি-সুজা আগাইয়া আসিয়া তাহার গলায় হাত বুলাইতে লাগিল—কেটে ফেললে কি মাথা আবার জোড়া লাগানো যায়?

গঞ্জালেসের মুখের সামনে শোকাচ্ছন্ন উন্মাদ ডি-সুজার টকটকে লাল চোখজোড়া জ্বলিতে লাগিল, গরম নিশ্বাস আসিয়া আগুনের হল্‌কার মতো তাহাকে স্পর্শ করিতে লাগিল।

সেখান হইতে বাহির হইয়া লক্ষ্যহারার মতো চলিতে লাগিল গঞ্জালেস্। পোস্টাপিস

পার হইল, খাসমহাল কাছারী ছাড়াইল, তারপর গ্রামের হাট-খোলা পাশে রাখিয়া মুসলমানদের পাড়ার মধ্য দিয়া সে চরের পশ্চিম দিকে আগাইয়া চলিল।

সামনে বিল। বর্ষায় তেঁতুলিয়ার জল আসিয়া বিল আর নদীকে একত্র করিয়া দেয়, তারপর বর্ষার অবসানে ছোট বড় অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন জলখণ্ড লইয়া বিলের সৃষ্টি হয়। মাটির নিবিড় স্পর্শে নোনা জল মিঠা হইয়া উঠিয়াছে, শালুক ফোটা শেষ হইয়া গেলেও সমস্ত বিল জুড়িয়া হরিদ্রাভ শালুক পাতা আর গাঢ় সবুজ কলমী শাক লক্ লক্ করিতেছে। ওদিকে দীর্ঘ হোগলা বন, সেই হোগলা বনে এক ধরনের ফল দেখা দিয়াছে। দুটি ছোট ছেলে একখানা সুপারির লম্বা ডোঙায় চড়িয়া হোগলার সেই ফলগুলি সংগ্রহ করিতেছিল। এদিকে একজন লোক একটা টেটা লইয়া ঝুঁকিয়া জলের উপর দাঁড়াইয়া আছে—মাছ পাইলেই বিঁধিয়া ফেলিবে।

গঞ্জালেস্ একটা ঢিবির উপর আসিয়া বসিল। শাদা শাদা মেঘে সারা আকাশটা ছাইয়া আছে, আর সেই আকাশ একটা গম্বুজের মতো বাঁকিয়া দূরে নদীর মধ্যে নামিয়া গেছে। হঠাৎ দেখিলে মনে হইতে পারে, আকাশটা আর কিছু নয়—ওই নদীটাই ওখান দিয়া বাঁকিয়া উঠিয়া মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেছে, শাদা মেঘগুলি ঢেউয়ের মতো সূর্যের আলোয় জ্বলিয়া উঠিতেছে। বহু দূরে জলের মধ্যে একদল বুনো হাঁস নির্ভয় ও স্বচ্ছন্দ মনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে; বড় বড় পা ফেলিয়া ঝুঁটিওয়ালা বক বিচরণ করিতেছে দলপতির মতো। আর বকেরই বৃহত্তর সংস্করণ তিন-চারিটি বিরাটকায় কঙ্ক বা 'কাঁক' পাখি ফণা-ধরা সাপের মতো এই পক্ষী-তন্ত্রকে পাহারা দিতেছে। সুযোগ পাইলেই ছোঁ মারিয়া বিলের জল হইতে সংগ্রহ করিতেছে পারিশ্রমিক।

গঞ্জালেস্ বসিয়া রহিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার মনের মধ্যে একটা নিশ্চিত আকার পাইয়াছে এতক্ষণে। লিসিকে ধরিয়া লইয়া গেছে বর্মীরা, ডি-সুজা উন্মাদ পাগল এবং জোহানকে কাহারা মুণ্ড কাটিয়া নদীর ধারে ফেলিয়া গেছে। আর সেই সঙ্গে গঞ্জালেসের সমস্ত আশা আর কল্পনা সাবানের বুদ্বুদ হইয়া অসীম শূন্যতায় ফাটিয়া পড়িয়াছে।

বুকের হৃৎপিণ্ডে যে রক্তধারা আসিয়া পাথরের মতো জমিয়া গিয়াছিল, সে রক্ত ক্রমে তরলতর ও দ্রুততর হইয়া আসিল। তারপর সে রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল মস্তিষ্কের মধ্যে। পায়ের তলা হইতে একটা ঘাসের শীষ তুলিয়া সে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িতে লাগিল—অকস্মাৎ একটা ঘুমন্ত হিংসা আসিয়া তাহার আঙুলের ডগায় যেন আশ্রয় লইয়াছে।

ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল। তাহার চোখে পড়িল মৎস্যলোভী লোকটি টেটার বাঁকা ফলাগুলিতে প্রকাণ্ড একটা কুঁচে মাছকে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে। মৃত্যু-যন্ত্রণায় মাছট

সুরড়াইতেছে, ছটফট করিতেছে।

গঞ্জালেসের আঙুলে হিংসাটা যেন আরো প্রবল—আরো ভয়ংকর হইয়া উঠিতেছে। তাহার হাত দুইটা কিছু একটা করিতে চায়, যেন কোনো একটা বস্তুকে মোচড়াইয়া পিষিয়া ভাঙিয়া না ফেলিলে সে দুইটা আর তৃপ্তি পাইবে না। গঞ্জালেস্ নির্মমভাবে ঘাসের শীষ ছিঁড়িয়া চলিল। ঘাসের মধ্য হইতে একটা চিনে জোঁক মাথা তুলিতেছিল, গঞ্জালেস্ টানিয়া আনিল সেটাকে। তারপর দুই আঙুলে ধরিয়া সেটাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সেটাকে সহজে ছেঁড়া গেল না—রবারের মতো সেটা বড় হইয়া চলিল, তাহার পিচ্ছিল শিরা-সর্বস্ব দেহটা আঙুলের মধ্যে শির শির করিতে লাগিল। খানিকটা ক্লেদাক্ত নীলরসে গঞ্জালেসের আঙুল চটচট করিতে লাগিল আঠার মতো।

নখের সাহায্যে গঞ্জালেস্ জোঁকটাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিল। এতক্ষণে তাহার মনে হইল সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের উত্তর পুরুষ সে—ডেভিড তাহার পিতা। শক্তির পূজা করিয়াছে তাহারা—বাহুবলকেই একমাত্র পরম সার ও চরম তত্ত্ব বলিয়া জানিয়াছে। নারীর জন্য কখনো তাহারা আরাধনা করে নাই, ক্লান্ত তপস্যায় প্রতীক্ষা করে নাই, ইনাইয়া বিনাইয়া প্রেমের প্রলাপ বলিতেও তাহারা অভ্যস্ত নয়। তাহাদের কাছে নারীর মূল্য একান্ত দেহগত—ছিনাইয়া আনিলেই যথেষ্ট। প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে উচ্ছিষ্ট পাত্রের মতো দূরে ফেলিয়া দিতেও তাহারা কুণ্ঠা বোধ করে নাই কোনোদিন। ডেভিডের জীবনে কত নারী আসিয়াছে গিয়াছে—তাহার মতো লিসিকে হারাইয়া বুক চাপড়াইয়া কখনো কাঁদিতে হয় নাই তাহাকে।

কিন্তু গঞ্জালেস্! আজ হঠাৎ একটা তীব্র ধিক্কার আর অপমানবোধে বিষাক্ত হইয়া গেল তাহার মন। গঞ্জালেস্ নিজের অমর্যাদা করিয়াছে, বংশধারার অপমান করিয়াছে, চরম অসম্মান করিয়াছে দিগ্বিজয়ী হার্মাদ-বীর সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেসের। কেন সে ছিনাইয়া লয় নাই লিসিকে, কেন সে বাহুবলে তাহাকে আয়ত্ত এবং অঙ্কশায়িনী করে নাই? নিজের জাতিগত গৌরব এবং বিশেষত্বকে অবহেলা করিয়া সে দুর্বলের পথ ধরিয়াছিল, তাই তাহার এই পুরস্কার?

জুতা বাহিয়া আর একটা জোঁক উঠিতেছিল, গঞ্জালেস্ সেটাকে চাপিয়া ধরিল। কোন্ ফাঁকে সেটা গঞ্জালেসের খানিকটা রক্ত খাইয়াছিল কে জানে, সেটাকে ধরিতে কয়েক বিন্দু ঘন রক্ত জুতার উপর ছড়াইয়া পড়িল। আঙুল দুইটা ভরিয়া গেল সেই রক্তে। কয়েক মুহূর্ত সে সেই রক্তের দিকে তাকাইল—মানুষের রক্ত, সব চাইতে উগ্র নেশা!

শুঁটকি মাছের ব্যবসা, চট্টগ্রামের সেই নিরিবিলি নিবাস। কর্ণফুলির কল্লোলে

নারিকেল বীথির মর্মর মিশিতেছে। পেরিরা—মদের বোতল। অনুগৃহীতা সেই বাঙালী মেয়েটা।···মুহূর্তে মনে হইল সব কিছু ব্যর্থ আর অর্থহীন। তাহার সমস্ত চেতনাকে মুখরিত করিয়া সমুদ্রের গর্জন বাজিয়া উঠিল—যেমন করিয়া সাহাবাজপুরের নদীর মুখে ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ সমুদ্র সেদিন গর্জন করিয়া উঠিয়াছিল সেই রকম। সেই সমুদ্রের ঘোড়ায় সোয়ার হইয়া যাহারা পৃথিবী জয় করিয়াছে, মনের সামনে তাহাদের ছায়ামূর্তিগুলি আসিয়া দেখা দিল। কালো চামড়ার টুপিতে তাহাদের মাথা আর মুখটা ঢাকা—তাহাদের তামাটে কপাল চোঁয়াইয়া শ্রম-ক্লান্ত ঘামের বিন্দু বড় বড় গোঁফদাড়ির মধ্যে গড়াইয়া পড়িতেছে। শকুনের মতো চোখ মেলিয়া তাহারা নীল চক্রবালে চাহিয়া আছে—কোথাও শাদা পালের এতটুকু আমেজ পাওয়া যায় কিনা। তাহাদের হাতের মধ্যে বন্দুকের কঠিন নল ঘামে ভিজিতেছে, অবিশ্রান্ত লোহার সাহচর্যে তাহাদের হাতেও মরচে পড়িয়া গেছে যেন। ওদিকে 'টারেটের' উপর তাহাদের পিতলের কামান গলা বাড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে—মাথার উপর থর্ থর্ করিয়া তাহাদের জাহাজের পাল উড়িতেছে—বাঘের জিভের মতো টকটকে লাল, যেন ক্ষুধার্ত হইয়া সশব্দে লেহন করিতেছে বিরাট শৃঙ্খলী।

গঞ্জালেস্ উঠিয়া দাঁড়াইল। স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে তাহার মন। যেমন করিয়াই হোক, সে ইহার প্রতীকার করিবে, প্রতিষ্ঠা করিবে নিজের পৌরুষকে। যে ভুল তাহার একবার হইয়াছিল, সে ভুলের আর পুনরাবৃত্তি হইতে দিবে না কোনোক্রমেই। আরাকান—আরাকান সে আর কতদূরে। কাজের তাড়ায় সে বহুবার আরাকান হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছে। আর দূর! দূর হইলেই বা ক্ষতি কী। তাহার পূর্বপুরুষেরা সাত সমুদ্র তেরো নদী ডিঙাইয়া অবলীলাক্রমে দেশ-দেশান্তরে চলিয়া গেছে। আর সে এই সামান্য পথটুকু ডিঙাইতে পারিবে না! পৃথিবীর যেখানে থাক, লিসিকে সে খুঁজিয়া বাহির করিবেই।

প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিয়া আর্তনাদ, খানিকটা ঝুটাপুটির শব্দ। গঞ্জালেস্ চাহিয়া দেখিল আকাশ হইতে শিক্‌রে বাজ ছোঁ মারিয়া একটা হাঁসের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, মৃত্যু-কাতর হাঁসের আর্ত রব বিলের শান্ত আকাশকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে।

অসংযত অস্থির হাত দুইটাকে কঠিনভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া গঞ্জালেস্ ফিরিয়া চলিল।

জোহানের অপঘাত মৃত্যুর খবরটা তখন থানায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল। চৌকিদারের মুখে সংবাদ পাইয়া বিরক্ত দারোগা ব্যাপারটা ডায়েরী করিয়া লইলেন। তারপর গোটা-কয়েক পান আর এক থাবা জরদা মুখে পুরিয়া ক্ষুব্ধ অসন্তোষে কহিলেন, ব্যাটারা আর চাকরি করতে দেবে না। খুন আর জখম, খুন আর জখম। দুটি দিন যেন ঘরে বসে বিশ্রাম করব তার জো-টি নেই। ইংরেজ রাজত্ব কি একেবারে বান্‌চাল হয়ে গেল, না এরা নো-ম্যান্‌স ল্যাণ্ড পেয়েছে? তুই কী বলিস্ রে ব্যাটা?

শেষোক্ত প্রশ্নটি করিলেন তিনি চৌকিদারকে। চৌকিদার কী বলিবে ভাবিয়া পাইল না, দাড়ি চুলকাইয়া বোকার মতো হাসিল এবং শঙ্কিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে তাহার সজ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত কোনো অপরাধ বিদ্যমান আছে কিনা।

দারোগা আবার বলিলেন, জলপুলিস কোথায়?

চৌকিদার কহিল, আজ্ঞে, তাঁরা তো নেই ওদিকে।

—তা থাকবেন কেন! তাঁরা প্রাণের আনন্দে নৌকো-বিলাস করছেন—সুখের চাকরি তাঁদের। আর আমি সম্বচ্ছী দিন নেই রাত নেই—টো টো কোম্পানির ম্যানেজারী করে বেড়াচ্ছি। নৌকোয় ঘুরতে ঘুরতে সর্দি-কাশি-প্রুফ্ হয়ে গেলাম, জল-কাদায় স্রেফ্ ওয়াটার-প্রুফ্। আর ঘোড়া আর সাইকেল দাব্‌ড়ে হার্নিয়া হয়ে গেল। ছেড়েই দেব এই কচুপোড়ার চাকরি, দেশে গিয়ে জমিতে লাঙল ঠেললে এর চাইতে অনেক বেশি কাজ দেবে।

লাঙল ঠেলিলে অবশ্য ভালোই হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও চাকরির মায়াটা দারোগা কাটাইতে পারিলেন না। মুখে যত গর্জনই করুন, ধরা-চূড়া পরিয়া বাহির হইয়া পড়িতে হইল। খুনের মামলা, সংবাদ পাওয়া মাত্র ছুটিতে হইবে, এক মুহূর্ত বিলম্ব করিলে চলিবে না।

নৌকাতেও দেড় দিনের পথ। যাতায়াত তিন দিন। দুজন কন্‌স্টেবল লইয়া দারোগা যখন চর ইস্‌মাইলে আসিয়া দর্শন দিলেন, জোহানের কবন্ধ দেহটা পচিয়া তখন এমন উৎকট দুর্গন্ধ ছাড়িতেছে যে তাহার এক মাইলের মধ্যেও আগানো যায় না। অসংখ্য শাদা পোকা সর্বাঙ্গে কিলবিল করিতেছে, কালো রস গড়াইতেছে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। চৌকিদার পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিল বলিয়াই শেয়াল কুকুরে খাইতে পারে নাই। পচা চামড়ায় পোড়া তামার রং।

কিন্তু দারোগা এতটুকু দ্বিধা করিলেন না, একবারও নাসাকুঞ্চন করিলেন না। সেই দুর্গন্ধ বিকট বস্তুটাকে পা দিয়া বারকয়েক নাড়াচাড়া করিলেন, তারপর সেটাকে

নয়। একদল ধর্মোন্মত্ত ফকির এই ভারটি গ্রহণ করিলেন। বিধর্মীদের ইসলামের ছত্র-ছায়ায় আনিয়া তাহাদের কল্যাণ-সাধন, ইহাই ছিল ফকিরদের ব্রত। কিন্তু ফকিরেরা বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবদের মতো অহিংস ছিলেন না—তাঁহাদের কোরাণ আর তরবারি পাশাপাশি চলিত। বাহুবলে তাঁহারা অবিশ্বাসী কাফের জমিদারদের পরাভূত করিয়া ইসলামের দীক্ষা দিতেন। পূর্ববঙ্গে তাঁহাদের কীর্তি কলাপের সীমা-সংখ্যা নাই। নিম্ন বাংলার দুর্গমতম স্থলেও অভিযান করিয়া এই ফকিরেরা যেভাবে তাঁহাদের ব্রত পালন করিয়াছেন—একমাত্র আফ্রিকার অরণ্যবাসীদের মধ্যে খৃস্টানধর্ম প্রচারকারী মিশনারীদেরই সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। বাংলা দেশের মুসলমান সংখ্যাধিক্যের বিরাট কৃতিত্ব বহু পরিমাণে এই ফকিরেরাই দাবি করিতে পারেন।

এই অসিধারী ফকিরেরাই সে যুগে গাজী নামে পরিচিত ছিলেন। ইহারা কেহ কেহ নিজেদের অসীম শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতার বলে পীরত্ব বা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। নিম্ন বঙ্গে হিন্দু দেবতা ব্যাঘ্রাচার্য দক্ষিণ রায়ের সহিত সমানভাবেই মুসলমানের পীর কোনো এক বড় খাঁ গাজীকে পূজা করা হয়। প্রচলিত মঙ্গল কাব্য ও লৌকিক সাহিত্যে দক্ষিণ রায়, কালু রায়, বড় খাঁ গাজী এবং মহিলা বনবিবির কীর্তিকথা বর্ণিত হইয়াছে। সে-সব কাহিনীতে রূপকথার খাদ আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাতে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে বিস্মৃত যুগের এক অপূর্ণ অথচ অপূর্ব সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ইতিহাস।

নুরুল গাজী ইঁহাদেরই কাহারও বংশধর।

নুরুল গাজীর ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ যখন ধর্ম প্রচারার্থ এদেশে আসিলেন, তখন স্বরূপ রায় নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত জমিদার এদেশে কোথাও রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রচুর সৈন্যসামন্ত ছিল, বিচক্ষণ মন্ত্রী এবং সেনাপতি ছিলেন, অস্ত্র-শস্ত্র-হাতী ঘোড়া ছিল এবং সর্বোপরি স্বরূপ রায় দুর্দান্ত বীর ছিলেন। তাঁহার নামে নিম্নবঙ্গ তখন তটস্থ থাকিত।

নুরুল গাজীর পিতৃপুরুষ সিকন্দর গাজী প্রচুর সেনা লইয়া স্বরূপ রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিলেন ; কিন্তু স্বরূপ রায়ের দুর্ধর্ষ বাহিনীর কাছে সিকন্দর গাজীর সৈন্য দাঁড়াইতে পারিল না, স্রোতের মুখে কুটোর মতো ভাসিয়া গেল তাহারা। বার বার তিনবার। রক্তে নদী বহিল, শবদেহে পাহাড় জমিল, স্বরূপ রায় নিজে যুদ্ধে আহত হইলেন, তবুও তাঁহার শক্তিক্ষয় হইল না!

উপায়ান্তর না দেখিয়া গাজী তাঁহার অলৌকিক শক্তির আশ্রয় লইলেন। তিনি কী মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন কে জানে, আশেপাশের জঙ্গলে যেখানে যত বাঘ ছিল, তাঁহার মন্ত্রের আঘ্রাণে পিল্ পিল্ করিয়া সুবোধ বালকের মতো গাজীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের লইয়া তিনি এক অভিনব সৈন্যদল রচনা করিলেন এবং পুনরায়

বীরদর্পে রায়ের রাজ্য আক্রমণ করা হইল।

স্বরূপ রায়ের সৈন্যেরা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেই অভ্যস্ত, রণক্ষেত্রে বাঘের আবির্ভাব দেখিয়া তাহাদের আত্মাপুরুষ খাঁচাছাড়া হইয়া গেল। সুন্দরবনের ডোরা-কাটা হলুদবর্ণের সমস্ত কেঁদো বাঘ—ভাঁটার মতো চোখগুলি পাকাইয়া হুঙ্কার করিয়া অগ্রসর হইতেছে, এ দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের আর যুদ্ধ করিবার মতো মনের জোর অবশিষ্ট রহিল না। অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। স্বরূপ রায়ের সেনাপতি বিক্রম পাল নাকি বর্মচর্ম লইয়া বাঘ মারিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু তিন-চারিটি কেঁদো বাঘ একসঙ্গে পড়িয়া মুহূর্তে ঢাল-তরোয়াল সমেত তাঁহাকে রসগোল্লার মতো ফলার করিয়া ফেলিল।

অতএব একরকম বিনাযুদ্ধেই সমাপ্ত হইল বিজয়-পর্বটা। স্বরূপ রায় সপরিবারে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সিকন্দর গাজী স্বরূপ রায়ের একটি সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিয়া খুলনা জেলার নিম্নাঞ্চলে মুসলমান ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ধর্মান্তরিত বৌদ্ধের দল এবং গাজীদের তরবারি বাংলার শেষ হিন্দুশক্তিকেও লুপ্ত করিয়া দিল।

তাঁহারই উত্তর পুরুষ নুরুল গাজী কেমন করিয়া এখানে আসিয়া বাসা বাঁধিলেন, সে ইতিহাস স্বতন্ত্র। নূতন জাগা চরের ইজারা লইয়া তাঁহার পিতামহ প্রথম এদেশে আসেন। সেই হইতেই গাজী সাহেবেরা স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস এবং ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন।

দিগ্বিজয়ীর বংশধর বলিয়াই বোধ করি, গাজী সাহেবের সঙ্গে ডি-সুজার হৃদ্যতাটা এত জমাট হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর সে বন্ধুত্বটা আরো প্রগাঢ় হইল, যখন দুইজনেই একটি ব্যবসায়ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুত্ব ও বিশ্বাসের চরম অধ্যায়।

গাজী সাহেবের কাজ অবশ্য একটা নয়। চরে জমিদারীটা তাঁহার উপলক্ষ্য মাত্র। সুযোগ পাইলে লোক নামাইয়া তিনি এখনো নদীতে ডাকাতি করান। তা ছাড়া পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্যটাও একেবারে বিসর্জন দেন নাই তিনি। উপরের দিক হইতে কেহ নারীঘটিত ব্যাপার করিয়া পলাইয়া আসিলে গাজী সাহেব তাহাকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। তারপর রাতারাতি মেয়েটাকে ইস্‌লামে দীক্ষিত করেন—পুলিস সন্ধান না পাইলে ভালোই, পাইলেও সেটাকে ফাঁসাইয়া দিতে তিনি জানেন।

দিনকয়েক বাদে গাজী সাহেব আবার চর ইস্‌মাইলে আসিলেন। ডি-সুজার এখনও কোনো পরিবর্তন নাই, তাহার মাথা তেমনি অসংলগ্ন হইয়া আছে। দূর হইতেই একটা সহানুভূতির নিশ্বাস ফেলিয়া আজও তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। একবার কবিরাজের সঙ্গে দেখা তাঁহার করিতেই হইবে। সে ওষুধটা না হইলে কোনোমতেই চলিতেছে না। বয়স ষাট হইয়া গেছে, তবু গাজী সাহেব আরো অনেক বেশি

বাঁচিতে চান, সতেজ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া জীবনকে উপভোগ করিতে চান একান্ত ভাবে।

কবিরাজকে কিন্তু বাড়িতে পাওয়া গেল না। রাধানাথ বাহিরের রোয়াকে একটা মাদুর পাতিয়া নির্জন দুপুরে নিশ্চিন্ত নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল। তাহার হাঁ-করা মুখের একপাশ দিয়া লালা গড়াইয়া ওয়াড়হীন তেলচিটচিটে কালো বালিশটার উপর পড়িতেছিল ; আর তাহারি গন্ধে নিমন্ত্রিত একপাল মাছি ঢুকিয়া পড়িয়াছিল তাহার উন্মুক্ত মুখ-গহ্বরের মধ্যে—যেন অভিযাত্রীর কৌতূহল লইয়া রহস্যপুরীর তথ্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিতেছিল।

গাজী সাহেবের জুতা আর কড়ির মালার খট্‌খট্‌ শব্দে রাধানাথের তন্দ্রা ভাঙিল। কপাৎ করিয়া হাঁ-করা মুখটা সে বুজিয়া ফেলিল, আর সেই সঙ্গে আট-দশটা অনুসন্ধিৎসু মাছিকেও উদরসাৎ করিল সম্ভবত। এক হাত দিয়া মুখের দুর্গন্ধ লালাটা মুছিয়া লইয়া সে তন্দ্রাজড়িত রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়া চাহিল। তারপর সসম্ভ্রমে কহিল, গাজী সাহেব যে! আদাব আদাব।

গাজী সাহেব দাড়ি-গোঁফের ভিতর হইতে নীরবে একটু হাসিলেন। রাধানাথ জিজ্ঞাসার আগেই সংবাদটা জানাইয়া দিল, বাবু নেই তো বাড়িতে।

—কোথায় গেছেন?

—ওপারে, রুগী দেখতে। সন্ধ্যার পরে ফিরবেন।

—আমি তা হলে চললুম—গাজী সাহেব যাইবার জন্য পা বাড়াইলেন। বলরামের ভৃত্য, অতএব স্বাভাবিকভাবে মনিবের মতো কতকগুলি গুণও আয়ত্ত করিয়াছে রাধানাথ। আপ্যায়নের ত্রুটি সে-ও করিল না। বলিল, বসুন না, তামাক সেজে দিই—

—না বসব না। কবিরাজ এলে খবর দিয়ো আমি এসেছিলুম—গাজী সাহেব চলিয়া গেলেন।

রাধানাথ বড় করিয়া একটা হাই তুলিল, তারপর একটা বিড়ি ধরাইয়া আবার যথাস্থানে চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। দিব্যি মিঠা বাতাস আসিতেছে—দিবা-নিদ্রাটি ভারী জমিয়া উঠিয়াছিল। মাঝখান হইতে গাজী সাহেব আসিয়া কাঁচা ঘুমটুকুকে মাটি করিয়া দিয়া গেল।

মধ্যরাত্রির মতো নিস্তব্ধ প্রশান্ত দুপুর। উষ্ণমণ্ডলের সূর্য মাথার উপরে জ্বলিতেছে প্রবল ভাবে—আকাশটা পুড়িয়া যেন খাক্ হইয়া যাইবে। নীল আকাশটা অদ্ভুতভাবে নীল—এই অতিরিক্ত নির্মলতাকেই অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হয় এখানে। এমন এক একটি দিনেই কালবৈশাখীর আবির্ভাব ঘটে।

তেঁতুলিয়ার জলকণা লইয়া স্নিগ্ধ হাওয়া আসিতেছিল। মাথার উপর সুপারির

পাতাগুলি খস্ খস্ শব্দে কাঁপিতেছে, পাখীর ঠোকর লাগিয়া একটা পাকা সুপারি পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। আর সেই সময় হঠাৎ চোখ তুলিয়া চাহিতেই গাজী সাহেব আর একবার মুক্তোকে দেখিলেন। আপনা হইতেই তাঁহার পা দুটি থামিয়া আসিল, দৃষ্টি আট্‌কাইয়া রহিল দুর্লভ-দর্শন একটি অপূর্ব নারীমূর্তির দিকে।

সুপারিবনের একপাশে একটা ডোবা। সম্মান করিয়া পুকুর বলা চলিতে পারে। অনেকটা জায়গা লইয়া বলরামের বাড়ি আর বাগান, কাজেই ডোবাটাকে মোটামুটি নিরিবিলি ও নিভৃত বলিয়া মনে করিলে দোষ হয় না। তাই মুক্তো ঘাটে বসিয়া কী যেন করিতেছিল।

দূর হইতে অতৃপ্ত-চোখে গাজী সাহেব তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। আঁচল খসিয়া-পড়া অনাবৃত পিঠের উপর কালো চুলের রাশি ছড়াইয়া আছে, অসতর্ক বেশবাসে সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত। চকিতের মতো সেদিন তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন, আজ নিনমেষ দৃষ্টিতে ভালো করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে হইল মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী।

কে এ? বলরামের স্ত্রী নয় নিশ্চয়ই—অন্য কোনো আত্মীয়া হইলে এই দূরদেশে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে বসবাস করিতে কেন রাজী হইবে? তবে কি—

মুহূর্তে ব্যাপারটার সমাধান হইয়া গেল। বলরাম সাধু সাজিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে এতটা শুদ্ধ সংযত কিছু নয়। সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রত্যাশাতে যেন গাজী সাহেবের মনটা পূর্ণ হইয়া উঠিল। বলরাম যখন পাইয়াছে, তখন তাঁহার পক্ষেও খুব দুষ্প্রাপ্য হইবে না হয়তো। তা ছাড়া বলরাম অপেক্ষা তিনি সর্বাংশে যোগ্য ব্যক্তিও বটেন।

চোখের দৃষ্টিতে বোধ হয় চুম্বকের মতো কী একটা ব্যাপার আছে। মুক্তো এক সময় পিছন ফিরিয়া তাকাইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলন্ত দুটি ক্ষুধার্ত চক্ষুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎকার হইয়া গেল।

মুক্তো চমকিয়া উঠিল। চকিতে নিজেকে সংযত করিয়া লইল, তারপর প্রকাণ্ড একটা ঘোমটা টানিয়া দিল মাথার উপর। গাজী সাহেব একবার চারিদিকে তাকাইলেন—কোনোখানে জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ কিছুই নাই। বাতাসে কেবল সুপারির পাতা কাঁপিতেছে।

গাজী সাহেব হাসিলেন, ইঙ্গিতপূর্ণভাবে দু-একবার কাশিলেনও। মুক্তো কী ভাবিল কে জানে, ঘোমটার ভিতর হইতে তাঁহার দিকে চকিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই তড়িৎবেগে তিরোহিত হইল। গাজী সাহেব দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

বলরামের ফিরিতে রাত হইয়া গেল। গীর্জার ঘাটে আসিয়া যখন তিনি নৌকা

ভিড়াইলেন, তখন রাত বারোটার ওপরে গড়াইয়া গেছে। নৌকার মাঝি আলো ধরিয়া তাঁহাকে আগাইয়া দিল। এইখানেই কয়েকদিন আগে জোহান খুন হইয়াছে, কবিরাজের গায়ের মধ্যে ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

বাহিরের ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল—রাধানাথ খুলিয়া রাখিয়াছে। একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছে মিট্ মিট্ করিয়া। দেওয়ালে চীনা মেয়ের ছবি বাতাসে দোল খাইতেছে।

শাদা জিনের কোটটা খুলিয়া এবং পায়ের লাল কেড্স জোড়াকে একপাশে রাখিয়া বলরাম নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। বিছানাটা পরিপাটী করিয়া পাতা—মাথার কাছে একটা বড় ঘটি এবং এক গ্লাস জল কেরোসিনের কাঠের একটা টেবিলের ওপর বসানো রহিয়াছে। মুক্তোর হাতের স্পর্শ। সাংসারিক ভাবে মুক্তোর অস্তিত্ব সম্পর্কে ভুল করিবার কোনো কারণ নাই। রান্না-বান্না হইতে শুরু করিয়া তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োজনটুকুও সে যেন আগে হইতেই বুঝিয়া রাখে, কখনো এতটুকু অভিযোগ করিতে হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ সে কতখানি দূরে সরিয়া গেছে। অত্যন্ত কাছে টানিতে গিয়াই কি বলরাম মুক্তোকে হারাইলেন?

নৌকায় আসিতে আসিতে অনেক কথাই তাঁহার চিন্তার মধ্য দিয়া আনাগোনা করিয়াছে। আজ বলরাম বুঝিয়াছেন মুক্তোকে না হইলে তাঁহার চলিবে না। শুধু শারীরিক ভাবেই নয়—তাহাকে বাদ দিয়া তাঁহার মনও আজ কোনোখানেই দাঁড়াইতে পারিতেছে না। দশ বছর আগে বিপত্নীক হইয়াছিলেন—তারপর এতদিন কাটিয়াছে শান্ত আত্মবিস্মৃতির মধ্যে। সংযমী ধীরচিত্ত মানুষ বলরাম, তাই বহুকাল পরে সেই স্থির সংযমে আসিয়া যখন তরঙ্গের দোলা লাগিয়াছে, তখন সেটা কোনমতেই সংযত হইবার নয়।

কিন্তু তাঁহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এই অনাহূত শিশু—এই অবাঞ্ছিত আগন্তুক। দুটি অদৃশ্য অথচ দুর্বার বাহু প্রসারিত করিয়া সে বাধা রচনা করিয়া বসিয়া আছে। মুক্তো তাহাকে চায়—বলরাম তাহাকে চান না। তাই বলরামের প্রতি সন্দেহে মুক্তো ব্যাঘ্রীর মতো সতর্ক হইয়া উঠিতেছে বুঝি।

বলরাম বিছানায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলেন না। সেদিনকার মতো সর্বাঙ্গে অসহ্য উত্তেজনা। চোখের পাতা দুইটা বুজিলেও অন্ধকার আসে না—যেন আগুনের কতকগুলি ফুল সামনে নাচিতে থাকে। সমস্ত বিছানাটায় যেন বালি কিচ্ কিচ্ করিতেছে। বলরাম উঠিয়া বসিলেন।

মুক্তো আজকাল দরজায় খিল দিয়াই ঘুমায়। তা হোক। বলরাম জানেন একটু চেষ্টা করিলেই ও-ঘরের দুটি কবাটের জোড় অনেকখানি ফাঁক হইয়া যায় আর সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া খিল খুলিয়া ফেলা চলে সহজেই। যা হওয়ার হোক—এই আত্ম-

নিপীড়ন অসহ্য।

বাহিরে অন্ধকারে প্যাঁচা ডাকিতেছে—নিম্‌-নিম্‌-নিম্‌। প্যাঁচার ওই ডাকটার সম্বন্ধে এদিককার লোকের কেমন একটা কুসংস্কার আছে—ওরা নাকি মৃত্যুর সংবাদ বহন করিয়া আনে। কাহাকেও লইয়া যাইবার মতলবে আসিয়াছে, নিম্‌-নিম্‌ করিয়া সেই কথাটারই জানান দিতেছে। চর ইস্‌মাইলের চারদিক ঘিরিয়া তেঁতুলিয়ার অতন্দ্র কল্লোল জাগিয়া আছে—আর থাকিয়া থাকিয়া কুকুরের অর্থহীন চিৎকার।

একটা টর্চ লইয়া বলরাম বাহিরে আসিলেন। রাধানাথ নাক ডাকাইতেছে—কট্‌কটে ব্যাঙের ডাকের মতো বিশ্রী একঘেয়ে আওয়াজ। পাণ্ডুর জোৎস্না দেখা দিয়াছে, তাহারি আলোয় বলরামের নিজের ছায়াটা যেন প্রেতমূর্তির মতো অতিশয় দীর্ঘ হইয়া বারান্দার উপর ছড়াইয়া পড়িল। নিজের ছায়া দেখিয়া তাঁহার নিজেরই ভয় করিতেছে যেন। প্যাঁচাটা ক্রমাগত শাসাইয়া চলিয়াছে—নিম্‌-নিম্‌-নিম্‌।

বলরাম মুক্তোর ঘরের খিল খুলিয়া ফেলিলেন। মুক্তোর ঘুম আজকাল যেন আগের চাইতে ঢের বেশি বাড়িয়া গেছে। সেদিনের মতো বলরাম আজো আসিয়া আবার তাহার বিছানার পাশে দাঁড়াইলেন।

মুক্তো উঠিয়া বসিল, এক ধাক্কায় বলরামকে ঠেলিয়া তিন-চার হাত দূরে ফেলিয়া দিল। তারপর পশুর মতো একটা আর্তনাদ করিয়াই টলিতে টলিতে ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া গেল। যেন পলাইতে চায়—পলাইয়া রক্ষা করিতে চায় নিজেকে। সজোরে এবং সশব্দে কবাটটাকে খুলিয়া অন্ধকারের মধ্যে নামিয়া গেল সে।

আর পরক্ষণেই পতনের শব্দ আর সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ভাসিয়া আসিয়া যেন বলরামের কানের মধ্যে বিঁধিয়া গেল।

নিজের মূঢ়তাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলরাম তড়িৎ বেগে বাহিরে আসিলেন। বেশি দূর আসিতে হইল না—পাণ্ডুর চাঁদের আলোয় দেখা গেল একেবারে দাওয়ার সম্মুখেই কী একটা শুভ্র বস্তু মাটিতে পড়িয়া আছে।

বলরাম টর্চ জ্বালিলেন। মাটিতে পড়িয়া আছে মুক্তো। সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া সামলাইতে পারে নাই—পা ফস্‌কাইয়া আছড়াইয়া পড়িয়াছে। টর্চের আলোয় বলরাম দেখিলেন বড় বড় ক্লান্ত নিঃশ্বাসে তাহার উবুড় হইয়া থুবড়াইয়া পড়া দেহটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, আর গল্‌ গল্‌ করিয়া নামিয়া আসা কাঁচা রক্তে যেন স্নান করিতেছে সে।

এত করিয়াও মুক্তো তাহার সন্তানকে রাখিতে পারিল না।

কালুপাড়াকে কেন্দ্র করিয়া মণিমোহন আশেপাশে কালেক্‌শন মোটামুটি শেষ করিল। পনেরো-বিশটা দিন কাটিয়া গেল অবিশ্রান্ত খাটুনির মধ্যেই। সরকারী লোক এবং তাহার কালেক্‌শন—ইহা ছাড়া জীবনের আর কোনো রূপ যে থাকিতে পারে, সে কথা ভাবিবারই যেন অবকাশ ছিল না কয়দিন। রাণী নয়, বর্মী মেয়ে নয়, ডায়েরী পর্যন্ত নয়।

কিন্তু এবার ফিরিতে হইবে। বহু টাকা সঙ্গে জমিয়া গিয়াছে, এগুলি কাছারীতে জমা করিয়া দেওয়া দরকার। ওখান হইতে টাকা লইয়া লোক শহরে চলিয়া যাইবে। এতগুলি টাকা সঙ্গে লইয়া নদীতে ঘুরিয়া বেড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। অভাবে অভিযোগে দেশের লোক কুকুরের মতো হন্তে হইয়া আছে—সরকারী বাবুকেও রেয়াত করিতে রাজী হইবে না তাহারা।

এত ধান—প্রকৃতির এমন দাক্ষিণ্য—এমন অপরিমিত ঐশ্বর্য। তবুও দুর্ভিক্ষ চলে। ডাকাতি কেবল লোকে যে স্বভাবের দিক হইতে করে তা নয়, অভাবের প্রশ্নটাও সমান জটিল এবং নির্মম। পটুয়াখালি এলাকায় কয়েকখানা ধানের নৌকা লুট হইয়াছে। তা ছাড়া উপনিবেশের এই দুর্জয় মানুষের দল। একবার যদি কোনোক্রমে জানিতে পারে যে, মণিমোহন এই রাশি রাশি কাঁচা টাকা লইয়া নিশীথ রাত্রিতে নির্জন নদীতে চলাফেরা করে, তাহা হইলে মরিয়া হইয়া একটা চেষ্টা হয়তো করিয়া বসিবে।

মণিমোহন কহিল, এবার তা হলে ফেরা যাক গোপীনাথ।

গোপীনাথের স্বরে নৈরাশ্য প্রকাশ পাইল: এত তাড়াতাড়ি ফিরবেন বাবু?

—দেরি করে আর কী লাভ? ওশীল এর বেশি আর হবে বলে মনে কর নাকি?

—আজ্ঞে না, তা নয়—গোপীনাথ কথাটা স্বীকার করিয়াই ফেলিল, এই খাওয়া-দাওয়াটা আর কি। একরকম মন্দ তো চলছে না—পাঁঠা, মুরগী, ডিম—বেশ পাওয়া যাচ্ছিল। আর কাছারীতে ফিরে গেলে সেই ভাগাভাগির কারবার, খেয়ে পেট ভরে না।

মণিমোহন হাসিয়া বলিল, খাওয়াটা তো আসল ব্যাপার নয়, চাকরি করতেই আসা।

—তা বটে। কিন্তু খাওয়াটা জুৎসই না হলে আর চাকরির নামে এখানে কী আশায় পড়ে থাকি? আপনিই বলুন না।

মণিমোহন সহানুভূতি বোধ করিয়া কহিল, সে তো সত্যি। কিন্তু এতগুলো টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়ানো—রাতে এসে যদি নৌকায় চড়াও হয়, তখন? একটা বন্দুক দিয়ে কী ঠেকানো যাবে?

গোপীনাথ সক্ষোভে বলিল, তা বটে।

কিন্তু কালুপাড়া হইতে বিদায় লইবার পূর্বে আর একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

সকাল বেলা বোটে বসিয়া মণিমোহন চা খাইতেছিল। যে কোনো অবস্থাতেই হোক, এই চা-টি না হইলে তাহার কোনোক্রমেই চলিবার জো নাই। মহিষের দুধ প্রচুর মেলে, যদিও চিনি পাইবার সম্ভাবনা নাই সব সময়ে। অভাবপক্ষে গুড়ের চা খাইবার অভ্যাসটা সে মোটামুটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। আজও সকালে গোপীনাথের তৈরি খেজুরের গুড়ের উগ্রগন্ধী চা গিলিতে গিলিতে সে দেখিল গ্রামের একটা বিরাট জনতা তাহার বোটের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মজাঃফর মিঞার মেহেদী রাঙানো দাড়িটাই তাহাদের সকলের আগে চোখে পড়িল।

মণিমোহন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী ব্যাপার?

সম্মিলিত জনতার মধ্যে উত্তেজনা প্রকাশ পাইতেছিল। মেহেদী রঙীন দাড়ি লইয়া মজাঃফর মিঞাই সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহাদের বক্তব্য ঘোষণা করিল, আমরা বিচার চাই হুজুর।

—কিসের বিচার?

তারপর কিছুক্ষণ ধরিয়া কলরব চলিতে লাগিল। তাহারা ক্ষেপিয়া গিয়াছে। হুজুর ভালোয় ভালোয় একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলে তো ল্যাঠা চুকিয়াই গেল, নতুবা যাহা করিবার তাহারা নিজেরাই করিবে। বহুকাল ধরিয়া তাহারা সহ্য করিয়াছে কিন্তু আর নয়।

—আঃ, ব্যাপারটা কী, তাই শুনি না।

আবার কলরব। তবে তাহার মধ্য দিয়াও বক্তব্যের মর্মটি উদ্ধার করা গেল। সেই বর্মী মেয়ে। তাহাদের গ্রামে শান্তিপূর্ণ জীবনে সে ধূমকেতুর মতো আসিয়া দেখা দিয়াছে। গ্রামের জোয়ান ছোকরাগুলির মতিগতি বিগড়াইয়াছে। কাজ নাই, কর্ম নাই, তাহারা ওই মেয়েটার পিছনেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুধু কি তাই! তাহাদের নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি এমন কি লাঠালাঠি পর্যন্ত হইয়া গেছে। সমস্ত গ্রামের বুকের মধ্যে ওই মেয়েটার রূপ প্রখর একটা অগ্নিপিণ্ডের মতো জ্বলিতেছে। আর শুধু যে জ্বলিতেছে তা নয়—সকলকে জ্বালাইতেছে সমান ভাবে।

শুনিয়া মণিমোহন স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে প্রচণ্ড একটা আঘাত আসিয়া লাগিয়াছে। বর্মী মেয়েকে অবশ্য খুব চরিত্রবতী বলিয়া মনে করিবার মতো কোন কারণ কখনও ঘটে নাই। সেই ঝড়ের সন্ধ্যা কোনোদিন তাহার স্মৃতি হইতে মিলাইয়া যাইবে না—সেই অরণ্যমর্মরিত ভয়াল পরিবেশের মধ্যে, কালো অন্ধকারে বর্মী মেয়ের সর্বাঙ্গ যেন মশালের মতো শিখায়িত হইয়া জ্বলিতেছিল। আগুনের কাজই দাহন—প্রতিদিন—প্রতি মুহূর্তেই নূতন করিয়া ইন্ধনের দাবি জানাইবে সে। মণিমোহন সেখানে একচ্ছত্র এবং অনন্ত হইয়া থাকিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল কেন?

তবুও তাহার মন মৃদু একটা বেদনার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বর্মী মেয়ের রক্তে উপনিবেশের বর্বর যৌবন জাগিয়াছে—সে যৌবন সর্বগ্রাসী; কিন্তু তাহার মার্জিত দীপ্তি, তাহার চরিত্রে একটা রুচিসঙ্গত পরিচ্ছন্নতা—সবগুলি ভাবিয়া কথাটাকে যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

নিজেকে আত্মস্থ করিয়া লইয়া সে প্রশ্ন করিল, আমি এর কী বিচার করব?

মুখপাত্র মজাঃফর মিঞা কহিল, ডেকে এনে সমঝে দিন না হুজুর। নইলে আমরাই ওকে গাঁ থেকে তাড়িয়ে দেব। ওই কস্‌বীটার জন্যে ছেলেগুলো সব জাহান্নামে গেল।

—তোমরা ওকে ডেকে নিয়ে এলে না কেন?

—ডেকেছিলাম হুজুর, এল না। ভারী মেজাজ। বলে কি জানেন? কোনো সরকারী বাবুকে আমি পরোয়া করি না। গরজ থাকে নিজেই যেন আসে।

কী হইল কে জানে, মণিমোহনের সরকারী পদমর্যাদাটা অকস্মাৎ অত্যন্ত প্রখর ও প্রবল হইয়া জাগিয়া উঠিল। এক মুহূর্তে তাহার মন অসহ্য ক্রোধ এবং অপমানবোধে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে শুরু করিয়া দিল।

—বটে! আচ্ছা যাও তোমরা—আমি দেখছি।

—ব্যবস্থা একটা করুন হুজুর, নইলে গাঁয়ে বাস করা কঠিন হবে আমাদের।

জনতা নিজেদের মধ্যেই উত্তেজিত আলোচনা করিতে করিতে বিদায় লইল।

তারা চলিয়া গেলে মণিমোহন খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। ওই মেয়েটা তাহাকে অপমান করিয়াছে, ঠকাইয়াছে তাহাকে। সেদিনকার সেই সন্ধ্যায় এত সহজেই তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল, সেই গর্বেই অভিভূত হইয়া আছে তাহার মন। কিন্তু এ গর্ব ভাঙিতে হইবে।

ঘণ্টাখানেক পরে দুজন পেয়াদা সে পাঠাইয়া দিল। মেয়েটাকে ডাকিয়া আনিতে হইবে।

পেয়াদারা ফিরিল দশ-পনেরো মিনিট পরেই। একরকম ঊর্ধ্বশ্বাসেই ছুটিতেছে তাহারা—তাহাদের সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত। সমস্বরে কহিল, আসবে না হুজুর।

—আসবে না?

—না। শুধু কি তাই? মেয়েমানুষ নয় তো হুজুর, সাক্ষাৎ বাঘিনী। দা নিয়ে তাড়া করেছিল আমাদের, হাতের কাছে পেলে কেটে ফেলত।

বাঘিনী! তা বটে! একেবারে মিথ্যা নয়। প্রথম দিন যখন মা-ফুনের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছিল, সেই দিনটার কথা মনে পড়িল। সেদিনও সে এমনি আসামী হইয়াই আসিয়াছিল। থান ইটের ঘায়ে স্বামীর মাথাটা দিয়াছে ফাটাইয়া—আর যাহারা তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে, তাহাদের আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিয়াছে।

দুটি ক্রুদ্ধ চোখ জ্বলিতেছে তীব্র ক্রোধ আর হিংসার আলোকে।

বাঘিনী—তা বাঘিনীকে সায়েস্তা করিতেও সে জানে। মণিমোহনের মনে হইল, তাহার সমস্ত পৌরুষ যেন একটা অসহ্য অপমানে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। কী মনে করিয়াছে এই মেয়েটা? পশ্চিমবঙ্গের ছেলে—কিন্তু তাই বলিয়া সে কি এখনো পিছাইয়া নাকি? উপনিবেশ প্রবেশ করিয়াছে তাহার রক্তে—উপনিবেশ সঞ্চারিত হইয়াছে তাহার স্নায়ুতে। একান্ত ভাবে ইচ্ছা হইল, বন্দুকটা লইয়া সে নামিয়া পড়ে, একবার দেখিয়া আসে, বন্দুক অথবা দায়ের জোরটাই বেশি। বাঘের থাবার শক্তি যত প্রচণ্ডই হোক, তাহার নথ যতই ধারালো হোক, শিকারীর বন্দুক অথবা রাইফেলের মুখে চিরদিন তাহা গুঁড়াইয়া গেছে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বসিয়া রাণীকে চিঠি লিখিল সে। কেমন করিয়া এবং কেন যে কে জানে, আজ রাণীকে চিঠি লিখিতে তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিতেছিল। যেন একটা দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়া সে রাতারাতি সুস্থ আর স্বস্থ হইয়া উঠিয়াছে। মণিমোহনের ভাবিয়া হাসি পাইতে লাগিল, সত্যি সত্যিই বর্মী মেয়েটা তাহাকে পাকে পাকে অজগর সাপের মতো গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে যেন। তাহার নীল চোখ—তাহার চুনির মতো রঙীন ঠোঁটের বিভঙ্গ—তাহার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে যৌবনের অসংকোচ আত্মপ্রকাশ—সবটা মিলিয়া তাহাকে যেন প্রত্যেক দিন জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল। আজ সে বাঁচিয়া উঠিয়াছে—ফিরিয়া পাইয়াছে নিজেকে। উপনিবেশ তাহার গৃহ নয়—এখানকার শ্রীহীন আদিম নির্লজ্জতার মধ্যে কোনোদিন সে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিবে না। এই রাক্ষসী নদী, ঝড়ের মেঘে কালো হইয়া আসা বন্ধহীন আকাশ—এগুলি তাহার জীবনে সত্য নয়। প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখায় ছোট ঘরটি আলোকিত—মণিমোহনের ফোটোখানির উপর একছড়া মালা দুলিতেছে। জানালার সামনে চুপ করিয়া বসিয়া আছে রাণী। বাহির হইতে আমের মুকুলের গন্ধ আসিতেছে। হরিসভায় কীর্তন চলিতেছে—বাতাসে খোল করতালের সঙ্গে সঙ্গে গানের শব্দ। সেই জীবন অনেকদিন পরে আবার হাতছানি দিয়া মণিমোহনকে ডাকিল। নদী—কিন্তু নদী বলিলে কি এই! এখন—এই ফাল্গুন চৈত্রে সে নদী হাঁটিয়া পার হয় লোকে। দুই তীরে তার ভাট ফুল মদির গন্ধ বিস্তার করে, আর প্রেমদাস বৈরাগী বাবাজীর যে সমাধিটা ঝাউ বনের অন্ধকারে লুকাইয়া আছে, একটা প্রদীপ নদীর বাতাসে কাঁপিতে কাঁপিতে সেখানে আলো ছড়াইতে থাকে।

এই বহুদূর বিদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বসিয়া মণিমোহন আজ যেন নূতন করিয়া দেখিল তাহার গ্রামকে—নূতন করিয়া রাণীর কথা তাহার মনকে নাড়া দিতে লাগিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া সে চিঠি লিখিল। তারপর বাতি নিবাইয়া যখন সে ঘুমাইবার উপক্রম করিল, তখন নদী পর্যন্ত যেন রাত্রির তন্দ্রালু স্পর্শে নীরব হইয়া গেছে। দূরে কোথাও গাঙ-শালিকের বাসায় কিছু অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, সম্ভবত রাত্রির সুযোগ লইয়া ডাকাতের মতো সাপ আসিয়া হানা দিয়াছে তাহাদের গর্তে।

—বাবু, বাবু, সরকারী বাবু!

একটু তন্দ্রার আমেজ আসিয়াছিল, মুহূর্তে টুটিয়া গেল সেটা। ঘুমের ঘোরে ভুল শুনিল না তো? অথবা নিশির ডাক নয় তো? এ দেশে ভূত-প্রেত স্কন্ধকাটা কোনো কিছুতেই তো অবিশ্বাস করিবার নয়।

কিন্তু আবার স্পষ্ট ডাক আসিল—সরকারী বাবু!

বোটের মাঝিরা অসাড় হইয়া ঘুমাইতেছে। অস্বাভাবিক খাটে বলিয়াই অস্বাভাবিক ভাবে ঘুমায়। মড়া মনে করিয়া চিতায় তুলিয়া দিলেও তাহারা বোধ হয় জাগিবে না—ঘুমন্ত অবস্থাতেই স্বর্গলাভ করিবে। সুতরাং এ ডাকে তাহারা জাগিল না। মণিমোহনের অজানিতে মাঝিদের সহযোগিতায় খানিকটা তাড়ি যোগাড় করিয়া গিলয়াছে গোপীনাথ—অবশ্য টের পাইয়াও মণিমোহন কিছু বলে নাই। নেশা না টুটিয়া যাওয়া পর্যন্ত গোপীনাথ পড়িয়া থাকিবে জগদ্দল পাথরের মতো অচল ও অনড় হইয়া।

সুতরাং মণিমোহন নিজেই বাহির হইয়া আসিল। ভুল হইবার কোনো কারণ নাই। জলের ধারে কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। তারার আলোয় সে সাহসিকাকে চিনিতে কষ্ট হইল না।

অসীম বিস্ময়ে মণিমোহন কহিল, তুমি এখানে? এই সময়ে?

অন্ধকারে সে হাসিল কি না বোঝা গেল না। বলিল, হাঁ আমি; একটুখানি আশ্রয় দিতে হবে সরকারী বাবু।

—আশ্রয়!—বিস্ময়ে আর বাক্‌স্ফূর্তি হইল না তাহার।

জোয়ারের জলে বোটটা অনেকখানি ভাসিয়া আসিয়াছে। পরনের ঘাঘ্‌রাটাকে হাঁটু পর্যন্ত তুলিয়া অভিসারিণী ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দে জল ভাঙিয়া একেবারে বোটের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, তুলে নাও আমাকে।

অবস্থাটা চিন্তা করিয়া মণিমোহন সংকুচিত হইয়া গেল—এই বোটে? এখন?

—ভয় পাচ্ছ?

—না, ভয় নয়—মণিমোহন আর বলিতে পারিল না।

—বড় বিপদে পড়েই এসেছিলুম। তা হলে আমি ফিরে যাই—

—বিপদ!—দ্বিধা কাটিয়া গেল মুহূর্তে। একথা ভুলিলে চলিবে না এই এলাকায় আপাতত সে রাজ-প্রতিনিধি, অনেক কিছু করিবার ক্ষমতাই রাখে।

—না, না, এসো তুমি।—হাত বাড়াইয়া সে তাহার লঘু দেহটি স্বচ্ছন্দে বোটে তুলিয়া লইল। তারপর বজরার মধ্যে আসিয়া দুজনে মুখোমুখি হইয়া বসিল—বসিল খানিকটা দূরত্ব রাখিয়াই। ঝড়ের রাত্রি আর আশ্রয়ের রাত্রি এক নয়। একটা সিগারেট ধরাইয়া মণিমোহন বলিল, কী বিপদ?

ক্লিষ্ট জবাব আসিল, পরে বলব।

দেশলাইয়ের কাঠির ক্ষণিক আলোকে মণিমোহন দেখিল নীলার উপর যেন মুক্তার বিন্দু টলমল করিতেছে। এই মেয়ের চোখেও কি জল দেখা দিতে পারে! নীরব বিস্ময় এবং বেদনার অনুভূতিতে তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না, আর অনাহূতা দু হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল একটা ছায়ামূর্তির মতো।

* * * *

চর ইসমাইলের কাজ ফুরাইয়াছে। এখানে পড়িয়া থাকিলে আর কী হইবে? ওদিকে ব্যবসার যারা দু-একজন অংশীদার আছে তাঁরা যে এই সুযোগ দুহাতে লুটিয়া খাইতেছে তাহাও নিঃসন্দেহ।

কিন্তু লিসি। গঞ্জালেস্ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া দেখিল্ লিসিকে না হইলে তাহার চলিবে না। পৃথিবীতে যাহাকে পাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, একমাত্র তাহারই জন্য সমস্ত অন্তরাত্মা আর্তনাদ করিতেছে গঞ্জালেসের। শরীরের দাবি মিটাইবার জন্য নারীর অভাব নাই, যতদিন অর্থ আছে ততদিন সে অভাব হইবেও না। তবু লিসিকেই তাহার একমাত্র প্রয়োজন। মোহ বেশিক্ষণ থাকিবার কথা নয়, লিসির প্রতি তাহার যেটুকু চিত্ত-চাঞ্চল্য জাগিয়াছিল, আজ বাদে কাল তাহার আন্দোলন অতি সহজেই যাইবে শান্ত এবং প্রশমিত হইয়া। কিন্তু আঘাত লাগিয়াছে তাহার পর্তুগীজ অহমিকায়। তাহার সম্মুখ হইতে তাহারই স্বজাতীয়া বাঞ্ছিতাকে ছিনাইয়া লইয়া যাইবে কোথা হইতে একদল বর্বর রেঙ্গুনী আর আরাকানী আসিয়া!

গঞ্জালেসের প্রাক্-পুরুষেরা রচনা করিয়াছিল ইতিহাসকে আর আজ সেই ইতিহাসই নূতন করিয়া গঞ্জালেস্‌কে রচনা করিতেছে। পান্সী নৌকা নয়, যুদ্ধ জাহাজ। বাঘের জিভের মতো টকটকে লাল সাতটা পালে ঝড়ের হাওয়া লাগিয়াছে। নীল কেশর-ফোলানো সমুদ্রের ঘোড়ায় তাহারা আসোয়ার। সেদিন কোথায় ইংরাজ—কোথায় তাহার ম্যান্-অফ্-ওয়ার! সপ্তগ্রামের বন্দরে চলিতেছে আকাশ-ছোঁয়া অগ্নিযজ্ঞ—সরস্বতীর কালো জলে সেই আগুনের ছায়া নাচিতেছে। মৃতদেহে ভাগীরথীর বুক পরিকীর্ণ।

গঞ্জালেস্ ডি-সুজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিন্তু ডি-সুজা তাহাকে চিনিল। শোকের এবং আকস্মিকতার ধাক্কাটা কিছু পরিমাণে সামলাইয়া সে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়াছে বোধ করি। সমস্ত জীবন ধরিয়া একটা

নির্মমতার ইতিহাস তাহাকে নির্মোকের মতো ঘিরিয়া আছে। শুধু নির্মোক নয়—চরিত্র এবং মনের উপর তাহা রচনা করিয়াছে লোহার মতো একটা দুর্ভেদ বর্ম। তাই এ আঘাতও সে স মলাইয়া লইল।

মা তালের মতো টলিতে টলিতে ডি-সুজা আগাইয়া আসিল সামনে। সম্বর্ধনা করিয়া বলিল, তুমি স্যামুয়েল!

—হাঁ, আমি স্যামুয়েল।

মমির হাতের মতো দুখানা কালো এবং শুকনা হাত বাড়াইয়া গঞ্জালেসের ডান হাতখানি টানিয়া লইল ডি সুজা। তারপর যেন ঘুমন্ত দুটি চোখ মেলিয়া স্বগতোক্তি করিল, ডেভিডের ছেলে তুমি। মানুষ খুন করাই ছিল ডেভিডের আনন্দ। তোমাকে এর শোধ নিতে হবে।

—হাঁ, এর শোধ নেব।—লোহার মতো দুটি কঠিন হাতে ডি-সুজার শিরা-বাহির-করা জীর্ণ হা ত দুখানি চাপিয়া ধরিল গঞ্জালেস্—এর শোধ আমি নেবই।

ডি-সুজার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল।

—খুঁজে বার-করতে হবে ওদের।

—হাঁ, খুঁজে বার করবই। চট্টগ্রাম থেকে আরাকান কদিনের পথ! তারপর বর্মা। তারপরে চীন। তারপরে পৃথিবী।

ডি সুজা চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, সমস্ত পৃথিবী?

—সমস্ত পৃথিবী।

কতটুকু এই পৃথিবী! সমুদ্র যাহাদের পায়ের তলায়, মৃত্যুকে যাহারা লইয়াছে মুঠোর মধ্যে আয়ত্ত করিয়া—ঝড়ের গতির তালে তালে যাহাদের জাহাজ রাতারাতি মহাসাগর পার হইয়া যায়, তাহাদের কাছে পৃথিবী কয়দিনের পথ! কর্ণফুলীর তীরে নারিকেল-বীথির যে নীড়, তাহা তো পথের পাশে ক্ষণিকের ছায়া-শীতল আশ্রয় মাত্র। আকাশের আহ্বান আসিয়া সাড়া দিয়াছে—রক্তে রক্তে পাখা মেলিয়াছে যাযাবর পর্তুগীজের মন। কালো চামড়ার টুপি—বন্দুক—পায়ের তলায় শরণাগত পৃথিবীর ভয়ার্ত হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে।

ডি-সুজা কহিল, কিন্তু লিসি?

—তাকেও পাওয়া যাবে।

—পাওয়া যাবে?

আবার অকারণ খানিকটা নির্বোধের হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ডি-সুজার মুখ।

পরের দিন সকালে ডি-সিল্ভার মনে হইল ডি-সুজার একটা সন্ধান লওয়া তার

কর্তব্য। হাজার হোক প্রতিবেশী, দুঃসময়ে তাহার খোঁজখবর না করাটা অত্যন্ত অমানুষিক ব্যাপার হইবে। যদিও লিসিকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবটা লইয়া ডি সুজা তাহাকে যা নয় তাই অপমান করিয়াছিল—কিন্তু এখন সেটা ভুলিয়া যাওয়াই উচিত। তা ছাড়া জননী মেরী তাহার দর্পের শোধ তুলিয়াছেন—ডি-সুজা উচিতমতো শিক্ষা পাইয়াছে। এখন আর পাপীকে ঘৃণা করা উচিত নয়।

অনেকটা করুণার্দ্র বোধ করিয়া ডি-সিল্‌ভা দেখা করিতে আসিল ডি-সুজার সঙ্গে। পায়ের মচকানোটা এখনো সারে নাই, খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হয় এখনো। ব্যাঙের মতো লাফাইতে লাফাইতে একটা লাঠি ভর করিয়া ডি-সিল্‌ভা আসিল। ডি-সুজাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে।

কিন্তু কোথায় ডি-সুজা! বাড়িতে যে কখনো মানুষ বাস করিত, তাহারও তো চিহ্ন নাই কোনোখানে। শুধু কতকগুলি ভাঙা টুকরো টুকরো এলোমেলো জিনিস ছড়াইয়া আছে সমস্ত উঠানটাতে। মুরগীর খোঁয়াড়টা অবধি শূন্য—কতকগুলি পাখা আর আবর্জনাই সেখানে অবশিষ্ট! একটা ভাঙা ডিম খানিক নির্যাস লইয়া পড়িয়া আছে—দু-তিনটা কাক তাহা ঠোকরাইয়া খাইতেছে। আর বাতাসে বেড়ার গায়ে ডি-সুজার একটা ছেঁড়া প্যাণ্টালুন নিশানের মতো দুলিয়া উঠিতেছে।

ধ্বক করিয়া ডি-সিল্‌ভার বুকটা একটা ধাক্কা খাইল। এ সমস্ত কী ব্যাপার?

লাঠি আর খোঁড়া পা একত্র করিয়া একসঙ্গে আট-দশটা কোলা ব্যাঙের মতো লম্বা লাফ লাগাইল ডি-সিল্‌ভা। আসিয়া দর্শন দিল একেবারে নদীর ধারে।

গঞ্জালেসের নৌকাটা যেখানে বাঁধা ছিল সেখানে একটা নোঙরের মতো গর্ত এবং মোটা কাছির চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নাই। নদীতে যতদূর তাকানো যায় শূন্য একটা শুভ্রতা কেবল ধু ধু করিতেছে। গঞ্জালেসের নৌকার আভাস কোনোখানে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

ডি-সিল্‌ভা হাঁ করিয়া দিগন্তের পানে তাকাইয়া রহিল।

ইহার পরে চর ইস্‌মাইলে ডি-সুজা আর কখনো ফিরিয়া আসে নাই। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন কাটিল—ডি-সিল্‌ভা এবং তাহার মতো আরো দু-চারজন উৎসাহী ব্যক্তি আসিয়া রাতারাতি ডি সুজার ভিটে খুঁড়িতে লাগিয়া গেল। অনেক টাকা করিয়াছিল তো লোকটা—ভুলেও কি তাহার দু-একটা ঘড়া মাটির তলায় পুঁতিয়া রাখিয়া যায় নাই!

কিন্তু যাহা কিছু, পণ্ডশ্রম হইল মাত্র। মাঝে হইতে ডি-সুজার ভিটাগুলিতে কয়েকটা বড় বড় কুয়ার সৃষ্টি হইল, তাহার বেশি কিছুই নয়। তারপর নিরাশ হইয়া অর্থলোভীর দল ডি-সুজার ঘরের টিন, বাঁশ, দরজা, কবাট যাহা পাইল তাহা লইয়াই প্রস্থান করিল।

পাশাপাশি দুইটি ভিটা—জোহান আর ডি-সুজার। তাহাদের সমস্ত অপ্রীতি আর সন্দেহের মাঝখানে লিসি সেতু রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। একদিন সে সেতু ভাঙিয়া গেল। তারপর কালো মৃত্যুর একটা আবরণ নামিল তাহাদের ঘিরিয়া—চর ইস্‌মাইলের পর্তুগীজ সংস্কৃতির উপর সময় ও শতাব্দীর নূতন হস্তাবলেপ।

৫

ওদিকে মণিমোহনের বোটের উপর রাত্রি শেষ হইয়া আসিল নক্ষত্র চক্রের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। কালো জলে ধূপছায়ার পাণ্ডুরতা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তেঁতুলিয়া কল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে। দূরে দূরে অরণ্য রেখার অর্থহীন জমাট রূপ এক একটা অবয়ব গ্রহণ করিতেছে ক্রমশ। নৈশ-পরিক্রমা শেষ করিয়া বাদুড়েরা ফিরিতেছে নিদ্রাতুর দেহ এবং মন লইয়া।

অর্থহীন চিন্তায় মণিমোহন এই দীর্ঘ সময়টা বসিয়া আছে অতন্দ্র চোখে। আর বর্মী মেয়ের মুখখানা তাহার হাতের মধ্যে লুকানো, ঘুমাইতেছে কিংবা জাগিয়া আছে বোঝা কঠিন। এত কাছে—অথচ এত দূরে! সেই ঝড়ের সন্ধ্যায় মনে হইয়াছিল সে বাঘিনী, সে বিষকন্যা। আর এখন মনে হইতেছে মাটির পুতুলের মতো ভঙ্গুর, স্পর্শ-মাত্রেই ভাঙিয়া লুটাইয়া পড়িবে মাটিতে। এমন অবসরে—এমন একটি সুন্দরী মেয়েকে কাছে পাওয়ার লোলুপতাটা করুণার বন্যায় কোথায় তলাইয়া গেছে।

তারপর মেয়েটি মাথা তুলিল। চুলগুলি চূড়া করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, তোমার অনেক ক্ষতি করলুম।

মণিমোহন অস্পষ্ট গলায় বলিল, ক্ষতি?

—ক্ষতি ছাড়া আর কী! লোকে তো সত্যি মিথ্যে জানবে না, নিন্দে রটাবে তোমার।

—রটাক গে।

—নিন্দে-কলঙ্কের ভয় করো না তুমি?

—করি বই কি। কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি দাম আমি পেয়েছি।

বর্মী মেয়ে ক্ষীণভাবে হাসিল। কথাটা সে বুঝিয়াছে। এই সভ্যতাবর্জিত দেশের পটভূমিতে আজ আসিয়া সে দাঁড়াইয়াছে বটে; কিন্তু তাহার জীবন ও শিক্ষাদীক্ষা ঠিক এই ধাঁচের নয়। বিশিষ্ট বর্মীর মেয়ে সে, মৌলমিনে তাহার বাবার কাঠের কারবার

ছিল। মিশনারী স্কুলে সামান্য কিছু লেখাপড়া করিয়াছিল, সভ্যতার উপরকার স্তরটাকেও যে কিছু কিছু না দেখিয়াছিল তা নয়। কিন্তু আশৈশব অসংযত তাহার মন। ঘোড়ায় চড়িয়াছে, সমানভাবে মারামারি করিয়াছে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে। একদিন বাপ-মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শুধু ঝোঁকের মাথায় একটা ভ্যাগাবণ্ড যাযাবর লোককে সে বিবাহ করিয়া বসিল। তারপর—

তারপর নানা যোগাযোগে ঘুরিতে ঘুরিতে এই চর। অর্ধ সভ্য মানুষগুলির সঙ্গে দৈনন্দিন মেলা-মেশার ফলে সে সকলের সঙ্গে এক হইয়া গেছে, এদের নীচতা আর অসংযমকে লইয়াছে সমান আয়ত্ত করিয়া। কিন্তু রেঙ্গুন-মান্দালয়—পেগু-মৌলমিন, প্রকৃতি-ধর্মের অতিরিক্ত সে মন, সে মন তাহার জাগিয়া উঠিল মণিমোহনকে কেন্দ্র করিয়া।

মণিমোহন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। আবছায়া আলো পড়িতেছে বাহির হইতে। সে আলোয় তাহাকে চেনা যায় না—একটা আভাস পাওয়া যায় শুধু। করুণ আর শিথিল বসিবার ভঙ্গি। সমস্ত দেহটা ঘিরিয়া স্নিগ্ধ মধুরতা যেন অস্পষ্টভাবে সঞ্চারিত হইয়া আছে। নীলার উগ্র রশ্মিছটা নাই—যে আগুন প্রথম একটা অসহ্য জ্বালা লইয়া তাহার সামনে আসিয়া দেখা দিয়াছিল, সে আগুনই বা আজ কোথায়? একটা অর্থহীন বিষাদের প্রতিমূর্তি যেন।

মা-ফুন কহিল, এবার আমি নেমে যাব।

—নেমে যাবে?

—হাঁ, মাঝিরা জেগে ওঠবার আগেই। হয়তো তা হলে ব্যাপারটা চাপা থাকতে পারে এখনো। আসাটাই অবশ্য অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু, না এসে আমার কোনো উপায় ছিল না যে।

মণিমোহন জিজ্ঞাসু চোখে চাহিয়াই রহিল।

—না এসে উপায় ছিল না। তোমার কাছে মিথ্যে দরবার করেছে ওরা সব। আমি ওদের ছেলেপুলের মাথা খাবার কোনো মতলব করিনি, ওরাই বরং—

—বটে!—মণিমোহন উঠিয়া বসিল—আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। এর একটা বিচার—

—কী লাভ? ওদের কোনো দোষ নেই। আমি একা—কেন ওরা সুযোগ নিতে চাইবে না? আজ রাতে ওরা সব দল বেঁধে আমার বাড়িতে হানা দেবার মতলব করেছিল, তাই তোমার কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিলুম। কিন্তু এবার আমি চললুম সরকারী বাবু—এর পরে বেলা উঠে যাবে।

—না, না, দাঁড়াও।—মণিমোহন উত্তেজিত হইয়া উঠিল—বেলা উঠুক, কারো কথাতে আমি ভয় করি না। কিন্তু আজ বিকালে তো আমি চলে যাব, তারপর কোথায় আশ্রয়

পাবে তুমি ?

বর্মী মেয়ে কয়েক মুহূর্ত নীরব হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে জবাব দিল, সে ভাবনা আমার।

মণিমোহন আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল মুহূর্তে। মা-ফুনের হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল সে। বলিল, তোমাকে আমি নিয়ে যাব।

—কোথায় ?

—যেখানে হয়। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

বর্মী মেয়ে শান্তকণ্ঠে বলিল, এসব কথার কোনো মানে নেই সরকারী বাবু। তোমার সমাজ আর জীবন আলাদা। কোনোখানে মিলবে না আমাদের। পথে যেতে যেতে যা পাওয়া যায় সেইটুকুই লাভ। কোথাও থেমে দাঁড়ালেই ঠকতে হয়।

আশ্চর্য পরিবেশ—আশ্চর্য জগৎ! ইহার মাঝখানে মণিমোহন এমনি একটি মেয়ের দেখা পাইবার কল্পনা কি স্বপ্নেও করিতে পারিত! অরণ্যের অন্ধকারে যেন অরণ্যলক্ষ্মী!

—এবার আমি চলি সরকারী বাবু। তুমি আমার বড় উপকার করেছ। তোমাকে আমি কখনো ভুলব না—মা-ফুন্ উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিল।

কিন্তু মণিমোহন তাহাকে ছাড়িল না।

বলিল, আজ থেকে তুমি আমার।

শিশুর নির্বোধ সারল্যে মানুষ যেমনভাবে হাসে, ঠিক তেমন করিয়াই সে হাসিল। বলিল কিন্তু স্বামী ?

—সে তো তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

—আবার ফিরতেও তো পারে।

—না ফিরবে না।—মণিমোহনের কণ্ঠস্বর দৃঢ় শুনাইল—তুমি বাজে কথা বলছ আমাকে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব কলকাতায়, সিভিল ম্যারেজের আইনে বিয়ে করব।

রাণী! পলকের জন্য মনের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল রাণীর ছায়াছবি। বিদায়ের আগে তাহার অশ্রুম্লান মুখখানি। দূর বিদেশে কতদূর যে যাইতে হইবে। তাহার কপালের সিন্দুর বিন্দুটি এবং হাতের শাঁখা যেন ঝলমল্ করিয়া উঠিল একবার। তা ছাড়া এক স্ত্রী থাকিতে কি সিভিল ম্যারেজ করা যায় ? কিন্তু সে কথা পরে ভাবিলেও চলিবে।

এখানে বন্য-প্রকৃতির আদিম প্রেরণা। পাশে বসিয়া আছে বিদেশিনী বিচিত্র নারী—তাহার জ্বলন্ত তীব্র রূপ লইয়া। পৃথিবী এখানে পরিপূর্ণ কোমলতার নির্যাস বহিয়া অনাবৃত লাবণ্যে দাঁড়াইয়া আছে—বর্বর উচ্ছৃঙ্খলতার নেশা আপনা হইতেই আচ্ছন্ন করে আনিয়া।

বর্মী মেয়ে মৃদুভাবে কহিল, তোমার আত্মীয়-স্বজন ?

—কেউ বাধা দেবে না। তোমাকে আমি নিয়ে যাবই !

রাণী ! কিন্তু রাণীর মুখখানা এবার সম্পূর্ণ করিয়া দেখা দিল না—ভাবনার পর্দার উপর ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠিবার আগেই মিলাইয়া গেল ছায়ার মতো। মণিমোহনের দৃঢ় ও লোভী মুষ্টির মধ্যে বর্মী মেয়ের কঠিনে কোমলে মিশানো হাতখানি ঘামে ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। হাতখানি ধীরে ছাড়াইয়া লইয়া বর্মী মেয়ে আরো দূরে সরিয়া বসিল।

বেলা বেশি হইবার আগেই মণিমোহন বোট ছাড়িয়া দিল।

মাঝিরা ভালোমন্দ কোনো কথা কহিল না—পরস্পরের দিকে একবার তাকাইল মাত্র। আর নেশা ছুটিয়া গেলেও গোপীনাথ চোখে মুখে খানিকটা জল দিয়া বসিয়া রহিল গুম্ হইয়া। এসব কী ব্যাপার ? চাকুরি করিতে আসিয়াছে—সন্ন্যাসী সাধু হইয়া নাই থাকিলে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সে উপসর্গটাকেও কাঁধে করিয়া টানিয়া লইয়া যাইবে, কোন্ দেশি বেহায়াপনা এসব ? শিক্ষিত লোকগুলা কি একেবারেই নিরঙ্কুশ নাকি ?

তা ছাড়া হিন্দুর ছেলে। শরীরে খানিকটা বিশুদ্ধ আর্যশোণিত বহিতেছে সেটা তো আর অস্বীকার করিবার জো নাই বাপু। একটা নাপ্পিখাওয়া থ্যাবড়া-মুখো মগের মেয়েকে কাঁধে তুলিয়া শোভাযাত্রা করা—এ যে মুসলমানের ভাত খাওয়ার চাইতেও বিপজ্জনক। মুরগী না হয় চলিতে পারে, এক-আধটা নষ্ট মেয়েকে বোষ্টুমী রাখিলেও চলে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে এতটা—

কী একটা বইতে গোপীনাথ পড়িয়াছিল সত্যযুগ আসিল বলিয়া। আর এই সত্যযুগে আবির্ভূত হইতেছেন স্বয়ং কল্কি অবতার, যত ম্লেচ্ছ এবং ম্লেচ্ছভাবাপন্নদের তলোয়ার দিয়া কচুগাছের মতো তিনি কচাকচ্ শব্দে সাবাড় করিবেন। যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা ঘুম ভাঙিয়া দেখিবে রাতারাতি তাহারা ষাট হাত লম্বা হইয়া গিয়াছে—সত্যযুগের মানুষ কিনা। আর পৃথিবীতে অসাধু, চোর, পাওনাদার কিংবা চৌকিদারী ট্যাক্স কিছুই নাই—একেবারে রামরাজ্য যাহাকে বলে।

উৎসাহিত হইয়া গোপীনাথ কথাগুলি শুনাইয়াছিল মণিমোহনকে। কিন্তু মণিমোহন বিশ্বাস করে নাই—গাঁজা বলিয়া এবং নানারকম কটুকাটব্য করিয়া জিনিসটাকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে। সেই হইতে গোপীনাথ মণিমোহনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পুরাপুরি নিরাশ হইয়া উঠিয়াছে। দু-দশটা অন্যায় কাজ কে না করে—পৃথিবীতে সবাই-ই আর এমন কিছু সাধুসন্ত জাতীয় জীব নয়, কিন্তু দু-চারটা মাস একটু শুদ্ধ-শান্ত থাকিয়া যদি কল্কি অবতারকে ফাঁকি দিয়া সত্যযুগের বাসিন্দা হইতে পারা যায় তো মন্দ কী। কিন্তু ও সম্বন্ধে মণিমোহনের কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা বা চেষ্টা দেখা যাইতেছে না।

বোট চলিতে লাগিল। দিনের উজ্জ্বল আলো নামিয়া নদীর বুক হইতে অস্পষ্টতার শেষ আবরণ মিলাইয়া গেল। আবার সেই পুরাতন জল আর আকাশের জগৎ। মোহ নাই, আচ্ছন্নতা নাই—মৃত্যুর মতো নিঃসংকোচ ও নিরাবরণ। বোটের গায়ে জল বাঁজবার শব্দ—মাঝে মাঝে কচুরিপানার পচাগন্ধ। বিরাট নদীর তলায় নূতন মাটির সূচনা—মাঝে মাঝে মধ্য নদীতেও লগি বাধিয়া যাইতেছে!

উত্তেজনা খানিকটা শিথিল হইয়া আসিতেছে মণিমোহনের। উপনিবেশের স্বপ্ন-কোমল রহস্য-উপন্যাসের মতো রাত্রি, আর খাসমহল কাছারীর তহশিলদারের হিসাবের কাগজ-পত্রে আচ্ছন্ন দিন এক নয়। তা ছাড়া দিনের আলো বড় বেশি প্রকট, বড় বেশি উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়, কিছুই যেন প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিবার উপায় থাকে না। রাণীর ছায়ামূর্তি আবার আসিয়া উঁকি মারিতেছে।

বর্মী মেয়ে জড়োসড়ো হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সমস্ত ঘটনাটাই যেন মন্ত্রবলে ঘটিয়া চলিয়াছে। মণিমোহনকে তাহার ভালো লাগিয়াছে সত্য—কিন্তু তাহার পশ্চাতে আছে উপনিবেশের এই পটভূমিকা। এই বর্বরতার মাঝখানে সে সভ্য-জগতের আলো লইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই সভ্য-জগতে? যেখানে মণিমোহন আর দশজনের মধ্যে একজন, যেখানে বহুর মধ্যে বৈশিষ্ট্যহীন একটা বুদ্‌বুদ হইয়া মিলাইয়া যাইবে সে, সেখানে? নিজের বন্য মনকেই কি সে বিশ্বাস করে? রেঙ্গুন-মৌলমিন-পেগু হইতে নিজেকে সে একদিন ছিনাইয়া আনিয়াছিল—আজ আবার উপনিবেশকেও ছাড়াইয়া যাইতে চায়? নূতন জীবনেই কি বাঁধা পড়িবে সে? নদীর মতো সে বহিয়া আসিতেছে, পুরানো চর ভাঙিয়া নূতন চরকে সে রচনা করিতেছে প্রত্যহ—মণিমোহন কি অনড় হইয়া থাকিবে সেই স্রোতের মুখে? তাহার চাইতে—

সামান্য একটু হাসিয়া মা-ফুন্ বলিল, কেন মিথ্যে পাগলামি করছ সরকারীবাবু, আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো। ঘর আছে, সংসার আছে তোমার। চরের জীবন চরেই শেষ হয়ে যাক, তার বাইরে তাকে টেনে নিতে চেয়ো না।

মণিমোহন বলিল, হুঁ।

অতি প্রত্যক্ষ দিনের আলো। প্রথম সূর্যের আলোয় নদীর মূর্তিটাকে শান্ত আর সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে। ভালো করিয়া তাকাইলে গাছপালার আভাসও সুদূর পরপার হইতে যেন হাতছানি দিয়া আহ্বান করে। সে আহ্বান এই রাক্ষসী নদীর মৃত্যু-সংকেত নয়—সে আহ্বান আসিতেছে সেখানকার বাণী লইয়া, যেখানে লাল-কাঁকরের প্ল্যাটফর্মের পাশে ছোট্ট একটি স্টেশন। কলিকাতার লোক্যাল আসিয়া মাত্র এক মিনিট দাঁড়ায়। কাঁচা মাটির পথের ধারে আমের বন ছায়া ফেলিয়াছে, আর—

বর্মী মেয়ে। রাত্রির একটি বিশেষ মুহূর্তে যে মহীয়সী, যাহার জন্য সে মুহূর্তে যত

রকম অসাধ্য সব সাধন করিয়া ফেলা যাইতে পারে, দিনের বেলায় তাহার প্রয়োজন কতটুকু। লোলুপতার উপর নিশীথের রঙ লাগিয়া তাহাকে দেহের অতীত ভাবের জগতে লইয়া যায়, কিন্তু সূর্যের আলো উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় তাহার অনাবরণ রূপ।

বর্মী মেয়ে আবার কহিল, ফিরে যাবার সময় আছে এখনো। আমার জন্তে তুমি ভেবো না। আমরা মগের মেয়ে—নিজেদের ভার নিজেরাই নিতে জানি। তুমি আমার জন্তে কেন যেচে নিন্দের বোঝা মাথায় নিতে চাচ্ছ?

মণিমোহন জোর করিয়াই হাসিল অনেকটা। বলিল, পাগল! নিয়ে চলেছি যখন, নিয়ে যাবই। নিন্দের বোঝা মাথায় বইতে আমি ভয় করি না।

সত্যিই সে ভয় করে না। এই নদী, এই পৃথিবী, এই সব মানুষ। নিন্দা-প্রশংসা এখানে সমান অর্থহীন। কিন্তু সব কিছু তো এইখানেই শেষ হইবার নয়। পশ্চিমবঙ্গের ছেলে, পাকুড়-প্যাসেঞ্জার আর ধানক্ষেতের আওতায় বাড়িয়া উঠিয়াছে, বি-এস্-সি পাস করিয়াছে, মার্জিত আর পরিচ্ছন্ন জীবনের স্বপ্ন তাহার সম্মুখে। এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে তো আর সে স্থায়ী ঘর বাঁধিতে পারিবে না। তাই এখান হইতে যখন তাহাকে ফিরিতে হইবে তাহার নিজের পরিচিত গণ্ডিতে—কলিকাতার ট্রামে-বাসে, সিনেমার আলোয় আর প্রসাধনের দীপ্তিতে উজ্জ্বল মুখগুলির মধ্যে—তখন? তখন? তখনও কি সে ভয় করিবে না?

মণিমোহন ভাবিতে লাগিল।

দুদিন পরে মণিমোহনের বোট আসিল চর ইস্‌মাইলে। কিন্তু বর্মী মেয়ে সঙ্গে আসে নাই। পথেই রাত্রে কোথায় কোন্ অবসরে যে বোট হইতে নামিয়া গেছে মণিমোহন জানিতেও পারে নাই সেটা। রাত্রির অন্ধকারে আশ্রয় নিতে আসিয়াছিল, রাত্রির অন্ধকারেই ফিরিয়া গেছে আবার। জল, জঙ্গল, অন্ধকার আর অরণ্য-প্রকৃতির আদিম বর্বরতা নিঃশেষে নিজের মধ্যে তাহাকে লুপ্ত করিয়া লইয়াছে।

কিন্তু সেটাই আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। সব চাইতে বিস্ময়কর খবর এই যে মণিমোহন ফিরিয়া আর তাহাকে খুঁজিতে চায় নাই। এ মাসে তাহাকে দশ হাজার টাকার কালেক্‌শন দেখাইতে হইবে—বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তারপরে হয়তো ছুটি মিলিতে পারে। রাণীর সঙ্গে কতদিন যে দেখা হয় নাই। নদীতে অবশ্য রোলিঙের ভয় আছে কিন্তু সেজন্য দেশের ছেলে কি দেশে ফিরিবার চেষ্টা করিবে না?

প্রকৃতি আর মানুষ। প্রকৃতি মানুষকে জয় করিবার প্রত্যাশা লইয়া বসিয়া আছে—আশা করিতেছে, আবার সেই সৃষ্টির প্রথম দিনটির মতো তাহার সন্তানকে ফিরিয়া পাইবে নিজের বুকের ভিতর। কিন্তু, কালের বেলাভূমিতে পদচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া যে

যুগ হইতে যুগান্তরের পারে চলিয়া গেছে—সে আর কোনোদিন তাহার শৈশবে ফিরিয়া আসিবে না।

বলরাম ভাবিয়াছিলেন, মুক্তো এ যাত্রা তাঁহাকে খুনের দায়েই ফেলিল বুঝি। কিন্তু পরম আশ্বাসের সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি দেখিলেন, মুক্তো মরিল না। কিছুদিন বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

ব্যাপারটা বাহিরে কেউ জানিতে পারিল না, পারিবেই বা কে? বলরাম দিনকয়েক নিজের যথাসাধ্য কবিরাজী বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া মুক্তোকে চাঙ্গা করিয়া তুলিলেন। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় এই সামান্য কয়দিনের মধ্যেই তিনি যেন অর্ধেক আয়ুক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছেন—এমন জানিলে কি আর—

মুক্তো ভালো হইয়া উঠিল, কিন্তু অদ্ভুত পরিবর্তন হইয়া গেল তাহার ব্যবহারে। এতটুকু অভিযোগ সে জানাইল না বলরামের বিরুদ্ধে, যেন কিছুই হয় নাই, সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক। অথবা জোর করিয়াই অতীতের ঘটনাটাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে সে। বলরাম অবশ্য এখনও তাহার কাছে আমল পাইতেছেন না, কিন্তু তাঁহাকে যে আজকাল সে অন্তত বাঘের মতো ভয় করিতেছে না, এইটুকু দেখিয়াই নিশ্চিন্ত হইলেন তিনি।

সন্ধ্যার দিকে বলরাম ভাবিলেন, একবার খাসমহল কাছারী হইতে ঘুরিয়া আসা যাক। যোগেশবাবু লোকটির দাবা খেলিবার সখ প্রচণ্ড। প্রথম প্রথম এখানে আসিয়া তিনি বলরামের আস্তানায় তাস খেলিয়াছেন; দাবার সঙ্গী ছিল না। তবে সম্প্রতি বলরামকেও দাবায় খানিকটা দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন—মাঝে মাঝে খাসমহল কাছারীতে গিয়া তিনি আসর জমাইয়া তোলেন।

বলরাম বাহির হইবার উপক্রম করিতে মুক্তো প্রশ্ন করিল, কোথায় যাচ্ছ?

—যোগেশবাবুর ওখানে।

—ফিরবে কখন?

—দেরি হবে!

বলরাম বাহির হইয়া গেলেন।

ফিরিলেন অনেক রাত করিয়া। দাবায় একবার জমিলে চট করিয়া উঠিয়া আসা কঠিন। তা ছাড়া খেলাটা এখনো শেষ হয় নাই। মাথার মধ্যে নৌকা, গজ আর মন্ত্রী সমানভাবে পরিক্রমণ করিতেছিল তাঁহার। কাল সকালেই আবার যাইতে হইবে। খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নাই মনে। পথে আসিতে আসিতে হিসাব করিতে লাগিলেন, ঘোড়ার আগে গজের কিস্তিটা লাগাইলে—

বাহিরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। রাধানাথ চুপটি করিয়া বসিয়া। বলরামকে ঢুকিতে দেখিয়া সে হুড়মুড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সর্বনাশ হয়েছে বাবু!

বলরাম সভয়ে কহিলেন, কী সর্বনাশ?

—দিদিমণি চলে গেছে।

—চলে গেছে! চলে গেছে কি রে!—বলরামের মাথায় যেন গোটা আকাশটাই ভাঙিয়া পড়িল সশব্দে: কোথায় চলে গেছে?

—গাজী সাহেব এসেছিল। তারই সঙ্গে।

শরীরে সমস্ত রক্ত উত্তেজনায় যেন শীতল হইয়া গেল বলরামের: ধরে নিয়ে গেছে! সশব্দে বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন তিনি—তোর চোখের সামনে থেকে মুসলমানে ধরে নিয়ে গেল তাকে? আর বসে বসে দেখলি তুই, বাধা দিতে পারলি নে? লাঠির ঘায়ে দু-একটা মাথা নামিয়ে দিতে পারলি নে মাটিতে? একটা খবরও দিলি নে আমাকে?

থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল বলরামের সর্বাঙ্গ।

কিন্তু ঘৃণা আর হতাশা প্রকট হইয়া উঠিল রাধানাথের কণ্ঠস্বরে।

—বাধা দেব কি বাবু? ইচ্ছে করেই তো চলে গেছে দিদিমণি। তোমাকে খবর দিতেও নিষেধ করলে। বললে, বাবুকে বলিস, আমি চলে গেলুম গাজী সাহেবের সঙ্গে। গলায় দড়ি! সকলের চোখের সাম্‌নে মুসলমানের সঙ্গে বেরিয়ে গেল—ছি—ছি—ছি—ছি!

বলরাম দারুমূর্তি বলরামের মতোই অনড় হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাধানাথ বলিয়া চলিল, ভয়ে তোমাকে বলিনি বাবু, দিদিমণি খুব খাতির জমিয়ে নিয়েছিল তোমার ওই গাজীর সঙ্গে। তুমি না থাকলেই গাজী যখন তখন যাতায়াত করত আর—

বলরামের মুখের দিকে তাকাইয়া কথার মাঝখানেই রাধানাথ বলিয়া গেল।

দেওয়ালের গায়ে অসম্বৃত-বসনা চীনা নারীমূর্তিটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে অদ্ভুত ভাবে। তাহার চোখে আচ্ছন্ন স্বপ্নাবেশ, তাহার মুখে লালসার মদির হাসি। কাচভাঙা ঘড়িটায় বড় কাঁটাটা কেমন করিয়া যেন বাঁকিয়া সামনের দিকে উদ্যত হইয়া আছে, আর পেণ্ডুলামের নিয়ন্ত্রিত আন্দোলনের তালে তালে হাতুড়ি ঠোকার মতো অস্বাভাবিক শব্দ হইতেছে—ঠক্—ঠক্—ঠকাঠক্—

* * * *

পৃথিবী বাড়িতেছে।

নদীর মুখে প্রতিদিন নামিয়া আসিতেছে বাংলার বুক-ধোয়া পলিমাটি, দিগন্ত-প্রসারিত নদীর নিভৃত গর্ভকোষে মৃত্তিকার ভ্রূণ-শিশু লালিত হইয়া চলিয়াছে। জন্ম

লইবে নূতন আলোয়, নূতন আকাশের নীল-নির্মল স্নেহচ্ছায়ায়।

শিশু পৃথিবী। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতো বর্বরতা লইয়া—সেদিনকার মতো উচ্ছল অসংযম লইয়া। নিজের খেলনা সে নিজেই চূর্ণ করিয়া চলিবে কয়েকদিন। সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম—এগুলি এখনও তো তাহার দূর চক্রবালেই নিহিত।

কিন্তু চর পড়িতেছে নদীতে। গঙ্গার ব-দ্বীপের প্রাণ-প্রবাহিণী শিরা-উপশিরাগুলিতে মৃত্যুর মন্থরতা। সামুদ্রিক বহুভুজের মতো, কালো কালো বাহু বাড়াইয়া দিতেছে নূতন সভ্যতা ; কলে কারখানায় বন্দী বিদ্যুতের আর্তনাদ।

শাখায় পাতায় অন্ধকার করিয়া হিংসার গুহা এই যে সুন্দরবন, এ আর কতদিন দাঁড়াইবে কুঠারের মুখে! তেঁতুলিয়া কালাবদর কিংবা রায়মঙ্গলের মুখে আর কি বানের জল তেমন পাহাড়ের মতো উঁচু হইয়া আসে? পর্তুগীজদের শেষ উপনিবেশ মিলাইয়া যায় নীলগর্ভে—সিবাস্টিয়ান্ গঞ্জালেসের রক্ত—ডি-সুজা, জোহান আর লিসি পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া গেছে। অবশিষ্ট আছে পেরিরা আর ডি-সিল্‌ভা, জমিতে লাঙল ঠেলে তাহারা, শুঁটকি মাছের ব্যবসা করে।

আরো দশ বছর পরে যারা এখানে আসিবে, তারা দেখিবে কত বড় হইয়াছে চর ইস্‌মাইল। সভ্য, শিক্ষিত মানুষ। নদী—শান্ত এবং অহিংস, এখানে ওখানে চর পড়িয়া গোটা চেহারাটাই তাহার বদলাইয়া গেছে। আর. এস. এন. কোম্পানির নূতন লাইনে স্টিমার যাতায়াত করে, ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে বসিয়া প্রেমালাপ জমায় আধুনিক তরুণ দম্পতি। শহর আর শিক্ষার প্রভাবে উপনিবেশ সমুজ্জ্বল। যদি সময় আসে তো সেদিনকার কাহিনী বলিব নূতন করিয়া।

কেবল আদিম পৃথিবীর সেই বর্বর দানবটার মৃত্যু হইয়াছে। আর কালের বালুবেলার পরপারে প্রতিদিন মিলাইয়া আসিতেছে বিদ্রোহী শিশুদের অস্পষ্ট পদচিহ্নগুলি।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

মন্ত্র-মুখর

"আসে রাত্রি মহা-বিপ্লবের,
মশাল জ্বালায়ে রাখো ঘরে ঘরে দৃপ্ত জীবনের।"

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

নির্যাতন ও কারাবাস যাঁর বিদ্রোহী প্রাণকে অবদমিত
করতে পারেনি, সেই অক্লান্ত দেশকর্মী—

মেজদা

শ্রীশেখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-কে

১

মহকুমা শহরের দুটি প্রবেশ-পথ।

একটি বেরিয়েছে আঠারো মাইল দূরের রেল-ইস্টিশন থেকে। ইস্টিশনটিও ছোট নয়—প্রকাণ্ড বন্দর, বিখ্যাত গঞ্জ। লাল কাঁকর-ফেলা রাস্তা, ব্যবসায়ীদের বড় বড় বাড়ি। থানা আছে, সার্কল-অফিসারের আস্তানা আছে। চালের কলের পুঞ্জীভূত ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন, সার্ভিস লাইনের বড় বড় মোটর-বাস গতায়াত করছে অবিচ্ছিন্নভাবে।

বড় ইস্টিশন। ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং-রুম আছে, ডেক-চেয়ার আছে, এমন কি টানা-পাখা অবধি আছে,—যদিও তার মাদুরের আধখানা কোণাকুনিভাবে ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। বিবর্ণ বার্ণিশ-ওঠা প্রসাধনের টেবিলে একখানা ফর্সা টার্কিশ তোয়ালে আর এক টুকরো সাবান সযত্নে সজ্জিত থাকে, সাহেব-সুবো বা অফিসারেরা কেউ এলে তাঁদের সাদর অভ্যর্থনার জন্যে। তবে তাঁরা কেউ অবশ্য ওই সাবান কিংবা তোয়ালে ব্যবহার করেন না, আর্দালীরা গায়ে মাথে অথবা বিলিতি কুকুরকে স্নান করায়। স্টেশন-মাস্টার তাতেই কৃত-কৃতার্থ।

এই লাইন দিয়ে দু'খানা মেল ট্রেন চলে। একখানা আসে আসামের পাহাড়ের বুকে ঘন-গর্জিত ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে, আর একখানা নেমে আসে সাপের কুণ্ডলীর মতো হিমালয়ের 'লুপ' ঘুরে ঘুরে। একখানা চলে দিনে, আর একখানা নিশাচর। দিনের গাড়িখানা থামে না, একটা বিশাল বন্যজন্তুর মতো প্রচণ্ড গতির ছন্দে নিশ্বাসের কালো বিষ ছড়িয়ে উড়ে যায় দিগন্তে—অনেকক্ষণ ধরে থর থর কাঁপতে থাকে দরজা-জানালার কাচের সার্শীগুলো। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে স্টেশনের কুলি সবুজ পতাকা দুলিয়ে তার স্বচ্ছন্দ গতিপথের নির্দেশ দেয়।

রাত্রের গাড়িখানা আসে নিষুতি প্রহরে—কাল-পুরুষের জ্যোতির্ময় মূর্তিটা যখন উদয়াস্তের কেন্দ্রপথে—ঠিক সেই সময়ে। চালের কলের কালো চিম্‌নিগুলো তখন স্তব্ধ ছায়ামূর্তির মতো নিরালা অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে—আর এখানে ওখানে দপ্‌ দপ্‌ করছে দু-চারটে ইলেকৃট্রিকের আলো। বহু মানুষের উদ্বিগ্ন-কোলাহলে ইস্টিশন মুখরিত হয়ে ওঠে। ঘট্—ঘট্—ঘটাং। লাল সিগন্যাল সরে যায়—সবুজের সংকেত জানায় সাদর আহ্বান। তার পরে আলোর শুভ্র রশ্মি-আভায় দিগন্তের কালো অরণ্য আর তমসাবৃত আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—সার্চ লাইটের জোরালো আলোয় লাইনের

ইস্পাত যেন ঝলসে ওঠে দুটো সরীসৃপের মতো, কোথা থেকে একটা আগ্নেয় তীর উড়ে এসে বিঁধে যায় এখানকার পাথর-ছড়ানো প্ল্যাটফর্মে। মাত্র এক মিনিট। তবু ওই এক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত পৃথিবীর বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়ে যায়। খবরের কাগজ নামে, নামে ডাকের ব্যাগ। আবার ঘট্—ঘট্—ঘটাং। স্টার্টারের ইঙ্গিত পড়ে,—আগ্নেয় তীরটা আবার নিক্ষিপ্ত হয় অনিশ্চিত অন্ধকারের কক্ষবদ্ধ লক্ষ্য বিন্দুর দিকে।

আস্তে আস্তে রাত শেষ হয়। ভোরের আভাসে ঘনীভূত তমসা জোলো কালির মতো ফিকে হয়ে আসে। ইস্টিশনের এখানে ওখানে যে সব পশ্চিমা কুলি নিঃসাড়ে পাগড়ির মলিন গামছাটা মাথার তলায় দিয়ে ঘুমিয়েছিল, তারা উঠে পড়ে একে একে। এবার কোলাহল শোনা যায় ইস্টিশনের বাইরে।

ভোঁপ—ভোঁপ—ভোঁপ। বাস সাড়া দিয়েছে। বাসের ছাতের ওপরে লাল-রঙের একটা মস্ত লোহার বাক্স, রয়্যাল্ মেল তোলা শেষ হয়েছে তাতে। এবার প্যাসেঞ্জারেরা ইচ্ছে করলে উঠে আসন নিতে পারে।

স্টেশনে যে-সব যাত্রী পোঁটলা-পুঁটলি আর টিনের স্যুট্‌কেস মাথায় দিয়ে ঝিমুচ্ছিল, তড়াক্ করে উঠে বসে তারা। তার পর আর এক দফা মল্লযুদ্ধ। ওঠ—ওঠ—ওঠ। ওরে বাপু, মালটা তুলে দে না ছাতের ওপর। কী বলছেন মশাই, এই ছোট স্যুট্‌কেসটা রাখতে পারব না সীটের নীচে? না—না, প্যাসেঞ্জারের অসুবিধে হবে কেন? এখানে আর কোথায় লোক নেবে দাদা, দম আটকে মারবে নাকি শেষ পর্যন্ত? যাও—যাও—ওই দু'আনাই ঢের দিয়েছি, আর জুলুম করো না। আমার হাঁড়িটা একটু দেখবেন স্যার—লাথি-টাথি মারবেন না, কালীঘাটের প্রসাদ আছে ওতে। আরে—রহমান সাহেব যে! আবার এখানেই বুঝি পোস্টেড হয়ে এলেন? এই বিড়ি পান, চার পয়সার খিলি পান দে যাও। ভোঁদা যদি আবার ছট্‌ফট করবি—তা হলে এক চড়ে কান ছিঁড়ে দেব। ওগো, ঘিয়ের বোয়ামটা নীচে দিতে বলো, ওপরে দিলে ওতে আর বস্তু থাকবে না। বাপধন ড্রাইভার—আর ভোঁপু বাজিয়ো না দয়া করে, গাড়িটা এবারে ছাড়ো, দম আটকে যে গেলাম!

পাঞ্জাবী ড্রাইভার পেছনের দিকে মুখ ফেরায়। দুটো বিশ্লেষণী চোখের দৃষ্টির সাহায্যে অনুমান করে নেয় যাত্রীদের অবস্থা অন্ধকূপ-হত্যার ঠিক পূর্বাধ্যায়ে পৌঁছেছে কি না। তার পর হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করে: এ ইন্দুরবাবু, সব টিক আছে?

ইন্দুর বাবু অর্থাৎ ইন্দ্রবাবু বাসের কণ্ডাক্টার। পাঞ্জাবী প্রোপ্রাইটরের স্বল্প বৈতনিক কেরানী। শুকনো ইঁদুরের মতোই চেহারা, রোগা মুখের লম্বা লম্বা বিশৃঙ্খল গোঁফগুলো দু'পাশে খাড়া হয়ে আছে। সেলুলয়েডের কালো ফ্রেমে আঁটা গোল চশমাটা মুখের ওপরে কেমন বেমানান বলে মনে হয়।

ইন্দুর বাবুর তখন গলদ্‌ঘর্ম অবস্থা। বাস ছাড়বার আগেই যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়ার টাকাপয়সা আদায় করে নিতে হবে। কিন্তু নিজের কীর্তির কৃতিত্বে ইন্দুর বাবু ত্রিশঙ্কুত্ব লাভ করেছেন। তারস্বরে চিৎকার করে সাদর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি—এই যে চলল বাস নিশ্চিন্ত নগর, একদম খালি গাড়ি—

আহ্বানে আশার অতিরিক্ত সাড়া মিলেছে তাঁর। মুরগীর খাঁচার মতো বাসে বোঝাই হয়েছে খালি গাড়ির প্রলুব্ধ যাত্রীদল। তার ভেতর দিয়ে পথ করে অগ্রসর হচ্ছেন ইন্দুর বাবু। কিন্তু অগ্রসর? কখনো শূন্যে ঝুলে, কখনো যাত্রীদের হাঁটুর তলায় হামাগুড়ি দিয়ে, আবার কখনো বা হাতাহাতি যুদ্ধের নীতিতে। বিকচ্ছ অবস্থা, বস্ত্রখণ্ডের এক প্রান্ত পেছনের একটা টিনের স্যুট্‌কেসের হ্যাণ্ডেলে লটকে আছে। যেন স্রোতের মুখে উদ্দাম নৌকো বাঁধা পড়েছে নোঙরে।

—আপনার ভাড়াটা দাদা—শুনছেন—

দাদা অনুজের দিকে ভ্রূকুটি-ভয়াল মুখে তাকালেন।

ভাড়া যে দেব মশাই হাত বের করবার জায়গা রেখেছেন? বলি আমাদের কি শূয়োর-ভেড়া পেয়েছেন যে এমনি করে গাদাচ্ছেন একসঙ্গে?

ইন্দুর বাবুর গাল দিয়ে টস টস করে ঘাম পড়ছে। দু'দিকের চাপে চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে, ইন্দুরের মতো মুখখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে ছুঁচোর মতো। বললেন, কী করবেন দাদা, সবাইকেই তো যেতে হবে—

—এই ভাবে যেতে হবে! কিন্তু তা হলে আর পৌঁছুতে হবে না,—গাড়িতেই—আর একজন রসিক ব্যক্তি মন্তব্য করলেন, একেবারে বৈতরণী পেরিয়ে যেতে হবে। নিশ্চিন্তনগর নয়, নিশ্চিন্তপুর—

চাপে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, বিনয় করেও ইন্দুর বাবুর হাসবার অবস্থা নয়। তবু বড়লোকের ছেলে গরীবের বাড়িতে পাত্রী দেখতে এলে মেয়ের বাপ যেমন করে একটা প্রাণান্তিক হাসি হাসে, তেমনি করে একটা মোহিনী হাসি হাসবার চেষ্টা করলেন ইন্দুর বাবুঃ গাড়ি ছাড়লেই একটু ঠাণ্ডা লাগবে, হাওয়া আসবে কি না।

—কিন্তু হাওয়া আসবারও তো একটু জায়গা চাই মশাই।

কাছায় এমন টান পড়েছে যে, নৌকোর নোঙর বুঝি ছেঁড়ে। এক হাতে সেটাকে টানতে টানতে সামনে ড্রাইভারের আসনের দিকে বাঁকা চোখে তাকালেন ইন্দুর বাবু।

—কী করব দাদা—চাপা-গলায় ফিস্‌ফাস করে বেরিয়ে এল বিশ্বস্ত কণ্ঠস্বর : ওই ড্রাইভার ব্যাটা—ওরাই তো মালিক। ওরা যত লোক চাপাতে বলবে তত চাপাতে হবে। আমরা মাইনের চাকর—

—দাড়ি উপড়ে দাও ড্রাইভারের।—একজনের সরোষ মন্তব্য, কিন্তু সজোর নয় :

আমরা মানুষ নই না কি ?

রসিক ভদ্রলোকটি বললেন, আপনারা প্যাসেঞ্জার। প্যাসেঞ্জার আর মানুষের ডেফিনিশন আলাদা মশাই—ট্রেনে দেখতে পান না ?

—আইন বলেও তো একটা জিনিস আছে। টু সীট্, সিক্সটিন—কিন্তু এ কী !

—আইন ! এবারে এত দুঃখেও হাসলেন দাদা।

ভোঁপ—ভোঁপ। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ভেঁপু। সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা অনিবার্য শারীরিক নিয়মে ইন্দুর বাবুর গলা থেকে বাঁধা স্বরে বেরিয়ে এল : এই যে চলল নিশ্চিন্ত-নগর, একদম খালি গাড়ি—

—চুপ করুন মশাই। খালি গাড়ি ! কানের কাছে ও-কথা আর একবার হাঁকড়াবেন তো মাড়ি উড়িয়ে দেব।

ছুঁচোর মতো মুখ মুহূর্তে ছোট হয়ে গেল আরশোলার মতো।—কী করব দাদা, পেটের দায়ে—বোঝেন তো—

—এ ইন্দুর বাবু, ঠিক আছে ?

—ঠিক আছে পাঁইজী। গাড়ি ছেড়ে দাও। কই দাদা, আপনার পয়সাটা—

ভোঁপ ভোঁপ। ঘর্মাক্ত দেহে কাছা গুঁজতে গুঁজতে ইন্দুর বাবু চলে এসেছেন দরজাটার কাছে। হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে বললেন, চলল মশাই নিশ্চিন্তনগর, খালি গাড়ি—

—খালি গাড়ি !—মাড়ি ওড়ানো প্যাসেঞ্জারটি ঘুষি বাগাবার আগেই ইন্দুর বাবু লাফিয়ে পড়েছেন নীচে : আচ্ছা আসুন দাদা—নমস্কার।

স্টার্টারে চাপ পড়েছে গাড়ির, পুরোনো বাসের জীর্ণ দেহ ঝর ঝর করে নড়ছে। তার পরেই দু'পা ব্যাক করে একটা বাঁক নিয়ে সোজা এসে পড়ল পি-ডবলু-ডির কালো পীচের রাস্তায়। ইন্দুর বাবুর কথা মিথ্যে নয়—বাইরে থেকে এক ঝলক সকালের মিষ্টি হাওয়া এসে যেন যাত্রীদের সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিয়ে গেল।

—আঃ, বাঁচলাম মশাই। এখন গিয়ে পৌঁছুব ভরসা হচ্ছে।

—দাঁড়ান দাদা, আর একটু দাঁড়ান। এই লক্কড় গাড়িতে যা লোক তুলেছে, মরা নদীর ব্রীজের ওপরে উলটে না গেলে বাঁচি।

কিন্তু ও আশঙ্কা যাত্রীদের সত্যিই নেই। আজ বিশ বছর ধরে এই পথ দিয়ে এমনি নিয়মিতভাবে বাস চলেছে, ও রকম দুর্ঘটনা কখনো ঘটেনি। এটা শুধু কথার কথা—হাল্‌কা একটা পরিহাস মাত্র। পি-ডবলু-ডির পথ দিয়ে বাস এগিয়ে চলবে তার অভ্যস্ত নিয়মে, কালভার্ট, মাইল পোস্ট, ধানের ক্ষেত আর টেলিগ্রাফ তারের অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী পার হয়ে যথাসময়ে গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌঁছুবে। চাপাচাপিতে সামান্য

কষ্ট ছাড়া এই পথটুকু যাত্রীদের নেহাৎ মন্দ লাগে না। ট্রেন থেকে বাইরের জগৎকে যেমন একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন এবং নিজেদের অত্যন্ত দূরবাসী বলে মনে হয়, বাসের বেলায়, অন্তত এই বাসের বেলায় তা বোধ হয় না। সব চেনা, সব জানা, সব প্রত্যেক দিনের পরিচিত। এই ইস্কুল বাড়িটা—তারপরে: চোখ বুজে মুখস্থ বলার মতো যে কোনো প্যাসেঞ্জার আবৃত্তি করে যেতে পারে: তারপরে দুটো ধানের আড়ত ছাড়ালে আসবে হাটখোলা—তাঁতিদের একটা বস্তি। পথের পাশেই বড় বড় বাঁশের খুঁটিতে নানা রঙের সুতো টানা দেওয়া। তারপর ক্রমশ বাঁধের মতো উঁচু হয়ে উঠতে উঠতে গাড়িটা চড়বে মরা নদীর ব্রীজে। একদিন খরস্রোতা ছিল—আজকে কঙ্কাল। দু-তিনটে ছোট ছোট ধারা বিকীর্ণ বালুশয্যার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে আছে—নীল শ্যাওলায় ঢাকা। মাঝখানে চরের ওপরে ঘন কাশের বন। তারপর টানা পীচের পথ। আম জাম শালের ছায়া, ধানের ক্ষেত, বিল, সাঁওতাল রাজবংশীর গ্রাম—ছোট ছোট দুখানা হাট। পাশের কাঁচা রাস্তায় কখনো গরুর কখনো বা একটা মোষের গাড়ি। কালো জামের ডালা মাথায় কালো সাঁওতাল মেয়ে, ধানের বস্তার বাঁক কাঁধে ম্যালেরিয়া-পীড়িত বাংলার চাষা। পুরোনো বটগাছের নীচে সিঁদুর লেপা কালীর থান। তারপরেই চৌধুরী সাহেবের ল্যাংড়া আমের বড় বাগানটা—সেটা ছাড়ালেই লাশ কাটা ঘর, ছোট ছোট একতলা বাড়ির পত্তনি। মহকুমা শহর নিশ্চিন্তনগর।

পীচের রাস্তা পেরিয়ে গিয়ে এবার মফঃস্বল শহরের পাথুরে পথ। উঁচু উঁচু খোয়াতে নড়বড়ে বাসে ঝরাং ঝরাং করে ঝাঁকুনি। এঞ্জিনের সামনে জল ঢালবার মুখটা দিয়ে ভস্ ভস্ করে গরম ধোঁয়া উঠছে—যেন ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলছে গাড়িটা। তারপরে উকিল সারদা চক্রবর্তীর দেওয়াল দেওয়া লিচু বাগানের পাশ দিয়ে বাঁক নিলেই শহরের বাজার। বাস স্ট্যাণ্ড,—আউট এজেন্সির অফিস, চা আর খাবারের দোকান। যাত্রা শেষ।

ভোঁপ—ভোঁপ—ভোঁপ—

মফঃস্বল শহরের নির্জীব কুলির দল হাই তুলে একে একে এগিয়ে আসে বাসের দিকে। তাড়া নেই, তাগিদ নেই কিছু। পথের শেষ, ধীরেসুস্থে নামালেই হবে।

—কুলি লাগবে বাবু, কুলি?

—কোন্ পাড়ায় যাবেন হুজুর? টমটম চাই?

—এক্কা হোগা হুজুর, এক্কা?

বাসের মধ্যে মুখরতা: ওরে ভোঁদা, জুতোটা কোথায় ফেললি হতভাগা? তুমি একটু ঘিয়ের বোয়ামটা ধরে নাও না গো—মেয়েটাকে কাঁখে নিয়ে কতদূর সামলাই আমি? হুড়োহুড়ি কোরো না বাপু, ধীরেসুস্থে নামো। এই কুলি—ছাতের ওপরে

বড় চামড়ার স্যুট্‌কেসটা—। ছাতাটাকে অমন বেয়নটের মতো ধরবেন না মশাই, একটু হলেই আমার চোখের দফা সেরে দিয়েছিলেন আর কি! হাঁড়িটা একটু দেখবেন দাদা—কালীঘাটের প্রসাদ আছে ওতে—

কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই সব নীরব। এবার সত্যিই খালি গাড়ি। সকালের রোদে শূন্য বাসটা নিঝুম হয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

মহকুমা শহরের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগসূত্র রাখে এই পথ। কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই। বাইরের মানুষ, বাইরের চিন্তাধারা। অভিজাত, অফিসার, ব্যবসায়ী, এমন কি তানসেনগুলির এজেন্ট। সভ্যতার সযত্ন-চিহ্নাঙ্কিত পি-ডবলু-ডির কালো পীচের পথ। তোমার জন্যে, আমার জন্যে, আরও দশজন ভদ্র সন্তানের জন্যে। কিছু এ ছাড়া আর একটা পথ আছে। সেটা বাইরের নয়—একান্তভাবে অবহেলিত। তুমি, আমি আরো দশজন ভদ্রসন্তান যারা শহরে থাকে সে পথ তাদের চেনা নয়!……

…শহরমাত্রেরই শহরতলী থাকে, ছোট মহকুমা নিশ্চিন্তনগরের পক্ষেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। খোয়া-ওঠা রাস্তাও এ পর্যন্ত আসতে সঙ্কোচ বোধ করছে। দু'পাশে খোড়ো ঘরগুলো অসহায় দারিদ্র্যে ভেঙে নামবার উপক্রম। যারা বাসিন্দা, তাদের কেউ কুলি খাটে, কেউ বা টমটম চালায়, কারো বা গোরুর গাড়ি আছে।

শহরের এই প্রত্যন্ত দিয়ে যে পথটা চলে গেছে, তার দিকে একবার তাকাও। পি-ডবলু-ডির পীচের রাস্তার এখানে কল্পনাও করতে পারবে না। অসংখ্য গোরুর গাড়ির ছন্দোহীন চলায় মাটি একেবারে শতধাদীর্ণ হয়ে গেছে—কোথাও গর্ত, কোথাও জল। মোটর কিংবা বাস এ পথে আসবার দুঃসাহস করলে কর্ণের রথচক্রের মতো মেদিনী তাকে গ্রাস করবে।

এই পথ চলে যায়নি রেলস্টেশনের দিকে। চলে যায়নি সেদিকে—যেখানে দ্রুতগামী মেল ট্রেন থেকে ডাকের ব্যাগ নামে, নামে নিখিল বিশ্বের অসংখ্য বার্তা। যেখান থেকে কলকাতা মাত্র আট ঘণ্টার মেয়াদ—এ পথ তার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে —যেন জোর করেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে মহা পৃথিবীর স্পর্শ থেকে।

এখান দিয়ে ভারমন্থর গোরু-মোষের গাড়ি চলে। ধুলোভরা পা নিয়ে দেহাতী মানুষ বহুদূর থেকে হেঁটে আসে,—ধান বিক্রি করতে, মোকর্দমা করতে, রেজেস্ট্রী আফিসে, শহরের বাজারে। চিরনিদ্রাতুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চিরন্তন রাস্তা—প্রকৃতির করুণাতেই একান্তভাবে সমর্পিত।

দুধারে মাঠ চলেছে আদি-অন্তহীন বিস্তারে। পাশে পাশে গ্রাম—অযত্নবর্ধিত ঝাঁকড়া আমের গাছ। শ্যাঁওড়া—বাবলা, বাঁশ; ঝুরি নামানো বটের বিস্তীর্ণ ছায়ার নীচে পোড়া মাটির ভাঙা উনুন, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানেরা ফ্যানসা ভাত আর

পেঁয়াজের তরকারী রান্না করে খেয়েছে। মজাদীঘির উঁচু পাড়ি—তার ওপরে তালগাছ দাঁড়িয়ে দিগন্তের প্রহরায়; মাথায় শকুন বসে আছে—সাপের মতো গলা উঁচু করে দুরবীনের মতো শানানো চোখ দিয়ে লক্ষ্য করছে কোথাও পড়ে আছে কিনা মরা গোরু।

ধূ-ধূ মাঠ—লোকে বলে, 'ভাতারমারীর মাঠ'। মরা কয়েকটা বাবলাগাছ ছাড়া একটি ছায়াতরু নেই কোনোখানে। গল্প আছে, এক চাষা দুপুরের রোদে মাঠে কাজ করতে করতে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিল। বৈশাখের রৌদ্রে পিপাসায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে, অথচ একবিন্দু জল নেই কোথাও। দূরগ্রাম থেকে তার স্ত্রী ভাত নিয়ে আসে, সেদিন কী কারণে আসতে বেচারার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর যখন প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত, এমন সময় দূরে দেখা গেল স্ত্রী ভাত নিয়ে আসছে। আকুল হয়ে চাষা হাতের পাঁচনবাড়ি দেখিয়ে তাকে সংকেত করতে লাগল—তাড়াতাড়ি আয়।

কিন্তু স্ত্রী বুঝলে সম্পূর্ণ উল্টো। সে ভাবলে তার আসতে দেরি হয়েছে দেখে স্বামী তাকে শাসাচ্ছে, কাছে এলে তার পিঠে ভাঙবে পাঁচনবাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে সে পেছন ফিরে দৌড় দিলে। স্বামী যত কাছে আসবার জন্যে আকুলি-বিকুলি করে, সে তত প্রাণপণে ছোটে। ফলে যা হওয়ার তাই হল। খানিক পরে স্বামী সেই যে আছড়ে পড়ে গেল মাটিতে—আর উঠল না। স্ত্রী যখন ব্যাপারটা বুঝলে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে—সেই থেকে এই দিক্‌বিস্তীর্ণ মাঠের নামকরণ হয়েছে 'ভাতার মারীর মাঠ'।

এই মাঠের মধ্য দিয়ে নিশীথ রাত্রে যখন গাড়ি চলে, তখন গাড়োয়ানদের বুক একটা অজানা আশঙ্কায় টলমল করে। তরল অন্ধকারে তারা যেন বহুদিন আগেকার একটা বিস্মৃত বিয়োগান্তক নাটকের অভিনয় দেখতে পায় এখানে। যেন গোঁ গোঁ করে কে আর্তনাদ করছে যন্ত্রণাবিকৃত গলায়: একটু পানি দে বউ, একটু পানি। মরে গেলাম, বুক জ্বলে গেল, একটু পানি—

তাড়াতাড়ি গোরুর পিঠে পাঁটা বসায় তারা। প্রয়োজনের চাইতে বেশি গলায় জোর দিয়ে বলে, চল্‌-চল্‌! আঃ, শালার বলদ হাঁটে না ক্যানে হে!

এই মাঠখানা পেরোলেই মনসা কাঁটা আর বুনো ঝোপ-ঝাড় হঠাৎ পথখানাকে আচ্ছন্ন করে দেবে। তারপরে আর রাস্তা নেই। এখান থেকে গাড়িটা গড় গড় করে অনেকখানি নীচে নেমে গিয়ে সোজা পড়বে বালির ওপরে। প্রায় আধ মাইল বালির ডাঙার ভেতর দিয়ে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে আর বহু কষ্টে চাকা টেনে টেনে গাড়ি নিয়ে যেখানে পৌঁছুবে—সেখানে ক্ষীণ অথচ খরস্রোতা উত্তর বাংলার পরিচিত

পাহাড়ী নদীর ওপরে খেয়াঘাট। লোকে বলে, রঙীর ঘাট।

রঙীর ঘাট। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সম্পত্তি—ইজারা নিয়েছে পশ্চিমা ব্রাহ্মণ বিন্ধ্যেশ্বরী সুকুল। একটা চোখ কানা, তাই লোকে তাকে কানাঠাকুর বলে ডাকে। মসৃণ করে কামানো মাথা, তার ওপর টিকিটি কেটে নেওয়া ধানগাছের গোড়ার মতো খাড়া হয়ে আছে। ঘাটের একপাশে একখানা মাচাং বেঁধে নিয়েছে সে—তার ওপরে বসে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে, চৈতনটির সযত্ন পরিচর্যা করে আর গাড়ির পারানি আদায় করে।

দুখানা খেয়া নৌকো বিন্ধ্যেশ্বরী সুকুলের। ঠিক দুখানা নয়—দুখানা দুখানা চারখানা। দুটো করে বড় নৌকো একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে তার ওপরে বাঁশের 'ফরাস' পেতে গোরুর গাড়ি পারাপারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এক-একবারে সাত-আটখানা করে গাড়ি পার হয়। মহিষ আর বলদ সাঁতরে পার হয় নদী। তবে সব সময় সাঁতরাবার দরকার হয় না, গরমের দিনে হেঁটেই পাড়ি জমানো চলে।

তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে বটে, কিন্তু এদিকে নজরটি ঠিক আছে কানাঠাকুরের।

—তিনখানা গাড়ি তোমাদের। আঠারো আনা।

—আর আঠারো আনা?—গাড়োয়ানেরা বোকার মতো হাসে, তুষ্ট করবার চেষ্টা করে : এই একটা টাকাই ধরে দিনু ঠাকুর মশাই, লিয়ে লাও।

—উঁহু, হবে না। সরকারী রেট বাঁধা আছে।

—লে বাপ, ক্যানে ঝ্যামেলা করেক খামেখা? গোটা টাকাটা ধরি দিনু, দু'গণ্ডা পয়সার লেগ্যে এমন করেন না বারে।

—নেহি, নেহি, আঠারো আনা।—জোর দিয়ে কানাঠাকুর বলে : আঠ্‌ঠেরো আনা। পৈসা নিকালো।

—দে না বা, দু'গণ্ডা পাইসা বিড়ি খাবা দিলে তুমার কি হেবে?

—হোবে না।—রামায়ণ পড়তে পড়তে চোখের পাতা ভিজলেও এ ক্ষেত্রে কানা-ঠাকুরের মন ভেজে না। শেষ পর্যন্ত আর এক আনা পয়সা দিলে তবে রফা হয়।

তবু ঘাটোয়াল কানাঠাকুর লোক খারাপ নয়। বাস কোম্পানি বা রেল-কোম্পানির মতো নিছক অর্থকরী সম্পর্কটাই সত্য নয় এখানে। খাতিরের লোককে বিনা পয়সাতেও পার করে দেয় কানাঠাকুর, একসঙ্গে বসে এক কল্‌কেতে গাঁজাও খায়। কুশল আদান-প্রদানও চলে মাঝে মাঝে।

—তোমার মুলুকের খবর কি ঘাটোয়াল?

—আর খবর! কানাঠাকুরের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে হয়তো : খত পাইলাম, হামার তিনটা ভৈঁসা মরিয়ে গিছে। মনটা বড় খারাপ হইয়ে আছে ভাই।

—তিনটা ভৈঁসা মরি গেইছে! আহা—হা চুক্-চুক্! শ্রোতার কণ্ঠে সমবেদনার

সুর : বড় খারাপ খবর ঘাটোয়াল ভাই।

—হাঁ, বড় খারাপ খবর, কানাঠাকুরের চোখ ছল-ছলিয়ে ওঠে : কিন্তু কী করা যাবে ভাই, সব নসীব। ভগবান রামচন্দ্রজীর যো হিচ্ছা হোয়—

—সে তো বটেই, সে তো বটেই। ল্যাও ভাই—একটা বিড়ি ল্যাও। ভাল কথা, আমাকে একটু মহাবীরজীর পরসাদ দিয়ো ভাই। বিটিটার ব্যামার কিছুতেই ছাড়োছে না।

রঙীর ঘাট পার হয়ে সার বেঁধে গাড়িগুলো এগিয়ে চলে গ্রামের দিকে। গ্রাম—ধানের মাঠের মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন শ্রীহীন বাংলার গ্রাম। কখনো কখনো এক একটা ছোট গঞ্জ, এক-একটা নগণ্য হাটখোলা। ভাঙা মন্দির, ভাঙা মসজিদ। বটের শিকড়ে-শিকড়ে সহস্র পাকে জড়ানো দীর্ঘ বিদীর্ণ পীরের দরগা, পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ।

এমন একদিন ছিল, যখন বাংলার সভ্যতা নগর-প্রাণ মাত্রই ছিল না। দেশের অন্ত্যপ্রত্যন্তে সে নিজেকে বিস্তীর্ণ করেছিল, বিকীর্ণ করেছিল। বরেন্দ্রভূমির মাটির প্রত্যেকটি ধূলিকণায় অতীতের কঙ্কাল তার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু সে রাম নেই—সে অযোধ্যাও নেই। যে যুগে রেলগাড়ি ছিল না এবং যন্ত্রচক্রের দ্রুত গতিতে কলকাতা—দিল্লী বোম্বাই—ছাড়িয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের পৃথিবী রয়টারের মারফৎ মানুষের কাছে এসে পৌঁছোয়নি, সে যুগে মানুষ নিজের দেশকে চিনত, নিজের দেশের মানুষকেও জানত। কেন্দ্রীভূত সমৃদ্ধি নয়—সর্বময় পরিব্যাপ্তি। কিন্তু যদুপতির মথুরাপুরী নেই, রঘুপতির উত্তর কোশলও নিশ্চিহ্ন! সেদিনের মহাস্থান আজ ধ্বংসাবশেষ, সে যুগের কোটিবর্ষ আজ আত্মবিস্মৃত। বহির্মুখী নগর আজ একচক্ষু হরিণের মতো তাকিয়ে আছে কোন্ শূন্য দিগন্তের দিকে? অথচ তার চতুর্দিকে প্রসারিত যে বাংলাদেশ—লজ্জায় দুঃখে দুর্ভিক্ষে যা কালের প্রহর গুণে চলেছে, সেখানে অলক্ষ্যে কোন্ যে মৃত্যুবাণ শাণিত হচ্ছে সে খবর আজও তার কাছে এসে পৌঁছোয়নি!

কিন্তু গোরুর গাড়ি চলেছে, চলেছে পায়ে হেঁটে মানুষের দল। গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে গ্রামে। আসছে ধান-চাল-পাট। মন্থরগামী গোরুর গাড়ির বহু ক্লেশে বয়ে আনা প্রাণ-সঞ্চয়ের স্রোতে একদিন যদি ভাঁটা পড়ে, তা হলে হাহাকার উঠবে শহরে। হাহাকার উঠবে মোটর বাসের যাত্রীদের মধ্যে।

বিভিন্নমুখী দুখানা গোরুর গাড়ি। একখানা শহর থেকে আসছে শূন্য হয়ে, আর একখানা বোঝাই নিয়ে যাচ্ছে শহরে।

—কত করি ধানের ভাও দেখি আলেন শহরৎ?

—দেখি তো আনু পাঁচ টাকা করি।

—পাঁচ টাকা! অ্যাতে দর ক্যানে চড়ছে কহিবা পারেন?

—ক্যামন করি কহিব বারে। মহাজন যে দর দিবা চাহিবে, ওই দরই তো নিবা নাগিবে। ভালোই তো হৈল্—দর বাড়িলেই—

—না বারে, মোর মনে ভালো ঠ্যাকোছে না।

গাড়ি দুটোর ব্যবধান বেড়েই চলেছে ক্রমশ। পরস্পরের কাছে পরস্পরের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। চাকায় চাকায় লাল ধুলোর ঝড় ওঠে। তালগাছের মাথা থেকে শোনা যায় শকুনের পাখার ঝাপট। উজ্জ্বল রৌদ্রে মাঠের ওপর জ্যোতির্ময় পতঙ্গের মতো রাশি রাশি শিমুলের তুলো ওড়ে। চটাস্ চটাস্ করে ল্যাজের ঘা দিয়ে গোরুগুলো পিঠের ওপর থেকে ডাঁস তাড়ায়।

—হাঁট হাঁট, মহামাই। বড পিয়াস নাগিছেরে, ঝট করি ঘরত্ চল্ বা—গোরুকে সাদর আর অন্তরঙ্গ সম্ভাষণ, সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজে একটি প্রচণ্ড মোচড়। ল্যাজ তুলে ছুটতে শুরু করেছে গোরু। আর বেশি দেরি নেই, এই মাঠখানা ছাড়ালেই বাঁ হাতে কাঁচা রাস্তায় এগিয়ে তার গ্রাম। তার বিশ্রাম, তার সংসার, তার প্রেম, তার দুঃখ।

পিছনে টানা-রাস্তা ধুলোয় অন্ধকার হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে মহকুমা শহর নিশ্চিন্ত-নগর পর্যন্ত। অনাদৃত পথ, ভুলে যাওয়া পথ। শহরের খিড়কি দুয়োর পর্যন্ত সীমানা। নিভৃত অথচ অনিবার্য পঞ্চ গৌড়ের প্রাণ-প্রবাহিকা।

আর এই দুটি পথের কেন্দ্রস্থলে হচ্ছে মহকুমা শহর নিশ্চিন্তনগর। অনগ্রসর জেলার অনগ্রসর মহকুমা। যতটুকু অনুমান করা যায়, ঠিক ততটুকুই—তার বেশি কিছুই নয়। কয়েকখানা কোঠাবাড়ি, কিছু টিনের ঘর, বাকি খড়ের এবং খোলার। খোয়া-ওঠা সরু সরু রাস্তা। আধভাঙা ড্রেনে পচা জল জমে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। শহরের আনাচে-কানাচে জঙ্গল, আবর্জনা ছড়ানো একফালি পোড়ো মাঠ। মিউনিসিপ্যালিটির অচল টিউবওয়েল, কোনো এক ভূতপূর্ব সব-ডিভিশনাল অফিসারের নামাঙ্কিত রিং-ভাঙা ইঁদারা। পুরোনো থিয়েটার হলের জরাজীর্ণ টিনের চালায় নতুন টকী হাউস,—যেখানে সগৌরবে প্রদর্শিত হচ্ছে হাতী পিকচার্সের রোমাঞ্চকর ছবি 'চাবুকওয়ালী'। বাজার, মুদীখানা, কাপড়ের গদী, মনোহারী স্টোর্স—বেনেতি মশলার দোকান; খাপ্‌রার ঘরে তেপায়া টেবিল আর হাতল-ভাঙা চেয়ার সাজিয়ে চায়ের স্টল—বাইরে বিবর্ণ সাইন্‌বোর্ড: দি গ্র্যাণ্ড নিশ্চিন্তনগর র্যাস্তরাঁ।

ঠিক এইখান দিয়ে শহরটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। শহরের প্রান্তচারিণী নদীটি থেকে ছোট একটি শাখা এসে যেন ঠিক মাঝখান দিয়ে টেনে দিয়েছে ব্যবধানের সীমারেখা। মশকগুঞ্জিত খানিকটা বিচ্ছিন্ন জল আর জঙ্গলের ওপর দিয়ে লোহার পুল। মোটর চলতে পারে—বাস চলতে পারে এই পুলের ওপর দিয়ে—মহকুমা শহরের একটা গৌরব বিশেষ।

পুল পেরিয়ে গেলে শহরের অভিজাত অঞ্চল।

বাংলো প্যাটার্নের কয়েকখানা মনোরম বাড়ি, সামনে ফুলের বাগান। ছেলেদের হাই স্কুল, মেয়েদের এম-ই ইস্কুল। ত্রিলোকেশ্বর শিব আর মহামায়ার পুরোনো মন্দির। পোস্টাপিস, সাব-রেজিস্ট্রি, মুন্সেফ আর সাব-ডিভিসন্যাল অফিসারের আদালত, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের একটা শাখা। উকিল আর অফিসারের ক্লাব—আড়াইশো বইয়ের পাবলিক লাইব্রেরী। তার ওপারে নদী, স্নানের ঘাট—একরাশ নৌকো, জেলেদের গ্রাম, শ্মশান-ঘাট। মহকুমা শহর নিশ্চিন্তনগরের সীমানা।

তর্কটা জমে উঠেছিল পাবলিক লাইব্রেরীর বারান্দায়।

আসরে উপস্থিত ছিলেন অনেকেই। কালির দাগ আর চায়ের কাপের বাদামী রেখায় চিহ্নিত ওভ্যাল-শেপের পুরোনো সেক্রেটারিয়েট টেবিলের চারপাশে খানকয়েক চেয়ার। সকালের বাসে খবরের কাগজ এসে পৌঁছেছে, তারই খান তিনেককে কেন্দ্র করে রসনা-সংগ্রামের সূত্রপাত।

উকিল পূর্ণবাবু টেবিলে কিল মেরে বললেন, ওসব জানি না মশাই। সোজা যেটুকু বক্তব্য তা সেবাগ্রাম থেকে অনেক আগেই বলে দেওয়া হয়েছে।

ইস্কুল মাস্টার রমাপদবাবু বললেন, অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ, কুইট ইণ্ডিয়া। পলাশীর পর থেকে অনেককাল তো ইজারা ভোগ করলে বাপু, আর কেন ? প্রভু, এবারে দয়া করে চাঁটিবাটি তোলো।

রমাপদবাবুর মুখে ব্যঙ্গের সুতীক্ষ্ণ হাসি : চাঁটিবাটি তুলবে বলে মনে করেন আপনি ?

—নিশ্চয়, কেন তুলবে না ?—পূর্ণবাবুর কণ্ঠ জ্বালাময়ী : না তোলে, তোলাতে হবে।

—ওঃ, তোলাতে হবে।—রমাপদবাবু স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। মিটল একটা প্রকাণ্ড দুর্ভাবনা।

পূর্ণবাবু চটে গেলেন।

—এ কথার মানে কি মশাই ? আপনি কি বলতে চান যে স্বরাষ্ট্র শাসনের অধিকার আমাদের আজো হয়নি ? জানেন, সেদিন লুই ফিসার কী বলেছেন ?

—লুই ফিসার আমেরিকার মানুষ, কাজেই তাঁর গায়ে লাগবার কথা নয়। যার

ল্যাজে পা পড়ে, সে-ই টের পায়! জন-বুলের আসল কথাটা যদি জানতে চান, তাহলে তথাকথিত সোশ্যালিস্ট-পুঙ্গব এইচ. জি. ওয়েল্‌স স্যার হরিশঙ্কর গৌরকে যে চিঠিটা লিখেছেন দয়া করে সেটা পড়ে দেখবেন।

—আরে রাখুন মশাই—ওসব ছেড়ে দিন। কথায় আর চিঁড়ে ভেজে না আজকাল। অ্যামেরি থেকে শুরু করে সব শেয়ালই তো এক রা ধরেছে। যা করবার আমাদের নিজেদেরই করতে হবে, প্রমাণ করতে হবে যে—

কথাটা কেড়ে নিয়ে রমাপদবাবু বললেন, প্রমাণ করতে হবে যে আমরা সাবালক? ক্রীপ্‌সের চুষি-কাঠিতে আর ভুলছি না? তাহলে প্রমাণটা দয়া করে করুন।

—করবই তো। উত্তেজিত পূর্ণবাবু চশমাটা খুলে রাখলেন টেবিলের ওপর। সামনের বাঁধানো দাঁত দুটো এমনভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠল যেন তারা ছিটকে বেরিয়ে যাবে।

—করবই তো। দাঁড়ান না মশাই, ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংটা একবার শেষ হোক। যে রেজোলিউসন আমরা নেব—

সার্কেল অফিসার বিনোদবাবু এক কোণায় বসে চুরুট টানছিলেন। একটু নিদ্রাতুর মানুষ, পাঁচ মিনিটের জন্যেও কোথাও গা এলাতে পারলে সেই ফাঁকে ঝিমিয়ে নেন। আজো চিরাচরিত অভ্যস্ত নিয়মে বিনোদবাবুর চোখ দুটি বুজে আসছিল আস্তে আস্তে। মুখটা একটুখানি ফাঁক হয়ে সবে নাসারন্ধ্রে গম্ভীর গুরুধ্বনি নিঃসৃত হবে, ঠিক সেই মুহূর্তেই চুরুটের ইঞ্চিখানিক পোড়া ছাই ছ্যাঁক করে বুকের ওপর পড়ল। হাত-পা ছুঁড়ে ধড়-ফড় করে খাড়া হয়ে বসলেন বিনোদবাবু।

—অ্যাঁ—প্রকাণ্ড মুখগহ্বর থেকে একটা অলৌকিক শব্দ বেরুল: কী বলছিলেন পূর্ণবাবু!

হঠাৎ যেন পূর্ণবাবুর নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে হল। যেন বিপরীত পক্ষের উকিলের মুহুরির কাছে মামলার কয়েকটা উইক-পয়েন্ট ফাঁস করে ফেলেছেন তিনি।

—না স্যার, বলছিলাম এই কুইট ইণ্ডিয়ার কথা।

—অঃ!—গলা থেকে আর একটা নাদধ্বনি নির্গত হল। শোনা যায় সেকালে নাকি সার্ভেয়ার হয়ে বিনোদবাবু চাকরিতে ঢুকেছিলেন, তারপর মাতুলকুলের সহায়তায় কোনো একটা তৈলাক্ত মসৃণ পথ দিয়ে বুড়ো-বয়সে সাব-ডেপুটির এই পদমর্যাদা তিনি লাভ করেছেন। কিন্তু জনশ্রুতি যাই থাক, বিনোদবাবুর লেখাপড়ার দৌড়টা যে খুব বেশিদূর নয়, প্রতিমুহূর্তেই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে। তাঁর জাজমেণ্টের পাঠোদ্ধার করতে কেরানীর দল এবং তিনখানা ডিক্সনারী হিম্‌সিম খায়।

খবরের কাগজের পাতায় হাঁপানির একটা বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে বিনোদবাবু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সমস্ত আলোচনাটাই তাই তাঁর কাছে নিতান্ত হাস্যকর এবং একান্তভাবে ছেলেমানুষি বলে অনুমিত হল।

—কিছুতেই কিছু হবে না মশাই—বিনোদবাবু চুরুটে টান দিলেন: যাই বলুন তাই বলুন, চার্চিলের ইম্পিরিয়াল শিল্ডই শেষ পর্যন্ত আমাদের রক্ষা করবে।

মুহূর্তে পূর্ণবাবুর মুখভাব পরিবর্তিত। কিন্তু সুযোগটা নিলেন মোক্তার কালীসদন-বাবু। অত্যন্ত বিচক্ষণের মতো হাসলেন তিনি।

—স্যার, যা বলেছেন। এই হচ্ছে লাখ কথার এক কথা। হাতে ধরে যা দেবে তাই ভরসা, হাজার লাফালাফি করলেও কোনো সুবিধে হবে না।

পূর্ণবাবুর মুখে-চোখে বিদ্রোহ ঘনাতে লাগল। ইচ্ছে হল প্রকাণ্ড একটা চড় বসিয়ে দেন কালীসদনের গালে। কোর্টে মামলা ঝুলছে বলেই কি এমন করে তোষামোদ করতে হবে না কি। বিবেক বলেও তো একটা জিনিস আছে মানুষের।

উৎসাহিত হয়ে বিনোদবাবু বললেন, দেখলেন তো কতবার। বোমা পিস্তল ছোঁড়া হল—যেন পটকা-বাজীতেই অত বড় জাতটা ঘাবড়ে যাবে। আর গান্ধীর চিৎকার তো কতকাল থেকেই চলছে। কী লাভ হল বলতে পারেন?

কালীসদনবাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি করে গেলেন, কিছুই না।

পূর্ণবাবু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, কিন্তু স্যার—

একটা উদার স্নেহময় হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন বিনোদবাবু। কালো মাড়ির ভেতরে ক্ষয়ে যাওয়া তীক্ষ্ণাগ্র দাঁতগুলো উদ্ঘাটিত হল বিকটভাবে। বিনোদবাবু হাসলে তাঁর আলজিভটা পর্যন্ত দেখা যায়।

—হ্যা-হ্যা-হ্যা। এখনো ছেলেমানুষ আছেন পূর্ণবাবু। আরো একটু বয়স বাড়ুক, তখন বুঝতে পারবেন সব।

কালীসদন বললে, সে তো বটেই। আপনারা স্যার বহুদর্শী প্রবীণ লোক, আপনাদের মতো অভিজ্ঞতা আমরা পাবো কোথায়?

রমাপদবাবু ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন অখণ্ড মনোযোগে। এতক্ষণে মৃদুমন্দ ভাবে হাসলেন তিনি। পূর্ণবাবুর কানের কাছে মুখ এনে বললেন, যাক আর ভাবনা নেই কী বলেন? এ ড্যানিয়েল হ্যাজ কাম টু জাজমেণ্ট।

ইস্কুল-মাস্টার রমাপদবাবু সাধারণত ইংরেজি ক্লাসিক সাহিত্য থেকেই প্রয়োজন মতো টীকা-টিপ্পনীগুলো সংগ্রহ করে থাকেন। তাঁর ধারণা এবং আরো দশজন তাঁর স্বজাতীয়ের মতোই ধারণা: ওতে বুদ্ধিমান শ্রোতা বাণাহত হয় এবং নির্বোধেরা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু সার্কেল অফিসার বোধ হয় এ দুটির মাঝামাঝি, অতএব

কর্ণক্ষেপ করলেন না। তাঁর নাক এবং মুখের সম্মিলিত চেষ্টায় পরিতৃপ্তির উদ্গারের মতো একটা গদ্গদ ধ্বনি বেরুল।

—তিরিশ সালে আমিও বাড়ির সব বিলিতী কাপড় পুড়িয়ে শেষ করেছিলাম মশায়। গিন্নী দিন-রাত্তির কানের কাছে ঘটর ঘটর করে চরকা ঘোরাতে শুরু করলেন। চাকরি-বাকরি ছেড়ে আমিও লেংটি ধরে ছোট গান্ধী হওয়ার জো হয়েছিলাম—হ্যা-হ্যা-হ্যা—

কালীসদনবাবু ভয়ঙ্কর ভাবে হাসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কলিকের ব্যথাটা চিন্ চিন্ করে ওঠায় তেমন জুৎসই ভাবে হাসতে পারলেন না। সুতরাং পূর্ণবাবু এই সুযোগে তাঁকে ডিঙিয়ে গেলেন। রমাপদবাবুও হাসলেন এবং সেই সঙ্গে চিরন্তন একটা দার্শনিক তথ্য তাঁকে আলোড়িত করতে লাগল : মূর্খে হাসে ক'বার।

কাপড়ের কষিটা হাসির ধমকে শিথিল হয়ে এসেছিল—নতুন উত্তেজনায় সেটাকে আবার শক্ত করে বাঁধলেন বিনোদবাবু : শেষে দেখলাম—বাবা, কিছুতেই কিছু হয় না। কত ছাব্বিশে জানুয়ারি এল গেল, অনেক ফ্ল্যাগ উড়ল, কিন্তু স্বাধীনতা এল না। তা ছাড়া পাকিস্তান, পরিস্তান আর গুলিস্তানের যে নমুনা দেখছি, তার চাইতে ইংরেজিস্তান ঢের ঢের ভালো।

—ইংরেজিস্তান! হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ—

পেট চেপে ধরে কালীসদনবাবু শেষ চেষ্টা করলেন : পাকিস্তান—গুলিস্তান—ইংরেজিস্তান! কী অসাধারণ হাসির কথা। এর পরে না হেসে আত্মসংযম করবার চেষ্টাটা আত্মহত্যার তুল্যমূল্য। উঠুক কলিক্—জ্বলে যাক বুক আর পেট—সারা রাত ভিজে গামছা আর জলের ঘটি পেটের উপরে বসিয়ে আর্তনাদ করতে হোক—কিন্তু এ অবস্থায় নীরবতাটা কল্পনাতীত ঘটনা। মৃদু-মন্দ নয়, অট্ট-অট্ট নয়—অট্টতর থেকে অট্টতম কোনো ব্যাপার সংসারে নেই কি? মামলাটার দুর্বল জায়গাগুলোর একটা সুরাহা হয়ে যাবে বলেই ভরসা হচ্ছে।

রমাপদবাবু আবৃত্তি করলেন : **Laugh, laugh, thou idiot—**

কিন্তু আকস্মিক ভাবে একটা কেন্দ্র-বিন্দুর দিকে চোখ পড়তেই আলোচনাটায় ছেদ পড়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

সামনে দিয়ে লাল কাঁকরের রাস্তাটা সোজা গিয়ে উঠেছে লোহার পুলের ওপর। আর সেই পুলের রেলিং ধরে নীচের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে একটি চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। একটি তরুণী,—দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণা এবং রূপবতী। নীচের খালে নতুন বর্ষার জলে সাঁওতাল মেয়েরা পোলো ফেলে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে, মেয়েটির লক্ষ্য বোধ হয় সেই দিকেই।

প্রথমে দেখেছিলেন পূর্ণবাবু, তার পর একে একে সকলেই অনুসরণ করলেন তাঁর দৃষ্টিকে। আর একসঙ্গে সকলের মনে হল এতক্ষণ যেন সময়টা বৃথাই অপচয় হয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি অদৃষ্টপূর্বা, সুতরাং বিস্ময় এবং রোমাঞ্চ যুগপৎ শিহরণ জাগিয়ে দিলে। চুরুটের ছাই ঝেড়ে বিনোদবাবু আরো শক্ত করে কাপড়ের কষি বাঁধলেন।

সত্যিই তো, সময় এতক্ষণ বৃথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল না তো কী! সকালের আকাশে এক প্রান্তে শ্রাবণ-মেঘের নীলাঞ্জনমায়া। বৃষ্টি এখন নামবে না, কিন্তু একটা স্নিগ্ধ মধুর ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে পৃথিবী। লাল কাঁকরের পথের দুপাশে শাল গাছে কচি পাতা ধরেছে, সিঁদুরের মতো টুকটুকে রাঙা তার রঙ। আর দুটো বড় বড় গাছে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে কদমফুল—রাশি রাশি, গণনাতীত। শালের রাঙা পাতায় দোলা দিয়ে আর বৃষ্টির গুঁড়োর মতো কদমফুলের রেণু উড়িয়ে দিয়ে পুবালি বাতাস বয়ে যাচ্ছে। লোহার পুলের তলা দিয়ে কলোচ্ছ্বাসে ধাবমান নতুন জল—তার মৃদুসঙ্গীত এতক্ষণ পরে যেন এখানে ভেসে এল। পূর্ণবাবু অনুভব করলেন বাতাসে ভিজে ঘাস আর কদমফুলের একটা মিষ্টি গন্ধ যেন এইমাত্র দিকে দিকে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল।

খস্-স্—খবরের কাগজটা উড়ে পড়ল নীচে। কিন্তু কালীসদনবাবুও সেটাকে তুলে আনতে ভুলে গেলেন।

কী আশ্চর্য পটভূমিতে—কী আশ্চর্য একটি মেয়ে। পূর্ণবাবু কিছুদিন পশ্চিমে বাস করেছিলেন, চকিতে তাঁর চেতনার মধ্যে কাজরী-গানের একটা কলি যেন গুঞ্জন করে গেল। রমাপদবাবু ভাবলেন 'শ্রাবণ-ঘন গহন-মোহে' কোনো 'জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না' কি স্বপ্নের পাখা মেলে নেমে এল মহকুমা শহর নিশ্চিন্তনগরের এই নগণ্য কুৎসিত একটা লোহার পুলের ওপরে! বহু বছরের পরিচিত এই পুরোনো পথ, এই শালের শ্রেণী, ওই কমদফুল—ওদের যে এমন একটা আলাদা রূপ কখনো অপরূপ হয়ে মনে নেশা ধরিয়ে দিতে পারে, এ কথা আগে কি কল্পনাও করতে পেরেছিল কেউ?

কিন্তু রমাপদবাবু যাই ভাবুন, মেয়েটি কিন্তু জনপদবধূ নয়—সম্পূর্ণভাবেই তার উলটো। সুডোল গ্রীবা এবং সবুজ শাড়ির ওপর দিয়ে আধুনিকার বেণী বিন্যস্ত হয়ে পড়েছে। একটি অনাবৃত দীর্ঘ বাহু পাশে ঝুলে পড়েছে—শুভ্র মণিবন্ধে ঝিকমিক করছে কঙ্কণ, কালো ফিতেয় বাঁধা ছোট একটি সোনালি ঘড়ি। হাতে আল্‌গাভাবে ধরা কালো-চামড়ার ছোট একটি ব্যাগ। শুভ্র-পায়ে সাদা রঙের জুতোটা যেন দেহ-বর্ণের সঙ্গে একাকার হয়ে মিলে গিয়েছে। নিশ্চিন্তনগরের নিশ্চিন্ততাকে বিস্মিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। পূর্ণবাবু বাতাসে কদমফুলের গন্ধটা নিশ্বাসে নিশ্বাসে টানতে লাগলেন—যেন এই গন্ধের সঙ্গে ওই মেয়েটির কোনো একটা যোগাযোগ আছে।

সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু ঘটে গেল মাত্র মিনিট তিনেকের মধ্যে। চুরুটের খানিকটা

ধোঁয়া গিলে ফেলে বিনোদবাবু যেন খাবি খেলেন বারকতক। তারপর বললেন, বাঃ, বেড়ে মেয়েটি তো। কে ও ?

কালিদাসের ভাষায় রমাপদবাবুর মন আর্তনাদ করে উঠল : দিঙনাগের স্থূল হস্তাবলেপে কবিতার উজ্জ্বল সৌন্দর্য যেন কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে! অমন হাঁড়ির মতো গলায় এমন অসভ্যের মতো প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা না করলেই কি চলত না বিনোদবাবুর ? আর পূর্ণবাবুর মনে হল চুরুটের দুর্গন্ধে কদমফুলের মিষ্টি সুরভিটা হঠাৎ যেন বিস্বাদ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু অতটা আত্মবিস্মৃত হবার সুযোগ ছিল না ঘাগী মোক্তার কালীসদনবাবুর। পেটের কলিকের ব্যথাটা মুহুর্মুহু তাঁকে বাস্তব পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনছিল। পেটটা চেপে ধরে কালীসদন পকেট থেকে এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বার করে গলায় ঢেলে দিলেন, তারপর বিকৃত মুখে বললেন, ওই নতুন—

তিনটি গলায় সমস্বরে ঐকতান ধ্বনিত হল : ওই নতুন কী ?

হোমিওপ্যাথিক বড়িগুলো গিলতে গিলতে কালীসদন বললেন, লেডী ডাক্তার।

—লেডী ডাক্তার!—তিনটি কণ্ঠে আবার সমবেত প্রতিধ্বনি। কদমফুল নয়, কড়া চুরুট নয়, ক্লাবের পাশে একটা ছোট খানার মধ্যে মিউনিসিপ্যালিটির যে সমস্ত সঞ্চিত আবর্জনা বর্ষার জলে অভিসিঞ্চিত হচ্ছিল, তাদের একটা পচা গন্ধ পেলেন পূর্ণবাবু। আর রমাপদবাবুর মনে হল শুধু দিঙনাগ নয়, তার সঙ্গে কুল্লুক ভট্টও (অবশ্য কুল্লুক ভট্ট কে এবং কী, তা তিনি জানেন না, কিন্তু নাম শুনেই তাকে কাব্য-রস-বঞ্চিত উল্লুক বলে কল্পনা করা চলে) এসে যোগ দিয়েছেন। লেডী ডাক্তারদের অখ্যাতির কথা তো বিশ্ববিশ্রুত—আরো বিশেষ করে তারা যদি তরুণী এবং তন্বঙ্গী হয়। স্কুল মিস্ট্রেসদের ক্ষমা করা যায়, তাদের সঙ্গে ললিত-কলার কিছুটা সম্পর্ক আছে এবং সুকুমারী কিশোরী ও তরুণীদের নিয়েই তাদের কারবার। কিন্তু লেডী ডাক্তার! মেয়ে হয়েও যারা নির্বিচারে বাড়ি বাড়ি নাড়ী টিপে বেড়ায় এবং দরকার হলে ছুরি-কাঁচি ধরে কচাকচ শব্দে অপারেশন করতে পারে, তাদের নিয়ে প্রাণে এতটুকু চঞ্চলতা অনুভব করাও বোকামি। নির্বিকার মুখে যারা মানুষের গায়ে ছুরি বসাতে পারে, নির্মমভাবে তারা মানুষের মনেও ছোরা বসাবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ।

কিন্তু মেয়েটি যে আশ্চর্য সুন্দরী। লেডী ডাক্তারের কল্পনাতেই যে কালো মোটা একটি বিভীষিকা চোখের সামনে ভেসে ওঠে অথবা আমৃসিবদনা কৃকলাসিকা মনের ভেতর ছায়া ফেলে যায়, তার সঙ্গে এর তো এতটুকুও মিল নেই কোনখানে। অন্তত রমাপদবাবু বিশ্বাস করতে পারলেন না।

সত্যি জানেন আপনি, লেডী ডাক্তার ?

—আমি জানি না?—কালীসদনবাবু করুণার ভঙ্গিতে হেসে উঠেই কলিকের ব্যথায় করুণ হয়ে গেলেন: আমার পাশের বাড়িতেই যে ওর কোয়ার্টার। কাল সকালে আমদানি হয়েছে এখানে।

রমাপদবাবু চুপ করে গেলেন, কিন্তু প্রশ্ন করলেন পূর্ণবাবু।

—নামটাম শুনেছেন?

—হু। এডিথ রেখা সান্যাল।

—এডিথ!—তিনটি কণ্ঠের কাতর কোরাস।

—হুঁ! যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে কালীসদন বললেন, ক্রীশ্চান।

শেষ ঘা এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর ঘা। ব্যঞ্জনাময় একটা স্তব্ধতায় কয়েক মুহূর্ত সকলে নীরব। এরপর আর বলবার কিছুই নেই—স্বপ্ন দেখবারও আশা নেই এতটুকু। শুধু আড়ালে কুৎসা রটাবার এবং সাগ্রহে কুৎসা বিশ্বাস করবার পথটাই খোলা রইল মাত্র।

মেয়েটি এইবারে এদিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে—বিজয়িনীর মতো সুঠাম পদক্ষেপে হেঁটে আসছে লোহার পুলটা পার হয়ে। রঙীন শাড়ির আঁচল বাতাসে পরীর পাখার মতোই উড়ছে—আশ্চর্য সুন্দর দেহটিকে যেন গানের তালে তালে দোলা দিয়ে এগিয়ে আসছে সে। আর ওপরে মেঘ-মেদুর আকাশ, লোহার পুলের নীচে জলের কলধ্বনি, বাতাসে কদমফুলের রেণু উড়ে যাচ্ছে, হাওয়ায় কাঁপছে শালের পাতা, কিন্তু—

কিন্তু আলেয়া!

বিনোদবাবু শব্দ করে বড় একটা নিশ্বাস ফেললেন। তারপর যেন মস্তবড় একটা দুরূহ সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন এমনি গলায় বললেন, ওঃ, কিরিশ্চান? সাহেবের রক্ত নিশ্চয় আছে, তাই অমন ফুট-ফুটে চেহারা।

—নিশ্চয়।—কালীসদন প্রতিধ্বনি করে বললেন, ওদের তো আর জাতের ঠিক-ঠিকানা নেই কিছু। ছশো ছত্রিশ জাত মিলেই তো ওরা।

ইস্কুল-মাস্টার রমাপদবাবু ম্লান হয়ে বসেছিলেন, কিন্তু এইবারে তর্ক তুললেন তিনি। হঠাৎ তাঁর মনে হল এরা সকলে মিলে যেন অসহায়া একটি তরুণীকে অপমান করবার চেষ্টা করছে এবং সে অসম্মান থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব একমাত্র তিনিই নিতে পারেন, তাঁর নেওয়া উচিত।

—সে কথা আপনারা বলতে পারেন না। ছশো ছত্রিশ জাত না হলে যে কেউ ক্রীশ্চান হয় না—এ আপনাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। নাম শুনলেন না? এডিথ রেখা সান্যাল, খাঁটি ব্রাহ্মণের মেয়ে হওয়াও আশ্চর্য নয়।

—তাতে কি আসে যায় মশাই? ক্রীশ্চান—ক্রীশ্চান।—বিনোদবাবু রায় দিলেন: আহম্মদ আলী ভট্টাচার্য নাম শুনেছেন কখনো? আমি শুনেছি। তাই বলে তাকে একে-

বারে পুরুতঠাকুর ভেবে মাথায় তুলতে হবে নাকি ? জাত দিলেই রক্তের জাত গেল।

—তাই নাকি ?—রমাপদবাবুর মুখে বিদ্রূপের বাঁকা হাসি দেখা দিল : তা হলে অন্তত আর যাই হোক, আর্যামির গর্বটা বাঙালীর পোষায় না। পর্তুগীজ, মোঙ্গল, নিগ্রো, দ্রাবিড়—আরো কত জাতির রক্ত বাঙালীর ভেতরে মিশেছে তার খবর রাখেন ?

কিন্তু রমাপদবাবুর তত্ত্ব এবং তথ্যপূর্ণ ভাষণটা শেষ পর্যন্ত কারো কানে ঢোকেনি এবং নিজের অজ্ঞাতেই রমাপদবাবুও চুপ করে গেছেন। সামনে দিয়ে এডিথ রেখা সান্যাল হেঁটে চলেছে। আশ্চর্য সুন্দর রঙ—অপূর্ব দেহের গঠন। সত্যিই বিজাতীয় রক্ত কিছুটা তার মধ্যে থাকা অসম্ভব নয়। চলার মধ্যে একবিন্দু সঙ্কোচ নেই, চোখের দৃষ্টিতে বাঙালী-সুলভ লজ্জার রেশমাত্র দেখতে পাওয়া গেল না। পায়ের জুতোটার শব্দ স্বচ্ছন্দ দ্রুত লয়ে—যেন সামরিক ভঙ্গিতে মেয়েটি মার্চ করে চলেছে। একবার উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি এদের দিকে নিক্ষেপ করেই সে চোখ ফিরিয়ে নিলে, রাস্তাটার বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিনোদবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যাই বলো, তাই বলো, মেয়েটি দেখতে কিন্তু বেড়ে। সে সম্বন্ধে কারো মতভেদ ছিল না, কিন্তু কথাটার জবাব দিলেন না কেউ। মেয়েটি দেখতে যে কী সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে গেলে যেন অনুভূতিটাকে খর্ব করেই ফেলা হবে।

কোথায় গেছে রাজনীতি—কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে শৃঙ্খলিতা ভারতমাতা! সব কিছুকে ছাপিয়ে আগ্নেয়-রূপিণী এডিথ রেখা সান্যাল মনের সামনে ভেসে উঠছে। বাতাসে খবরের কাগজটা বারান্দা থেকে উড়ে গিয়ে নীচের আবর্জনাস্তূপের ওপরে পড়ল।

ক্রীং—ক্রীং। সাইকেলটাকে নীচে আছড়ে ফেলে মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো পোস্টাপিসের কেরানী সুধীর এসে সামনে দাঁড়ালো। যেন ঘুম ভেঙে হঠাৎ চারটি প্রাণী জেগে উঠল—ভেসে উঠল স্বপ্ন-সাগরের কোনো একটা অতল-স্পর্শতা থেকে।

—কী খবর সুধীর, কী খবর ? অমন ঝোড়ো-কাকের মতো চেহারা নিয়ে এমন ভাবে ছুটে এলে কোত্থেকে ?

—মস্ত খবর রমাপদবাবু! শোনেননি ?—সুধীর হাঁপাতে লাগল।

—না তো, কী হয়েছে ?

—ওয়ার্কিং কমিটির সেসন শেষ হওয়ার আগেই কংগ্রেসের সমস্ত লিডারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে—রেডিয়োতে খবর এল।

— সমস্ত লিডারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ?

সমবেত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি—একটা আর্তনাদের মতোই শোনালো। বিনোদবাবুর ঠোঁট থেকে খসে পড়ল চুরুটটা।

দেওয়ালে বড় একখানা ক্যালেণ্ডারের ৯ই আগস্ট তারিখটা তখন অগ্নিলেখার মতো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

৩

রঙীর ঘাট।

শ্রাবণের ভরা নদী খরস্রোতে বয়ে চলেছে। লাল ঘন জল—তীরের মতো ধারায় ছুটেছে আর দুধারের খাড়া উঁচু পাড়ি থেকে ঝপাঝপ শব্দে খসে পড়ছে মাটির চাঙাড়। একটা বিরাট আন্দোলন, একটা আবর্ত—তার পরেই কোনোখানে আর এতটুকু চিহ্ন নেই। বৈশাখের মরা নদী—যার তিরতিরে সঙ্কীর্ণ জলরেখার মধ্যে হাঁটু অবধি ডুবত না, শ্যাওলা জমে কালো হয়ে থাকত এখানে ওখানে, আর মাছের আশায় প্রতীক্ষা করত 'কানি বক'—পরিপূর্ণ শ্রাবণে তার রূপই বদলে গিয়েছে।

থেকে থেকে জলের মধ্যে শুশুকের 'উলাস'। কখনো কখনো চলস্রোতে ঘড়িয়ালের ছায়া ভেসে ওঠে—বাঁশির মতো অদ্ভুত শব্দ করে ঘড়িয়াল ডাকে—দ্রুত উলাসের পর উলাস দিয়ে শুশুক ছুটে পালায়, মাছের দলে চাঞ্চল্য জাগে। ভাঙা-পাড়ির গায়ে বসে বান মাছ ধরবার চেষ্টা করে গাঁয়ের লোক—বাঁকে বাঁকে 'ভেসাল' পাতা—খরস্রোতে তার বাঁশগুলো থর থর করে কাঁপে। আকাশে জলের গন্ধ ওঠে—বালির গন্ধ ওঠে, ভিজে কাদা আর পচা শ্যাওলার গন্ধ ওঠে—ভেসালের জাল থেকে ওঠে আধ-পচা সুতো আর মাছের আঁশের গন্ধ।

আর তার ভেতর দিয়ে কানাঠাকুরের খেয়া নৌকোয় পারাপার চলে অবিশ্রান্ত। গোরু-মহিষের গাড়ি আসে মহকুমা শহর নিশ্চিন্তনগর থেকে, গোরু-মহিষের গাড়ি যায় মহকুমা শহর নিশ্চিন্তনগরে।

খেয়াঘাটের ওপারে বটগাছ-তলায় আড্ডা জমে কানাঠাকুরের। নানা স্তরের লোক জড়ো হয় সেখানে। এটাকে দেহাতি লোকের ছোটখাটো একটা ক্লাব বললেও ভুল হয় না।

গাঁজার কলকে ঘোরে বৃত্তাকারে, হাতে হাতে ঘোরে হুঁকো। নীল ধোঁয়া, লাল ধোঁয়া। কড়া নেশা, ঠাণ্ডা নেশা। গাঁজা টেনে কেউ বুঁদ হয়ে যায়, তামাকে টান দিয়ে কারুর বা মুখ খোলে। হাত পা নেড়ে সজোর সোল্লাস এবং সভয় আলোচনা চলে।

গল্প জমায় আধিয়ারেরা, ছোট চাষারা, গাড়ির গাড়োয়ানেরা। খেয়াপারের জন্যে প্রতীক্ষমান ছোটখাটো জোতদারেরা গাড়ির ভেতর বসেই নিজের স্বাতন্ত্র্য তথা আভিজাত্য বজায় রাখে, কিন্তু আলোচনায় যোগ না দিয়ে থাকতে পারে না। মাথামাথি করতে চায় না শুধু আড়তদার আর মহাজনেরা—একমাত্র তারাই শুধু ভিন্ন জগতের জীব। গাড়ির মধ্যে পড়ে পড়ে তারা ঝিমোয়, কখনো বা নিদ্রাজড়িত চোখে জিজ্ঞাসা করে ধানের দর, মটর আর কলাইয়ের ভাও।

পুরোনো প্রসঙ্গেরই জের টানে কানাঠাকুর। পুরোনো কিন্তু চিরন্তন।

—দেশের হালচাল ভারী খারাপ।

—হাঁ—ভারী খারাপ। অন্তত এই একটি ব্যাপারে কারো মতভেদ নেই কোনোখানে, সমস্বরে সম্মিলিত প্রতিধ্বনি ওঠে।

একজন এরই মধ্যে প্রশ্ন করে বসে, লড়াইয়ের কী হল ভাই?

—লড়াই আর থামবে না।

—থামবে না! এমনি করেই চলবে বরাবর?

—হাঁ, চলবে বরাবর।

—তাতে লাভ কী? খালি মানুষ মেরে কার কী লাভ হয়?

গোরুর গাড়ির ছইয়ে হেলান দিয়ে স্বল্পশিক্ষিত জোতদার করুণার হাসি হাসে। ফতুয়ার পকেট থেকে একপয়সা দামের একটা সিগারেট বার করে ধরায় সেটাকে। বলে, ওরে মানুষ মুফৎ লড়াই করে না, দরকার আছে বলেই করে। ধানের জমি নিয়ে তুই মাথা ভাঙা-ভাঙি করিস কেন?

—হাঁ—হাঁ, ঠিক বাত আছে।—বিচক্ষণের মতো মাথা নাড়ে কানাঠাকুর।—অংরেজকে হঠিয়ে জার্মান রাজা হৈতে চায়। ওহি লিয়ে তো লড়াই।

—জার্মান কি এবার জিতে যাবে চৌধুরী সাহেব?

গাড়ির মধ্যে জোতদার শিউরে ওঠে।

—খবর্দার, খবর্দার। ওসব কথা মুখেও আনবি নে বেকুফ কোথাকার। থানার দারোগা সাহেব একবার শুনলে জিঞ্জীর পরিয়ে সিধা সদরে চালান করে দেবে। কে জিতবে না জিতবে তা দিয়ে তোর দরকার কি বাপু? হেলে চাষা আছিস—ভুঁইতে লাঙল ঠেলেই খোসা হয়ে থাক। আদার ব্যাপারী তুই, জাহাজের খবর নিতে গিয়ে শেষতক মারা যাবি রে।

—হাঁ—হাঁ—এ বাত ঠিক আছে। লড়াই হয় হোবে, তুমহার আমার কি আছে দাদা? সরকারী ঢোল শুনোনি? জাস্তি বাত কহনেসে ফাটক হোতে বি পারে লোকের।—কানাঠাকুর সমর্থন এবং বিশদ করে দেয় জোতদার চৌধুরী সাহেবের বক্তব্যটাকে।

মানুষগুলি চুপ করে থাকে। সত্যি কথা—হাটে হাটে সরকারী ঢোল তারা শুনেছে। যুদ্ধ সম্পর্কে একটু কোনো রকম অসঙ্গত আলোচনা করলেই ভারত রক্ষা আইনের বজ্র-মুষ্টি এসে চেপে ধরবে—এক বিন্দুও ক্ষমা করবে না। অতএব সাধু সাবধান, নীরবতাই হচ্ছে স্বর্ণতুল্য। বেশি বুঝতে চেয়ো না, শুধু ধৈর্য ধরো এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে প্রতীক্ষা করো। আর শাস্ত্রের শাশ্বত বাণীকে প্রতিনিয়ত স্মৃতিপথে সজাগ করে রেখো:

বোবার শক্তি নেই।

শুধু সরকারী ঢোলই নয় হাটে হাটে। কিছুদিন আগে ঋণ-সালিশীর স্পেশ্যাল অফিসার এসেছিলেন নবীপুরের থানায়। আশেপাশে দশখানা গাঁয়ে সাড়ম্বরে হাঁক দিয়ে গেল ইউনিয়নের চৌকিদারেরা। সকলে এসো, দলে দলে এসো। সরকারী অফিসার তোমাদের যুদ্ধের তাৎপর্য বিশদ ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দেবেন—বুঝিয়ে দেবেন এই যুদ্ধের সার্থকতা এবং সেই সঙ্গে তোমাদের কর্তব্য। নবীপুর ডাক-বাংলোর সামনে জমায়েত।

আহ্বান উপেক্ষা করে কার সাধ্য? রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, এমন কি ছ'ক্রোশ ঘাঁটা ঠেঙিয়ে কচি-কাঁচায়, তরুণে-প্রবীণে, পুরুষে-নারীতে পাঁচ-সাতশো লোক এসে জমা হল। অভুক্ত, অর্ধভুক্ত মানুষগুলো ডাক-বাংলোর সামনে মাঠের মধ্যে বসে বেলা বারোটা থেকে প্রতীক্ষা করতে লাগল। গন্‌গনে রোদে চাঁদি পুড়ে যাচ্ছে, কোনোখানে এমন একটু ছায়া নেই যে বিশ্রাম নিতে পারে তারা। কিন্তু স্পেশ্যাল অফিসার জানেন—এসব অভ্যাস এদের আছে। সারাদিন রোদে জলে জমি চাষ করে; সারারাত এরা বিনিদ্র চোখে গাড়ি হাঁকায়—একটু ঝিম এলেই আরোহী ধমক দেয়: হাঁকিয়ে চল্‌ ব্যাটা, নইলে সকালবেলা নিশ্চিন্তনগরে গিয়ে মেল্‌গাড়ির বাস ধরতে পারব না। এক-আধ বেলা অনাহারে কাটানোও এদের বংশানুক্রমিক অভ্যাস।

অতএব নিশ্চিন্ত স্পেশ্যাল-অফিসার সারা দুপুর পরম পরিতুষ্টি সহকারে দিবানিদ্রা দিলেন। ঋণসালিশীর চেয়ারম্যান লোক ভালো, খ্যাটের ব্যবস্থাটা নেহাৎ মন্দ করেনি, আর এই দারুণ গরমে টানাপাখার বাতাসটাও মন্দ লাগছিল না একেবারে। চারটে পর্যন্ত ঘুমিয়ে স্পেশ্যাল-অফিসার নবীপুরের দারোগা এবং বন্দরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চা খেলেন, খেয়ে গল্প করলেন। বাইরে তখন লোকগুলো ক্ষিদেয় ধুঁকছে, গাল-কপাল দিয়ে টস্‌-টস্‌ করে কালো ঘাম ঝরে পড়ছে তাদের। অথচ পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। কড়া পাহারা দিচ্ছে চৌকিদারেরা।

—এই সুমুন্দি, উঠছ কেন? সরকারী হুকুম—কেউ যেতে পাবে না।

সূর্যের চাইতে উত্তপ্ত বালি দুঃসহ। চৌকিদারেরা এতকাল চোর ধরবার অসম্ভব আশায় রাত-বিরেতে শুধু গৃহস্থ-পাড়ায় হাঁক দিয়েই ফিরেছে, কিন্তু এতগুলো মানুষকে দাবিয়ে রেখে এমন করে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ কখনো পায়নি। বিবর্ণ নীল-উর্দি পরে তারা ভারত-সম্রাটের সঙ্গে অতি নিকট যোগসূত্রটার অলক্ষ্য শিহরণ অনুভব করেছে। তাদের পিতলের চাপরাশ সূর্যের আলোয় মহিমা-মণ্ডিত হয়ে দীপ্তি পাচ্ছে।

মানুষগুলোর কিন্তু দাঁত কড়মড় করে। একবার কায়দায় পেলে হয় তোমাকে। এক চড়ে উড়িয়ে দেব চাপরাশ, একটানে ছিঁড়ে দেব দাড়ির গোছা।

প্রাণান্তিক প্রতীক্ষার পরে ডাক-বাংলোর বারান্দায় চেয়ার পড়তে লাগল। একটা ছোট টেবিল এল—তার ওপরে দুটো ফুলদানি—ঋণসালিশীর চেয়ারম্যান পাঠিয়ে দিয়েছেন। একে একে নবীপুরের মহাজনেরা, স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার, পোস্টমাস্টার এবং দু-চারজন ভদ্রলোক এসে চেয়ারে আশ্রয় নিতে লাগলেন। তার পরে খানিকটা রহস্যময় স্তব্ধতা। দামী হ্যাটে এবং সোনার চশমায় হুজুরের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ। তার পর বক্তৃতা। কত যুক্তি—কত আবেগ, কত উচ্ছ্বাস। তার মাথামুণ্ডু কেউ কি বুঝতে পারল? নাৎসী দস্যু, রাক্ষস জাপান—তোমাদের বুকের রক্ত খেতে এসেছে। সব হুঁসিয়ার। কেউ টঁ্যা ফোঁ কোরো না, বেঘোরে মারা যাবে। আর সব চেয়ে বড় কথা—যুদ্ধে যোগ দাও, চাঁদা দাও এবং বাড়ি ফিরে গিয়ে জগদীশ্বর ও আল্লার কাছে প্রার্থনা করো যেন আমরা শত্রু-নিপাত করতে পারি।

অত্যন্ত ভালো ভালো কথা—শুনলে শুধু ইহকাল নয়, পরকালের কাজ হয়ে যেতে পারে বলে সন্দেহ হয়। শুধু চাঁদার কথাটাই একটু অবান্তর ঠেকল। তা ছাড়া গরীবের ছেলে—দিন আনে দিন খায়, পল্‌টনী সিপাই সাজবার মতো বিলাসিতাটাও তাদের খুব ভালো লাগলো না।

ঝাড়া এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে গলদ্‌ঘর্ম স্পেশ্যাল-অফিসার সশব্দে বসে পড়লেন—চেয়ারটা আর্তনাদ করে উঠল। দুদিক থেকে দুজনে সজোরে পাখা করতে লাগল। ভেতরে খবর গেল—চা, জলদি চা।

ডাক-বাংলোর মাঠে জমায়েতের ভিড় ভাঙছে। যা শুনেছে জলের লেখার মতো মুছে গিয়েছে মন থেকে। ওদের ডাকবার অর্থ কী এবং এত সব কথা ওরা কেন শুনল—এ সব প্রশ্ন ওরা কখনো জিজ্ঞাসা করে না। ওরা এটাকে একটা স্বাভাবিক নিয়ম বলেই ধরে নিয়েছে। চৌকিদার হাঁক দিলে জমা হতে হয়—রোদে-জলে পুড়ে দুর্বোধ্য বক্তৃতা শুনতে হয়—তার পর দিনান্তে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসতে হয়। যা শুনেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভুলে যাওয়াটাই ওদের রেওয়াজ।

শুধু একটা জিনিস ভোলবার উপায় নেই—সে হচ্ছে সরকারী নিষেধ। হুঁশিয়ার। মুখ খুললেই বিপদ। নির্বোধই নির্বিঘ্ন।

স্পেশ্যাল-অফিসার ততক্ষণে সুগন্ধি রুমাল দিয়ে কপাল মুছছেন। তারপর সমবেত ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন বললাম?

সকলে সমস্বরে বললেন, চমৎকার।

একটু দ্বিধা করে স্পেশ্যাল-অফিসার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা সবাই বুঝতে পেরেছে বলে মনে হয় আপনাদের?

—নিশ্চয়। একেবারে জল।—পোস্টমাস্টার আণ্ডার-গ্রাজুয়েট, তিনি কথাটার ওপরে

আরো বেশি জোর দিয়ে বললেন, ক্রিস্ট্যাল ক্লিয়ার !

কানাঠাকুরের আড্ডায় বসে এদের মনের সামনে ভেসে উঠছিল স্পেশ্যাল-অফিসারের নিষেধ বাণীগুলোই। সাবধান। শুধু দেখে শুনে যাও, কথা বোলো না। কথা বলার দায় অনেক।

জহর গাড়োয়ান বলদকে জাবনা দিচ্ছিল। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বললে, কিন্তু চৌধুরী সাহেব, যুদ্ধ না থামলে আমরা যে মরে গেলাম।

চৌধুরী সাহেব মুখের ওপরে সিগারেটের ধূম্রজাল বিস্তীর্ণ করে বললেন, যুদ্ধে তো কত লোক মরছে, না হয় তোরাও মরলি।

—কিছু পাওয়া যায় না, হু হু করে দর চড়ে যাচ্ছে, ধান উড়ে যাচ্ছে—

চৌধুরী সাহেব বললেন, যুদ্ধে বোমা পড়ে শহর উড়ছে—গোটা জেলাই উড়ে যাচ্ছে আর এখানে ধান উড়বে তাতে আশ্চর্য হচ্ছিস কেন আহাম্মক।

– যারা যুদ্ধ করছে, ঘর উড়ছে তাদের। আমরা তো যুদ্ধ করছি না, তবু আমাদের ধান উড়বে কেন ?

চৌধুরী সাহেব এবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন। নাঃ, মরবার পাখা উঠেছে এদের, শিখেছে মুখে মুখে তর্ক করতে। উষ্মাভরে একটা ধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর্ বেল্লিক কোথাকার। আমাদের সরকার যুদ্ধ করছে—কাজেই আমরাও যুদ্ধ করছি। সোজা কথাটা বুঝিস না কেন ?

কানাঠাকুর গাঁজার কলকেতে আর একটা টান দিয়ে বললে, হাঁ, এ বাতভি ঠিক আছে। রাজা লড়াই করলে তো পরজার ভি লড়াই হইল।

—তা তো হইল।—কিন্তু গ্রামের লোকে সান্ত্বনা পায় না, আশ্বাসও পায় না। আকাল ঘনিয়ে আসছে চারদিকে। ধানের দর বাড়াতে বড় চাষী, আড়তদার আর মহাজনের কিছু সুবিধে হয়েছে বটে, কিন্তু দিনমজুর আর বর্গাদারেরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে অমাবস্যার অন্ধকার। কিছু পাওয়া যায় না—ডাল নয়, নুন নয়, কেরোসিন নয়। সরকারী ডাক্তারখানায় ওষুধ নেই—লাল আর নীল জল। অসুখ-বিসুখও যেন সময় পেয়েছে—এখানে ওখানে মানুষ মরে যাচ্ছে টপাটপ। ভয়ে বুক শুকিয়ে যাচ্ছে লোকের—কী যে হবে শেষ পর্যন্ত সে কথা কারো কল্পনা করবার ক্ষমতা নেই।

কিন্তু সরকারের কড়া হুকুম : কোনো কথা বলতে পারবে না তারা, কোনো ভাবনা ভাবতে পারবে না। মুশকিল এই : তাদের কথা তারা ছাড়া ভাববে কে ? যুদ্ধ হচ্ছে হোক, শত্রু নিহত হয়ে যাক—প্রজারা আনন্দিত হবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু আকালের শত্রু—আধিব্যাধির শত্রুকে নিপাত করে দেবে তাদের এমন বান্ধব কে আছে ? যুদ্ধের আক্রমণটা

তাদের ওপর নেমে আসছে প্রাত্যহিক জীবনে—যেন প্রাকৃতিক নিয়মে। তাকে নিঃশব্দে, নির্বিকার মুখে স্বীকার করে যেতে হবেঃ যেমন করে ওরা স্বীকার করে মহামারীকে, বন্যার জলকে, কাল-বৈশাখীর ঝড়কে এবং সোনার ফসলের সর্বনাশ করে দেওয়া আকাশ-ভাঙা শিলাবৃষ্টিকে।

প্রসঙ্গটা বদলে গেল হঠাৎ।

—রশি মারো, রশি মারো—ফরাস বরাব্বর। এ রামলেহড়—

কানাঠাকুর চিৎকার করে উঠল।

একখানা জোড়া নৌকো থান-আষ্টেক খালি গাড়ি নিয়ে এপারের ঘাটের ফরাসে ভিড়বার চেষ্টা করছে। গাড়িগুলো একটা আর একটার কাঁধে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে—যেন গোরুর ঘাড় থেকে মুক্তি পেয়ে আকাশে মাথা তুলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস নিচ্ছে। হঠাৎ দেখলে কেমন অস্বাভাবিক মনে হয় ওগুলোকে। বড় বড় চাকাগুলো ধুলো আর কাদায় দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে—অনভিজ্ঞ কোন আমেরিকান সৈন্য ওগুলোকে দেখলে কল্পনা করতে পারে অ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফট্ বলে। জোয়াল-খোলা বলদগুলো জাবর কাটছে অনাসক্তের মতো—নৌকো থেকে নেমে যে আবার ওই গাড়িগুলোকে কাঁধে তুলতে হবে, সে কথা যেন ভুলেই গেছে তারা। জলের ভেতর দিয়ে সাঁতরে আসছে তিন-চারটে মহিষ—কখনো ভোঁস্ ভোঁস্ করে ডুব দিচ্ছে, কখনো নাক দিয়ে নিশ্বাসের সঙ্গে খানিকটা জল ছড়িয়ে দিচ্ছে। পরনের কাপড়টাকে মাথায় পাগড়ির মতো বেঁধে নিয়ে বছর বারোর একটি ছেলে লেংটি পরে একটা মহিষের পিঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং হাতের পাঁচনবাড়ি ঘুরিয়ে দলটাকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

ওদিকে রামলেহড় লগি মারছে প্রাণপণে। সামাল্-সামাল্—রশি-রশি—নৌকো ফরাসের কাছে ভিড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু ঠিক ভিড়তে পারছে না। মাঝনদীতে বড় বড় ঘূর্ণি ঘুরছে বটে, কিন্তু জলটা সেখানে শান্ত। কিন্তু পারের কাছে নদীর স্রোত যেমন উদ্দাম, তেমনি প্রখর। কুটোটা ফেললে শাঁ করে দেখতে দেখতে উড়ে যায়। নৌকোর তলায় হু-হু করে জল-গর্জন বেজে উঠছে—ফরাসে ভিড়বার আগেই তাকে ঠেলে নিয়ে চলে যেতে চায়। রামলেহড় আর বনোয়ারী মালা দুদিক থেকে লগি ঠেসে ধরেছে, কিন্তু নৌকো বাগ মানে না, যেন ছিটকে বেরিয়ে যেতে চায়। হাতের পেশীগুলো তাদের শক্ত হয়ে ফুলে উঠেছে, গা দিয়ে টস্‌টস্ করে ঘাম ঝরছে। কানাঠাকুর আবার বললে, সামাল্—

এপারে যারা বসেছিল, তারা ছুটে এল সবাই। নৌকো থেকে দুটো মোটা কাছি ছুড়ে দিয়ে শক্ত করে ফরাসের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিলে এরা। ঝর-ঝর—মটাস্। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বড় নৌকো ফরাসের গায়ে আটকে গেল।

গড়-গড় করে গাড়িগুলো টেনে নামানো হতে লাগল। ঢালু পাড়ির ওপর দিয়ে ঠেলে এবার ওপরে ওঠানো : হেঁইয়ো সাবাস। যারা আড্ডা দিচ্ছিল, তামাক আর গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়েছিল—তারাও এসে এবার যোগ দিয়েছে। দুঃখের পটভূমিতে যারা প্রতিদিন পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত—তাদের মধ্যে অন্তত এ ক্ষেত্রে একটা অসংশয় একতা আছে। ধরো, চলতে চলতে বুক-সমান এঁটেল কাদায় আটকে গেল কারো বোঝাই গাড়ি : বলদ পা তুলতে পারছে না, গাড়োয়ানের পাঁটা খেয়ে হাঁটু ভেঙে পড়ে আছে—মুখ দিয়ে গড়াচ্ছে শাদা ফেনা। পেছন থেকে অন্য গাড়ি যারা এল—হাজার কাজ, হাজার অসুবিধে থাকলেও এ গাড়িকে তুলে না দিয়ে তারা এক পাও নড়বে না। হাজার বৈষম্য এবং বিভেদের মধ্যেও এখানে ওদের স্বাভাবিক সংঘবুদ্ধি—প্রাকৃতিক সাম্যবাদ।

এবার কানাঠাকুরের ওঠবার পালা।

—পৈসা—ঘাটোয়ালকা পৈসা—

আবার প্রাত্যহিকের পুনরাবৃত্তি।

—দুটা পাইসা ছাড়ি দে বা—বিড়ি খাবা দিবু না?

—তুমাদের পৈসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ঘাট আমার লোক্‌সান হইয়ে যাবে নাকি?

—ঘাট নোক্‌সান হবে। হেঁ—হেঁ—হঁ—মানুষগুলো আপ্যায়িত করবার চেষ্টা করে কানাঠাকুরকে : তুমি তো টাকার কুমীর ঠাকুরমশাই, তোমারও লোকসানের ভাবনা?

—ওসব হোবে না—পুরো পৈসা না দিলে গাড়ি যাইতে দিবো না।

এপারে যারা প্রতীক্ষা করছিল, তাদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। জোতদার চৌধুরী সাহেবের রাজনীতির আলোচনা বন্ধ হয়ে গেছে—ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন তিনি : ওরে জাফর—গাড়ি তোল্ শীগ্‌গির—

একে একে বলদ খুলে সকলে গাড়ি নামিয়ে আনছে ফরাসের ওপর। রামলেহড় আর বনোয়ারী নৌকোয় গাড়ি তুলতে সাহায্য করছে গাড়োয়ানদের।

—হাঁ—হাঁ—পানিত গিরাইয়োনা জী—

—শালার ভৈঁসা ক্যামন করে বা—জলত নামোতে ডরোছে ক্যানে?

—ধরেক ভাই, শিকপাহাটা মোর ধরেক। মারো জোয়ান—হেঁইয়ো—

চৌধুরী সাহেব গাড়ি থেকে নেমে নৌকোর গলুইয়ে এসে বসলেন। বদনা ডুবিয়ে নদী থেকে জল তুলে অঞ্জলি করে ধুয়ে নিলেন মুখ, চোখ আর দাড়ি। তারপর আরাম করে এক পয়সা দামের সিগারেট ধরালেন একটা। মাথার মধ্যে চিন্তার চরকীপাক—মস্ত একটা দেওয়ানী মামলা ঘাড়ের ওপর ঘুরছে, সে সম্বন্ধে উকীলের সঙ্গে পরামর্শ

করতে হবে।

জহর গাড়োয়ান বললে, শালার বলদও লড়াই করিবা চাহে নাকি হে? ঘাড় সিধা কইরছে না ক্যানে জী—জার্মান ফৌজ হইল্ নাকি বলদ!

সকলে হো হো করে হেসে উঠল—এমন কি জোতদার চৌধুরী সাহেব পর্যন্ত। আর সেই সময়ে মাথার ওপর দিয়ে ধ্বনিত হয়ে গেল লৌহ-যন্ত্রের গর্জন। ঘর্-র্-র্। একটা কর্কশ কুৎসিত শব্দ। নদীর জল চমকে উঠল—চমকে পাখার ঝাপট দিলে তালগাছের মাথায় ধ্যানস্থ শকুন। বরেন্দ্রভূমির শূন্য প্রান্তর আর ক্ষেতের ধানের শীষ পর্যন্ত যেন বিমানের পাখার শব্দে কাঁপতে লাগল।

মানুষগুলোর হাসি যেন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে গেছে। এক দৃষ্টিতে সকলে তাকালো আকাশের দিকে—বিস্মিত আর বিহ্বল দৃষ্টিতে। যেন তাদের একবার ভালো করে দেখে নেবার জন্যেই বিমানটা ছোঁ মেরে নীচে নেমে এল অনেকখানি। গোরুগুলো সভয়ে দাপাদাপি করে উঠল—নৌকোটা ডোবে আর কী। পরক্ষণেই ঘর্র্—গোঁ-গোঁ-গোঁ—। তালগাছের মাথা থেকে ভয়ার্ত শকুনদের উড়িয়ে দিয়ে বিমান অদৃশ্য হয়েছে নিঃসীম নীল-দিগন্তে, চলেছে হয়তো কোনো সুদূর সীমান্ত থেকে যুদ্ধের বার্তা বহন করে।

জাফর গাড়োয়ান মুখটাকে আড়াই ইঞ্চি ফাঁক করে বললে, সাবাস কারখানা হে! ঝড়ের মতো উড়ি গেল—

চৌধুরী সাহেব বললেন, হুঁ, লড়াই ফতে করতে যাচ্ছে।

লড়াই তো ফতে হবে—কিন্তু : জহর কিছুতেই পুরানো কথাটা ভুলতে পারছে না। সক্ষোভে বললে, কিন্তু আমাদের কী সুরাহা হবে জোতদার সাহেব?

বিরক্ত জোতদার সাহেব কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কথাটা তাঁর মুখ থেকে আর বেরুলো না। ওপার থেকে যে সব যাত্রী নেমেছিল, তাদের মধ্যে একজন হাত-পা ছুঁড়ে কী যেন বলে যাচ্ছে উত্তেজিত ভাষায়। তার চার পাশ ঘিরে ভিড় জমিয়েছে চাষারা আর গাড়োয়ানেরা—যেন তাদের মধ্যেও কিছু একটা উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে।

—কী হৈল্, ওইঠে কী হৈল্ বা রে?

—খুব চিল্লাইছে লালচাঁদ মণ্ডল। কী হৈল্ হে লালচাঁদ?

লালচাঁদ এবার এগিয়ে এল এদিকে। মাথায় তামাটে রঙের অল্প চুল—মুখে কিশোরের মতো অপরিণত গোঁফের রেখা—রাজবংশীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। ময়লা ফতুয়ার অন্তরালে বলিষ্ঠ পেশল বুক। হাতের মাংসপেশী পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে মোটা নীল শিরা উঠেছে। গলায় হলদে রঙের পৈতা গোল করে জড়ানো, একটা মণিবন্ধে লোহার বালা, আধি-ব্যাধির প্রশমন কামনায় বালাটা হাতে পরা হয়েছে। সাধারণ

রাজবংশীর চেহারা—তবু অসাধারণ তার বিরল ভ্রূর নীচে জ্বলন্ত পিঙ্গল চোখ দুটো। যারা লালচাঁদকে চেনে তারা জানে অন্ধকারে ওই চোখ দুটো জ্বলে—যেন জানোয়ারের চোখ।

লালচাঁদ রাজবংশী ভাষায় তীব্রস্বরে যা বললে তার বঙ্গানুবাদ এই: তোমরা কি কিছুই শোনোনি এখনো?

—না, ভাই, কী হয়েছে?

—শহরে হুলুস্থুল। গান্ধী মহারাজকে ধরে ফাটকে পুরেছে, আর সেই সঙ্গে কংগ্রেসের আর সব নেতাকেও ধরে নিয়ে গেছে।

—তাই নাকি!

একশো গলার প্রতিধ্বনি উঠল। শুধু রাজবংশীরা নয়, জহর, জাফর, এমন কি চৌধুরী সাহেব পর্যন্ত। কয়েক মুহূর্ত কারো মুখে কোনো কথা নেই।

চৌধুরী সাহেব প্রথমে মুখ খুললেন, হুঁ, লীগের কথা না শুনেই—

কিন্তু লালচাঁদ শুনতে পেল না। উনিশশো তিরিশের আন্দোলনে সত্যাগ্রহ করেছে সে, জেল খেটে এসেছে। তার চোখ জ্বলতে লাগল: ভাই সব, এ কথা আমরা যেন কখনো না ভুলি যে আমাদের জন্যেই গান্ধী মহারাজ জেলে গিয়েছেন। তোমার আমার সকলের জন্যেই আজ তাঁর এই দুঃখ, এই লাঞ্ছনা। আমরা একথা কখনো ভুলব না—কখনোই না। বন্দে মা-তরম্—

—বন্দে মা-তরম্—

অনেকটা যেন নিজেদের অজ্ঞাতেই দেহাতী মানুষগুলো সমস্বরে ধ্বনি তুলল: বন্দে মা-তরম্—গান্ধীজী কী জ-য়—

শান্ত, ঘুমন্ত রঙীর ঘাট। খেয়া পারাপার চলে, খোসগল্প জমে কানাঠাকুরের আড্ডায়, গাঁজা আর তামাকের ধোঁয়ায় নানা স্বপ্ন দেখে গ্রামের লোক। কানাঠাকুর পারানির পয়সা হিসেব করে আর তুলসীদাস পড়ে, রামলেহড় আর বনোয়ারী নৌকো ঠেলে—ফরাসের কাছে এসে চেঁচিয়ে ওঠে: সামাল্—সামাল্—রশি। পরিচিত—প্রতিদিনের আত্ম-আবর্তনশীল জীবন। কিন্তু আজ সেখানে এল এ কি মন্ত্র—এ কি জয়ধ্বনি! প্রাত্যহিকের অভ্যস্ত কাব্যে আজ এ কোন্ নতুন ছন্দ নিজেকে সূচনা করল—অসংখ্য উদ্দীপ্ত কণ্ঠে—নিরুদ্ধ বজ্রাগ্নির আকস্মিক শিখা-সম্পাতে!

আবার তালগাছের মাথায় পাখা ঝটপট করে উঠল শকুন—বরেন্দ্রভূমির বিস্তারিত দিক-প্রান্তরে থর থর করে শিউরে উঠল ধানের শীষ। ফরাসের নীচে শ্রাবণের ভরা নদীর তীক্ষ্ণ জলগর্জন—আর থেকে থেকে ঝুপ্-ঝাপ্ করে মাটির চাঙড় ভেঙে পড়বার শব্দ।

৪

সন্ধ্যা প্রায় আটটার সময় এডিথ হস্‌পিট্যাল থেকে কোয়ার্টারে ফিরে এল। ক্লান্তি আর অবসাদে সমস্ত শরীর তার আচ্ছন্ন। সারাদিনের মধ্যে এক মুহূর্ত বিশ্রাম করবার সুযোগ সে পায়নি।

শহর ছোট—হস্‌পিট্যাল আরো ছোট। কিন্তু মানুষের রোগব্যাধি শহর কিংবা হাসপাতালের আয়তন হিসেব করে দেখা দেয় না। এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কাজের চাপে এডিথ একেবারে তলিয়ে গিয়েছে।

বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণ ধরে সে স্নান করলে। ইঁদারার কনকনে ঠাণ্ডা জল—দু-এক ঘটি গায়ে পড়তে না পড়তেই শীত ধরে যায়, কিন্তু এডিথের সমস্ত শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল এতক্ষণ—নিজের শারীরিক অস্তিত্বটাই যেন তার খেয়ালে ছিল না।

কাপড়-চোপড় বদলে একটু লঘু প্রসাধন করে বারান্দার ডেক-চেয়ারে এসে সে বসল। চাকরটা এসে চা দিয়ে গেল, চায়ে চুমুক দিতে দিতে এডিথ অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইল অন্ধকার দিগন্তের দিকে।

এদিকে ছোট শহরের মিটমিটে কতকগুলো আলো—খোয়াওঠা রাস্তায় খট্‌-খট্‌ করে টমটম চলছে—। সিনেমা হাউসের অ্যামপ্লিফায়ার থেকে বিকৃত কণ্ঠে একটা ভয়ঙ্কর গান বাজছে—যেন ভীমের ভূমিকায় অভিনয় করছে কেউ। কিন্তু কান পাতলে শোনা যাবে, গানের মধ্যে বীররস একেবারেই নেই, নিতান্তই মৃদু কোমল ব্যাপার : চামেলির বুকে চাঁদের পরশ সম্পর্কে ভাব-গভীর খানিকটা বিলাপ। সেই বিলাপে মাঝে মাঝে যখন ছেদ পড়ছে তখন উড়িয়া হোটেল থেকে রামায়ণ পড়বার একটা বিচিত্র সুর শোনা যাচ্ছে। তার সঙ্গে মিশেছে উকিল সারদাবাবুর বাড়িতে রেডিয়োর সঙ্গীতালাপ—নিতান্তই মফঃস্বল শহর—ধুলো-উড়ানো মহকুমা শহর নিশ্চিন্তনগর যেন রাতারাতি গন্ধর্বলোক হয়ে গিয়ে সুর-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে।

আর এক পাশে মাঠ—ধূ-ধূ মাঠ। অন্ধকার তার ওপর দিয়ে কালো কালির মতো গড়িয়ে চলেছে। ওখানে গান নেই—ঝিঁ ঝিঁ করে তীব্রকণ্ঠে ঝিঁঝি ডাকছে—ডাকছে সোনা ব্যাং, কোলা ব্যাং, কাঠ ব্যাং। একটা ঝুপসী ঝাওড়া গাছে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে ঝগড়া করছে প্যাঁচা। উল্কামুখীর আলো আলেয়া হয়ে দপ্‌-দপ্‌ করে উঠছে। আর বহুদূরের আল-পথ দিয়ে কে যেন হেঁটে চলেছে—চলার তালে তালে দুলছে তার হাতের লণ্ঠন।

মাঠ—কালো কালি গড়িয়ে যাওয়া দিকচক্রহীন মাঠ। তার বুকে জেগে আছে

মহকুমা-শহর নিশ্চিন্তনগর। যেন বিশাল সমুদ্রের বুকে একটি দ্বীপ। হঠাৎ এডিথের মনে হল : সমুদ্রে যেমন টাইফুন আসে—একটা বিশাল তরঙ্গ আছড়ে পড়ে তীরতটের যা কিছু সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়—তেমনি করে কি কখনো ওই কালো প্রান্তর থেকে আসতে পারে একটা বিরাট প্রাণবন্যা—এই মহকুমা শহর নিশ্চিন্তনগর—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা সকলে গ্রেপ্তার হয়েছেন। আজ বারোই আগস্ট। আকাশের একপ্রান্তে থম-থম করছে খানিকটা কালো মেঘ—ঝড়ের ইঙ্গিত বয়ে সেই মেঘ ফুলে উঠছে, ফেঁপে উঠছে। রাত্রে ঝড়-বৃষ্টি হবে বোধ হয়।

পাশের টেবিলটাতে ঠুন্ ঠুন্ করে শব্দ। এডিথ মুখ ফেরালো। ছোকরা চাকর চায়ের কাপটা নিয়ে যেতে এসেছে।

—কে, আনোয়ার ? আর এক পেয়ালা চা দিস আমাকে।

—জী।

মনের মধ্যে খেলা করছে নানা এলোমেলো অলস ভাবনা। মাঠের পাড় থেকে চমৎকার বাতাস আসছে—ভারী ভালো লাগছে এডিথের। অন্ধকার আলের পথে লণ্ঠনের আলোটা দুলতে দুলতে মিলিয়ে যাচ্ছে দূর থেকে আরও দূরে। আকাশের ওই কোণাতে হঠাৎ খানিকটা রক্ত ছড়িয়ে দিল কে ? চাঁদ উঠছে নাকি ?

কিন্তু—রক্ত ! কালোর ওপরে খানিকটা টকটকে লাল রক্ত। মনে পড়ল রেজেস্ট্রি অফিসের পেশকার হরিহর তরফদারের কালো বউটার আজকে ছেলে হয়েছে হাসপাতালে। পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পড়ে কী ওষুধ-বিষুধ হরিহর তার স্ত্রীকে খাইয়েছিল কে জানে—শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে টানাটানি। এখনো অক্সিজেন চলছে—মেয়েটা বাঁচবে কি না বলা শক্ত। অত রোগা শরীর থেকে অত রক্ত যে কেমন করে পড়ল সে যেন কল্পনাও করা যায় না।

অশিক্ষিত নির্বোধ জীবন। বৈজ্ঞানিক পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই অথচ জন্ম নিয়ন্ত্রণের সখ আছে। জড়িবুটি ও হাতুড়ের ওষুধে অখণ্ড বিশ্বাস। ঐ তো লোক হরিহর, একান্ত ভাবে ক্যাবলা চেহারা, হাতে বড় বড় নোখ এবং হাসবার আগেই খৈনী-পোড়া মাড়ি বেরিয়ে পড়ে—ওর পেটে পেটে যে এত, সে-কথা কে ভাবতে পেরেছিল ! ওই সব বিজ্ঞাপনওয়ালা আর এই সব স্বামী—এদের ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত, এরা হত্যাকারীর দল।

কিন্তু আজ ১২ই আগস্ট। মার্গারেট স্যাঙ্গারকে মহাত্মাজী কী বলেছিলেন ? যার সামর্থ্য নেই সন্তানকে বড় করে তুলবার, সংযম ছাড়া তার গত্যন্তর কোথায় ?

এডিথের চমক ভাঙল। ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল—খুলে গেল সামনেকার কাঠের গেটটা। কাঁচভাঙা ল্যাম্পপোস্টের খানিকটা ক্ষীণ আলোক ছড়িয়ে পড়েছে লনের ওপর—

সেই আলোয় দেখা গেল তিন-চারটি মেয়ে এসে ঢুকেছে। মহকুমা-শহর নিশ্চিন্তনগরের একদল আধুনিকা।

স্যাণ্ডেলের চটাচট ধ্বনির কোরাস তুলে মেয়েরা উঠে এল বারান্দায়, হাত তুলে নমস্কার জানালে।—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

—নমস্কার! বেশ তো, আসুন, আসুন।

—সারাদিন পরে আপনি বিশ্রাম করছিলেন, হয়তো বিরক্ত—

—না, না, বিরক্ত কী। বসুন, বসুন। আনোয়ার—আরো তিন-চার পেয়ালা চা দিয়ে যাস বাবা।

মেয়েরা সবাই বসল। দুজন চেয়ারে, বাকি দুজন বেঞ্চিতে। যে মেয়েটির বয়স সব চাইতে অল্প, সে-ই বললে, সত্যি আপনি একটু বিশ্রাম করছিলেন—

—আমাদের আর বিশ্রাম!—এডিথ ক্লান্তভাবে হাসল: ডাক্তারের কি বিশ্রাম করবার উপায় আছে বলুন। পেশেন্টের বাড়ি থেকে ডাক এলেই ছুটতে হবে—তার রাতও নেই, দিনও নেই।

গিন্নী-বান্নী গোছের ভারিক্কী একটি মেয়ে কথা বললে। কপালে বড় করে সিঁদুরের ফোঁটা, হাতের ভারী ভারী সোনার গয়নায় সৌভাগ্যের ব্যঞ্জনা। ভরা গাল দু'টি মেদের সমৃদ্ধিতে চিক্ চিক্ করছে: তবু বেশ আছেন আপনারা। স্বাধীন জীবন—আমাদের মতো লাথি ঝাঁটা খেয়ে তো স্বামীর ঘর আঁকড়ে পড়ে থাকতে হয় না।

—স্বাধীন!—এডিথ ম্লান হাসল। সুন্দর মুখের ওপর দিয়ে ছায়া ভেসে গেল মুহূর্তের জন্যে, চোখের পাতা দুটো যেন ভারী হয়ে আসবার উপক্রম করলে মাত্র এক পলক। স্বাধীন কি সে-ই হতে চেয়েছিল! ঘরের স্বাদ সে পেয়েছিল, তাই পথের দুঃখ আজ তার কাছে খুব উপভোগ্য বলে মনে হয় না।

কিন্তু এডিথ নিজকে সামলে নিলে। ম্লান হাসিটা কৌতুকোজ্জ্বল হয়ে আরো খানিক বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল।—কই, আপনাকে দেখলে লাথি-ঝাঁটা খাওয়া চেহারা বলে তো সন্দেহ করতে পারে না কেউ। বরং প্রচুর ঘি-দুধ না খেলে অমন খোলতাই চেহারা হতে পারে না, আমার ডাক্তারী বিদ্যে তো তাই বলছে।

—ধরেছেন ঠিক—উচ্ছল কণ্ঠে হেসে উঠল অন্যান্য মেয়েরা: সাক্ষাৎ একটি যখ আপনি অমলা-দি। ডাক্তারের চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া সহজ!

হাসি থামলে সব চাইতে অল্পবয়সী মেয়েটিই আবার কথা বললে। ছিপছিপে শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে, দেখলে ষোলো-সতেরো বছরের বেশি বলে মনে হয় না। কিন্তু চোখের সোনার চশমা যেন তার বয়স খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছে—আন্দাজ কুড়ি থেকে বাইশ বছর বয়স হবে মেয়েটির।

—ও-সব আলোচনা থাক। এবার মিস্ সান্যালের সঙ্গে আমরা পরিচয় করে নিই সর্বপ্রথমে। ইনি অমলা-দি—উকিল পূর্ণবাবুর অর্ধাঙ্গিনী—

—নমস্কার।

পূর্ণবাবুর অর্ধাঙ্গিনী বিগলিত হয়ে বললেন, নমস্কার। কিন্তু অর্ধাঙ্গিনী বললি কি রে? বরং বলা উচিত ছিল অমুক বাবু এঁর অর্ধাঙ্গ—

আবার খানিকটা অকারণ উচ্ছলিত হাসি। এডিথের মনে হল অমলা-দি'র হাসির ধরন অনেকটা পুরুষের মতো।

অল্পবয়সী মেয়েটি এবারে ছোট একটু ধমক দিলে। বোঝা গেল আকারে প্রকারে এবং হয়তো বা বয়সে ছোট হলেও—মেয়েটি ছোট নয়, বরং সে-ই এদের দলনেত্রী।—কী খালি খালি হাসছ তোমরা সব! উনি কী ভাবছেন বলো দেখি?

এডিথ বললে, না—না, না, আমি কিছুই—

—হয়তো ভাবছেন না, কিন্তু একটা স্বাভাবিক ভদ্রতার দিক থেকে আমাদের তো ভাবা উচিত। কিন্তু সে যাক—সকলের পরিচয়টা দিয়ে নিই আগে। এ হচ্ছে সন্ধ্যা ঘোষ, এখানকার স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড-মাস্টার রমাপদবাবুর বোন—মহিলা-সমিতির সেক্রেটারী। এ অনিলা দত্ত এবং আমি পূরবী দাশগুপ্ত, আমাদের দু'জনের পেশাই এক, অর্থাৎ এখানকার গার্ল-স্কুলে আমরা পড়াই।

—নমস্কার—নমস্কার—নমস্কার—

আনোয়ার চা এনেছিল। এডিথ বললে, নিন, চা নিন আপনারা।

সবাই চা নিলে, একটু দ্বিধা করে সন্ধ্যা অবধি নিলে। দাদা কোনো কুসংস্কার মানেন না, সুতরাং বৌদির জন্যে ভীত হবার কিছু বিশেষ নেই। কেবল নিলেন না অমলা-দি—একে ক্রীশ্চানের বাড়ি, তার উপরে মুসলমানের চা—গোরু আর শূয়োরের রাজ-যোটক হয়েছে। অমলা-দি আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে যতই মেলামেশা করুন কিংবা যতই প্রগতির কথা বলুন না কেন, এতখানি বরদাস্ত করা তাঁর পক্ষেও শক্ত।

অমলা-দি বললেন, থাক, চা আর আমি নাই খেলাম।

এডিথ হাসল: কেন, আমাদের চা খেতে আপত্তি বুঝি?

—না না, সে সব কিছু নয়—অমলা-দি একটা ঢোক গিলে কাষ্ঠহাসি হাসলেন: আমার আবার অম্বল আছে কিনা, অসময়ে চা সহ্য হয় না। আমার সঙ্গে পানের ডিবে আছে, তা থেকে দুটো পান খাই বরং—কী বলেন?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। তার জন্যে কি আমাকে অনুমতি দিতে হবে?

পূরবী যেন ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। ছোট ছোট পায়ের ছোট ছোট স্যাণ্ডেল দুটো মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে বললে, রাত বেশি হয়ে যাচ্ছে, কাজের কথাটা সেরে নিয়ে

এখন মিস্ সান্যালকে বোধ হয় বিশ্রাম করতে দেওয়া উচিত।

অমলা-দি একসঙ্গে দুটো পান মুখে দিয়ে বললেন, বেশ বেশ। এক থাবা চুন মুখে দিতে গিয়ে গালের পাশে খানিকটা চুন লেগে রইল।

এবার কথা বললে সন্ধ্যা—মহিলা-সমিতির সেক্রেটারী হিসেবে আলোচনাটা শুরু করবার দায়িত্ব তারই। হাতের পোর্টফোলিয়ো থেকে খানকয়েক কাগজ-পত্র বার করলে সে, তারপর গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললে, আমাদের এখানে একটা মহিলা-সমিতি আছে।

—বেশ, ভালো কথা।

—আপনাকে তার মেম্বার হতে হবে।

—বেশ, মেম্বার হবো। চাঁদা কত?

—অ্যাড্‌মিশন দু টাকা—চাঁদা চার পয়সা করে মাসে।

—আচ্ছা, এক্ষুনি আমি মেম্বার হয়ে যাচ্ছি। আনোয়ার, রাইটিং টেবিলের ওপর থেকে আমার ব্যাগটা দিয়ে যা তো বাবা—

পূরবী হেসে ফেলল।—আপনি তো বেশ লোক। কথা পাড়তে না পাড়তেই মেম্বার হতে রাজী হয়ে গেলেন। আর শুধু রাজী নয়—একেবারে নগদ চাঁদা মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। আজকালকার দিনে সভা-সমিতির মেম্বারশিপের জন্যে এমন আগ্রহ তো দেখা যায় না কোথাও।

এডিথ বললে, দেখা হয়তো যায় না। কিন্তু এত রাত্রে আপনারা কষ্ট করে আমার কাছে যখন এসেছেন এবং সামান্য তিনটে টাকারই যখন মামলা, তখন ঝামেলাটা চট্‌পট মিটিয়ে ফেলাই ভালো নয় কি?

সন্ধ্যা হাসল, অমলাও হাসলেন। সন্ধ্যা বললে, তা হলে রসিদ দিই?

পূরবী কিন্তু হাসতে পারল না। তার মনের মধ্যে কোথায় একটা অলক্ষ্য কণ্টক খচ-খচ করে উঠেছে। বললে, আপনি শুধু ঝামেলা মেটাবার জন্যেই চট্‌পট চাঁদাটা দিয়ে আমাদের বিদায় করতে চাচ্ছেন?

এডিথ চোখ তুলল।—তার মানে?

পূরবী সোনার চশমার ভেতর দিয়ে তাকালো এডিথের মুখের দিকে: মানে অত্যন্ত সহজ। সমিতির উদ্দেশ্য কী, কী তার কাজ—কিছু না জেনেই আপনি অসংকোচে এর সদস্য হতে চাচ্ছেন কী করে?

পূরবীর গলায় প্রচ্ছন্ন খানিকটা উত্তাপ যে আছে, দলের প্রত্যেকে সেটা অনুভব করতে পারল। রসিদ লিখতে লিখতে থেমে দাঁড়ালো সন্ধ্যার কলম।

—ওঃ, এই কথা।—এডিথ হাসল: দেখছি সমিতির সভানেত্রী আমাদের এস্.ডি.ও.

সাহেবের বিবি মিসেস্ এল. আহম্মদ। এর পরে তো সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভাববার কিছু নেই। চোখ বুজে ব্ল্যাঙ্ক চেক সই করলেই চলে।

পূরবীর সর্বাঙ্গে বিদ্রোহ দেখা দিল: তার মানে আপনি বলতে চান—

—আমি কিছুই বলতে চাই না—এডিথ খানিকটা অবজ্ঞাভরেই যেন তিনখানা নোট সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে দিলে: আপনাদের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করবার কিছুই তো নেই বাস্তবিক। নারী জাতির উন্নতি হোক—নারী জাতি প্রগতি লাভ করে ধন্য হোক—এ তো চিরকালের খাঁটি কথা। আপনাদের আদর্শ সম্বন্ধে নারী হিসাবে আমার স্বাভাবিক যা সহানুভূতি থাকা উচিত, তাই আছে।

ঝড়ের মেঘ দেখা দিল পূরবীর মুখে: আপনি কি আমাদের অপমান করতে চান?

—অপমান!—এডিথ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে হেসে উঠল: কে কাকে অপমান করতে পারে বলুন। অপমান নির্ভর করে কে কতখানি তাকে অনুভূতির মধ্যে স্বীকার করে নিতে পারে তারই ওপর। নইলে আজ কংগ্রেসের নেতাদের যখন বন্দী করা হল—চূড়ান্ত অপমানে সমস্ত দেশের মুখ যখন কালো হয়ে গেল—তখনও তো এস্. ডি. ও.র পত্নীকে সভানেত্রী করে আমরা নারী-প্রগতির স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু সে কথা যাক। আপনার রসিদ লেখা হয়েছে মিস্ ঘোষ? আর কত রাত করবেন আপনারা?

সন্ধ্যা চমকে রসিদটা এগিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাঝখান থেকে একটা নাটকীয় কাণ্ড করে বসল পূরবী। একটা থাবা দিয়ে সে সন্ধ্যার হাত থেকে রসিদখানা কেড়ে নিলে। বললে, থাক সন্ধ্যা। তিনটে টাকার জন্যে এ ভাবে অপমান সইবার কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না। ধন্যবাদ, আপনাকে মেম্বার হতে হবে না। আর রাতও আমরা করব না—চললাম, নমস্কার।

এডিথ তখনো হাসছে। পূরবীর অগ্নিবর্ষী মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ব্যাপার কী মিস দাশগুপ্ত, এভাবে হঠাৎ চটে উঠলেন কেন?

—ব্যাপার কী, সে তো আপনি নিজেই সব চাইতে ভালো করে জানেন—উত্তেজনায় পূরবী থরথর করে কাঁপছে: কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন। কংগ্রেস নেতাদের বন্দী করা হয়েছে বলে বেদনা বা বিক্ষোভ জানানোর কথা আপনার মুখে অন্তত শোভা পায় না।

এডিথের মুখের মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠল: আমার অপরাধ?

দলের অন্যান্য সকলে বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ব্যাপারটা অথবা কথাবার্তাগুলো কিছুই তারা ভালো করে বুঝতে পারছে না—সবই তাদের কাছে দুর্বোধ্য একটা নাটকের মতো বলে মনে হচ্ছে। অনিলা এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি, এইবারে আলগা ভাবে পূরবীকে ছুঁয়ে বললে, কী করছ?

কিন্তু পূরবীর মাথায় যেন খুন চেপেছে। তীব্র গলায় বললে, অপরাধ! নিজের ধর্ম ছেড়ে যারা মনিবের ধর্মকে মেনে নিয়ে দেশের লোককে ঘৃণা করতে শেখে, তাদের মুখে এ সব কথা প্রহসনের মতোই শোনায়।

—তাই নাকি!—এডিথ হঠাৎ তেমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল। তার মুখের উপর থেকে সমস্ত মেঘ কেটে গেছে—তার অপূর্ব সুন্দর দেহ যেন হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে রূপের তরঙ্গে। বললে, আপনি এখনো ছেলেমানুষ আছেন মিস দাশগুপ্ত। আপনার কথায় আমি রাগ করব না।

ব্যঙ্গভরে পূরবী বললে, ধন্যবাদ—আপনার উদারতা আমার মনে থাকবে। কিন্তু আমি ছেলেমানুষ কিনা সে বিচার আপনার করবার দরকার আছে বলে মনে করি না।

অমলা-দি এতক্ষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—আহা-হা,—কী করছ পূরবী, খালি খালি ঝগড়া করছ কেন? দেখুন মিস সান্যাল—

পূরবী কঠিন গলায় বললে, না, ঝগড়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু এর পরে এখানে থাকবারও আর দরকার নেই অমলা-দি—খালি খালি ওঁর মূল্যবান সময়ই নষ্ট করা হচ্ছে। আচ্ছা, চললাম আমরা, নমস্কার।

হতভম্ব দলটিকে এক রকম টেনে নিয়েই পূরবী নেমে গেল বারান্দা থেকে। একরাশ স্যাণ্ডেলের চটাচট্ শব্দ লন পেরিয়ে, গেট পেরিয়ে মিলিয়ে গেল মহকুমা-শহর নিশ্চিন্ত-নগরের খোয়া-বাঁধানো রাস্তায়।

এডিথ অনুজ্জ্বল আলোকে দাঁড়িয়ে রইল বারান্দাতে। একটা পরুষ-গম্ভীর কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ছে রাত্রির বাতাসে। আজকে বারোই আগস্ট—খবর বলছে অল্-ইণ্ডিয়া-রেডিয়ো। নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোম্বাইতে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে—হাঙ্গামা বেধেছে শহরের নানা অঞ্চলে। আকাশের কোণে যেখানে একরাশ কালো মেঘ ঘন হয়ে ছিল, সেখানে বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছে ক্রমাগত। রাত্রে বোধ হয় ঝড়-বৃষ্টি হবে খানিকটা। শহরের এ পাশে দিগন্ত-প্রসারিত কালো প্রান্তরের বুকে তীব্র স্বরে ঝিঁঝিঁ ডাকছে—ডাকছে কোলা ব্যাং, কাঠ ব্যাং, কটকটে ব্যাং আর সোনা ব্যাং—উল্কামুখীর মুখ থেকে দপদপিয়ে জ্বলছে আলেয়ার আলো!

বিনোদবাবু তাঁর বসবার ঘরে জাজমেণ্ট লিখছিলেন।

পুরোনো ব্যাপার। গরীব আসামী বড়লোক ফরিয়াদীর ক্ষেতে গাই নামিয়ে তার নতুন ফসলের শীষ অর্ধেক সাবাড় করে দিয়েছে। এবং আসামীকে হাতে-হাতেই ধরে ফেলা হয়েছে, তার দুষ্কৃতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণেরও অভাব নেই।

কিন্তু আদালতে দাঁড়িয়ে আসামী যে-কথা বলেছে তাতে বিনোদবাবুর মতো জাঁদরেল

হাকিমও চিত্ত-চঞ্চলতা বোধ করেছেন। লোকটা অত্যন্ত গরীব—এত বেশি গরীব যে, এক বেলা ভাতও তার জোটে কিনা সন্দেহ। বহুকাল আগে ফরিয়াদীর কাছ থেকে সে দশ টাকা ধার করে, কিন্তু লেখাপড়া জানত না বলে ফরিয়াদী তাকে পঞ্চাশ টাকার কাগজে টিপ-সই করিয়ে নেয়। সুদে আসলে দাঁড়ায় দেড়শো টাকার ওপরে—তার ভিটে পর্যন্ত যায় যায়। এর পরে আসে ঋণ-সালিশী বোর্ড, মোট পঁচিশ টাকায় চেয়ারম্যান মামলার নিষ্পত্তি করে দেন। এই পঁচিশ টাকার কিস্তি চালাবার সামর্থ্যও তার নেই। অথচ ফরিয়াদীর পাকেচক্রে তার যথাসর্বস্ব গেছে। যুদ্ধের বাজারে জনমজুরের ভাত জোটে না—শেষ সম্বল একটা গাই, তার চরবার ভুঁই নেই, জাবনা কিনবার পয়সা নেই। তাই রাগে-দুঃখে সে ফরিয়াদীর তিনশো বিঘে ধানী জমি থেকে তার গোরুকে এক পেট ধান খাইয়েছে। হুজুর তাকে যা খুশি শাস্তি দিতে পারেন—তার কোনো আপত্তি নেই, সে তা মাথা পেতেই নেবে। অসংকোচেই তার অপরাধ সে কবুল করে যাচ্ছে।

বিনোদবাবু ভাবছিলেন, কী করা যায়।

আসামী পক্ষের সাক্ষী ছিল লালচাঁদ মণ্ডল। কটা-রঙের মাথার চুল—কঠিন চোয়াল, ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ। সারা গায়ে নীল শিরা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। লোকটা বেপরোয়া—কাউকে ভয় করে না বিশেষ। হাকিমকে নয়, উকিলকে নয়, আদালতকেও নয়। খুব জোরালো সাক্ষ্য দিয়েছিল লালচাঁদ।

—হুজুর, আপনারা বিচার করবেন। এ বেচারা গরীব, এর সহায়সম্বল কিছুই নেই। এক বেলা ভাতও এর জোটে না। তাই এর ওপরে এত জুলুম। এর যথাসর্বস্ব ফরিয়াদীর পেটে গেছে। এ যদি তা থেকে সিকি কাঠা ধান গোরুকে খাইয়েই থাকে, তার জন্যে একে কি শাস্তি পেতে হবে?

ফরিয়াদী পক্ষের মোক্তার কালীসদনবাবু চটে উঠেছিলেন: তোমাকে যা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তার জবাব দাও। তুমি হাকিম নও—তোমাকে মামলার রায় দিতে হবে না।

লালচাঁদের ছোট ছোট চোখ যেন জ্বলে গিয়েছিল।

—তা জানি মোক্তারবাবু। আমি হাকিম নই—কিন্তু সাক্ষী তো বটে। যা সত্যি তা আমি আদালতে দাঁড়িয়ে বলব, কারো চোখরাঙানির ভয় করব না। আজ এই গরীবের ওপর যদি সুবিচার না হয় তাহলে আদালতের ওপরে আমরা ভরসা রাখব কী করে?

কিন্তু বিনোদবাবুর অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কী আশ্চর্য ভাবে বদলে গেছে দিন। কুড়ি বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। তখন দেহাতী মানুষ, বিশেষ করে উত্তর-বাঙলার এই "বাহে" সম্প্রদায় আইন-আদালতকে কী ভয়ানক ভয় করত। সাক্ষীর সমন পেলেই থর থর করে কাঁপত তারা—ভাবত, এইবারেই বুঝি তাদের জিঞ্জীর পরিয়ে কালাপানির

পারে পাঠিয়ে দেবে! তা ছাড়া আদালতে একবার জেরার সামনে তাদের দাঁড় করিয়ে দিতে পারলেই হল। উকিলের একটি ভ্রূকুটিতেই পাকা ঘুঁটি তারা কাঁচিয়ে ফেলত, প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হলেও একটি ধমক খেয়েই সব কিছু গোলমাল করে ফেলত তারা—খুনী মামলার আসামীও বে-কসুর খালাস পেয়ে যেত।

আজ কারা এসব এল, কোথা থেকেই বা এল। আইন-আদালতের সেই সব থম-থম করা উদাত্ত মহিমা। শামলা-পরা উকিল। কাঠগড়া, গম্ভীরমুখ হাকিম, কনস্টেবল, টানা পাখা, নকীবের হাঁক-ডাক, আইনের বই আর নথি-পত্তরের স্তূপ; বটগাছ-তলায় উকিল টাউট আর সাক্ষীদের রহস্যময় ফিস্‌ফাস্ আলোচনা। সবসুদ্ধ মিলিয়ে কী আশ্চর্য ভীতি-রোমাঞ্চিত একটা পরিবেশ। যেন একটা আত্মিক অলৌকিক আবহাওয়া—এখানে এসে ওরা বিহ্বল বোবা দৃষ্টিতে তাকাত—যেন কশাইখানার একদল পশু।

সেই ওরা আজ কী বলছে! বিচারের কথা, আইনের কথা! কলিযুগ কি বদলে গেল না কি? নেংটি-পরা গান্ধী মহারাজ সম্পর্কে বিনোদবাবুর যতটা অনুকম্পাই থাক না কেন, লোকটার যে ক্ষমতা আছে সে কথা মানতেই হবে।

কালীসদন রোষরক্ত চোখে বললেন, ইয়োর অনার, সাক্ষী অত্যন্ত ইম্পার্টিনেণ্ট!

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল আসামী পক্ষের মোক্তার ব্রজেন। নতুন পাস করে এসেছে, খদ্দর-পরা, জেল-খাটা সেদিনকার ছোকরা। লঘু-গুরু জ্ঞান নেই, সিনিয়ার মোক্তার কালীসদনের কথায় তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল সে: প্রত্যাহার করুন।

বিনোদবাবু ধমক দিয়ে বললেন, অর্ডার, অর্ডার।

আদালতে শান্তি ফিরে এল, কিন্তু মনের মধ্যে ক্রমাগত একটা তীব্র অশান্তি বোধ করছেন বিনোদবাবু। কোথায় যেন কিসের একটা অশুভ ব্যঞ্জনা। মাটির তলায় কোন্ একটা অলক্ষ্য স্তরে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর জোড় আল্‌গা হয়ে গেছে না কি!

জাজমেণ্ট লিখতে লিখতে একবার খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন বিনোদবাবু। নীচে ছোট ছেলে প্রমোদের পড়বার ঘর। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে এবার—রাত জেগে পড়াশুনো করে। ছেলেটার মতিগতি এত দিন ভালোই ছিল—লেখাপড়ায়ও মন্দ ছিল না, মাস্টারেরা আশা করেছেন স্কলারশিপ একটা পেলেও পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু কিছুদিন থেকে মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রমোদ আজকাল একটু রাত করে বাড়ি ফেরে—দু-তিনটে অকর্মা ছেলে আসে তার কাছে, নানা রকম তর্ক করে। এলোমেলো ভাবে বিনোদবাবু যা শুনেছেন তাতে মনে হয় সেগুলো পলিটিক্স ছাড়া আর কিছুই নয়।

দু-একবার ভেবেছেন ছেলেটাকে ডেকে ধমকে দেবেন, শাসন করে দেবেন খানিকটা। কিন্তু তাতেও বাধে। এইখানেই অপরিসীম একটা দুর্বলতা তাঁর আছে।

বাইরে জবরদস্ত হাকিম বলেই বোধ হয় পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর প্রতিপত্তিটা কিছু পরিমাণে ক্ষীণ—প্রকৃতির প্রতিশোধ। অথবা অত্যন্ত স্নেহ-প্রবণ মানুষ—আত্মীয়-স্বজনের কালো মুখ তিনি দেখতে পারেন না। কয়েকবার বলি-বলি করেও প্রমোদকে কোনো কথাই তিনি বলতে পারেননি।

তার পরে সেদিন একটা ব্যাপার হয়ে গেছে। সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে চা খাওয়ার সময় আই. বি. ইনসপেক্টর এমদাদ হোসেন তাঁকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। দু'জনে একান্তে দাঁড়িয়ে দুটো সিগারেট ধরাবার পর এমদাদ হোসেন বলেছিলেন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—বলুন।

—প্রমোদ কিন্তু খারাপ দলে মিশছে—ওর মাথায় পলিটিক্সের পাগলামি ঢুকছে। আমি যে-সব রিপোর্ট পেয়েছি, সেগুলো ভালো নয়।

—সে কি কথা!—বিনোদবাবুর বুকের রক্ত মুহূর্তে জল হয়ে গিয়েছিল—মনে হয়েছিল—তাঁর ব্লাড-প্রেসারটা আবার বুঝি বেড়ে উঠবে। হৃৎপিণ্ড দুটো ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দে প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়েছিল—তা কি হয়?

—হয়, মিস্টার চক্রবর্তী, হয়। আমরা 'আই. বি'র লোক—এমন মানুষের এমন খবর দিতে পারি যা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না মশাই। এই নিশ্চিন্তনগরের কোন্ মেয়ে কাকে ক'খানা প্রেম-পত্র মাসে মাসে লেখে সে খবর অবধি জানি—আর আপনার ছেলে যে পলিটিক্স করবার মতলবে আছে, সেটুকুও বুঝতে পারব না?

—কিন্তু—

—কিন্তু নয় মিস্টার চক্রবর্তী—এমদাদ হোসেন অনুকম্পার ভঙ্গিতে হেসেছিলেন: আমি যা বলছি তা পাকা খবর। দেওয়ালে দেওয়ালে আমাদের কান পাতা, কাজেই আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন। আগেভাগেই আপনাকে বলে রাখছি। বেশি বাড়াবাড়ি হলে সার্কেল অফিসারের ছেলে বলেও গভরমেন্ট রেয়াৎ করবে না।

বিনোদবাবু স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন খানিকক্ষণ। ক্লাবের অমন মনোরম আড্ডা, অফিস এবং পরচর্চা মুহূর্তে কটু আর বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল তাঁর গায়ে একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর উঠেছে, তাঁর মাথায় ব্রেন-কন্‌কাশন হয়েছে, তাঁর হাতে-পায়ে ঝিঁঝি ধরেছে, হাঁটুতে বাত দেখা দিয়েছে—এবং বুকে ডবল-নিমোনিয়ার অতর্কিত আক্রমণও অসম্ভব নয়!

ঝড়ের মতো বেগে বিনোদ বাড়িতে এলেন। বজ্রগর্ভ স্বরে ডাকলেন, প্রমোদ!

নিরীহ একটি ষোলো-সতেরো বছরের প্রিয়দর্শন ছেলে সামনে এসে দাঁড়ালো। বড় বড় চোখ দুটি শিশুর মতো সরল—মুখখানা দেখলে শান্ত আর দুর্বলচিত্ত বলে মনে

হয়, মনে হয়; ছেলেটার কবিতা লেখবার কিংবা ছবি আঁকবার অভ্যাস আছে। দুটো আঙুলে কালি, এক হাতে একটা স্কেল। জ্যামিতির এক্সট্রা করছিল বসে বসে। বিনোদবাবু সন্দিগ্ধ হাকিমী দৃষ্টিতে নিজের ছেলের আপাদমস্তক দেখে নিলেন। নাঃ, অসম্ভব। এর ভেতরে রাজনীতির আগুনের একটি স্ফুলিঙ্গও থাকতে পারে না কোনোখানে।

—ডাকছিলেন বাবা ?

—হুঁ, ডাকছিলাম। তুই নাকি পলিটিক্সের দলে মিশেছিস ?

প্রমোদের কোমল শান্ত মুখখানা যেন শক্ত হয়ে উঠল : কে বলেছে ?

—আই. বি. ইনসপেক্টর।

প্রমোদের সমস্ত চেহারাটা মুহূর্তের জন্যে বদলে গেল কি ? না, বিনোদবাবুর চোখের ভুল ? পরক্ষণেই শিশুর মতো তরল আর নির্মল গলায় সে হেসে উঠল।

—ওদের কথা আপনি বিশ্বাস করলেন বাবা ? ওরা কী না বলে !

বিনোদের মন থেকে সঙ্গে সঙ্গে যেন ভার নেমে গেল একটা। বললেন, তা বটে, তা বটে। কিন্তু তুই নাকি যার-তার সঙ্গে মিশছিস ?

—বাঃ, যার-তার সঙ্গে মিশতে যাব কেন আমি।—প্রমোদ অকৃত্রিম ভাবে সত্য কথা বলে গেল, কার সঙ্গে হয়তো একটা কথা বলেছি আর ওরা ধরে নিয়েছে যে আমি পলিটিক্স করছি। আমার কি আর কোনো কাজ নেই বাবা ? পরীক্ষা দিতে হবে না আমাকে ?

—তা বটে, তা বটে।—হঠাৎ এমদাদ হোসেনের ওপর একটা বিজাতীয় ক্রোধে বিনোদবাবুর সমস্ত মনটা ভরে গেল। আই. বি.র লোকগুলোর স্বভাবই এই—অকারণে সুস্থ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলাই ওদের পেশা। প্রমোদ অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারী ছেলে—বিশেষ করে তাঁরই তো ছেলে! সে কখনো ওসব কু-পথে যাবে, এ কি বিশ্বাসযোগ্য! বিশেষ করে বিনোদবাবুর বাড়িতে সামান্যতম রাজনীতিও তো কখনো প্রশ্রয় পায়নি।

—আচ্ছা পড়গে। কিন্তু সাবধান, কখনো মিশবি নে বাজে লোকের সঙ্গে।

—আপনি পাগল হয়েছেন বাবা !—প্রমোদ পড়ার ঘরের দিকে চলে গেল।

পরের দিন এমদাদ হোসেনের সঙ্গে দেখা হতেই বিনোদবাবু বললেন, ছেলেটাকে খুব করে ধমকে দিয়েছি মিস্টার হোসেন।

মিস্টার হোসেন চাপ-দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে হাসলেন : ভালোই করেছেন। লেখা-পড়া করুক, জীবনে উন্নতি করুক—এসব বদখেয়াল যেন মনের কোথাও ঠাঁই না দেয়। আর জানেনই তো আমাদের অপ্রিয় কর্তব্য—বেগে সাইকেল চালিয়ে এমদাদ হোসেন

এস. ডি. ও.র বাংলোর দিকে চলে গেলেন।

কিন্তু আজ রাত্রে জাজমেণ্ট লিখতে লিখতে হঠাৎ প্রমোদের ঘরের দিকে তাঁর চোখ পড়ল। সমস্ত শহর ঘুমিয়ে পড়েছে, রাত প্রায় এগারোটার কাছাকাছি। নিশ্চিন্তনগর মিউনিসিপ্যালিটির অষ্টাবক্র চেহারার কাঠের পোস্টগুলোর ওপরে কাচ-ভাঙা আবরণের ভেতরে মিটমিটে কেরোসিন ল্যাম্পগুলো একটার পর একটা নিবে যাচ্ছে। মফঃস্বল শহর নিশ্চিন্তনগরের সমস্ত কোলাহল আর খোয়া-ওঠা পথে টমটমের শব্দকে ছাড়িয়ে মাঠের দিক থেকে ছড়িয়ে পড়েছে শেয়াল আর ঝিঁঝির তীব্র ঐকতান, আর চারদিকের এই স্তব্ধতার ভেতরে প্রমোদের ঘরে আলো জ্বলছে। তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, কিন্তু এখন—এই রাত্রে তার ঘরে কথা বলছে কে?

বিনোদবাবুর অত্যন্ত আশ্চর্য লাগল। প্রাইভেট টিউটর চলে গেছেন সাড়ে নটার পরেই। বাড়ির আর সকলেই ঘুমিয়েছে বা ঘুমোবার উপক্রম করছে। তা ছাড়া চাকর-বাকর বা আর কারুর পড়বার সময় ওঘরে যাওয়ার হুকুম নেই, পরীক্ষার ক্ষতি হবে প্রমোদের। তা হলে?

বিনোদবাবু কান পাতলেন। টুকরো টুকরো কথার আভাস পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটা অনিশ্চিত সন্দেহে সমস্ত চেতনাটা পীড়িত হয়ে উঠল।

অসমাপ্ত জাজমেণ্ট রেখে বিনোদবাবু জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন—ভালো করে ঝুঁকে তাকালেন প্রমোদের ঘরের দিকে। গলার স্বর কখনো উঠছে, কখনো বা অত্যন্ত নীচু পর্দায় নেমে যাচ্ছে। ব্যাপার কী?

দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। বিনোদবাবু দেখলেন, দু-তিনটি ছেলে নেমে এল নীচে, আবছায়া আলোতে ভালো করে তাদের চেনা গেল না। প্রায় নিঃশব্দ পায়েই তারা সদর রাস্তার দিকে হেঁটে চলে গেল।

এমদাদ হোসেনের কথাগুলো মস্তিষ্কের মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমক দিলে। তাদের ভেতরে কোনো সত্যি নেই তো? মুহূর্তে বিনোদবাবু ব্রেন-কন্‌কাসন, ব্লাডপ্রেসার, বাত আর একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর যেন একসঙ্গেই অনুভব করলেন।

একটা অসহ্য অস্থিরতায় উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর পায়ে চটিটা টেনে নিয়ে বাইরের ঘোরানো সিঁড়িটা দিয়ে নেমে এলেন নীচে। এই সিঁড়ির মুখেই প্রমোদের পড়বার ঘর। জানলা দিয়ে বিনোদ দেখলেন, প্রমোদ একমনে কী লিখে চলেছে।

—প্রমোদ?

প্রমোদ চমকে উঠল।—বাবা!

—হুঁ, আমি।—বিনোদবাবু কঠিন মুখে বললেন, কারা এসেছিল?

—ওঃ, ওরা?—প্রমোদ যেন ছোট একটা ঢোক গিলল: আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড।

—ক্লাস-ফ্রেণ্ড ? তা এত রাত্রে কেন ?

—অঙ্ক কষতে এসেছিল।

—অঙ্ক কষতে ?—বিনোদবাবু তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে মিথ্যা কথা বলছে প্রমোদ—এতদিন পরে তাঁর মনে হল প্রমোদও মিথ্যে কথা বলতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক স্নেহ আর সহজাত একটা দুর্বলতার জন্যেই হয়তো প্রশ্নটাকে ভালো করে যাচাই করে নিতে পারলেন না বিনোদবাবু।

—সে যাক, এত রাত্রে ওদের আসতে বারণ করে দিয়ো।—বিনোদ পেছন ফিরলেন।

—দেবো।

প্রমোদ লেখায় মন দিলে।

চটির শব্দ করে বিনোদবাবু ফিরে এলেন দোতলায়। শরীরের মধ্যে একটা তীব্র অস্বস্তি। মনের চিন্তাগুলো যেন সব বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে। এলোমেলো কতগুলো মুখ আর বিচ্ছিন্ন কতগুলো ঘটনা এখান ওখান থেকে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। সেই লালচাঁদ মণ্ডল। স্বদেশী-করা মোক্তার ব্রজেনবাবু। প্রমোদ কি সত্যি সত্যিই রাজনীতির দলে ভিড়েছে না কি ?

আকাশে কালো মেঘে লাল বিদ্যুৎ ঝলসে চলেছে। রাত্রে ঝড়-বৃষ্টি কিছু একটা হবে নিশ্চয়।

৩

পূরবী আর অনিলা যখন বোর্ডিংয়ে ফিরল তখন পূরবীর মুখখানা যেন ফেটে পড়ছে। জামা-কাপড়ও সে ছাড়ল না, কেবল ফিতে থেকে জুতোটা খুলে সে দূরে ছুঁড়ে দিলে, তার পর গড়িয়ে পড়ল বিছানায়।

পূরবী বড়লোকের মেয়ে। ছেলেবেলা থেকেই যেমন খেয়ালী তেমনি অভিমানী। বাড়িতে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি কথাও কেউ বলতে পারত না। ফোর্থ ইয়ারে পড়বার সময় কলেজ-ইউনিয়ানের ব্যাপারে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে ঝগড়া করে কলেজ ছেড়েছিল। বাড়িতে বাবা মৃদু তিরস্কার করলেন, পূরবী ঝগড়া করলে। বললে, তোমার টাকা আমি চাই না, নিজে স্বাধীনভাবে চলবার শক্তি আমার আছে।

বাবা অনুতপ্ত হয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পূরবী ভোলবার পাত্রী নয়। বাড়ি সে ছাড়লই। খবরের কাগজে ভ্যাকান্সি দেখে দরখাস্ত করে দিলে, এইখানে চাকরি জুটল। স্কুলে তার অগাধ প্রতিপত্তি, হেড্-মিস্ট্রেস্ থেকে সেক্রেটারী পর্যন্ত তাকে ভয়

করেন। নিজের জোরে সে তার বৈশিষ্ট্যকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

আজ এডিথ তাকে একটা মস্ত ঘা দিয়েছে। বিছানায় এলিয়ে পড়ে হিংস্রভাবে পূরবী আঙুল কামড়ে চলল।

ঘরে দুখানা খাট। একখানাতে অনিলা, আর একটিতে পূরবীর আস্তানা। দু'জনে সম্পূর্ণ দু জাতের, তবু একসঙ্গে থাকে বলে পরস্পরের মধ্যে এক ধরনের বন্ধুত্ব আছে। অনিলা ফিট-ফাট, গোছানো। অল্প মাইনের ভেতরে যতটুকু ছিমছাম থাকা যায় সে চেষ্টায় তার ত্রুটি নেই। একটা বেতের টেবিলে অল্প কিছু প্রসাধনী—ছোট্ট একখানা সুন্দর আয়না। ব্র্যাকেটে ফরসা শাড়িগুলো যত্ন করে গুছানো, একটি রঙীন প্যারাসোল। দুটি ফুলদানি আছে, তবে অভিজাত ফুলের অভাবে তাতে আপাতত গোটাকয়েক সপত্র কদমফুল শোভা পাচ্ছে—ইস্কুল থেকে আসবার সময়ে যোগাড় করে এনেছে অনিলা। তা কদমফুল নেহাৎ মন্দ মানায়নি, আর আকাশে ঘন মেঘের নীলাঞ্জন—বেশ একটা সময়োচিত কবিদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে—একটা মৃদু সুগন্ধ ভাসছে ঘরের বাতাসে। বইয়ের সেল্ফে সচিত্র মেঘদূতের একটি সংস্করণ, খানকয়েক উপন্যাস আর ক্লাসের টেক্সট্ বই। ফুল-তোলা রঙীন বেড-কভারে বিছানাটি ঢাকা।

পূরবীর ব্যবস্থা অন্য রকম। একটা ট্রাঙ্কের ওপর জামা-শাড়িগুলো স্তূপাকার হয়ে আছে। ধবধবে শাদা চাদর বিছানো শয্যা—তাতে আধখোলা বই আর কাগজ ছড়িয়ে রয়েছে। অনিলা অনেকবার গুছিয়ে দিয়েছে কিন্তু কোনো ফল হয়নি—পূরবীর স্বভাব নোংরা। প্রসাধনের বালাই নেই বললেই চলে। সেল্ফে রাশি রাশি বই জমে আছে, আর আছে চামড়ার কাজ করবার সরঞ্জাম। দেশ-নেতাদের দু-তিনখানা ছবি শোভা পাচ্ছে মাথার কাছে। পূরবীর এই অগোছালো বিশৃঙ্খলার পেছনে কোথায় যেন একটা আত্ম-সচেতনতার ইঙ্গিত আছে, যেন মেয়েদের স্বভাবসুলভ রুচিবাগীশতাকে সে অনেকটা জোর করেই অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু তার এই রূপ যে তার নিজস্ব ধর্ম নয়, সে পরিচয় মেলে তার এমব্রয়ডারীতে, তার ঝকমকে চামড়ার কাজে।

অনিলা ব্র্যাকেট থেকে একটা শাড়ি নিতে নিতে জিজ্ঞাসা করলে, হাত-পা না ধুয়েই এমন করে শুয়ে পড়লে যে?

—এমনিই, ভালো লাগছে না।

অনিলা অল্প একটু হাসল: খুব ঝগড়া করে এলে তো?

পূরবীর চোখ জ্বলে উঠল। তিক্ত ভাবে বললে, ঝগড়া করব না? ব্যবহারটা একবার দেখলি?

—কথাটা কিন্তু তুমিই খুঁচিয়ে তুললে।

—খুঁচিয়ে তুললাম? মোটেই না। কী অসাধারণ দাম্ভিক! আমরা যেন মানুষই

নয়! কথাটার ধরন লক্ষ্য করিসনি? মহিলা-সমিতি? এস. ডি. ও.র স্ত্রী তার প্রেসিডেন্ট? তার মানে জিনিসটাই একটা প্রহসন—মাঝে মাঝে নারী জাতির উন্নতি সম্বন্ধে দু-চারটে ভালো ভালো আলোচনা—তার বেশি কিছুই নয়।

অনিলা মৃদুস্বরে বললে, কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্যি নেই কি?

—হয়তো আছে।—পূরবী বিছানার ওপরে উঠে বসল। তীব্রভাবে বললে, কিন্তু এই রকম একটা মফঃস্বল শহরের পক্ষে এরও তো দাম কম নয়। যেখানে মানুষের ঘর-সংসার, সিনেমা দেখা, পান চিবানো আর দুপুরে পরচর্চা ছাড়া আর অন্য কাজ নেই—সেখানে এটা একটা নতুন আলো নিশ্চয়।

—উনি হয়তো আরো বেশি আশা করেন।

—আশা করলেই তো হয় না—পূরবী ঝাঁকিয়ে উঠল: স্থান-কাল বলে একটা জিনিস আছে তো। রোমকে রাতারাতি ব্যাবিলন করা যায় না। আসল কথাটা কী জানিস? আমরা এখনো একেবারেই পিছিয়ে আছি—আমাদের যা কিছু চেষ্টা সব ছেলেমানুষী—এইটাই ও প্রমাণ করতে চায়। হাম্‌বাগ!

অনিলা মৃদু হেসে স্নানের ঘরের দিকে চলে গেল। এডিথের ব্যবহার হয়ত সত্যিই খুব ভাল নয়, কিন্তু এক দিক থেকে নিতান্ত মন্দ লাগেনি অনিলার। দু'জনের মধ্যে গভীর আর নিবিড় একটা বন্ধুত্ব সত্ত্বেও মনে হল, এরকম একটা কিছু প্রয়োজন ছিল পূরবীর পক্ষে। পূরবী অত্যন্ত সাধারণ চালে চলে, অত্যন্ত সহজ ভাবে মেশে। কিন্তু সব কিছুর ভেতর দিয়ে প্রবল আত্মপ্রত্যয়—কখনো বা প্রবল একটা দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় পূরবীর আচরণে। নিজের সম্বন্ধে অতি-সচেতনা খানিকটা উন্নাসিক করে তুলেছে ওকে; সকলকে যেন করুণার পাত্র বলে মনে করে—অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের হাত থেকে রাতারাতি সবাইকে মুক্ত করবার জন্যে একটা মহতী ব্রত নিয়ে এখানে আবির্ভূত হয়েছে পূরবী।

—রমাপদবাবুর সঙ্গে আলাপ করলি? টিপিক্যাল্ স্কুল-মাস্টার। ডেজার্টেড্ ভিলেজ, জন গিল্‌পিন আর বড় জোর কিং লীয়ারের ওপরে আর উঠতে পারল না। **Though vanquished, he argues still**—একেবারে নিখুঁত।

অনিলা সংক্ষেপে বলে, হুঁ।

—আর সন্ধ্যা। আধুনিকা হওয়ার ঝোঁক আছে, আই. এ.ও ফেল করেছে বার দুই—অথচ দেখেছিস, খবরের কাগজের একটা পাতা অবধি কখনো পড়ে না। ঘাড়ে গলায় সেরখানেক পাউডার ঢেলে আধুনিকা সাজতে পারে বড় জোর—আর বিলিতী সিনেমা-স্টারদের নাম মুখস্থ বলতে পারে। তবু ওকেই মহিলা-সমিতির সেক্রেটারী করতে হল। শেম।

—হুঁ।

—আচ্ছা, অমলা-দি'টা কী রকম বল্ তো? গিনি সোনা আর পাকা সোনার ডিস্‌টিংশন ছাড়া আর কিছু বোঝে বলে মনে করিস? A lump of flesh and fat—ডি. এইচ. লরেন্সের ভাষায় একটা মাংস-মাখন-খাওয়া কাবুলী বিড়াল মনে হয়। যেন গলায় হাত বুলিয়ে দিলে ঘর্-র্ করে ডাকতে শুরু করে দেবে।

এই তো পূরবীর কথাবার্তার নমুনা। অনিলার সব সময়ে ভালো লাগে না—বরং মাঝে মাঝে অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে মনে হয়। পূরবী শ্রদ্ধা করতে পারে না—একমাত্র নিজেকে ছাড়া কাউকে স্বীকার করতে পারে না। এমন করে কি কাউকে কাছে টানা যায়? মানুষের আকর্ষণ মানুষের সহজ হৃদ্যতায়। পূরবীকে সকলে ভয় করে—পূরবী অনেক পড়েছে, অনেক খবর রাখে। কিন্তু পূরবীকে কেউ ভালবাসে কি? আজ অনিলার মনে হয়েছে—নিশ্চিন্তনগরে এতদিন পরে ওর একচ্ছত্র মানসিক আভিজাত্যের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটেছে—অন্তত ওর চাইতে যে আরো বেশি উন্নাসিক—আরো বেশি এগিয়ে ভাববার ক্ষমতা রাখে। আর এ কথাও মনে হয়েছে—মহিলা-সমিতিকে এডিথ যাই বলুক, অন্তত পূরবী যে অপদস্থ হয়েছে এতে সন্ধ্যা আর অমলা-দি খুশিই হয়েছে মনে মনে।

মুখে সাবান ঘষতে ঘষতে অনিলা ভাবল, এক দিক থেকে এ ভালোই হয়েছে বোধ হয়। চারদিকে সবাই এত ছোট যে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পূরবী ঠিক বুঝতে পারছিল না সে কতখানি উঁচু—তার মাথা কতটা অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে। এবার সে নিজের আয়তনটা সম্বন্ধে স্পষ্ট করে একটা ধারণা নিতে পারবে নিশ্চয়। এতে পূরবীর উপকারই হবে।

আর বিছানাটার ওপর লম্বা হয়ে পড়ে মনের মধ্যে যেন জ্বলে যাচ্ছিল পূরবী। পিঠের নীচে একরাশ বই-খাতা খচ-খচ করে বাজছে—কিন্তু সেদিকে তার কোনো লক্ষ্য ছিল না। ওই নেটিভ ক্রীশ্চান—হয়তো বা য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েটা তাকে তুচ্ছ করতে পারল আজ! পূরবী যত বেশি চটেছে, তত বেশি করে হেসেছে অনুকম্পার হাসি। ফিরিঙ্গী ছোকরাদের সঙ্গে ফ্লার্ট করে বেড়ানো ছাড়া যাদের জীবনে আর কোনো অ্যাম্বিশন্ নেই—তারাও আজ ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে পূরবীকে উপদেশ দিতে আসে: কী দুঃসাহস!

পূরবী উঠে বসল। নাঃ, ও সব দুশ্চিন্তা থাক। এডিথের সম্বন্ধে মনকে এত বেশি শিথিল করে দেওয়ার অর্থ ওকে অত্যন্ত বেশি মূল্য দেওয়া। ওর কথা আর সে ভাববেই না। একটা নেটিভ ক্রীশ্চান মেয়ে—ফুঃ! কতটুকু বোঝে!

তিন দিন পরে।

রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চিন্তনগর। পূরবীদের বোর্ডিংও তন্দ্রার অতলে নিমগ্ন।

—'বন্দে মা-তরম্'—

পৃথিবীর চমক লাগল। ঝিল্লীরব-মুখরিত নিশ্চিন্তনগরের নিশ্চিন্ত পথ-ঘাট চকিত করে হঠাৎ তিন-চারটি কণ্ঠে তীব্র ঝঙ্কার উঠেছে :

—'বন্দে মাতরম্'—

—'কারারুদ্ধ জাতীয় নেতাদের স্মরণ করুন'—

—'আপনার কর্তব্য পালন করুন'—

—'ডু অর্ ডাই'—

পূরবী উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কড়াং কড়াং করে কয়েকটা সাইকেলের শব্দ—ভাঙা ল্যাম্পপোস্টের আলো কিরণ বিকিরণের প্রহসন করছে—তরল অস্বচ্ছ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে সাইকেলগুলো।

হঠাৎ পেছনের একটা সাইকেল থেমে পড়ল। খোলা জানালায় আলোকিত পটভূমির ওপরে একখানা তৈলচিত্রের মতো পূরবীর চেহারাটা সাইকেল-যাত্রীর নজরে পড়েছে। সাইকেল মাটিতে ফেলে সে এগিয়ে এল, তার পর পূরবীর জানালার কাছে গিয়ে বললে, এই নিন—পড়ে দেখবেন।

একরাশি প্যাম্ফলেট।

কিন্তু প্যাম্ফলেটের দিকে পূরবীর নজর ছিল না। সে বিস্ময়াহত হয়ে ছেলেটির মুখের দিকে তাকাল : এ কি তুমি!

ছেলেটি মৃদু হাস্যে বললে, হ্যাঁ।

—তুমিও আছো এই দলে?

ছেলেটি তেমনি হাস্যোজ্জ্বল মুখেই বললে, আজ আর আলাদা কারো কোনো দল নেই পূরবীদি, সবাই এক দলে। স্বাধীনতা কে চায় না বলুন?

—কিন্তু তোমার বাবা—

—খুশি হবেন না। সব সময়ে তো সবাইকে খুশি করা সম্ভব নয়। সে যাই হোক—আপনি কাগজগুলো পড়ে দেখবেন—আমার সময় নেই।

ছেলেটি চলে গেল। দ্রুত সাইকেল হাঁকিয়ে অদৃশ্য হল অন্ধকারের মধ্যে। দূর থেকে তখনো ক্ষিপ্রগামী চোঙার শব্দ আসছে :

—'রাজবন্দী দেশনেতাদের স্মরণ করুন'—

—'আপনার কর্তব্য স্থির করুন'—

—'ডু অর ডাই'—

—'বন্দে মাতরম্'—

আরও আধ ঘণ্টা পরে ছয় সেলের একটা টর্চ আর জন পাঁচ-সাত কনেস্টবল নিয়ে

বেরুলেন এম্‌দাদ হোসেন। কিন্তু কোনোখানে কারো চিহ্ন নেই। অন্ধকার শহরের পথে পথে যারা বজ্র-কণ্ঠে শ্লোগান তুলেছিল, অন্ধকারের মধ্যে তারা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কালো মেঘে মেঘে আকাশটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। দিগন্তে লাল তলোয়ারের ঝলক। অগ্নিময় কশার আঘাতে ঝড়ের ঘোড়াকে তাড়না করে আসছে বিপ্লবের রক্তদূত।

এদিকে ব্রীজের আড্ডা জমেছিল পূর্ণবাবুর বাইরের ঘরে। রাত জেগে খেলা চলছে, বেশ জমাট খেলা।

পূর্ণবাবু আছেন, তাঁর চির-প্রতিদ্বন্দ্বী কালীসদন আছেন, সারদা চক্রবর্তীর ছেলে বরদাবাবু আছেন, শিখ-মোটর-সার্ভিসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী গুরদিৎ সিংও আছে। গুরদিতের মুখে ঘন দাড়ি, মাথায় পাগড়ী, হাতে বালা। এক হাতে উল্‌কীতে লেখা—সৎশ্রী আকাল। আড়ে বহরে আদর্শ পাঞ্জাবী। কিন্তু বাংলা দেশে পঁচিশ বছর থেকে এবং নিশ্চিন্তনগরের নিশ্চিন্ত আবহাওয়ার জারকে জীর্ণ হয়ে সে প্রায় বাঙালী হয়ে গিয়েছে। আঠারো মাইল দূরের রেল-স্টেশন থেকে মেল-ট্রেনের যাত্রীদের নিশ্চিন্তনগরে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে সে অন্যতম কাণ্ডারী।

পূর্ণবাবু আর গুরদিৎ পার্টনার—অন্য দিকে বরদাবাবু আর কালীসদন। গুরদিৎ ভালো খেলতে পারে না, কিন্তু খেলার প্রতি তার একটা অসাধারণ মোহ আছে, আর আছে বাঙালীর সঙ্গে মিশবার একটা ঐকান্তিক ইচ্ছা। অদ্ভুত ভালো মেজাজের লোক গুরদিৎ। কখনো চটে না, প্রায়ই হাসে—হো হো করে হাসে এবং দু'মাইল দূর থেকে সে হাসির শব্দ শোনা যায়। এমনিতে গুরদিৎ পুণ্যাত্মা লোক—এই ছোট মফঃস্বল শহরেও সে একটা ছোট গুরুদ্বার আর শিখ ধর্মশালার বন্দোবস্ত করেছে।

পূর্ণোৎসাহে তাস খেলা চলছিল।

গুরদিৎ খুশি হয়ে বললে, এই দিলাম রুইতনের টেক্কা—

—আর রুইতনের টেক্কা! কালীসদন বললেন, এই করলাম রঙের তুরুপ—

—ছিঃ ছিঃ, করলে কী সিংজী! ক্ষোভে এবং ক্রোধে পূর্ণবাবু হাতের তাসগুলো মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলেন : দিলে তো খেলাটা ডুবিয়ে!

—কেন, টেক্কার পিট নেবো না?

—টেক্কার পিট নেবে, তার আগে তেরোখানা রঙের হিসাব তো নিতে হয়! টেক্কা তো তোমার পালিয়ে যাচ্ছিল না, পরে নিলেই হত। গেল ডাউন হয়ে!

—তাই তো—তাই তো—!—সিংজী অপ্রতিভ হয়ে কাঁচা-পাকা দাড়িগুলো চুলকোতে লাগল :

—আমি ভেবেছিলাম—

—নাঃ—অসম্ভব। তোমাকে পার্টনার নিয়ে বসাই ভুল হয়েছে। এত ভালো তাস হাতে, অথচ খেলাটা ডুবে গেল—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

সিংজী ম্লান হয়ে রইল। বললে, আচ্ছা, আর ভুল হবে না।

পূর্ণবাবু অনাসক্ত বৈরাগীর মতো একটা হরতনের পাঞ্জা ফেলে বললেন, আর কী হবে। চারটের খেলা সিওর, অথচ তিনটে ডাউন দিতে হল।

এক কোণে রমাপদবাবু একখানা ইজিচেয়ারে লম্বা হয়ে কী যেন পড়ছিলেন। অন্-প্রিন্সিপ্‌ল্ তিনি কখনো তাস খেলেন না। তিনি নিজে শিক্ষাব্রতী—অতএব তাঁকে সব দিক থেকে আদর্শ চরিত্রের হতে হবে—'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'—মহাপ্রভু চৈতন্যদেব উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। সেই জন্যে রমাপদবাবু বিড়ি-সিগারেটকে বিষতুল্য মনে করেন, মাথায় দশ-আনি ছ-আনি ছাঁট দেন না ; উপন্যাস পড়েন না, সিনেমা দেখেন না এবং চেস্টারফিল্ডের পত্রগুচ্ছ আর কার্লাইলের প্রবন্ধ থেকে অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেন।

রমাপদবাবু বললেন, তাস খেলা নিয়ে এত বিচলিত হচ্ছেন কেন পূর্ণবাবু? এতেই যদি এত মেজাজ খারাপ করতে হয়, তা হলে কোর্টে গিয়ে মাথা ঠিক রাখেন কেমন করে? তাই চেস্টারফিল্ড বলেছেন—

—না, না, আপনি বুঝতে পারছেন না—

হঠাৎ বাইরে তীব্র ধ্বনি উঠল :

—'বন্দে মাতরম্'—

—'ডু অর ডাই'—

কী ব্যাপার? একসঙ্গে চমকে উঠল সকলে।

—'বন্দী নেতাদের স্মরণ করুন'—

সাইকেলের গতির সঙ্গে দূরে চোঙার কম্বুনাদ মিলিয়ে গেল।

কালীমদন বললেন, জানেন না? সমস্ত ভারতবর্ষ চঞ্চল হয়ে উঠেছে যে। বোম্বাইতে—আহমেদাবাদে ভয়ানক কাণ্ড চলেছে। হ্যাট পোড়ানো হচ্ছে, স্টেশন, ট্রাম জ্বালানো হচ্ছে—সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু হয়েছে দেশে।

গুরদিৎ বললে, তাই নাকি? আর পাঞ্জাবে?

—হ্যাঁ—লাহোরেও হয়েছে।

—ঠিক আছে—সিংজীর মুখ উল্লাসে জ্বলে উঠল : আমার পাঞ্জাব কখনো পিছিয়ে থাকবে না। রাউলাটের হামলা আমার দেশের উপর দিয়েই সব চাইতে বেশি হয়ে গেছে। কামানের সামনে বাচ্চা-জেনানা বুক পেতে দিয়ে তাজা খুনে মাটি রাঙিয়ে দিয়েছে আমার পাঞ্জাব—রণজিৎ সিং—গুরুজীকা পাঞ্জাব!

সিংজীর ভারী গম্ভীর কথার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল—সমস্ত ঘরটা যেন গমগম

করে উঠল একসঙ্গে। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সকলে তার মুখের দিকে তাকালো। সেই সদা-হাস্য স্থূলবুদ্ধি সিংজী এ নয়। এর শিরায় শিরায় যেন দোলা দিয়েছে বিদ্রোহী পাঞ্জাবের রক্ত—'ওয়া গুরুজীকা ফতে' মন্ত্রে যারা মুহূর্তে অনায়াসে মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারত—এ তাদেরই বংশধর।

কিন্তু কালীসদন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

—তাই বলে এখানেও এসব আরম্ভ করবে নাকি ওরা?

পূর্ণবাবু বললেন, আশ্চর্য নয়।

—সে কি! কোর্ট-কাছারী বন্ধ হয়ে যাবে! বলেন কি মশাই—আদালতের কাজকর্ম না থাকলে খাব কী!

পূর্ণবাবু ম্লান মুখে বললেন, তবে তো মুশকিল!

রমাপদবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? সব চাইতে আগে স্ট্রাইক হবে ইস্কুল। খাওয়া চলবে, পরা চলবে—দু'দিন পরে আপনাদের কাছারীও ঠিক নিয়মমতোই চলবে, কিন্তু ইস্কুলের দফা কত দিনের জন্যে গয়া—তার ঠিক নেই। যেন স্বাধীনতা পাওয়ার পথে একমাত্র শত্রু হচ্ছে শিক্ষা, আর যেন তেন প্রকারে ওই শত্রুটাকে নিপাত করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য।

কালীসদন বললেন, ঠিক কথা। স্বাধীনতার জন্যে লড়াই হচ্ছে—সে বেশ জিনিস। স্বাধীনতা কে না চায়? কিন্তু তাই বলে আমাদের ঘাড়ের ওপর কেন? কলকাতায় হচ্ছে হোক—বোম্বাইতে হচ্ছে হোক—কিন্তু নিশ্চিন্তনগরে? কোর্ট বন্ধ করে, ইস্কুল বন্ধ করে? এ সব স্বাধীনতার অর্থ বুঝি না মশায়।

সবাই চুপ করে রইল। কেবল যে লোকটি এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল সে-ই বিড়-বিড় করে কিছু একটা বললে, কিন্তু কেউ শুনতে পেল না। বরদা অনেকটা স্বগতোক্তি করলে: সে বোঝবার মতো মগজ তোমার নেই বাপু।

আর সকলকে আশ্চর্য করে দিয়ে হঠাৎ ছাদ-ফাটানো হাসি হেসে উঠল সিংজী। প্রকাণ্ড দেহটা দুলে উঠল—ঘন দাড়ির ফাঁকে প্রকাণ্ড মুখের বত্রিশটা দাঁত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটা অপরিসীম কৌতুকের উচ্ছ্বাসে।

—হাঃ হাঃ হাঃ। এ বড় চমৎকার কথা। আমরা কিছু করব না—চাকরি চলবে, ব্যবসা চলবে—আর কলকাতা বম্বাইতে লড়াই হয়ে স্বাধীনতা এসে যাবে। এমন মুফৎ স্বাধীনতা আসে না কালীবাবু। সবাইকেই দিতে হয়, সবাইকে কাজ করতে হয়। অনেক শিখের কলিজার রক্ত দিয়ে পাঞ্জাব বড় হয়েছিল—খবরের কাগজ পড়ে নয়।

সিংজী উঠে দাঁড়ালো। বললে, আচ্ছা—আপনারা বসুন। ঢের রাত হয়ে গেছে, আমি এবার উঠলাম।

অন্ধকারের মধ্যে নেমে দ্রুত চলে গেল সিংজী। পাঞ্জাব উত্তাল—বোম্বাই উতরোল। ঘরের কোণে তাস খেলতে মনের কোণে কোথায় যেন বাধে। মুক্ত রক্ত—উন্মাদ পদাতিক আর অশ্বারোহী বাহিনীর বিজয় অভিযান এখনো শিখের মনে শুধু স্মৃতির স্বপ্নবিলাসই নয়। ইতিহাসের অরণ্য থেকে পাঞ্জাব-কেশরীর গর্জন স্নায়ুরন্ধ্রে মেঘমন্দ্ররবে ধ্বনিত হচ্ছে। সিপাহী-বিদ্রোহে যে রক্ত একবার মাতাল হয়ে উঠেছিল, যে রক্ত বারে বারে নেচে উঠেছে নানা ঐতিহাসিক আবর্তন-আলোড়নে—আজ তা কি আবার কোনো নতুন ছন্দে বন্যা বইয়ে দিতে চায়!

আর ঘরের মধ্যে পাশাপাশি চুপ করে রইলেন পূর্ণবাবু, রমাপদবাবু, কালীসদন-বাবু। খবরের কাগজ এক কথা—'কুইট ইণ্ডিয়া' নিয়ে পাবলিক লাইব্রেরীর বারান্দায় বাদ-বিতণ্ডা করাও এমন কিছু শক্ত কথা নয়। কিন্তু ঝড় কে চায়—নিজের জীবনে, নিজের ঘুমন্ত প্রশান্ত অবকাশকে কে চায় বিঘ্নিত করতে! স্বাধীনতা আসুক—সত্যাগ্রহ হোক—কিন্তু আমার ছেলেটি স্বদেশী না করলেই আমি খুশি হবো। তার ওপরে আমার কত আশা, কত ভরসা। যদি কোনোমতে 'ল'টা পাস করতে পারে, তা হলে আমার পসার নিয়েই তো বেশ জাঁকিয়ে বসতে পারবে। আর ব্যানার্জি সাহেবকেও বলা আছে: কোনোমতে থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিকটা তরে যেতে পারলে সিভিল কোর্টে একটা চাকরি নির্ঘাৎ। তাই তো বলি বাপু, গরীবের ছেলের ও-সব ঘোড়া রোগে দরকার কী! স্বাধীনতা আসবে, নিশ্চয় আসবে। আমাদের গান্ধী আছেন, জহরলাল আছেন, সুভাষচন্দ্র আছেন;—কত সোনার টুকরো ছেলে আছে—যারা জেলে যাচ্ছে, লাঠি খাচ্ছে, দ্বীপান্তরে চালান হচ্ছে, ফাঁসিতে ঝুলছে। কিন্তু তা দিয়ে তোমার কী! তুমি চাকরি-বাকরি করো, দুটো পয়সা এনে বাপ-মাকে দাও, বিয়ে-থা করো, নাতি-নাতনী হোক, দেখে আমরা চক্ষু সার্থক করে যাই। মেয়েটা বাড়িতে বসে রেকর্ড থেকে 'বন্দে মাতরম্' শেখে শিখুক, কিন্তু খবর্দার কখনো যদি দেখি যে রাস্তায় মিছিলে নেমে 'বন্দে মাতরম্' বলে চিৎকার করেছে, সেই দিনই কিন্তু ইস্কুল ছাড়িয়ে দেব—এই তোমাকে বলে রাখলাম গিন্নী। বাপ-মাকে মেরে ও-সব স্বদেশী-ফদেশী করা চলবে না।

শহরের রাস্তায় এম্‌দাদ হোসেন তখনো ছয় সেলের টর্চ হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কনেস্টবলদের পাঠিয়ে দিয়েছেন চারদিকে। রাস্তায় রাস্তায় চোঙ্গা ফুঁকে যারা নিশ্চিন্ত-নগরের নিশ্চিন্ত বিশ্রামকে বিড়ম্বিত করে তুলেছিল, তারা কোন্ দিকে গেল, পালালো কোন্ পথে?

এম্‌দাদ হোসেনের মুখের ওপরে অন্ধকার ঘনালো। লক্ষণ ভালো নয়।

সাব-ইন্‌স্পেক্টার আদিত্য বললে, কী মনে হচ্ছে স্যার?

—ট্রাবল্ অনিবার্য। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ আদিত্য!

—বলুন।

—যারা সাইকেলে করে টহল দিচ্ছিল, অন্ধকারে তাদের তো চিনতে পারলাম না। কিন্তু একজনের গলার স্বর আমার অত্যন্ত চেনা বলে মনে হল।

—কার?

—প্রমোদের।

—প্রমোদ! আদিত্য বিস্মিত হয়ে বললে, বিনোদবাবুর ছেলে!

—নিঃসন্দেহ। চলো তো একবার দেখে আসি।

বিনোদবাবু নিজের ঘরে বসে জাজমেণ্ট লিখছিলেন। এম্‌দাদ হোসেনের ডাকা-ডাকিতে নেমে এলেন নীচে। বললেন, কী ব্যাপার, এমন অসময়ে হৈ-চৈ কেন?

—আপনার ছেলে কোথায়? প্রমোদ?

—অ্যাঁ!—বিনোদবাবুর বুকের রক্ত যেন শুকিয়ে গেল: কেন, পড়ছে।

—না, পড়ছে না। তার ঘর অন্ধকার।

—সে কি, গেল কোথায়? বিনোদবাবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

—এত রাত্রে ছেলে কোথায় বেরিয়ে যায় সেটা তো বাপেরই জানবার কথা সকলের আগে—এম্‌দাদ হোসেনের মুখের রেখা কঠোর হয়ে উঠতে লাগল।

—আঁ—আঁ—দাঁড়ান দেখি—অন্দরের দিকে পা বাড়াবার উপক্রম করলেন বিনোদ-বাবু।

—মিথ্যে খুঁজছেন মিস্টার চক্রবর্তী—এম্‌দাদ হোসেন যেন তীব্রস্বরে ধমক দিলেন একটা: আমরা জানি সে কোথায়। দেশ-মাতাকে স্বাধীন করবার প্ল্যান নিয়ে কোথায় রাস্তায় রাস্তায় চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছে। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলেন মিস্টার চক্রবর্তী। অথচ এবারে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার ফার্স্ট নমিনেশন পেপার গিয়েছিলো আপনারই।

কিন্তু বিনোদবাবু কোনো জবাব দিলেন না। তাঁর চোখের সামনে পৃথিবীটা হঠাৎ যেন সৃষ্টির আদিম রূপে ফিরে গিয়েছে—আকারহীন অবয়বহীন পেঁজা তুলার মতো খানিকটা রক্তবর্ণ গাঢ় ফেনার মতো দিগ্‌-দিগন্ত গাঁজিয়ে উঠেছে। শুধু কানের কাছে একটা অস্ফুট শব্দ বাজছে: বিজ্‌ বিজ্‌ বিজ্‌। টগ্‌বগ্‌ করে কোথায় যেন শব্দ করে কী ফুটছে: রক্ত না আল্‌কাতরা?

এম্‌দাদ হোসেন সভয়ে বললেন: এ কি—মিস্টার চক্রবর্তী! দেখুন, বাড়ির সবাই দয়া করে একবার বাইরে বেরিয়ে আসুন তো। আদিত্য, দৌড়ে যাও, জল আনো খানিকটা। কী দুর্ভোগ! হ্যাঁ—হ্যাঁ—পাখা চাই। একখানায় কুলুবে না—দু'খানা।

প্রমোদ সত্যিই ঘরে ছিল না।

নিশ্চিন্তনগরের সীমা ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে চলেছে তারা। এ পথ পীচ-ঢালা মোটরের রাস্তা নয়। রেল-স্টেশন থেকে যে পথ দিয়ে মসৃণ স্বচ্ছন্দ গতিতে আসে মোটর, আসে সভ্য আর মার্জিত মানুষ; আসে খবরের কাগজ আর ডাকের ব্যাগ, দিল্লী-বোম্বাই-কোলকাতার যাত্রী আর রয়টার-গ্লোব-এ-পি-ইউ-পি মারফৎ বিশাল মহা-পৃথিবীর বার্তা—আজ আর সে পথে ওরা চলছে না। ওরা চলেছে সেইখান দিয়ে—যেখানে মোটর এক পা এগুতে গেলে কর্ণের রথচক্রের মতো মেদিনী তাকে গ্রাস করবে। যেখানে পথের ধারে বড় বড় বাড়ি নেই, রেডিয়োর তার নেই, টেলিগ্রাফের পোস্ট নেই। যেখানে মাঝে মাঝে ভাঙা ঘর, অসংলগ্ন বস্তি। ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের চিরন্তন এবড়ো-খেবড়ো পথ—ধুলো উড়ছে রাশি রাশি—হাঁ করে আছে পঙ্ককুণ্ড। রাঙা-মাটির টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তালের শ্রেণী—ডানা মুড়ে ঘুমিয়ে আছে শকুন, কখনো বা আকাশে এরোপ্লেনের রক্তচক্ষু দেখে পাখার ঝাপট দিয়ে জেগে উঠছে। অন্ধকার গড়িয়ে চলেছে চারদিকে। প্রসারিত ধান-খেতের মাথার ওপরে অনির্বাণ নক্ষত্র-বাসর। শেয়ালের ডাক—ঝিঁঝিঁর একতান—কাঠ-ব্যাং আর কোলা-ব্যাংয়ের সম্মিলিত কোলাহল। ভাদ্রের ভরা-নদী ঝপাস্ ঝপাস্ করে পাড়ি ভাঙছে, কাশবনের মধ্যে কুণ্ডলী পাকানো সাপেরা সে শব্দে একবার নাড়াচাড়া দিয়ে উঠেই আবার ঘুমিয়ে পড়ছে।

নদী পার হয়ে চারটে সাইকেল চলেছে। এত ধুলো—এত অসমতল, পদে পদে বাধা পাচ্ছে সাইকেলের স্বচ্ছন্দ গতি। ব্রজেন নেমে পড়ল।

—কী হল ব্রজেনদা?

—চেন খুলে গেল।

—তাড়াতাড়ি করে নাও—ওরা হয়তো কখন থেকে মাঠের মধ্যে এসে বসে আছে।

—এই এক মিনিট।

তিন-চারটে টর্চের আলোয় চেনটা ঠিক হয়ে গেল। আবার যাত্রা। নিঃশব্দ—নির্বাক্। শুধু সাইকেলের শব্দমুখর চাকার নীচে ধুলোয় ভরা পথটা অতি কষ্টে পেছনে সরে যাচ্ছে। পথের ধারে নয়ানজুলিতে ব্যাংয়ের ডাক—ঘাসের মধ্যে ঝিঁঝিঁর ডাক ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েই আবার দ্বিগুণ বেগে মুখর হয়ে উঠছে।

—ভাতারমারীর মাঠ আর কত দূর?

—আরো মাইল খানেক।

—সেইখানেই ওরা জমায়েৎ হবে তো?

—সেই রকমই তো কথা আছে। তাড়াতাড়ি চলো ভাই।

—তাড়াতাড়ি তো চলতে চাই। কিন্তু যা ধুলো!

অন্ধকারে ব্রজেনদা মিষ্টি করে হাসল: শহরের ছেলে, ধুলোয় তো কখনো পা দাও

না। আমাদের মতো চাষাদের সঙ্গে মিশলে দু'দিনেই ধুলোর মধ্যে সাইকেল চলা শিখতে পারবে নিশ্চয়।

একজোড়া কিশোর চোখ দপ্‌ দপ্‌ করে উঠল। সাইকেলে জোর প্যাড্‌ল্ করতে করতে সে সুর ধরলে :

'উষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা ঘুচাবো তিমির-রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল—'

—সাবাস্ ভাই, সাবাস্।

তাল গাছ, ধানের ক্ষেত—ঘুমন্ত গ্রাম আর মৃত্যুমগ্ন বাংলা দেশকে পেছনে ফেলে সাইকেল এগিয়ে চলেছে। তারপর যখন ওদের চমক ভাঙল, তখন সামনে দেখা দিয়েছে কালো রাত্রির বুকে রহস্য-প্রসারিত আদি-অন্তহীন ভাতারমারীর মাঠ। হু হু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে—কেঁপে উঠছে তালের পাতা, আর যেন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কোনো এক মৃত্যু-পথিকের অসহায় গোঙানি : মরে গেলাম রে বউ, পানী দে, এক ফোঁটা পানী দে আমাকে—

কিন্তু আজ শুধু একটি মানুষের নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের, কোটি কোটি ক্ষুধার্ত প্রাণের কান্না উঠছে ভাতারমারীর মাঠে। তাদের মুখের গ্রাস, তাদের তৃষ্ণার জল ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ হাত—রোমশ, কর্কশ—রক্ত-লোলুপ নখর-শোভিত কোটি কোটি হাত। যুদ্ধ ঘনিয়েছে—দুর্ভিক্ষ নেমে আসছে—প্রতিদিনের পীড়নে কশাইখানার পশুর মতো নির্বিকার অপ্রতিবাদে প্রাণের অর্ঘ্য ঢেলে চলেছে তারা। কিন্তু হিসাব-নিকাশের দিন আজ। ভাতারমারীর মাঠে শুধু মৃত্যুর কান্না নয়—নবযুগের নব-জাতকের জয়ধ্বনি।

রাত্রির বুক চিরে জ্বলছে পনেরো-বিশটা রক্তাক্ত মশাল। কত মানুষ জড়ো হয়েছে এখানে? একশো, দুশো, তিনশো, চারশো? কোনো হিসেব নেই। এ ডাক স্পেশ্যাল-অফিসারের নয়—চৌকিদারের হাঁকে এরা দলে দলে যুদ্ধসংক্রান্ত বক্তৃতা শোনবার জন্যে এসে জড়ো হয়নি। এ আহ্বান ওরা শুনেছে নিজের সত্তার ভেতর থেকে—শুনেছে স্নায়ু-শিরার রক্ত-কল্লোলে। পনেরো-বিশটা মশালের আলোয়—এই জনশূন্য বিশাল প্রান্তরে এই মানবগুলো যেন অন্য কোনো জগতের বাসিন্দা। রাজবংশী আর সাঁওতালের ভীতি-বিহ্বল মুখ—যারা পৃথিবীর মাটির সব চাইতে অন্তরঙ্গ আত্মীয় অথচ পৃথিবীর কাছেই চিরকাল অপরাধী হয়ে আছে—তারা আজ কোন্ নতুন অধিকারে হঠাৎ আত্ম-চেতন হয়ে উঠল এমন ভাবে যে সে মুখে নির্ভীক নিঃসংশয়তার বজ্র-কঠোর রেখা পড়েছে এসে?

চারটে সাইকেলের শব্দে মানুষগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। জনশূন্য তিমির-প্রান্তরে

মশালের লাল আলোয় দুলতে লাগল কতগুলো দীর্ঘ ছায়া প্রেতচ্ছবির মতো। আর সকলের আগে এগিয়ে এল লালচাঁদ মণ্ডল।

—আপনারা এসেছেন বাবু?

ব্রজেন বললে, হাঁ, এসে পড়েছি। তার পর, সব জমায়েত হয়েছ তোমরা?

—দেখতেই পাচ্ছেন।—লালচাঁদ মশালের আলোয় ভয়ঙ্কর ভাবে হাসল: যারা আসেনি—তাদের এখনি এনে দিচ্ছি। এই—নাগারা!

—ডুম—কড়্-র্-র্—

ভাতারমারীর মাঠে ডঙ্কা বাজল সাঁওতালদের। ডুম্—কড়্-র্-র্—আকাশের ভীতি-সংকীর্ণ বুক চিরে মন্দ্রিত হল রণবাদ্য। পায়ের তলায় যেন মাটি থর্-থর্ করতে লাগল, শিউরে উঠতে লাগল ধানের শীষ!

—কড়্-র্-র্—ক্র্যাং—

চারদিক থেকে প্রবল কল্লোল। জনসমুদ্রে জোয়ার। দলে দলে মানুষ ছুটে আসছে—গ্রাম ছাড়িয়ে—মাঠ পেরিয়ে। দূরে কাছে নাচছে রাশি রাশি মশাল। পৌণ্ড্রবর্ধনের সমাধিস্তূপ ভেঙে ছুটে আসছে গৌড়ীয় বাহিনী।

কিন্তু নিশ্চিন্তনগর অনেক দূর। এম্‌দাদ হোসেন সেখান থেকে এই রণডঙ্কার করাল নির্ঘোষণ শুনতে পেলেন না।

৬

সকাল বেলা চা খেয়েই বেরুল এডিথ। রুগী দেখতে হবে। উকীল সারদাবাবুর একমাত্র মেয়ে, বড়লোকের দুলালী। প্রথম সন্তান-সম্ভবা বলে বাপের বাড়িতে এসে উঠেছে। ক'দিন থেকেই তার পেটে একটা যন্ত্রণা—অবশ্য অসময়ে।

এডিথ দেখে এল মেয়েটিকে। ফল্‌স পেইন। সমস্ত মনটা অত্যন্ত তিক্ত হয়ে গিয়েছে। এই বড়লোকের মেয়েরা যে কী জাতীয় জীব সেটা সে এখনো বুঝে উঠতে পারল না। সাংসারিক কাজে কুটোটি ভেঙে দু'খানা করতে জানে না—তা বরং নাই জানল; কিন্তু এক-আধটু এক্সারসাইজ তো করা দরকার। কিন্তু সে সব কিছুই নয়, থলথলে খানিকটা মাংসপিণ্ড মাত্র। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে বুক ধড়ফড় করে—এক ঘণ্টা বই পড়লে নাকি চোখে অন্ধকার দেখে। এই অপদার্থের দল পৃথিবীতে কী কারণে বাঁচে এবং অনাবশ্যক ভাবে খানিকটা অক্সিজেন আত্মসাৎ করে, সেটা অনুমান করা এডিথের সাধ্যায়ত্ত নয়। বীরপ্রসবিনীর জাতিই বটে! তাই প্রথম সন্তানটির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আসে

যমরাজের পরোয়ানা। যারা টিঁকে থাকে, সারা জীবন নানা ব্যাধির ভারে বিড়ম্বিত হয়, স্বামীকে আর সংসারকে বিব্রত করে তোলে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এডিথ আসছিল। ওই আহ্লাদী পুতুল মেয়েটা তার সমস্ত সকালকেই যেন অশুচি করে দিয়েছে। বলেছিল: একটু এক্সারসাইজ করতে পারেন না? ওতে খারাপ এফেক্ট হয়।

রোগিণী বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে, ডাম্বেল-মুগুর করতে বলেন নাকি?

—না না, অত বীরত্বে কাজ নেই। একটু ফ্রী-হ্যাণ্ড—

—আচ্ছা দেখব—রোগিণী মস্ত একটা হাই তুলে বললে, দেখুন, শুয়ে থাকতেই আমার ভালো লাগে। ও-সব আমার ধাতে সইবে না।

—ধাতে সইবে না তো—একটা কটু গালাগালি এসেছিল এডিথের মুখে। কিন্তু এই অকালপক্ক একটা অপোগণ্ড মেয়ের সঙ্গে তর্ক করতে ইচ্ছে হল না। সামলে নিয়ে বললে, চেষ্টা করবেন। দিনরাত শুয়ে থাকলে ক্ষতি হবে আপনারই—

মেয়েটি অপ্রসন্ন মুখে জবাব দিলে: হুঁ,—ওরে রামপিয়ারী, একটু হাওয়া দে—একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠলাম যে—

এডিথ আর কথা বাড়ায়নি। ভিজিটের টাকা ক'টা নিঃশব্দে ব্যাগে পুরে যখন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিল, রোগিণীর স্পষ্ট তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তার কানে এল: আরে রেখে দাও তোমাদের লেডী ডাক্তার। কলকাতায় অমন গণ্ডা গণ্ডা দেখে এলাম। উনি বলেছেন মেডিক্যাল্ কলেজে আমাকে নিয়ে গিয়ে—

এডিথ হেঁটে চলছিল। অপূর্ব সুন্দর দেহভঙ্গিমার তালে তালে পায়ের জুতোটা বাজছিল খোয়া-ওঠা পথের ওপরে। কোনো দিকে না তাকিয়েও এডিথ টের পাচ্ছিল চারদিক থেকে অসংখ্য চোখ যেন আপাদমস্তক গিলে খাচ্ছে তার। নয়ন-বাণ কথাটা যদি সত্যি সত্যিই বাণরূপ পেত, তা হলে অনেকক্ষণ আগেই শরশয্যা রচিত হয়ে যেত তার।

একজন পথচারী যেতে যেতে তাকে ছোট একটা ধাক্কা দিয়ে গেল—কে একজন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে শিস্ দিলে বেশ টানা দীর্ঘছন্দে। 'দি গ্র্যাণ্ড নিশ্চিন্তনগর র‍্যাস্তর‍াঁ' থেকে একজন দরদ-ভরা গলায় ভাটিয়ালী ধরলে:

"বন্ধুর বাড়ী আমার বাড়ীর মধ্যে মানের বেড়া,
হাত বাড়াইলে না পাই লাগাল
আমার এমনি কপাল পোড়া,
প্রাণ-কোকিলা রে—"

ভরা ভাদ্র মাসে কোকিল ডাকে না—তা ছাড়া সকালের এমন চমৎকার রোদকে

নিশিরাত বলে কল্পনা করবারও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই কোনো। সুতরাং ব্যাপারটা রূপক এবং বিশেষ ব্যঞ্জনাপূর্ণ। কিন্তু এ পুরোনো ব্যাপার—নিত্য-নৈমিত্তিক; অভ্যাস হয়ে গেছে—তেমন করে আর গায়ে লাগে না।

হঠাৎ মনে পড়ল প্রভাসকে। যাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার আশা করেছিল—অথচ যাকে নিয়ে ঘর বাঁধা গেল না। ওদের দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো পৃথিবী। অপমানিতের পৃথিবী—লাঞ্ছিতের পৃথিবী। যেখানে মানুষ নামগোত্রহীন—যক্ষপুরীর তাল তাল সোনার দেশে শুধু সংখ্যা; রাজর্ষি জনক আর বীরশ্রেষ্ঠ হলায়ুধের হলধারী যে বংশধরদের আজ রাজ্য নেই, আয়ুধ নেই—অন্নও নেই।

প্রভাস বললে, দুঃখ করো না রেখা। আমি পারলাম না। আমার কাজের মধ্যে তোমাকে ডাক দিয়েছিলাম—দেখলাম সেখানেও তোমার মন সাড়া দিচ্ছে না। তাই আমিই চলে যাই।

হাতের মধ্যে থেকে মুখ না তুলেই রেখা বলেছিল,—যাও।

—তুমি কিছু ভেবো না। ঘর বাঁধতে কি সবাই পারে? তা ছাড়া তুমি তো স্বাধীন—তোমার শিক্ষা আলাদা, সংস্কার আলাদা। তুমি পথ চলতে জানো, পথ চলতে ভালোও বাসো। ঘরের গণ্ডী থেকে মুক্তি পেলে—এ ভালোই হল।

হায় রে ঘরের গণ্ডী—হায় রে মুক্তি! যে সব মেয়ে সত্যিকারের কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজেদের সহজাত নারীত্বের সংস্কারকে জয় করেছে, তাদের কথা এভিথ জানে না। কিন্তু ওর নিজের দিক থেকে এবং আরো বারো-আনা মেয়ের তরফ থেকে এ কথা ও জোর করে বলতে পারে যে এমন অসহায় ভাবে এত বড় পৃথিবীতে ওরা চলতে চায় না। ইয়োরোপ বলো, আমেরিকা বলো—পৃথিবীর যে প্রান্তের কথাই বলো—মেয়েদের সঙ্গে সকলেরই যেন একটা নির্ভুল খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। যে স্বাধীনতা পুরুষের হাত দিয়ে মেয়েদের কাছে এসে পৌঁছেচে, তারই সুযোগ নিয়ে মেয়েদের চূড়ান্ত অসম্মান করে পুরুষেরাই। প্রভাস কেমন করে জানবে কত দুঃখে, কতখানি বাধ্য হয়ে পথে নামতে হয় আধুনিকাদের। ভুয়া শিভাল্‌রির মুখোশ যখন-তখন খুলে যায়—বেরিয়ে আসে কুৎসিত লালসাতুর মুখ-বিকৃতি। প্রতি পদে অসম্মান—প্রতি পদে বাক্যবাণ সারা গায়ে এসে বিছুটির মতো জ্বালা ধরিয়ে দেয়। লজ্জায় মাথা মাটিতে নুয়ে যায়—মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করতে।

আর সেই জন্যেই পথ চলতে হয় অত্যন্ত কঠিন হয়ে—অতিশয় রূঢ় হয়ে। একটু শৈথিল্যের পরিচয় দাও, খেয়াল-খুশিতে একটুখানি হেসে ওঠো—অমনি ট্রামগাড়িতে পাশের সীটে বসা তরুণটি কল্পনা করে নেবে তুমি তার প্রেমে পড়ে গেছ। আর পরবর্তী ইতিহাস তো জলের মতো সরল আর তরল।

কিন্তু এডিথের তত্ত্ব-চিন্তায় বাধা পড়ে গেল। সিনেমা-হাউসের সামনে ছোট এক-ফালি মাঠের মতো পড়ে আছে। চোখে পড়ল সেখানে অনেকগুলি মানুষ জমেছে। বেশির ভাগ স্কুলের ছাত্র—বেকারের দলও আছে কিছু। সভা হচ্ছে ওখানে। ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ছে—ধ্বনি উঠছে—'বন্দে মাতরম্'! রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে একদল কৌতুহলী দর্শক।

নিজের অজ্ঞাতেই এডিথ দাঁড়িয়ে গেল। কংগ্রেস বে-আইনি, সমস্ত সভা-সমিতির ওপরে নেমেছে একশো-চুয়াল্লিশের কঠোর অনুশাসন। কোন্ ভরসায় এখানে এমন করে মিটিং জমিয়েছে ওরা?

হঠাৎ দূরে নারীকণ্ঠে ধ্বনি উঠল : বন্দে মাতরম্—

এবার সমস্ত লোকের দৃষ্টি ঘুরে গেল সেই দিকেই। মফঃস্বল শহরের খোয়া-ওঠা পাথর-বাঁধানো পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে আর একটি শোভাযাত্রা। এ দলে পুরুষ নেই—সমস্ত মেয়ে এবং তার সব কয়টিই স্কুলের ছাত্রী। তাদের সকলের আগে আসছে পূরবী। তার কাঁধে পতাকা।

—'বন্দী দেশনেতাদের স্মরণ করুন'—

—'আপনার কর্তব্য পালন করুন'—

কল্লোলিত জনতা আরো বেশি উতরোল হয়ে উঠল—হয়তো মেয়েদের দেখেই নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে অকস্মাৎ সচেতন হয়ে উঠল তারা।

—'বন্দী দেশনেতাদের স্মরণ করুন'—

—'মহাত্মা গান্ধী কি জয়'—

—'পণ্ডিত জহরলাল কি জয়'—

—'রাষ্ট্রপতি আজাদ কি জয়'—

—'বন্দে মাতরম্'—

পূরবী আসছে সকলের আগে আগে। তার পেছনে পেছনে সন্ধ্যা। পূরবীর একনিষ্ঠ ভক্ত সে—তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলে সব সময়ে। কিন্তু পূরবীর বন্ধু অনিলা নেই—পূর্ণবাবুর অর্ধাঙ্গিনীও নেই।

রাত্রে সেই প্যাম্ফলেট পড়ে হঠাৎ অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে পূরবী। সত্যিই আর বসে থাকা চলে না। দেশের ডাক—গণ-দেবতার দাবী। এই নিশ্চিন্তনগরের মেয়েরা শুধু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারে, স্বপ্ন দেখতে পারে, পরচর্চায় জীবন কাটাতে পারে। কিন্তু বৃহত্তর জীবনের কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষা—কোনো আদর্শই নেই ওদের কাছে। এই অসুস্থতার আত্ম-বিকার থেকে ওদের মুক্ত করার ভার নেবে কে—কে বোঝাবে শুধু বীরমাতা না হয়ে বীরাঙ্গনা হওয়ারও দরকার আছে।

পূরবী অনুমান করেছে সে ভার তারই—সে কথা বোঝাবার দায়িত্ব তারই। স্থির

করেছে এই আন্দোলনে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে—যোগ দেবে এই বে-আইনী সভায়। কিন্তু অনিলাকে সে রাজি করাতে পারেনি। অত উগ্রতা নেই অনিলার চরিত্রে। সে ওজন করে বোঝে, ওজন করে করে চলে—নিজের শক্তি সম্বন্ধে অতটা প্রগাঢ় আস্থাও তার নেই। তা ছাড়া অনিলার সব সময়ে মনে রাখতে হয় ছোট ভাইটির কলেজে পড়বার মাইনেটা তাকেই চালাতে হবে, কারণ, অথর্ব বাপের একটি কানাকড়িরও সঙ্গতি নেই। অনিলা বলেছে, মাপ করো পূরবীদ্দি, আমি পারব না।

পূরবী ঘৃণা-কষায়িত দৃষ্টিতে বলেছে : শেম্!

অনিলা লজ্জায় লাল হয়ে জবাব দিয়েছে : কী করব বলো।

—কিছুই করতে পারবে না। শুধু একটা কাজ কোরো। ভালো দেখে একটা বিয়ে করে ফেলো চটপট্। যাতে অন্তিমে সতী-স্বর্গ লাভ এবং পুন্নাম নরকের হাত থেকে নিষ্কৃতির ব্যবস্থাটা একসঙ্গেই হয়ে যায়।

অনিলা মাথা নীচু করে থাকা ছাড়া কিছু আর বলতে পারেনি।

পূরবী হঠাৎ ঝাঁঝালো স্বরে বলেছে, ওই লেডী ডাক্তারটা আমাকে রাজনৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আসে। সরকারী চাকরি করে—ক্রীশ্চান—তাই ভালো ভালো উপদেশ দিতে বাধে না। কিন্তু কোনো দিন স্যাক্রিফাইস্ করেছে—ভেবেছে দেশের কথা?

অনিলার যেন চমক ভেঙেছে। পূরবীর এই আকস্মিক উদ্দীপনার পেছনে এডিথের কোনো প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত অনুপ্রেরণা নেই তো?

আজ কাঁধে জাতীয় পতাকা নিয়ে এগিয়ে আসবার সময় সেই এডিথের সঙ্গে চোখা-চোখি হয়ে গেল পূরবীর। পূরবী কি তাকালো তীব্র দৃষ্টিতে—খানিকটা অনুকম্পার ভঙ্গিতে? অথবা এডিথকে সে দেখতেই পেলো না?

—'বন্দে মাতরম্'—

অসংখ্য মানুষের কোলাহলের মাঝখানে পূরবী উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে একটা টেবিলের ওপর—যাতে সকলে ছোটখাটো মানুষটিকে ভালো করে দেখতে পায়। বহু লোকের মাঝখানে, সম্মিলিত জনতার ভেতরে তাকে দেখাচ্ছে রাজেন্দ্রাণীর মতো। তার মুখে সূর্যের আলো পড়েছে, তার সোনার ফ্রেমের চশমা জ্বলছে—হাওয়ায় উড়ছে তার চূর্ণ-কুন্তল, তার শাড়ি পাড়। অনিলা থাকলে বলতে পারত—হাঁ, পূরবীর জিত হয়েছে, আজ আর এডিথ তার কাছে দাঁড়াতে পারে না, কোনোখানেই না।

—'গান্ধী মহারাজ কি জয়'—

ভৈরব জয়ধ্বনি। পূরবী বক্তৃতা দিচ্ছে।

—বন্ধুগণ, আজ কী জন্যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আপনারা জানেন।

বৈদেশিক শাসন-তন্ত্র আজ প্রতি পদে পদে—

ক্লিক্। এডিথের পাশেই একটা শব্দ। ক্যামেরাতে কে যেন ছবি নিচ্ছে পূরবীর।

কিন্তু ওদিকে আবার কোলাহল। ভিড় ঠেলে লাল-পাগড়ি এগিয়ে আসছে। সামনে ইউনিফর্ম-পরা ইন্‌স্পেক্টর, দারোগা। জনতার কতক আস্তে আস্তে সরে গেল, কতক আরো ঘন হয়ে এগিয়ে এল।

—'বন্দে মাতরম্'—

পূরবীর চোখ জলছে।—বন্ধুগণ, স্মরণ রাখবেন, এ ইতিহাস এক দিনের নয়। পলাশীতে যে পাপ আমরা করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত—

সভার মধ্যে ভেঙে পড়েছে লাল পাগড়ি। বিপ্লবের আর দেরি নেই—পূরবীর পরিণতি সম্বন্ধেও সংশয় নেই কারো। এডিথ আস্তে আস্তে সরে এল।

পিছনে প্রবল কোলাহল। হঠাৎ মানুষ ছুটতে শুরু করেছে চারদিকে। সভায় লাঠি-চার্জ হচ্ছে বোধ হয়।

* * * *

একবেলার মধ্যেই নিশ্চিন্তনগরের রূপ বদলে গেল।

নিশ্চিন্তনগর আর নিশ্চিন্ত নয়। সমস্ত শহরটা যেন থম্ থম্ করছে। মীটিং ভেঙে দেওয়া হয়েছে, ব্যাপকভাবে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সভার সমস্ত উদ্যোক্তাদের। তাদের দলে আছে পূরবী, আছে সন্ধ্যা, আছে বরদা, এমন কি পোস্টাপিসের কেরানী সুধীর পর্যন্ত আছে। কাল পর্যন্ত যারা ছিল সাধারণ মানুষ—সহজ আর স্বাভাবিক, তোমার আমার মতো দশজনের সঙ্গে মিশত, হাসত, কথা বলত, গল্প করত তারা যেন অসাধারণ হয়ে গেছে কার যাদু-মন্ত্রে। পুলিসের পাহারাতে তারা চলেছে মফঃস্বল শহরের জেলখানাতে। তাদের মুখের দিকে কেউ তাকাতে পারছে না। স্কুল-মিস্ট্রেস্ পূরবী, নিশ্চিন্তনগরের বহু ছেলের মাথা-ঘুরিয়ে-দেওয়া আধুনিকা সন্ধ্যা। পোস্টাপিসের ল্যালাক্ষ্যাপা কেরানী সুধীর আর সারদাবাবুর বি.এ. ফেল ভাই চুপচাপ মানুষ বরদা—কে ওদের একসঙ্গে এমনভাবে জড়ো করে দিলে—কে ওদের এমন করে নামিয়ে আনলে একটা নিশ্চিত আদর্শের সম-পংক্তিতে?

তা ছাড়া আরো কিছু চাঞ্চল্যকর খবর আছে। পুলিস সার্চ করে বেড়াচ্ছে শহরের বাড়ি-ঘর। কয়েকটি আপত্তিকর ছেলের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। অধিকতর কিছু একটা দুষ্কৃতি ঘটাবার জন্যে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে কোথাও। তাদের মধ্যে আছে ব্রজেন, এবং সব চাইতে যেটা রোমাঞ্চকর খবর, তাদের মধ্যে আছে প্রমোদও—সার্কেল-অফিসার বিনোদবাবুর গোবেচারী ভালো ছেলেটি।

পাথরের মূর্তির মতো বসে আছেন রমাপদবাবু। তাঁর চোখ ফেটে জল নয়—যেন

রক্ত বেরিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার এই কাজ—এই করে বসল সন্ধ্যা। ধনে-প্রাণে তাঁকে অথৈ দরিয়ার মধ্যে যেন ডুবিয়ে দিয়ে গেল।

রমাপদবাবুর মুখে কথা নেই। খবরের কাগজটা অবধি পায়ের কাছে বিমর্ষ হয়ে পড়ে আছে। এক বেলার মধ্যে যেন পঁচিশ বছর বয়েস বেড়ে গিয়েছে তাঁর।

গালে হাত দিয়ে বসে আছেন পূর্ণবাবু। একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে ছাতের কার্নিশে গোটাকতক চলিষ্ণু টিকৃটিকি, উড়ন্ত কাঁচপোকা আর পলায়মান মাকড়সার গতিভঙ্গি লক্ষ্য করছেন কালীসদনবাবু; যেন মর্ত্যের পৃথিবীটা তাঁকে একান্তভাবে হতাশ করেছে, তাই কীট-পতঙ্গের জগৎ থেকে একটা মানসিক সান্ত্বনা সঞ্চয় করবার চেষ্টায় আছেন তিনি। তবু পূর্ণবাবু নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

—দেখা করেছিলেন?

রমাপদবাবু নীরব, নিশ্চল—যেন দারুভূত মুরারি।

—দেখা করেছিলেন মাস্টারমশাই?

—অ্যাঁ—? হাঁ—।

—কী বললে?

—কিছুই না।

—বণ্ড্ দিতে রাজী হল?

—বণ্ড্?—এতক্ষণে রমাপদবাবু বিদীর্ণ হয়ে পড়লেন: হুঁঃ, রাজী হবে! তা হলে পাকাপাকি ভাবে আমার সর্বনাশ করবে কেমন করে। উঃ, বোন নয় তো, কালসাপিনী। দুধ-কলা দিয়ে পুষে বিষই বাড়িয়েছি! উত্তেজনায় রমাপদবাবুর মুখ দিয়ে আর ক্লাসিক বেরুল না, বাকিটা যা বেরুল তা নিছক গালাগালি এবং বিশুদ্ধ ভারতীয় পদ্ধতিতে।

—একেবারে কিছুই বললে না?

—বলবে না?—স্কুল থেকে কোনো ছেলেকে রাসটিকেট করবার সময় যেমনধারা হুঙ্কার ছাড়তে হয়, ঠিক তেমনি করেই একটা ব্যাঘ্র-গর্জন ছাড়লেন রমাপদবাবু: তা হলে এতকাল কলেজে পড়েছে কি করতে, আর এতবার আই.এ. ফেলই বা করল কেমন করে। বললে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করবার জন্যে কারা-বরণ করেছি—দাসখৎ লিখে দেওয়ার অপমানকে মেনে নিতে পারব না।

—হুঁ।—পূর্ণবাবু চিন্তিত মুখে বললেন: কথাটা তো সন্ধ্যার নয়। হায় মিস্ট্রেসের ভয়েস্ যেন শোনা যাচ্ছে এর ভেতরে।

—তাতে আর সন্দেহ আছে!—রমাপদবাবু বললেন, ওই পূরবী দাশগুপ্ত। সেই মেয়েটাই সন্ধ্যার মাথা খেয়েছে। কিন্তু বলুন তো এখন আমি কী করি? গবর্মেন্ট-এইডেড্ ইস্কুল—এবার চাকরিটা নির্ঘাৎ যাবে। তার পর সপরিবারে উপোস করে মরতে

হবে যুদ্ধের বাজারে।

পূর্ণবাবু জিভে-তালুতে সহানুভূতির শব্দ করে বললেন: চুক্-চুক্-চুক্। মনে মনে ভাবলেন, বাড়ি ফিরে গিয়ে কষে ধমকে দিতে হবে অমলাকে। হালে একটা চরকা কিনেছে আবার। দিনরাত ঘটর-ঘটর করে ঘোরায়—ওটাকে আগে উনুনে দিয়ে তবে অন্য কথা।

কালীসদনবাবুর হঠাৎ যেন চমক ভাঙল।

—নাঃ, আমার মেয়েটাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেবো। ওদের পাল্লায় পড়ে মেয়েটা একেবারে গোল্লায় যাবে বোধ হচ্ছে।

রমাপদবাবু বললেন, তাই করুন মশাই, তাই করুন। বোনকে লেখাপড়া শিখিয়ে আমার তো যা হ'ল! বাইরের আলো-বাতাসে ছেড়ে দেওয়ার চাইতে ওদের কানায়ে ঠেলতে জুড়ে দেওয়াই ভালো।

পূর্ণবাবু সনিশ্বাসে বললেন, এখন দেখছি হিটলারের থিয়োরীই দরকারী। ব্যাক টু দি কিচেন অ্যাণ্ড কন্‌ফাইন্‌মেণ্ট—সংসারে শৃঙ্খলা আসুক, প্রজাপতির অনুগ্রহে বংশবৃদ্ধি হয়ে চলুক।

কালীসদন আবার টিকটিকিগুলোর দিকে মনোনিবেশ করে মন্তব্য করলেন: সর্দা-আইনে বাধে, নইলে ন' বছরে গৌরীদান করেই নিশ্চিন্ত হতুম। আর শুধু মেয়েই বা বলি কেন—ছেলেদের ব্যাভারও সুবিধে নয়। এই দেখুন না আমাদের সার্কেল-অফিসার সায়েবের অবস্থা! প্রমোদ তো চম্পট—এখন ব্লাড-প্রেসারে ভদ্রলোক যান-যান অবস্থা।

—নাঃ মশাই, বড় দুঃসময় পড়েছে।—পূর্ণবাবু হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন একেবারে: 'কুইট ইণ্ডিয়া' দূরের কথা, এখন যে ছেলে-মেয়ে কুইট্ করছে, তার কী করি। আমার গিন্নী যদি এই চল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ শহীদ হওয়ার জন্যে ফ্ল্যাগ নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েন, তা হলে এণ্ডি-গেণ্ডি ছানা-পোনা নিয়ে আমি তো বেঘোরে মারা গেলাম!

রমাপদবাবু কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না। উদ্গত অশ্রুর উচ্ছ্বাস এসে তখন তাঁর দু' চোখ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। চাকরিটা এবারে গেল—ভারতরক্ষা-বিধানের একটি প্যাঁচও যে সঙ্গে সঙ্গে গলায় এসে এঁটে বসতে পারে এটাও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। উঃ সন্ধ্যা! সন্ধ্যা শেষে এই করলে!

—ডুম্—কড়্র—কড়্র—

সমস্ত নিশ্চিন্তনগরের অস্থিপঞ্জরে কাঁপন জাগিয়ে বাইরে থেকে উঠল নির্ঘোষ। যে ডঙ্কা কাল মুখরিত হয়ে উঠেছিল ভাতারমারীর মাঠে—আজ তারি নিনাদ উঠেছে মহকুমা শহর নিশ্চিন্তনগরে।

—কড়্র-ক্র্যাং—

শহরের পথ-ঘাট শিউরে উঠল। তার সঙ্গে মানুষের কোলাহল। একজন নয়—দু'জন নয়—চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষের।

—'বন্দে মাতরম্'—

—'মহাত্মা গান্ধীকি জয়'—

—'চাল চাই—কাপড় চাই'—

—'স্বাধীন ভারত কি জয়'—

শুধু পূর্ণবাবু, কালীসদনবাবু, রমাপদবাবুই নয়। যেন হঠাৎ দিবানিদ্রা ভেঙে নিশ্চিন্তনগরের মানুষগুলো দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়ালো। চোখের সামনে যা তারা দেখতে পেল সেটা বিশ্বাস করবার মতো নয়। দেশে কি রাতারাতি স্বরাজ হয়ে গেছে, এত বড় শাসনতন্ত্র চিরদিনের মতো গেছে নীরব আর নিশ্চল হয়ে।

এমন দৃশ্য কেউ আর কখনো দেখেনি। কিছু দেখেছিল তিরিশ সালের সত্যাগ্রহে, কিন্তু এর তুলনায় সে কিছুই নয়। সে যদি প্রাণস্রোত হয়—এ প্রাণ-সমুদ্র। যে যুগে মরা, ঘুণে-ধরা বাংলাদেশ এমন করে সামগ্রিকরূপে জেগে উঠত, তা বহুকাল আগেই বিস্মরণের তমসাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।

কত মানুষ এগিয়ে আসছে? পাঁচশো, ছয়শো, সাতশো, হাজার? সে সংখ্যা অনুমান করবার ক্ষমতাও কারো নেই—চোখের দৃষ্টি যেন তাদের অন্ধকার করে দিয়েছে এই কল্পনাতীত লোকযাত্রা। খালি গা, নেংটি পরা—ধুলো মাথা, হাজারে হাজারে মানুষ। এই মহকুমা শহরের প্রান্ত দিয়ে ধুলোয় ভরা যে মেঠো পথটাকে একদিন সবাই ভুলে থাকত —সেই পথ দিয়ে এই প্রচণ্ড ভয়ানক জোয়ার এল কী করে?

হাজার হাজার হাতে হাঁসুয়া জ্বলছে—হাজার তেলের বাঁক আর তেলপাকানো লাঠি জ্বলছে—হাজার হাজার চোখ জ্বলছে, আর বাজছে তিরিশ-চল্লিশটা নাগাড়া। নতুন যুগের নতুন রণযাত্রা।

তাদের আগে আগে পতাকা বয়ে চলেছে প্রমোদ, ব্রজেন, শহরের আরো দু-তিনটি ছেলে। এতদিন যারা শিকার ছিল, আজ তারাই শিকারী; ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে আজকের বন্দী আগামী কালের সেনানায়ক।

সমস্ত নিশ্চিন্তনগর বিস্ফারিত বিহ্বল চোখ মেলে দেখতে লাগল। সত্যিই কি স্বরাজ এল দেশে? এই পাঁচ হাজার লোকের তরঙ্গকে বাধা দেবে—নিশ্চিন্তনগরে এমন শক্তি কার আছে? শান্তিরক্ষার দায়িত্ব যাদের—তাদের কোথাও দেখা গেল না। আপাতত তারাই শান্তিমগ্ন।

প্রথমেই একদল এসে ঘেরাও করলে শিখ-মোটর-সার্ভিসের অফিস। পেট্রোল চাই।

দোতলায় দাঁড়িয়েছিল গুরদিৎ সিং। নীরব দৃষ্টি মেলে সে সমস্ত দেখছিল। ছুটতে ছুটতে ওপরে এল হরনাম সিং: মালিক, সব তেল যে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ওরা।

গুরদিৎ বললে, নিতে দাও।

—সে কি মালিক! লুট করে নিয়ে যাবে! বন্দুকটা বার করুন—গুলি চালান।

গুরদিতের রক্তে তখন কল্লোল জেগেছে। শুধু পাঞ্জাব নয়—শুধু চিলিয়ানওয়ালা নয়—শুধু জালিয়ানওয়ালা নয়। বাংলা দেশেও তা হলে মানুষ আছে! সাবাস ভাই সব, বহুৎ সাবাস!

হরনাম কাতর কণ্ঠে বললে, মালিক!

গুরদিৎ ধমক দিয়ে বললে, চুপ! শিখের বাচ্চা না তুমি? গুলি চালাবে কার ওপরে! যাও—ঘরে যাও।

দশ-পনেরো-বিশ টিন পেট্রোল যা পাওয়া গেল সব টানাটানি করে বার করে নিলে ওরা। তারপর পেট্রোল তার কাজ করলে। অফিস, আদালত—মদের দোকান। নিশ্চিন্ত-নগরের মাথার ওপর আগুন আর ধোঁয়া উঠতে লাগল কুণ্ডলী পাকিয়ে—আর দূর থেকে নির্নিমেষ চোখে তা দেখতে লাগল রঙীর ঘাটোয়াল কানাঠাকুর। ভাতারমারীর মাঠের আশপাশ থেকে গ্রাম্যবধূরা উৎসুক-ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল জলন্ত শহরের আভাসিত দিগন্তের দিকে—তাদের চোখের ওপর সূর্যালোক প্রতিফলিত হতে লাগল।

আর পাগলের মতো শহরময় ছুটে বেড়াতে লাগলেন এম্‌দাদ হোসেন।

থানার দারোগা কোয়ার্টারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। দরজায় উন্মত্ত করাঘাত। স্পন্দিত বুকে এবং বিবর্ণ মুখে দরজা খুললেন দারোগা।

—কী মশাই, কী খবর?

হাঁপাতে হাঁপাতে এম্‌দাদ হোসেন বললেন, করছেন কী! শহর জালিয়ে দিলে যে!

—কী করতে বলেন!

—ফায়ার করুন—লেভেল করে দিন সব! এ কি অরাজক পুরী নাকি! ইংরেজ রাজত্ব কি শেষ হয়ে গেছে!

—পাগল হয়েছেন আপনি?—দারোগা বললেন, কটা বন্দুক আছে থানায়, ক'জন লোককে গুলি করা যাবে? আর তার ফলটা কী দাঁড়াবে বুঝতে পারছেন না? আপনাকে আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে পাঁচ হাজার লোক। এস. ডি. ও. এই কথাই বলেছেন।

—কী সর্বনাশ!

দারোগা বললেন, আপনি ভাববেন না মিস্টার হোসেন। এ ইংরেজ রাজত্বই বটে। 'লায়ন হ্যাজ্ উইংস' শুধু নয়—নখ-দন্তও প্রচুর। একটা দিন ওদের রাজত্ব করতে

দিন। কালই শহর থেকে আসবে ফোর্স—রাইফেলের গুঁতোয় সব ঠাণ্ডা মেরে যাবে।

শহরের বুকে তাণ্ডব চলেছে। আগুন, ধোঁয়া আর কোলাহলে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সব। থেকে থেকে হুঙ্কার উঠছে আকাশ-বাতাস-মাটি কাঁপিয়ে দিয়ে। এম্‌দাদ হোসেন ছুটে চললেন টেলিগ্রাম করতে। কিন্তু শহর সে টেলিগ্রাম রিসিভ করতে পারল না—তার কাটা গিয়েছে। এম্‌দাদ হোসেন ধুলোর উপরেই বসে পড়লেন। বিনোদবাবুর সঙ্গে তাঁর অবস্থার কোন তফাৎ নেই—চোখের সামনে সব কিছু অগ্নিকুণ্ডে রূপান্বিত হয়েছে।

নিশ্চিন্তনগরের হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়ে নাগাড়া বাজতে লাগল : ডুম—কড়্‌র—কড়্‌র—

সন্ধ্যার পরে ম্লান চাঁদ উঠেছে। কানাঠাকুর ভীতি-মলিন মুখে মাচাংয়ে বসেছিল। শব্দ উঠল : ঝপ্‌-ঝপ্‌-ঝপাস্‌—

পাঁচ হাজার লোক শহর থেকে ফিরে এসেছে। ঝাঁপিয়ে পড়েছে নদীতে—ভরা ভাদ্রের নদীর খরস্রোত ঠেলে চলে আসছে এ-পারে। তাদের সঙ্গে চকচকে হাঁসুয়া—ঝকঝকে লাঠি। পোঁটলায় বাঁধা চাল, গাঁটরিতে বাঁধা কাপড়। তাদের বলিষ্ঠ বাহুর বিক্ষেপে নদীর জলে যেন মন্থন শুরু হয়েছে।

পাঁচ হাজার লোক নদী সাঁতরে এপারে চলে এল। একদিনের মধ্যে তারা অন্য মানুষ হয়ে গেছে। স্বাধীনতার নতুন রক্ত নেচে উঠেছে—দুলে উঠেছে তাদের সর্বদেহে।

লালচাঁদ সামনেই দাঁড়িয়ে। তার জানোয়ারের মতো চোখ দুটো বাঘের মতো ভয়ঙ্কর। বললে, বলো ঠাকুরভাই, 'বন্দে মাতরম্‌'—

কানাঠাকুর ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'বন্দে মাতরম্‌'—

—দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। আর পারানির পয়সা পাবে না তুমি।

কানাঠাকুর জবাব দিলে না। বুকের মধ্যে বাঁশপাতার মতো কাঁপছে। পাঁচ হাজার লোকের কাছে পারানির পয়সা চাইবার মতো সাহস তার ছিল না।

৭

রেল স্টেশন।

যেখান দিয়ে দুখানা মেলগাড়ি বেরিয়ে যায় ঝড়ের মতো দ্রুতবেগে। একখানা আসে আসামের পাহাড়ের বুকে ঘন-গর্জিত ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে, আর একখানা আসে হিমালয়ের লুপ ঘুরে ঘুরে। একখানা দিনে—একখানা রাত্রে। দিনের ট্রেন থামে না—লোহার ঘূর্ণির মতো উড়ে যায় ; আর নিষুতি রাত্রে কালপুরুষের জ্যোতির্ময় মূর্তিটা যখন উদয়াস্তের সীমারেখায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে—রাত্রের ট্রেনখানা তখন শাণিত একটা আলোক-তীরের মতো এসে বিদ্ধ হয় এখানকার কাঁকর-ফেলা প্লাটফর্মের নীচে। এখানে ফার্স্ট-ক্লাস

ওয়েটিং-রুমের প্রসাধন-টেবিলে একখানা ময়লা তোয়ালে এবং একটুকরো লাক্স সাবান সজ্জিত থাকে এবং সাহেবের আর্দালী তাই দিয়ে বিলাতী কুকুরকে স্নান করিয়ে স্টেশন-মাস্টারকে কৃতকৃতার্থ করে দেয়। এখানে অন্ধকারের পটভূমিতে চালের কলের ছায়ামূর্তি-গুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

স্টেশনের পেছনে খোলার ঘরের উড়িয়া-হোটেলে ইন্দুরবাবু নিদ্রামগ্ন। ময়লা মাদুর আর পুরোনো কেরোসিন কাঠের চৌকির ফাটল থেকে দলে দলে ছারপোকা বেরিয়ে তাকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু ইন্দুরবাবুর শুকনো হাড়ের পাঁজা থেকে একবিন্দু রস তারা সঞ্চয় করতে পারছে না। মশারির ছিদ্রপথে ঢুকেছে একঝাঁক মশা—কিন্তু তাদেরও ওই দশা—নিরাশ হয়ে বেরুবার চেষ্টায় তারা মশারির কোণায় কোণায় ভন্-ভন্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে।

অঘোরে ঘুমুচ্ছে ইন্দুরবাবু। সকাল হতে এখনো দু ঘণ্টা দেরি—দু ঘণ্টা পরে ভোরের বাস যাত্রা করবে নিশ্চিন্তনগরের পথে। ইন্দুরবাবু স্বপ্ন দেখছে, খোঁয়াড়ের মতো ঠাসাঠাসি-করা বাসের পা-দানিতে দাঁড়িয়ে সে প্রাণপণ গলায় চিৎকার করছে: এই যে চলল বাস নিশ্চিন্তনগর—একদম খালি গাড়ি—

—শাট্ আপ্, স্টুপিড্। খালি গাড়ি! যে করে আমাদের গাদিয়েছ—তার ওপরে আরো লোক ডাকছো। একবার হাতের কাছে এগিয়ে এসো না বাপধন—একটি বোম্বাই ঘুষিতে নাকটা চ্যাপ্টা করে দিই।

গাড়ির দরজার কাছে যে পাগড়ী-পরা প্রকাণ্ড জোয়ান লোকটা প্রায় শূন্যে ঝুলে ছিল, সে হঠাৎ চোখ পাকিয়ে পেছন ফিরল।—ঠারিয়ে ঠারিয়ে বাবু—হাম্ দেখলা দেতা উস্কো—

—বাপ রে—বলে ইন্দুরবাবু লাফিয়ে নামতে গিয়ে কোঁচায় পা বেধে আছাড় খেয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে গেল তার।

নাঃ, বাস নয়—মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েনি সে। পাশের জানালা দিয়ে ঝাঁঝালো টর্চের আলো এসে তার চোখ-মুখ জ্বালিয়ে দিচ্ছে—শিখ-মোটর-সার্ভিসের ম্যানেজার আকালী সিং তাকে হেঁড়ে-গলায় ডাকছে: ইন্দুরবাবু—এ ইন্দুরবাবু—

শিথিল এবং বিস্রস্ত কাপড়-চোপড়গুলো গুছিয়ে নিয়ে ইন্দুরবাবু তড়াক করে উঠে বসল: কী হয়েছে পাঁইজী, এই রাত্রিতে ডাকাডাকি কেন?

—আরে উঠো না জল্দি—

—বল্ না বাপু কী হয়েছে! মাঝ-রাত্তিরে কী নরক-যন্ত্রণা রে বাবা!

—তুরন্ত্ বাহার আও। তিনঠো স্পেশ্যাল্ দিতে হোবে। নিশ্চিন্তনগরে যো হাঙ্গামা হৈয়ে গিয়েছে, উস্কোঁ ওয়াস্তে সরকারী ফৌজ আ গিয়া—

—অ্যাঃ—

ছেঁড়া টুইল-শার্ট আর চশমা পরে ইন্দুরবাবু বেগে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে। খোয়া-ওঠা স্টেশনের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বিড়্ বিড়্ করে বকতে লাগল : ছেড়ে দেব এই ঘোড়ার ডিমের চাকরি। শালারা দেবে তো একুনে বাইশ টাকা আর খাটিয়ে নিচ্ছে যেন কলুর বলদ।

স্টেশনের পেছনে মিট-মিট করছে আলো। আর সেই অনুজ্জ্বল আলোয় চক্-চক্ করছে একরাশ উজ্জ্বল চাপরাশ—ঝক্-ঝক্ করছে কতগুলো রাইফেলের নল। ফৌজী বুটের শব্দে স্টেশনের কাঁকর আর্তনাদ করে উঠছে। সিংহের নখ-দন্ত।

কোমরে রিভল্‌ভার—আঁটা-সাঁটা ইউনিফর্ম-পরা শহরের এস্ পি সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর তীব্র দৃষ্টি ইন্দুরবাবুর ইঁদুরের মতো শুকনো মুখের ওপর এসে পড়ল— সর্বাঙ্গে ভয়ের বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল ইন্দুরবাবুর। মনে হল যেন নিশ্চিন্তনগরের হাঙ্গামার জন্যে তিনিও একজন অপরাধী, এখনি হয়তো এস্-পি হুঙ্কার দিয়ে উঠবেন : পাকড়ো ইসকো।

ইন্দুরবাবু দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন।

এস্-পি বললেন, বাসের দেরি কত ?

ইন্দুরবাবু শুকনো ক্ষীণস্বরে বললেন, এখুনি আসবে হুজুর।

—এক্ষুনি ?—তা আসছে না কেন ?—অন্ধকারের মধ্যে একসারি উদ্ধত দাঁত যেন খিঁচিয়ে এল—তাড়া করে এল ইন্দুরবাবুর দিকে।

—আসবে স্যার। পেট্রোল নিয়ে ঠিক-ঠাক হয়ে আসবে তো—

—বেশি ঠিক-ঠাক করতে হবে না—আমাদের সময় নেই। এক্ষুনি দৌড়ে যান মশাই —বাস যেমন আছে ওতেই চলবে। অ্যাট্ এনি কস্ট—ভোরের আগেই আমাদের নিশ্চিন্তনগরে পৌঁছতে হবে—বুঝেছেন ?

এস্-পি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে ইন্দুরবাবুর কাঁধে ঝাঁকুনি দিলেন। সে ঝাঁকুনিতে ইন্দুর-বাবুর হাড়-পাঁজরগুলো যেন একসঙ্গে ঝন্ ঝন্ শব্দ করে বেজে উঠল।

—এই যে যাচ্ছি স্যার—

ইন্দুরবাবু প্রায় ছুটেই পালালেন সেখান থেকে। যেন মস্ত-বড় একটা ফাঁড়া কেটে গেছে—আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন তিনি।

সাত-আট মিনিটের মধ্যেই হেড্-লাইটের তীব্র আলো ছড়িয়ে তিনখানা বাস এগিয়ে এল। এবার চিৎকার করে ইন্দুরবাবুকে লোক ডাকতে হল না—খালি গাড়ির আকর্ষণ দেখিয়ে কাউকে প্রলুব্ধ করবার দরকার হল না—চকচকে বুট আর ঝকঝকে রাইফেলের নলগুলো একে একে নিজেরাই বাসে উঠে বসল।

—ভোঁপ্, ভোঁপ্, ভোঁপ্—

পরক্ষণেই তিনখানা বাস ঘুমন্ত বন্দরকে সচকিত করে দিয়ে নক্ষত্রগতিতে বেরিয়ে গেল। হাটখোলা পার হয়ে, তাঁতীদের বস্তি ছাড়িয়ে, মরা নদীর লোহার পুলটার ওপর দিয়ে পীচ-বাঁধানো পথে ছুটে চলল নিশ্চিন্তনগরের দিকে। অরাজক পুরীকে শায়েস্তা করতে হবে—বুঝিয়ে দিতে হবে যে—

ইন্দুরবাবু তখনো স্টেশনের পেছনে ঠায় দাঁড়িয়ে।

আকালী সিং এসে আস্তে তার পিঠে একটা থাবড়া মারলে। ইন্দুরবাবুর পা থেকে মাথা অবধি একসঙ্গে কেঁপে উঠল।

—কে, পাঁইজী ?

—অমন করে দাঁড়িয়ে আছো কেন ইন্দুরবাবু !

—ভাবছি। এত ফৌজ কেন গেল পাঁইজী ?

—লড়াই করতে।

—লড়াই ! কার সঙ্গে লড়াই ?

—দেহাতী লোকের সঙ্গে। যারা নিশ্চিন্তনগরকে জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের সঙ্গে।

—ও: !—কিন্তু একটা জিনিস এখনো ইন্দুরবাবু বুঝে উঠতে পারছে না। দেহাতী মানুষ, যারা কখনো চোখ তুলে তাকাতে সাহস পায়নি—যারা চিরদিন মার খেয়েছে, পশুর মতো মরেছে ; যাদের কাছ থেকে আট আনা ভাড়ার বদলে একটা টাকা আদায় করেছে সে, এবং একটিমাত্র ধমকেই যারা ল্যাজ গুটিয়ে পায়ের নীচে শুয়ে পড়েছে—আজ তাদের এত শক্তি, এত আত্মবিশ্বাস দিলে কে ? ম্যালেরিয়া আর অভাবের পীড়নে যারা শুধু মৃত্যুর জন্যেই দিন গুনেছে, আজ বাঁচবার এই অমোঘ মন্ত্র তারা পেল কোথায় ?

আকালী সিং বললে, বাঙালীর ওপরে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ইন্দুরবাবু।

ইন্দ্রবাবু জবাব দিলে না। নিজের মধ্যে যেন কী আশ্চর্য একটা অনুভূতি তাকে রোমাঞ্চিত করে তুলেছে। এই বাইশ টাকা মাইনের চাকরি—এই উড়িয়া-হোটেলে দিনগত পাপক্ষয়, রক্তচক্ষু যাত্রীদের ভয়ে তটস্থ থাকা—সকলের কাছে জোড়হাতে ইহজন্ম আর পরজন্মের কৃত যা কিছু অপরাধের জন্যে সারাক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা। এ ছাড়া আরো কোনো কি অর্থ আছে জীবনের, আছে বৃহত্তর কিছু ? ওই হঠাৎ-জেগে-ওঠা দেহাতী লোকগুলোর মতো তারও চেতনায় কি নতুন কোনো সূর্যের প্রসন্ন একটা আলোক-দীপ্তি এসে পড়বে ?

বাসের শব্দ মিলিয়ে গিয়েছে দূরে। কিন্তু ওই বাস আর কত দিন চলবে অমন করে ! সব পথই কি চিরদিন সমান মসৃণ থাকে ! দুর্যোগ আসে, নানা বিঘ্ন-বিড়ম্বনা আসে, অপঘাত আসে—কত গাড়িতে কত দুর্ঘটনা হয়। নিশ্চিন্তনগরের পিচ-বাঁধানো মসৃণ

রাস্তায় কখনো কি শোচনীয় একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে না, অন্তত লোহার পুলটা ভেঙে দু-একখানা বাস আছড়ে পড়তে পারে না—পড়ে চুরমার হয়ে যেতে পারে না—পঞ্চাশ ফুট নীচে ওই মরা নদীর গর্ভে ?

রাত্রি ভোর হয়ে আসছে। মিটমিটে আলোগুলো নিবে আসছে চারদিকে। একটা ঠাণ্ডা হাওয়ায় ইন্দ্রবাবুর শরীর শিরশির করতে লাগল—কপালের ওপর কোথা থেকে এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল এসে পড়ল—শিশির। ভোঁ-ও-ও। চালের কলের প্রথম বাঁশি বাজল—কালো ফানেলের মুখে ধক-ধক করে বেরুল খানিকটা ধোঁয়া। ঘট্-ঘট্-ঘটাং। স্টেশনে সিগন্যালের শব্দ—একটা গুড্স্ ট্রেন আসছে।

যাত্রীদের মধ্যে দু-একজন করে প্ল্যাটফর্মের বাইরে বেরিয়ে এল।

—ও মশাই, নিশ্চিন্তনগরের বাস ছাড়বে কখন ?

—ঠিক নেই। তিনখানা গাড়ি চলে গেছে ফৌজ পৌঁছে দিতে, তারা না এলে কোনো গাড়ি শহরে যাবে না। যান যান, চুপ করে পড়ে থাকুন গে।

মনের মধ্যে একটা অকারণ অস্বস্তি। চোখের সামনে কতকগুলো রাইফেলের নল যেন এখনো ঝক্-ঝক্ করে উঠছে। ইন্দ্রবাবু আস্তে আস্তে হোটেলের দিকে চলতে শুরু করে দিলে। মরা রক্তে কখনো কি সূর্যালোক পড়ে—জোয়ারের উচ্ছ্বাস কি গর্জে ওঠে কোনো দিন ?

৮

তারপরে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

ভাতারমারীর মাঠ ; মরা দীঘির উঁচু পাড়ি আর টিলার নীচে এক সংগ্রামের রক্তাক্ত-স্বাক্ষর রয়ে গেল। জলে-যাওয়া গ্রাম আর মরা মানুষের ভাঙা পাঁজরে যে কাহিনী প্রচ্ছন্ন রইল তা উদ্ধার করবে অনাগত কালের প্রত্নতাত্ত্বিক, স্বাধীন-ভারতের ঐতিহাসিক। এখানে তা লেখবার অধিকার নেই। এই আখ্যায়িকায় যে ফাঁক রয়ে গেল তা পূর্ণ হয়ে উঠবে সেইদিন, যেদিন দু'শো বছরের শৃঙ্খল দু-টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে—যেদিন বন্দী-শালার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসবে ভাবী ভারতের দেশ-নায়ক।

খবরের কাগজে বহুদিন পরে সেন্সারের ছাপ-মারা যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে জানা যায় : "সশস্ত্র পুলিসের সহিত জনতার সংগ্রামে চারিজন নিহত ও বহু ব্যক্তি আহত হইয়াছে।" নিশ্চিন্তনগরে যাদের চোখের সামনে গোরুর গাড়িতে করে লাশের চালান এসেছে—এই খবরে একটুখানি বিষণ্ণ হাসি মাত্র হেসেছে তারা। যুদ্ধকালীন নিরাপত্তার পক্ষে এ অপরিহার্য প্রয়োজন, সুতরাং নীরব থাকাই ভালো।

তবু সান্ত্বনা আছে তাদের—। যাদের সামনে পথ ছিল না, যারা শুধু নতুন সূর্যের আলোতেই প্রাণ পেয়েছিল, প্রেরণা পেয়েছিল, তাদের বুলেট-বেঁধা বুকের রক্তের ছাপ আর পুড়ে-যাওয়া ঘরের কালো কালো খুঁটিগুলো দিক-নির্দেশক হয়ে রইল আগামী কালের সৈনিকের জন্যে। রাত্রির তপস্যা দিন আনবেই—এ-বাণী কবির নয়, দার্শনিকের নয়, মৃত্যুজয়ী মানুষেরই।

তিন-চারদিন পরে একটু একটু করে ধাতস্থ হয়ে উঠছে নিশ্চিন্তনগর। আর দুর্ভাবনার কারণ নেই কিছু। ইংরেজ-রাজত্ব সত্যিই বানচাল হয়ে যায়নি। ধর্মরাজ্যে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে—সরকারী ফৌজ নিমকের গুণ ভোলেনি।

সকালের আলোয় আবার আড্ডা বসেছে ক্লাবের বারান্দায়। তেমনি করেই আকাশের কোণে ঘনিয়ে আছে একরাশি মেঘ। পূবের বাতাস বয়ে যাচ্ছে—লোহার পুলের তলা থেকে আসছে জলের কলরোল। শালের কচি রাঙা পাতায় মর্মর বাজছে। বড় বড় কদম গাছ দুটোর পাতা দেখা যায় না, সংখ্যাহীন অগণ্য নীপমঞ্জরী রোমাঞ্চিত আনন্দে গন্ধের মদিরতা বিকীর্ণ করে দিয়েছে।

খবরের কাগজ এসেছে। তার পাতায় পাতায় বিক্ষোভের বিবরণ। এখানে আগুন জলেছে, ওখানে গুলি চলেছে। প্রলয়ের ঘূর্ণি বয়ে যাচ্ছে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। কিন্তু নিশ্চিন্তনগর আজ যেমন শান্ত নিরুদ্বিগ্ন হয়ে গেছে, কাল সমস্ত ভারতবর্ষও তেমনি নীরব নিশ্চিন্ততায় ঘুমিয়ে পড়বে। জেগে থাকবার দরকার নেই—দিবাস্বপ্নই ভালো—সত্য এবং সার্থক! শুধু কারাগারের অন্ধ বন্ধন যাদের প্রাণকে বন্দী করতে পারেনি—বুকের পাঁজরে মশাল জ্বালিয়ে অন্ধকারের মধ্যে তারা প্রতীক্ষা করে আছে। তারা স্বপ্ন দেখেনি—প্রসারিত উজ্জ্বল ভবিষ্য-দৃষ্টিতে আগামী কালকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে।

সত্যিই কি ভারতবর্ষ আবার ঘুমিয়ে পড়বে! যে আগুন জলেছিল—তার শিখা একেবারেই নিভে যাবে চিরদিনের জন্যে! হয়তো আজ পথ ভুল হয়েছে—কিন্তু পথ চলার প্রেরণা কি সেইখানেই শেষ হয়ে যাবে! ভুলের মধ্য দিয়েই তো সত্যের রূপ ক্রমশ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে—অনেক ব্যর্থ আত্মবলির অবসানে সাধনা সার্থকতার জয়মাল্য লাভ করে।

কিন্তু সে ভাবনা ভাববার দায় রমাপদবাবু, কালীসদনবাবু, পূর্ণবাবুর নয়। আদালতের কাগজ-পত্র পুড়ে গেছে—ছাত্রেরা ইস্কুলে আসে না। কিন্তু সে ক'দিনের জন্যে! আবার সব সহজ হয়ে যাবে। মামলা চলবে, মোকর্দমা চলবে, ব্যবসা চলবে—অধ্যয়নের তপস্যার মধ্য দিয়ে ছাত্রেরা সরস্বতীর প্রসাদ লাভ করবে। শান্ত—নিশ্চিন্ত—নিরুদ্বিগ্ন ভারতবর্ষ, মনু-পরাশর-বেদব্যাসের সোনার ভারতবর্ষ।

রমাপদবাবুর মনটা খুশি আছে। তিনি সোজা গিয়ে এস. ডি. ও.র কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে করুণা ভিক্ষা করেছেন। এস. ডি. ও. আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, তিনি দেখবেন। সন্ধ্যা সাবালিকা—তার দায়িত্ব তো সম্পূর্ণভাবে রমাপদবাবুর নয়।

খবরের কাগজ ওল্টাতে ওল্টাতে রমাপদবাবু বললেন, দেখলেন সি. পি.র ব্যাপারটা! উঃ, কী কারবারই করেছে!

পূর্ণবাবু পান চিবুতে চিবুতে বললেন, ও আর কী দেখবেন! নিজের চোখে এখানেই তো সব দেখলেন।

কালীসদনের কলিকের ব্যথা উঠেছিল পেটে। একটা হোমিওপ্যাথিকের পুরিয়া মুখে ঢেলে দিয়ে বিকৃত মুখে তিনি চুপ করে বসেছিলেন। হঠাৎ যেন তাঁর চমক ভাঙল।

—গেঁয়ো লোকগুলোর সাহস দেখলেন? ব্যাটারা কোনো দিন সাত-চড়ে রা করতে জানে না—হঠাৎ কী কাণ্ডটাই বাধিয়ে দিয়ে গেল।

রমাপদবাবু সোৎসাহে বললেন, তেমনি শিক্ষাও হয়েছে বাছাদের। রাইফেলের মুখে সব ঠাণ্ডা। রভীর ওপারে ভাতারমারীর মাঠের আশেপাশে যে সব গ্রাম ছিল সব একেবারে স্ম্যাকড্ হয়ে গেছে। ওদিক থেকে যারা আসছে তারা বলছে, আর কিছু নেই —পুড়ে সব শ্মশান!

পূর্ণবাবু বললেন, বেশ হয়েছে! পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরবার জন্যে। আরে বাপু, দেশ স্বাধীন করতে হবে! কিন্তু তা দিয়ে তোদের কোন্ দায়টা পড়েছে! দেশে এত বড় বড় নেতা আছেন, এত কর্মী আছে—তাদের বাদ দিয়ে তোরাই স্বাধীন-ভারত তৈরি করবি নাকি! চাষা আছিস—চাষাই থাক—তা নয়—একেবারে ঝাঁপ দিয়ে পড়লি আগুনের মধ্যে! এখন ঠ্যালা সামলাবে কে? ধনে-প্রাণে গেল তো সব!

কালীসদন পেট চেপে ধরে বললেন, এই ব্যাটা লালচাঁদ মণ্ডল। চিরদিন ওদের নাচিয়ে এসেছে। কাউকে পরোয়া করে না, আদালতে সেদিন আমাকে যা-নয়-তাই বলে গেল। এখন ঠিক হয়েছে—বুকে ছুটো বুলেটের ফুটো নিয়ে পড়ে আছে লাস-কাটা ঘরে! ছোট জাতের বুদ্ধিই এই রকম।

রমাপদবাবু কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন, ওরে বাপ রে—সব জায়গাতেই এক খবর। এই যে নাগপুরে—নাঃ মশাই, আর ভালো লাগে না সব পড়তে। —কাগজটাকে টেবিলের একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে রমাপদবাবু বললেন, ওদের দোষ দিচ্ছেন কী—দোষ তো ভদ্রলোকের ছেলেদেরই। ওই ব্রজেন—ওই বাচ্চা ছেলে প্রমোদ—চোখের সামনে তো দেখলেন। ওরা যা বললে, লোকগুলোও তাই করলে!

কালীসদন খানিকটা আত্মস্থ হয়ে উঠেছেন: আঃ, বিনোদবাবুর বা অবস্থা! ভদ্র-

লোক এখনো বিছানা থেকে উঠতে পারছেন না—প্রলাপ বকছেন। ওইটুকু ছেলের পেটে যে অত বিদ্যে আছে কেউ বুঝতে পেরেছিল মশাই ?

রমাপদবাবু সরোষে বললেন, আর ওই ইস্কুল-মিস্ট্রেস পূরবী দাশগুপ্ত ! আমার সর্বনাশটা করে তবে ছাড়লে। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের দিয়ে আর কোনো আশা নেই। আচ্ছা, ব্রজেন প্রমোদ—ওরা কি সব ধরা পড়েছে ?

—নাঃ, অ্যাবস্‌কণ্ড্‌ করেছে সব। কালীসদন জবাব দিলেন : কিন্তু ক'দিন থাকবে লুকিয়ে। ইংরেজের তো বাবা চোখ নয়, সহস্র-লোচন। এম্‌দাদ হোসেন সাহেব উঠে পড়ে লেগেছেন। ক'দিন পরেই দেখবেন কোমরে দড়ি পরে সব সুড়-সুড় করে এসে হাজির হয়েছে। তা ছাড়া রিওয়ার্ডের ব্যবস্থাও হয়েছে ধরে দিতে পারলে।

—হুঁ।—পূর্ণবাবু হঠাৎ নিজের মধ্যে দেশাত্মতার একটা প্রেরণা অনুভব করলেন : কিন্তু যাই বলুন, বুকের পাটা আছে স্বীকার করতেই হবে। নিজের জন্যে তো কিছু করেনি—যা করেছে দেশের কল্যাণে। ত্যাগের একটা মূল্য তো দিতে হবে।

কালীসদন তেড়ে উঠলেন : আরে রাখুন দাদা ত্যাগ আর ফ্যাগ্‌। এদিকে কী হচ্ছে খবর রাখেন ? আদালত-কাছারী আপনারা পোড়ালেন, তার কোনো খেসারত দিতে হবে না, ভেবেছেন ? এমনি এমনিই ছেড়ে দেবে ? মোটেই নয়। আমি এস. ডি. ও.র ওখানে শুনে এলাম কালেকটিভ ফাইনের বন্দোবস্ত হচ্ছে।

—কালেকটিভ ফাইন !

—নির্ঘাৎ। পঁচাত্তর থেকে আশী হাজার টাকা উশুল করা হবে এই ছোট শহর আর আশপাশের গ্রাম থেকে। সকলের ট্যাঁকেই টান পড়বে—কোনো শর্মাই তার হাত থেকে রেহাই পাবেন না।

—বলেন কি মশাই ?

—যা বলছি তা পাকা কথা। ত্যাগ ! এইবারে বুঝবেন কত ধানে কত চাল হয়।

সমবেত ভদ্রমহোদয়ের মুখ একসঙ্গে কালো হয়ে গেল। রমাপদবাবু শুকনো গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, আর ফাইন না দিলে ?

—ঘটি-বাটি নীলাম করে আদায় করে নেবে। এ বাবা আইন।

আইন ! তা বটে। কারো মুখে আর কোনো কথা নেই।

এক কোণে চুপ করে বসে ছিল গুরদিৎ সিং। কোনো কথা সে এতক্ষণ বলেনি—বলবার প্রেরণাও তার ছিল না। এই ক'দিনেই মনের মধ্যে আশ্চর্য রকম বদলে গিয়েছে সে। দুদিন আগে যখন গ্রাম থেকে একদল লোককে ধরে এনে গুরদিৎকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এদের মধ্যে কে কে তার গ্যারেজ পুড়িয়েছে এবং এদের কাউকে সে চিনতে পারে কিনা, তখন সে সোজা জবাব দিয়েছে : না, এদের কাউকে সে চেনে না।

গুরদিৎ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। এমন শব্দ করে থুথু ফেললে যে সকলে একসঙ্গে চমকে উঠল।

—ব্যাপার কী সিংজী, গলায় কী ঢুকল ?

—পচা গন্ধ ঢুকেছে—ঘৃণা-বিকৃত মুখে গুরদিৎ বললে, আপনারা বসুন, আমি চললাম।—দীর্ঘদেহ শিখ নেমে পড়ল বারান্দা থেকে—কাঁকরের রাস্তা দিয়ে উদ্ধত পদক্ষেপণে হেঁটে লোহার পুলটা পার হয়ে। আর এখানকার সকলে বিহ্বলভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল—সিংজীর ব্যবহারের মধ্যে কিছু একটা সন্দেহ করেছে তারা।

এডিথ বারান্দায় আচ্ছন্নের মতো পড়েছিল ডেকচেয়ারে। পাশে চেয়ারের হাতায় আনোয়ার চা দিয়ে গেছে—অর্ধজাগ্রত চেতনার মধ্যে চায়ের মিষ্টি গন্ধটা পাচ্ছিল এডিথ। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে সত্যি—কিন্তু শরীরে এমন প্রেরণা পাচ্ছে না যে নিদ্রাজড়িত চোখ খুলে হাত বাড়িয়ে চায়ের পেয়ালায় সে চুমুক দেবে।

কাল সারাটা রাত কেটে গেছে দারুণ একটা যেন দুর্যোগের মধ্যে। নিশ্চিন্তনগরে এত কাণ্ড ঘটেছে—এত রাজনৈতিক সংঘাত—গুলি চলল, এতগুলো মানুষ জেলে চলে গেল—কিন্তু নিজের কাজ ছাড়া কোনো দিকে তাকাবার সময় এডিথের ছিল না। হরিহর তরফদারের বউটাকে নিয়ে কাল রাত্রে যমে-মানুষে টানাটানি গেছে। পঞ্জিকার পাতা থেকে সংগৃহীত জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অব্যর্থ ওষুধ মেয়েটার শরীরে অমোঘ কাজ দেখিয়েছে। যে পরিমাণ হেমারেজ হয়েছে তাতে শেষ পর্যন্ত টিকবে কিনা সন্দেহ—অক্সিজেনের ওপরেই আছে এখনো। সারদাবাবুর আহ্লাদী মেয়ের কপালেও ওই রকম দুর্যোগ অনিবার্য—এ সম্বন্ধে এডিথ প্রায় নিশ্চিত।

কিন্তু কী ইডিয়ট ওই ল্যাগবেগে হরিহরটা! কাছা-কোঁচা সামলে চলতে পারে না, অথচ এ সব বুদ্ধি বেশ আছে। লোকটাকে কষে একটা চড় বসানোর জন্যে ওর হাতটা নিস্‌পিস করছিল—বহু কষ্টে মনের সে হিংস্র উত্তেজনাটাকে ও সামলে নিয়েছে। এত আইন হয়, অথচ এই সব হাতুড়ে ওষুধওয়ালাদের ফাঁসিতে লটকাবার জন্যে একটা আইন করতে পারে না কেউ! ইণ্ডিয়া-ডিফেন্স-অ্যাক্ট, একশো-চুয়াল্লিশ-ধারা, অ্যামেণ্ডমেণ্ট-অ্যাক্ট, পাঁচ-আইন—সরকারের-দাক্ষিণ্য-প্রসারিত বাহু এক্ষেত্রে এমন কৃপণ কেন!

চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এডিথ আর একবার বেগে উঠবার চেষ্টা করলে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝিমিয়ে পড়ল সর্বাঙ্গের একটা স্থানীয় জড়তা আর শ্রান্তির শিথিল আচ্ছন্নতায়!

—রেখা!

—কে ?

মুহূর্তে এ্যাডিথের আচ্ছন্নতা দূর হয়ে গেল। রেখা! এ নামে তাকে কে ডাকে!

—রেখা! ঘুমুচ্ছ?

এবার আর চোখ-কানকে অবিশ্বাস করবার কিছুই নেই। সামনে পরিচিত মুখ, সেই পরিচিত হাসি। টকটকে ফরসা রঙ—একটি দীপশিখার মতো ক্ষীণ-দেহ উজ্জ্বল মানুষ!

—প্রভাস!

মুহূর্তে রেখা প্রভাসের বুকের মধ্যে ভেঙে পড়ল।

কয়েক মিনিট কেটে গেল ঘনীভূত খানিকটা অনুভূতিমগ্ন স্তব্ধতায়। আস্তে আস্তে রেখা প্রভাসের বাহু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে। বললে, তুমি কী করে এলে?

—যেমন করে সবাই আসে। ট্রেনে, তারপরে মোটরে—তারপরে হেঁটে। জানতাম এখানে তুমি আছো—খুঁজে নিতে কষ্ট হল না।

উচ্ছ্বসিত আনন্দের আবেগে রেখার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আঁচলে চোখের জল মুছে নিয়ে বললে, বসো, চা খাও, বিশ্রাম করো। সাতদিনের মধ্যে তোমাকে আমি ছেড়ে দেব না, এই বলে রাখলাম।

প্রভাস কোমল গলায় বললে, পাগল! আজকের দিনটাও যে থাকতে পারবো না। বড় জরুরী কাজ। আমাকে যেতে হবে গ্রামে ভাতারমারীর মাঠের ওপারে।

—ওঃ!—রেখার সমস্ত উজ্জ্বল উল্লাসের ওপর ঠাণ্ডা একটা ভারী চাপ এসে পড়ল যেন। প্রভাস তার কাছে আসেনি—এসেছে আপনার কাজে। রুদ্র সন্ন্যাসীর তপস্যা এখনো শেষ হয়নি—এখনো আসন্ন হয়নি ঘর বাঁধবার মধুমাস। আর কত দিন, কত দিন এই অনাসক্ত বৈরাগীর পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করবে রেখা!

—আজই যাবে?

—আজই যেতে হবে।

কিন্তু ওখানে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে গেছে। চূড়ান্ত রিপ্রেশন হয়েছে—মানুষগুলো যেন পাগলা কুকুরের মতো ক্ষেপে রয়েছে। কী করবে ওখানে গিয়ে?

—এই তো কাজের সময়। এখন গিয়েই তো ওদের বলতে হবে বিশ্বাস হারিয়ো না। যা হারিয়েছ, যা ত্যাগ করেছ—যতখানি রক্ত দিয়েছ—তার ঋণ একদিন শোধ করবেন বিশ্বের ভাণ্ডারী। কিন্তু ভুল করেছিলে ভাই—বিপথে গিয়েছিলে। আত্মস্থ হও—প্রকৃতিস্থ হও। বিপ্লবের প্রদীপকে নিবিয়ো না—বুকের রক্ত দিয়ে জালিয়ে রাখো—ঐক্যবদ্ধ হও—শক্তি অর্জন করো। আকস্মিক আত্মঘাতী বিস্ফোরণ নয়—গণসংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হও।

—কিন্তু তোমার স্বপ্ন কি সার্থক হবে প্রভাস?

—স্বপ্ন তো দেখি না রেখা। যা অনিবার্য তাকেই দেখি। বাঁধ যখন ভেঙেছে তখন তাকে ঠেকাবার সাধ্য আর কারো নেই। কিন্তু কূল-ভাঙা দিক-ছাড়া বন্যা নয়—তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে—তাকে পথ দেখাতে হবে। ইতিহাস আর পৃথিবী যে পথে চলেছে সেই বৈজ্ঞানিক পথ তাকে অনুসরণ করতে হবে। যা স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাসের মধ্যে রূপ পেয়েছিল—যুক্তির সত্য দিয়ে তাকে ফলবান করতে হবে। এর মধ্যে স্বপ্ন নেই—সুনিশ্চিত বাস্তবতা আছে।

প্রভাস চুপ করল—রেখা চুপ করে রইল। প্রভাসের সমস্ত মুখখানা জ্বলছে—দীপ-শিখার মতো। উজ্জ্বল দীর্ঘদেহে অনাগত সার্থক দিনের যেন আনন্দময় প্রতিচ্ছবি এসে পড়েছে। কিন্তু তবুও রেখা খুশি হয়ে উঠতে পারছে না—চোখের কোণ দিয়ে তেমনি অশ্রুর বিন্দু গড়িয়ে আসছে। আর পারে না সে—আর পারে না। এই স্বাধীন জীবন—এই নিঃসঙ্গ পথ-যাত্রায় সে ক্লান্ত। কিন্তু রুদ্র সন্ন্যাসীর তপস্যা শেষ হবে কবে? কবে আসবে মিলনের মধুমাস! সে কি অনাদি আর অনন্ত কালের পরে?

* * * *

মহকুমা-শহরের দুটি প্রবেশ পথ।

পীচের রাস্তা দিয়ে চলেছে বাসের পর বাস। আর্মড্-ফোর্সের আনাগোনা—রাজবন্দীদের নিয়ে চলেছে লরী। আসছে অফিসার—অভিজাত—শহরের বাসিন্দা। আসছে বোম্বাই-দিল্লী-কোলকাতার মানুষ; আরো দূরের জগৎ—ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকার বার্তা আসছে রয়টারে। মসৃণ পথ, সমতল পথ—নিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত জীবন।

আর রঙীর খেয়া পার হয়ে, কানাঠাকুরকে পারানির পয়সা গুণে দিয়ে ভাতারমারীর মাঠের দিকে হেঁটে চলেছে প্রভাস। পিঠে একটা ছোট থলি—হাঁটু পর্যন্ত উঠেছে লাল ধুলো। পঙ্কিল অসমতল রাস্তা—জনহীন দিক-প্রান্তর, টিলার ওপরে তালগাছের মাথায় শকুনের পাল। বাতাসে যেন এখনো ভাসছে বারুদের একটা মিষ্টি আর উগ্র গন্ধ।

পশ্চিম প্রান্তে রক্ত-রঙীন দিনান্ত। আকাশ যেন লালচাঁদ মণ্ডলের বুলেট-বেঁধা বুকের রক্তে লাল।

রচনাকাল:
ভাদ্র, ১৩৫২

মহানন্দা

১

অজগর সাপের দু'দুটো ফাঁসের মতো দুটো রেল কোম্পানীর ব্রীজ পড়েছে। হিমালয়ের গা থেকে কেটে কেটে ওয়াগনের পর ওয়াগন ভর্তি করেছে পাথরে, তারপর সেই পাথর এনে ঢেলেছে মহানন্দার জলে। পাহাড়ী নদীর উদ্দাম প্রাণশক্তি বহুদিন ধরে ঠেলে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে সেই জগদ্দল, ফেনিল গর্জন করে উঠেছে ক্ষুদ্র আক্রোশে, ভয়াল শব্দে জলচক্রে ঘুরিয়েছে নিজের অর্থহীন উন্মত্ততার মতো, তারপর 'খেদায়' আটকে পড়া বুনো হাতী যেমন করে পোষ মানে, তেমনি করে আত্মসমর্পণ করেছে দুর্বিনীত মানুষের যন্ত্রবিদ্যার কাছে। পাথরের ভিতের উপর গড়ে উঠেছে গম্বুজের মতো মোটা মোটা থাম মাথা তুলেছে বিরাট শক্ত বল্টুর জোড় লাগানো উদ্ধত ইস্পাতের হাঙর, হুস্—হুস্ করে বেরিয়ে গেছে নিশ্চিত নির্ভীক রেলগাড়ি। এক নয় দু'দুটো ব্রীজ শোনা যাচ্ছে ইংরেজ-বাজার শহরের সঙ্গে রেলস্টেশনের অবাধ যোগসূত্র স্থাপন করবার জন্য, আরো একটা লোহার শিকল তৈরি হচ্ছে আগামী ভবিষ্যতে।

মরে যাচ্ছে মহানন্দা, শুকিয়ে আসছে দিনের পর দিন। উত্তর বাংলার শ্যামল মাটির শ্রেষ্ঠ প্রাণপ্রবাহিনীর সর্বাঙ্গে নেমেছে অপঘাতের ছায়া। এদিকে ওদিকে যে দু'চারটে স্টিমার সার্ভিস ছিল আস্তে আস্তে তা বন্ধ হয়ে আসছে, নদীতে জল নেই। বর্ষা আর শরতের কয়েকটা মাস ছাড়া মরা নদী মহানন্দার দিকে তাকালে কষ্ট হয়। বিশাল বালুশয্যার মাঝখানে এদিকে ওদিকে তির তির করে দু'একটা জলের রেখা বয়ে যায়, কোনোটায় স্রোত চলে, কোনোটায় চলে না। রুদ্ধ জলের টুকরোগুলোতে নিষ্পত্র ছোট ছোট ডালের মতো—এক ধরনের ছোট ছোট শ্যাওলা—চিংড়ি মাছের সবুজ ডিম থোকায় থোকায় তাদের গায়ে জড়িয়ে থাকে, বালির চড়ায় অজস্র বনঝাউ, তাদের ফাঁকে ফাঁকে নেচে বেড়ায় স্নাইপ আর গাংশালিক, কখনো কখনো কচ্ছপেরা উঠে রোদ পুইয়ে যায়। আর এখানে ওখানে মরা কুমীরের মতো জেগে থাকে ভাঙা নৌকোর গলুই—তার ওপরে অবসর সময়ে মাছরাঙারা ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে।

তবুও ঢল আসে বর্ষার—তিরতিরে নীল জলে নামে ঘোলা জলের পাহাড়ী বান। শ্যাওলার স্তর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, হারিয়ে যায় বনঝাউয়ের দল, মোটা মোটা গম্বুজগুলোকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠে নদীর ভৈরব গর্জন। চলতি ট্রেনের যাত্রীরা ভয়ার্ত চোখে তাকায় নীচের জলের উন্মত্ত আক্রোশের দিকে—যদি ব্রীজটাকে ভাঙে হঠাৎ? কিন্তু সে ক্ষমতা নেই মহানন্দার, শুধু খাড়া পাড়ের গা থেকে মাঝে মাঝে খসিয়ে নামিয়ে নেয় অনেক বড় বড়

চাঙাড়, তারপর বর্ষার জল টানলে দেখা যায় সেই মাটির চাঙাড়গুলোই আরো খানিকটা নিষ্ঠুর বালুশয্যা হয়ে মহানন্দার ক্ষীণ কণ্ঠকে আর একটা কঠিন মুষ্টিতে আঁকড়ে ধরেছে। আত্মহত্যা করছে মহানন্দা—পাথরের প্রাচীরে মাথা ঠুকে ঠুকে নিজেকেই রক্তাক্ত করে ফেলছে—নিশ্ছেদ নিয়মে বছরের পর বছর লিখে চলেছে অবক্ষয়ের ইতিহাস।

আর সেই ইতিহাসের সঙ্গে বিবর্তিত হচ্ছে সেই সব মানুষের জীবন—মহানন্দাকে কেন্দ্র করে যারা ঘর বেঁধেছিল, যারা ভালবেসেছিল, ভালোয় মন্দে নানা সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্বে যারা আলোড়িত হয়েছিল। উৎসবে ব্যসনে যারা নিত্যসঙ্গী ছিল, শ্মশানের পথে আজ তারা সহযাত্রী। মাঝে মাঝে বনঝাউয়ের দীর্ঘ নিঃশ্বসিত আকুলতায় কিসের একটা ঈঙ্গিত পাওয়া যায়—স্পষ্ট করে বুঝতে পারা যায় না। মহানন্দা মরে যাচ্ছে—আর মরে যাচ্ছে গৌড়বঙ্গের সংস্কৃতি। আত্মহত্যা আর অবক্ষয়।

যতীশ ঘোষের বাড়িতে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন হচ্ছিল।

যাদবের গ্রাম এই যোধপুর। পূর্বপুরুষ কেউ কেউ জমি চাষ করত, কিন্তু এখন আর সে দিন নেই। ভোলাহাটের ইংরেজী স্কুলে লেখাপড়া শিখে তারা অনেকেই ভদ্রলোক হয়ে গেছে। কেউ কেউ ভালো চাকরিবাকরি করে, অনেকে ইংরেজবাজারে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য খুলে বসেছে। বাণিজ্যে এবং রাজসেবায় লক্ষ্মীর কৃপা মিলেছে, কৃষিতে যারা এখনও বিশ্বাস রাখে তারা আজকাল আর নিজের হাতে লাঙ্গল ধরে না, জন-মজুর রাখবার সঙ্গতি আছে তাদের। মোটের ওপর ছোটর মধ্যে যোধপুর সমৃদ্ধ আর প্রতিপত্তিশালী গ্রাম।

আর অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের অঙ্গাঙ্গী হচ্ছে ধর্ম। আর্থিক ভাবনার বিড়ম্বনাটা না থাকলে পারমার্থিক সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করা যায় অনেক সহজে। জমি আছে, খামার আছে, মহিষ আছে, আর ছোট ভাই রতীশ ঘোষের ইংরেজবাজারে কাপড়ের দোকান আছে। একান্নবর্তী পরিবারে দু ভাইয়ের রোজগার প্রয়োজনের পাত্র ছাপিয়ে অনেক বেশি পরিমাণেই উপচে পড়ে! দান-দাক্ষিণ্য আর ধর্মচর্চায় যতীশ ঘোষের নাম ছড়িয়ে গেছে চারদিকে।

নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব যতীশ ঘোষের দু'দুবার মথুরা-বৃন্দাবন হয়ে গেছে, শ্রীধাম নবদ্বীপে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্পও কিছুদিন থেকে চাড়া দিচ্ছে মনের ভেতরে। দিন কাটে চৈতন্যভাগবত আর চরিতামৃতের 'কৃষ্ণপ্রেম' আস্বাদন করে, কীর্তনের আসরে গলদশ্রু হয়ে এবং চৌদ্দ প্রহর অষ্টপ্রহরের বিলিব্যবস্থা করে। গলার কুঁড়োজালি আর কপালের তিলকসেবা প্রথম দৃষ্টিতেই সশ্রদ্ধ কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।

এমনিতে যতীশ কথা বলেন কম। কিন্তু এই জেলার অতীত ইতিহাসের কথা উঠলেই

তাঁর সমস্ত চেহারায় একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়, বৈষ্ণবের শান্ত বিনীত চোখ দুটো জ্বলে ওঠে অশান্ত উত্তেজনায়। যতীশ বলতে থাকেন—

বলতে থাকেন অনেক কথা। তখন 'নৃপতি-তিলক' হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে। তাঁর ডান হাত বাঁ হাত যখন দু'জন হিন্দু সামন্ত, অমর আর সন্তোষ—দবীরখাস আর সাকরমল্লিক। সমস্ত পূর্বভারত জুড়ে প্রচারিত হোসেন শাহের অমিত যশ আর অপরিসীম কীর্তি-গৌরব দবীরখাস সাকরমল্লিকের একনিষ্ঠ কর্তব্য পালনের ফল। হোসেন শাহ প্রাণের চাইতেও ভালোবাসেন এই দুটি ভাইকে—অমর আর সন্তোষকে।

এমন সময় নদীয়ার মাটিতে দেখা দিল এক পাগল। কৃষ্ণপ্রেমে তার দু চোখ দিয়ে ধারা বইছে, ভাবের আবেশে ক্ষণে ক্ষণে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, সোনার অঙ্গ ধূসর হয়ে গেছে ধুলোয়। তার গানে, তার কীর্তনে, তার ভাবাবেগে বাংলাদেশ টলমল করে উঠেছে।

তার পাগলামির ছন্দ মানুষকে মাতিয়ে দিলে। বর্ষা-মাতাল মহানন্দার মতো ভাঙন ধরিয়ে দিলে উঁচু উঁচু নিশ্চিন্ত ডাঙাগুলোতে। হরিনামে মুসলমান মাতাল হয়ে গেল, যৌবনদর্পিতা গণিকা দেবী হয়ে উঠল, পদ্মাতীরে দাঁড়িয়ে রাজা নরোত্তম ধ্যান-দৃষ্টিতে তার অপূর্ব মূর্তি দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন, রাজকুমার রঘুনাথকে বাঁধতে পারল না ঐশ্বর্য আর রূপের ইন্দ্রজাল, কূটতার্কিক অদ্বৈতবাদী সার্বভৌম তার উদ্দাম প্রেমপ্রবাহে ভাসিয়ে দিলেন নিজের সমস্ত বুদ্ধির দম্ভ, বিদ্যার অহমিকা।

সেই পাগল আসছে গৌড়ে। মহানন্দা, ভাগীরথী, কালিন্দী, ফুল্লরা আর টাঙনের জল তার প্রতীক্ষায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। হোসেন শাহ প্রমাদ গনলেন, তাঁর দিগ্বিজয়ী তলোয়ার শত্রুকে হটিয়ে দিতে পারে কিন্তু এই পাগলকে তিনি ঠেকাবেন কেমন করে?

তিনি পারলেন না। মহাপ্রভুর পদপাতে গৌড় ধন্য হল, চরিতার্থ হল রামকেলি, নগরের পথে পথে উঠল নামকীর্তনের কলরোল। হোসেন শাহের সেনাবাহিনী তলোয়ার ধুলোয় ফেলে দিলে, মূঢ় বিস্ময়ে সুলতান শুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মহানন্দা, টাঙন, ফুল্লরা, কালিন্দীতে বান ডাকল—ফেঁপে ফুলে দুলে উঠল আদি ভাগীরথীর নিস্তেজ মুমূর্ষু প্রবাহ। "যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী" মন্ত্র উচ্চারণ করে সাকরমল্লিক সন্তোষ অনুভব করলেন ঐশ্বর্য ও আধিপত্যের অনিত্যতা। সাকরমল্লিক সন্তোষ শ্রীরূপ গোস্বামী হয়ে সর্বত্যাগী বৈরাগীবেশে পথে নেমে পড়লেন।

দবীরখাস অমরকে বেঁধে রাখতে চাইলেন সুলতান প্রলোভন দিয়ে, অর্থ দিয়ে, খেলাত-খেতাব দিয়ে। কিন্তু অমরের রক্তেও সেই সৃষ্টিছাড়া নাচের ছন্দ লেগেছে। সুলতানের ক্রোধ জেগে উঠল। তিনি অমরকে কারাগারে কাঠের পিঞ্জরে বেঁধে রাখলেন।

কিন্তু ঝড়ের আকাশ যাকে ডাক পাঠিয়েছে, পিঞ্জরের বন্ধন তার কতক্ষণ? উড়িষ্যা অভিযান শেষ করে হোসেন শাহ যখন ফিরলেন, তখন পাহাড় পর্বত নদী অরণ্য পার হয়ে

ব্যাকুল বৈষ্ণব সনাতন গোস্বামী যাত্রা করেছেন নীলাচলে, নীলমাধবের পুণ্যভূমিতে গৌরাঙ্গের চরণাশ্রয় তিনি লাভ করবেন।

মহাপ্রভুর সেই পদচিহ্ন বহন করছে এই জেলা, রামকেলি, গৌড়, সাদুল্লাপুরের ঘাট। রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামীর দেশ। এখানকার প্রতিটি জলবিন্দুতে, এখানকার মাটির প্রত্যেকটি পরমাণুতে হরিপ্রেমের অমৃত মিশে আছে। এই জেলার অধিবাসী হয়ে তাঁর জন্ম সার্থক, তাঁর জীবন ধন্য। মুদিত নেত্রে যতীশ বলতে থাকেন :

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ,
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ পরব্যোম যার দলশ্রেণী,
সর্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকার গণি।
এইমত ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ অবতার
ব্রহ্মা শিব অন্ত না পায়, জীব কোন ছার—

যতীশের চোখ দিয়ে জল পড়ে। সামনে মহানন্দার জল রোদে ঝক ঝক করে ওঠে, সেদিকে তাকিয়ে তিনি যেন দেখতে পান সোনার গৌরাঙ্গের অঙ্গদ্যুতি ও গৈরিকাভা শান্ত স্রোতের মৃদু তরঙ্গে তরঙ্গে উছলে উঠছে।

কিন্তু লোকে বলে, যতীশ ঘোষের এই বৈষ্ণবতার পেছনে আর একটু ব্যক্তিগত কারণ আছে। কৃষ্ণানুরক্তি অবশ্য এ অঞ্চলের বংশগত সংস্কার।

নামজপ আর নামকীর্তন এখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে পুরুষানুক্রমে সংশ্লিষ্ট। তবু যতীশ ঘোষের এই বাড়াবাড়িটা শুরু হয়েছে বছর বারো আগে থেকে, একটা পারিবারিক ব্যাপারে।

যতীশ ঘোষের একমাত্র ছেলে নীতীশ ঘোষ। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান, মেধাবী ছেলে। খোলাহাট স্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ত, মাস্টারেরা আশা করতেন ভালো রকম জলপানি নিয়ে সে পাস করবে, উজ্জ্বল করবে স্কুলের মুখ, বাপের মুখ, গ্রামের মুখ। যোধপুর গ্রামের রত্ন নীতীশ ঘোষ।

অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া এ অঞ্চলের রেওয়াজ, নীতীশেরও বিয়ে হয়েছিল। তেরো বছরের কিশোরী স্ত্রী মল্লিকা আর সতেরো বছরের কিশোর ছেলে নীতীশের প্রেম সেদিন যেন পাখায় ভর করে উড়ে বেড়াত। বসন্তের শান্ত মহানন্দার জলে জ্যোৎস্না পড়ত, কোকিল ডাকত যতীশ ঘোষের বড় ফজলী আমের বাগানটায়। মল্লিকার নিদ্রাকরুণ অপরূপ মুখের দিকে তাকিয়ে বর্গফুটের অঙ্ক ভুল হয়ে যেত নীতীশের।

তারপরে এল বর্ষা।

শান্ত মহানন্দা গর্জে উঠল—ঘোলা জলের অর্ঘ্য ঢেলে দিতে লাগল কালিন্দী, ফুল্লরা,

পুনর্ভবা। নিমাসরাই স্তম্ভের নীচে নদী ধরল কুপিতা ধূমাবতীর মূর্তি। চরের বনঝাউ-গুলোর চিহ্ন রইল না, উতরোল হয়ে উঠল বাসা-ভাঙা গাংশালিকের কান্না, সেই রাত্রে মল্লিকারও বাসা ভাঙল।

সমানে বৃষ্টি আর বাতাস চলছিল। দূর থেকে আসছিল মহানন্দার কলধ্বনি—বানের জল দুর্যোগের আনন্দে মেতে উঠেছে। সেই সময় মাইল তিনেক দূরে হরেকৃষ্ণ কুণ্ডুর গদীতে ডাকাতি হয়ে গেল। স্বদেশী ডাকাতি—ছোরা আর পিস্তল নিয়ে ডাকাতেরা হানা দিয়েছিল।

মল্লিকার যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখন দেখেছিল নীতীশ ভিজে জামাকাপড়গুলো ছেড়ে একটা গামছা দিয়ে মাথা মুছছে। সবিস্ময়ে মল্লিকা বলেছিল, এ কি!

—ভিজে গিয়েছি।

—ভিজে গিয়েছি! কেন, বাইরে গিয়েছিলে নাকি?

—হুঁ।

—এই রাত্রে! জামাকাপড় পরে? কোথায় গিয়েছিলে?

বিরক্ত হয়ে একটা ধমক দিয়েছিল নীতীশ। বলেছিল, চুপ করো। সব কথা জেনে তোমার লাভ কি।

—আচ্ছা বেশ!—অভিমানে পাশ ফিরে শুয়েছিল মল্লিকা—একটাও কথা বলেনি। আশ্চর্য, সব চেয়ে আশ্চর্য, তার অভিমান ভাঙাবার জন্যে এতটুকুও চেষ্টা করেনি নীতীশ। দুঃখে এবং বিস্ময়ে সমস্ত রাত্রি মল্লিকার ঘুম আসেনি। ফোঁটায় ফোঁটায় চোখের জল পড়ে বালিশটা ভিজে গিয়েছিল শুধু।

কিন্তু চোখের জলের পালা যে ওখানেই শেষ হয়নি, মল্লিকা তা জানত না। জানল দিন কয়েক পরে। ঘটল অসম্ভব আর অপ্রত্যাশিত। পুলিস এল, গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল নীতীশকে। ডাকাতি আর খুনের অপরাধে পনেরো বছর জেল হয়ে গেল তার।

মহানন্দার জলে তখন ফেনিল ঘূর্ণি ঘুরছিল, বাসা-ভাঙা গাংশালিক আকুল কান্নায় চক্রাকারে উড়ছিল উন্মাদ ঘোলা জলের ওপরে। মল্লিকা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, যতীশ ঘোষ স্থির হয়ে বসেছিলেন—বাজপোড়া মানুষ যেমন নিঃসাড়, নিষ্পলক এবং নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সে আজ বারো বছর আগেকার কথা। এর মধ্যে অনেক বদলেছে পৃথিবী, মহানন্দা আরো অনেকখানি মরে গেছে। ভরা পূর্ণিমায় থম্ থম্ করছে মল্লিকার যৌবন। সংকীর্তন আর অষ্টপ্রহরে তদ্গতমন হয়ে গেছেন যতীশ ঘোষ।

অষ্টপ্রহরের সংকীর্তন চলছিল—যতীশ ঘোষ বসে ছিলেন ধ্যানস্থ হয়ে। গালের পাশ দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল। সেই অভিভূত মানসমগ্নতা হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ঘায়ে

চুরমার হয়ে গেল, পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠল যতীশের।

স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রমও নয়। কারা যেন চিৎকার করে উঠেছে। সুস্পষ্ট, নির্ভুল চিৎকার।

একমাত্র স্টিমার থেকে যোধপুরের ঘাটে নেমেছে নীতীশ ঘোষ। বারো বছর পরে ঘরে ফিরে এসেছে।

২

আর, বারো বছরের ভেতরে নীতীশ এত বদলে গেছে কে জানত!

চেনা কি আর যায় না? তা যায় বই কি—নইলে যোধপুরের লোকেরা এত সহজে তাকে চিনলে কী করে? তবুও বারো বছর আগেকার স্মৃতিটা যাদের মনের কাছে তেমন ফিকে হয়ে যায়নি, তারা কেমন একটা অভিভূত কৌতূহলে নীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বাইরেটা বদলেছে বই কি। রোগা হয়েছে নীতীশ, লম্বা হয়েছে, অনেক ময়লা হয়েছে তার গায়ের রঙ। কপালের ওপরে একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন, ওটাও আগে ছিল না। আর ভারী হয়েছে গলার আওয়াজ, কিশোরের কোমল পেলব কণ্ঠস্বরে লেগেছে যৌবনের গাম্ভীর্য। নীতীশ বড় হয়েছে—সন্দেহ নেই।

কিন্তু বড় হলে কী হবে—মনের দিক থেকে ছেলেটি তেমনি নম্র, তেমনি বিনীত। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করার ব্যাপারটা সে আজো ভোলেনি। পায়ের ধুলো নিয়ে বড়দের প্রণাম করলে সে। গাঁয়ের লোকে অসীম বিস্ময়ভরে ভাবল এমন একটা ছেলে কি কখনো খুন করতে পারে, না ডাকাতি করতে পারে!

একজন আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, সত্যিই তুমি খুন করেছিলে নাকি?

নীতীশ হাসল।

—না, সুদাম কাকা। খুন করিনি, খুন হয়ে গেল।

তবে কথাটা সত্যিই। আদালতের বিচার মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি। সকলের ভয়-জড়ানো চোখের দৃষ্টি আর একবার নীতীশের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গেল। কিন্তু হত্যাকারীর কোনো স্বাক্ষরচিহ্ন সে মুখের কোথাও পড়তে পারা যায় না। নির্মল, নিষ্কলঙ্ক।

কৌতূহল আরো গভীর হয়ে উঠল।

—খুন হয়ে গেল! কী রকম?

—লোকটা আমায় জাপ্‌টে ধরেছিল। ছাড়াতে গিয়ে রিভলভারের গুলি বেরিয়ে গেল। তারপর—

তারপর নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই শুনে যেতে লাগল কাহিনী। ঝড় চলছিল তখন প্রবল বেগে, বৃষ্টি পড়ছিল অশ্রান্ত ভাবে, আকাশের বুক ফেড়ে লকলকিয়ে উঠছিল বিদ্যুতের নীল ফলক। মহানন্দা গর্জন করছিল বুকের তলায় একরাশ ডিম লুকিয়ে-রাখা সন্ত্রস্তা নাগিনীর মতো। সেই মহানন্দা সাঁতরে ওরা পালিয়ে এসেছিল—সেই ক্রুদ্ধ ফেনিল জলে ধুয়ে গিয়েছিল রক্তের দাগগুলো। তারও পরে—

গল্প চলতে লাগল। শান্ত, ঘুমন্ত গ্রাম যোধপুর। সেই দুর্যোগের রাতে সেই ডাকাতির গল্প এখানে স্বপ্নের মতো অবাস্তব—অবসর মুহূর্তের নিছক কল্পবিলাসের মতো। বারো বছর আগে, সেই বিশেষ রাত্রিতে যোধপুর গ্রামের মানুষগুলো চিরাচরিত নিয়মে তলিয়ে ছিল নিশ্চিন্ত ঘুমের গভীরে, শীতের হাল্‌কা আমেজে একটা পাতলা চাদর কেউ কেউ জড়িয়ে নিয়েছিল গায়ে, কেউ বা বৃষ্টির ছাট রোখবার জন্যে হয়তো শক্ত করে এঁটে দিয়েছিল দরজা-জানালাগুলো। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঘটে যাচ্ছিল কতকগুলো ভয়ঙ্কর ঘটনা, খুন-ডাকাতি—মানুষের রক্তে হাত রাঙা হয়েছিল নীতীশের।

আজও তেমনি নিশ্চিন্ত যোধপুর। প্রথম ফাল্গুনে মুকুল ধরেছে কলমের বাগানে বাগানে। পুরোনো কোকিল-পাপিয়ার গান উঠেছে আকাশ-বাতাসে, মহানন্দার বালুচরে মাতামাতি করছে বনঝাউ। যতীশের দাওয়ায় মাদুর পেতে বসেছে সকলে। তামাক পুড়ছে, ধোঁয়া উড়ছে, উঠছে হুঁকোর শব্দ। সেই রাত্রির সে ঘটনা যেমন যোধপুরের মানুষদের কাছে সত্য ছিল না, তারই আজকের গল্পও তেমনি অলস কল্পনার ছায়ামূর্তির মতো। রূপ আছে, রঙ আছে, কিন্তু আকার নেই।

তবু একটা কথা যোধপুর জানত না। আর এক নতুন দুর্যোগ সাড়া দিয়ে আসছে, আর এক নতুন ঝড়ে লাল আলো ঝল্‌কে উঠছে অগ্নিকোণে, মহানন্দার মরা জলে গোপনে গোপনে সঞ্চারিত হচ্ছে আরো এক বন্যার অলক্ষ্য সংকেত। সেদিন যোধপুর টের পায়নি, আজও পেল না; কোনো নির্দেশ তারা খুঁজে পেল না নীতীশের চোখের তারায়, তার পবিত্র মুখখানার কোনো প্রান্তেই।

যতীশ ঘোষ কিছুটা কি টের পেয়েছিলেন? কে জানে!

বারো বছর পরে দেখা হয়েছে একমাত্র ছেলের সঙ্গে। আবেগে, উল্লাসে আর দম-আটকে-আসা অদ্ভুত একটা অনুভূতির প্রতিক্রিয়ায় অনেকক্ষণ ধরে কোনো কথা তিনি উচ্চারণ করতে পারেননি। চোখের সামনে একটা বাষ্পের কুয়াশা এলোমেলো ঘুরপাক খেয়েছিল অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরে মনে হয়েছিল যেন তাঁর হাত-পাগুলো আকস্মিক পক্ষাঘাতের স্পর্শে কেমন আড়ষ্ট, অচেতন হয়ে গেছে। তারপর আস্তে আস্তে

সামনেই যখন স্বচ্ছ হয়ে এল, দেখলেন তাঁর পায়ে মাথা রেখে নীতীশ প্রণাম করছে।

প্রায় অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভালো ছিলে তো?

—হ্যাঁ বাবা।

—খুব রোগা হয়ে গেছ।

—ও কিছু না, শরীর আগের মতোই ভালো আছে আমার।

একটা অবাঞ্ছিত নীরবতার ভেতরে উড়ে গেল গোটাকয়েক পলাতক মুহূর্ত। শুধু বিরাম-যতির মতো এক-একটা পাপিয়ার শিস্ চিহ্নিত করতে লাগল সময়কে। তারপর :

তারপর, নীতীশ প্রশ্ন করল, তুমি অনেক বুড়ো হয়ে গেছ বাবা—

—বয়েস তো বাড়েই মানুষের—কমে না কোনোদিন।

—না, তা নয়। তোমার মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে—

এইবারে যতীশ ঘোষ হাসলেন। প্রশান্ত, সস্নেহ, নির্বেদ বৈষ্ণবের হাসি।

—বয়েস হলে চুল পাকেই চিরকাল। কিন্তু ওসব যাক। এখন তুমি একটু বিশ্রাম করো গে যাও, পরে কথাবার্তা হবে।

নীতীশ চলে গেলে, খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে যতীশ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। আশ্চর্য, যতীশ বুঝতে পারছেন না খুব খুশি হয়েছেন কিনা তিনি। বারো বছর পরে ছেলে ফিরে এসেছে। যার ফেরার কোনো আশাই ছিল না, আজ একান্ত আকস্মিক আর অপ্রত্যাশিত ভাবেই সে ফিরে এসেছে। এই আকস্মিকতার জন্যেই কি অনুভূতিটা এমন ভাবে ঝাপ্সা হয়ে গেছে যতীশের? অথবা খুশির মাত্রাটা এত বেশি গভীর আর ব্যাপক হয়ে ছড়িয়ে গেছে যে যতীশ সেটাকে ঠিকমতো পরিমাপ করতে পারছেন না?

কী হল কে জানে, তবু যতীশ স্পষ্ট বুঝলেন আজ থেকে জীবনের সহজ সরল রেখায় নতুন কাটা আঁচড় পড়ল একটা। নীতীশ ফিরে না এলে কী হত সেটা তিনি নির্ধারিত করে নিয়েছিলেন নিজের মধ্যে, বেছে নিয়েছিলেন ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারণা, কীর্তন, অষ্ট-প্রহরের নির্দিষ্ট একটা নিয়ন্ত্রিত পথ। লৌকিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি অতি-লৌকিকের একটা সুনিশ্চিত পরিণতি নিয়েছিলেন। কোন উৎকণ্ঠা ছিল না আর, কোন আবেগ ছিল না, ভাব-ভাবনার আতিশয্য ছিল না কোথাও।

কিন্তু ফিরে আবার নতুন গ্রন্থি পড়ল একটা। যে পথ নিশ্চিন্ত ছিল, তার গতিটা বদ্‌লে যাবে আবার। আবার সংসার, আবার মায়া, আবার সন্তানমোহ। তার চাইতেও বড় কথা—একদিন যে ঝড় তুলে নীতীশ বিদায় নিয়ে গিয়েছিল, আবার কি সে ফিরিয়ে আনবে সেই ঝড়কে?

যতীশের মনে পড়ল ছেলের নতুন চেহারা। বড় হয়েছে সে, বয়স বেড়েছে তার। রং ময়লা হয়েছে, গলার স্বর হয়েছে গম্ভীর আর গভীর। গালের হাড় দুটো অতিরিক্ত

প্রকট হয়ে উঠেছে মুখের দু পাশে। চোখের দু কোণে কালো ছায়া নেমেছে, কি চোখ দুটো হয়েছে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আর অতিরিক্ত খরশান! সব কিছু মিলিয়ে এমন একটা কিছু লক্ষ্য করেছেন যতীশ ঘোষ—যা একটা সূক্ষ্ম অস্বস্তির মতো পীড়ন করছে তাঁকে। সত্যিই বদলে যাবে সব—বদলে যাবে এতদিনের বাঁধা নিয়মে নিশ্চিন্ত পদচারণা।

তবে কি ছেলে ফিরে না এলেই যতীশ খুশি হতেন?

ছি-ছি-ছি! কথাটা মনে পড়তেই যতীশ ধিক্কার দিলেন নিজেকে। এ কি বিশ্রী মনোবিকার! বুড়ো বয়েসে কি ভীমরতি ধরেছে তাঁর? বারো বছর পরে একমাত্র ছেলে ফিরে এলে নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বাপ সেটাকে অবাঞ্ছিত বোধ করে—এ কি স্বপ্নেও ভাবতে পারে কেউ! নারায়ণ নারায়ণ!

বাড়িতে তখন হৈ-হুল্লোড় শুরু হয়েছে।

ওদিকের পুকুর তোলপাড় হচ্ছে মাছের জন্যে। যতীশ নিরামিষাশী, মল্লিকাও প্রায় তাই—খাওয়ার লোক বলতে তিন-চারজন চাকর মজুর আর নীতীশ। তবু এর মধ্যেই সের দশেক ওজনের মাছ ধরা হয়ে গেছে। যতীশের বিরক্তি বোধ হল। শুধু জীবহত্যা নয়, অপচয়ও বটে।

আবার নিজেকে ধমক দিলেন যতীশ। এ কি হচ্ছে তাঁর—ছেলে বাড়িতে পা দিতে-না-দিতেই মনের মধ্যে এসব কী কিলবিল করে বেড়াচ্ছে! নারায়ণ নারায়ণ!

পুজোর ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। একটু আগেই মল্লিকা এসে সব সাজিয়ে দিয়ে গেছে। ঘরে রেখে গেছে শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন—গুছিয়ে রেখেছে ঝকঝকে দুটি বাটিতে। ধূপদানিতে সুগন্ধি ধূপ জ্বলছে, তামার পুষ্পপাত্রে সাজানো ফুলগুলোর মৃদু কোমল সুরভি মিশেছে ধূপের গন্ধের সঙ্গে। সামনে লাল শালু ঢাকা ছোট জলচৌকির ওপরে যুগল-মূর্তির সর্বাঙ্গে ঝকমক করছে অলঙ্কার, রাধাকৃষ্ণের মুখে নিশ্চল হাসিতে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে স্বর্গীয় ব্যঞ্জনা।

আসনে বসলেন যতীশ। হঠাৎ মনটা শান্ত হয়ে গেছে, স্তিমিত হয়ে গেছে একটু আগেই তরঙ্গিত হয়ে ওঠা এলোমেলো বিশৃঙ্খল ভাবনাগুলো। এই তো তাঁর নিজের জগৎ, এই তো তাঁর স্থির-সমাহিত হওয়ার অনুকূল আর বাঞ্ছিত পরিবেশ। এখানে সংসার নয়, নীতীশ নয়— আকস্মিকের অনিশ্চয়তাও নয়। যুগল-মূর্তির অপরূপ হাসি যেন তাঁর সমস্ত সংশয় দিয়েছে নিরসন করে।

মৃদু কণ্ঠে ভক্তি-বিনম্র প্রার্থনা উচ্চারিত হতে লাগল :—

"শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ,
কাতরে বন্দনা রচে নরোত্তম দাস—"

কিন্তু মল্লিকা!

বারো বছর পরে প্রোষিতভর্তৃকার সাক্ষাৎ হল স্বামীর সঙ্গে।

রাত প্রায় এগারোটা। যতীশের দাওয়া থেকে আসরটা ভাঙল এতক্ষণ পরে। খাওয়া-দাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল, একটা সিগারেট শেষ করে নীতীশ এল শোবার ঘরে।

ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল, খাটের ওপর ছড়ানো ছিল ধবধবে বিছানা। একখানা থালার ওপরে সাজানো মোটা একছড়া গোড়েমালার গন্ধে আমোদিত হয়েছিল ঘরখানা।

ঢুকেই নীতীশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মল্লিকাকে যে ভাবে সে আশা করেছিল, দেখল সম্পূর্ণ অন্য ভাবে। এ কি শোবার ঘর, না এও পূজার ঘর?

একপাশে শ্রীগৌরাঙ্গের একখানা সোনার ছোট মূর্তি। ফুল আর চন্দন দিয়ে তাকে সাজানো হয়েছে নিখুঁত সুন্দর হাতে। তারই সামনে একটি ঘিয়ের প্রদীপ। আর—

আর ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে মল্লিকা। বারো বছর আগেকার সেই বালিকা বধূ নয়, তরুণী, পরিণত-যৌবনা মল্লিকা। কিন্তু সেই যৌবনের ওপরে নিরাসক্ত বৈরাগ্যের একটা ছায়া পড়েছে—যেন নিজেকে হঠাৎ আবিষ্কার করেই পরমুহূর্তে মল্লিকা জোর করে সেটাকে ভোলবার চেষ্টা করেছে। ঘাড়ের, গলার ওপর দিয়ে ভেঙে পড়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ অবিন্যস্ত চুল, রুক্ষ,—তেলের স্পর্শবর্জিত, অরণ্যের মতো অসংস্কৃত অমনোযোগিতায়। মল্লিকার চোখ দুটি মুদ্রিত, শুধু সেই চোখের দুই কোণা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে মোটা মোটা অশ্রুর বিন্দু। অপূর্ব পরিতৃপ্তিতে সুকুমার মুখখানি অপরূপ শ্রী ধরেছে। নিবিষ্ট হয়ে আছে মল্লিকা, শুনতে পায়নি নীতীশের পায়ের শব্দ।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীতীশ, ভাববার চেষ্টা করতে লাগল। এ কার ঘরে পা দিলে সে? এ কি তারই মল্লিকা? এর কি কোন দেহ আছে যা তার স্পর্শগম্য, কোনো কি মন আছে যাকে সে উপলব্ধি করতে পারবে তার মানসিকতার ব্যাপ্তি দিয়ে? এ যেন অলক্ষ্য একটা জ্যোতিঃসংকেত—যাকে সে কোনোদিন আয়ত্ত করতে পারবে না। বারো বছর আগেকার মল্লিকার সঙ্গে এ মল্লিকার কোনো মিল কি খুঁজে পাওয়া যাবে আজ?

অথচ কী আশা করেছিল সে? আশা করেছিল যা সবাই করে—যে আশা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। ঘরে ঢুকতেই মল্লিকা তার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে দুকূলহানা বন্যার দুর্জয় উচ্ছ্বাসের মতো। আর তার চোখ থেকে নেমে আসবে জলের ধারা,—নীতীশের বুক ভাসিয়ে সে জল ঝরে পড়তে থাকবে।

হ্যাঁ—জল পড়ছে মল্লিকার চোখ দিয়ে। কিন্তু কার উদ্দেশ্যে সেই ঠিক বুঝতে পারছে না নীতীশ। মন্ত্রমুগ্ধের মতোই সে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে রাত্রি। আমের মুকুলের গন্ধে উতরোল বসন্তের রাত্রি, পাপিয়ার শিসে সেই পরিচিত পুরোনো আকুলতা।

মহানন্দার বালিভাঙা থেকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে বনঝাউয়ের হু-হু শ্বাস। অতল সমুদ্রের মতো একটা স্তব্ধতা।

আর সেই স্তব্ধতা যেন রূপ ধরেছে মল্লিকার সর্বাঙ্গে। কোনোখানে এতটুকু জীবনের লক্ষণ নেই—সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে গেছে সে। জোরে নিশ্বাস ফেলতেও আশঙ্কা হল নীতীশের—হয়তো মল্লিকা চমকে উঠবে।

আরো কয়েকটা মিনিট তেমনি করেই কাটল মল্লিকার। তারপর আস্তে আস্তে নিবাত-নিষ্কম্প দেহটা নড়ে উঠল। রুক্ষ চুলের রাশি সোনার গৌরাঙ্গের পায়ের ওপর ছড়িয়ে সে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে। নীতীশ দাঁড়িয়ে রইল তেমনি নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে—যেন এই মুহূর্তেই অলৌকিক কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।

মল্লিকা উঠে দাঁড়ালো। নীতীশের দিকে তাকিয়ে হাসল মৃদু ভাবে। কিন্তু সে হাসি যেন তার নিজের নয়, যতীশ ঘোষের কাছ থেকে সেটা সে ধার করে এনেছে।

—তুমি কখন এলে ?

—এই তো, একটু আগেই।

নীতীশের গলাটা একটু কেঁপে উঠল কি ?

—ঠাকুরের ধ্যান করছিলাম, টের পাইনি। দাঁড়াও, তোমাকে প্রণাম করি।

প্রণামের পরে হয়তো কেমন একটু চাঞ্চল্য ঘটেছিল নীতীশের। একটুখানি কলরোল হয়তো জেগে উঠেছিল রক্তের মধ্যে। তাই তখন একটু বেশি পরিমাণেই আকর্ষণ করেছিল মল্লিকাকে নিজের বুকের ভেতরে।

কিন্তু মল্লিকা ভেঙে পড়ল না, বুকের মধ্যে লুটিয়েও পড়ল না বাঁধ-ভাঙা বন্যার উচ্ছ্বাসে। বরং শান্তভাবে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলে নীতীশের বাহু-বন্ধন থেকে।

—দাঁড়াও, অত চঞ্চল হতে নেই। সামনে গৌরাঙ্গ রয়েছেন, দেখতে পাচ্ছ না ?

বশীভূতের মতো নীতীশ সরে দাঁড়ালো। ঘরটাকে এখন অত্যন্ত বেশি গুমোট, অত্যন্ত বেশি পরিমাণে গরম বলে মনে হচ্ছে তার। বাইরের খোলা হাওয়ায় একটুখানি গিয়ে দাঁড়ালে বুঝি একটা স্বস্তির শ্বাস টেনে নিতে পারত সে।

মল্লিকা বললে, গৌরাঙ্গ তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। সবই তাঁর দয়া।

নীতীশ জবাব দিল না, শুনে যেতে লাগল।

মল্লিকা বলল, আসছে শনিবার আমাদের বৃন্দাবনে যাওয়ার কথা ছিল। আমি আর বাবা—সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তুমি এসে আমাদের শ্রীধাম দর্শন নষ্ট করে দিলে।

মল্লিকা হাসছে—হয়তো সে হাসিটা একটুখানি কৌতুকের বেশি কিছুই নয়। তবু নীতীশের মনে হল, তার কথার আড়াল থেকে যেন একটা ক্ষোভের স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল, ফুটল একটা সূক্ষ্ম নৈরাশ্যের ইঙ্গিত।

আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কার কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ল নীতীশের চেতনায়। কেমন যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল—কেমন যেন দম আটকে আসতে লাগল। মল্লিকা কি সোনার গৌরাঙ্গের মতোই নিষ্প্রাণ আর নিশ্চেতন হয়ে গেছে—স্বর্গীয় আর অপরূপ, মৃত আর অলৌকিক? এই মল্লিকার ছোঁয়ায় তারও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কি বন্ধ হয়ে গিয়ে রূপান্তরিত হবে একটা সোনার পিণ্ডে?

হঠাৎ নীতীশ বললে, আজ ভারী ক্লান্ত মল্লি, ভয়ানক ঘুম পেয়েছে—

আর তৎক্ষণাৎ একটা পাশবালিশ আঁকড়ে নিয়ে বিছানার এক পাশ ঘেঁষে সে শুয়ে পড়ল। চোখের পাতায় যদি অন্ধকার টেনে আনা যায়, তাহলে আর কোনো পার্থক্য থাকে না আন্দামানের পাষাণ-প্রাচীর কিংবা যোধপুরে তার নিজের শোবার ঘরটির সঙ্গে।

৩

নীতীশের যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়েছে। একটা রোদের ফালি এসে লুটিয়ে পড়েছে বিছানার ওপরে। জানালার গরাদে বেয়ে একটা ছোট বুনো লতা উঠেছে। তার ঘন সবুজ চিক্কণ পাতায় রোদ ঝিকমিক করছে, পাতাগুলি শির শির করছে সকালের মিষ্টি হাওয়ায়।

আধবোজা চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু ঘোর কাটেনি। এখনো যেন নিজেকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হতে চাচ্ছে না। এতদিন পরে সত্যিই কি সে বাড়িতে ফিরেছে, তার নিজের বাড়িতে? বারো বছর আগে যেখান থেকে সে বিদায় নিয়ে গিয়েছিল, চলে গিয়েছিল আম বাগানের ভেতরে গোরুর গাড়ির ধুলো-ওড়া কাঁচা মাটির পথটা দিয়ে শহরের দিকে—যেখানে আবার কখনো ফিরে আসবে এ সম্ভাবনার কথা বিন্দুমাত্রও সে ভাবতে পারেনি সেদিন। মহানন্দার বুকে ঘোলা জল পাক খাচ্ছিল তখন, ওদিকের উঁচু ভাঙাটা থেকে মাঝে মাঝে খসে পড়ছিল মাটি আর ঘাসের চাঙাড়—তীব্র স্রোতের মুখে তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছিল জেলে ডিঙি আর মহাজনী নৌকো, এখানে ওখানে রূপোর উচ্ছ্বাসের মতো আকস্মিক এক-একটা ঘাই মারছিল মহানন্দার বড় বড় চিতল মাছ, আর থেকে থেকে পরমোৎসাহে ডিগবাজি খাচ্ছিল শুশুকের দল—দু চোখ ভরে তার সমগ্র একটা রূপ দেখে নিয়েছিল নীতীশ, একটা বিচিত্র বেদনার সঙ্গে পান করে নিয়েছিল শেষবারের মতো। কোনোদিন সে আর ফিরে আসবে না এখানে—মহানন্দার এলোমেলো ঢেউয়ের দোলার সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ত আর দুলে উঠবে না কখনো, এখানকার হটটিটি পাখী আর গাংশালিকের ডাক আর তার ভাবনায় সুর মেলাবে না কোনোদিন।

তারপর সেই দিনগুলো গেল। খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে ওয়ার্ডারের আর ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া। হুকুম হয়ে গেল স্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ডকাফের। হাত দুটো ওপরে ঝুলিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল চব্বিশ ঘণ্টা। সে কি অসহ্য অমানুষিক যন্ত্রণা! মনে হয়েছিল কে যেন একখানা করাত দিয়ে দুটো কাঁধের কাছটা কর্ কর্ করে অনবরত কেটে চলেছে। দাঁতে দাঁত চেপে তবু সেই গান: 'ওদের যতই বাঁধন শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে'—

কোর্ট। সাক্ষী, সাবুদ, জেরা। সরকারী উকিলের সেই ব্যাঙের মতো গলা ফুলিয়ে বক্তৃতা। ওরা নিশ্চিত জানত ফাঁসি হবে। তিন-চারজনে মিলে সুর করে গেয়ে উঠত:

আমায় ফাঁসি দিয়ে মা ভোলাবি
আমি কি মার সেই ছেলে,
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে।

কিন্তু ফাঁসি হয়নি। বয়স অল্প দেখে জুরীদের করুণা হয়েছিল। চৌদ্দ বৎসর দ্বীপান্তরের হুকুম হল। কিন্তু ওরা খুশি হতে পারেনি। সৈনিকরূপে ওরা চেয়েছিল বীরের মৃত্যু—মনের সামনে ছিল অজস্র শোনা গল্পের রোম্যান্স। ফাঁসির খবর পেয়ে কার কার শরীরের ওজন বেড়ে গিয়েছিল, গীতার শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে কারা গিয়ে উঠেছিল ফাঁসির মঞ্চে—সেই সব স্বপ্ন-কামনায় ওরাও রোমাঞ্চিত হয়ে থাকত। কিন্তু সরকারের করুণা সে সব রোমাঞ্চকে দিলে উড়িয়ে।

তারপর আন্দামান। বঙ্গোপসাগরের সেই উতরোল কালীদহ, মর্মরিত নারিকেল গাছের আড়ালে সেই দ্বীপের কারাগার। অতিকায় তেতলা বাড়িটা, যার প্রতিটি অণুপরমাণুতে হাহাকার, অভিশাপ, চোখের জল, দীর্ঘশ্বাস আর বজ্র-শপথ মিশে আছে শত সহস্র অপমানিত মনুষ্যত্বের। কতদিন সেখানে কেটে গেল—কতগুলো বৎসর! পাহাড়ী-কূলে প্রতিহত কালো ঢেউয়ের মতো কালো রঙের নির্ভুল, নিয়ন্ত্রিত সময়। সেই কালো ঢেউ আর কালো সময় পেরিয়ে আবার কোনোদিন সে ফিরে আসবে যোধপুরে, ফিরে আসবে তার নিত্য-পরিচিত মহানন্দার পটভূমিতে—জন্মান্তর না ঘটলে এমন সম্ভাবনার কথা স্বপ্নেও মনে হয়নি সেদিন।

তবু সে ফিরে এসেছে। জন্মান্তর ঘটেনি, তবুও। কিন্তু সত্যিই কি জন্মান্তর হয়নি?

এতক্ষণে নীতীশের ঘুম ভাঙল সত্যিকারের। মনে পড়ল মল্লিকাকে। কখন যে তার পাশে এসে শুয়েছিল আর কখন যে উঠে চলে গেছে সে টেরও পায়নি। বারো বছর পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের রাত্রিটি কেটে গেছে প্রতিদিনের সহজ স্বাভাবিক পরিচয়ের মতো। হয় আবেগের তীব্রতায় কারো মুখে কোনো কথা ফোটেনি, ভয় পেয়েছে পরস্পরকে স্পর্শ করতে, অথবা বারো বছরের ব্যবধান দুজনের মাঝখানে তুলে দিয়েছে একটা বিরাট ও

দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। হয় এটা অত্যন্ত বেশি স্বাভাবিক, নতুবা একান্ত ভাবেই অস্বাভাবিক।

কিন্তু কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না। জানালা দিয়ে চোখ মেলে বড় ভালো লাগছে ফ্রেমে-আঁটা চারুচিত্র দেখতে। মনের মধ্যে দৃষ্টি তলিয়ে যাচ্ছে না, ছড়িয়ে যাচ্ছে হালকা মেঘের ছোঁয়া বুলোনো নীল ঝিমন্ত আকাশে, কালো-সবুজ আমের বনে বনে, মহানন্দার চরে বনঝাউয়ের অশ্রান্ত নাচের দোলায়। তার দেশ, তার গ্রাম। যে গ্রামের মাটিতে দাঁড়িয়ে একদিন দেখেছিল ভারতবর্ষের বিশ্বরূপ, যেখানকার নদীর গানে গানে শুনেছিল দেশের বুকের ভেতর থেকে গুমরে গুমরে ওঠা বোবা কান্নার স্বর, সেই গ্রামে সে ফিরে এসেছে। যেখানকার মাটির ফোঁটায় তিলক কপালে পরে প্রথম দীক্ষা নিয়েছিল, সেখানকার মাটিতেই নিজের রক্ত ঝরিয়ে দিয়ে তার ব্রতের উদ্‌যাপন করতে হবে হয়তো।

চাকর বিশু ঢুকল ঘরে।

—দাদাবাবু, আপনার চা তৈরি হয়েছে।

—চা!—বিস্মিত কৌতূহলে নীতীশ বললে, এখানে চায়ের পাট এখনো আছে নাকি?

—না। আপনার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছেন কর্তাবাবু।

—আর কেউ চা খায় না বুঝি?

—না।

—ওঃ।

বিশু আবার তাড়া দিলে, উঠুন, মুখ-হাত ধুয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

হঠাৎ একটা প্রত্যাশায় নীতীশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: কে চা করেছে রে? বৌদি বুঝি?

—না, বৌদি নয়। আমিই তৈরি করলাম। বৌদির কি আর সময় আছে এখন—মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বিশু বলতে লাগল, বৌদি এখন পুজোর ঘরে—বেরুতে কখন সেই বেলা দুপুর হয়ে যাবে। দিন রাত পুজো-আচ্ছা নিয়েই আছেন, চা কি তিনি ছুঁতে পারেন?

গলায় একটা তিক্ত মন্তব্য এসে গেল। কে জানত চা স্পর্শ করতেও মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নিষেধ করে গেছেন? চায়ের রঙ লাল বলে কি ওতেও জীবরক্তের গন্ধ পেয়েছে নাকি ওরা? ভণ্ডামিরও একটা সীমা থাকা দরকার।

আর সঙ্গে সঙ্গেই খোল-করতালের প্রবল কলরবে সমস্ত বাড়িটা মুখরিত হয়ে উঠলো। যেন ডাকাত পড়েছে।

—ও কি রে বিশু?

—সংকীর্তন হচ্ছে আজ্ঞে। রোজই হয়। কিন্তু উঠুন দাদাবাবু, চা জল হয়ে গেল যে।

ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত গেল নীতীশের। খোলের চাঁটিগুলো কানের ভেতরে পেরেক ঠুকছে। হঠাৎ রূঢ় গলায় বলে ফেলল, তুই এখানে বকবক করছিস কেন ? নিজের কাজে যা—আমি যাচ্ছি।

তাড়া খেয়ে বিশু বোকার মতো বেরিয়ে গেল।

নীতীশ উঠে পড়ল। বাড়ির আবহাওয়া তাকে পীড়া দিচ্ছে, কাল রাতের মতো আজও যেন দম আটকে আসবার উপক্রম করে তুলছে তার। আলনা থেকে একটা গেঞ্জী টেনে সে গায়ে গলিয়ে নিলে, তারপর চটি পায়ে সে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু চায়ের আকর্ষণে নয়, অন্দরমহলের দিকেও নয়। সদর দরজা দিয়ে একেবারে সোজা রাস্তায়, আমবাগানের ছায়ায়, ধুলো-ওড়া মেঠো পথটাতে।

অন্তঃপুরে তখন জমাট আসর বসেছে। জোড়হাত করে সোনার গৌরাঙ্গ আর যুগলমূর্তির পায়ের কাছে বসে আছে মল্লিকা, ধ্যানস্থ হয়ে আছেন যতীশ। সমস্ত বাড়িটা শুচিপবিত্র হয়ে উঠেছে চন্দন, ফুল আর ধূপের গন্ধে, কীর্তনিয়া ইনিয়ে বিনিয়ে ধংছে রসকীর্তন :

সখি, আজি সুদিন কুদিন ভেল
মাধব মন্দিরে আওব তুরিতে
কপাল কহিয়া গেল—

নীতীশ আমবাগানের ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছে—চলেছে অন্যমনস্কের মতো। বিশুর তৈরি চা খেয়ে এলেও মন্দ হত না। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে হল বাড়িতে যা ব্যাপার চলেছে তাতে চা-টা কীরকম দাঁড়াবে, ঘোর সন্দেহ আছে সে বিষয়ে। হয়তো পাথুরে বাটিতে এসে উপস্থিত হবে একটা অপরূপ পানীয়, তার ওপর গোটাকয় তুলসী-পাতা ভাসছে, বৈষ্ণবী মতে শোধন করে দেওয়া হয়েছে সেটা।

নাঃ, ও চলবে না। আজই বিকেলে ইংরেজবাজারে গিয়ে চায়ের সরঞ্জাম কিনে আনবে সে। যতদূর মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বীই হতে হবে তাকে। তুলসীপাতার আধ্যাত্মিক রসকে চা বলে গিলতে তার আপত্তি আছে অন্তত।

এগিয়ে চলল সে। কেমন ক্লান্তি লাগছে—কেমন বিস্বাদ বিতৃষ্ণ লাগছে সমস্ত। বারো বছর আগেকার মানবী মল্লিকা আজ মিশে গেছে ধূপের ধোঁয়ার সঙ্গে, একাকার হয়ে গেছে চন্দনের সুগন্ধে, নিঃশেষে আত্মদান করেছে সোনার গৌরাঙ্গের পাদপদ্মে ; আজ সে দেবদাসী, মানুষের স্পর্শসীমার বাইরে—এমন কি হয়তো দৃষ্টির বাইরেও বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ, এতগুলো দিন জেলে কাটিয়েই একেবারে নির্বিকার আর অহিংস হয়ে যায়নি নীতীশ। মনে মনে সংকল্প নিয়েছে জেল থেকে বেরিয়েই আবার ঝাঁপ দিয়ে পড়বে, ঝাঁপ দিয়ে পড়বে কর্মমুখর ঢেউয়ের দোলায়। তার দৃষ্টি বাস্তব, তার

বোধ স্বচ্ছ আর উজ্জ্বল। তাই বাড়ির আবহাওয়ার এই ভক্তিগদগদ আবিলতাটা তার অসহ্য ঠেকল। সবটাকে কেমন যেন ভণ্ডামি বলে মনে হল, আর সোনার গৌরাঙ্গের মূল্যই বা—

নীতীশের আবার চমক ভাঙল। তার পরিচিত পৃথিবী, তার দেশের মাটি যোধপুর। নিজের রক্তের কণায় কণায় যে নতুন সংকল্পের বীজ সে বয়ে এনেছে, এই মাটিতে সে বীজ তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে—এখানকার পোড়ো জমিতে জাগিয়ে দিতে হবে নতুন অঙ্কুরের সংকেত।

কিন্তু কতটুকু সম্ভব?

মহানন্দার পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে এতক্ষণে। নিজেকেই একবার প্রশ্ন করে বসল, কতটুকু সম্ভব?

সামনে মহানন্দা। বর্ষার জল থিতিয়ে আসছে এর মধ্যেই, জলের তলা থেকে ভূতুড়ে মাথাগুলো আকাশে তুলে ধরতে চাচ্ছে ডুবন্ত ঝোপঝাড়ের দল। এত স্বল্পস্থায়ী এখন মহানন্দার বান, এত অল্পদিনেই এমন করে তার জল নেমে যায়! আর এক মাসের মধ্যেই তা হলে আবার জরাগ্রস্ত হয়ে পড়বে—বালির চড়ার ওপর পঙ্কিল পলিমাটির আস্তরণ রেখে চলে যাবে বন্যার জল, ক্ষণযৌবনের অস্থায়ী উন্মত্ততার গ্লানির স্বাক্ষর মহানন্দার বুকে ছড়িয়ে থাকবে কিছুদিন। তারপর আকাশে জ্বলবে প্রখর সূর্য, পলিমাটির স্তর ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে—আবার বেরিয়ে আসবে বালির কঙ্কাল, তিরতিরে জলের এলোমেলো ধারা বয়ে যাবে চোখের জলের প্রবাহের মতো।

নীতীশের মনে হল এর সঙ্গে কোথায় যেন মিল আছে যোধপুরের। রূপ-সনাতনের নামপবিত্র মহাপ্রভুর চরণধন্য গৌড় রামকেলি। শত শত বৎসর ধরে নিরন্তর অলস ক্ষয়ের ইতিহাস। আকস্মিক বন্যার ঢল এলেও তার আয়ু কতক্ষণ? ওই বালিই সত্য; আর সত্য একফালি জলের কান্না—ভাঙা পাড়ির গায়ে গায়ে গাঙশালিকের অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতময় কল-ক্রন্দন।

—এ কি, নীতু যে! এখানে দাঁড়িয়ে?

মহানন্দার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে নীতীশ। নদীর উঁচু ডাঙাটা থেকে বাঁদিকে কয়েক পা নেমে গেলেই অড়হরের একটা মস্ত ক্ষেত শুরু হয়েছে। সেই অড়হর ক্ষেতের ভেতর দিয়ে দাঁতন ঘষতে ঘষতে এগিয়ে আসছেন সুদাম কাকা। হাতে ঘটি, কাঁধে গামছা।

—এই সকালে এখানে দাঁড়িয়ে যে?

—একটু বেড়াচ্ছিলাম সুদাম কাকা।

ক্ষয়ে-যাওয়া নিমের দাঁতনটা ছুঁড়ে দিয়ে সুদাম কাকা বললেন, নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলে

বুঝি ? তা বেশ—সকালে নদীর হাওয়াটা বড্ড ভালো।

—আচ্ছা সুদাম কাকা, নদীতে আজকাল আগের মতো বান আসে না, না ?

—নাঃ। নদী মরে যাচ্ছে যে। এখন বর্ষার সময়ে যা দশ-বারোদিন নদীর গজরানি এক-আধটু শুনতে পাই, তার পরেই আবার যে-কে সেই।—সুদামের গলার স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ পেল : তার ফলও যা তাই হতে শুরু করেছে। ম্যালেরিয়া কাকে বলে আগে এদেশের লোকে তা জানত না। এখন এই তো দুদিন বাদেই তো শরৎকাল পড়বে, দেখো লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে তখন কেমন কোঁ কোঁ করতে করতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে সব।

—খুব ম্যালেরিয়া লাগবে বুঝি এখন ?

—লাগবে আর কী বলছ, লেগেই তো আছে। বারো মাসই অল্পবিস্তর জ্বরে ভোগে লোকে, তবে এ সময়টা একেবারে পাইকিরী ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আর বুঝলে বাবা, সব ওই নদীর জন্যে। যতদিন জলের জোর ছিল, ততদিন এ জেলায় একটা মশা উড়তে দেখেনি কেউ। নদী যেদিন মরে যাবে, সেদিন এই মালদা জেলাও একেবারে শ্মশান হয়ে যাবে এই তোমাকে বলে রাখলাম।

নীতীশ চুপ করে রইল।

সুদাম বললেন, একটু দাঁড়াও, মুখটা ধুয়ে আসছি।

সুদাম নদীর ঘাটে নামলেন, হাত মুখ ধুয়ে ঘটি মেজে ওপরে উঠে এলেন। নীতীশ তখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিল কে জানে, শুধু কপালে কতগুলো রেখা নড়ে বেড়াচ্ছিল তার।

সুদাম বললেন, একটু আসবে না আমার বাড়িতে ?

—এখন ?

—চলো না। তোমার কাকিমা কাল বলছিল তোমার কথা। এতটুকু ছেলে চলে গিয়েছিলে, এখন কত বড় হয়েছ। একবারটি দেখা করে আসবে ?

নীতীশ অন্যমনস্ক ভাবে বললে, বেশ চলুন।

সুদাম ঘোষ সঙ্গতিপন্ন। কয়েক বছর হল নতুন দালান দিয়েছেন বাড়িতে। আক্ষেপ করে বলছিলেন, দোতলাটা এবার আর পুরো করতে পারলাম না বাবা। ইট-সুরকি পাওয়াই যায় না—যা দাম, একেবারে আগুন ! কথা কইতে কইতে দুজনে দালানে উঠে এসেছেন ততক্ষণে। আর ঠিক তখনই নীতীশ শুনতে পেল ভেতরে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে বেশ মিঠে সুরেলা গলায় কে গান গাইছে

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা

মনে মনে,

মেলে দিলেম গানের সুরের এই ডানা
মনে মনে—

নীতীশ দাঁড়িয়ে গেল : কে গাইছে সুদাম কাকা ?

সগর্বে সুদাম বললেন, আমার ছোট মেয়ে অলকা। তুমি দেখেছ, মনে নেই বোধ হয়। তুমি যখন চলে যাও বছর ছয়েক বয়েস ছিল তখন।

নীতীশ বললে, কিন্তু চমৎকার গাইছে তো। এমন ভালো গান শিখল কোথায় ?

—বাঃ—ও যে ইংরেজবাজারে স্কুলে পড়ে, ম্যাট্রিক দেবে এবার। বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশুনো করে। ওখানেই গানবাজনা শিখেছে।

—তাই নাকি! বেশ, বেশ! কিন্তু যোধপুরের আজকাল এ কি হচ্ছে সুদাম কাকা! এখন এখানকার মেয়েরাও লেখাপড়া শিখছে নাকি!

সুদাম হাসলেন : দিনকাল বদলে যাচ্ছে যে বাবা। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি কিন্তু সময়কে তো সে বলে আটকাতে পারব না। তা যাক—এখন এসো, ভেতরে এসো। পরের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

বাড়ির ভেতরে অলকার গান শোনা যাচ্ছে :

পারুল-বনের চম্পারে মোর হয় জানা
মনে মনে—

সচ্ছল সমৃদ্ধ গৃহস্থালী সুদাম ঘোষের। নতুন দালানের সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে লক্ষ্মীশ্রী। পাড়াগাঁয়ের বাড়ি বলেই শহরের অহেতুক প্রাচুর্যে ভারাক্রান্ত নয়, টেবিল, সোফা আর ড্রেসিং টেবিলের স্তূপে উৎপীড়িত নয়। তবে দেওয়ালে দেওয়াল-ঘড়ি আছে, চওড়া খাটে দুধের মতো ধবধবে বিছানা আছে, হুঁকোদানে তিন'চারটে রূপো-বাঁধানো হুঁকো ঝকঝক করছে। পল্লীর সহজ সংস্কারে লাল সিমেন্টকরা টুকটুকে মেজেতে পদ্মলতার আল্পনা আঁকা—আঁকা লক্ষ্মীর পদলেখা : লক্ষ্মী যে প্রসন্না আছেন সেটা বলাই বাহুল্য।

দালানের নীচেই মস্ত অঙ্গন। তার একপাশে বড় একটা কনকচাঁপার গাছ, ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে, তার উগ্রমধুর গন্ধটা আবিষ্ট করে রেখেছে সমস্ত বাড়িকে। আর একদিকে বাঁধানো তুলসী-মঞ্চ, তারও চারদিকে আলপনার সুকুমার লেখা-বিলাস। হঠাৎ নীতীশের মনে হল একটু আগেই যার গলায় গান বাড়িটাকে সুরের সৌন্দর্যে আকুল করে তুলেছিল, এর মধ্যে কোথায় তারই হস্তস্পর্শ প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

সুদাম কাকা ঘুরে ফিরে বাড়ি দেখাচ্ছিলেন নীতীশকে। চোখে-মুখে আনন্দের দীপ্তি, চরিতার্থতার গর্ব। নতুন বাড়ি—নিজের মনের মতো বাড়ি। তিনি আর কদিন—কয়েক বছরের ভেতরেই তো ওপারের ডাক আসবে। তাই ছেলেমেয়েদের

জন্যে একটা আস্তানা তৈরি করে দিয়ে যাওয়া, অন্তত মাথা গুঁজে যাতে পড়ে থাকতে পারে। তা ছাড়া বিঘে কয়েক ধানী-জমি রইল, গোটা কয়েক আমের বাগানও থাকল, রাধারাণীর অনুগ্রহে হয়তো মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।

অবশ্য এগুলো সুদাম কাকার বিনয়, বৈষ্ণবের স্বভাবসিদ্ধ বিনয়। মাথা গুঁজে পড়ে থাকবার কথা শুধু নয়—হাত পা ছড়িয়ে যথেষ্ট আরাম করবার জায়গাও রয়েছে বাড়িতে। তা ছাড়া চারটে বড় বড় গোলাতে যা আছে, দশ বছর দেশে মন্বন্তর চললেও এ বাড়িতে কখনো ভাতের অভাব ঘটবে না।

যত্ন করে নীতীশকে বসিয়ে সুদাম হাঁক দিলেন: ওগো, নীতু এসেছে।

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুদামের স্ত্রী। কাকিমা টকটকে ফর্সা রঙ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা ভারী হয়ে পড়েছেন। চার দিকের পৃথিবীতে—এমন কি এই যোধপুর গ্রামেও আধুনিক জগতের যে হাওয়া এসেছে, সেটা সুদামের অন্তঃপুরের এই অংশটুকুতে যে প্রবেশ করতে পারেনি কাকিমাকে দেখে সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। ভারী ভারী গহনায় হাত দুটিতে কোনোখানে আর জায়গা নেই, নাকে সোনার নাকছাবি ঝলমল করছে। কপালে আর সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর দেওয়া, পরনে চওড়া লালপাড়ের শাড়ি। লক্ষ্মীমন্তের ঘরের লক্ষ্মীমতী ঘরণী।

নীতীশ কাকিমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

সস্নেহে চিবুক স্পর্শ করে আঙুলের ডগায় চুমু খেলেন কাকিমা। বললেন, সুখী হও বাবা, রাজরাজেশ্বর হও। কাল তুমি এসেছ শুনেই তোমার কাকাকে বলছিলাম একটিবার তোমায় ধরে আনতে। চোদ্দ বছরের ছেলে চলে গিয়েছিলে, এখন কত বড়টি হয়েছ।

নীতীশ হাসল: আচ্ছা কাকিমা, আমাকে ভয় করে না আপনাদের?

কাকিমা গালে হাত দিলেন: শোনো কথা একবার ক্ষ্যাপা ছেলের। কেন, ভয় করবে কেন?

—বাঃ, আমি খুন করেছি, ডাকাতি করে জেলে গিয়েছি—

কাকিমার গলার স্বর স্নিগ্ধ হয়ে উঠল: তুমি যে দেশের কাজ করতে গিয়েছিলে বাবা। অন্যায় তো করোনি, গাঁয়ের মুখ আলো করেছ। তোমাদের যে মাথায় করে রাখা উচিত।

নীতীশ আশ্চর্য হয়ে কাকিমার মুখের দিকে তাকালো। ঠিক এই রকম একটা কথা অন্তত এখানে প্রত্যাশা করেনি সে। বারো বছর আগে যখন সে কাকিমাকে দেখেছিল তখনকার কথা বিশেষ করে কিছু মনে নেই, অন্তত গ্রামের আরো দশজনের সঙ্গে তাঁর কোনো পার্থক্য বিশেষভাবে আলোড়িত করেনি তার মনকে। কিন্তু আজ মনে হল,

জেল থেকে বেরিয়ে এসে এই বারো বছর পরে মনে হল : কাকিমার ভেতরে এমন একটা কিছু আছে যা অন্তত এই যোধপুর গ্রামে সুলভ নয়।

কাকিমা আবার বললেন, সবাই দুঃখ করে, লেখাপড়া শিখলে নীতু একটা মানুষের মতো মানুষ হতে পারত। কিন্তু আমি সে কথা মনে করিনি বাবা। খালি বই পড়ে মানুষ হওয়ার চাইতে বই না পড়েও দেশের কাজ করে মানুষ হওয়া ঢের বড় জিনিস।

এবার না চমকে উপায় নেই। কার মুখে ও এ কি শুনছে! পাড়াগাঁয়ের অন্তঃপুরের সাংসারিকতার হাজার জালে জড়ানো একান্ত কূপমণ্ডুকের মতো সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ মনের ওপর এই নতুন আলো এমন করে ছড়িয়ে দিলে কে? নাকি এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, যুগধর্ম? সূর্যের আলোর মতই অকৃপণ উদারতায় তা সর্বত্র সমানভাবে বিকিরিত হয়ে পড়েছে? না, ভুল বুঝেছিল সে। বাইরে যে ঝোড়ো হাওয়ার মাতামাতি আজ শুরু হয়েছে, সুদাম ঘোষের অন্তঃপুরও তার ঝাপ্‌টা এড়াতে পারেনি।

কিন্তু সুদাম বিব্রত হয়ে উঠলেন।

—ওসব পরে হবে, কথা তো পালিয়ে যাচ্ছে না। আগে একটু চা খাওয়াও নীতুকে।

—চা? শুধু চা কেন?—কাকিমা বললেন, এ বেলা ও খেয়ে যাবে এখান থেকে। আমি ব্যবস্থা করছি সব।

—না না, কাকিমা, ওসব ঝামেলা করে—

—ঝামেলা?—কাকিমা স্নেহভরে বললেন, বাড়ির ছেলে বাড়িতে খাবে এতে আবার ঝামেলা হল কোন্‌খানে? আমাদের সঙ্গেও কি ভদ্রতা করতে হয় বোকা ছেলে!

—না না, ভদ্রতা নয়। বাড়িতে—

—সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি।

সুদাম নিবিষ্ট মনে কল্‌কেতে ফুঁ দিচ্ছিলেন। মাথা তুলে ঘাড় নেড়ে বললেন, তা কাজটা একটু অন্যায়ই হবে বইকি। এতদিন পরে ফিরে এসেছে—

কাকিমা বললেন, তুমি থামো। ফিরে এসেছে তো কী হয়েছে। নিজের বাড়ি তো আর পালাচ্ছে না—বোষ্টমের বাড়ির মাল্‌সাভোগ রইলই তো। আজ ও এখানে খেয়ে যাবে। তুমি বোসো বাবা, পালিয়ো না। আমি রামুকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছি, আর তোমার চায়ের বন্দোবস্তও করে আনছি।

কাকিমা চলে গেলেন।

তাঁর শেষের একটা কথা নীতীশের কানে বাজছিল তখনও। বোষ্টমের বাড়ির মাল্‌সাভোগ। এ অঞ্চলের সবাই বৈষ্ণব—রূপসনাতন শ্রীজীব গোস্বামীর স্মৃতি-পবিত্র, মহাপ্রভুর চরণধন্য এই দেশটাতে বৈষ্ণবতাটা অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক। কিন্তু যতীশ ঘোষের ধর্মপ্রাণতা এ দেশের পক্ষেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, অন্তত কাকিমার কথার

মধ্যে যেন একটুখানি কটাক্ষ লুকিয়ে আছে বলে মনে হল।

হুঁকোয় টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে সুদাম জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কী করবে ঠিক করলে?

নীতীশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সুদাম বললেন, বাড়িতেই থাকবে তো?

—তাই তো ভাবছি।

—বেশ বেশ।—সোজা মানুষ সুদাম খুশি হয়ে উঠলেন: যা হওয়ার সে তো হয়েই গেছে। এখন মন দিয়ে সব দেখাশোনা করো, সংসারটাকে ভালো করে গুছিয়ে-টুছিয়ে নাও। তোমার বাবাকে তো দেখছই, কোনো দিকে নজর নেই, বৃন্দাবনের দিকেই মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন। ওতে করে কি আর বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা হয়? এবারে তুমি হাত লাগাও, বুড়োর কাঁধ থেকে নামিয়ে নাও জোয়ালটা।

নীতীশ সংক্ষেপে বললে, চেষ্টা করব।

উপদেশের ভঙ্গিতে সুদাম বলে চললেন, তা ছাড়া স্বদেশী-টদেশী তো ঢের হল। তুমি এখন বড় হয়েছ, উপযুক্তও হয়েছ। নিজের সংসার রয়েছে তোমার। বাইরের ভাবনা-চিন্তাগুলো ছেড়ে দিয়ে একবার ভালো করে ঘরের দিকে মন দাও দেখি।

নীতীশ হাসল।

—সবাই যদি নিজের ঘর দেখে, তা হলে পরের ঘর কে দেখবে কাকা?

—অ্যাঁ?—কথাটা সুদাম ঠিক বুঝতে পারলেন না।

নীতীশ বললে, জেলে বসে ভেবেছি, যা করতে চেয়েছিলাম—তার পথ বদলে গেছে। কালো অন্ধকারের অবিশ্বাসে-ভরা সুড়ঙ্গ দিয়ে আর চলব না—এবার চলতে হবে সকলের সঙ্গে সোজা রাস্তায়। তাই যদি হয় তা হলে নিজের ঘরটাকে আরো একটু বাড়াতে হবে—সকলের ঘরের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে তাকে।

সুদাম আরো বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। হুঁকোটা হাতে করেই হাঁ করে নীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন—হেঁয়ালিটার মর্মোদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন।

প্রায় দু মিনিট পরে তাঁর বিহ্বল ভাবটা কেটে গেল।

—তা হলে তুমি—

—ভয় নেই সুদাম কাকা, বোমা-পিস্তলের কারবার আর করব না।

—কী করবে তবে?

—সংসারই করব বইকি। তবে আপনারা যে ভাবে মনে করেছেন, সে ভাবে হয়তো নাও হতে পারে। কিন্তু ওসব এখন থাক।—নীতীশ হাসল: কিন্তু একটু আগেই কার যেন গান শুনছিলাম—

—ওঃ, লোকা—অলকা।—সুদাম হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠলেন : তাই তো, মেয়েটা এসে তো তোমায় একটা প্রণামও করে গেল না।—সুদাম হাঁক ছাড়লেন : লোকা, লোকা—

রান্নাঘর থেকে কাকিমা সাড়া দিলেন : লোকা চা নিয়ে যাচ্ছে—

সুদাম অনুযোগের স্বরে বললেন, আমার এই মেয়েটা হয়েছে এক নম্বরের চা-খোরা। আগে বাড়িতে চায়ের বড় বালাই ছিল না, সর্দিকাশি হলে কৈলাসের দোকান থেকে দু পয়সার গুঁড়ো চা কিনে আনা হত—আদা দিয়ে তাই এক-আধটু খেতাম। এখন দেখ না, বাড়িতে একেবারে চায়ের দোকান বসে গেছে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সাতবার চা তৈরি হচ্ছে। তোমার কাকিমা দলে ভিড়েছে। আমারও কেমন বিশ্রী অভ্যেস ধরেছে, সকালে বিকেলে এক পেয়ালা না হলে—

—এসব বুঝি লোকার আমদানি ?

—তাছাড়া কী আর ? হোস্টেল থেকেই চায়ের পাট এনেছে বাড়িতে। লাভের মধ্যে বাজে খরচ বেড়েছে খানিকটা—অপ্রসন্ন মুখে সুদাম ধূমপান করতে লাগলেন। —তাছাড়া ব্যাধিরও সৃষ্টি হয়েছে। সময়মতো না পেলে কেমন মাথা ধরে যায়, গা ঝিমঝিম করে। ইংরেজরা কত বিষই যে এনেছে দেশে—সুদামের কণ্ঠে অসহায় বিদ্রোহের স্বর শুনতে পাওয়া গেল।

এমন সময় দু পেয়ালা চা হাতে এল অলকা।

পাঁচ বছরের ছোট্ট একটুখানি লোকাকে দেখেছিল নীতীশ—এতাদন পরে মনে পড়ল সে কথা। টুকটুকে রঙ, ফুটফুটে মুখ—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—এতটুকু একটু দুরন্ত মেয়ে। সেই লোকা আজ সতেরো বছরের পরিপূর্ণ অলকা হয়ে উঠেছে—এ যেন একটা বিচিত্র আবিষ্কারের মতো মনে হল নীতীশের।

সৌন্দর্যে আর লাবণ্যে রীতিমত একটি নারী হয়ে গড়ে উঠেছে অলকা। একটু আগেই স্নান করেছে, ভিজে চুল পিঠের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে অবহেলাভরে। সামান্য প্রসাধনের চিহ্নও মুখের ওপরে লক্ষ্য করা যায়। কপালে একটি কাঁচপোকার টিপ সুকুমার ললাটটিকে যেন উজ্জ্বল করে তুলেছে। পরনে সাধারণ আটপৌড়ে শাড়ি—কিন্তু তাতেই মেয়েটির রূপ যেন আরো প্রখর, আরো প্রগল্ভ হয়ে উপচে পড়ছে।

অলকা এগিয়ে এল। চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে নীতীশের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। একগুচ্ছ চুল নীতীশের পায়ে এসে পড়ল—বাতাসে ছড়িয়ে গেল চুলের স্নিগ্ধ মৃদু সুরভি। তারপর নতমুখে সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

সুদাম বললেন, কি রে, চিনতে পারিসনি ?

অলকা নিরুত্তরে ঘাড় নাড়ল, জানাল, চিনতে পেরেছে।

নীতীশ বললে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো।

অলকা তেমনি নিরুত্তরে মেজেতে বসে পড়ল, তারপর নত মস্তকে শাড়ির পাড়টা আঙুলে জড়াতে লাগল।

—কোন্ ক্লাসে পড়ছ ?

অলকা এবার মাথা তুলল। দুটি কালো নিবিড় চোখের সঙ্গে চোখ মিলল নীতীশের। তারপর পরিচ্ছন্ন সহজ গলায় বললে, এবারে ম্যাট্রিকুলেশন দেব।

—বেশ, বেশ। কী কী কম্বিনেশন নিয়েছ ?

পরিষ্কার নির্ভুল উচ্চারণে অলকা বললে, ম্যাথ্‌মেটিক্‌স, অ্যাডিসনাল স্যান্‌স্‌ক্রিট।

সুদাম বললেন, লেখাপড়ায় ও ভালোই বাবা। ক্লাসে ফার্স্ট হয় বরাবর।

—তাই নাকি ?—নীতীশ প্রফুল্ল মুখে বললে, তবে তো আরো ভালো। স্কলারশিপ পাবে নিশ্চয় ?

অলকা আবার মাথা নত করলে, কিন্তু জবাব দিলেন সুদাম। সগর্বে বললেন, সবাই তো সেই আশাই করছে। সেদিন হেড্‌ মিস্ট্রেস আমায় বলছিলেন, একটু খাটলেই ও জেনারেল স্কলারশিপও পেতে পারে।

—স্কলারশিপ পেলে আমাদের খাওয়াবে তো ?

জবাবটা সুদামই দিলেন : খাওয়াবে বইকি, নিশ্চয়ই খাওয়াবে। ও কথা কি আর মনে করিয়ে দিতে হয় ! কত খেতে পার, সে দেখা যাবে তখন।

অলকা মৃদু গলায় বললে, চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—ঠিক কথা।—চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে ছোট্ট করে একটা চুমুক দিলে নীতীশ : চা কে তৈরি করেছে ? তুমি ?

অলকা মাথা নাড়ল।

—কিন্তু একটু খুঁত ধরব। বড্ড বেশি মিষ্টি হয়ে গেছে।

চোখ তুলে অলকা হাসল : ঠিক কথা, খেয়াল ছিল না। জেলের কড়া চা খেয়ে যাদের মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে, ঘরের মিষ্টি চা তাদের ভালো লাগবে না।

নীতীশ পূর্ণদৃষ্টিতে অলকার মুখের দিকে তাকালো। নিবিড় কালো চোখ দুটি এখন আর প্রথম পরিচয়ের সংকোচে আচ্ছন্ন নয়—একটি উজ্জ্বল মনের সহজ আলোয় তা জ্বলে উঠেছে। এবারে আর পল্লীর একটি লাজনম্রা কিশোরী বালিকা নয়, পলকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে আত্মচেতন তরুণী।

নীতীশ হেসে উঠল : ঠিক বলেছ। বারো বছর জেল খেটে মিষ্টি জিনিসের স্বাদ আমরা ভুলে গেছি, কড়া নইলে আমাদের নেশা জমে না।

—আর একটু লিকার এনে দেব ?

—না, দরকার নেই। অভ্যাস বদ্‌লানো ভালো।

অলকার কণ্ঠস্বরে কৌতুকের আভাস পাওয়া গেল : এখন কি নিরামিষাশী হবেন ঠিক করেছেন নাকি ? এতদিন যা করে এসেছেন সব ছেড়েছুড়ে দেবেন ?

—পারলেই তো ভালো হত। কিন্তু যে বাঘ একবার রক্তের আস্বাদ পেয়েছে ঘাসপাতায় আর তার পেট ভরবে না বলেই মনে হয়। তবু মিষ্টির লোভটাও ছাড়তে পারছি না।

—কারণ ?

—কারণ তোমার গান। বাড়িতে ঢোকবার মুখে একটুখানি শুনেছিলাম। কিন্তু ওতে লোভটাই বেড়েছে মাত্র। দুটো-একটা গান শোনাতে আপত্তি আছে ?

ব্যতিব্যস্ত হয়ে সুদাম বললেন, আপত্তি ! আপত্তি কেন ? নিশ্চয় শোনাবে। লোকা, নিয়ে আয় তো মা হারমোনিয়ামটা ওঘর থেকে। আচ্ছা, আমিই নয় এনে দিচ্ছি—

—তুমি ব্যস্ত হয়ো না বাবা, হারমোনিয়াম আমিই আনতে পারব।

রান্নাঘর থেকে কাকিমা ডাক দিলেন, লোকা—লোকা—

—কী মা ?

—লুচি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে—

—আমি আপনাদের খাবার নিয়ে আসি আগে—

প্রজাপতির মতো হাল্‌কা হাওয়ায় অলকা রান্নাঘরের দিকে প্রায় উড়ে চলে গেল।

পূজা আর সংকীর্তনের পালা মিটতে বেলা বেড়ে উঠল অনেকখানি। তখন পুবদিকে দাওয়ার নীচে মস্ত ছায়াটা একটুখানি হয়ে গেছে। উঠানে ছাতিম গাছটার ছায়া পড়েছে একেবারে গোল হয়ে। পাতকুয়োটার চারদিকে এলোমেলো ভাবে সাজানো ইটের টুকরো-গুলোর ভেতরে যে কালো কালো ময়লা জল জমছে, তারই ভেতরে পাখা ঝেড়ে ঝেড়ে শুরু হয়েছে চড়াই আর কবুতরের স্নানপর্ব। ঝিম ঝিম করে রোদের একটা নিঃশব্দ ঝঙ্কার বাজছে, ওদিকে দেওয়ালের পাশে সজনে গাছটা থেকে ঝুরঝুর করে ফুল ঝরে যাচ্ছে, ছাতিমের ডালে অক্লান্তকর্মী দুটো কাক শ্রান্তভাবে চোখ বুজে বসে অস্পষ্ট গলায় কঃ—কঃ করে ডেকে উঠছে।

বেলা বেড়ে উঠেছে, খরতাপ হয়ে উঠেছে বরেন্দ্রভূমির মধ্যাহ্ন-রৌদ্র। কীর্তনের উচ্চণ্ড মুখরতায় ছেদ পড়ে যাওয়াতে একটা আশ্চর্য নির্জনতায় ভরে গেছে বাড়িটা। যেন কীর্তনের রেশ বাড়িটাকে একটা ভাবাবিষ্ট মূর্ছনায় বেষ্টন করে আছে এখনো। এটা

এই বাড়ির পক্ষেই স্বাভাবিক। বারো বছর আগে যখন জীবন্ত ছিল মহানন্দা, যখন আজকের দিনের কঙ্কাল-ছবি জলরিক্ত বালির চড়াগুলো প্রচ্ছন্ন থাকত একবাঁশ জলের তলায়, তখন এ বাড়িতেও চঞ্চলতার স্রোত বইত, উঠত সজীবতার কলধ্বনি। কিন্তু সে ধারা রুদ্ধ হয়ে গেছে মহানন্দার, সে জীবন এ বাড়ি থেকেও হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির ফল্গুধারার নীচে।

এখন শুধু বৈরাগ্য, শুধু নিষ্প্রাণ শুদ্ধতা। ধূপ আর চন্দনের গন্ধ যেন বাতাসে বাতাসে কতগুলো যবনিকার মতো সঞ্চারিত হয়ে আছে, বাইরের যা কিছু তরঙ্গ তার বাইরে এসে থমকে থেমে দাঁড়ায়; সজনের ফুল ঝরানো রোদে ঝিম্‌ঝিম্ করে নিঃশব্দ ঝঙ্কার উঠছে, কোন বৈরাগীর হাতে একতারা বেজে চলেছে একটা। পুজো শেষ হয়ে গেছে, ভোগরাগের পাট মিটে গেছে, এখন রাধামাধবের বিশ্রাম; আর সেইজন্যেই মানুষেরও যা কিছু প্রয়োজন সমস্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে—একটা নিরাসক্ত নির্বেদের মধ্যে তলিয়ে থাকা ছাড়া তারও কিছু করবার নেই।

পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এল মল্লিকা—পূবের বারান্দায় একটা খুঁটি ধরে সে দাঁড়ালো। তাকালো আকাশের দিকে—সেখানে গাঢ় নীলের ওপর খণ্ড খণ্ড মেঘের টুকরো ছাড়া আর কিছুই নেই। তার দৃষ্টিও কৌতূহলমুক্ত—তার চোখেও জেগে নেই কোনো প্রশ্ন, উজ্জ্বল হয়ে নেই বিন্দুমাত্র আকাঙ্ক্ষা, ছায়াচ্ছন্ন হয়ে নেই তিলমাত্র অভিযোগ। সব শেষ হয়ে গেছে, সব পাওয়া হয়ে গেছে। বারো বছর আগেকার বর্ষাবিক্ষুব্ধ মাতাল মহানন্দার বুকে একটা বালির ডাঙা জেগে উঠেছে, কয়েক বছর পরে এ ক্ষীণস্রোতও আর বইবে না।

—বৌদি?

আকাশ থেকে দৃষ্টিটা মল্লিকা নামিয়ে আনল মাটিতে: কে, রামু?

সুদাম ঘোষের মাহিন্দার রামু। বললে, মা একটা কথা আপনাকে বলতে পাঠালেন।

—কী কথা?

—নীতুবাবু এ বেলা বাড়িতে খাবেন না। আমাদের ওখানে তাঁর নেমন্তন্ন।

—ওঃ—মুহূর্তের জন্যে মল্লিকার মুখে একটা ছায়া পড়তে না পড়তেই সরে গেল: তা কথাটা তাঁকেই বলে যা রামু। বোধ হয় বাইরের ঘরে বসে গল্প করছেন।

রামু একগাল হাসল: বাইরের ঘরে বসে থাকবে কেন গো, তিনি যে আমাদের বাড়িতেই বসে আছেন।

—তাই নাকি?

—হাঁ গো। আমাদের বাড়িতে বসে দিদিমণির গান শুনছেন তিনি।

—আচ্ছা, ভালো কথা।

রাম্ চলে গেল।

বারান্দার খুঁটিটা তেমনি ধরে আবার আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলল মল্লিকা। একটা বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল না মন, ক্ষোভে প্লাবিত হয়ে গেল না। শুধু একটুখানি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। এতদিন পরে বাড়িতে ফিরেছে লোকটা, তবু স্বভাব বদলায়নি। সেই টো টো করে বেড়ানো এখনো তেমনি রয়েছে, সেইরকম খামখেয়ালী। এবেলা যে খাবে না আগে সেটা বলে পাঠালেই হত। অনর্থক এতটা বেলায়—

ঘর থেকে যতীশ ডাকলেন, বৌমা—

যাই বাবা—সাড়া দিল মল্লিকা।

এতক্ষণে যতীশ মালা জপ শেষ করেছেন, এতক্ষণে সচেতন হয়ে উঠেছেন বিষয়-বাসনা আর ভোগ-লালসায় পঙ্কিল এই পৃথিবীটার সম্পর্কে। মল্লিকা ঘরে ঢুকতেই প্রশ্ন করলেন, নীতু কোথায় ?

—সুদাম কাকার বাড়িতে।

—এত বেলা অবধি কী করছে ওখানে ? বিশুকে পাঠিয়ে দাও, ডেকে আসুক।

—দরকার নেই বাবা।

—দরকার নেই মানে ?—যতীশ অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন : বেলা যে একটা বাজে সে খেয়াল আছে ? ঠাকুরের ভোগ কখন হয়ে গেছে, সবাই কতক্ষণ বসে থাকবে আর ? শিবুকে পাঠিয়ে দাও এক্ষুণি।

মৃদুকণ্ঠে মল্লিকা বললে, তাঁর এবেলা ও-বাড়িতে নেমন্তন্ন।

—নেমন্তন্ন !—যতীশের গলায় স্পষ্ট বিরক্তির সুর ফুটে বেরুল : সুদামের কি আর নেমন্তন্ন করবার তর সইল না নাকি ? এতদিন পরে ফিরেছে—দুটো দিন না বাড়িতেই খাওয়াদাওয়া করত।

মল্লিকা চুপ করে রইল।

যতীশ বলে চললেন, তা ছাড়া পুকুর থেকে মাছ ধরা হয়েছে, যদি খাবেই না, তাহলে এমন করে জীবহত্যা করবার কী দরকার ছিল ? হরেকৃষ্ণ !—যতীশ আবার হাতের মালায় মনঃসংযোগ করলেন। জপ করবার জন্য নয়, মনের ভেতর থেকে উদ্‌গত হয়ে ওঠা বিরক্তিটাকেই দমন করবার জন্যে।

—তবে আর কী করবে। আমাকে খাবারটা দিয়ে তুমিও খেয়ে নাও গে। হরি হে ! যাও যাও, আর দেরি কোরো না।

জায়গা পরিষ্কার করে, আসন পেতে দিয়ে, যতীশের জন্য খাবার নিয়ে এল মল্লিকা : বসুন বাবা।

যতীশ বসলেন, মল্লিকা পাখা নিয়ে বসল তাঁর সামনে।

—আঃ, তুমি আবার পাখা হাতে করে বসলে কেন? বেলা হয়ে গেছে, খেয়ে নাও গে।

—সে হবে এখন। আপনার খাওয়াটা আগে হয়ে যাক—

—তোমাকে নিয়ে পারা গেল না বৌমা—যতীশ আচমন করলেন।

মল্লিকা বাতাস করতে লাগল। এটা বেশ বোঝা যায় খাওয়ার সময় সে পাখা হাতে নিয়ে না বসলে যতীশ তৃপ্তি পান না। কেমন খিটখিট করেন, সামান্য কারণে খাওয়া নষ্ট হয়ে যায় তাঁর। দশ বছর ধরে এই নিয়মেই ওঁরা অভ্যস্ত, আর দশ বছর ধরে এই একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি চলে আসছে। তাই যতীশ যখন অনুযোগ করে বলেন, এমন করে বসে বসে বুড়ো ছেলেকে খাওয়াতে হবে না তখন সে অনুযোগের মধ্যে শুধু কথাই থাকে, ব্যঞ্জনা থাকে না। মল্লিকা জানে, যতীশের খাওয়া শেষ হওয়ার আগে যে মুহূর্তে সে উঠে যাবে, তৎক্ষণাৎ তাঁর দুধের মধ্যে মাছি পড়বে। এ অনিবার্য, এর ব্যতিক্রম নেই।

খেতে খেতে যতীশ বললেন, আচ্ছা বৌমা?

—কী বলছিলেন?

—একটা কথা ভাবছিলাম।

—কী কথা?

—আচ্ছা থাক—যতীশ আবার থালার ভেতরে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু খেতে পারলেন না, অন্যমনস্কভাবে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন ভাতগুলোকে। মল্লিকার চোখে পড়ল যতীশের মুখে মেঘের সঞ্চার হয়েছে, একটা অস্পষ্ট অস্বস্তিকর চিন্তার ছায়াপাত হয়েছে গালে-কপালে কতগুলো রেখার আকুঞ্চনে।

কিন্তু যতীশ চুপ করে থাকতে পারলেন না। একটু পরেই আবার বললেন, আচ্ছা বৌমা—

—বলুন?

—সংসারটা বড় খারাপ জায়গা, নয়?

এ সম্বন্ধে দুজনের ভেতরে কারো কোনো মতভেদ নেই। তবু কী কারণে কথাটাকে আবার নতুন করে উত্থাপন করতে হল সেটা বুঝতে না পেরে নীরব অপেক্ষা করে রইল মল্লিকা।

যতীশ বললেন, বড় দুঃখেই মহাকবি লিখেছিলেন:

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুতমিত রমণী সমাজে,
তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু
অব মঝু হব কোন্ কাজে—

কথাটা একেবারে বর্ণে বর্ণে খাঁটি। ঠিক নয়!

মাথা নেড়ে সায় দেয় মল্লিকা। এও পুরোনো কথা, এও ভূমিকা। রসকীর্তনের যে কোনো পালা গাইবার আগে যেমন মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করে গৌরচন্দ্রিকা গেয়ে নিতে হয়, তেমনি যে কোনো প্রসঙ্গ, যা যতীশের মনের কাছে প্রীতিকর নয়, যা তিনি পছন্দ করেন না, তাদের সব কিছু সম্পর্কে বীতরাগ প্রকাশ করতে গিয়েই তিনি বিশ্বসংসারের খলতা ও মহাজনের রচনা স্মরণ করে নেন। মামলায় হারা থেকে শুরু করে কেউ যদি খোঁয়াড়ে গোরু দেয়, সেক্ষেত্রে পর্যন্ত তিনি একই সুরে এই গৌরচন্দ্রিকা আবৃত্তি করেন।

—তাই ভাবছি। তাতল সৈকতে যা দিলুম তা সবই চোখের পলকে শুষে নিলে। এখন ভাবছি, দিন ফুরিয়ে এল, বোঝা বয়েই কাটালুম অব মঝু হব কোন্ কাজে—

মল্লিকা নিরুত্তরে বাতাস করে যেতে লাগল।

—তোমার ভাগ্যেই হল না মা। তোমার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।

এতক্ষণে নতুন শোনাচ্ছে সুরটা। মল্লিকা কৌতূহলভরে মুখ তুলল : কী হয়েছে বাবা? কী হল না আমার ভাগ্যে?

—ব্রজমণ্ডলী দর্শন।

মল্লিকা আকুল কণ্ঠে বললে, কেন বাবা? যাওয়া কি বন্ধ হয়ে গেল?

দুধের বাটিটা থালার ওপরে টেনে নিয়ে যতীশ বললেন, না না, আমার কথা বলছি না। আমার যাওয়া কি আর বন্ধ থাকবে? প্রভু যখন ডাক দিয়েছেন, তখন সে ডাক উপেক্ষা করব এমন শক্তি আমার কোথায়? শ্রীধাম আমাকে যেতে হবেই মা—তাতল সৈকতের মায়ায় আর তো পড়ে থাকতে পারব না।

—বেশ তো, আমিও সঙ্গে যাব।

—নাঃ, তা হয় না—বিষণ্ণ ভাবে হাসলেন যতীশ।

—কেন বাবা, কী অপরাধ করলাম আমি?—কাতরতার সুর ফুটে উঠল মল্লিকার কণ্ঠে। হাতের যান্ত্রিক নিয়মে যে পাখাটা চলছিল হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সেটা।

যতীশ এবার আর হাসলেন না। মুখে আরো নিবিড় হয়ে বিষণ্ণতার ছায়াটা ছড়িয়ে পড়ল তাঁর।

—না মা, সে আর হবার উপায় নেই।

—কেন বাবা? কী দোষে প্রভু আমাকে পায়ে ঠেললেন?

এক চুমুকে দুধের বাটিটা শেষ করে যতীশ সেটাকে থালার উপরে নামিয়ে রাখলেন : ওই যে বললাম না, তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম? মহাজনের কথা কি আর মিথ্যে হবার জো আছে! আমার বন্ধন তো কাটিয়েছি, কিন্তু রাধামাধব তোমাকে যে আবার নতুন জালে জড়িয়ে দিলেন। হরে কৃষ্ণ। কী আর করবে বলো!

যতীশ উঠে পড়লেন ইঙ্গিতটা অস্পষ্ট রেখেই। হাতের পাখাটা নামিয়ে রেখে মল্লিকাও উঠে দাঁড়ালো, যতীশকে মুখ ধোয়ার জল এগিয়ে দিতে হবে।

বেলা পড়ন্ত হয়ে এল। পূর্বদিকের দাওয়া থেকে ছায়াটা সরে এল পশ্চিমদিকের দাওয়ায়—ছাতিমের নিচেকার বৃত্তাকার ছায়াটা ক্রমশ একদিকে হেলে পড়তে লাগল। ছাতিমের ডাল থেকে কাক দুটো নেমে এল খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায়, চড়াই পাখিরা শেষবারের মতো বেরিয়ে পড়ল খড়কুটো সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। বিকেলের একঝলক হাওয়া লেগে ঝুরঝুর করে সজনে ফুল সমস্ত উঠোনময় ছড়িয়ে যেতে লাগল।

নিজের ঘরে চৈতন্যচরিতামৃত খুলে বসেছিলেন যতীশ। সকাল থেকে ক্রমাগত মনে হচ্ছে কোথায় কিসের অবাঞ্ছিত দোলা লেগেছে একটা, কোত্থেকে অহেতুক অতৃপ্তির তরঙ্গ এসে নিজেকে কেমন বিস্বাদ করে দিয়েছে। এ কিসের লক্ষণ? এতদিনের সঞ্চিত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রশান্তি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে যেন। এমন হওয়া উচিত নয়, এমন হওয়াটা উচিত ছিল না। যতীশ জোর করে মনের জড়তাটা দূর করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, তারপর আবেশবিহ্বল কণ্ঠে পড়তে শুরু করলেন :

"সর্ব ত্যজি জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস।
ব্রজ বৃন্দাবনধাম যাঁহা লীলা রাস॥
শ্রবণ-মধ্যে জীবের শ্রেষ্ঠ কোন্ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন"—

কিন্তু—

যতীশের মন আবার বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ব্রজভূমি বৃন্দাবনের আহ্বান মনের কাছে যেন কেমন ফিকে হয়ে আসছে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার কর্ণরসায়নমধুরতা কেমন তিক্ত আর কটু হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে, কিসের প্রভাব এসব? তাতল সৈকতে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে আবার আকর্ষণ জেগেছে নাকি বারিবিন্দুর অন্তরে?

—বাবা—

—কে, বৌমা? এসো মা।

মল্লিকা প্রবেশ করল, তারপর দরজার চৌকাঠ ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কী হল? কিছু বলবে?

মল্লিকার গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল, মনে হল তার চোখের কোণায় অশ্রুবাষ্প সঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

—বাবা, আমার উপর প্রভুর এ অকৃপা কেন?

যতীশ বই নামিয়ে রাখলেন, খুলে রাখলেন চশমাজোড়া। তারপর গম্ভীর সহানুভূতি ও নিবিড় বেদনাভরে তাকালেন মল্লিকার মুখের দিকে।

—বন্ধন তো সকলের একসঙ্গে ছেঁড়ে না মা। আমি মুক্তি পেয়েছি, আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তোমার তো তা নয়। তোমার স্বামী রয়েছে, সংসার রয়েছে। এ দায়িত্ব তো তোমাকে পালন করতে হবে। এ কর্তব্য তো তুমি উপেক্ষা করতে পারবে না।

—কিন্তু এর চাইতেও বড় কর্তব্য মানুষের কি নেই বাবা? বিষয়-বাসনার জটিলতার বাইরে প্রভুর চরণাশ্রয় পাবার আমার কি অধিকার নেই? মীরাবাঈ যদি ব্রজেশ্বরের বাঁশি শুনে ঐশ্বর্যসুখ বিসর্জন দিয়ে বৈরাগীর গেরুয়া তুলে নিতে পারেন, তবে আমি কেন পারব না?

ঠিক কথা—যুক্তির দিক থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার এতটুকুও নেই যতীশের। বরং তাঁর অবচেতন মন যেন এই কথাগুলো শোনার জন্যেই প্রতীক্ষা করেছিল—ঠিক এই কথাগুলো না শুনলেই তিনি কেমন একটা নৈরাশ্যবোধ করতেন। কিন্তু বাপ হয়ে কেমন করে তিনি বলবেন, আমার ছেলের চাইতে মহাপ্রভুর আহ্বান অনেক বড়, অনেক বেশি সত্য? সেই আহ্বানেই তুমি বেরিয়ে এসো, ছিন্ন করে এসো সংসারের এই জটিল জালবন্ধন?

—আশা তো করেছিলাম, তোমাকে নিয়েই ব্রজমণ্ডল দর্শন করে আসব, সম্ভব হলে ওখানেই কুঁড়ে বাঁধব দুজনে। কিন্তু এখন দেখছি তা হওয়ার জো নেই। যা ভেবেছিলাম, তা—

যতীশ আবার থমকে থেমে গেলেন। কী বলতে যাচ্ছেন তিনি, কিসের ইঙ্গিত দিতে যাচ্ছেন! একটা অতি ভয়ঙ্কর, অতি অবিশ্বাস্য কল্পনা তাঁর মনের মধ্যে স্থান পেয়েছিল নাকি, মাথা তুলেছিল নাকি একটা অমানুষিক প্রত্যাশা! নিজের গভীরে তিনি কি কামনা করেছিলেন নীতীশ আর ফিরে আসবে না, মগ্নচৈতন্যের মধ্যে তিনি কি পুত্রের মৃত্যু সংবাদের জন্যে প্রতীক্ষা করে ছিলেন!

হঠাৎ যতীশের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল।

—ওসব আলোচনা এখন থাক মা, এ কথাগুলো ভাববার সময় তো যায়নি এখনো।

—না বাবা, বড় বিশ্রী লাগছে আমার। একটুও শান্তি পাচ্ছি না।

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন যতীশ, আবার চৈতন্যচরিতামৃত খুলে নিয়ে মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, পাবে, শান্তি পাবে বইকি। প্রভুর নাম কীর্তন করো, তা হলেই—

—ব্রজমণ্ডল দর্শন করতে না পারলে নামকীর্তনে আমার সুখ নেই বাবা।

ঘরের মধ্যে আবার স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। একটা বিতৃষ্ণাভরা, বিরক্তিভরা স্তব্ধতা। দুজনের মনের মধ্যেই একটা কাঁটা খচখচ করে বিঁধছে, একটা বিশেষ বেদনা জ্বলছে

দুজনকেই পীড়িত করে। স্পষ্ট করে দুজনেই সেটা বুঝতে পারছে, কিন্তু কেউ কাউকে বলতে পারছে না, বলবার উপায় নেই। ওই অবচেতন আকাঙ্ক্ষাটা কি মল্লিকার মনের গভীরেও নিহিত হয়ে ছিল নাকি?

শিবু ঘরে ঢুকতেই অস্বস্তির আবহাওয়াটা কিছু পরিমাণে লাঘব হয়ে গেল। যেন একটা নূতন কোনো বিষয়বস্তুতে মনোযোগ দিতে পারায় দুজনে সহজ হয়ে ওঠার সুযোগ পেল খানিকটা।

—বাবু, লোক এসেছে।—শিবুর কণ্ঠে আতঙ্কিত উত্তেজনার সুর।

—কে লোক?

—থানার দারোগা সাহেব।

দারোগা সাহেব! বৈরাগ্য, আধ্যাত্মিকতা, বিষয়বিতৃষ্ণা—সব কিছু এক মুহূর্তে তিরোহিত হয়ে গেল, একটা কালো আশঙ্কা মনকে আচ্ছন্ন করে দিলে। পুলিসের অবাঞ্ছিত অনিমন্ত্রিত আবির্ভাবটা কারো কাছেই কোনো অবস্থাতেই কাম্য নয়, ধর্মপ্রাণ, বৃন্দাবনমুখী যতীশ ঘোষের কাছেও নয়।

—দারোগা আবার এল কেন রে?

—বলতে পারি না। বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

পাংশু মুখে যতীশ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, হরে কৃষ্ণ। চল্ দেখি।

ততোধিক পাংশু মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল মল্লিকা।

কিন্তু দারোগা মফিজর রহমান খুব সহজ ভাবেই অভ্যর্থনা করলেন যতীশকে। বললেন, আদাব, আদাব ঘোষ মশাই, ভালো আছেন তো? অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি—

যতীশ সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, হরে কৃষ্ণ। হাঁ, ভালোই আছি। তা দারোগা সাহেব কী মনে করে?

—এই কিছু না, খুব সামান্যই ব্যাপার—দারোগা হাসলেন: আপনার ছেলের একটু খোঁজখবর নিতে এলাম।

—আমার ছেলে!—মুহূর্তে যতীশ কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলেন: আমার ছেলে! তাকে নিয়ে আবার কী হল?

—না না, কিছুই হয়নি—সস্নেহে আশ্বাস দিলেন দারোগা: বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা—জানেন তো? একবার যখন চ্যাঁড়া পড়েছে, তখন খোঁজখবরটা মাঝে মাঝে নিতেই হবে—এই হচ্ছে আইন। কোথায় থাকেন উনি, কী করেন—কখনো-সখনো তারই দুটো-চারটে রিপোর্ট ওপরে পাঠাতে হবে, এই আর কি।

শঙ্কিত হয়ে যতীশ বললেন, কোনো রকম গণ্ডগোল—

—কিছু না, কিছু না,—হাত নেড়ে একটা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক ভঙ্গি করলেন মফিজর রহমান। বললেন, ওই আইন বাঁচানো, আর কি! বোঝেন তো, পুলিসের চাকরি, এমন পাজী কাজ ভূ-ভারতে আর নেই। লোকের ভালো করবার জন্যে আমাদের আহার নিদ্রা নেই। আজ এখানে ছুটছি, কাল ওখানে যাচ্ছি, প্রাণ হাতে করে ডাকাতের আস্তানা রেইড্ করছি, অথচ—দারোগার কণ্ঠে আক্ষেপ এবং বেদনা মূর্ত হয়ে উঠল : একটা ইনামও নেই, বুঝলেন! লোকে শালা ছাড়া কথা কয় না, আর ভাবে ঘুষ খেয়ে ভালো মানুষকে হায়রাণ করা ছাড়া আর বুঝি কোনো মতলবই নেই আমাদের। লাভের মধ্যে ওপরওলার তাড়ায় প্রাণ একেবারে ওষ্ঠাগত।

যতীশ চুপ করে রইলেন। এ স্বগতোক্তি, এর উত্তর দেবার মতো কিছু নেই।

—যাক, কর্তব্য করে যাই, পরলোক তো আছে—মফিজর রহমান একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন : খোদাই বিচার করবেন।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দারোগা বোধ হয় উথ্‌লে ওঠা আবেগটাকে সংবরণ করে নিলেন। তারপরে তাঁর কাজের কথা মনে পড়ল : আপনার ছেলে কোথায়?

—বেরিয়েছে।

—আঃ!—দারোগা কপালটাকে কুঞ্চিত করলেন একবার। বললেন, বাড়ি এলেই থানায় গিয়ে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন। না না, ভয়ের কোনো কারণ নেই—ওই যা বললাম, আইন বাঁচানো আর কি। আচ্ছা আজ চলি, আদাব—

সাইকেলটা টেনে নিয়ে দারোগা অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে রইলেন যতীশ ঘোষ। সুর কেটে গেছে—ধূপধুনো আর চন্দনের গন্ধে, রাধামাধবের শ্রীঅঙ্গসৌরভে এই বাড়ির চারদিকে যে একটা অলৌকিক যবানিকা রচিত হয়েছিল, আজ ছিদ্র হয়েছে তাতে, আসছে বাইরের ধুলো-ঝাপটা। এ কি আগামী ঝড়ের পূর্বাভাস, এতদিনের অভ্যস্ত নিরুত্তেজ ধ্যানশান্ত জীবনে প্রত্যাসন্ন কোনো বিপ্লবের পূর্ব সংকেত? আশঙ্কা আর বিরক্তি তিল তিল করে মনটাকে আক্রমণ করছে, রক্তের মধ্যে কোথাও ক্ষীণ বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে একটা।

৫

যা যা হওয়া দরকার, তাদের কোনোটাতেই ত্রুটি ঘটল না। খাওয়া হল, গল্প হল, অলকার গানও শোনা হল। একটু পরে সুদাম কাকা উঠে পড়লেন। তাঁর বেশিক্ষণ বসবার উপায় নেই, জোতে বেরুতে হবে।

বাকি রইল নীতীশ, কাকিমা আর অলকা। কিন্তু কাকিমাও যে দুদণ্ড স্থির হয়ে

বসবেন তার জো নেই। তাঁরও সংসারের হাজার কাজকর্ম রয়েছে, এটা ওটা অসংখ্য খুঁটিনাটি রয়েছে। সুতরাং তিন মণ কলাইয়ের ব্যাপারে তিনি রামুকে নিয়ে পড়লেন। উঠোনে তাঁর উচ্চকণ্ঠ শোনা যেতে লাগল : তিন মণ কলাই ভাঙিয়ে আনতে দশ দিন গেল ? তোদের উপর ভরসা করে বসে থাকলেই তো হয়েছে।

পাশের খোলা জানালাটা দিয়ে অলকা তাকিয়ে ছিল দূরে মহানন্দার দিকে। নদীটা ঠিক এখান থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, শুধু চোখে পড়ছে বাতাসে ফুলে ওঠা মস্ত একটা রাঙা পাল—যেন শূন্যের ওপর দিয়ে ভেসে চলেছে সেটা। আকাশে ঝাঁক বেঁধে উড়ছে হট্টিটি—সন্ধানী মাছরাঙার নীল পাখনায় ঝলকাচ্ছে সোনালী রোদ্দুর। বেলা পড়ন্ত।

তারপর আস্তে আস্তে অলকা নীতীশের দিকে মুখ ফেরালো। একটা ঘোর-লাগা দৃষ্টি মেলে জিজ্ঞাসা করল, বারো বছর পরে গ্রাম কেমন লাগছে নীতুদা ?

—একটু নতুন লাগছে। আরো নতুন লাগছে তোমাকে দেখে।

—আমাকে ? কেন ?—অলকার নিমগ্ন চোখ কৌতূহলে সজাগ হয়ে ওঠে।

—সুদাম কাকা তাঁর মেয়েকে শহরের ইস্কুলে পড়াতে পাঠাবেন যোধপুর সম্পর্কে এতটা আশা আমার ছিল না।

অলকা মৃদু হাসল, জবাব দিলে না।

নীতীশ বলে চলল, তবে এর চাইতে আরো কিছু বেশি হলে আমি খুশি হতাম।

—কী সেটা ?—অলকার গলার স্বরে তেমনি সকৌতুক কৌতূহল।

—পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। যোধপুরের মেয়েরা শুধু ইস্কুলে পড়েই পৃথিবীর কাছে দায়িত্বটা শেষ করে দেবে ?

—আর কী করতে বলেন ?—অলকার দৃষ্টিতে কৌতুকটা তেমনিই ঝলমল করতে লাগল।

—সেটাও কি বলে দিতে হবে ?

—ইস্কুলে পড়া ছাড়া মেয়েদের আরো অনেক কাজই তো করবার আছে। কিন্তু আপনি কী যে চান সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

নীতীশ অলকার দিকে একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে নিলে : ইস্কুলের বাইরে একটা মস্ত বড় দেশ আছে।

অলকা বললে, জানি। তার নাম ভারতবর্ষ।—ঠোঁটের কোণায় অল্প হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে সে বলে গেল : তার উত্তরে হিমালয় পর্বত দক্ষিণে ভারত মহাসাগর।

—কিন্তু ভূগোল ছাড়াও সে দেশটার অন্য পরিচয় রয়েছে। সেই পরিচয়টা জানাই আজকের সব চেয়ে বড় কাজ।

অলকা বললে, বারো বছর জেলে থেকে আপনিই সে দেশটাকে বোধ হয় ভুলে গেছেন নীতুদা। নইলে মেয়েদের সম্পর্কে অবিচার করতে পারতেন না।

নীতীশ চকিত হয়ে উঠল।

—তাই কি?

—তাই নয় কি? সূর্যের আলো যখন পড়ে তখন সকলের চোখেই পড়ে। মেয়েরা এমন কি অপরাধ করেছে যে ওদের চিরকালের জন্যে অন্ধকারের বাসিন্দা বলে ধরে নেবেন? পৃথিবী যদি বদলে থাকে তাহলে মেয়েদের ক্ষেত্রেও তা বদলেছে। অন্তত সেটাই আশা করবেন।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে নীতীশ চুপ করে গেল। তা হলে সত্যিই ভুল হল নাকি তার, সত্যিসত্যিই অবিচার করেছে সে? সব মেয়ের ব্যাপারে না হোক, অন্তত অলকার সম্পর্কে? এই সুকণ্ঠী সুন্দরী মেয়েটিকে মনের দিক থেকে যতটা কৃপার পাত্র বলে সে ভেবেছিল, ঠিক ততটা নাবালিকা নয় সে। ঘুমন্ত নিরিবিলি গ্রাম এই যোধপুরে শুধু বাইরে থেকে এলোমেলো আলোর ঝলক এসেই ছড়িয়ে পড়েনি, তার কাছেও এসে পড়েছে অনেক সমুদ্রের কল্লোল—অনেক আকাশের দূরান্তিক আহ্বান। অতীতে একটা যুগ ছিল—সে যুগ রূপকথার, সে যুগ প্রেমের; সে যুগ বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের কালো চোখে ঘনিয়ে আনত ইংরেজী কবিতার স্বপ্ন, সে যুগে মেয়েদের তনুশ্রী দুলিয়ে দিত সুইনবার্ণের কবিতার ছন্দ, অলিভপত্র মর্মরিত ছায়াবীথির তলা দিয়ে সে যুগের মন তীর্থ-যাত্রা করত প্যাগান ভাস্কর্যের গম্ভীর উদার মহিমায় বিমণ্ডিত ভেনাসের দেবায়তনে। সে যুগের রাসায়নিক পরশ-পাথর তৈরি করতে চেয়েছিলেন—তাঁদের বৈজ্ঞানিক ভাবনা জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল প্রেমের ভেতরে, তাঁরা বলেছিলেন এই প্রেম লোহায় গড়া মনকে সোনা করে দেয়। আজ তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। আজ বিদ্যা মেয়েদের চোখে শুধু স্বপ্ন আনেনি, এনেছে দীপ্তি; আজকের মন ভেনাসের মন্দিরে অর্ঘ্য সাজিয়ে অগ্রসর হয়নি; মৌসুমী ফুলের কেয়ারী সাজানো নিভৃত নিরুদ্বিগ্ন অ্যাশ্‌ফল্টের পথ ছাড়িয়ে সে নেমে আসছে সংবাদ মুখরিত পীচগলা রৌদ্রদগ্ধ রাজপথে, আজকের পরশ-পাথর লোহাকে সোনা নয়, সোনাকে লোহা করে দিচ্ছে; ঝকঝকে ইস্পাত—চেরী ফুলের বহু পুষ্পিত ডাল নয়, একখানা উজ্জ্বল তলোয়ার। অলকার মধ্যেও কি আছে সে তলোয়ারের ইঙ্গিত?

এক মিনিট—দু মিনিট। নীতীশের আত্মমগ্ন মনের ভেতর পরপর অনেকগুলো ঢেউ ভেঙে পড়ল যেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই অলকার হাসির শব্দ তাকে চকিত করে দিল। যেন হঠাৎ একটা বন্ধ জানালা খুলে গিয়ে তার ঘুমন্ত মুখে ঠাণ্ডা বৃষ্টির একটা ছাট এসে পড়েছে।

—হঠাৎ কী ভাবছিলেন এত ? একেবারে যেন ডুবে গিয়েছিলেন ?

—সে অনেক কথা। আর একদিন বলা যাবে।

—আজ নয় ?

—নাঃ, থাক।—ঘুম ভাঙলেও নীতীশের ঘোর কাটেনি : ভেবেছিলাম এসব কথা বলবার লোক এখানে কাউকেই পাওয়া যাবে না। কিন্তু এইবার মনে হচ্ছে তোমার কথাই ঠিক—বারো বছর জেলে থেকে দেশকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।

—আপনার কথাগুলো বড্ড ধেঁায়াটে ঠেকছে। ব্যাখ্যা দরকার।

—আর একদিন হবে—আজ নয়।—নীতীশ হঠাৎ যেন কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠল : বেলা ডুবে যাচ্ছে, এবারে বাড়ি যাওয়া দরকার। সারাটা দিন তো তোমাদের বাড়িতে আড্ডা দিয়েই কাটিয়ে দিলাম।

অলকার গলায় বিষণ্ণ বিস্ময়ের সুর পাওয়া গেল : সত্যিই বেলা ডুবে গেল নাকি ? এর ভেতরেই ?

—বেলা অবেলায় ডোবেনি, ডুবেছে তার স্বাভাবিক নিয়মেই। কিন্তু এবার সত্যিই ওঠা যাক—আর দেরি করলে তোমাদের এখানে রাতটাও কাটিয়ে যেতে হবে।

—বেশ তো, ক্ষতিটা কী !—লঘুভাবে অলকা বলে গেল : জলে তো পড়েননি।

—জলে পড়লেও সাঁতার কাটতে জানি, ডুবব না। সুতরাং সে ভয় নেই—এলোমেলো ভাবে জবাব দিলে নীতীশ : কিন্তু সে কথা নয়। এবার বাড়িতে যেতেই হবে।

—সারাটা দিন বাজে কথাতেই নষ্ট হয়ে গেল আপনার।

—মাঝে মাঝে হয়তো এরকম বাজে কথাতেই দিনটা কাটিয়ে যেতে হবে—অকারণেই নীতীশের স্বরটা আবেগে রেশ খেয়ে উঠল। নিজের অজ্ঞাতে অর্ধচেতন মনের ভেতর নদীর ওপর থেকে আসা ক্রমক্ষীণ একটা ঢেউয়ের মতো কী যেন দুলে দুলে চলে গেল তার।

—যদি সময় করে কখনো কখনো আসতে পারেন, তা হলে বড্ড ভালো হয়।—অলকাও টের পেল না তার গলায় নীতীশের স্বরের প্রতিধ্বনি এসে ছোঁয়াচ দিয়েছে।

সুদাম কাকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নীতীশ যখন নিজেদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল, মহানন্দার কোলে কোলে তখন কালো কালো ছায়া নেমেছে। পায়ের নিচেকার পথটার এখন আর কোনো সুস্পষ্ট আকার নেই—কেমন আবছায়া ইঙ্গিতের রূপ নিয়েছে সেটা। অন্ধকারে ঘন বনের ভেতরে উঠছে তীব্র ঝিঁঝিঁর ডাক। সুদাম কাকার আমবাগানটায় যেখানে অকাল-রাত্রি নিবিড়তর হয়ে উঠছে, সেখানে ঝিল্‌মিল্‌ করছে কয়েক সহস্র জোনাকি। একটা শৃঙ্খলাহীন বিপর্যস্ত মনের অগণ্য ভাবনার স্ফুলিঙ্গ যেন।

নীতীশ ভাবছিল। কী ভাবছিল সে ঠিক জানে না—মনের ভেতরটা হঠাৎ যেন

ফাঁকা হয়ে গেছে, আর সেই ফাঁকা জায়গাটাকে দখল করে নেবার জন্যে একটার পর একটা অসংলগ্ন চিন্তা আছড়ে পড়ছে এসে কিন্তু চেতনার এই আকস্মিক শূন্যতাটা কোনো বেদনার্ত নিরাশার প্রতিক্রিয়া নয়, যেন পুরোনো ঘরের আসবাবপত্র বদলে ফেলে তাকে নতুন করে সাজাবার আয়োজন চলছে। কালো সমুদ্রের লবণাক্ত সাশ্রু উচ্ছ্বাসে মুখর, পাষাণ ঘেরা আন্দামানে বারো বছর ধরে যে জীবনটা গড়ে উঠেছিল, আজ নতুন পরিবেশের মধ্যে নতুন করে মানিয়ে নিতে হবে তাকে। দ্বীপদুর্গে বসে বন্দীর যে মন মুক্ত একটা নিঃসীম পৃথিবীর স্বপ্ন দেখত, সে মন আজ সত্যিই অবারিত আকাশের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন শুধু ভাবলেই চলবে না, কাজ করতে হবে।

কিন্তু সে কাজের ভেতরে কোথা থেকে যেন একটুখানি অকাজের সুর এসে লেগেছে ; কালো হয়ে আসা থম্‌কানো আকাশের নীচে যেন আচমকা একটা বাঁশির সুর : "পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা, মনে মনে—"

মহানন্দার পাড় দিয়ে নীতীশ হেঁটে চলছে। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে অনেকটা দূরে বাঁকের মুখে গোটা তিনেক মিটমিটে আলো। ওই আলোগুলো তার একেবারে অচেনা নয়—ওটা ভোলাহাট থানা। মহানন্দার হৃৎপিণ্ডে বেঁধা কতগুলো কাঁটার মতো যে সমস্ত বালুচর ইতস্তত জেগে আছে, তাদের সঙ্গে যেন ওই ওদেরও কোথায় মিল আছে একটা। হিমালয়ের কোলে, পাইন-দেবদারুর ছায়ায় ছায়ায় ফুলঝুরিঝরা ঝর্ণাকে মাতাল করে দিয়ে যখন হাজার হাজার পাগলাঝোরা নামে, তখন এই মহানন্দার মরা জল উতরোল আনন্দে ফুলে ওঠে, এই বালুচরগুলোর চিহ্ন পর্যন্তও থাকে না ; কিন্তু এমন কি কোনো ঢল নামবে না কোনোদিন, আসবে না এমন একটা উন্মাদ বন্যাস্রোত—যা ওই ইঁটে গাঁথা কঠিন বাঁধটাকে শুধু সাময়িকভাবে নয়, চিরকালের মতো নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিতে পারে ?

হঠাৎ একটা বিশ্রী কোলাহলে ছিঁড়ে গেল রাত্রির স্তব্ধতা—নীতীশ থমকে দাঁড়িয়ে গেল পথের ওপরে। বাঁদিকে নেমে একটুখানি এগিয়ে গেলেই জেলেপাড়া। সেখান থেকে বিকট চিৎকার উঠছে। আর সব চিৎকারকে ছাপিয়ে একটা অশুভ ভয়ঙ্কর শব্দ আকাশকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে : খুন—খুন—খুন !

পরমুহূর্তেই দ্রুতপায়ে নীতীশ জেলেপাড়ার ভেতরে এগিয়ে গেল।

যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা মানুষের রক্ত আতঙ্কে জল করে দেবার মতো। দু'ধারে দু'সারি ছোট ঘর, মাঝখানে উঠোনের মতো একটু খালি ফাঁকা জায়গা। সেই জায়গাটুকু আপাতত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গোটা তিনেক মশালের ঊর্ধ্বমুখী শিখা একটা রক্ত-পিঙ্গল আলোয় উদ্ভাসিত করে দিয়েছে চারদিক। মাথায় গামছা বাঁধা চার-পাঁচজন কালো কালো পুরুষের হাতে ঘুরছে বড় বড় পাকা লাঠি—লাঠিতে লাঠিতে দ্রুতলয়ে ঠকাঠক্ আওয়াজ উঠছে। একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে, তার মাথা থেকে রক্তের ধারা

গড়িয়ে নামছে মাটিতে। দু দিকের দাওয়া থেকে মেয়েরা কলকণ্ঠে চিৎকার করছে, কাঁদছে, আর্তনাদ করছে। পুরুষদের চোখগুলোতে আদিম হিংসা ঠিকরে পড়ছে, রক্ত দেখে রক্ত চড়ে গেছে ওদেরও মগজে।

মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল নীতীশ। তারপর বাজের মতো গর্জন করে উঠল : এই থামো, থামো। কী হচ্ছে এসব ?

অপরিচিত গলার এই আকস্মিক হুঙ্কারটা মন্ত্রের কাজ করল যেন। হাতের লাঠি উদ্ধত রেখেই মানুষগুলো একসঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

—দাঙ্গা কিসের ? কেন এই খুনোখুনি ? একসঙ্গে সবগুলো জেলে যাবে—জানো ?

অচেনা মানুষ, অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। গলার স্বরে বজ্রের কঠিনতা—সে স্বরে আদেশ করবার যেন জন্মগত অধিকার একটা। একই চিন্তা, একই কথা মানুষগুলোর মনের ভেতরে একসঙ্গে নাড়া দিয়ে উঠল। নিশ্চয় পুলিসের লোক। থানার নতুন জমাদারবাবু কিনা তাই বা কে জানে।

—স্থির হয়ে দাঁড়াও সব।

সব স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

—লাঠি নামাও।

তেমনি মন্ত্রবলে লাঠিগুলো নেমে এল। এত উত্তেজনা, এত প্রবল জিঘাংসা কেমন করে যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। মনের মধ্যে একটি মাত্র অনুভূতি শিউরে বেড়াচ্ছে এখন—সে ভয়, মর্মান্তিক ভয়। নিজেদের অপরাধ সম্পর্কে এখন পুরোমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠেছে তারা। থানার জমাদারবাবু স্বয়ং ঘটনাটা দেখতে পেয়েছেন—এবারে নিঃসন্দেহে সকলকে ভোলাহাটের হাজতে যেতে হবে। আর দারোগা মফিজর সাহেবের ঠ্যাঙানিটা রীতিমতো বিশ্ববিখ্যাত ব্যাপার।

হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে একজন ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল : দোহাই জমাদারবাবু, আমি কিছু জানি না বাবু। এই হারামজাদা বিন্দে আমার ভাইকে একেবারে মেরে ফেলেছে জমাদারবাবু—

—চুপ করো, আমি এর বিচার করেছি—

আর দাঁড়াবার সময় ছিল না তখন। মাটিতে পড়া লোকটার পাশে গিয়ে সে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তখনও তার মাথা থেকে রক্ত গড়াচ্ছে—সত্যি সত্যিই খুন হয়ে গেছে নাকি !

কিন্তু অনেক আঘাত সয়ে থাকা ছোটলোকের মাথা, ভদ্রলোকের নরম মাথার মতো মাটিতে গড়া নয় যে এক ঘায়ে গুঁড়িয়ে যাবে। যতটা মনে হয়েছিল আঘাত সাংঘাতিক নয় সে পরিমাণে। কপালের ওপরে চওড়া আকারের খানিকটা ক্ষত হয়েছে, রক্তটা

গড়াচ্ছে সেখান থেকেই। লোকটা পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে গেছে তাও নয়, মস্ত একটা চোট খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে।

দুদিকের দাওয়াতে মেয়েরা দু'এক মিনিটের জন্যে থেমে গিয়েছিল, এই ফাঁকে আবার তারা কিল্‌বিল্‌ করতে শুরু করেছে। নীতীশ ফের একটা ধমক দিলে।

—এই, কান্না বন্ধ করো সব। জল আনো খানিকটা। তারপর একে ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে।

আস্তে আস্তে আবহাওয়া সহজ হয়ে এলে ঘটনাটা শোনা গেল সমস্ত। কাহিনীটা নারীঘটিত এবং কিছু কৌতুকের উপাদান থাকলেও সবটা মিলে বিয়োগান্তক ব্যাপার।

প্রধান আসামী বিন্দে ওরফে বিনোদ কান্নার সুরে সব বর্ণনা করে গেল। তার স্ত্রী হচ্ছে সাবি—যার পোশাকী নাম সাবিত্রীবালা। কিন্তু নামটা সাবিত্রী হলেও স্ত্রীর চরিত্র ঠিক সাবিত্রীর মতো নয়। কিছুদিন থেকেই বিনোদের সন্দেহ ছিল, আজ সন্ধ্যায় অন্ধকারের মধ্যে রামকেষ্টর ঘরে স্ত্রীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছে সে, চক্ষের পলকে অন্ধকারের মধ্যে সাবি কোথায় ছিটকে পড়েছে—বিনোদ তাকে কায়দা করতে পারেনি; কিন্তু এক মোক্ষম ঘায়ে সে শুইয়ে দিয়েছে রামকেষ্টকে। তারপরই দুজনের আত্মীয়স্বজন মিলে এই দাঙ্গা।

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রামকেষ্ট এইবার ফোঁস করে উঠল।

—তোর বউয়ের দোষ কি রে, তোর বউয়ের দোষ কী? পেটে ভাত দিতে পারিস না, পরনে কাপড় দিতে পারিস না—ওঃ, ভারী সোয়ামী!

বিনোদ খেঁকিয়ে উঠল: তাই বলে তুই আমার বউকে কাপড় কিনে দিবি?

—তোর কাছে চেয়েছে, তুই দিতে পারিসনি, আমার কাছে চেয়েছে, আমি দিয়েছি।

তা ঠিক। এই জেলেপাড়ায় রামকেষ্টই একমাত্র ব্যক্তি—সে শুধু নিজের নয়, দরকার হলে পরের বউকেও একখানা কাপড় কিনে দিতে পারে। এ সখ এবং সৌভাগ্য একমাত্র তারই পক্ষে সম্ভবপর। বাকি আর সকলের অবস্থা তাদের ভাঙাচুরো নিরানন্দ ঘরগুলোর দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। চালে খড় নেই; দাওয়ার খুঁটিতে ঘুণ ধরেছে—একটু টোকা দিলেই ছোট ছোট ছিদ্রপথে হলদে রঙের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ে। জাল ছিঁড়ে গেলে নতুন করে সুতো কেনবার পয়সা নেই, একটা জালের কাঠি হারালে ইঁটের টুকরো বেঁধে কাজ চালাতে হয়। চারিদিকে নির্ভুল অনশন আর অপমৃত্যুর ছায়া নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। অথচ—

অথচ, বারো বছর আগে এমন দিন ছিল না। তখন এই মহানন্দার জলে জালভরা

ইলিশ পড়ত, দশসেরী চিতলের দাপাদাপিতে জেলে-নৌকাগুলো ভেঙে পড়বার উপক্রম করত। নদীর জলে মাছের প্রাচুর্য ছিল আর শরীরে মনে ছিল স্বাস্থ্য ও জীবনের অপরিমিতি। কিন্তু আজ নদী মরে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে মরে যাচ্ছে সমস্ত। অভাবের অন্ধকার দরজাটার ভেতর দিয়ে ওরা পা বাড়িয়েছে অপঘাতের পিচ্ছিল পথে। এ তারই সুস্পষ্ট সংকেত।

নীতীশ যখন উঠল তখন অনেক রাত হয়ে গেছে।

—আচ্ছা, আজ থাক। কাল আমি এসে এর যা হয় একটা বিহিত করব।

বিনোদ আবার কেঁদে উঠল: সত্যি বলছি জমাদারবাবু, আমার কোনো দোষ নেই—

—দেখা যাক।

নীতীশ হাসল। এরা এখনো তাকে জমাদারবাবু বলেই ভাবছে তাহলে। ভাবুক, ক্ষতি নেই।

একফালি চাঁদের পাণ্ডুর আলোয় জল-মেশানো কালির মতো রাত্রির রঙ। পায়ের শব্দে শেয়াল ছুটে পালাচ্ছে, ঝিঁঝির ডাক একবার থেমে গিয়েই দ্বিগুণ জোরে মুখরিত হয়ে উঠছে আবার। মহানন্দার চরে শোঁ শোঁ করছে বনঝাউ, কোথা থেকে ভেসে আসছে প্যাঁচার চিৎকার। নীতীশের মনে হল তার ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্বত আর দক্ষিণে কন্যাকুমারী নয়; এই নগণ্য গ্রাম যোধপুরের নগণ্যতম এই জেলেপাড়াতে তার ভারতবর্ষ রূপায়িত হয়ে উঠেছে—অনিবার্য ভাঙন আর অপমৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে টলমল করছে তার ভারতবর্ষ; শুকনো মহানন্দার মতো তারও জীবনের ধারা শুকিয়ে আসছে, তারও জীবন আজ আত্মঘাতের অবুদ্ধিতে বিষাক্ত।

আপাতত এইখান থেকেই তার কাজ শুরু। মুষ্টিগত ভারতবর্ষ থেকে সমষ্টিগত ভারতবর্ষের তীর্থ-সরণিতে।

৬

কাজ তো শুরু—কিন্তু কী ভাবে, কোন্ পরিকল্পনায়? আত্মজিজ্ঞাসায় ভারাক্রান্ত মন নিয়েই ফিরে আসছিল নীতীশ। কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। কিছু একটা করবার আকুলতা সমস্ত চৈতন্যকে পীড়িত করে তুলছে, অথচ কী করা যেতে পারে তার কোনো উত্তর মিলছে না মনের কাছে। বারো বছর ধরে যে শক্তিটা তিল তিল করে নেপথ্যে সঞ্চিত হয়েছে, আজ নীতীশের মনে হল তারা যেন অন্ধ এক-একটা বোবা ঢেউয়ের মতো

পাঁজরার ভেতরে ক্রমাগত ঘা দিচ্ছে তার। কিছু করতে হবে, কিছু করা চাই। বিলম্ব করা চলবে না, অপেক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু কী করা যায়?

মহানন্দা থেকে উঠেছে বাতাস, সরু পথটার দুপাশে ঘাসবনের আড়ালে ঝিঁঝির আবহসঙ্গীত। ওই বাতাসে, ওই ঝিঁঝির ডাকে অন্ধকারটা কেমন দুলে দুলে উঠছে, যেন থরথর করে কাঁপছে রাত্রি। ওপরে আকাশটার দিকে তাকাতেই সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল পশ্চিম দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটে গেল একটা উল্কা। যেন স্তব্ধ কালপুরুষের ধনুক থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল আগ্নেয় তীর। আর ওই তীরের আঘাতেই কি এমন করে কেঁপে উঠল রাত্রি, মৃত্যুযন্ত্রণায় একটা চমকে শিউরে উঠল অন্ধকারটা?

ঠিক কথা।

একটা তীর। একটা বিষাক্ত তীর এসে বিঁধেছে। সেই বিষের জ্বালায় মহানন্দা মরে যাচ্ছে, মরে যাচ্ছে যোধপুর। তারপর সমস্ত বাংলাদেশটাও মরে যাবে। একটা অনিবার্য ক্ষয় এসে ধরেছে, রাহুর গ্রাসের মতো কালো একটা অতিকায় ছায়া বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে ক্রমশ। বারো বছর আগে নীতীশ যা অনুভব করেছিল তার চেয়ে ঢের বেশি; বারো বছর আগে মহানন্দার গলায় যে ফাঁস পড়েছিল সেটা আরো শক্ত হয়ে এঁটে বসেছে। সেদিন যে আবর্জনার স্তূপ জমে উঠেছিল আজ তার চাইতে ঢের বড় বাধা সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? এলোমেলো ভাবে যোধপুরের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলে এর উল্টো কথাটাই তো মনে হবে। সমৃদ্ধি হয়েছে গ্রামের। অনেক মাঠকোঠা দালান হয়েছে, অনেক একতলা বাড়ি হয়েছে তেতলা। শুধু সুদাম ঘোষ নয়, গাঁয়ে আরো অনেকের ধানের গোলায় লক্ষ্মী এসে বাসা বেঁধেছেন। কিন্তু যোধপুরের এটা তো সত্যিকারের রূপ নয়—এ যে মুখোস! সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল অনেকগুলো ছাড়া ভিটে। যেখানে আগে ভরপুর সংসার দেখেছিল, সে সব জায়গাতে গজিয়েছে ঘন জঙ্গল; সাপের আস্তানা হয়েছে, আড্ডা হয়েছে শেয়ালের ঐকতানের। ওই জেলেপাড়ারও যে আর বেশি দিন নেই বুঝতে কষ্ট হয় না এটাও। সময়ের নিয়মে কোথায় যেন হিসেব মিলছে না। জমাখরচের পাতায় কোথায় আজ মস্ত বড় একটা গরমিল হয়ে গেছে।

আপাতত এই হিসেবটাই একবার তলিয়ে দেখতে হবে নীতীশকে। তা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই তার।

শুকনো পাতার ওপরে পায়ের শব্দে যতীশ ঘোষ চমকে উঠলেন। হালকা ঘুমের আমেজটা চোখ থেকে সরে গেল, মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা খসে পড়ল তাকিয়ার ওপর। যতীশ বললেন, কে?

—আমি।

ততক্ষণে অন্ধকার জায়গাটা পেরিয়ে নীতীশ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কয়েক মুহূর্ত যতীশ নীরব-জিজ্ঞাসায় ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু নীতীশ যখন কোনো জবাব না দিয়েই পাশ কাটিয়ে ভেতরে যাওয়ার উপক্রম করলে, তখন বাধ্য হয়েই যতীশ বললেন, দাঁড়াও!

নীতীশ দাঁড়াল।

বিতৃষ্ণাভরা গলায় যতীশ বললেন, এত রাত হল যে?

—কাজ ছিল।

—কী কাজ?

যতীশ যেন জেরা করছেন। নীতীশের কপালের রেখাগুলো এক মুহূর্তের জন্যে ঢেউ খেলে গেল। শান্তভাবে জবাব দিল, জেলেপাড়ায় মারামারি লেগেছিল।

—তাই থামিয়ে দিয়ে এলে?

—হাঁ।

—ছাখো বাপু—যতীশের গলার স্বরে বিরক্তি আর প্রচ্ছন্ন হয়ে রইল না: ঘরের খেয়ে বনের মোষ তো অনেক তাড়িয়েছ। তার খেসারতও কম দিতে হল না। এখন দুটো দিন ঘরে সুস্থির হয়ে বোসো দেখি। আমি আর সংসারে কদিন। এখন একবার শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে পা বাড়ালেই হয়।—দম নিয়ে যতীশ বলতে লাগলেন: এবেলাই সব দেখেশুনে না নিলে চলবে কেন? ওসব তো অনেক হল, এখন একবার ঘরসংসারের দিকে নজর দাও দেখি।

নীতীশ চুপ করে শুনে গেল। এই হচ্ছে নিয়ম। বাপেরা চিরকাল ছেলেদের সংসারে মনোনিবেশ করবার জন্যে যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়ে থাকেন এবং ছেলেরা চিরদিন সে উপদেশের বোঝা নীরবে অম্লান মুখে ঘাড়ে তুলে নেয়।

আরো খানিকক্ষণ বকে গেলেন যতীশ। তারপর যখন তাঁর মনে হল উপদেশটা যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে, তখন প্রশ্ন করলেন: জেলেপাড়ায় বুঝি ফের মারামারি হচ্ছিল?

—হাঁ।

যতীশ মুখ বিকৃত করে বললেন, হারামজাদারা এই করেই গোল্লায় যাবে। হেন মাস নেই যে দু'তিনটের মাথা না ফাটছে। হবেই তো—জীবহত্যে করে প্রাণধারণ করে, ওদের অমন অবস্থা হবে না তো হবে কার?

এটাও কথামৃত। বিনা বাক্যব্যয়ে গিলে ফেলবার বস্তু।

—ওদের জন্যে কিছু করে লাভ নেই, একেবারে হতভাগার জাত। কিন্তু এত রাত করে কি তোমার বাড়ি ফেরা উচিত? সবে দুদিন হল এসেছ—কোথায় দুদণ্ড বাড়িতে থাকবে, তা নয় বউমা রাতভর তোমার জন্যে খাবার নিয়ে বসে রইল। যাও যাও ভেতরে,

আর দেরি কোরো না।

নীতীশ চলে গেল।

যতীশ বিরক্ত চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন সেদিকে। অনেকগুলো কথা মনে এসেছিল, বলতে পারলেন না,—কোথায় যেন আটকে গেল। বৈষ্ণবের সংযম—ধৈর্যচ্যুত হওয়া চলবে না। ঘটানো চলবে না আত্মবিস্মৃতি। 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানিনাং মানদেন'—! শ্লোকের বাকিটুকু মনে পড়ছে না। তা নাই পড়ুক, বৈষ্ণবের সংযম এবং দীনতা সম্পর্কে অচেতন থাকলে তো চলবে না। তা ছাড়া—তা ছাড়া আরো একটু কথা আছে। আজ যতীশ ঘোষ এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন, তিনি এবং তাঁর ছেলের ভেতরে একটা স্পষ্ট ব্যবধানের সমান্তরাল রেখা পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে এমন ফাঁক—যেটাকে ভরাট করে তুলবার কোনো কৌশলই তাঁর জানা নেই।

বারো বছর। একটা যুগ। অনেক জল বয়ে গেছে মহানন্দার, অনেক বালি জমেছে তার ওপরে। সময়ের সুযোগে বাপ-ছেলের মনের ভেতরটায় যেন মাথা তুলেছে অরণ্য—একটা বিশৃঙ্খল দুশ্ছেদ্য অরণ্য। তার এপারে ওপারে এ ওকে দেখছে, কিন্তু ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। কাছে থাকলে যে সহজ পরিচয়ের সূত্রে দুজনে দুজনকে অতি সহজে চিনতে পারত, বারো বছরের দূরত্ব সে সম্পর্কের মাঝখানে একটি তৃতীয় ব্যক্তির মতো এসে দাঁড়িয়েছে যেন। ইচ্ছে করলেই আজ আর সব কথা বলা যাবে না; হিসেব করতে হবে, বিচার করতে হবে, ওজন করতে হবে। একটি অপরিচিত মানুষের মতো তার সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হবে নতুন করে!

যতীশ হরিনামের মালাটা তুলে নিলেন। বড্ড যা-তা ভাবছেন তিনি আজকাল, অত্যন্ত বিশ্রী রকমের মানসিক অস্বস্তি পেয়ে বসেছে তাঁকে। নাঃ—আর নয়। এবার তাঁকে ব্রজধামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়তেই হবে, ভুলতে হবে এ সমস্ত অকারণ চাঞ্চল্য।

কিন্তু ভুলতে চাইলেই কি ভোলা যায়? হরিনামের মালায় যতীশের আঙুল কখন আটকে দাঁড়ালো তিনি নিজেই তা টের পেলেন না। না, কোনো সন্দেহ নেই, আজ ইচ্ছে করলেই ছেলেকে তিনি যা খুশি বলতে পারেন না। পুত্রবধূর মতো ছেলে তাঁর আয়নায় দেখা অবিকল প্রতিচ্ছবি নয়, তাঁর নিজের হাতে নকল করা 'হরিবংশে'র খসড়াও নয়। সে একটা স্বতন্ত্র সত্তা; শাখানদী আজ দিক্ দিক্ থেকে বহু উপনদীর অর্ঘ্যই পেয়েছে, আজ যদি তার উৎসমুখ শুকিয়েই গিয়ে থাকে, তাতেও তার ক্ষতি হবে না।

যতীশ এবারে মালাছড়াটা কুঁড়োজালির ভেতরে পুরে ফেললেন। সত্যিই তাই। সব কথা ইচ্ছে করলেই বলা যায় না, এমন কি অত্যন্ত দরকারী কথাও না। বিরক্তিভরা মুখে যতীশ ভাবতে লাগলেন, অন্তত মফিজর দারোগার খবরটা নীতীশকে দেওয়া উচিত

ছিল, তাকে বলা দরকার ছিল যেন সে কাল সকালেই থানায় গিয়ে একবার রাহুটার সঙ্গে দেখা করে আসে।

দারোগা! নামটা মনে পড়তেই বিরক্তির চমক লাগল একটা। আর ভালো লাগছে না। যতীশ উঠে পড়লেন বাইরের দাওয়া থেকে, তারপর পায়ের খড়মটা খট খট করে অগ্রসর হলেন অন্তঃপুরের দিকে। শুব্ধ বাড়িটার প্রান্তে প্রান্তে তার একটা রূঢ় প্রতিধ্বনি উঠতে লাগল।

মল্লিকা জেগেই ছিল। নীতীশ যেমন আশা করেছিল, ঠিক তেমনিই। কিন্তু আজ আর ধ্যান করছিল না মল্লিকা। অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে ভাগবতের পাতা উল্‌টে চলেছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, আজ বুঝি কোথাও ফাঁক ছিল একটু। গত রাত্রিতে তার ধ্যানস্তিমিত একটা বিস্ময়কর রূপ দেখেছিল নীতীশ; বাহ্যজ্ঞান ছিল না, নীতীশের পায়ের শব্দও তার ধ্যান ভাঙাতে পারেনি। কিন্তু আজ বাইরে একটা শুক্‌নো পাতা উড়ে পড়বার শব্দও শুনতে পাচ্ছিল মল্লিকা, কোথায় ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলেছে সাপ,—সতর্ক পায়ে হেঁটে চলেছে নিশাচর শেয়াল, তাদের প্রতিটি সঞ্চার যেন মল্লিকা টের পাচ্ছিল।

ভাগবতের টীকাকার লিখেছিলেন: 'অহো, লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের কী অচিন্ত্য লীলা! এই লীলারস যে আস্বাদন করে, তাহার বস্তুজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্তি হয়। যাবতীয় কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় সেই অপার্থিবতার অমৃতরসে বিমজ্জিত হইয়া সর্বাঙ্গে যে ভাবশাবল্য উপস্থিত করে—'

ভক্তিভাবে মল্লিকা ভাগবতের পাতা বন্ধ করে দিলে, তারপর অত্যন্ত সম্ভ্রমভরে বইখানাকে মাথায় ঠেকাল। ভালো ভালো কথা হলেই সব সময়ে তা ভালো লাগে না। কিন্তু ভাগবত ভালো লাগে না এ কথা মল্লিকা কখনো বলতে পারবে না, ভাবতে গেলেও তিনবার বিষ্ণুমন্ত্র স্মরণ করবে। বলবে দোষটা ভাগবতের নয়, পাপী মনের; সংসারের কুটিলতায় জর্জরিত তার মন সব সময়ে ভালো জিনিসকে মেনে নিতে পারে না, তার জন্যে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে চিত্তের বিশুদ্ধি। সুতরাং চিত্ত যখন যথোচিত পরিমাণে পবিত্র নয়, তখন শাস্ত্রগ্রন্থকে সসম্মানে তুলে রাখাই দরকার।

আজ যেন কোথায় সুর কেটে গেছে। বাইরে থেকে যে একটা ধুলোর ঝাপ্‌টা এসে এখানকার ধূপধুনোর গন্ধে পবিত্র যবনিকাটাকে দুলিয়ে দিয়েছে, অন্তরের ভেতরেও যেন তার ছোঁয়া লেগেছে কোথাও। কী হয়েছে মল্লিকা ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু এটা বুঝতে পারল আজ হঠাৎ কেমন একটা ক্লান্তি এসে তাকে অধিকার করে বসেছে।

এমন সময় ঘরে এল নীতীশ।

মল্লিকা উঠে দাঁড়াল: এই ফিরলে?

—হাঁ, এই মাত্র।

—হাত মুখ ধুয়ে নাও, খাবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

নীতীশ মল্লিকার মুখের দিকে তাকালো। মল্লিকা সুন্দরীই বটে। কিন্তু একটা নিষেধের সূক্ষ্ম যবনিকা সে সৌন্দর্যকে আড়াল করে রেখেছে। সে আর তার স্পর্শগম্য নয়—তার থেকে অনেক দূরে।

কাল রাত্রে ভারী নৈরাশ্য বোধ হয়েছিল একটা, ঘা লেগেছিল ; একটা অতি কোমল, মৃদু অনুভূতি শীতল পাথরের গায়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য কারণে আজ সে নৈরাশ্য-চেতনা নেই, সে বেদনাবোধও না। অনাসক্তির একটা শান্ত প্রলেপ ঢেকে দিয়েছে ব্যথার জায়গাগুলোকে। ভালো, এই ভালো। নীতীশ মল্লিকাকে চিনেছে। কোনো ন্যায়শাস্ত্রের দাবিতেই তো মনের ওপরে কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেওয়া যায় না! মল্লিকা নিজের পথে চলেছে, নীতীশও তার পথেই চলবে। এই ভালো। দুজনের মনে এই নিঃশব্দ চুক্তিটাই সব চেয়ে নিরাপদ।

—যাও, হাত মুখ ধুয়ে এসো, দেরি করছ কেন ?

মল্লিকার স্বরে কোথায় যেন অধৈর্য প্রকাশ পেল। নীতীশ লক্ষ্য করল না। গায়ের জামা-গেঞ্জী খুলে গামছা নিয়ে চলে গেল কুয়োতলার দিকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর্বটাও শেষ হল সংক্ষেপে এবং নীরবে। তারপর অভ্যাসমতো নীতীশ একটা সিগারেট ধরালো, টুল টেনে নিয়ে এসে বসল জানালার সম্মুখে। দৃষ্টিটা বিস্তীর্ণ করে দিল ঝিল্লীমুখর কালো শূন্যতার ভেতরে—যেথায় উল্কার আগ্নেয়তীরে আহত হয়ে বেদনার্ত অন্ধকারের হৃৎপিণ্ডটা থরোথরো করে কাঁপছে।

সত্যিই কাজ—অনেক কাজ। এই জেলেপাড়া, ওই পোড়ো ভিটেগুলো দিয়েই সে কাজের বোধন করতে হবে। কিন্তু কী ভাবে ? জেলের যে সব বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা ঠিক করেছিল, খালাস পেয়েছে তাদের কেউ কেউ। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার।

অবশ্য তাদের অনেকের সঙ্গেই তখন তার মতের মিল হয়নি ; এখন যে সে অমিলটা ঘুচেছে তাও নয়। তবু চিন্তাধারার বিপর্যয় ঘটেছে। তাই দ্বিধা আছে, কাজ আরম্ভ করা সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেনি।

বাগানে অন্ধকার আমবাগানে বাদুড় পাখা ঝাপটাচ্ছে। এখন আমের সময় নয়, তবু কি খাচ্ছে কে জানে। শেষের দু বছর যখন নীতীশ বক্সার জেলে "সংশোধিত ফৌজদারী আইনের" বন্দী ছিল, সেই সময়কার একটা কথা মনে পড়তে লাগল।

ব্যাপারটা হয়েছিল ব্রজেনদার স্টাডি সার্কেলে। ওরা দু'চারজন তখনও জার্মানী থেকে আবার অস্ত্র আনা যায় কি না এ সম্পর্কে গবেষণা করছিল, এমন সময় এল

শচীন। ওদের মুখের সামনে ধপাস করে ফেললে একখানা বই, তার নাম 'লেনিনিজ্‌ম'।

শচীন বললে, চোখ দুটো এবারে খোলো। এ যুগে ও নিহিলিজ্‌ম চলবে না। ওই ক্ল্‌স হিরো ডি-ভ্যালেরা আর সিন্‌ফিন্‌ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ো না। ছাখো পৃথিবী কোন্‌দিকে এগোচ্ছে।

সেই সূত্রপাত। স্টাডি সার্কল জমে উঠল। কিছুদিন আগে খবরের কাগজে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার যে বিবরণী বেরিয়েছিল অথচ যে ঘটনাটা বোমা পিস্তলের অভাবে ওদের বিন্দুমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি তার নতুন ব্যাখ্যা শুনতে পাওয়া গেল। যে রুশবিপ্লবের ইতিহাসকে ওরা জালালাবাদের সঙ্গে একাত্ম করে দেখত, আজ দেখা গেল তার ধর্ম আলাদা, তার রূপ স্বতন্ত্র।

তর্ক চলতে লাগল দিনের পর দিন। আলাদা দল গড়ে উঠল, আর বিরুদ্ধবাদীদের নেতা হল নীতীশ। অত প্রলিটারিয়েটপ্রীতি তার নেই; যুক্তি তর্ক আর তথ্যের ভারে আকীর্ণ ওই নিরামিষ বিপ্লব তার পছন্দ হয় না। বোমার ফিউজের মতো তার রক্ত বিস্ফোরণের জন্যে অপেক্ষা করে আছে—পলাশীর মাঠে যে ভাবে ইংরেজ প্রথম পা বাড়িয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই তাকে ইংলিশ চ্যানেল পার করে দিতে হবে। সোশ্যালিজম? হাঁ—ও কথাটায় আপত্তি নেই, ওটা সেও চায়। কিন্তু ক্লাইভের উত্তরাধিকারীদের আগে বিদায় করো, ওসব ভালো ভালো কথা তারপরে বিচার করা যাবে।

অপর পক্ষ তাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। বোঝাতে চেয়েছিল ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা, বলেছিল বিপ্লবের এই ধর্ম—বুর্জোয়া বিক্ষোভের চরম পরিণতি প্রোলেটারিয়ান রেভোলিউশনে। নীতীশ কতটা বুঝেছিল কে জানে, বইও কিছু কিছু পড়তে হয়েছিল, কিন্তু মেনে নিতে পারেনি। তার নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় থেকেই সে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবু আজ দ্বিধা দেখা দিয়েছে—মনে হচ্ছে নতুন কিছু করা দরকার; আরো মনে হয় প্রতিপক্ষ শুধু ইংরেজ নয়;—আরো অনেকে আছে, এই যোধপুর গ্রামেও তাদের কালো কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে। সে ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে রাশীকৃত পোড়ো ভিটেয় আর নতুন গড়ে ওঠা দোতলা তেতলা দালানগুলোতে।

—শোবে না?

নীতীশের চমক ভাঙল। ঠিক পেছনটিতেই মল্লিকা দাঁড়িয়ে আছে। শান্ত মৃদু গলায় আবার জিজ্ঞাসা করলে, শোবে না তুমি?

নীতীশ এবার আর মল্লিকার মুখের দিকে তাকালো না; পাথরের দিকে তাকিয়ে লাভ নেই—দৃষ্টিটা শুধু ঘা খেয়েই ফিরে আসবে। অন্যমনস্ক স্বরে জবাব দিলে, একটু পরে।

—কিন্তু অনেক রাত হয়ে গেছে।

—হোক, তুমি শুয়ে পড়ো।

নীতীশ ভুল করল। পাথরের দিকে তাকিয়ে দেখল না। বুঝতেও পারল না পাথরের ভেতর ক্ষীণ ধারায় রক্ত বইতে শুরু করেছে আবার। মল্লিকা ছায়ার মতো তার পেছন থেকে সরে গেল।

টুলটার ওপরে পা তুলে বসল নীতীশ, আরাম করে আবার একটা সিগারেট ধরালে। চিন্তার ধারাটা কেটে গেছে, নতুন করে আবার থেই ধরতে হবে।

হঠাৎ একটা অকারণ আনন্দে বুকের ভেতরটা দুলে উঠল তার। এতক্ষণে নীতীশ বুঝতে পারল, ব্যথার ওপরে শান্ত প্রলেপের অনুভূতিটা এসেছে কোথা থেকে; কাল সমস্ত রাত যে মনটা তিক্ততা আর নিরাশায় আকুলিবিকুলি করছিল আজ এমন করে কে তাকে নিশ্চিন্ত উদাসীনতায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছে; মল্লিকার সঙ্গে তার মনের যে নীরব চুক্তি, তার প্রেরণাটাই বা এসেছে কোথা থেকে! কানের কাছে বাজতে লাগল :

"পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা,
মনে মনে—"

কিন্তু আজ মল্লিকার পালা। কী যে হয়েছে তার—বিছানায় ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করছে। কিছুতেই দুটো চোখের পাতা যেন এক করতে পারছে না।

৭

গ্রামের ছেলেরা এতদিন পরে নীতীশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠেছে বলে মনে হল। তাই পরদিন সকালে এসে হাজির হল তাদেরই জন তিনেক।

গ্রামের ছেলেদের যেমন হয়। হাত তুলে ভদ্রতাসঙ্গত একটা নমস্কার করে কর্তব্য শেষ করবার চাইতে গ্রামসুবাদে যাঁরা গুরুজন তাঁদের প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতেই তারা অভ্যস্ত বেশি। এরাও তাই করলে। তারপর ভক্তিনম্র বিনীত গলায় বললে, দাদা বোধ হয় আমাদের চিনতে পারেননি?

নীতীশ একবার সকলের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলে। তার দৃষ্টি বিব্রত।

—এতটুকু সব দেখে গিয়েছিলাম, এখন সব বড় হয়েছ, তাই—

ছেলেরা নিজেদের পরিচয় ব্যাখ্যা করে দিলে। আমি সুভাষ, কৃষ্ণদাস ঘোষের ছেলে। এ হল বঙ্কিম—এর বাবা ব্রজেন পাল ভোলাহাট ডিস্পেনসারীর ডাক্তার। আর ওকে চিনতে পারলেন না? ও তো মোহন, ওর বড়দা খগেন তো আপনার সঙ্গেই জেলে গিয়েছিল।

মনে পড়েছে বইকি। বিশেষ করে শেষ নামটা—খগেন। ওদের মামলায় সেও একজন আসামী ছিল। তবে বেশিদিন তাকে জেল খাটতে হয়নি। বয়স ছিল তার সব চাইতে কম, সেই জন্ত অপরাধের দায়িত্বটা ছিল সামান্তই। বছর তিনেক বাদেই খালাস পেয়েছিল খগেন।

নীতীশ বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ খগেন। কোথায় আছে আজকাল?

ভীরু গলায় জবাব দিল মোহন। শান্ত, মিষ্টভাষী ছেলে, চোখে মুখে মেয়েদের মতো একটা সংকুচিত ভীরুতা। বললে, নবাবগঞ্জে মাস্টারী করছেন।

—যাক ভালোই।

অন্যমনস্ক ভাবে নীতীশ ভাবতে লাগল ভালোই করেছে খগেন। এ পথ খগেনের ছিল না, এর সংস্কার স্বাভাবিক ছিল না, ওর রক্তের ভেতরে সেই বিশেষ বয়সে কৈশোরের একটা উন্মাদনা, প্রতিদিনের পরিচয়ে আকীর্ণ রৌদ্রোজ্জল পথটার সীমা ছাড়িয়ে একটা অনিশ্চিতের রহস্য রোমাঞ্চিত অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার নেশা খগেনকে সেদিন ডাক দিয়েছিল। ছেলেবেলার অনেক মোহ, অনেক মানসিক বিলাসের মতো এটাও যথানিয়মে একদিন খগেনকে মুক্তি দিয়েছে—বিশেষ করে তিন বছর জেল খেটে আসাটা ভালো করেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়েছে ওকে। সুতরাং সংবাদটা অপ্রত্যাশিত নয়। শুধু নবাবগঞ্জের স্কুলে মাস্টারী কেন, খগেন যদি আজ পুলিসের দারোগা হয়ে পরম নিষ্ঠাভরে স্বদেশী করা ছেলেদের শাপ-শাপান্ত বাপ-বাপান্ত করতে থাকত তাহলেও নীতীশ আশ্চর্য হত না।

দলের ভেতর সুভাষ ছেলেটিই বড়। বছর কুড়িক বয়েস হবে—বহরমপুর কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। কথাবার্তা বেশির ভাগ সে-ই বলছিল। বাকি দুটির বয়েস ষোল থেকে আঠারোর ভেতরে, এখনো ইস্কুলের চৌহদ্দি পেরোয়নি। চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল তারা। ভক্তি, বিস্ময় এবং একটা সাগ্রহ কৌতূহলে চোখমুখ জলজল করছিল তাদের; বীরপূজোর উপযোগী শ্রদ্ধান্বিত ভাব নিয়ে বসল তিনজনেই, নীতীশের ভেতর থেকে অতলস্পর্শী কোনো একটা রহস্য উদ্ঘাটিত করবার চেষ্টা করছিল তারা।

আস্তে আস্তে সংকোচটা কাটিয়ে নিয়ে সুভাষ বললে, আপনার কাছে একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

নীতীশ স্নিগ্ধভাবে হাসল: তার জন্যে অত সংকোচ করছ কেন? কী বলবে বলো!

—আমরা একটা ক্লাব করেছি গ্রামে।

—বেশ তো, খুব ভালো কথা।

—নাম দিয়েছি 'জাগরণ সংঘ'। ভালো হয়নি নাম?

—জাগরণ সংঘ?

দ্বিধাভরে সুভাষ বললে, নামটা কি খুব খারাপ হয়েছে ?

—না না, খারাপ হবে কেন ! চমৎকার নাম। কিন্তু তোমাদের সংঘের উদ্দেশ্যটা কী ? কাকে জাগাবে ?

এবার সুভাষ উৎসাহিত হয়ে উঠল। পকেট থেকে বার করে আনলে একতাড়া কাগজ, এগিয়ে দিলে বাঁধানো একখানা মোটা খাতা। বললে, এতেই আমাদের আদর্শ আর উদ্দেশ্য সব লেখা রয়েছে।

—খাতা থাক, পরে দেখব এখন। বলো, তোমাদের মুখেই শুনি।

—আমরা একটা পাঠাগার—মানে, লাইব্রেরী করছি।

—তারপর ?

সুভাষ এতক্ষণে সপ্রতিভ ভাবে বলে যেতে লাগল : যারা চাঁদা দিয়ে মেম্বার হবে তারা বই নিতে পারবে লাইব্রেরী থেকে। আর লাইব্রেরীর মেম্বার যারা হবে না, তাদের জন্যেও ফ্রী রিডিং রুম থাকবে, তারা সেখানে পড়তে পারবে খবরের কাগজটাগজ।

নীতীশ বললে, বেশ তো ভালোই প্ল্যান। কাজে লেগে যাও।

বঙ্কিম এতক্ষণ কিছু একটা বলবার জন্য যেন আঁকুপাঁকু করছিল। এবারে সে সুযোগ পেল। সামনে গলা বাড়িয়ে দিয়ে উচ্ছ্বসিত উৎসাহে বঙ্কিম বললে, না না, শুধু এই নয়। এ ছাড়া আরো অনেকরকম আইডিয়াও রয়েছে আমাদের। আমরা একটা এক্সারসাইজ্ ক্লাব করব, সেখানে শরীরচর্চা হবে।

মোহন জুড়ে দিলে : তা ছাড়া নাইটস্কুলও করা হবে। সেখানে বিনি পয়সায় লেখাপড়া শিখবে গরীবের ছেলেমেয়েরা। নার্সিং ডিপার্টমেণ্ট থাকবে, অসুখবিসুখ করলে আমরা নার্স করতে যাবো। একটা ফার্স্ট এইডের দলও থাকবে—

নীতীশ বললে, দাঁড়াও, দাঁড়াও— এ যে বিরাট ব্যাপার ! তোমাদের তো দেখতে পাচ্ছি একুনে তিনটি প্রাণী, তিনজনে মিলে এত ঝামেলা সইতে পারবে ?

সুভাষ হাসল : শুধু তিনজন কেন, পাড়ায় আরো অনেক ছেলে রয়েছে। তা ছাড়া আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।

—আমি ?—নীতীশ একবার চোখ তুলে সুভাষের মুখের দিকে তাকালো। হঠাৎ যেন ভালো লাগল কথাটা, কেমন আশ্চর্য মনে হল। এতদিনের অপরিচয়ের পরে যেন আজ সত্যিকারের যোধপুর তাকে চিনতে পেরেছে, ফিরে ডাক পাঠিয়েছে নতুন করে। তার গ্রামের প্রীতি আর অনুরাগ যেন নতুন করে স্বীকৃতি দিয়েছে তাকে। নীতীশের মুখ আলো হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে।

—আমি ? আমি কী করতে পারি তোমাদের জন্যে ?

—আপনার কাছ থেকে উপদেশ চাই, সাহায্য চাই আমরা।

—আমার সাহায্য?—নীতীশ চুপ করে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বললে, তোমাদের ভয় করবে না?

—কেন, কিসের ভয়?

—বাঃ, জানোই তো আমি দাগী আসামী, আমার পেছনে দারোগা ঘুরছে। আমাকে ক্লাবের ভেতরে টেনে নিয়ে শেষকালে হয়তো নানা রকম মুশকিলে জড়িয়ে পড়বে তোমরা!

—আপনি বিপ্লবী, আপনি আমাদের গৌরব—যেন মানপত্র পড়ছে এমনি উজ্জ্বল আর-অলঙ্কৃত হয়ে উঠল সুভাষের ভাষা: আপনি দেশের সুসন্তান। আপনাকে নিয়ে যদি ক্লাবের কোনো বিপদ-আপদ ঘটে, তা হলে সেটাই তার সব চাইতে বড় সম্মান।

বুকের ভিতরটা ছলছল করে উঠল নীতীশের, মুখের ওপরে আলোর আভাসটা আরো প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। কথাগুলোর মধ্যে স্তুতি এবং অতিভাষণ আছে; একটা ডাকাতি মামলায় বারো বছর জেল খেটে এসেই দেশের সুসন্তান হয়ে ওঠবার মতো আত্ম-প্রত্যয়ও তার নেই। কিন্তু একেবারে ওজন করে পাওয়ার চাইতে একটু বেশি পাওয়াই ভালো; আমি যতটুকু তার চাইতে আরো কিছু বড় করে আমাকে প্রতিফলিত করো—নিজেকে আমি আরো ভালো করে চিনতে পারব।

কিন্তু শুধু এই নয়। এই স্তুতির পিছনে যোধপুরের সেই বিস্মৃত ভালোবাসা, সেই লুপ্ত দাবির পুনরধিকার। আমি তো তোমাদেরই—বহু দিনের বহুপ্রসার কণ্টকাকীর্ণ পথ ছাড়িয়ে এই তো আবার তোমাদের কাছে ফিরে এলাম। আমাকে স্বীকার করো, আমাকে গ্রহণ করো। আন্দামানের পাষাণপ্রাচীরের আড়াল থেকে ঝড়ের রাত্রে যে কালো সমুদ্রের আর্ত কান্না, আমার এই দেশের মাটিরই আকুতি। নারিকেলবীথির মর্মর শব্দে বারে বারেই তো শুনেছি মহানন্দার বালিভাঙায় বনঝাউয়ের সঙ্গে তোমারই দীর্ঘশ্বাস! আমি তোমাকে ভুলিনি—আমার প্রত্যেকটি শিরা স্নায়ু দিয়ে, আমার প্রতিটি রক্তকণার সঞ্চারে সঞ্চারে প্রতি মুহূর্তে তোমাকে অনুভব করেছি। আজ আমাকে নতুন করে বরণ করবার সময় যদি তোমার কণ্ঠস্বরে কোথাও উচ্ছ্বাসের উচ্ছলতা এসে পড়ে, যদি অতিভাষণ থাকে কোথাও, সে তো আমার প্রাপ্য। মায়ের কাছে অস্থিসার রিকেটি ছেলেও তো সাত রাজার ধন এক মানিকের চাইতে মূল্যবান, ধুলোমাখা কালো ছেলেও তো আকাশের চাঁদের চাইতে অপরূপ বস্তু!

নীতীশ স্নিগ্ধ গলায় বললে, এসব উচ্ছ্বাসের ব্যাপার নয় ভাই, কাজের কথা। আমাকে আর এ সবের ভেতরে না-ই টানলে বরং? শেষ যদি সত্যিই কোনো মুশকিল হয়—

সুভাষ বাধা দিয়ে বললে, সেসব আমরা ভাবব, আপনাকে কিছু বলতে হবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে আজ বিকেলে দোলমঞ্চের আঙিনায় আমাদের একটা মিটিং আছে।

আপনাকে যেতে হবে।

—আমি মিটিংয়ে যাব ?

—হ্যাঁ, আপনাকে যেতে হবে। আর শুধু গেলেই চলবে না—প্রেসিডেন্ট্ হতে হবে।

—প্রেসিডেন্ট্! বলো কী!—নীতীশ বসে থাকা অবস্থাতেই প্রায় হাত তিনেক লাফিয়ে উঠল।

মোহন বললে, আমরা সবাই তাই ঠিক করেছি।

—আমি প্রেসিডেন্ট্! ভাবতেই যে আমার বুক কাঁপছে। ওসব আমি পারব না। সুদাম কাকা রয়েছেন, ব্রজ মামা রয়েছেন—

—ওঁরা তো বারো মাসই আছেন। তা ছাড়া ওঁরা সবাই বুড়ো হয়েছেন, ওঁদের সঙ্গে আমাদের মত মেলে না, ভালোও লাগে না। আপনাকেই চাই আমরা।

—কিন্তু তাই বলে আমি প্রেসিডেন্ট্! আমার যে মুখ দিয়ে কথা বেরুবে না হে!—ভয়ার্ত মিনতি জানালো নীতীশ।

—সে সব আমরা বুঝব'খন—সুভাষ উঠে পড়ল : আপনি কোথাও যাবেন না কিন্তু। বিকেল পাঁচটার সময় আমরা এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

—তোমরা তো পুলিসের চাইতেও সাংঘাতিক দেখতে পাচ্ছি।

ছেলেরা সবাই হেসে উঠল। তারপর কয়েক পা এগিয়েই আবার মুখ ফেরাল সুভাষ : গ্রামকে আবার নতুন করে গড়ে তুলব দাদা। আপনি হাত বাড়িয়ে দিলে সব কাজ আমাদের সহজ হয়ে যাবে। তাই আপনাকে না পেলে আমাদের চলবে না।

ওরা চলে গেল—চলে গেল খুশি মনে কলরব করতে করতে। যেন মস্ত বড় একটা কাজ করে ফেলেছে—একটা বিরাট সাফল্যের উল্লাসে উল্লসিত হয়ে উঠেছে। বেশ আছে এই ছেলেরা, কত অল্পেই কতখানি পরিপূর্ণ হয়ে যায়। জীবনের যা কিছু অতৃপ্তি, যা কিছু অপূর্ণতা—এখান ওখান থেকে এক মুঠো কুড়িয়ে নিয়েই ওরা তার সব কিছু ভুলতে পারে চরিতার্থ করে!

অপলক ভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল নীতীশ। আর একটা দোলা লেগেছে মনে, আর একটা নতুন মিষ্টি সুরের রেশ রিন্ রিন্ করছে রক্তের ভেতরে। মল্লিকার দিক থেকে যে কাঁটাটা বিঁধে খচ্ খচ্ করছিল একটা সূচিমুখ অস্বস্তির মতো, তার ওপরে একটার পর একটা স্নেহস্নিগ্ধ মধুপ্রলেপ পড়ছে এসে। কাকিমা, সুদাম কাকা, এই ছেলেরা, সেই গান—'পারুল বনের চম্পারে মোর হয় জানা'—

নীতীশের মুখের ওপর অকারণেই একটা রক্তের আভা পড়ল। আজো একবার ঘুরে আসবে নাকি অলকাদের ওখান থেকে? নাঃ, থাক, ভালো দেখাবে না বোধ হয়।

একটা বিশেষ বাড়ির সঙ্গে হঠাৎ অতটা ঘনিষ্ঠতা করবার সঙ্গত তাৎপর্য নেই কোনো।

আরো একটা কথা মনে পড়ে গেল। একবার গেলে হত জেলে পাড়ায়। একবার দেখে আসা উচিত ছিল কেমন আছে রামকেষ্ট—পাড়ায় সন্ধিস্থাপনটাও হয়েছে কিনা।

কিন্তু ওটাও থাক। বেশ লাগছে এই সকালটাকে, দেখতে ভালো লাগছে সকালের রোদে ঝল্‌কে ওঠা মহানন্দার কাকচক্ষু উজ্জ্বল জলকে, দূরে সোনা ফলানো সর্ষেফুলে ভরা মাঠটাকে। এই নিরুদ্বিগ্ন সকালে এখানে এম্‌নি চুপ করে বসে থাকাই ভালো। সমস্ত চেতনার ওপরে যেন মৃদু মধুর একটা নেশার আমেজ লেগেছে, মনে হচ্ছে সকালের রোদে ঘোমটা সরিয়ে প্রসন্ন একখানা ঝলমলে মুখ নিয়ে তার দেশের মাটি তারই দিকে তাকিয়ে আছে।

মিটিংয়ের আয়োজন মন্দ হয়নি।

বৈষ্ণবের গ্রাম—বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের কারবার নেই এখানে। দোলমঞ্চের অঙ্গনটাই এখানকার বারোয়ারীতলা। ঝুলন হয়, রাস হয়, দোল হয়—বৈষ্ণবের আরো দশটা পর্ব-পার্বণ হয়। অবস্থাবান লোকের গ্রাম যোধপুর, তাই অনেক খরচ-পত্র করেই বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে। একদিকে মন্দির—সেখানে নিতাই-গৌরাঙ্গের মূর্তি স্থাপিত। মন্দিরের নীচেই দোলমঞ্চ—আবীরে আবীরে তার নীলাভ সিমেণ্টের রঙ লালচে হয়ে এসেছে—বেদীর খাঁজে খাঁজে গাঢ় রক্তবর্ণের রেখা। তারপরেই মস্ত বড় বাঁধানো অঙ্গন, আর অঙ্গনজোড়া নাট-মন্দির। পাঁচ-সাতশো লোক স্বচ্ছন্দে বসতে পারে সে নাট-মন্দিরে। তার মোটা মোটা থামের গায়ে পটুয়ার হাতের বিচিত্র রেখায় কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকা—কালীয়দমন থেকে শুরু করে বস্ত্রহরণ পর্যন্ত। আবার কাঁধে গালপাট্টাওয়ালা দুই হিন্দুস্থানীর ছবিও আছে, সম্ভবত ওরা কংসের সৈনিক—নতুবা মন্দিরের প্রতিহারী হিসেবে এখানে ওদের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ওপরে ধূলিমলিন একটা ঝাড় লণ্ঠন ঝুলছে, ওটা শুধুই শোভা বাড়াবার জন্মে। যাত্রা কিংবা কীর্তনের আসর যখন বসে তখন গোটাকয়েক পাম্পলাইট এনে জ্বেলে দেওয়া হয়। নাট-মন্দিরের পেছনে ইট-পাথরের একটা অসংলগ্ন স্তূপ প্রায় পাঁচ-ছ হাত উঁচু হয়ে আছে, ওটা বৃন্দাবনের গিরিগোবর্ধন। তবে আপাতত শ্রীকৃষ্ণ ওটাকে ধারণ করে নেই, তাই গোটা দুই কাক নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে ওখানে।

আজ অবশ্য নাট-মন্দিরের চেহারা অন্যরকম। লাল নীল কাগজ কেটে শিকল তৈরি করে চারদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা বিশিষ্ট আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের দ্যোতক। ফটকের বাইরে লাল কাগজের ওপর তুলো এঁটে লেখা হয়েছে 'জাগরণ সংঘ'—স্বাগতম। একটা টেবিল, তাতে দুটো চীনে মাটির ফুলদানিতে কিছু কিছু ফুল আর পাতাবাহার।

খান তিনেক চেয়ার রাখা আছে টেবিলের সামনে। মেজেতে ঢালাও করে ফরাস পেতে দেওয়া হয়েছে—জাগরণ সংঘের সগৌরব অধিবেশন।

লোক কিন্তু বেশি হয়নি। ছেলেছোকরাদের ব্যাপারে যোধপুরের বিচক্ষণ আর ব্যবসায়ী মানুষদের খুব বেশি কৌতূহল নেই, তবে ধরাধরি করে জন পঞ্চাশকে জড়ো করেছে ওরা। বেশির ভাগই স্কুলের ছেলে আর অকর্মার দল, সুদাম কাকার মতো প্রধান ব্যক্তিও দু-একজন আছেন। নীতীশ সসংকোচে সভাপতির আসনে গিয়ে বসল।

সভায় যা যা হওয়ার দরকার সবই হল। উদ্বোধন সঙ্গীত, সভাপতির নাম প্রস্তাব এবং সমর্থন। সংঘের সম্পাদক সুভাষের কার্যবিবরণী পাঠ। ছেলেরা হাততালি দিলে, প্রবীণদের দু-একজন ভ্রুকুটি করলেন।

খুব জোর বক্তৃতা দিলে সুভাষ। যতটা ক্লাবের কথা বললে না, তার চাইতে বেশি ক র বলে গেল নীতীশের কথা। টেবিল চাপড়ে সুভাষ বললে, "এতবড় ত্যাগী, এমন অনন্যসাধারণ কর্মীকে আমাদের ভেতরে ফিরে পেয়ে আজ আমরা ধন্য। যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন দেশ হত, তাহলে এই বিপ্লবীকে সত্যিকারের মর্যাদা আমরা দিতে পারতাম। যে বিদ্রোহী প্রাণের মশাল হাতে নিয়ে একদিন দুঃখের অন্ধকারে যাত্রা শুরু করেছিলেন, আমরা জানি সে মশালের শিখা নেবোনি। আমরা আশা করি তাঁর সেই মশাল থেকে আমরাও জ্বালিয়ে নেবো আমাদের পথ চলবার প্রদীপ—তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেবো ভয়কে জয় করবার আশীর্বাদ।"

জোর হাততালি দিলে ছেলেরা, বললে, এনকোর! কিন্তু বৃদ্ধেরা আবার ভ্রুকুটি করলেন: তাঁদের দৃষ্টি যেন পরিষ্কার বলছিল এতটা ভালো নয়, উচিত নয় জেল-ফেরত একটা সাংঘাতিক লোককে নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা। মশালের শিখার অর্থ তাঁরা বোঝেন না, কিন্তু এটা জানেন আগুনে হাত দিলেই হাত পুড়ে যায় এবং সেই পুড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই সুখের কথা নয়। যতীশ ঘোষকে দেখেই তাঁরা সেটা বুঝতে পারছেন।

সুভাষের বক্তৃতা শেষ হলে দ্বিধাজড়িত পায়ে উঠে দাঁড়ালো নীতীশ। হাতের প্রোগ্রামটার দিকে একবার তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, সমবেত ভদ্রমহোদয়ের মধ্যে কেউ কিছু বলতে রাজী আছেন কি না?

ভদ্রমহোদয় সাড়া দিলেন না।

নীতীশ পুনরাবৃত্তি করলে প্রশ্নটার। বৃদ্ধেরা অপ্রসন্নভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন, চাপা গলায় কী বলাবলি করলেন নিজেদের মধ্যে। তাঁদের মূল্যবান বক্তব্যগুলোকে এখানে অপচয় করবার জন্যে মনের দিক থেকে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে আসেননি। তা ছাড়া নীতীশকে এই সভাপতির আসনে বসানোতে তাঁদের সমর্থন

তো নেই-ই, বরং আন্তরিক একটা প্রতিবাদ আছে।

কিন্তু তাঁদের দলের ভিতরে একটি লোক শুধু সামনে প্রসন্নমুখে শুনে যাচ্ছিলেন সুভাষের বক্তৃতা। লোকটি সুদাম ঘোষ। সুভাষের প্রতিটি কথায় তাঁর চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তাঁর দৃষ্টি বলছিল ঠিক ঠিক। এবারও প্রাচীন দলের ভেতর থেকে তিনিই জবাব দিলেন। হাসিমুখে বললেন, কে আর কী বলবে বাবা, যা হয় তুমিই বলো।

টেবিলে ভর দিয়ে নিজেকে সংযত করে দাঁড়াল নীতীশ। হোক না ছোট এতটুকু সভা, তবু পা কাঁপছে, তবু গলার ভেতরটা শুকিয়ে আসছে। এতগুলো কৌতূহলী মানুষের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে এমন করে পরীক্ষা দেওয়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। ধীরে ধীরে থেমে থেমে সে বলতে আরম্ভ করল। শুধু জাগরণ সংঘের কথা নয়, দেশের কথা, মানুষের কথা। আস্তে আস্তে সংকোচ কেটে গেল, আনন্দে আবেগে তার বুকের ভিতর থেকে কে যেন আপনা থেকেই কথা জুগিয়ে দিতে লাগল। কারাপ্রাচীরের আড়ালে বসে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যে সব কথা চিন্তা করছে, যে আশা আর আশ্বাস—ভবিষ্যতের যে সব নিশ্চিত সঙ্কল্প তার রক্তকে দুলিয়ে দিয়েছে—তাদেরই কথা বলে যেতে লাগল সে। জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল তার চোখ, কাঁপতে লাগল তার গলার স্বর, তার বুকের ভেতর রক্তের প্রবাহ বইতে লাগল দ্রুততালে। এতদিনে যেন মুক্তি পেয়েছে একটা বন্দী ঝর্ণা, সরিয়ে দিয়েছে দীর্ঘ দিনের নিস্তব্ধতার একটা জগদ্দল পাথর। ঘন ঘন করতালি পড়তে লাগল, এমন কি বুড়োরাও আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কথাগুলো ভালো লাগছে না, তবু অপূর্ব একটা মাদকতা আছে তাদের।

এমন সময় হঠাৎ যেন সুরটা কেটে গেল নীতীশের। নাট-মন্দিরের একেবারে পেছনে গিরিগোবর্ধনের আড়ালে মাটিতে হাঁটু পেতে বসে একটা লোক নিবিষ্ট মনে কী লিখে চলেছে। গায়ে তার খাকি রঙের পুলিসী ইউনিফর্ম—পিঠটা উঁচু হয়ে আছে, মনে হচ্ছে একটা চিতাবাঘ যেন শিকারের জন্যে থাবা পেতে বসে রয়েছে।

কেউ লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ। দারোগা মফিজর রহমান সাহেব।

মিটিংয়ের পরেও ঝামেলা মিটতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ছেলেরা তখনও তাকে ছাড়তে চায় না। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো তাদের লাইব্রেরী, নাইট ইস্কুল, এক্সারসাইজ ক্লাব। হাতের একটা পত্রিকা বার করেছে, তার নাম "জাগরণী"। লাল নীল পেন্সিল দিয়ে আর ম্যাপ আঁকবার রং গুলে এঁকেছে প্রচুর কাঁচা হাতের ছবি—পত্রিকাটিকে

লোভনীয় রকমে সচিত্র করে তোলবার চেষ্টায় ত্রুটি হয়নি কোথাও। প্রচ্ছদপট দেখে মনে হল একটা ধানের গোলার পাশে বসে দাড়িওয়ালা একজন সন্ন্যাসী একটা গোখ্‌রো সাপ ধরছেন ; কিন্তু শিল্পী মোহন সলজ্জভাবে বুঝিয়ে দিলে পেছনে ওটা ধানের গোলা নয়, হিমালয় ; উনি দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসী নন, বিস্রস্তবেণী বন্দিনী ভারতমাতা ; আর যেটাকে গোখ্‌রো সাপ বলে মনে হচ্ছে ওটা পরাধীনতার শৃঙ্খল ; ভারতমাতা সাপ ধরছেন না, শৃঙ্খল ছিন্ন করে ফেলছেন।

নীতীশ বললে, বাঃ, খাসা ছবি হয়েছে।

—শুধু বাইরেটাই দেখছেন যে ! ভেতরের লেখাগুলো দেখুন।

নীতীশ পাতা ওল্‌টালো। হ্যাঁ, তারিফ করবার মতো। ছেলেদের প্রতিভা কতদিকে যে বিকশিত হতে পারে তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর ঝলমল করছে বইটির পাতায় পাতায়। 'আমাদের খাদ্য সমস্যা' থেকে শুরু করে 'গীতাঞ্জলির কবি রবীন্দ্রনাথ' পর্যন্ত কোনোটাই বাদ নেই। শেষ প্রবন্ধটা সুভাষের রচনা, এদের দলের মধ্যে সে-ই সবচাইতে বিচক্ষণ আর বিদ্বান ব্যক্তি।

—নীতীশদা, আগামী সংখ্যাতে আপনার একটা লেখা চাই।

—ক্ষেপেছ ! তিনটে কলম ভাঙলেও আমার হাত দিয়ে একটা সেন্‌টেন্স বেরুবে না। ওসব লেখা-টেখা আমার কাজ নয়। তোমরা লিখছ এই ভালো।

—আচ্ছা লেখা না দিন, অন্তত একটা আশীর্বাদ—

—না ভাই, আশীর্বাদ করবার মতো অত গুরুতর লোক এখনও হয়ে উঠিনি। তবে শুভেচ্ছা রইল, ভবিষ্যতে তোমাদের এই কাগজ বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন কিংবা রবীন্দ্রনাথের সাধনার মতো সিদ্ধিলাভ করুক।

ছেলেদের চোখ চকচক করতে লাগল।

নানা কথা, নানা আলোচনা। মিটিংয়ের আরো প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে খালাস পাওয়া গেল ছেলেদের হাত থেকে। মহানন্দার ধার দিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল নীতীশ।

বেলা নেমে আসছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে এলোমেলো ছাপ। মহানন্দার জলে শান্ত ঢেউ কলধ্বনি করছে—বনঝাউয়ের আড়াল থেকে মাছরাঙা আকাশে ডানা মেলছে নীড়ের সন্ধানে। জেলে পাড়াটার দিকে একবার কৌতূহলী জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলে তাকালো সে। একটা কলরব কানে আসছে। আজও কি আবার মারামারি বাধিয়েছে নাকি ওরা ? থেমে দাঁড়ালো পা দুটো।

কিন্তু না। ওটা মারামারির কলরব নয়—গানের কোলাহল। খুব চিৎকার করে ঢোল আর করতাল বাজিয়ে গান ধরেছে ওরা—যতদূর মনে হচ্ছে আল্‌কাপের গান। মৃদু একটা আশস্ত হাসির রেখা ফুটে উঠল নীতীশের ঠোঁটের কোনায়। সংগ্রামের পরে

শান্তিপর্ব চলছে নাকি? তাই সম্ভব।

হঠাৎ সামনে দিয়ে একটা খরগোস কান খাড়া করে ছুটে গেল, লাফিয়ে পার হয়ে গেল সর্ষেফুলে ভরা সম্মুখের মাঠখানাতে। আর অন্যমনস্ক কৌতূহলে সেদিকে তাকাতেই মাঠের আলে আলে পায়ে চলা পথের মসৃণ উচ্চাবচ একটা রেখা পড়ল চোখে, দৃষ্টিটা সেই পথেরই রেখা বেয়ে এগিয়ে গেল, এগিয়ে গেল যেখানে একটা আমের বাগান বিকেলের শ্যামচ্ছায়ায় বিবর্ণ হয়ে আসছে আর তার পেছনে পাওয়া যাচ্ছে লাল রঙের চিলে কোঠাটার আভাস।

অনিশ্চিত ভাবে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল নীতীশ।

বাড়ি ফিরবে কি এখন? কিন্তু কথাটা ভাবতে গিয়েও মনটাকে পীড়িত করে তুলল ক্লান্তি আর শূন্যতা। এই তিন-চারদিনের অভিজ্ঞতায় এ বোধটা নিঃসন্দেহে অর্জিত হয়েছে যে বাড়িতে থাকাটা তার পক্ষে এখন একটা অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন; অশুচি অপবিত্র মন নিয়ে যেমন দেবমন্দির যাওয়া চলে না, তার নিজের বাড়ি সম্পর্কেও এখন সেই রকম একটা প্রস্তুতি দরকার। সেখানে বাহুল্য চলবে না, চটুল আলাপে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাও যাবে না; একটা গভীর আবহাওয়া সেখানে থম থম করছে। এমন কি নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসার চেষ্টাও সেখানে দৃষ্টিকটু। সোনার গৌরাঙ্গের সতর্ক চোখ দিবারাত্র সজাগ হয়ে আছে প্রহরীর মতো। দেওয়ালে "আইনত দণ্ডনীয় গোছের" সরকারী নিষেধের মতো মল্লিকার হাতে করা স্থচের কাজটা জলজল করছে:

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

কিন্তু অতটা কৃষ্ণপ্রীতি নেই নীতীশের। কৃষ্ণপ্রাপ্তি কথাটা সে লৌকিক অর্থেই ব্যবহার করে। আর বাড়ির কথা ভাবলেই শান্ত বিতৃষ্ণা সমস্ত মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এসে। কী হবে এখন বাড়ি ফিরে? যদি ক্লান্ত হয়ে থাকে, সেবাপরায়ণা স্ত্রীর মতো এখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে না মল্লিকা; বাতাস করবে না, এগিয়ে দেবে না পা ধোয়ার জল, সস্নেহে নরম আঙুলগুলি বুলিয়ে দেবে না চুলে-কপালে, তাড়াতাড়ি করে এক পেয়ালা চাও এনে দেবে না।

বরং এখন যে রূপে তাকে দেখা যাবে সে রূপের ওপর আর যারই থাক, নীতীশের দাবি নেই কণামাত্রও। এখন সন্ধ্যাবন্দনা হচ্ছে, রাধা-গোবিন্দের কাছে মল্লিকা বসে আছে; খোল বাজাচ্ছেন পাড়ার পাল মশাই, বেসুরো গলায় যতীশ ঘোষ শুরু করেছেন নরোত্তমের প্রার্থনা-পদাবলী। সমস্ত বাড়িটা ভরে গেছে চন্দনের গন্ধে ধূপের গন্ধে, ফুলের গন্ধে। এখন চোরের মতো অঙ্গন পেরিয়ে তাকে ঘরে উঠতে হবে, নিজের জানলাটার

কাছে বসে থাকতে হবে চুপ করে।

তার চেয়ে—

পাশে চলা আল্-পথের শেষপ্রান্তে আমবাগানের ওপর শ্যামচ্ছায়াটা আরো স্নিগ্ধ, আরো কোমল ভাবে বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে। ওখানে মন্দিরের প্রখর পীড়াদায়ক শুচিতা নেই—আছে শান্তি; আর বিশ্রামের সংকেত। দেবতার দেবায়তন নেই, আছে মানুষের নিশ্চিত নীড়ের আভাস। লাল চিলেকোঠাটায় যেন একটা সুনিশ্চিত হাতছানি।

অতএব—

অতএব সোজা রাস্তা ছেড়ে নীতীশ মাঠের পথে নেমে পড়ল।

বাগান পেরিয়ে বাড়িটার সামনে পৌছতেই ভারি সুন্দর একটা দৃশ্য পড়ল চোখে।

খালি ছাতের ওপরে একমাথা চুল এলিয়ে দিয়ে পেছনে ফিরে বসে আছে অলকা। পিঠের যতটুকু দেখা যায় রাশি রাশি ফাঁপানো চুলে ঢাকা পড়ে গেছে, বোধ হয় মাথা ঘষেছে আজকে। দু কানে দু টুকরো সোনার আভরণ ঝিকমিক করছে দিনান্তিক রৌদ্রচ্ছটায়, দুটি সুডোল সুগোল বাহুর আভাস পাওয়া যাচ্ছে—নিবিষ্ট মনে অলকা কিছু একটা বই পড়ছে।

—এখন আর অত পড়তে নেই, চোখ খারাপ করবে।

চমকে পেছন ফিরল অলকা। হাত থেকে খসে পড়ল বইটা, অর্ধবিন্যস্ত আঁচলটাকে সযত্নে গুছিয়ে নিলে গায়ে। হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ: বাঃ রে, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

—তোমাকে দেখছিলাম। বেশ লাগছিল।

ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক আলো এসে রাঙিয়ে দিলে অলকাকে, নত হয়ে পড়ল অলকার চোখের দৃষ্টি। কিছু একটা জবাব দিয়ে লজ্জার হাত এড়ানো দরকার, কিন্তু ছাতের ওপর থেকে ঝগড়া করাও চলে না। তাই আবার চোখ তুলল অলকা, দু চোখে বর্ষণ করলে তিরস্কার। বললে, বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে হবে না, ভেতরে আসুন।

তারপর জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই চঞ্চল পায়ে অদৃশ্য হয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। প্রফুল্ল মুখে নীতীশ পা বাড়ালো বাড়ির ভেতরে। ডাক দিলে, কাকিমা!

ভেতরের বারান্দায় চশমা চোখে দিয়ে তখনো ডাল বাছছিলেন কাকিমা। অপরিমিত খুশি হয়ে মুখ তুললেন, বললেন, এসো বাবা, অনেক দিন বাঁচবে।

—হঠাৎ এ আশীর্বাদ কেন কাকিমা?

স্নেহসিক্ত স্বরে কাকিমা বললেন, হঠাৎ কেন, এ আশীর্বাদ তো সব সময়েই করি

বাবা। আর এক্ষুনি ভাবছিলাম পাগ্‌লা ছেলেটাকে আজ দুদিন দেখিনি কেন।

নীতীশ কাকিমার কাছে এসে বসে পড়ল: আমিও ডাল বেছে দেব কাকিমা?

কাকিমা বললেন, থাক থাক। ডাল তুমি বাছবে কোন্ দুঃখে। অনেক বড় বড় কাজ যে তোমায় করতে হবে, আমরা তো তোমারই মুখ চেয়ে আছি।

নীতীশ অভিভূতভাবে চুপ করে রইল। প্রথম দিন থেকেই কাকিমার মুখে এ কথাটা সে শুনে আসছে। তাকে বড় কাজ করতে হবে, করতে হবে অনেক কাজ। সে কাজের রূপটা কী, তার সত্যিকারের পরিণতি কোথায়, এ সম্পর্কে হয়তো কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই কাকিমার; কিন্তু স্নেহ আছে, শুভেচ্ছা আছে, আন্তরিকতার মধু যেন ক্ষরিত হয়ে পড়ে তাঁর প্রত্যেকটি কথা থেকে। আর এই কথাগুলো শুনলে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তার মা নেই, মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মাকে হারিয়েছে সে।

একটা মধুর স্তব্ধতা কিছুক্ষণ ঘিরে রইল দুজনকে। বাতাসে যুঁই ফুলের গন্ধ। মনে পড়ল বাড়িতে ধূপধুনোর গন্ধের কথা, কেমন শ্বাসরোধ হয়ে আসে, বুকের ওপর ভারী একটা কিছুর চাপ পড়বার মতো কেমন একটা কষ্ট হতে থাকে। এর সঙ্গে তার কত প্রভেদ!

নীতীশ বললে, আমাকে দিয়ে কিছু হবে না কাকিমা, মনে হচ্ছে আমি একটা

কাকিমা একখানা হাত তুলে সস্নেহে বুলিয়ে দিলেন মাথায়। বললেন, ষাট্ ষাট্, সোনার টুক্‌রো ছেলে।

পেছন থেকে অলকার হাসির শব্দ বেজে উঠল।

হুঁ, চমৎকার ছেলে, দিব্যি আমার মায়ের আদরটুকু কেড়ে নেওয়া হচ্ছে!

নীতীশ মুখ ফেরালো। দৃষ্টি মিলল অলকার উজ্জ্বল গভীর চোখের সঙ্গে: তোমার হিংসে হচ্ছে নাকি?

—হওয়াই তো উচিত। আমার মায়ের আদরে কেউ ভাগ বসালে আমার হিংসে হবে না?

তিরস্কারের স্বরে কাকিমা বললেন, মেয়ের আবার হিংসে কিসের? দুদিন বাদে পরের ঘরে চলে যাবি, ডাকলে আসতে চাইবি না। তখন এই ছেলেরাই আমায় দেখবে, তা জানিস?

অলকা প্রতিবাদ করলে: যা তা বোলো না।

—কেন বলব না? বড় হয়েছিস, বিয়ে তো দিতেই হবে—

—তুমি ভারী অসভ্য মা—অলকা পালিয়ে গেল। আলতাপরা টুকটুকে একখানা পা চোখে পড়ল দোরের আড়ালে, শোনা গেল: নীতুদা, আমার পড়ার ঘরে

আসবেন।

কাকিমা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন: ওই একটা মেয়ে—কার হাতে যে দেব তাই ভাবি। তোমার মতো একটি ছেলে যদি—

নীতীশের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, চমক খেল হৃৎপিণ্ডটা। আর কথাটা শেষ না করেই কাকিমাও থেমে গেলেন। এই স্নেহগভীর মুহূর্তটা, এই মধুর আবেগ, কয়েক মুহূর্তের জন্য মনের নিগূঢ় কামনাটাকে যেন নাড়া দিয়ে তুলেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বাস্তব পৃথিবীটা স্মরণ করিয়ে দিলে সে হয় না, সে হওয়া সম্ভব নয় আর। লোহার প্রাচীর সেখানে।

কাকিমা বললেন, চা খাবে একটু ?

প্রসঙ্গটা বদলে যেতে কেমন স্বস্তিবোধ করলে নীতীশ, জোর করে হাসবার চেষ্টা করলে: পেলে তো ভালোই হয় কাকিমা। বকে বকে গলা কাঠ হয়ে গেছে আমার।

—তা হলে তুমি লোকার পড়ার ঘরে যাও, আমি চায়ের যোগাড় দেখি।

—সুদামকাকা বুঝি এখনো ফেরেননি ?

—এসেছিল, তারপর পাশা খেলতে বেরিয়ে গেল হলধর ঘোষের ওখানে। ওই এক নেশা, সন্ধ্যে হলে আর ঘরে থাকতে পারে না।

কাকিমা উঠে পডলেন: যাও, তুমি ঘরে গিয়ে বোসো। আমি চা করে আনি—

কুলোটা হাতে করে কাকিমা চলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

নীতীশ অলকার পড়ার ঘরে এসে ঢুকল। ছোট টেবিলের ওপরে দুধের মতো সাদা গোল চিম্‌নির একটা ল্যাম্প আলো ছড়াচ্ছে। মন দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কী যেন লিখছে অলকা। নীতীশের পায়ের শব্দ কি সে শুনতে পেল না ? না, শুনেও না শোনবার ভান করল ?

কী হচ্ছে ?

মুখ তুলে এক টুকরো চাপা হাসি হাসল অলকা। বললে, একটা জ্বালাময়ী রিপোর্ট লিখেছি।

হাসি এবং কথার সুরটা সন্দেহজনক। নীতীশ প্রশ্ন করলে, কিসের জ্বালাময়ী রিপোর্ট ?

—একটা প্রচণ্ড বক্তৃতার। জাগরণ সংঘের সভাপতির অভিভাষণ। খবরের কাগজে পাঠিয়ে দেব।

—ঠাট্টা হচ্ছে, না ?—নীতীশ পাশের চেয়ারটাতে বসল এসে: তুমি কি মিটিঙে গিয়েছিলে নাকি ? কই, দেখলাম না তো সেখানে ?

—দেশটাকে এর মধ্যেই ভুলে গেছেন নীতুদা ? মনে নেই, এটা ঘোষপুর, কলকাতা

নয় ? এখানে মেয়েরা চিকের আড়ালে বসে কৃষ্ণযাত্রা দেখতে পারে কিন্তু জাগরণ সংঘের মিটিঙে যেতে পারে না। দেশ এখনও অত এগোয়নি।

নীতীশ হালকা ভাবে বললে, দেশ না হয় এগোয়নি, কিন্তু তুমি তো এগিয়েছ। একবার না হয় নতুন কিছু একটা করেই দেখতে।

অলকার চোখের দৃষ্টি বদলে গেল : লাভ কী ? নতুন কিছু করতে হবে বলেই অকারণ অকাজ বাধিয়ে তো কোনো ফল হবে না।

—তার মানে ?

মানে ?—অলকা আবার চাপা ঠোঁটে হাসল : আপনি আপাতত জাগরণ সংঘের সভাপতি, কথাটা শুনলে ব্যথা পাবেন।

—ব্যথা পাবো ? কেন ?—নীতীশ আশ্চর্য হয়ে বললে, এর সঙ্গে জাগরণ সংঘের সম্পর্ক কী ?

—সম্পর্ক এই যে আপনার জাগরণ সংঘের ওপরে আমার কোনো শ্রদ্ধা নেই।

নীতীশ আহত হল, কথাটা অপ্রত্যাশিত লাগল কানে।

—কেন ? গ্রামের ছেলেরা উৎসাহ করে একটা প্রতিষ্ঠান গড়েছে, উদ্দেশ্যও ভালো, তাদের এভাবে ছোট করে দেখছ কেন ?

—তা হলে তর্ক করতে হবে আপনার সঙ্গে—অলকা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো : দাঁড়ান, তার আগে দেখে আসি আপনার চায়ের কতদূর। অনেক বকে এলেন, একটু রিলিফ অন্তত আপনাকে দেওয়া দরকার।

চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অলকা।

নীতীশের চোখ গেল টেবিলের দিকে। সামনেই একখানা সাদা কাগজ, তারই ওপরে এতক্ষণ আঁকিবুঁকি করছিল অলকা। কৌতূহলভরে নীতীশ ঝুঁকে পড়ল, চোখে পড়ল একটা অসমাপ্ত বকের ছবি, গোটা কয়েক এলোমেলো পেন্‌সিলের টান, অস্পষ্ট ভাবে লেখা 'নীতীশদা' আর পরিচ্ছন্ন হাতের অক্ষরে একটি কবিতার লাইন :

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি—"

কাগজের ওই এলোমেলো লেখাগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল নীতীশ, চোখ ফেরাতে পারল না। হয়তো এগুলো নিতান্তই অর্থহীন খেয়াল—অবসর মুহূর্তে, কোনো একটা ভাবনার স্পষ্ট নিশ্চিত রূপ মনের মধ্যে না থাকলে মানুষ কাগজের ওপর এমন কত কথারই তো দাগ কাটে। কিন্তু—কিন্তু—তবুও! হঠাৎ লোভী হয়ে ওঠা নীতীশের মন বললে, কোথাও কি কোনো যোগসূত্র আছে আবছা ভাবে লেখা তার নামটি আর তার সঙ্গে ওই কবিতার লাইনটির ?

একটু আগেই কাকিমার কথায় বুকের মধ্যে যে দোলা জেগে উঠেছিল এখনো তা

সম্পূর্ণ শান্ত হয়নি, এখনো রক্তের মধ্যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারের মতো সেটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাকিমার মনের যা প্রচ্ছন্ন কামনা—জীবনে তা সম্ভাব্যতার সীমারেখার বাইরে। কিন্তু যা অসম্ভব বলে আপাত মুহূর্তে মনে হয় তা কি সত্যিই অসম্ভব? পরস্পরের জীবন থেকে যখন পরস্পরের প্রয়োজন একান্ত ভাবেই সমাপ্ত হয়ে গেছে, তখনো কি তার জের টেনে চলতে হবে, চলতে হবে নিরর্থক একটা অবাস্তবতার বোঝা বয়ে?

এল আত্মবিস্মৃতি, জ্বরের মৃদু উত্তাপের মতো একটা স্নায়বিক উত্তেজনা অসুস্থ চঞ্চলতা সঞ্চার করতে লাগল শরীরের ভেতরে। কপালে ঘাম জমে উঠল, কাঁপতে লাগল হাতের আঙুলগুলো। ধূপ, ধুনো আর সোনার গৌরাঙ্গের প্রহরায় আজ মল্লিকা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে। শুচিস্মিতা দেবদাসীর দিকে দূর থেকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা চলে কিন্তু সেই সঙ্গে এও অনুভব করা যায় সে স্পর্শনীয়ও নয়; মাটির পৃথিবীর সহজ দাবিতে তার কাছে এগিয়ে যাওয়া চলবে না, মলিন করা চলবে না তার নিষ্কলুষ মহিমাকে।

ছাতের ওপরে বেলাশেষের আলো। আরক্ত নীলিম আকাশের বর্ণবিলসিত পশ্চাদ্‌পটে অলকাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। গলার সরু হারের রেখার সূক্ষ্ম বেষ্টনী জ্যোতির্মণ্ডলের মতো বিস্তীর্ণ হয়ে আছে। কাকিমা বলছিলেন—

ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কী পাগলামী হচ্ছে এসব। নিজের কাছে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে হতে লাগল নীতীশের। কোনো কি অর্থ হয় এইসব মূল্যহীন ভাবনার, এই সব শূন্যতা বিচরণের? তার চেয়ে যা আছে, সেই ভালো। সহজ উজ্জ্বল সম্পর্কের ভেতরে কী লাভ অবাঞ্ছিত ছায়াপাত করে, জটিলতার গ্রন্থি যোজনা করে? তা ছাড়া এই কি তার কাজ এখন? বারো বছর পরে জেল থেকে বেরিয়ে এসে এই মূল্যহীন অন্তর্দ্বন্দ্ব?

অলকা চা নিয়ে এল।

—শ্রদ্ধেয় সভাপতি মশাই?

হৃৎপিণ্ডের ভেতরে ছলাৎ করে উঠল নীতীশের। মুখের ওপরে এক ঝাঁক রক্তের কণা আছড়ে পড়েছে।

—জাগরণ সংঘের সভাপতি কি সম্প্রতি ধ্যানস্থ?

জোর করা সহজ গলায় নীতীশ বললে, ভারী ফাজিল হয়েছ তো। খুব কথা শিখেছ।

—লেখাপড়া শেখবার সুযোগ পেয়েছি, একটু কথা শিখব না?—মুখ টিপে হাসল অলকা: ওটুকু মার্জনীয়। তা চা পানটা হয়েই যাক—ঠাণ্ডা করে লাভ কী?

পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে দিয়ে একটা টুল টেনে বসল অলকা।

—সত্যি, কী এত ভাবছিলেন বলুন তো?

চায়ে চুমুক দিয়ে নীতীশ বললে, সব কথা কি ছেলেমানুষের শুনতে আছে?

—তাই নাকি?—অলকা হাসল: নিজেকে যতটা প্রবীণতার সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, আপনারও কি ততটাই পাওনা বলে মনে করেন?

নীতীশ চটে বলল, ওই জন্যেই তো মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে নেই। এমনিতেই কথা বলার আর্টটা কবচ-কুণ্ডলের মতো নিয়ে জন্মেছে, তারপর দু পাতা বই পড়লেই দুর্দান্ত বক্তিয়ার।

—হুঁ:, ঘা লাগবার কারণ আছে। এতদিন কথা বলাটা আপনাদেরই একতরফা ছিল, এবার সে আসনটা নড়ে উঠেছে কিনা।

—নাঃ, তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না—নীতীশ অসহায় ভাবে বললে, তোমার সঙ্গে ডিবেট্ করবার জন্যেই আমাকে এ ঘরে ডেকে এনেছ নাকি?

—নিশ্চয়, তর্ক করার জন্যেই তো।

—সেটা কি নারী প্রগতি সম্পর্কে?

—না। ও তো একশো বছরের পুরোনো। মরা পুরুষদের ওপর খাঁড়ার ঘা দিতে আমার দয়া হয়।

—তাই নাকি!—নীতীশ হেসে উঠল: যাক, আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে আর সংশয় নেই তা হলে। কিন্তু দয়াময়ী, তর্কটা তবে কিসের ওপর?

—আপনাদের ওই জাগরণ সংঘ।

—সর্বনাশ!—এত জায়গা থাকতে শেষে বেচারা জাগরণ সংঘের ওপর? গ্রামের ছেলে, জোট করে একটা প্রতিষ্ঠান গড়েছে, উদ্দেশ্যও নেহাৎ খারাপ নয়। ওদের ওপরে হঠাৎ এত খড়্গহস্ত হয়ে উঠলে?

—রাগ আমার ওদের ওপরে নয়। জাগরণ সংঘ প্রাণপণে জাগবার চেষ্টা করুক, তাতে আমার কিছুই আসে যায় না!

—তা হলে?

অলকা আস্তে আস্তে জবাব দিলে, আমার আপনার ওপরেই রাগ হয়।

—আমার ওপরে?

—নিশ্চয়।

—কিন্তু কারণটা?

একবার নীতীশের দিকে তাকিয়েই অলকা চোখ নামিয়ে নিল: কষ্ট হয় এই জন্যে যে আপনি নিজেকেই ঠকাচ্ছেন।

নীতীশ সন্দিগ্ধ অলকাকে বললে, তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ বুঝতে পারছি না।

অলকা অন্যমনস্ক ভাবে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তাকিয়ে রইল কালো হয়ে আসা মহানন্দার তটরেখার ওপরে উড়ন্ত গাংশালিকের ঝাঁকের দিকে। তারপর মৃদু একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, আপনি কি শেষ পর্যন্ত ওই জাগরণ সংঘেই নিজের জায়গা বেছে নিতে চান ?

নীতীশ বললে, ধরো তাই যদি করি, ক্ষতি কী তাতে ?

—লাভ কিছুই নেই !

—একথা কেন বলছ ?

অলকা তেমনি অন্যমনস্কভাবে বললে, আপনি বিপ্লবী। কিন্তু বিপ্লবের অর্থ কি জোড়াতালি ?

—ঠিক বুঝতে পারছি না।

অলকা কী একটা ভাবছিল। নীতীশের দিকে তাকিয়ে ছিল বটে কিন্তু নীতীশের পাশ দিয়ে তার দৃষ্টি ক্রম-শ্যামায়মান বাইরের বাগানটাতে সঞ্চারিত হয়ে ফিরছিল। আত্মমগ্ন ভাবে অলকা বললে, আপনার কাছ থেকেই কথাটা শুনতে চাই। জাগরণ সংঘের ভেতর দিয়ে আপনি কী করতে চান ?

—গ্রাম সংগঠন !

—সে কী রকম ?

—লাইব্রেরী,ফ্রী স্কুল।

—আর ?

—সবদিক থেকে গ্রামোন্নয়ন।

—অর্থাৎ, একটা আদর্শ পল্লী গড়ে তুলতে চান—এই তো ?

—অনেকটা।

অলকা মৃদু হাসল : পারবেন না।

—কেন ?

—এ চেষ্টা অনেকেই তো করেছে। যদি সম্ভব হত তা হলে বাংলা দেশের সমস্ত গ্রামগুলোই অনেক আগে আদর্শ পল্লী হয়ে গড়ে উঠত।

তর্ক করবার নেশায় নীতীশ চেয়ারের ওপরে পিঠ খাড়া করে উঠে বসল। মনের সে আচ্ছন্নতা কেটে গেছে, অলকার বলার ভঙ্গিতে যে খোঁচাটুকু আছে তা আহত করে তুলেছে পৌরুষের অভিমানকে। নীতীশ জোর দিয়ে বললে, তাদের নিষ্ঠা ছিল না, তারা পারেনি।

অলকা তেমনি মৃদু হাসিতে বললে, কথাটা ঠিক হল না তবু মেনে নেওয়া গেল।

স্বীকার করছি আপনার নিষ্ঠা আছে, আপনি পারবেন! কিন্তু এর বেশি কি আর কিছু করবার নেই?

—আছে বইকি।—নীতীশ উত্তেজিত হয়ে উঠল: এখানে এসে বুঝেছি, কাজের শেষ নেই। ছেলেদের অবস্থা দেখলাম, চাষাদের দৈন্যদশাও দেখেছি। এদের সব কিছুর প্রতীকার করা না পর্যন্ত কাজের কিছুই হতে পারে না।

—অতবড় কাজ জাগরণ সংঘ পারবে?

—নিশ্চয়ই পারবে।

—কী উপায়ে?

নীতীশের উত্তেজনা ক্রমশ বেড়ে উঠতে লাগল: দেশকে স্বাধীন করবার ভেতর দিয়ে।

—চাষাভুষোরা নিশ্চয়ই স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করবে?

—করবে বইকি।

অলকা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল: না—করবে না।

—করবে না?

—না।

—এ তোমার মিথ্যে সন্দেহ।

অলকা শান্ত স্বরে বললে, সন্দেহ নয়, মিথ্যেও নয়। এ সত্যি। আর—

—আর? থামলে কেন?

অলকা কৌতুকভরা চোখে নীতীশের দিকে তাকালো: ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?

—নির্ভয়েই বলো।

—আপনি নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছেন—দেশকে ফাঁকি দিচ্ছেন। বিপ্লবীকে হাতুড়ে হোমিওপ্যাথি করতে দেখলে শুধু তার জন্যেই কষ্ট হয় না, দেশের জন্যেও দুঃখ হয়।

নীতীশ সবিস্ময়ে বললে, হোমিওপ্যাথি?

—তা ছাড়া আর কী? বাড়িতে হোমিওপ্যাথির একটা বাক্স রেখে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করলে আত্মতৃপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু ডাক্তার নিজেই জানে তার কানা-কড়িরও মূল্য নেই।

ক্ষুব্ধভাবে নীতীশ বললে, আক্রমণটা টের পাচ্ছি কিন্তু কথাগুলো শোনাচ্ছে বিশুদ্ধ হেঁয়ালির মতো। আর একটু পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই।

—আপনি কর্মী—দেশের জন্যে আপনি অনেক করেছেন।—অলকার কণ্ঠে একটা অস্ফুট বেদনার আভাস পাওয়া গেল: তবু কেন আপনি বিশ্বাস করেন যে শুধু গ্রাম-

সংস্কার, অথবা শুধু একটা মাত্র গ্রামের মানুষকে নাড়াচাড়া দিয়ে সমস্ত দেশজোড়া ব্যাধির প্রতীকার করতে পারবেন ?

—আস্তে আস্তে এর গতি বাড়বে।

—কখনোই বাড়বে না। সমস্ত চেষ্টা একদিন আপনা থেকে শুকিয়ে মরে যাবে। আর সেদিন আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন, বিরক্তিতে মন ভরে উঠবে। ফলে দেশের কোনো লাভ হবে না, আপনিও বৃথা পরিশ্রমের জন্যে অনুতাপ করবেন।

—তুমি শুধু প্রতিবাদই করছ। কিন্তু কী করা যাবে তা তো বলছ না ?

এবার অলকা মিষ্টি সুরে হেসে উঠল : কী আশ্চর্য, আমি কী করে বলব আপনাকে ? আপনারা দেশের জন্য কাজ করেছেন, কত বড় আপনারা, কত আপনাদের অভিজ্ঞতা। আপনারাই তো বোঝাবেন আমাদের। আমরা শুধু আপনাদের কাছ থেকে শিখতে চাইছি।

—বেশ বলো, আরো কী শিখতে চাও।

—সমস্ত শরীরটাই যখন অসুস্থ, তখন মাথার একটা একটা চুল নিয়ে কী চিকিৎসা চালাবেন আপনি। সারা শরীরের কথাই কি ভাবা উচিত নয় ?

নীতীশের চোখ এবার জলজল করে উঠল : আমি বুঝেছি, তুমি কী বলতে চাও। কিন্তু এক জায়গা থেকে তো শুরু করতেই হবে।

—তা হবে।—কিশোরী মেয়ে অলকার সমস্ত মুখে যেন একটা প্রবীণ অভিজ্ঞতার পরিচ্ছন্ন দীপ্তি খেলা করতে লাগল : শুরুতেই আপনি ভুল করছেন বোধ হয়। একা এভাবে কিছুই হবে না। আপনি হাজার চেষ্টা করুন, জেলেদের চাষীদের দুঃখ মিটবে না, গ্রামের মানুষদের মন থেকে এতদিনের কুসংস্কারও মুছে যাবে না।

—তা হলে ?

—তা হলে সবসুদ্ধ ঘা দিতে হবে। ভারতবর্ষকে বাদ দিয়ে যোধপুর স্বাধীন হতে পারবে না। চল্লিশ কোটি মানুষের হিসাব না রেখে তিন হাজার মানুষের ভেতরে বিপ্লব অসম্ভব। যে কাজের ভেতর দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন আপনারা, তার পরিণতিও তো চোখেই দেখেছেন। বিপ্লবের পেছনে অনেকখানি সংগঠন চাই, অনেক বড় আয়োজন চাই। সব সমস্যার মূল সেইখানেই আছে। যদি তাকে ধরতে পারেন তা হলে ভারতবর্ষ থেকে যোধপুরকে আর আলাদা করে দেখবার দরকারই হবে না নীতুদা।

নীতীশ চুপ করে রইল। ঝোঁকের মাথায় যে তর্ক শুরু করেছিল, এতক্ষণ পরে টের পেল সে ঝোঁকটা কখন থেমে গেছে তার, কখন থেকে সে শুধু আশ্চর্য অভিভূতভাবে অলকার দিকে তাকিয়ে আছে। সতের-আঠারো বছরের একটি মেয়ে—বিশেষ করে যোধপুর গ্রামের মেয়ে টিপসই করার বেশি বিদ্যে বারো বছর আগেও যাদের ছিল না।

অথচ কী চমৎকার কথা বলে যাচ্ছে অলকা—সহজ ভাষায় তর্ক করে যাচ্ছে, প্রশ্ন তুলছে, উত্তর দিচ্ছে। শেষের দিকে তার সব কথাগুলো নীতীশের ভালো করে কানেও আসছিল না। অলকা আশ্চর্য, অলকা অদ্ভুত, সে পাথরে গড়া মূর্তির মতো নিষ্প্রাণ মল্লিকা নয়।

হঠাৎ অলকাও লক্ষ্য করল। লক্ষ্য করল নীতীশ তার কথা শুনছে না, তাকে দেখছে। তারপর দৃষ্টিতে আচ্ছন্নতার একটা কুয়াশা সঞ্চিত হয়ে আসছে লঘুসঞ্চারে।

লজ্জিত অপ্রতিভ গলায় অলকা বললে, না, থাক ওসব। আপনি ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, খালি খালি খানিকক্ষণ বাজে বকালাম আপনাকে।

নীতীশ একটা মস্তবড় নিশ্বাস চেপে নিলে বুকের মধ্যে: কিছু না, তোমার কথা শুনছিলাম।

—আমি ভারী বকবক করি আজকাল, বিশ্রী স্বভাব হয়ে গেছে না—অলকা যেন নিজে ত্রুটিটাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করল: ওসব থাক। কাল একবার আসবেন?

—কেন বলো দেখি? বাকি তর্কটা শেষ করতে চাও?

ভারী স্নিগ্ধভাবে হাসল অলকা: না, আর নয়। কাল রাত্রে যে আমি চলে যাব।

—চলে যাবে?—নীতীশের বুকের ভেতরে ধক্ করে একটা ঘা লাগল: কোথায় যাবে?

—বাঃ, মালদয়। পরশু আমার স্কুল খুলবে যে।

নীতীশের মুখে বেদনার ছায়া পড়ল: আবার কবে আসবে?

—ছুটি হলে।

—ও:—হঠাৎ নীতীশ উঠে দাঁড়ালো: আচ্ছা চলি আজ।

—বাঃ—এক্ষুনি?

—রাত বাড়ছে।

—কাল আসবেন তো?

—বলতে পারি না—অনাসক্তভাবে জবাব দিলে নীতীশ।

মুহূর্তে মুখের ওপর থেকে আলো নিভে গেল অলকার। ব্যথা আর অভিমান ছায়া ফেলেছে সমস্ত চেতনার ওপরে। এই তর্ক করবার জন্যই কি রাগ করেছে নীতুদা—মনে করেছে অলকা তাকে তুচ্ছ করতে চায়, অবজ্ঞা করতে চায়?

—আপনি কি রাগ করলেন?

—না।

পেছন ফিরে একবার না তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নীতীশ। একটা তীব্র বিরক্তির উচ্ছ্বাস তার মনের মধ্যে ক্রমাগত ঘা দিয়ে বলছে, অকারণ একটা নির্বোধের মতো সে এতক্ষণ এখানে বসে কাটিয়েছে, নষ্ট করেছে তার অতি মূল্যবান সময়। শুধু

মল্লিকাই দেবদাসী নয়, অলকাও। বুকের ভেতরে মাতলামি জাগিয়ে দেবে, কিন্তু ধরা দেবে না, যখন খুশি নিজের পথ বেয়ে এগিয়ে চলে যাবে। পেছনে যে ব্যর্থতাকে তুচ্ছ করে ফেলে এল, একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলবে না তার জন্যে।

নীতীশ চলে গেলে অলকা চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। কেমন একটা কষ্ট হচ্ছে—বেদনা বোধ করছে নিজের ভেতরে। নীতীশ যেন আহত হয়েছে, অপমান বোধ করছে অকস্মাৎ। কিন্তু কেন? হঠাৎ তার ওভাবে উঠে চলে যাওয়ার সত্যিকারের অর্থটাই বা কী?

পেন্‌সিলটা তুলে নিয়ে কাগজের ওপরে এলোমেলো দাগ কাটল আরো কিছুক্ষণ। এইটেই অভ্যাস, যখন কিছু ভাবে তখন আঙুলগুলো তার অশান্ত হয়ে এমনিভাবে আঁচড় কেটে চলে। একটা ছোট ফুল আঁকতে আঁকতে অলকা ভাবতে লাগল, কোথায় যেন একফালি মেঘ জমেছে।

কী মেঘ, কিসের মেঘ? একটা জিনিস বুঝতে পেরেছে, নীতীশকে খোঁচা দিতে বিচিত্র একটা আনন্দ আছে, আছে একটা মধুময় আস্বাদ। মানুষটাকে নিয়ে কেন খেলা করতে ভালো লাগে, ভালো লাগে তাকে শুধু শুধু চটিয়ে দিতে? অকারণ কৌতুকে জাগরণ সংঘের সভাপতির মতো গুরু-গম্ভীর মানুষটাকে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে খুশির হালকা বাতাসে। আর শুধুই কি জাগরণ সংঘের সভাপতি? সত্যিকারের বিপ্লবী সৈনিক, আন্দামানের পাষাণ-প্রাচীরের আড়ালে বারো বছর কাটিয়ে সে নিয়েছে তার জীবন-সাধনার আগ্নেয়দীক্ষা।

কিন্তু একি শুধুই অকারণ কৌতুক?

অলকা অল্প একটু হাসল। বাঁকা পাতলা ঠোঁটে হাসির ভঙ্গিটা সঞ্চারিত হয়ে রইল একটা স্নিগ্ধ আনন্দের মতো। একথা সত্যি যে আধুনিক কাল এসে ছোঁয়া দিয়েছে তারও মনে, তারও জীবনের কাছে এগিয়ে এসেছে মহাপৃথিবীর সামগ্রিক জীবনের দাবি। আধুনিক কথাটার অর্থ পাঁচ বছর আগে যা ছিল তা আজ আর নেই। একদিন আধুনিকতা ছিল অসংকোচে পথে নামায়—আজকের আধুনিকতা চলতি পথের বিক্ষুব্ধ মিছিলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ায়; সেদিনের আধুনিকতায় ছিল ওপরতলায় স্বচ্ছন্দসঞ্চারী মধুলেহীর স্বপ্ন, আজকের আধুনিকতা নীচের তলায় মানুষগুলোর সঙ্গে মিলে সুস্থ স্বাভাবিকতায় বাঁচবার দাবিতে সেই স্বপ্নচারণার কঠিন প্রতিবাদ!

সে প্রতিবাদকে গ্রহণ করেছে অলকা। আর তার জন্যে তাকে তৈরি করেছে সহপাঠিনী বীণা। থার্ড ক্লাসে পড়বার সময় আলাপ হয়েছিল বীণার সঙ্গে। কালো মেয়ে, পড়াশুনোয় মাঝারি, অঙ্কে প্রায়ই গোল্লা পায়। অথচ ওই তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে কী অদ্ভুত ঝকঝকে আর জ্বলজ্বলে! এতটুকু বয়েসে এত পড়েছে, এত ভাবতে

শিখেছে! অলকা আশ্চর্য হয়ে ভাবত ক্লাসে কেন ফার্স্ট হয় না বীণা?

কিন্তু ফার্স্ট হবে কী করে? পড়াশুনোর বালাই থাকলে তো? অর্ধেক দিন তো ইস্কুলেই আসে না। যেখানে যা কিছু সভা-সমিতি হোক ওই মেয়েটি একটা মোটা ফিতে আঁটা মস্ত একটা ক্যাম্বিশের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির। হেড মিস্ট্রেস একবার ডেকে ওয়ার্নিংও দিলেন: যদি সে এসব করে বেড়ায় তা হলে ইস্কুল থেকে তাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হবে।

সেই থেকেই অলকা আকৃষ্ট হল বীণার সম্পর্কে। পরিচয় হল, বন্ধুত্ব হল। তারপর—হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল। যেন অন্ধকার একটা বন্ধ ঘরের মস্ত একটা জানালাকে কেউ খুলে দিলে চোখের সামনে। এল আলো—নতুন কালের নতুন সূর্যের রাশি রাশি আলো এসে ঘুমন্ত চোখ দুটিকে পদ্মকলির মতো ফুটিয়ে দিলে। আর নতুন জাগা চোখ দিয়ে একটা অপরূপ দেশের ছবি দেখল অলকা। অনেক রক্ত, অনেক ক্ষতির ভেতর দিয়ে সেই দেশের দিকে এগিয়ে চলতে হবে। তারপর যখন পৌঁছানো যাবে—এবং সেদিন হয়তো খুব দূরেও নয়—তখন দেখা যাবে আজকের দিনের যা কিছু মিথ্যা যা কিছু অপমান, যত কিছু গ্লানি—সেই রোদের ধারালো তলোয়ারে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে মিলিয়ে গেছে শীতের কোনো ভোরের আড়ষ্ট পাণ্ডুর একরাশ পীতাভ কুয়াশার মতো।

এই তো পথ, এই তো জীবন!

পড়াশুনো শুরু হল। বীণার যোগাযোগে আরো অনেককে পাওয়া গেল। নিয়মিত পড়ানোর ক্লাসে যোগ দিতে আরম্ভ করল অলকা। আজ স্কুলের 'ছাত্রী ফেডারেশনের' সেক্রেটারী সে, বিস্তর কাজ তার, বহু দায়িত্ব।

একথা যোধপুর গ্রামের কেউ জানে না, সুদাম ঘোষও না। গ্রামের মেয়ে গ্রামে এসে নিরীহ আর লক্ষ্মী হয়ে থাকে। আত্মপ্রকাশ করে না, করতে চায় না। কিন্তু নীতীশের সংস্পর্শে এসে সে তো আর নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারেনি। যেন মস্ত একটা শক্তির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বেরিয়ে এসেছে খাপের ভেতর থেকে একখানা ধারালো ছোরার মতো।

কেন এমন হল?

কারণটা এখন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল অলকার মনের সামনে। নিজের ভেতরে যে আলো জ্বলেছে, সে আলো সে জ্বালিয়ে দিতে চায় সকলের ভেতরেও। যে সত্যকে একান্ত বলে জেনেছে তাকে সতেজ সবল কণ্ঠে প্রকাশ করবার জন্যে টগবগ করে ফুটছে সমস্ত মন।

তাই অপচয় সহ্য হয় না, সইতে পারা যায় না। অকারণ শক্তির অপব্যয়। নীতীশদার ভেতরে যে শক্তি, যে পৌরুষ আছে তা কেন ওভাবে আবর্তিত হবে এই ছোট গণ্ডির সংকীর্ণতার আড়ালে, বৃত্তাকার আত্মতৃপ্তির তুচ্ছতায়?

গ্রামের ভালো করা, নাইট ইস্কুল করে চাষার ছেলে মেয়েদের উন্নতি করা, চরকা ঘোরানো আর তাঁত বসানো, অনাথ-আশ্রমে ছেলে মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ করা, পচা পুকুরে নেমে কচুরীপানার উদ্ধার সাধনা! এক সময় অলকার মনে হয়েছিল এই হল সত্যিকারের দেশের কাজ, এর চাইতে পুণ্যকর্ম আর কিছু বুঝি হতে পারে না। কিন্তু বীণা তার ভুল ভেঙে দিল।

বীণা বলেছিল, এ তো ঢের হয়েছে, কিন্তু কী হল এতে?

—কিছুই হয়নি।

—কেন?

—কেন আবার কী? সুশীলদা সেদিন কী বলেছেন শুনিসনি? দুদিন পরেই চরকা ঘোরানো বন্ধ হয়, তাঁত ভেঙে পড়ে, নাইট ইস্কুলে ছাত্র জোটে না, পুকুরে আবার এসে জড়ো হয় কচুরিপানা। আঁজলা করে বানের জল সরিয়ে দেওয়া যায় না।

—তবে কী করতে হবে?

বীণা দৃঢ়স্বরে বলেছিল, সেই বান যাতে না আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে, বাঁধ দিতে হবে শক্ত করে। এভাবে যতটুকু করবি কাজের চেয়ে অকাজের বোঝা তার দ্বিগুণ হয়ে এসে জমবে। তাই একবারে এমন এক-আধটা গ্রামের কাজ নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের শক্তি দিয়ে গড়তে হবে সেই বন্যারোধের প্রাচীর।

নিরুপায় ভাবে অলকা বলেছিল: কেমন করে হবে?

—তাই তো হতে হবে। আর এই-ই আমাদের ব্রত।

তারপর বুঝেছে অলকা। আর সংশয় নেই। এত সহজ—এত নির্মল মনে হয়! কোনো জটিলতা নেই—নিজের কাছে এক বিন্দু ফাঁকি নেই কোথাও। কিন্তু কেন বোঝে না নীতীশ, কেন ভুল করে? এত বড় নীতুদা—এমন নির্ভীক কর্মী, পথ চলবার সময় সে আগে আগে চলবে পথ দেখিয়ে! সে কেন এভাবে ভুলের বৃত্তে পাক খেতে থাকবে?

অথবা একি সত্যি যে নীতীশ ফুরিয়ে গেছে? সুদীর্ঘ পথ পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই বিশ্রাম চায়, খুশি হয়ে থাকতে চায় ছোট সীমায় ছোট কাজের সুপ্তিশীতল আত্মতৃপ্তিতে? হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। কিন্তু যদি তাই হয়, অলকা সইতে পারবে না। এমন কিছু বয়স হয়নি নীতুদার, এমন কিছু শৈথিল্য আসেনি তার শক্তিতে আর স্নায়ুতে। তাকে আবার বড় করে তুলবে অলকা, তাকে আবার প্রতিষ্ঠা করবে তার নিজের মর্যাদায়। আজকের ক্লান্ত পরাভূত মানুষ আবার ফিরে পাবে তার উপযুক্ত নেতৃত্বের অধিকার।

কিন্তু কেন যেন ভালো লাগছে না। খালি মনে হচ্ছে অমন ভাবে হঠাৎ উঠে চলে

গেল কেন নীতীশদা, কেন রাগ করল, রাগ করল কার ওপর?

প্রশ্নের উত্তর মিলল না। যদি মিলত তা হলে আরো একটা প্রশ্নেরও উত্তর পেতো অলকা। নীতীশকে জ্বালিয়ে তোলবার জন্যে আগ্রহ কেন শুধু একটা নিছক আগ্রহই নয়, কেন একটা নিবিড় আর মাদক নেশার মতো তা তার চেতনার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে বেড়াচ্ছে।

চিন্তা ভেঙে দিয়ে মা ডাকলেন, লোকা?

—যাই মা—

টেবিল ল্যাম্পটাকে ক্ষীণপ্রভ করে দিয়ে অলকা উঠে দাঁড়ালো। দেওয়ালে একটা দীর্ঘছায়া ছড়িয়ে পড়ল তার, তার নিজের মানসিকতার প্রতিক্রিয়ার মতো, তার সহজ স্বচ্ছ মনের ভেতরে সৃষ্টি হয়ে ওঠা ছায়াকার দ্বৈত সত্তাটির মতো।

পরের দিন ইচ্ছে করেই সুদামকাকার বাড়ির দিকে পা বাড়ালো না নীতীশ। অলকা অনুরোধ করেছিল যাওয়ার আগে দেখা করবার জন্য। কিন্তু অনুরোধ সে রাখেনি, অনুরোধ রাখবার স্বাভাবিক স্পৃহাটার ওপরে প্রতিক্রিয়া হয়েছে একটা নিস্পৃহ উদাসীনতার, শান্ত বিতৃষ্ণার। অনেক রাত জেগে কোনো কঠিন বই পড়লে যেমন ঘুম আসতে চায় না, মাথার ভেতরে অশান্ত চঞ্চলতা ঘুরে ঘুরে কাঁপতে থাকে, ছোট বড় শিরাগুলোর ভেতরে দপদপ করে রক্ত আর চোখ বুজলে কুয়াশার আড়ালে তারার মতো নাচানাচি করে কতগুলি বিশৃঙ্খল আলোর বিন্দু, ঠিক সেই রকম। বার বার উঠেছে, পাল্‌টে নিয়েছে মাথার বালিশের ঠাণ্ডা দিকটা, জল খেয়েছে গ্লাস তিনেক। তারপর হতাশ হয়ে মেলে দিয়েছে সামনের জানালাটা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে রাত্রির বাতাসে অন্ধকার গাছপালার পত্রস্পন্দন।

কী ভেবেছে? কিছুই না। মাঝে মাঝে মনের এইরকম একটা আশ্চর্য অবস্থা দেখা দেয়। আসলে ভাবনাটা চেতনার অন্তরালে নিঃশব্দচারী ফল্গুর মতো বয়ে চলে; তাকে ঠিক ধরা যায় না, অথচ তার সূক্ষ্ম কল্লোল, তার অস্পষ্টপ্রায় একটা শিহরণ অজস্র এলোমেলো আর অবান্তর চিন্তাকে ফেনিয়ে পল্লবিত করে তোলে। একটা কিছু ঘটেছে নীতীশের মধ্যে। মহানন্দার মৃতকল্প ক্ষীণধারার পরিচিত-প্রবাহে কোনো এক সমুদ্রের লবণাক্ত নীলিম জোয়ার উঠেছে সংকেতিত হয়ে, কোনো এক মেঘবরণ সুদূর জংলা পাহাড়ের পাগলা-ঝোরা ব্যঞ্জিত হয়েছে তার বুকের ভেতরে।

পর পর কয়েকটা সিগারেট টানবার পরে তাও আর ভালো লাগল না। খুস্‌ খুস্‌ করছে গলার মধ্যে, অল্প অল্প জ্বালা বোধ হচ্ছে ঠোঁটের কোণায়। আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা বই টেনে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু সেও অসম্ভব। কোনো রূপ দিচ্ছে না অক্ষর-

গুলো—কতগুলো নীরেট মোটা মোটা কালো লাইনে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে যেন।

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে শুতে যাবে, এমন সময় দেখল মল্লিকাকে।

আশ্চর্য! বড় খাটটার একটা পাশ প্রতিরাত্রে যে মানুষটা অধিকার করে থাকে, যার সঙ্গে ইহ-পরকালের একটা স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত অধিকার—অদ্ভুত ভাবে তার সম্পর্কে সে অচেতন হয়ে আছে। রাত্রে সে শোয়ার পরে কখন মল্লিকা আসে জানে না, কখন উঠে যায়, তাও তার জানার বাইরে। সকাল বেলা ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় পাশ বালিশের ব্যবধানের ওপারে ঈষৎ কুঞ্চিত বিছানা, দুটি বালিশে মাথার একটা গোল দাগ, হয়তো একটুখানি চুলের বা ঘামের হালকা গন্ধ। কিন্তু কোনোদিন ওর তত্ত্ব বুঝতে চায় না, ও নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করে না এতটুকুও। লৌকিক অধিকার যাই-ই থাকুক, প্রথম রাত্রি থেকেই সে মল্লিকার সম্পর্কে মেনে নিয়েছে নিজের পরিচ্ছন্ন সীমানাটাকে। ঘরের কোণে সোনার গৌরাঙ্গের সতর্ক প্রতিহারী দৃষ্টি, সারা দিনের উৎসব আর ভোগ-রাগের ভেতরে অলক্ষণীয়া এবং অপ্রাপণীয়া দেবদাসী। এক হাত ব্যবধানের ভেতরে সহস্র যোজনের দূরত্ব বিকীর্ণ।

তারপরেই এল অলকা। ধূপ-ধুনো আর শুচিপবিত্র একটা যবনিকা তাকে আচ্ছন্ন আড়াল করে নেই। সহজ ভাবে তাকানো চলে তার চোখের দিকে, তার বুদ্ধি আর কৌতুকপ্রসন্ন মুখের দিকে, তার সম্পূর্ণ কৈশোর-লাবণ্যের দিকে। অসতর্ক মুহূর্তে একটা কথা বলে ফেলেছিলেন কাকিমা। শান্ত নিস্তরঙ্গ জলে যেন একটা পাতা উড়ে পড়ল, এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে সেটা, কাঁটার মতো অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি জাগছে অনবরত।

ধ্যেৎ। কোনো মানে হয় না এসব পাগলামির। সে তো আরো দূরের নক্ষত্র—সে সম্পূর্ণ অন্য জগতের। কাল সে চলে যাবে শহরে, চলে যাবে তার নিজস্ব পরিবেশের ভেতরে। সেখানে তার আলাদা জীবন, আলাদা তার ভাবনার বৃত্ত। নীতীশ ফিরে এল যোধপুরে—সে চলে গেল যোধপুর ছাড়িয়ে। ওর যাত্রা যেখানে এসে শেষ হল, সেখান থেকে যাত্রা শুরু হল অলকার।

কেমন একটা জ্বালা বোধ হচ্ছে, অকারণ হিংস্রতা উল্লসিত হতে চাচ্ছে মাথার ভেতরে, কামড়ে ধরতে ইচ্ছে করছে নীচের ঠোঁটটা একান্ত নিষ্ঠুর ভাবে। ফাঁকি, মিথ্যে। কোথাও ঠিক মিলছে না—ক্রমাগত ভুল হয়ে যাচ্ছে যোগফল। কী চাইছে বুঝতে পারছে না, কী পেলে খুশি হবে—তাও না। খালি মনে হচ্ছে কোথায় একটা বিরাট ফাঁকি প্রতীক্ষা করে আছে, আর তিলে তিলে সে এগিয়ে যাচ্ছে তারই একটা অতল শূন্যতার দিকে।

চুলোয় যাক সব। নীতীশের মন ক্ষিপ্তভাবে বললে, যেখানে খুশি যাক অলকা। তাতে ক্ষতি কী তার, লাভই বা কিসের? তার চেয়ে কেন সে নিজেকে জোর করে প্রমাণ

করে নিতে পারে না, প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারে না যেখানে তার সহজ স্বাভাবিক অধিকার—সেইখানে ?

হঠাৎ চেতনার এপ্রান্তে ওপ্রান্তে বিদ্যুতের ছুটোছুটির মতো কী কতকগুলো বয়ে গেল তার। নিজের ওপরে জোর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। বিভ্রান্তি চলবে না, ছেলেমানুষের মতো হাল ছেড়ে সরে দাঁড়ানোও না। পায়ের নীচে কোথাও একটা শক্ত ভিত্তির অভাবেই সে কোনো কিছু গড়ে তুলতে পারছে না; আন্দামানের পাথর-প্রাচীরের আড়ালে যে সংকল্প নিয়েছিল এখনো তো কিছুই করা হয়নি তার। এই যোধপুর রয়েছে, রয়েছে তার ক্ষয়িষ্ণু জেলেপাড়া, দিকে দিকে প্রসারিত রয়েছে বিশাল বিপুল মৃত্যুশয্যায় ঘেরা বাংলা দেশ। সবই তো করবার রয়েছে—করতে হবে। বিপ্লবী জীবনের অগ্নিদীক্ষাকে ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না, নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না খগেনের মতো সহজ নির্ঝঞ্ঝাট সাংসারিক জীবনে। কাজ তার চাই, কাজ তাকে করতেই হবে। অলকা যাই বলুক, আরো অলকা বিশেষ করে বলছে বলেই, জাগরণ সংঘকে অত ছোট করে সে দেখতে চায় না। একটা নিশ্চিত প্রতীতি গড়ে উঠছে—এই জাগরণ সংঘের মধ্য দিয়েই সে কাজ খুঁজে পাবে নিজের, পাবে নিজেকে কর্মীরূপে অবধারিত করবার অবকাশ। সুযোগ একটা যখন এসেছে তখন একে ছাড়া চলবে না, এর মধ্য দিয়েই যতটা পারা যায় এগিয়ে চলবার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু—একি হল ? একেবারে বাইরের ভেতরে কেন সে নিমগ্ন করতে পারছে না নিজেকে ? কেন তলিয়ে যেতে পারছে না কাজের নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণিপাকে, প্রচণ্ড প্রবল আবর্তনে ?

সকলের ভেতরে দাঁড়াবার আগে চাই নিজের দাঁড়াবার একটা জায়গা। একটা মানসিক অবকাশ। ঝড়ের আকাশে পরিক্রমা সমাপ্ত করে ডানা গুটিয়ে কোনো নীড়ের উষ্ণতা। বল পাবে সেখান থেকে, আশ্বাস পাবে। আর একটি মনের ভেতরেও জায়গা চাই—যে মন তার সঙ্গে তর্ক করবে না, বিচার করতে চাইবে না কোনো সূক্ষ্ম বুদ্ধির তৌলদণ্ডে; শুধু আশ্রয় দেবে, দু হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে কোমল বুকের ভেতরে ঘুম পাড়িয়ে দেবে পথক্লান্ত দিনান্তে।

কোথায় সে মন ? কোন্‌খানে তাকে পাওয়া যাবে ?

অলকা নয়। তবে মল্লিকাই বা নয় কেন ?

বাধা ? সে বাধা মিথ্যে। তার ব্যক্তিত্বকে কেন সে দাঁড় করাতে পারে না ঋজু মেরুদণ্ডে, অধিকারের সুকঠিন নির্ভরতায় ? দেবদাসী ? কিসের দেবদাসী ? তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে জীবনে, ছিনিয়ে আনতে হবে রক্ত-মাংসের মানুষের সুনিশ্চিত বোঝাপড়ায়।

লণ্ঠনটাকে নিবিয়ে দিতে যাচ্ছিল, জোরালো ভাবে উস্‌কে দিলে আবার। সোনার গৌরাঙ্গের জাগ্রত চোখ ঝলমল করছে—করুক। ও চোখকে সে ভয় করে না। ও যেন

কোনো বাইরের লোক—তার নিজের স্ত্রীকে, তার বিবাহিতা স্ত্রীকে ভুলিয়ে সরিয়ে নিচ্ছে তারই জীবন থেকে। এ চলবে না, চলবে না এই স্পর্ধাকে স্বীকৃত দেওয়া!

বিনিদ্র উত্তেজিত রাত্রি সব এলোমেলো করে দিলে নীতীশের। মনের গভীরের অন্তঃশীলা ফল্গুধারার মতো সূক্ষ্ম ভাবনাটাকে ধরা যাচ্ছে না, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়াটা বিদ্রোহী আর বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। হঠাৎ খানিকটা কড়া মদের নেশা করলে যেমন হয় তাই যেন হল তার। বাইরের কাজের মধ্যে দাঁড়াতে হলে একজনের মনের মধ্যেও তাকে দাঁড়াতে হবে, এবং যেখানে তার সেই ক্ষেত্র, সেখান থেকে কোনোমতেই অধিকারচ্যুত হবে না সে।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সে ধরল মল্লিকার মুখের কাছে। কখন ঝিম এসেছিল, আজও কখন নিঃশব্দচারিণী ছায়ার মতো মল্লিকা তার পাশে এসে শুয়ে পড়েছে—টের পায়নি। এই বিচিত্র রাত্রি, বিতৃষ্ণ চিন্তা আর লণ্ঠনের আলোর যোগাযোগে হঠাৎ যেন একটা নতুন দৃষ্টি জেগে উঠল নীতীশের। বারো বছরের ওপার থেকে আবার তার মল্লিকা ফিরে এসেছে তারই কাছে—অসতর্ক রাত্রির অসতর্ক অবকাশে দেবদাসীর অবগুণ্ঠনটা সরে গেছে মুখ থেকে।

অপলক চোখে নীতীশ স্ত্রীকে দেখতে লাগল। সত্যিই তো মল্লিকা, তার সেই পুরোনো মল্লিকা। নিদ্রা-শিথিল শরীরে সুকুমার কমনীয়তা জড়িয়ে আছে ছন্দের মতো, ঠোঁটের ভঙ্গিতে যেন একটা করুণ আত্মসমর্পণের প্রশান্তি। এ তো দেবদাসী নয়। ঘুমের ঘোরে বেশে-বাসে এসেছে স্রস্ততা, দল মেলছে মল্লিকা-ফুলের প্রতিটি পাঁপড়ি, কোথাও অপূর্ণতা নেই, নেই কলিকার সংকোচ। এ আর কারো নয়, এ একান্তভাবে তারই।

ঘুমের মধ্যে নিশ্বাস ফেলল মল্লিকা, কেমন ক্লান্ত বেদনাভরা নিশ্বাস। কিসের ক্লান্তি, কী এই বেদনার কারণ? বারো বছর আগেকার হারানো দিন কি ফিরে এসেছে স্বপ্নের গভীরতার ভেতর দিয়ে, গুঞ্জন করে উঠেছে মল্লিকার রক্তের মধ্যে? দেবদাসীর নাড়ীতে নাড়ীতে কি বইতে শুরু করেছে মানুষের প্রাণ-স্পন্দন?

দেখতে দেখতে নেশা জমে এল, ঘোর নেমে এল চোখে। একবার সোনার গৌরাঙ্গের দিকে তাকালো নীতীশ। থাকুক, জেগে থাকুক দেবতার ওই ভ্রূকুটিভরা স্বর্গীয় চোখ। ওই চোখকে সে ভয় করে না। দাঁড়াবার জায়গা চাই তার, চাই তার মনের আশ্রয় আর আশ্বাস। সে নিজেকে প্রমাণ করে দেবে, প্রতিষ্ঠা করে দেবে তার পৌরুষের স্বভাবসিদ্ধ দাবিকে।

এক মুহূর্ত!

শুধু এক মুহূর্তের দ্বিধা। তারপর প্রচণ্ড বলে শেষ সংশয় আর সংকোচ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সে ঝুঁকে পড়ল মল্লিকার মুখের ওপর, ঠোঁট নামিয়ে আনল ক্লান্ত-

করুণ আত্মসমর্পিত ছুটি ঠোঁটের ওপরে।

পরক্ষণেই সরে যেতে চাইছিল—যে ভুল ভেঙে আত্মস্থ করে নিতে চাইছিল নিজেকে। একটা অনুতাপের চমকও লেগেছিল হয়তো বা। কিন্তু তা হল না—বরং তার বদলে আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল একটা।

যেন ঘুমের ঘোরেই একখানা বাহু উঠে এল মল্লিকার। একগাছা ফুলের মালার মতো বেষ্টন করল নীতীশের কণ্ঠ, টেনে নিলে উত্তপ্ত নরম বুকের ভেতরে।

স্বপ্ন?

রক্ত ফুটতে লাগল টগবগ করে, চনমন করতে লাগল শরীর। কিন্তু স্বপ্ন নয়। ফিস্ ফিস্ করে মল্লিকা বললে, আলো নিবিয়ে দাও।

অন্ধকার। বারো বছরের প্রতীক্ষার পরে একশো প্রদীপের আলোর মতো জ্বলে উঠল যৌবন। মহানন্দার মরা স্রোতে এল শ্রাবণী-সমুদ্রের জোয়ার কল্লোল। চিন্তা-কল্পনা বিতৃষ্ণা-বিস্বাদ বিলীন হয়ে গেল উত্তপ্ত মাদকতার মধ্যে। বাইরে শুকনো পাতায় টপটপ করে শিশির পড়বার শব্দ। আর অন্ধকারের ভেতরে জেগে রইল সোনার গৌরাঙ্গের চোখ—জ্বলতে লাগল কোনো হিংস্র বনচরের ক্ষুধার্ত দৃষ্টির মতো।

সকাল বেলাতে আজ যতীশ বসেছিলেন অত্যন্ত অপ্রসন্ন মুখ করে। এমন হয় না, এমন হওয়া উচিত নয়! কুঁড়োজালির ভেতরে বার বার আঙুল থেমে আসছে তাঁর, এ কী হল? দশ বছরের মধ্যে যা কোনো দিন ঘটেনি, আজ তা হল কেমন করে, কী জন্যে ঘটল এমন একটা অশোভন ব্যতিক্রম?

আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে, পুবে ধরেছে স্থলপদ্মের পাঁপড়ির মতো ফিকে গোলাপী রঙ। ব্রাহ্মমুহূর্ত ত্বরিত গতিতে যাচ্ছে পার হয়ে, চলে যাচ্ছে সময়। অথচ এখনো আজ ঘুম থেকে ওঠেনি মল্লিকা, ঠাকুরের শীতলের বন্দোবস্ত করেনি! এ কী অলক্ষণে ব্যতিক্রম? ছেলের ঘরে শুয়ে আছে, ডাকাও চলে না, অথচ—অথচ আশঙ্কা হচ্ছে আজ কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে একটা।

—হরের্ণামৈব হরের্ণামৈব হরের্ণামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা—

কিন্তু নাঃ। মনের তিক্ততাটা এমনভাবে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না! শেষ পর্যন্ত নিরুপায় আক্রোশটা ফেটে পড়ল চাকরদের ওপরেই।

—হাঁরে বিশু, তোদের মতলব কী?

—আমরা কী করব বাবু?

—কী করবি?—যতীশ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, আমার মাথা করবি। বলি আজ পূজো-

টুজোর কোন ব্যবস্থা হবে, না, সমস্ত দিন রাধাকৃষ্ণ আর গৌরনিতাই উপবাসী থাকবেন ?

—পূজোর কাজ তো বৌদি করেন, আমরা—

—তোমরা—পরম বদমেজাজী শাক্তের মতো মহাবৈষ্ণব যতীশ দাঁত খিঁচিয়ে উঠলেন : তোমরা আর কী করবে ? যত সব গুণধরের দল ! বসে বসে মালপো ঠাসবে আর পরমানন্দে আড্ডা মারবে—এই তো ? একটু যদি কাজকর্মে না লাগো তা হলে আছো কী করতে। একটাকেও রাখব না—দূর করে দেব সমস্ত।

অকারণ গালাগালিতে বিব্রত হয়ে সামনে থেকে সরে পড়ল। তাঁর মনের উষ্মাটাকে প্রশমিত করবার জন্যে যতীশ হিংস্রভাবে শুরু করলেন।

—গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে !

ইতিমধ্যে ঘুম ভেঙেছে মল্লিকার। কিন্তু এখনো ঘোর কাটেনি চোখ থেকে, এখনো সর্বাঙ্গে সে মাদকতা সঞ্চারিত হয়ে আছে। জানালা দিয়ে ভোরের তরলোজ্জ্বল একটা রক্তাভা নীতীশের ঘুমন্ত মুখে প্রসারিত হয়ে আছে, রাত্রে নীতীশ যেমন মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকে দেখেছিল, এই সকালে সেই দৃষ্টি নিয়েই সে নীতীশকে দেখতে লাগল। এত সুন্দর তার স্বামী—এমন সুপুরুষ ! জেল থেকে ফিরে আসবার পরে যে শ্রান্ত গ্লানির ছাপ দেখেছিল চোখে মুখে, তা কবে কেটে গেছে। আবার পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আবার সুন্দর হয়ে উঠেছে আগেকার মতো।

কালকের রাত। কালকের অপূর্ব রাত। ঘুম তার আসেনি, নীতীশ সারা রাত জেগে ছটফট্ করছিল অস্থিরের মতো, কেমন করে ঘুম আসবে তার চোখে ? নীতীশ তো জানে না, কদিন থেকে কী আকুল আগ্রহ আর অভিমানে সে তার জন্যে প্রতীক্ষা করছে তার কাছ থেকে একটুখানি আহ্বান, একটু মাত্র সংকেত পাওয়ার। কিন্তু রাতের পর রাত ব্যর্থ হয়ে গেছে, নীতীশ টেরও পায়নি।

তারপর—

তারপর সেই পরম রাত এল। নীতীশের মুখ নেমে এল তার মুখের দিকে, তার ঠোঁটের উত্তপ্ত স্পর্শ লাগল তার ঠোঁটে। আর সব কিছু একাকার হয়ে গেল—ভেঙে গেল এত দিনের বাঁধ। উঃ—কত রাত পর্যন্ত ! মহানন্দার ওপারে থানার পেটানো ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে রাত তিনটে বেজেছে তখন পর্যন্ত জেগে ছিল তারা।

একটা অপূর্ব চরিতার্থতায় মল্লিকার মন যেন ভরে উঠছিল। নীতীশের চুলগুলোর মধ্যে সস্নেহে সে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। এদিকে এমন সময় ভোরের সুর কেটে গেল, শোনা গেল যতীশ ঘোষের উচ্চকিত কণ্ঠ : ওরে হারামজাদারা তোরা সব মরলি নাকি ? না হয় তোরাই আজ ঠাকুরের—

ধড়মড় করে উঠে পড়ল মল্লিকা—যেন চাবুক খেল একটা। সত্যিই তো—সত্যিই

তো। এ সে করছে কী! জানালার ভেতর দিয়ে রোদের ফালি উঁকি মারছে—কত বেলা সে করে ফেলেছে আজ। ঠাকুরঘরের রাশীকৃত কাজ বাকি, কখন হবে সে সব, কখন হবে সে সব মঙ্গলারতি! ছিঃ ছিঃ! নিজের দুর্বলতার জন্যে—

একটা তীব্র ধিক্কার উঠে মল্লিকার মনকে আচ্ছন্ন করে দিলে। এ উচিত হয়নি, নিজের বিবেকের কাছে, ঠাকুরের কাছে কোনো কৈফিয়ত নেই এই পাপের। কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে দ্রুত খাট থেকে নেমে পড়ল মল্লিকা, প্রণাম করলে সোনার গৌরাঙ্গকে অপরাধিনীর মতো, তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে।

বিষদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে যতীশ প্রশ্ন করলেন, তোমার শরীর কি আজ খারাপ বৌমা?

—না।

লজ্জিত জবাব দিয়ে মল্লিকা সামনে থেকে সরে গেল।

আরতি হল, শীতল হল, পূজোও হল। কিন্তু সবই অত্যন্ত দেরিতে, অত্যন্ত ব্যতিক্রমের মধ্যে। যতীশের মনটা বিষিয়েই রইল। মালার মধ্যে হাত রইল, মুখে জপও চলতে লাগল যন্ত্রের মতো অভ্যস্ত নিয়মে কিন্তু ক্রমাগত মন বলতে লাগল, এই যে ব্যতিক্রমের শুরু, এইখানে এর শেষ নয়। এ অত্যন্ত দুর্লক্ষণ, এ নিতান্তই অবাঞ্ছিত একটা ভবিষ্যতের আভাস দিচ্ছে। মনে হচ্ছে এতদিনের প্রথা আর চলবে না, সব অদল-বদল হয়ে যাবে। তার আগে সরে পড়াই ভালো, সংসার আর বিষয়-বাসনার মোহ কাটিয়ে সময়মতো শ্রীব্রজধামে গিয়ে পর্ণ-কুটীর বেঁধে নেওয়াই উচিত; পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সহচর হয়ে এবার অন্তিম দিনগুলো সেখানেই কাটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বুঝি।

—বৌমা?

—কী বলছেন বাবা?—পাশের ঘর থেকে অপরাধিনীর মতো মল্লিকা এসে দাঁড়ালো।

বৈষ্ণবের ভক্তিভরা ঔদাস্যভরে নয়, তিক্ত অভিমানে যতীশ বললেন, আর নয় বৌমা, আর মায়া নয়। আসছে মাসেই বেরিয়ে পড়ব শ্রীধাম বৃন্দাবনের উদ্দেশে।

—সে কী বাবা?

—হ্যাঁ, ঠিক করে ফেলেছি, তোমরা আর বাধা দিয়ো না—যতীশের গলায় অভিমানের স্বরটা আরো গাঢ় ঠেকল, কথার ভঙ্গিতে ফুটে বেরুল আরো বেশি তিক্ততা।

মল্লিকা বিস্মিতভাবে কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বিশু এসে বাধা দিলে আলোচনায়।

—বাবু?

—কী হয়েছে?

—দারোগা সাহেব এসেছেন।

—আবার দারোগা সাহেব ?—অসহ্য বিরক্তিতে পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল যতীশের। এই আর একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হল। ছেলে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়েছে পুলিসের আনাগোনা দিনরাত, পেছনে থানা পুলিস লেগে থাকবার মতো অস্বস্তি আর কিছুই নেই। ভালো ল্যাঠা জুটেছে যা হোক, বুড়ো বয়েসে ধর্মকর্ম তো দূরের কথা, একটু নিশ্চিন্তে পরমানন্দময় ভগবানের নামও করতে দেবে না যে!

অতএব বিশুকে নিয়েই পড়লেন : কেন এসেছেন ? মরবার আর সময় পেলেন না ?

—আমি কী জানি বাবু ? নিজে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন না ?—সকালে অকারণ বকুনি খেয়ে চড়ে ছিল চাকরটা। চড়াং করে জবাব দিয়ে সরে গেল সম্মুখ থেকে।

—ওঃ, ভারী মুখ হয়েছে তো ব্যাটাদের—

যতীশ উঠে পড়লেন। তারপর গজর গজর করতে করতে চললেন বাইরের ঘরে। সকাল বেলাতেই এ এক ল্যাঠা—দারোগার অপয়া মুখ দর্শন। এবার আর শ্রীধাম বৃন্দাবনে না গেলেই নয়।

দারোগা আজ আর হাসলেন না, সহজ সৌজন্যে প্রকাশ করলেন না তাঁর অভ্যস্ত বিনয়। শুষ্ক সম্ভাষণের পরে পকেট থেকে বার করলেন এক বাক্স কাঁচি মার্কা সিগারেট, একটা ধরিয়ে টান দিলেন উদার আর উদাস কর্তব্যপরায়ণতার ভঙ্গিতে। নাক দিয়ে মৃদু মৃদু ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আপনার ছেলের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই ঘোষ মশাই।

তালু শুকিয়ে উঠল যতীশের, ঠোঁটটাকে একবার লেহন করলেন, অস্বাচ্ছন্দ্যভরে বললেন, কেন ?

দারোগা মিটিমিটি চোখে একটু হাসির ভঙ্গি করলেন, কিন্তু হাসলেন না। বললেন, ঘাবড়াবেন না। কয়েকটা কথা বলে যাব ওঁকে—ভয়ের কোনো কারণ নেই।

—কিন্তু নীতু তো—নীতু বোধ হয় ঘুমুচ্ছে।

—তা হলে কষ্ট করে একটু জাগা দরকার ওঁর—দারোগার কথার ধ্বনে শ্লেষের আভাস ফুটে বেরুল : আমি এতটা পথ হেঁটে এলাম, উনি দয়া করে জাগতে পারবেন বোধ হয়।

—আচ্ছা আমি দেখছি—অস্বস্তিভরা গলায় জবাব দিলেন যতীশ।

—হাঁ, পাঠিয়ে দিন—আদেশের কঠিনতা স্পষ্ট হয়ে উঠল দারোগার স্বরে : ওঁকে পাঠিয়ে দিলেই হবে, আপনার আর আসবার দরকার নেই। কাজটা ওঁরই সঙ্গে।

নীতীশ যখন খবরটা পেল তখন তার ঘুম ভেঙেছে। কিন্তু মনের মধ্যে রাত্রির রেশ ঝিম ঝিম করছে এখনো, যেন অনেক দিন পরে মধুর অপরূপ স্বপ্ন দেখেছে একটা। কী হতে কী হয়ে গেল—সহস্র যোজনের দূরের মল্লিকা কত সহজে ছোট একটা পাখির মতো এসে হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল বুকের আশ্রয়ে। রাত্রির সে আশ্চর্য আস্বাদ এখনো

শরীরের অণু-পরমাণুতে রোমাঞ্চিত হচ্ছে, উঠছে অনুরণিত হয়ে। বিছানার দিকে চোখ পড়ল। দুস্তর পাহাড়ের ব্যবধান রচনা করা পাশবালিশটা নেই, সেটা চলে গেছে খাটের আর একদিকে। বিছানাটা অন্য দিনের চাইতে অনেক বেশি এলোমেলো। মাথার বালিশ-গুলো একসঙ্গে জড়াজড়ি করে আছে, তার নিজের বালিশে সিঁদুরের চিহ্ন, ঠিক বুকের ওপর গায়ের গেঞ্জিটায়ও সিঁদুরের টকটকে লাল আর গোল ছাপ ফুটে আছে।

রাত্রি যাদু জানে। অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করে, অনেক অবাস্তবকে আকর্ষণ করে আনে বাস্তবের স্বীকৃতিতে। বিগত নেশার শিথিলতায় নীতীশ আরো খানিকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইল বিছানায়। আর এরই মধ্যে এক ফাঁকে চোখ চলে গেল সোনার গৌরাঙ্গের দিকে—কেমন নিষ্প্রভ, আর বিবর্ণ। পরাজয়ের লজ্জায় আর অপমানে বিমর্ষ হয়ে আছে।

এমন সময় দারোগার উপস্থিতির সংবাদ এল। মৃদু হাসল নীতীশ। প্রচুর অভিজ্ঞতায় এই জীবগুলোকে সে চিনে নিয়েছে—জানে এদের দুর্বলতা কোথায়। রাজবন্দীদের সম্পর্কে একটা অহেতুক ভীতি আছে এদের, আছে আতঙ্ক।

নীতীশ বলে পাঠাল, বসতে বল, আমার একটু দেরি হবে।

মফিজর রহমান শুনে একবার দাড়ি চুলকোলেন। রাজার সম্মানিত অতিথি বলেই এ লোকগুলো রাজপেয়াদাদের তাচ্ছিল্য করে চলে। কিন্তু উপায় নেই—এদের তোয়াজ করে না চললে বিপদ। একে তো খুনে—দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার আসামীরা জেলের ভেতরেই রায় বাহাদুর ভূপেন চাটুয্যের মতো দুঁদে লোককে শাবল দিয়ে ঠাণ্ডা করে দিলে! সরকার এদের খাতির করে চলেন, তোয়াজ করেন দস্তুরমতো। একবার—সেবার তিনি কালিয়াচক থানার ও.সি.—এক ইন্টার্ণির সঙ্গে একটু খোঁচাখুচি লেগেছিল তাঁর। রিপোর্ট করলেন ওপরে, কিন্তু ফল হল উলটো, তাঁকেই ওয়ানিং দিলে ওপর থেকে, একটু হলেই চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ত। 'তোবা তোবা' বলে সেই থেকে তিনি সমঝে গেছেন, পারতপক্ষে এ সমস্ত লোকগুলোকে নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান না।

অতএব চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিকৃত অসহায় মুখে একা একা কাঁচি সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে লাগলেন তিনি। নীতীশ এল প্রায় আধঘণ্টা পরে।

—কী ব্যাপার?

দারোগা অভিবাদন জানালেন, কিন্তু প্রতি-নমস্কার এল না ও-তরফ থেকে। আর একবার গায়ের মধ্যে উঠল জ্বালা করে। লোকগুলো যেন কালেক্টর সাহেবের মেজাজ। পুলিসের স্যালুট পেতে অভ্যস্ত, আর অভ্যস্ত সেটাকে তাচ্ছিল্য করতে। দাড়ির ভেতরে দাঁতখিঁচুনি লুকিয়ে দারোগা বললেন, একটা অর্ডার আছে।

নীতীশ হাসল: অনুমান করেছিলুম। অকারণে আপনারা পায়ের ধুলো দেন না সে

জানি। কিন্তু কী অর্ডার?

বাদামী কাগজের ছাপানো আদেশলিপি দারোগা বাড়িয়ে দিলেন নীতীশের দিকে। নির্বিকার প্রসন্নমুখে পড়ে গেল সে। এই আদেশপ্রাপ্তির দিন থেকে আগামী ছয় মাস পর্যন্ত কোনো সভাসমিতিতে যোগদান করা তার পক্ষে নিষিদ্ধ। তাছাড়া সপ্তাহে একবার করে থানায় তাকে হাজিরা দিতে হবে, স্থানান্তরে গেলেও পুলিসকে জানিয়ে যেতে হবে সেটা। অন্যথায়—

—ওঃ—নীতীশ আবার হাসল ঃ এখনো ভয় কাটেনি? আশঙ্কা আছে যে আবার বোমা-পিস্তল নিয়ে যা কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারি? তাই এই বেড়ীর বন্দোবস্ত?

—যা মনে করেন। তবে আমরা গভর্ণমেণ্ট সার্ভেণ্ট, আমাদের ডিউটি গভর্ণমেণ্টের অর্ডার আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

—যদি আদেশ ঠিকমতো মেনে চলা না হয়?

শুষ্কভাবে দারোগা সাহেব বললেন, আমাদের একটা painful duty আছে। কারণ the law will take its course।

—ধন্যবাদ, তা হলে আপনি উঠতে পারেন।

আর বসা চলে না—এ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। অপমানে কান লাল হয়ে উঠল দারোগা সাহেবের। কথা বলছে যতীশ ঘোষের ছেলে নীতীশ ঘোষ নয়—একেবারে ডি. আই. জি. স্বয়ং!

—আচ্ছা চলি তা হলে, আদাব—

এবারেও প্রতিনমস্কার মিলল না। সাইকেলে উঠতে উঠতে অপমানিত ক্ষুব্ধ দারোগা ভাবতে লাগলেন ঃ আচ্ছা, আচ্ছা আমারও দিন আসবে, আসবে এর উচিত মতো জবাব দেবার পালা।

৯

গোরুর গাড়ির দুল্‌কি গতিতে অলকার ঘুম আসছিল না—কোনোদিন আসেও না। এই অঞ্চলের মেয়ে, গোরুর গাড়িতে যথেষ্ট অভ্যস্তও বটে। এই মালদা শহর থেকে বাড়ি যেতে বরাবরই তো গোরুর গাড়িতে পাড়ি জমাতে হয়। এদেশের লোকের পক্ষে বরং পৃথিবীর এই আদিম যানটির দোদুল দোলা ঘুমের পক্ষে বড় বেশি সুখকর মনে হয়। গাড়ি চড়তে না চড়তেই নাক ডাকাতে শুরু করে তারা। কিন্তু অলকার ঘুম আসে না। কোন একটা শারীরিক কষ্ট যে অনুভব করে তা নয়, কিন্তু কেমন একটা বিচিত্র

রোমাঞ্চকরতার প্রতীক্ষায় শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবধি তার সজাগ আর উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

দুপাশে ঘন অন্ধকার ছায়া, মালদার বিখ্যাত আমের বাগান অন্ধকার পান করে চলেছে কালো রাত্রির পানপাত্র থেকে। পাতায় পাতায় মৃদু মর্মর উঠেছে মাঝে মাঝে, দু-একটা ঝুপঝাপ শব্দ আসছে—আমগাছের ডালে কোনো রাত-জাগা বানরের গতি-বিধি! আর শোনা যাচ্ছে গাড়ির ছইয়ের একটা ঝরঝর শব্দ, চাকার করুণ আর্তনাদ, সপাৎ সপাৎ করে গোরুর লেজের আওয়াজ, বিছানার নীচে স্তূপীকৃত পোয়াল থেকে মচ্‌মচানি। চেনা অভ্যস্ত পথে গাড়িকে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিয়ে গাড়োয়ান ঘুমিয়ে পড়েছে কুণ্ডলী পাকিয়ে, সুদাম ঘোষের নাসিকা গর্জন একটা ঝাঁকুনিতে হঠাৎ থমকে গিয়ে আবার দ্বিগুণ বেগে মুখর হয়ে উঠছে। কিন্তু জেগে আছে অলকা।

আমের বনে ঝোড়ো মাতলামি জাগিয়ে এক-একটা পাগলা বাতাস ভিজে ধুলোর গন্ধ উড়িয়ে বয়ে যাচ্ছে মধ্যে মধ্যে। সেই বাতাসে ছইয়ের পেছনে টাঙানো ছেঁড়া চটটা উড়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। চোখে পড়ছে তিমির-স্তব্ধ গাছপালার কোনো নির্দিষ্ট আকার-হীন অতিকায় ছায়া, একরাশ উড়ন্ত জোনাকি, ঘন পাতার আড়ালে আড়ালে ছেঁড়া আকাশের নক্ষত্র-দীপায়ন। সজল চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে অলকা। দিনের অতি-পরিচিত পথটা অন্ধকারের ছায়ালোকে একটা অলৌকিক মায়ালোকে পর্যবসিত হয়ে গেছে। মনটা যেন দিশেহারা হয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে বাইরের ওই অনির্দিষ্ট রাত্রি-সমুদ্রে, অতি-চেনা নিজেকেও ঠিক ওই রকম অপরিচিত বলে বোধ হচ্ছে এখন।

কিছু একটা ভাবছে—কিন্তু কী ভাবছে? হস্টেল, স্কুল, পুরোনো দিনযাত্রা, পুরোনো ইতিহাস? না। ঠিক বুঝতে পারছে না, অথচ কোথায় একটা ব্যথা টনটনিয়ে উঠছে ক্রমাগত। পরিচিত বন্ধুদের ভেতরে ফিরে যাওয়া, পড়াশুনো, কাজ করা, ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধ লিখবে তার পরিকল্পনা—কিন্তু, না। সব কিছু ছাপিয়ে একটা তিক্ততা উঁকি দিচ্ছে চেতনার নেপথ্যে। ভালো লাগছে না। গভীর রাত্রে গোরুর গাড়িতে চলতে চলতে রোমাঞ্চকর জাগরণ নয়, অস্বস্তি ব্যথাবোধ।

হাওয়ায় চটের পর্দাটা আবার উড়ে গেল, আবার আমের বনে শোঁ শোঁ করে জেগে উঠল ঝড়ের চঞ্চলতা, আবার একরাশ জ্বলন্ত তারা দুলে গেল দৃষ্টির সম্মুখে। কষ্ট হচ্ছে—বাড়ি ছেড়ে আসতে কেমন কষ্ট হচ্ছে আজ। মার জন্যে? না—সে কষ্ট তো গা সওয়া হয়ে গেছে তিন-চার বছর আগেই। বাড়ি আর বোর্ডিঙের ভেতরে এখন আর বিশেষ কোনো পার্থক্যই নেই। বরং কোন্‌টাকে যে বেশি আপন আর অন্তরঙ্গ বলে বোধ হয় আজ হঠাৎ তার জবাব দেওয়া শক্ত। বড় দুই ভাইয়ের একজন পাটনায় চাকরি-বাকরি করে, আর একজন রেশমের ব্যবসা করে। তীব্র আর দুর্বার আকর্ষণে রক্তবহা নাড়ী

যেন ছিঁড়ে দুখানা হয়ে যেতে চাইছে !

ধড়মড় করে উঠে বসল অলকা। মনের সমস্ত বেড়া ডিঙিয়ে, সমস্ত সম্ভব-অসম্ভবের পরিধি পার হয়ে আজ তার জীবনের প্রথম পুরুষকে সে কামনা করে বসেছে ! আজ যোধপুর ছেড়ে আসতে যে কষ্ট হচ্ছে তা নীতুদার জন্যে একটা নিছক মায়ার ব্যাপার নয়—তীক্ষ্ণ একটা জ্বালার মতো শরীরের মধ্যে তা সঞ্চারিত হয়ে ফিরছে। কাল থেকে নীতুদার সঙ্গে আর দেখা হবে না—এ কথাটা ভাবতে গিয়েও তার সব কিছু যেমন বর্ণহীন, ঠিক সেই পরিণামেই ফিকে আর হৃতস্বাদ হয়ে যাচ্ছে।

দু হাতে নিজের মাথাটা টিপে ধরল অলকা—বুকে ভারী একটা পাথর চেপে বসবার মতো রুদ্ধ যন্ত্রণা—যেন দম ফেলতে পারছে না। জীবনে যা ঘটবার সামান্যতম আশঙ্কাও করেনি, আজ কেমন করে তাই ঘটল ! যার সঙ্গে কোনোদিন দেখা না হলেও বিন্দুমাত্র তার ক্ষতি হত না—আজ তাকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর কোনো কিছুকে ভাবতে পারছে না, কোথাও পাচ্ছে না তার পরিপূরক। স্কুল, বোর্ডিং, পরিচিত পৃথিবীর ছোট বড় নানা সুখ দুঃখ—সমস্ত ছাপিয়ে শুধু একটি বেদনার্ত মুখের ভাষাহীন অভিযোগ তাকে অস্বস্তিতে ভরে তুলেছে !

এ কী সর্বনাশ করল অলকা, এ কাকে ভালোবাসল ! কোনো ভবিষ্যৎ নেই এর, কোনো পরিণতি নেই। বিবাহিত মানুষ, চলার পথ আলাদা—দুজনের মাঝখানে যেন পাথরে গড়া প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। কোনো আশা নেই—পাথরে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া কোনো পরিণাম নেই এর !

তবে ?

হাওয়ায় চটের পর্দাটা উড়ে গেল, চারদিকে উঠল শোঁ শোঁ শব্দে ক্ষ্যাপা দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু এবার আর কোনো আকাশ চোখে পড়ল না, চোখে পড়ল না একরাশ নক্ষত্রের দীপান্বিতা। সমস্ত অন্ধকার—নিশ্ছিদ্র আমবাগানের ঘন-গম্ভীর অতিকায় আর অলৌকিক ছায়ালোক—আলোহীন রাত্রির করাল-সমুদ্র।

ওই রকম একটা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চলেছে অলকা, যেখানে তারা নেই, নেই আকাশের ইঙ্গিত। কিন্তু ফিরতে কি পারে না এখনো, এখনো কি ফেরবার উপায় নেই তার ? একদিন যে পথ চলার রক্ত-আলোর মশাল দেখেছিল সম্মুখে—সেই মশাল কি হারিয়ে যাচ্ছে তার আচ্ছন্ন চোখের তারায়, সে কি তাকে ফেরাতে পারে না এই নিশ্চিত আত্মহত্যার অপঘাত থেকে ?

বাইরে রাত থমথম করতে লাগল, বাতার ওপরে জোনাকির সবুজাভ আলোয় যেন কার একটা হিংস্র কুটিল চোখ ঝিকিয়ে উঠতে লাগল বারে বারে।

ভোরবেলায় হস্টেলের সামনে অলকাকে নামিয়ে দিয়ে সুদাম ঘোষ গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন মথতুমপুরের দিকে। মামলাসংক্রান্ত কিছু কাজ আছে, পরিচিত উকিলের বাড়িতে কাজকর্ম আর এ বেলার খাওয়াদাওয়া সেরে, বিকেলে কিছু কেনাকাটা করে সন্ধ্যের সময় বাড়ির উদ্দেশে গাড়ি ছাড়বেন তিনি।

হস্টেলের মেয়েরা সবে তখন জেগে উঠছে ঘুম থেকে। অলকার রুমমেট মণ্টু তখন কাঁধে শাড়ি তোয়ালে, আর গালের ভেতর টুথব্রাশ ঠেলে রওনা হয়েছে কলঘরের দিকে। অলকাকে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করলে তার। তারপর গালের ভেতর থেকে ফেনিল ব্রাশটাকে টেনে বার করে দাঁতে চেপে জিজ্ঞাসা করলে, এলে?

অলকা ক্লান্ত ভাবে হাসল: এলাম।

—এইমাত্র?

—নইলে কি মাঝরাত থেকে হস্টেলের দরজা পাহারা দিচ্ছিলাম?

মণ্টু বললে, ঘরে যাও। অনেক কথা আছে।

—কথা?—শ্রান্তভাবে হাই তুলল অলকা: এখন আর কথা নয়, যা ঘুম পাচ্ছে—লম্বা হয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ব। যদি সাধন উনুন ধরিয়ে থাকে তবে আমার জন্যে চটপট এক কাপ চা করে দিতে বলিস ভাই।

—বলব।

মণ্টু চলে গেল। যেতে যেতে আবার কেমন একটা দৃষ্টি বুলিয়ে গেল অলকার দিকে। কিন্তু সে দৃষ্টি অলকা ভাল করে লক্ষ্য করল না। সারারাত জাগরণ আর মনের মধ্যে একটা অশ্রান্ত দ্বন্দ্ব দুঃসহ জড়তার মতো তাকে বেষ্টন করে ধরেছে। আর সে দাঁড়াতে পারছে না। পা টলছে, মাথা ঘুরছে, চোখ খুলে রাখা যাচ্ছে না, একমুঠো বালি ছড়িয়ে পড়বার মতো কিরকির করছে চোখের ভেতরে।

ঘরে এসে খাটের ওপর বিছানাটাকে ছড়িয়ে নিলে অনিচ্ছুক ভাবে। একবার ভাবল হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে শুয়ে পড়বে, কিন্তু আর পারল না। বাইরে থেকে খানিকটা রাঙা রৌদ্র খাটে এসে পড়েছিল, জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল সে। সারারাত্রির ক্লান্তিশিথিল শরীর, নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গেল অবসাদের অতলতায়।

একটু পরে সাধন এসে ডাকল, দিদিমণি, চা—

জড়িত জবাব এল, হুঁ।

—এই টেবিলে রেখে দিয়ে গেলাম।

—হুঁ।

টেবিলের ওপর ধোঁয়া ছড়িয়ে ছড়িয়ে চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, কিন্তু জাগল না অলকা। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে রোদ পড়ে ডিশের ওপরকার টিফিনের রুটিমাখন শুকোতে লাগল। মণ্টু এসে ডাকল, এই, অমন পাগলের মতো ঘুমোচ্ছিস কেন, উঠে চা খেয়ে নে।

অলকা আড়ষ্ট বিরক্ত স্বরে জবাব দিলে, পরে।

—আরে চা-টা যে গেল!

—আঃ!

মণ্টু একবার করুণাভরা চোখে তাকালো ঘুমন্ত অলকার দিকে, একটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলে গলা পর্যন্ত। তারপর খাতা পেন্‌সিল টেনে নিজের টেবিলে অঙ্ক কষতে বসে গেল।

অনেকক্ষণ পরে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল অলকার।

ধড়মড় করে যখন খাটের ওপর উঠে বসল, তখন শরীরের দুঃসহ গ্লানিটা কেটে গেছে বটে, কিন্তু মাথাটাকে তখন পর্যন্ত অস্বাভাবিক ভারী বলে বোধ হচ্ছে তার। চোখের পাতা দুটো তখনো টেনে যেন তুলতে ইচ্ছে করছে না। খাটের পাশে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে খানিকক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল সে।

কিন্তু মণ্টুর হাসির শব্দে সংজ্ঞা ফিরে এল।

—কি রে, আজ সারাদিনই ঘুমুবি নাকি?

দু হাতে চোখ কচলে তাকালো অলকা, বিহ্বলভাবে জিজ্ঞাসা করলে, অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি, না?

—বেশিক্ষণ নয়, মাত্র ঘণ্টা চারেক।

—তাই নাকি? কটা বেজেছে?

—দশটার কাছাকাছি। এক্ষুনি খাওয়ার ঘণ্টা পড়বে।

—সে কি!—সন্ত্রস্ত হয়ে খাট থেকে নেমে পড়ল অলকা: আমাকে ডাকিসনি কেন এতক্ষণ?

—ডাকিনি মানে?—দাঁতের কোণায় পেন্‌সিলটা কামড়ে ধরে মণ্টু বললে, অন্তত বার পনেরো ডেকেছি। তাতে বোধ হয় কুম্ভকর্ণকেও জাগানো যেত, তোকে পারা যায়নি।

—ধ্যেৎ, সব মাটি। এক্ষুনি দৌড়তে হবে ইস্কুলে।

—না, সে ঝামেলা নেই। কে একজন মারা গেছেন, ইস্কুল ছুটি আজকে।

—যাক বাঁচালি।—একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অলকা আবার বিছানায় বসে পড়ল।

—ও কি, আবার ঘুমুবি নাকি? যা, স্নান করে আয়। কয়েকটা খুব জরুরী কথা আছে।

—জরুরী কথা ? কী কথা ?—জিজ্ঞাসু ভাবে তাকালো অলকা।

—এখন নয়, দুপুর বেলা।

—না, না, শুনিই না।

মণ্টু নিজের টেবিল ছেড়ে অলকার বিছানায় এসে বসল। তারপর মাথাটা কাছে সরিয়ে এনে চাপা গলায় বললে, ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে গেছে এদিকে!

—ভয়ঙ্কর ব্যাপার!—সবিস্ময়ে অলকা বললে, কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার ?

—বীণা কী করেছে জানিস ?

—বীণা!—হঠাৎ সমস্ত আড়ষ্ট দেহটাকে সম্পূর্ণ সজাগ করে, মেরুদণ্ডটাকে সোজা করে বসল অলকা। তীব্র দৃষ্টিতে মণ্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কী করেছে বীণা ?

—পালিয়েছে।

—পালিয়েছে!—অলকার মুখে কথা যোগালো না।

—না, না, খারাপ কিছু নয়, কোনো বিশ্রী ব্যাপার নেই এর ভেতরে।—তাড়াতাড়িতে নিজেকে সংশোধন করে নিতে চাইল মণ্টু : দু-একদিনের মধ্যেই পুলিস ওকে ধরত, তাই অ্যাব্‌সকণ্ড্ করেছে। একখানা চিঠি লিখে গেছে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে, ক্ষমা চেয়েছে তাঁর কাছে।

—হুঁ।—উত্তেজনায় অলকার বুকের ভেতরটা কাঁপতে লাগল। কাল রাত্রে চেতনার ভেতরে দোলা লেগে কালো সমুদ্রের ডাক দিয়েছিল আত্মহত্যা ; আর আজ ডাক দিল তার পথ চলবার আলো, সঙ্কটে অভিযাত্রার রক্তমশাল।

—তুই ওর বন্ধু—ভয় মেশানো গলায় মণ্টু বললে, পুলিসের ধারণা ওর খবর তুই জানিস। তাই খুঁজে গেছে। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টও তোকে বলবেন। একটু সাবধান থাকিস ভাই—শেষে কোনো বিপদে না পড়িস।

—নাঃ, বিপদে পড়ব না—অলকা এতক্ষণ পরে অল্প একটু হাসল : ভয় আমার নেই আর। কিন্তু আর বসে থেকে লাভ নেই, যাই স্নানটা সেরে আসি। এর পরে কলে জল পাবো না বোধ হয়।

উঠতে যাবে, ঠিক সেই সময় ঢুকল হস্টেলের বুড়ো চাকর সাধন। অলকার দিকে তাকিয়ে বললে, দিদিমণি, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট তাঁর অফিসে আপনাকে ডাকছেন।

১০

সুপারিনটেনডেন্ট সরলাদি কালো ফ্রেমের মস্ত একজোড়া চশমার মধ্যে দিয়ে অলকার দিকে তাকালেন। সে তো তাকানো নয়, যেন বিশ্লেষণ। অলকাকে যেন দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন না, মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে তাকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিচার করতে চাইলেন। বজ্র ও বর্ষণ যে আসন্ন হয়ে আসছে এটা অনুমান করতে দেরি হল না।

সরলাদি বললেন, বোসো।

এটা নতুন। সাধারণত সরলাদি নিজের অফিসিয়াল মর্যাদা সম্পর্কে একটু বেশি পরিমাণে সজাগ। কোনো মেয়েকে যখন আফিসে ডাকে তখন তাকে বসতে বলেন না, বিনীত হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কিন্তু আজ বসতে বললেন। তার অর্থ চারদিকে এমন একটা ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি লেগেছে যে নড়ে উঠেছে চিরাচরিত প্রথার ভিত্তিটা। বিড়ম্বনা আর বিপর্যয়ে সরলাদি তাঁর আভিজাত্যের সীমারেখাটা মনে রাখতে পারছেন না।

—বোসো—উৎকণ্ঠিত অসহিষ্ণু গলায় আবার বললেন, ওই টুলটাতে বোসো।

অলকা বসল।

—বীণার খবর শুনেছ ?

—শুনেছি।

—কে বললে ?

—মণ্টু।

—হুঁ।—সরলাদি চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। টেবিলের ওপর থেকে একটা কলম তুলে নিয়ে ব্লটিং প্যাডের ওপর তিনি আঁচড় কাটতে লাগলেন। যেন কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না, বুঝতে পারছেন না কোথা থেকে আরম্ভ করবেন কথাটা। শুধু অলকার চোখে বড় বেশি শ্রান্ত যেন মনে হচ্ছে সরলাদিকে, চোখের কোলে ঘন কালির রেখা। কড়া ধাঁচের মানুষ, প্রচণ্ড দাপটের সঙ্গে তিনি হস্টেল শাসন করেন, এতকাল মেয়েরা ওঁকে প্রতিপক্ষের মতোই দেখে এসেছে। কিন্তু আজ মনে হল সরলাদির সর্বাঙ্গে ক্লান্ত একটা শৈথিল্য বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে, হঠাৎ যেন আবিষ্কার করা গেল প্রবল পরাক্রান্ত সুপারিনটেনডেন্ট রাতারাতি বুড়ী হয়ে গেছেন।

—আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ ?—আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলেন সরলাদি।

অলকার শরীরে তখনো ঘুমের জড়তা। অবসাদ আর গ্লানিতে সমস্ত শরীর যেন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সরলাদির কথাগুলো অর্ধসজাগের মতো সে শুনছে, উত্তর দেবার জন্য এখনো প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি মানসিক বোধটা।

মৃদু করুণ কণ্ঠে সরলাদি বললেন, সমস্ত হস্টেলের যে বদনাম হল কী করে তা চাপা দেব জানি না। স্কুল-অথরিটির কাছে কৈফিয়ত দেবার পথ নেই আমার। গার্জেনদের সামনে আমি মুখ দেখাতে পারব না।

অলকা বললে, কিন্তু এ তো কোনো—

—সে জানি। লোকে যাকে স্ক্যাণ্ডাল বলে এ তা নয়। বীণাকে আমি চিনি, তা ও কখনো করতেও পারত না। কিন্তু হস্টেল থেকে পালানোর যে অপরাধ, সেও তো তুচ্ছ একটা ঘটনা নয়। তা ছাড়া লোকেই কি এটা বিশ্বাস করবে? এর ভেতরেই অনেকে বলতে শুরু করেছে—সরলাদি থেমে গেলেন।

মাথা নীচু করে শুনে যেতে লাগল অলকা।

—তারপরে পুলিসের হাঙ্গামা। উঃ, সে অসহ্য করে তুলেছে। ভাগাড়ে মরা গোরু পড়েছে যেন। একজনের পর আর একজন আসছে, অকারণ বকাবকি করে মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে। এখন নিজের সম্মান বাঁচাতে হলে চাকরিতে রিজাইন দেওয়া ছাড়া আর তো কোনো পথ দেখছি না। আজ কুড়ি বছর এই হস্টেলে আমি আছি, কিন্তু এমন তো কখনো—উঃ, আমি পাগল হয়ে যাব—দু হাতে সরলাদি কপাল টিপে ধরলেন। অলকার মনে হল কালিপড়া শ্রান্ত চোখের কোণায় কোণায় অশ্রুর আভাস ছলছলিয়ে উঠেছে তাঁর।

সত্যি ভারি দুঃখের কথা— কিছু একটা বলবার জন্যেই যেন বললে অলকা।

জলে ভরা চোখ তুললেন সরলাদি: তুমি বলছ দুঃখের কথা, আর চোখের সামনে সর্বনাশ দেখতে পাচ্ছি আমি। এখন তোমাকে নিয়ে আর এক প্রবলেমে পড়েছি, তা জানো?

—আমাকে নিয়ে প্রবলেম্!

—হাঁ, তোমাকে নিয়ে। বীণার তুমি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিশেষ বিশেষ মিটিং-এ একসঙ্গে দেখা গেছে তোমাদের। পুলিস সন্দেহ করে বীণার whereabouts তুমি জানো।

—কিন্তু সত্যিই আমি কিছু জানি না।

—জানো না?—সরলাদি হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। এত কাছে তাঁর মাথাটা এগিয়ে এল যে তাঁর চশমার ফ্রেমটা অলকার কপাল স্পর্শ করল; তাঁর নিশ্বাস লাগল তার গালে, কপালে। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হল অলকার।

—জানো না, সত্যিই তুমি জানো না?—চক্রান্তকারীর মতো আগ্রহভরা ফিসফিসে গলায় সরলাদি তাঁর প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন।

—না।

সরলাদির মুখে কে যেন কালি ছড়িয়ে দিলে খানিকটা: অলকা?

—বলুন।

অসহায় আর্তস্বরে সরলাদি বললেন, আমার অবস্থা কি তুমি বুঝতে পারছ না ?

—পারছি।

—তাহলে তুমি আমায় বাঁচাও—দু হাতে তিনি হঠাৎ অলকার একখানা হাত আঁকড়ে ধরলেন। সাপের মতো ঠাণ্ডা একটা ক্লেদাক্ত অনুভূতি বোধ করলে অলকা, গায়ের মধ্যে শিউরে উঠল তার। সরলাদির গাল বয়ে টপটপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে ব্লটিং প্যাডের ওপর।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। একটা অবিশ্বাস্য নাটকীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যেন। মুখে কথা আসছে না, বিপর্যস্ত হয়ে গেছে বুদ্ধি। যেন এখনো সে ঘুমের ঘোরটা তার কাটেনি, যেন স্বপ্নের মধ্যে এই সব ব্যাপারগুলো ঘটে চলেছে তার দৃষ্টির সামনে। তার হাতে সরলাদির হাতের স্পর্শ যেন জ্বালা করছে, চোখের জল ব্লটিং প্যাডের ওপরে পড়ে পড়ে শুকিয়ে যাচ্ছে—সেদিকে তাকিয়ে গলার মধ্য থেকে কী একটা মোচড় দিয়ে দিয়ে উঠতে চায়।

অভিভূত মুহূর্তগুলো পার হয়ে গেলে হঠাৎ অলকা শক্ত হয়ে উঠল : এ সব আমায় বলছেন কেন ? আমি আপনাকে বাঁচাব কেমন করে ?

—তুমি বীণার খবরটা আমায় দাও—সাশ্রুকণ্ঠে সরলাদি বললেন, তুমি আমায় বলো সে কোথায় আছে।

অলকার মুখের চেহারা কঠিন হয়ে এল, হঠাৎ মনে হল সরলাদি যেন অভিনয় করছেন, যেন চোখের জলের অস্ত্র দিয়ে তাকে দুর্বল করে ফেলে তার কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছেন স্বীকারোক্তি। অলকা জ্বলে উঠল। ব্লটিং প্যাডের ওপরে ভিজে চোখের জলের দাগটার দিকে তাকিয়ে এবার শরীরের মধ্যে ঘৃণায় রী রী করে উঠল তার।

আস্তে আস্তে অলকা হাতটা ছাড়িয়ে নিলে : আপনি এমন করছেন কেন ? আমার যা বলবার সে তো আমি বলেছি।

—না, তুমি বলোনি, তুমি তোমার বন্ধুকে বাঁচাতে চাইছ—শাড়ির আঁচলে সরলাদি চোখ মুছে ফেললেন। ধরা গলায় বললেন, তুমি নিশ্চয় জানো—

—কেন এমন করছেন আপনি ?—অসহিষ্ণু হয়ে অলকা বললে, আপনি তো জানেন আজ বারোদিন পরে আমি বাড়ি থেকে ফিরেছি। আমি কেমন করে বলব সে কোথায় গেছে ?

—হুঁ ?—সরলাদির মুখের রেখাগুলোও শক্ত হয়ে উঠল, যেন ফিরে আসছে তাঁর সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের আভিজাত্যবোধটা : কোথায় সে যেতে পারে তা জানো ?

—আমি অন্তর্যামী নই—এবার ঔদ্ধত্য ফুটে বেরুল অলকার গলায়।

—You should learn manners—তীক্ষস্বরে বললেন সরলাদি। একটু আগেই যে একটা অশ্রুঘন করুণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা যেন ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল : তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। এখনো সত্যি কথা বলো।

—সত্যি কথাই আমি বলছি—টুল ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অলকা : কিন্তু আপনি বিশ্বাস করছেন না।

—হুঁ—সরলাদি ঠোঁট কামড়ালেন : তা হলে তুমি জানো না ?

—না।

—আমাকে তুমি এ কথা বিশ্বাস করতে বলো ?

অলকা বিরক্তভাবে বললে, আমার যা বলবার আমি বলেছি। এখন বিশ্বাস করা না করা আপনার খুশি।

—বটে ? চশমার কাচের ভেতর দিয়ে মাইক্রোস্কোপের দৃষ্টি ফেললেন সরলাদি, অলকার আপাদমস্তক বিশ্লেষণ করে নিলেন একটা অত্যুগ্র তীক্ষতায়। তারপর বললেন, আচ্ছা তুমি যাও।

বেরিয়ে যাবার জন্যে পরদাটা সরিয়েছে অলকা, এমন সময় পেছন থেকে সরলাদির আহ্বান যেন তাকে একটা শিকরে বাজের মতো ছোঁ মারল : শোনো।

অলকা ঘাড় ঘুরিয়েই থেমে দাঁড়ালো।

—তোমার ভালো করতেই আমি চেষ্টা করছিলাম। But it seems you don't care for your own good ! কিন্তু একটা কথা তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি। যদি কথনো এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে বীণার সঙ্গে তোমার কিছুমাত্র যোগাযোগ আছে, সে দিনই তোমাকে হস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। শুধু সে দিন নয়, সেই মুহূর্তেই। মনে থাকবে ?

—থাকবে।

সরলাদির অগ্নিবর্ষী চোখের দিকে একবারও না তাকিয়ে অলকা চলে গেল।

* * * *

যতীশের সমস্ত দিনটা আজ কাটল যেন একান্ত একটা দুর্দিনের মতো। রাধামাধব ! কী কুক্ষণে কার মুখ দেখেই যে উঠেছিলেন ! একটা অর্থহীন তিক্ততায় সব কিছু বিস্বাদ লাগছে। পরম বৈষ্ণব, আজ থেকে থেকেই ধৈর্যচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন। 'তৃণাপি সুনীচেন, তরোরিব সহিষ্ণুনা'—কিন্তু কেন কে জানে একটা ভয়ঙ্কর অসহিষ্ণুতা বোধ হচ্ছে তাঁর, ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছে খানিকটা অর্থহীন ক্রোধের তাড়নায়।

কেন এমন হল ?

আজ সব অন্যরকম হয়ে গেছে, আজ দেখা দিয়েছে একটা অবিশ্বাস্য অবাঞ্ছিত

অনিয়ম। গৌর-নিতাইয়ের আরতি হয়েছে একান্ত অসময়ে, তাঁরা ভোগ পেয়েছেন অবেলাতে। একটা অমঙ্গল যেন শকুনের প্রসারিত ডানার মতো অমঙ্গলের ছায়াপাত করেছে চারদিকে। মল্লিকা উঠেছে দেরি করে—এত দেরি করে উঠেছে যা ক্ষমার অযোগ্য।

জপের মালা ভুলে গিয়ে যতীশ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। ছেলে বাড়ি ফিরেছে বারো বছর পরে এবং এমন ভাবে ফিরেছে যে তা সমস্ত সম্ভাবনারই বাইরে ছিল। সুতরাং এ ব্যতিক্রম তো স্বাভাবিক, প্রসন্ন মনেই যতীশের একে মেনে নেওয়া উচিত। কিন্তু এ কী হল! সমস্ত বিস্বাদ লাগছে যতীশের। মনে হচ্ছে কোথাও একটা মোহভঙ্গ হয়েছে, একটা গভীর আর নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এক লহমায় ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে কেউ। আজ মল্লিকার মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর কেমন একটা হিংস্র আক্রোশ বোধ হয়েছিল। স্বামী ফিরে এসেছে, আসুক; কিন্তু তার জন্য কি মল্লিকা অবহেলা করবে তার নিত্য-দিনের কর্তব্যগুলোকে, সে কি ভুলে যাবে যে গৌর-নিতাইয়ের এখনো আরতি হয়নি, উপবাসী আছেন এ বাড়ির গৃহদেবতা?

না—এ হওয়া উচিত নয়। এ হতে দেওয়া যাবে না। কিন্তু কিছু কি করা যায়? কী করা সম্ভব?

কী বলা যাবে পুত্রবধুকে? কেমন করে বলা যাবে স্বামীর চাইতেও ঢের বড় গৃহ-দেবতা, তোমার পারিবারিক জীবনের চাইতেও মহত্তর সত্য এই আধ্যাত্মিক দায়িত্ব?

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না অবস্থাটা। কিছু একটা নিশ্চয় করা দরকার, কিন্তু কী যে করা যাবে মনের কাছে স্পষ্ট করে তার কোনো উত্তর মিলছে না। আর তা ছাড়া—তা ছাড়া—

দারোগা মফিজর রহমান। এই সকাল বেলাতেই বাইরের ঘরে এসে জাঁকিয়ে বসেছে। কী আছে লোকটার মনে, কে জানে। শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণব চিরকাল পুলিসের হাঙ্গামাকে ভয় করেছেন, চিরকাল দূরে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন ওই অনাবশ্যক উপদ্রবটাকে। কিন্তু এমনি কুগ্রহ যে পুলিস যেন এঁটুলির মতো পেছনে লেগেছে—সকাল বেলা, 'হরেকৃষ্ণ' বলে চোখ খুলতে না খুলতেই ওই অযাত্রা মুখ দর্শন। হঠাৎ মনে হল, নিজের সমস্ত সজ্ঞান চেষ্টার একটা প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও মনে হল: বারো বছর পরে ছেলে ফিরে এসেছে কি তাঁকে এই বুড়ো বয়সে দু'দণ্ড বিশ্রাম দেবার জন্যে, কৃষ্ণনাম করবার নিশ্চিত আশ্বাস দেবার জন্যে? নাকি এই ছেলে এসেছে তাঁর জীবনের শেষ বিশৃঙ্খলার প্রচণ্ড একটা ঝড় তুলতে, তাঁর এই বারো বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা যে আয়োজন তাকে বিপর্যস্ত করে দিতে?

আর মল্লিকা—তাঁর পুত্রবধূ। অভিমানে আর ব্যথায় বুকের ভেতরটা কী রকম মোচড় খেয়ে উঠল যতীশের। এই মেয়েটিকে চেয়েছিলেন তিনি মনের মতো করে গড়ে তুলতে, চেয়েছিলেন এর বুকে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চার করে শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিয়ে যেতে, ব্রজ-মণ্ডলের পবিত্র ধুলোর স্পর্শে এর মনের ময়লা ঘুচিয়ে দিতে। কিন্তু আজ মল্লিকাও যেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে, যেন—

যতীশ অকারণেই একটা অস্ফুট আর্তনাদের মতো শব্দ করলেন, কী একটা বিঁধছে হৃৎপিণ্ডে খচ্ খচ্ করে, খোঁচা দিচ্ছে একটা বিষাক্ত তীক্ষ্ণতার মতো। কিন্তু কেন?

নীতীশের চটির আওয়াজ পাওয়া গেল। বিদ্বিষ্ট সন্দিগ্ধ চোখে যতীশ তাকালেন।

—কী বলে গেল দারোগা?

নীতীশ কোনো জবাব দিলে না, শুধু হলদে কাগজের সেই অর্ডারটা যতীশের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

যতীশ পড়লেন। একবার, দুবার, তিনবার পড়লেন। তারপর ভ্রূকুটি-ভয়ঙ্কর মুখে ছেলের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, এর মানে?

নীতীশ সংক্ষেপে বললে, ওইতেই লেখা আছে।

নিজের মধ্যে অসহ্য ক্রোধ ও বিরক্তির একটা প্রবল উচ্ছ্বাসকে অতি কষ্টে সংহত করলেন যতীশ ঘোষ। বললেন, তা তো বুঝলাম, এখন তুমি কী করতে চাও? আবার জেলে যাবার মতলব আছে নাকি?

—ঠিক বলতে পারি না।—প্রশান্তস্বরে জবাব এল একটা।

—বলতে পারো না?—যতীশের ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটিটা আরো ভয়াল হয়ে উঠল, গলায় ফুটে বেরুল দুর্যোগের থমথমে ইঙ্গিত: এখনো কি ওই সব ছেলেমানুষি করবে আবার? এতদিনেও কি তোমার শিক্ষা হয়নি?

—না বাবা, ছেলেমানুষি আমি করব না—নীতীশ জবাব দিলে, আমি আর ছেলেমানুষ নই। আর সেই জন্যেই ভাবছি ছেলেমানুষের মতো এসব ধমকানিতেও আর ভয় পাবো না।

—কী করতে চাও তুমি?

—এখনো ঠিক করিনি।—নীতীশের মনের সামনে ভেসে এল জাগরণ সংঘের আদর্শ আর তার পাশাপাশি অলকার মুখ। কোথা থেকে একটা বিচিত্র দোটানা এসেছে, কোন্ দিকে যে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এখনো যেন সেটা ঠিক নির্ণয় করতে পারেনি। অথচ আর অপেক্ষাও করা চলে না। অনেক, অনেক, অনেক কাজ। আন্দামানে যেদিন গিয়েছিল সেদিনকার সেন্টিমেন্টের ভেতর নিষ্ঠা ছিল, আত্মত্যাগ ছিল, কিন্তু বিচারবোধের পূর্ণতা ছিল না। তারপর সংশোধিত ফৌজদারী আইনের বন্দী হিসাবে এসেছিল নানা

জটিল সমস্যা আর কূট-কঠিন জিজ্ঞাসা। বন্ধুরা অনেকে সেদিন যে পথ বিপ্লবের একমাত্র সরণি বলে মেনে নিয়েছে, তাদের সঙ্গে মানসিক সমর্থনকে মেলাতে পারেনি নীতীশ। তবু এটা জেনেছে যে এখন একক বীরত্বের সময় নয়, এটা সামগ্রিক যুগ; আজকের কাজ সমষ্টিকে নিয়ে, আজকের কাজ যোধপুরের ওই জেলে সম্প্রদায় নিয়ে—যাদের নৈতিক জীবনের পঙ্গু বনিয়াদ আত্মঘাত আর স্ব-বিরোধে কলঙ্কিত। কিন্তু তাই বলে অলকার মতো সে নৈরাশ্যবাদী নয়, 'জাগরণ সংঘ'কে কেন্দ্র করেও হয়তো জাতির সত্যিকারের সত্তাটাকে জাগিয়ে তুলতে পারবে সে।

—এখনো ঠিক করিনি—তাই খানিকটা আচ্ছন্নের মতো নীতীশ জবাব দিলে, কিন্তু পথ একটা বেছে নিতেই হবে। অনেকক্ষণের সংযমের বাঁধ এতক্ষণে যতীশের ভেঙে পড়ল। নিষ্ঠাবান শুদ্ধ-শান্ত বৈষ্ণব হঠাৎ শাক্তের মতো গর্জন করে উঠলেন।

—তোমরা কি ভেবেছ সারাজীবন এমনি করে জ্বালাবে আমাকে? একটা দিন আমাকে শান্তি পেতে দেবে না?

যতীশের গর্জনে চমকে উঠল নীতীশ। এই আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাতের অর্থটা একেবারেই বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইল।

—শেষ বয়েসে দু'দণ্ড বসে কৃষ্ণনাম করব, জপের মালা হাতে করে একটু শান্তিতে পরকালের ভাবনা ভাবতে পারব। কিন্তু তা তোমরা হতে দেবে না। না, এ সংসারে আর আমি থাকব না। দয়া করে এবারে আমাকে রেহাই দাও তোমরা, কালই আমি বৃন্দাবনে চলে যাই।

—আপনার কী হল বাবা?

—যা হল সে তোমরা বুঝবে না—অসহ্য ক্রোধের সঙ্গে যেন একটা তিক্ত যন্ত্রণা ফুটে বেরুল যতীশের স্বরে: তোমরা কোনোদিন তা বুঝবে না। এখন প্রভু চৈতন্যচন্দ্র আমাকে তাঁর চরণে আশ্রয় দিলেই বাঁচি।

নীতীশের বিস্ফারিত বিহ্বল দৃষ্টির সামনে দিয়ে যতীশ বড় বড় পা ফেলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

তারও আধঘণ্টা পরে মল্লিকা এসে ঢুকল শ্বশুরের ঘরে।

—বাবা, আপনার সরবৎ।

—রেখে দাও বৌমা, আজ আমি উপবাস করব।

—উপবাস? উপবাস কেন?—বিস্মিত হয়ে মল্লিকা বললে, আজ তো একাদশী কিংবা কোনো তিথি—

—না, একাদশী নয়।—মেঘমন্দ্র স্বরে যতীশ জবাব দিলেন।

—তবে?

চৈতন্যচরিতামৃত থেকে চোখ তুললেন যতীশ। দৃষ্টিতে প্রখর ভৎর্সনা আর অনুযোগ বর্ষণ করে বললেন, আজ আমার প্রায়শ্চিত্ত।

—প্রায়শ্চিত্ত! কিসের প্রায়শ্চিত্ত বাবা?—হতবুদ্ধি কণ্ঠে মল্লিকা প্রশ্ন করলে।

যতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, আজ আমার গৌর-নিতাই উপবাসী ছিলেন বৌমা। আমার আজ তো কিছু মুখে দেবার অধিকার নেই।

লজ্জায় অপমানে সঙ্গে সঙ্গে যেন মরে গেল মল্লিকা। রক্তহীন ফ্যাকাশে হয়ে গেল তার মুখ : বাবা, আজ আমায় ক্ষমা করুন।

—ক্ষমা তোমায় কেন করব বউমা! পাপ হয়েছে গৃহস্থের। সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো আমাকেই করতে হবে। তোমার কোনো দোষ নেই বউমা—কারো দোষ নেই।

কান্নায় ভেঙে পড়ে যতীশের পা জড়িয়ে ধরল মল্লিকা।

—উপবাস যদি কাউকে করতে হয়, সে আমিই করব বাবা, পাপ আমারই হয়েছে। আপনি, আপনি আমায় ক্ষমা করুন। এই সরবৎটুকু খেয়ে নিন—

—আমায় অনুরোধ কোরো না।—শান্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পা ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন যতীশ ঘোষ। বললেন, উপবাস আজ আমায় করতেই হবে। তুমি শুধু—যতীশ গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন : তুমি শুধু মহাপুরুষের বইয়ের এই পাতাগুলো পোড়ো বউমা, আমার আর কিছু বলবার নেই।

মল্লিকার অশ্রুচোখ খোলা চৈতন্যচরিতামৃতের ওপর গিয়ে পড়ল। হঠাৎ যেন সূর্যের আলো পড়ে চোখের ওপর থেকে অশ্রুর কুয়াসা মিলিয়ে গেল তার। হঠাৎ একটা নতুন সত্য যেন ধারালো বাণফলকের মতো এসে বিঁধল তার বুকের মধ্যে। যতীশ ঘোষের উপবাসের একটা সম্পূর্ণ নতুন অর্থ যেন স্ফুট হয়ে উঠল তার কাছে।

খোলা পাতায় লাল পেন্‌সিল দিয়ে দাগানো ছিল :

"নিজেন্দ্রিয়-সুখ হেতু কামের তাৎপর্য।
কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য গোপীভাব বর্য ॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে আনন্দ-বিহার—"

মহানন্দা।

সকাল বেলায় উঁচু ডাঙাটার ধারে দাঁড়িয়ে জলের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়েছিল নীতীশ। এই মহানন্দা। বালির চর আর বনঝাউ। মরা জলের মন্থর স্রোত। উত্তর বাংলার প্রাণপথ এখন যেন মৃত্যুর অববাহিকা।

স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল সে।

এই মহানন্দার জলধারাকে আশ্রয় করে একদিন গৌড়ের সমৃদ্ধি পেয়েছিল পূর্ণতা, ফলে, ফসলে, ঐশ্বর্যে গরীয়ান হয়ে উঠেছিল বরেন্দ্রভূমি। কিন্তু আজ গৌড়ের ভাঙা বার-দুয়ারী আর হৃতশ্রী সোনা-মসজেদের কঙ্কাল মহানন্দার জলে ছায়া ফেলেছে।

হিমালয় থেকে নেমেছে কুশী নদীর প্রবাহ, বয়ে আসছে নেপালের বুকের ভেতর দিয়ে। গ্রীষ্মের উত্তাপ লাগত তুষারবিকীর্ণ হিমালয়ের চূড়োয় চূড়োয়, গলত গ্লেশিয়ার, পাহাড়ভাঙা ঝর্ণা নামত, কূল ছাপিয়ে বয়ে যেত কুশী নদীর বান। সেই কুশী নদী থেকেই মহানন্দা এক সময়ে সংগ্রহ করত তার অফুরন্ত জলের সম্পদ, বইত তার পাড়ি-ভাঙা খরস্রোত—যেমন বিস্তীর্ণ, তেমনি গভীর; বালির চড়া পড়ত না, অভিশাপের মতো মাথা তুলত না বনঝাউয়ের দল। কিন্তু এ দিন রইল না। কুশী নদী তার প্রবাহ বদলালো, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মহানন্দার সংযোগ, আর সেই সঙ্গে মহানন্দার বুকেও মৃত্যুর সংকেত এল ঘনিয়ে। ওই সংযোগটুকু আবার ঘটিয়ে দিতে না পারলে মহানন্দা আর বাঁচবে না, মৃত্যু তার নিশ্চিত, নিশ্চিত তার তিল তিল অবক্ষয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। আর তারি সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি ভেসে এল সমস্ত দেশের ছবি, একটা তুলনাবোধের মতো দেখা দিল মনের মধ্যে। সারা দেশটারই যেন সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে, বিচ্ছেদ ঘটে গেছে গ্লেশিয়ার-গলা দুর্জয় প্রাণশক্তির সঙ্গে। এই বিচ্ছেদের ফাঁকটাকে ভরা যাবে কি দিয়ে? আর কোথায় আছে সেই হিমালয়ের শীর্ষ—সেই তুষারমৌলি উদাত্ত গিরিশৃঙ্গ, যা জীবনের জনয়িতা—প্রাণের উৎস! কোন্ কুয়াশার আড়ালে লুকিয়ে আছে তা?

ঠিক বুঝতে পারছে না। ধরতে পারছে না কোন্‌খান দিয়ে কাজ আরম্ভ করতে হবে। অলকার কথাই কি ঠিক? এ শুধু নিজেকে ঠকানো ছাড়া আর কিছুই না? অলকাই কি—

কিন্তু, না। সে মনের সঙ্গে পরিষ্কার বোঝাপড়া করে নিয়েছে একটা। অলকা যেই হোক অথবা যাই বলুক মনের ভেতর আর জায়গা দেওয়া চলবে না তাকে। হঠাৎ গত রাত্রির স্মৃতিটা রোমাঞ্চিত করে তুলল তাকে। শরীরের প্রতি রোমকূপে যেন রাত্রির সে

স্মৃতি অনুরণিত হচ্ছে—শিউরে শিউরে উঠছে রক্তবাহী প্রতিটি শিরা-উপশিরাই। দেবদাসী মানবী হয়ে ধরা দিয়েছে তার কাছে, একান্ত হয়ে মিলিয়ে গেছে তার বুকের ভেতর। অন্ধকারে প্রতিহারী সোনার গৌরাঙ্গের চোখ দুটো শুধু জলজ্বল করেছে একটা ব্যর্থ হিংসায়। কিন্তু সে হিংসা ওকে স্পর্শও করতে পারেনি।

ভালোই হল—এ ভালোই হল। সমস্যাটা মিটে গেছে, নিষ্পত্তি হয়ে গেছে একটা অর্থহীন সমস্যার। সেতুবন্ধন হয়েছে দুর্বোধ্য একটা ব্যবধানের ওপর দিয়ে। অলকা শুধু সেখানে গ্রন্থিই রচনা করছিল—এই ভালো, চিরদিনের মতো সরে গেল তার কাছ থেকে।

মহানন্দার ভিজে বাতাস নিঃশ্বাসে টেনে নিয়ে—যেন সে নিজের মধ্যে একটা মুক্তিকে উপলব্ধি করতে চাইল। কাজ করা চাই। কিন্তু কী ভাবে করবে ঠিক করে উঠতে পারেনি এখনো। সরকারী নিষেধপত্রের জন্যে তার উৎকণ্ঠা কিছুমাত্র নেই—ওসব উপদ্রবের জন্য অনেকদিন আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে তবে জাগরণ সংঘকে দিয়ে দেশকে কতটা জাগানো যাবে সে চিন্তাও এখন যেন নীহারিকার মতো অস্পষ্ট। দলের বেশির ভাগ লোকই আজ যে পথে নেমে পড়েছে, মনের দিক থেকে সেটাকে সে মানতে পারেনি। ওদের অত বেশি আদর্শবাদ—অত ভেবেচিন্তে হিসেব কষে প্ল্যান-প্রোগ্রাম তার ভালো লাগে না। তার মধ্যে এখনো বিপ্লবীর রক্ত আগুন-লাগা খানিকটা স্পিরিটের মতো জ্বলে যাচ্ছে। সে আরো প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতে চায়—সোজাসুজি লড়াইয়ে নেমে পড়তে চায়। ওই চাষী-মজদুর ক্ষেপানো স্বর্ণ দিনের প্রতীক্ষায় বসে থেকে নয়, জনগণ কবে দয়া করে তাঁদের অনন্ত নিদ্রা থেকে জেগে উঠবেন সেই স্বপ্নাদ্য শুভ মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করেও নয়! এখনি নেমে পড়তে হবে। এবং সেটা যে অহিংস নিরামিষ পন্থায় নয় তা বলাই বাহুল্য।

আগের দলবলগুলো ভেঙে পড়েছে। প্রায় সবাই ছুটেছে ওই চাষী-মজদুরের পেছনে। কিন্তু নীতীশের ধাতে ও কুলোবে না। জেলে বসে যা পড়াশুনো করেছে তাতে অবশ্য এটা বুঝেছে যে আগেকার মতে চলে আর এখন লাভ নেই, তিনটে সাহেবকে সাবাড় করে আরো তেত্রিশটাকে ডেকে আনা হবে মাত্র। তাতে না মেলে দেশের লোকের সহানুভূতি, না পাওয়া যায় সহায়তা। সুতরাং বেশ বড় করে আরম্ভ করা দরকার। সমস্ত মানুষের হাতে হাতিয়ার তুলে দেওয়া চাই, তিনটে রিভলভার আর দুটো পিস্তলের কাজ নয়। জাগরণ সংঘ খানিকটা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু অত বড় একটা কাজ করতে গেলে আরো বাড়ানো চাই তার ক্ষেত্র-পরিধি, চাই আরো ব্যাপক বিস্তার।

কিন্তু কী উপায়ে?

সেটাই ভাবা দরকার। এবং সেজন্যে দেশের বাড়িতে আর চুপ করে বসে নিজের

মানসিক দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হলে চলবে না। যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে, আর নয়। দলগুলো ভেঙে গেছে, কিন্তু নতুন করে আবার সংগঠন গড়ে তুলতেই হবে। হাঁ—সোজা কথা। সশস্ত্র জাগরণ চাই, চাই ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে রক্তঝরা বিপ্লব। অতএব দু'এক দিনের মধ্যেই একবার শহরে যাওয়া দরকার। একবার তত্ত্বতালাস করে দেখতে হবে, বিগত দিনের সেই ফুল্‌কিগুলোকে আবার দুটো-চারটে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা আগামী দিনের বিপুল অগ্নিযজ্ঞের জন্যে।

—প্রণাম হই ছোটবাবু।

নীতীশ মুখ ফেরালো। একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে। বেঁটে রোগা চেহারা। হাড়ের খাঁচাটার ওপর কালো সিল্‌কের আবরণের মতো কোঁচ্‌কানো চামড়া ঝিকঝিক করছে। মাথার চুল বারো আনাই পাকা, দাঁত পড়ে যাওয়াতে শুকনো চিমসে মুখের দিকে তাকালে যেন শুঁটকি মাছের কথা মনে পড়ে। ধুতিটা হাঁটুর ওপরে উঠে এসেছে। আর সব কিছু মিলিয়ে দারিদ্র্য আর উপবাস নির্ভুল স্বাক্ষর এঁকে রেখেছে তার সর্বশরীরে।

নীতীশ ভ্রূকুঞ্চিত করলে, কে তুমি ?

—আমাকে চিনলেন না ছোটবাবু? আমি গোপেশ্বর!

তেমনি বিস্মিত সংশয়ে নীতীশ বললে, গোপেশ্বর ? কোন্ গোপেশ্বর ?

—ভুলে গেছেন ছোটবাবু? ছোটবেলায় আমার কলমের ফজলী আপনার উপদ্রবে একটাও থাকত না সে কথা মনে নেই বুঝি ?

—ঠিক, ঠিক।—বিদ্যুতের মতো স্মৃতিটা পলকে আলোকিত হয়ে উঠল : মালঞ্চীর গোপেশ্বর ? গোপেশ্বর মণ্ডল ?

—জী, হাঁ—গোপেশ্বর দন্তহীন মুখে বাধিত হাসি হাসল : এবারে ঠিক চিনেছেন!

—দাঁড়াও, দাঁড়াও—তোমাকে যে চেনা যাচ্ছে না!—নীতীশের দৃষ্টি এবারে সন্ধানী আর তীক্ষ্ণ হয়ে গোপেশ্বরের ওপরে এসে পড়ল : তোমাকে তো—

—না, বাবু, এখন চিনবেন না—দন্তহীন শুকনো মুখে বীভৎস ভাবে হাসল গোপেশ্বর : তখন আমি অন্য মানুষ ছিলাম। দুখানা বড় বড় আমের বাগান ছিল আমার, তিরিশ বিঘে ধানী জমি ছিল। আমার বাড়িতে তখন মানুষ মাইন্দার খাটত।

—সে কি!—গোপেশ্বরের সর্বাঙ্গে আর একবার জিজ্ঞাসু ও ব্যথিত দৃষ্টি ফেলে নীতীশ জিজ্ঞাসা করল, গেল কোথায় সে সব ? বিক্রিবাটা করে দিয়েছ নাকি ?

—হুঁ, বিক্রি করেই দিয়েছি!—গোপেশ্বর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—ছি, ছি, কেন বিক্রি করলে ? তোমার বাড়িঘর ?

—কিছুই নেই।—বড়কর্তাকে জিজ্ঞাসা করবেন ছোটবাবু।—হঠাৎ গোপেশ্বরের

মুখের চেহারাটা কেমন হয়ে উঠল, কালিপড়া কোটরের আড়ালে ঝিলিক দিয়ে উঠল চোখ। তারপরেই নিজেকে সামলে নিলে সে, ঝুঁকে পড়ে একটা সশ্রদ্ধ নমস্কার করে বললে, প্রাতঃপেন্নাম যাই ছোটবাবু।

নীতীশ কঠোর গলায় বললে, দাঁড়াও।

গোপেশ্বর থমকে গেল। মনে হল কাজটা তার অন্যায় হয়েছে, আর যাকেই হোক নীতীশকে বলাটা ঠিক হয়নি। আর যদি বা কোনো প্রতীকারের আশা থাকত তা হলেও হত, কিন্তু এখন সে সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবেই আয়ত্তের বাইরে। সুতরাং তাড়াতাড়ি সরে পড়তে চাইল গোপেশ্বর।

—না ছোটবাবু, আমি এখন যাই। একটা গোরু আমার পাঠিয়েছে ভোলাহাটের খোঁয়াড়ে। অনেক খুঁজে আজ খবর পেয়েছি, এবেলাই যদি ছাড়ান্ করে না আনি, তা হলে হয়তো বা নীলাম করে দেবে খোঁয়াড়ওয়ালা। আমি যাই।

—দাঁড়াও, একটা কথার জবাব দিয়ে যাও।—তেমনি রূঢ়ভাবে নীতীশ বললে, বড় কর্তা! তুমি কার কথা বলতে চাইছ গোপেশ্বর? আমার বাবা?

গোপেশ্বর মাথা নীচু করে রইল। উত্তর দিলে না।

—বলো গোপেশ্বর, জবাব দাও। কে বড়কর্তা? আমার বাবা?

—জী হাঁ।—এবার বিপন্নভাবে জবাব দিলে গোপেশ্বর। তারপর সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বললে, এখন ও সব ভেবে আর কী হবে ছোটবাবু, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে।

—না, কিছুই হয়নি—তীব্র দৃষ্টি গোপেশ্বরের মুখে ফেলে নীতীশ বললে, কী হয়েছে আমাকে বলে যাও।

অপরাধীর গলায় গোপেশ্বর বললে, আমার তো সবই কর্তাবাবু খাস করে নিয়েছেন। আমার সব কিছুর তো এখন আপনিই মালিক ছোটবাবু।

—কেন সেইটেই জানতে চাই আমি।—নীতীশের সমস্ত মনটা চকিতে কালো হয়ে গেল। সকালের রোদে শান্ত সমুজ্জ্বল মহানন্দার ওপর দিয়ে যেন মেঘের ছায়া পড়ল বিকীর্ণ হয়ে।

—মাঝখানে কুবুদ্ধি হয়েছিল ছোটবাবু—ম্লানকণ্ঠে গোপেশ্বর বললে, গুড়ের ব্যবসা করবার সখ হল। বোচাগঞ্জ থেকে গুড় আনিয়ে শহরে এক আড়ত করেছিলাম। সেই সময় কর্তাবাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলাম। দিন কয়েক ভালোও চলেছিল বেশ। কিন্তু বরাত মন্দ ছোটবাবু, মাড়োয়ারীরা পেছনে লাগল, আমি বসে গেলাম। তারপর—গোপেশ্বর থামল।

—থাক, আর বলতে হবে না। বুঝেছি আমি।—মেঘের মতো মুখ করে নীতীশ

মহানন্দার জলের দিকে তাকিয়ে রইল।

—তবে আমি চলি ছোটবাবু—

জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু নীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে আর অপেক্ষা করল না গোপেশ্বর, দ্রুতপায়ে হেঁটে চলে গেল।

আশ্চর্য—সেই গোপেশ্বর! বিরাট বিরাট ছুটো ফজলি আমের বাগান ছিল তার, আমের সময় দু হাজার আড়াই হাজার করে তার ডাক উঠত। তিরিশ বিঘের ওপর ধানী জমি ছিল কালিয়াচক থানার ওদিকে—ওখানকার ফসলী জমিতে সোনা ফলে। মরাইতে মরাইতে ধান ভরা ছিল গোপেশ্বরের, গোয়ালভরা গোরু ছিল। কতবার সেই গোরুর ক্ষীরের মতো দুধের সঙ্গে গোপালভোগ আমের আমসত্ত খাইয়েছে নীতীশকে। এখনও মনে পড়ে শাদা রঙের একজোড়া গাড়িটানা বলদ ছিল গোপেশ্বরের—বলদ তো নয়, যেন হাতীর বাচ্চা! তারা যখন গাড়ি নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটত তখন এ জেলায় এমন একখানাও গাড়ি ছিল না যা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

আশ্চর্য, কোথায় গেল!

আর সমস্ত গ্রাস করেছেন যতীশ ঘোষ—তার বাবা! অর্থের অভাব নেই তাঁর, তাঁর সমৃদ্ধি এ অঞ্চলে নামকরা। একমাত্র সন্তান নীতীশ ছাড়া সে সম্পত্তির ওয়ারিশানও নেই কেউ। তা ছাড়া পরম বৈষ্ণব তিনি, অহিংসা আর জীবে দয়া তাঁর ধর্ম, এমন কি, কালও তিনি গুনগুন করে গাইছিলেন:

"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
স্থত-মিত-রমণী সমাজে—"

এই তাঁর বৈরাগ্যের নমুনা আর এই তাঁর বৈষ্ণবতা! একটা সীমাহীন বিতৃষ্ণায় মনটা তেতো হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে—একটা নতুন আলোর ঝলক পড়বার মতো, একটা সত্য উদ্‌ঘাটনের মতো নীতীশের মনে হল, তার কাজ সে বুঝতে পেরেছে, পেয়েছে তার চলার পথ। কোন্ হিমালয়ের তুষার-শুভ্র চূড়া থেকে নামবে গ্লেশিয়ার গলা জলের ধারা, কুশী নদীর কোন্ বন্যাধারা আবার মরা মহানন্দার বুককে প্লাবিত করে দিতে পারে—তার সন্ধান তার মিলেছে এইবারে।

ওদিকে সমস্ত দিনটা যেন একটা জ্বরের ঘোরে কাটল মল্লিকার। যতীশ তাকে বুঝতে পেরেছেন, সে চিনেছে যতীশকে। যেটুকু বোঝবার বাকি ছিল তাকে সুস্পষ্ট করে দিয়েছে চৈতন্যচরিতামৃতের খোলা পাতাটা আর সেই পাতার কয়েকটি পংক্তি। আর সন্দেহ নেই।

সে কৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণ। সমস্ত বিশ্ব-পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র পুরুষ, পুরুষোত্তম। আর যেদিকে, যার দিকেই তাকাও, সবাই প্রকৃতি। বৈষ্ণব একমাত্র

তাঁকেই আত্মদান করতে পারে, একমাত্র তাঁকেই সমর্পণ করতে পারে জীবনযৌবন। আর যা কিছু সবই অপরাধ, সবই অন্যায়, অবৈষ্ণবোচিত। সাংসারিক সম্পর্ক যাই থাকুক এখন নীতীশও তার কাছে পরপুরুষ, শ্রীকৃষ্ণই তার একমাত্র স্বামী।

সুতরাং অপরাধ করেছে মল্লিকা। অপরাধ করেছে দেবতার কাছে। যতীশের সমস্ত আচরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে তারই তিরস্কার, লুকানো আছে তারই ধিক্কার। এখনই এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সংযমে এবং অনুতাপে পরিশোধিত করে নিতে হবে নিজেকে, মন থেকে মুছে ফেলে দিতে হবে কামনার শেষ বিন্দুটুকুকেও।

গতরাত্রিতে আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়েছিল নিজেকে। মনে হয়েছিল নিজের দেহের অণুতে অণুতে যেন আলো জ্বলে উঠেছে তার। একটা সুখাবিষ্ট স্বপ্নের মতো রাত্রির প্রহরগুলো পার হয়ে গেছে—যেন কাল সমস্ত রাত্রি ধরে বর্ষার স্নিগ্ধ ধারা ঝরে পড়েছে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত একটা তৃষ্ণার্ত মরুভূমির উপরে।

কিন্তু এখন সব কিছুই কালো হয়ে গেছে লজ্জায় আর গ্লানিতে। নিজের অশুচিতায় আর অসংযমে যেন মরে যাচ্ছে মল্লিকা, যেন মাথাটা লুটিয়ে যাচ্ছে মাটিতে। বারো বছর ধরে নিজেকে যে পূজোর ফুলের শুচিশুভ্র অম্লানতায় প্রস্তুত করে রেখেছিল, মাত্র এক রাত্রির ভুলে আর দুর্বলতায় সে তাকে পথের ধুলোয় লুটিয়ে দিলে! ছি, ছি, এ সে করল কী!

পূজোর ঘরে ঠাকুরের নৈবেদ্য-চন্দন সাজিয়ে দিতে আজ তার হাত কাঁপতে লাগল। তার অশুচি হাতের এই অর্ঘ্য দেবতা আজ আর গ্রহণ করবেন না। আজ যেন এই পূজোর ঘরে ঢুকবার অধিকার থেকেই সে বঞ্চিত হয়েছে। "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে কাম নাম।" কেমন করে সে ভুলে গেল মহাজনদের সাবধান-বাণী, কেন সে এমন করে—

হঠাৎ নীতীশের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণা মনের ভেতরে খানিকটা বিষ-বাষ্পের মতো সঞ্চারিত হয়ে গেল তার। এর জন্যে সে একা দায়ী নয়, একাই সে এই অপরাধের কালো পঙ্কে নেমে আসেনি। নীতীশ বিভ্রান্ত করেছে তাকে, দিয়েছে তার সংযম-নিয়ন্ত্রিত জীবনকে বিপর্যস্ত করে। যেন মনে মনে কোথায় একটা গভীর চক্রান্ত আছে তার। একটা তীব্র বিদ্বেষ এসে মল্লিকার চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে ধরতে লাগল: ঠিক তাই, নিশ্চয়ই তাই। এতদিন তো বেশ ছিল তারা, দিনের পর দিন কেটে চলেছিল বাঁধা নির্ভুল নিয়মে, কোথাও কোনো বিপর্যয়ের দোলা লাগেনি, এতটুকু ছন্দপতন হয়নি কোনো কিছুর। তবে? নীতীশ আসবার পরেই এই বাড়ির বারো বছরের নীতি-নিয়মে ফাটল পড়তে শুরু হয়েছে। যতীশের নেই সেই সদাহাস্য মুখ, সেই সৌম্য আধ্যাত্মিকতার জ্যোতিটাও যেন আজকাল আর চোখে পড়ে না। কেমন খিটখিটে

ভাব এসেছে একটা, সমস্ত চেহারায় থমথমে কী একটা ঘনিয়ে থাকে তাঁর। তাদের এতদিনের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রায়—

কিন্তু আর ভাবতে পারল না মল্লিকা। মাথার স্নায়ুগুলোতে রক্ত-চাঞ্চল্য উতরোল হয়ে উঠেছে। নিজের মনের চেহারা দেখে অসীম আশঙ্কা আর বেদনায় সে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল। দ্রুত উঠে দাঁড়ালো মল্লিকা, চলে এল ঠাকুরঘরে। ধূপধুনো আর ফুলের সুগন্ধে যেখানে রাইকিশোর অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে আছেন, আকুল ভাবে সেখানে লুটিয়ে প্রণাম করলে মল্লিকা।

উপায় চাই, উপায় চাই। চাই প্রায়শ্চিত্তের সুযোগ। একবার ভুল হয়ে গেছে বলেই আর ভুল করবে না সে। শক্ত হয়ে উঠবে সে, মনের মধ্যে গড়ে তুলবে একটা পাথরের প্রাচীর। কোনো ঝড় কোনো ঝাপটা ভেঙে ফেলতে পারবে না, দিতে পারবে না এতটুকুও আঁচড়।...

......সেই রাত্রে একটা অঘটন ঘটল। যে মেঘ এই কদিন থেকে একটু একটু করে পুঞ্জিত হচ্ছিল, তার রন্ধ্র থেকে বেরিয়ে এল ঝড়ের দমকা।

সমস্ত দিন বসে বসে নীতীশ ভাবছে গোপেশ্বরের কথা। লোকটার যথাসর্বস্ব গ্রাস করে পথে বসানো হয়েছে তাকে, এমন কি একটু একটু করে লোকটা এগিয়ে চলেছে মরণের মুখে। অথচ পরম ধার্মিক মানুষ যতীশ ঘোষ, ত্রিসন্ধ্যা কুঁড়োজালি জপ আর নামকীর্তন না করে জলগ্রহণ করেন না তিনি। তবু গোপেশ্বরকে সর্বস্বান্ত করতে তাঁর বাধেনি, তাঁর কৃষ্ণপ্রেম একবারও আর্তনাদ তোলেনি মনের মধ্যে! আশ্চর্য!

সন্ধ্যাবেলা কথাটা সে তুলল বাপের কাছে।

অসীম বিরক্তিতে যতীশ ভ্রূভঙ্গি করলেন: তোমার কাছে দরবার করতে এসেছিল নাকি লোকটা? মহা ধড়িবাজ, মহা শয়তান ও ব্যাটা! সোজা ভুগিয়েছে! জমিটুকুর দখল পেতেই তিনশো টাকা বেরিয়ে গেছে আমার।

—কিন্তু তাই বলে—

যতীশ ধমকে উঠল: কী বলতে চাও তুমি? বারোশো টাকা ধার দিয়েছিলাম, চারটিখানি কথা? ওর গুড়ের ব্যবসা ডুবেছে বলে আমার টাকাগুলোও ডুবে যাক, তাই কি বলতে চাও?

—কিছুই কি ওকে ছেড়ে দেওয়া যেত না?

—কি করে ছাড়া যাবে?—যতীশের বৈষ্ণব মুখে সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবোচিত ভঙ্গি প্রকাশ পেল একটা: টাকা কালোজামের গাছ নয়। নাড়া দিলেই ঝুরঝুর করে পড়ে না; অনেক মেহনত করে রোজগার করতে হয়।

নীতীশের মুখের রেখাগুলো ক্রমে শক্ত হয়ে উঠতে লাগল: কিন্তু ওর ছোটো বাগানের

দামই কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা হত—ঘরবাড়ির কথা ছেড়েই দিলাম।

যতীশ স্থিরদৃষ্টিতে তাকালেন এবার।

—এখনো আমি বৃন্দাবনে যাইনি, এখনো সম্পত্তি লেখাপড়া করে দিইনি তোমাকে। বুঝেছ?

নীতীশ উত্তর দিল না, তাকিয়ে রইল। শুধু নিজের অজ্ঞাতেই ঠোঁটের কোনায় একটুখানি হাসির রেখা যেন দেখা দিল তার। আধ্যাত্মিকতার মুখোশ খসে গেছে, সত্যিকারের চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছে যতীশ ঘোষের।

—তা হলে ওকে কিছু আপনি ছেড়ে দেবেন না?

—হয়তো দিতাম। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। ও সম্পত্তির আমি নিজে কানা-কড়িও ছুঁইনি, সবই ঠাকুরের নামে দেবত্র করে দিয়েছি। যাক, এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কোনো আলোচনা করতে ইচ্ছে নেই আমার। আমি যখন চোখ বুজব তারপরে এসব ভাবনার ভার তুমি নিয়ো; তার আগে নয়।

যতীশ আর কথা বাড়ালেন না। মুখের সামনে মস্ত বড় একটা ভারী দরজা সশব্দে বন্ধ করার মতো আলোচনাটা যেন থাবা দিয়ে থামিয়ে দিলেন তিনি, উঠে চলে গেলেন পূজোর ঘরে। যেন ওইটেই তাঁর দুর্গ—একান্ত নিরাপদ জায়গা—যেখানে নীতীশের আক্রমণ কোনো উপায়ে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে না।

আহত অপমানিত মুখে নীতীশ চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। বৃন্দাবন—ধর্ম—আধ্যাত্মিকতা। বিষয়-বিষে জর্জরিত হয়ে আর কতকাল এই পাপকুণ্ডে পড়ে থাকা। তাই বটে! তাই পনেরো শো টাকার বিনিময়ে পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি গ্রাস করতে এতটুকুও বিবেকের আর্তনাদ জাগল না যতীশের!

—ও সম্পত্তি আমি নিজে ছুঁইনি, ঠাকুরের নামে দেবত্র করে দিয়েছি!—ভণ্ডামিরও একটা সীমা থাকা উচিত। পাথরের দেবতা রাত্রির অন্ধকারে শুধু তাকিয়ে থাকতে পারেন লুব্ধকের মতো সোনার চোখের আগ্নেয়-ঈর্ষা নিয়ে; কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারেন না, আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতাও নেই। তাই যত অন্যায়, যত পাপকে তাঁর কাঁধে তুলে দিয়ে ভারমুক্ত হওয়া, হত্যাকেও শোধন করে নেওয়া আশীর্বাদী শান্তিজলে।

দেশের জন্য কিছু করতে হবে। কিন্তু তার আগে, নীতীশের মনে হল তার আগে ঘরে থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবে মনে হচ্ছে। বেশ বোঝা গেল যতীশ সহজ প্রতি-দ্বন্দ্বী নন, ভেক নিয়েই তিনি 'তৃণাদপি সুনীচেন' আর 'তরোরিব সহিষ্ণুণা' হয়ে ওঠেননি। আঘাত দিলে প্রতিঘাত দেবার জন্যে তিনি প্রস্তুত আছেন। ওদের পূর্বপুরুষ আগে দই দুধ বেচত আর বাঁক নিয়ে আদিগন্ত মালদহের 'টাল' জমিতে ডাকাতি করত—সেই হিংস্র রক্ত সেও তো যতীশের কাছ থেকেই পেয়েছে উত্তরাধিকারের সূত্রে।

সম্পত্তির মালিক তিনি, এক কথায় স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর অধিকারের ওপর হাত বাড়াতে গেলে বিন্দুমাত্র ক্ষমাও তিনি করবেন না। ছেলেবেলায় সামান্য একটুখানি অপরাধে প্রায় ঘাতকের মতো নির্দয়ভাবে তিনি ছেলেকে খড়ম দিয়ে পিটিয়েছিলেন, আজ অনেকদিন পরে তাঁর চোখে যেন সেই দৃষ্টির ইঙ্গিত দেখতে পেল সে।

কিন্তু কি করা যায়?

রাত্রেও ঘরে এসে বিছানার পাশে বসে সে ভাবতে লাগল কী করা যায়? এখন থেকেই কি সংঘাত শুরু হয়ে যাবে? জাগরণ সংঘ নয়, নিজের পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করে জাগবে প্রথম বিদ্রোহের ঘূর্ণি?

বাইরে রাত বাড়ছে। আমবাগানের ভেতরে শেয়ালে প্রহর ঘোষণা করল। দরজা ঠেলে চাকরটা ঘরে ঢুকল জলের গ্লাস নিয়ে, টেবিলের ওপর রেখে বললে, দাদাবাবু, এই জল রইল।

নীতীশের চমক ভাঙল, সঙ্গে সঙ্গে একটা তীক্ষ্ণ বিস্ময় সাড়া দিয়ে উঠল মনের মধ্যে।

—তোর বৌদি কোথায়?

চাকরটা একটু হাসল কি? ঠিক বোঝা গেল না। বললে, বৌদি তো এ ঘরে শোবেন না আর। তিনি ও ঘরে শুয়েছেন।

—ওঃ!—নীতীশের চোখ দুটো হঠাৎ ধ্বক্ ধ্বক্ করে উঠল : কেন?

—আমি কী করে জানব বাবু?

তা বটে। কথাটা ওকে জিজ্ঞাসা করা অকারণ, অশোভনও বটে।

—আচ্ছা, যা তুই।

চাকরটা জানে না, কিন্তু নীতীশ বুঝেছে। এখানেও যতীশ, এখানেও তিনি অধিকারের হাত বাড়িয়েছেন। তাই কাল রাত্রে ধরা দিয়েই আবার সরে গেছে মল্লিকা, দেবদাসী আবার আত্মগোপন করেছে তার স্বর্গীয় আবরণের আড়ালে। আজ সারাদিন ধরে সমস্ত তিক্তটাকে ডুবিয়ে দিয়ে, অলকার ক্ষতটার ওপরে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে যে মাদকতাটা রক্তের মধ্যে রিন্‌রিন্ করছিল—এক মুহূর্তে ছিঁড়ে তা হাওয়ায় উড়ে গেছে।

এখানেও যতীশ হাত বাড়িয়েছেন। মল্লিকাকেও তিনি ছিনিয়ে নিচ্ছেন তার কাছ থেকে। কিন্তু এ চলবে না, কিছুতেই একে সহ্য করা যাবে না। সে গোপেশ্বর নয়। তার সমস্ত ঋণের দায়ে তিনি দেবত্র করে দিতে পারেন, কিন্তু নীতীশের কাছে তাঁর পিতৃঋণের দাবিটা কি এমনি শুয়ে গিয়েই পৌঁছুতে পেরেছে যার জোরে তার স্ত্রীকে ছিনিয়ে দেবতার পায়ে দেবদাসী রূপে নিবেদন করে দেবেন?

বাধা দিতে হবে। এইখানে থেকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তার পৌরুষের অধিকারকে।

রক্তে যেন আগুন ধরে গেছে। ইচ্ছে করে ছুটে বেরিয়ে যায় সে, একটা ক্ষিপ্ত হিংস্র

মানুষের মতো জোর করে মল্লিকাকে টেনে আনে তার কাছে, ভেঙে চুরমার করে দেয় তার চারদিকে ঘিরে আসা একটা কুটিল চক্রান্তের ব্যূহকে। কিন্তু ইচ্ছাসত্ত্বেও সে পারল না। শুধু স্তব্ধ হয়ে যেখানে বসেছিল সেইখানেই বসে রইল, আর অন্ধকারে আজ তার চোখ জ্বলতে লাগল সোনার গৌরাঙ্গের চাইতেও তীব্র ভয়াবহ দ্যুতিতে!

১২

অন্য রুমের প্রভাতীর কাছে অ্যালজাব্রার অঙ্ক কষতে গিয়েছিল অলকা। এই অ্যালজাব্রা জিনিসটার সঙ্গে এখনো তার বন্ধুত্ব হয়ে উঠল না। সবাই বলে ভারী সোজা—নম্বর তুলতে অ্যালজাব্রার মতো কিছুই নেই। কিন্তু কেমন গোলমেলে লাগে অলকার, কোনমতেই ফর্মুলাগুলো মনে থাকে না। তা ছাড়া এ স্কোয়ার বি স্কোয়ারের সমারোহ দেখে কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায় মাথার মধ্যে।

প্রভাতী মেয়েটা অঙ্কে ভালো। শুধু ভালো বললে কম বলা হয়, অদ্ভুত একটা নেশা আছে তার অঙ্ক সম্বন্ধে। খেতে বসেও থালার ওপর আঙুলের আঁচড় দিয়ে জ্যামিতির একস্ট্রা কষতে থাকে, অকারণে রাত জেগে জটিল অঙ্কগুলোর সমাধান করে সে। নিজের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা জটিলতা আছে প্রভাতীর। যেমন কালো, তেমনি রোগা আর লম্বা, বয়েস একটু বেশি বলে চেহারায় এসেছে কেমন একটা রূঢ় কাঠিন্য। প্রভাতীকে কেউ কখনো হাসতে দেখেনি। ক্লাসের সহপাঠিনী মেয়েরাও বেশি কাছে এগোতে ভরসা পায় না ওর—একটা সসম্ভ্রম দূরত্ব বাঁচিয়ে চলে সব সময়ে। মুখের ওপর খানিকটা অসন্তোষ আর বিরক্তি ওর ফুটেই আছে—যেন পৃথিবীটাকে নিয়ে অঙ্ক কষতে গিয়ে ঠিকে ভুল হয়ে গেছে প্রভাতীর।

সুতরাং অন্যান্য মেয়েদের মতো অলকারও ওর সম্পর্কে বিশেষ অনুরাগ নেই। কিন্তু আর কিছুদিন পরেই প্রি-টেস্ট, একটু দেখেশুনে না নিলে অসুবিধেয় পড়তে হবে। কাজেই প্রভাতীর দ্বারস্থ হতে হল।

যখন ফিরল দেখে তাদের ঘর অন্ধকার। আলো নিবিয়ে মণ্টু বিছানায় উবুড় হয়ে পড়ে আছে। ঘুমুচ্ছে বোধ হয়।

অলকা আলো জ্বালল। কিন্তু মণ্টু ঘুমোয়নি, সুইচের আওয়াজ কানে যেতেই গায়ের কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল। মাথার চুল বিশৃঙ্খল, চোখ দুটো কেমন ফোলা ফোলা। একটা অসুস্থ বিহ্বল দৃষ্টিতে মণ্টু অলকার দিকে তাকালো।

টেবিলের ওপর খাতা পেন্‌সিল নামিয়ে অলকা জিজ্ঞেস করলে, কি রে, শরীর খারাপ নাকি ?

ভারী গলায় মণ্টু জবাব দিলে, না!

—তবে এই সন্ধ্যেবেলায় আলো নিবিয়ে অমন ভূতের মতো পড়ে আছিস কেন ? হয়েছে কী তোর ?

—না, কিছু না—মণ্টু বিছানাটার শিয়রের দিকে এগিয়ে গেল, তারপর খোলা জানালাটার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রইল একটা শূন্য স্তব্ধ দৃষ্টি ফেলে।

কেমন খটকা লাগল অলকার। অমন হাসি-খুশি মেয়েটার কী হল হঠাৎ যে এমন একটা ভাবান্তর ঘটে গেল ? মণ্টুর পাশে এসে সে দাঁড়াল, আবার প্রশ্ন করল, হল কি রে ? মন খারাপ ?

অব্যক্ত স্বরে মণ্টু জবাব দিলে, হুঁ।

—হঠাৎ ? ব্যাপার কী ?

মণ্টু জবাব দিলে না, তেমনি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। আচমকা একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এল অলকার, চাপা কান্নার শব্দ। মণ্টু কাঁদছে।

—কাঁদছিস নাকি রে ? ব্যাপার কী ?

মুখ ফেরালো মণ্টু। কান্নার আবেগে ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে তার, গালের ওপর দিয়ে নেমেছে অশ্রুর ধারা। একটা গভীর বেদনায় সমস্ত মুখখানা তার নীলাভ হয়ে গেছে। চকিতের জন্যে একটা ঝাপ্‌সা আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে মণ্টু অলকার দিকে তাকালো, তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে বিছানার ওপর বসে পড়ল।

অপরিসীম স্নেহে আর উৎকণ্ঠায় অলকা তার পিঠে হাত রাখল।

—কী পাগলামি হচ্ছে ছেলেমানুষের মতো ? ব্যাপার কী খুলে বল্ দেখি ? বাড়ির চিঠি পেয়েছিস নাকি ?

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মণ্টু বললে, হু।

—কারো অসুখ-বিসুখ করেছে ?

—না।

—তবে ?—সীমাহীন বিস্ময়ে অলকা জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে তা হলে ?

আবার অশ্রুরক্ত চোখ তুলল মণ্টু। কান্নায় কাঁপা গলায় বললে, আমার ফাঁসির হুকুম এসেছে।

—ফাঁসির হুকুম ? মানে ?—অলকা অধৈর্য হয়ে উঠল : হেঁয়ালি রাখ্, ব্যাপার কী ?

মণ্টু প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : ফাল্গুন মাসে আমার বিয়ে।

—বিয়ে !—অলকা হেসে ফেলল : আরে এ তো আনন্দের কথা। গয়না পাবি, শাড়ি পাবি, বর পাবি, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বেশ মোটাসোটা গিন্নী হয়ে বসবি। এর জন্যে কাঁদছিস কেন রে ? বরং ভালো করে খাইয়ে দে।

কান্না থামিয়ে এবার ভ্রূকুটি করলে মণ্টু : ইয়ার্কি করিসনি।

—ইয়ার্কি ? বিয়ে করবি তাতে ইয়ার্কিটা কোথায় ?

মণ্টু হঠাৎ যেন মনঃস্থির করে ফেলেছে নিজের মধ্যে। শাড়ির আঁচলে চোখ দুটো মুছে ফেলল, বসল পিঠ সোজা করে। তারপর স্পষ্ট সতেজ গলায় বললে, আমি আত্মহত্যা করব লোকা।

—আত্মহত্যা ! কী সর্বনাশ !—অলকা শিউরে উঠল : কেন অমন করছিস বোকার মতো ? আরে বিয়ে তো একদিন করতেই হবে। দেখবি গলায় ফাঁসের দড়ি পরার চাইতে ফুলের মালা পরা ঢের সহজ।

—যা বুঝিস নে তা নিয়ে ফাজলেমি করিস নে লোকা।—এবার মণ্টুর স্বর অগ্নিগর্ভ শোনালো।

—এতে আবার বোঝাবুঝির কী আছে ? বিয়ে হবে—বিয়ে হবে। ল্যাঠা মিটে গেল—প্রশান্ত নিরাসক্ত গলায় অলকা জবাব দিলে।

—না—না—আমি পারব না—

আবার দু হাতে মুখ ঢাকল মণ্টু, আবার ভেঙে পড়ল উচ্ছ্বসিত কান্নায়।

এতক্ষণে অলকার সত্যি সত্যিই বিশ্রী বোধ হতে লাগল। বড্ড বাড়াবাড়ি করছে মণ্টু, নাটুকেপনারও সীমা আছে একটা ; উষ্ণভাবে অলকা বললে, এমন করছিস কেন ? বিয়ে কি কারু হয় না কোনোদিন, না পৃথিবীতে তোরই এই প্রথম হচ্ছে ?

—বিয়ে আমি করব না কে বলেছে তোকে ?—ক্রোধ আর কান্নার একটা মিশ্রিত ভঙ্গি করে মণ্টু ঝাঁঝিয়ে উঠল।

—তবে ?

—তবে ?—ঝাঁঝালো ভাবে মণ্টু বললে, তুই লেখাপড়ায় যতই ভালো হোস্ না কেন, তোর মগজে কিছু নেই। একেবারে সব গোবর।

—বেশ, তাই ভালো।—অলকা চটে গেল : এখন আমাকে ডিস্টার্ব কোরো না, আমি পড়ব।

—পড়্‌গে যা। কে মানা করছে তোকে ?

—কানের কাছে অমন ভাবে কাঁদলে কারু পড়া হয় না। ফোঁস্ ফোঁস্ করতে হলে ছাতে গিয়ে কর্ গে—রূঢ়ভাবে জবাব দিয়ে নিজের সীটে চলে এল অলকা। মণ্টু বিছানার ওপর গুম হয়ে বসে রইল।

অলকা ওর দিকে আর ফিরে তাকালো না। বাস্তবিক, এ ন্যাকামি। লেখাপড়ায় এমন কিছু ভাল নয় মণ্টু। গতবার ম্যাট্রিকে ডিগবাজি খেয়েছে, এবারেও যে খাবে সেটা প্রায় নিঃসন্দেহ। পড়েই না। তা ছাড়া বাইরের রাজনৈতিক জগৎ সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই তার ; মুখে স্নো ঘষতে আর শাড়ি-ব্লাউজ পাট করতেই বেশির ভাগ সময় কাটে। বড়লোক নবাবগঞ্জের এক রেশমকারবারীর আহ্লাদে মেয়ে। ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায় বলেই বোধ হয় বিয়ের নামে এমনি করে কেঁদে-কেটে হাট বাধাচ্ছে। যত সব—!

নানা এলোমেলো দুশ্চিন্তায় নিজেরই মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছে, তার ওপর মণ্টুর ব্যাপারটা সমস্ত মনকে একটা বিস্বাদ তিক্ততায় ভরিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ খাতায় এলোমেলো আঁচড় কাটল সে, তারপর 'লাহিরিজ্ সিলেক্ট্ পোয়েম্‌স্'টা কাছে টেনে নিতেই আস্তে আস্তে তলিয়ে গেল তার মধ্যে।

কতক্ষণ পড়েছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ চমকে উঠল। মণ্টু উঠে এসেছে তার বিছানা থেকে, বসেছে ওর পেছনে, তারপর ওর কাঁধের ওপর মাথা রেখে প্রাণপণে ফোঁপাতে শুরু করে দিয়েছে। কাল সরলাদির চোখের জল দেখে যেমন তার গায়ের মধ্যে রি রি করে উঠেছিল, আজ মণ্টুর কান্নাটা তার চাইতেও ক্লেদাক্ত বলে মনে হল।

শুষ্কস্বরে অলকা বললে, তুই কি আমায় পড়তে দিবি নে ?

—আশ্চর্য মেয়ে তুই লোকা।—ফোঁপাতে ফোঁপাতে মণ্টু বললে, একটুও সিম্প্যাথি নেই তোর ?

—সিম্প্যাথি হবে কি রে ? একটা কারণ থাকা চাই তো—অলকার স্বর তেম্‌নি নীরস শোনালো।

—কারণ না থাকলে শুধু শুধু কাঁদছি নাকি ?—মণ্টুর কান্নায় অভিযোগের আমেজ এল : বিয়ে সকলের হয়, আমারও হবে। সেজন্যে কিছু ভাবছি না আমি। কিন্তু—

—কিন্তু ?

—আমি ওই হরিশচন্দ্রপুরের কোন্ এক রামবিলাস পালকে বিয়ে করতে পারব না! আমি—আমি—

মণ্টু থেমে গেল। কিন্তু মুহূর্তে চমক লাগল অলকার, যেন এতক্ষণ পরে রহস্যের কালো আবরণটার ওপরে আলো এসে পড়ল। কথা বললে না সে, শুধু তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

আর একটা প্রবল কান্নার ঝোঁক সামলে নিয়ে মণ্টু বললে, আমি আর একজনকে ভালোবাসি।

যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কা এসে লাগল অলকার হৃৎপিণ্ডে। স্তব্ধতায় ঘরটা স্তিমিত হয়ে রইল কিছুক্ষণ।

নীরবতাটা ভাঙল অলকাই। মস্ত বড় একটা নিশ্বাসকে চেপে অলকা মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল, কে সে ?

—আমাদেরই গ্রামের ছেলে।

—বেশ তো, তোর মাকে লিখে দে না—

—না, সে হওয়ার উপায় নেই—আবার আর্তনাদ করে উঠল মণ্টু : তারা ব্রাহ্মণ।

—তাতে ক্ষতি কী ? জাতে উঠবি বরং।

—না ভাই, আমার বাবাকে তুই চিনিস নে—হতাশায় ভেঙে পড়ল মণ্টু : একেবারে বাঘের মতো মানুষ। শুনলে আমাকে খেয়ে ফেলবেন। তা ছাড়া অবস্থা তাদের খুবই খারাপ - কিছুতেই রাজী হবে না।

সেই পুরোনো সমস্যা, পুরোনো জটিলতা। পৃথিবীর একেবারে প্রথম দিনটি থেকেই এ প্রশ্নের সমাধান হল না। আচারের বাধা, ধর্মের বাধা, সমাজের বাধা, অবস্থার বাধা, কত অনাবশ্যক জটিলতায় জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে মানুষ, নিজের চারিদিকে গড়ে তুলেছে কী অর্থহীন নিষেধের গণ্ডী। প্রতি মুহূর্তে যেন তারা বুকের ওপর চেপে বসতে চায়, প্রতি মুহূর্তে যেন নিশ্বাস বন্ধ করে আনে! মনে হয় সব কিছু একটা বিরাট ফাঁকির ওপরে গড়া—সবই আছে, কিন্তু যাকেই ধরতে চাও তাই একটা ছায়াবাজির মতো মিথ্যে হয়ে সীমাহীন শূন্যতায় মিলিয়ে যাবে! অলকার বুকের মধ্যে মোচড় খেয়ে উঠল হঠাৎ, চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল।

আকুল কণ্ঠে মণ্টু প্রশ্ন করলে, কী করা যায় ভাই ?

—হুঁ।

—কিছুতেই এ বিয়ে আমি করতে পারব না ভাই। তার আগে আমায় আত্মহত্যা করতে হবে।

—আত্মহত্যা করবি কেন ?—বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে অলকা বললে, জীবনটা অত সহজে নষ্ট করে দেবার জিনিস নয়।

—কী করব ? আর উপায় নেই আমার।

কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল, কেমন যেন মনে হতে লাগল মণ্টুর সান্নিধ্যে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। মণ্টুর মানসিক ব্যাধিটা তাকেও এসে স্পর্শ করেছে, তার মধ্যেও ঘনিয়ে আসছে একটা অসহায় ব্যাকুলতা, একটা নিরুপায় কাকুতি। যেন মুহূর্তের মধ্যে সীমাহীন বঞ্চনার মূর্তি ধরে তারও সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সমস্ত পৃথিবী। অলকার হঠাৎ অত্যন্ত কষ্ট হতে লাগল—একটা তীব্র যন্ত্রণাবোধ এসে যেন তারও শরীরকে আচ্ছন্ন করে ধরল।

ঢন্—ঢন্—ঢন্—

সারা বাড়ি কাঁপিয়ে উঠল ঘণ্টার শব্দ—যেন একটা শক্ত ঘা দিয়ে এই মোহাবিষ্ট বেদনাটাকে ভেঙে থান থান করে দিলে। কেমন যেন বেঁচে গেল অলকা, মনে হল ইস্কুলের অসীম ক্লান্তির লাস্ট্ পিরিয়ডের পর যেন পড়ল ছুটির ঘণ্টা, এল মুক্তির বাতাস!

—খাওয়ার বেল পড়ল, চল্ মণ্টু।

—না, বলিস আমার শরীর খারাপ।

অলকা উঠে দাঁড়ালো। একটা চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানার ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল মণ্টু।

—যাওয়ার আগে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাস্ লোকা—

খট করে একটা শব্দ হয়ে তরল অন্ধকারে ভরে গেল ঘরটা। দরজাটা সন্তর্পণে ভেজিয়ে দিয়ে চলে এল অলকা।

* * * *

খেতে এল বটে কিন্তু টেবিলে বসেই মনে হল তারও আজ যেন এতটুকু ক্ষিদে নেই। মণ্টুর মতোই চুপ করে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে পারলে তারও ভালো লাগত। অন্যমনস্ক ভাবে ভাতগুলো নাড়াচাড়া করে চলল অলকা।

দুপাশে মেয়েরা খাচ্ছে, কথা বলছে অনর্গল স্রোতে। খাওয়ার এক-আধটু ইতরবিশেষ নিয়ে ঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়াও বাধিয়েছে তাদের কেউ কেউ। ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো অলকা। অশ্রান্ত ভাবে কথা বলতে পারে মেয়েরা, হেসে উঠতে পারে কী অর্থহীন অকারণ পুলকে! পঞ্চাশটি ছেলে একসঙ্গে জুটলে যে কোলাহল করে, পাঁচটি মেয়ে কলরব করতে পারে তার তিনগুণ। ছেলেদের দলে কিছু কিছু কথা বলে, বাকিরা অন্তত শোনবার চেষ্টা করে সেটা। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে একেবারে উল্‌টো। কেউ কারো কথা শোনে না; সকলেই একসঙ্গে কথা কইতে চায় এবং সময়ে স্বরটাকে চড়িয়ে রাখতে চায় সোজা সপ্তমে। জীবনে কোথাও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ নেই বলেই বোধ হয় সমস্ত উদ্যমকে কণ্ঠে এনে সংযত করেছে মেয়েরা।

—জানিস ভাই লতিকা, হিস্ট্রীর দিদিমণি কী মুটকী। উষা ওর নাম দিয়েছে ক্ষেন্তি পিসি—

—তোর ব্রীজ প্যাটার্ন আংটিটা ভারী চমৎকার হয়েছে। আমিও একটা—

—আমাদের ক্লাসে একটা নতুন মেয়ে এসেছে, কী দেমাক! মুখটা প্যাঁচার মতো করে থাকে—

—ও ঠাকুর, মাছ কোথায়? এ যে একটা কাঁটা—

—ভাই লাবণ্যদি, আমি একখানা 'ভাগ্যচক্র' শাড়ি—

আশ্চর্য জীবন এদের, আশ্চর্য চিন্তাধারা। অগভীর স্রোতের মতো টানা বয়ে চলেছে,

আবর্ত নেই কোথাও, নেই কোথাও একটা নিবিড় স্থির ভাবনার অবসর। নতুন শাড়ি না পাওয়ায় বেদনা, নতুন গয়না তৈরি করবার পুলক। জীবনের ওপরতলার নিশ্চিন্ত যাত্রী। বেশির ভাগেরই স্কুলে পড়তে আসা বিয়ের বাজারে বাপের দায়িত্বকে খানিকটা লঘু করবার জন্যে। হস্টেলে যারা থাকে, সবাই বড়লোকের মেয়ে, শিক্ষা তাদের কারুরই জীবনে পথ চলবার সঞ্চয় নয়, বিদ্যা তাদের অস্ত্র নয় আত্মরক্ষা কিংবা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করবার। বিয়ের গয়নার ওপর একটুখানি শিক্ষার জৌলুস সঞ্চয় করতে পারলেই মেয়ের পরকাল নিশ্চিন্ত, বাপ-মাও চরিতার্থ।

শুধু কখনো এক-আধটু ব্যতিক্রম ঘটে—রঙ লাগে টুকরো রোমান্সের। দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলা, দুদিন বিরহিণীর মতো বিছানা আশ্রয় করে পড়ে থাকা, বোনের সঙ্গে, বৌদির সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে খানিকটা ক্ষীণ প্রতিবাদ, একা একা চুপ করে বসে আত্মহত্যার কল্পবিলাস। তারপর সব সহজ হয়ে যায়। এই লঘু তরল জীবন সংসারের দায়িত্বের মধ্যে ঢুকে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে নেয় নির্দিষ্ট জায়গাটিতে—ভাববার সময় থাকে না আর, এমন কি নিশ্বাস ফেলবারও না। হয়তো কোনো ঘুম-ভাঙা রাত্রে, কোনো নির্জন বিকেলের মেঘ-নীল অবকাশ ক্ষণিকের জন্যে উন্মনা করে দেয়। ব্যাস্ ওইটুকু।

মণ্টুর ক্ষেত্রেও এই হবে—ঠিক এমনি করেই আজকের জটিলতার মীমাংসা হয়ে যাবে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে আসা; নিজের সত্যকে নির্ভয়ভাবে স্বীকার করে নেওয়া—সে জোর মণ্টুর নেই, মণ্টুর মতো মেয়েদের থাকেও না। দিনকয়েক সিনেমার নায়িকার মতো ধরাশয্যা আশ্রয় করে পড়ে থাকবে, তারপর—

যদি বা একটুখানি সহানুভূতি জেগেছিল মণ্টু সম্পর্কে, এবার খানিকটা তিক্ত বিরক্তি এসে আবার বিমুখ করে তুলল ভাবনাকে। যা খুশি করুক—যত ইচ্ছে ন্যাকামি করুক, চুলোয় যাক। ওকে প্রশ্রয় দেওয়াই ভুল হয়েছে।

কিন্তু তবুও এখনো অস্বস্তি বোধ করছে কেন অলকা ?

জিজ্ঞাসার উত্তর মিলতে এক মিনিটের বেশি দেরি হল না। নিজের ভেতরও ভাঙন ধরেছে আজ। এতদিন এদের মধ্যে থেকেও যে স্বাতন্ত্র্যের গৌরবে মহিমান্বিত হয়ে থাকত অলকা, নিজেকে অনুভব করত এদের সংক্ষিপ্ত মানস-দৈন্যের ঊর্ধ্বে, আজ সেখান থেকে নিঃসংশয় অবতরণ ঘটেছে তার; সোজা চোখ মেলে তাকানো, নির্ধারিত নিশ্চিন্ত পথ ধরে এগিয়ে চলা—বাধা পড়েছে তাতে। দৃষ্টিতে নেমেছে আচ্ছন্নতার ঘোর, কেমন ঝাপসা ঝাপসা মনে হচ্ছে সমস্ত। তাই মণ্টুর বেদনা তাকেও এসে স্পর্শ করেছে, তাই তারও প্রাণের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণার ঝিলিক মারছে। সব মিথ্যে, সব ভুল, সব ফাঁকি। একান্ত করে যা চাইবে, তাই-ই হয়তো তেমনি একান্ত করেই—

নীতীশদা !

ভাত ফেলে উঠে পড়ল অলকা, আর একটা গ্রাসও মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না।

ঘরে এসে দেখল অন্ধকারে তেমনি নিথর হয়ে পড়ে আছে মণ্টু। জেগে আছে না ঘুমোচ্ছে বোঝা শক্ত। যা খুশি করুক। কিন্তু আলো জ্বালতে তারও আর ইচ্ছে করল না, উৎসাহ বোধ হল না 'লাহিরিজ সিলেক্‌ট্‌ পোয়েম্‌স্‌' খুলে নিয়ে তার অর্থ আর তত্ত্ববোধ করতে। সেও মণ্টুর মতোই একটা চাদর টেনে নিয়ে বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ল।

তবু ঘুম আসে না। চোখ বুজলেই যেন সামনে বিরক্তিকর কতগুলি আলোর বিন্দু নাচতে থাকে। সুতরাং পরিপূর্ণ দৃষ্টি সে মেলে দিলে খোলা জানালাটার ভেতর দিয়ে—যেখানে চন্দ্রহীন রাত্রির আকাশে তিমির-তোরণের প্রহরী কালপুরুষ আহত-বেদনায় পশ্চিম সীমান্তে ঢলে পড়েছে।

পরের দিন যখন স্কুলে গেল, তখন মাথাটা যেন অত্যন্ত ভারী বলে মনে হচ্ছে তার। কপালের শিরা দুটো দপ দপ করেছে—একটু জ্বরই হয়েছে বোধ হয়। কিছুই ভালো লাগছে না। শরীরে একটা অসহ্য শ্রান্তি, ঘাড়ের পেশীতে খানিকটা টনটনে যন্ত্রণা, মেরুদণ্ডটা কিছুতেই সোজা হয়ে বসে থাকতে চাইছে না। মনে হচ্ছে কতদিন সে ঘুমোয়নি, কতকাল যেন এতটুকু বিশ্রাম নেবার সুযোগ মেলেনি তার।

টিফিন্‌ পিরিয়ডে বই খাতা গুছিয়ে নিয়ে সে উঠে পড়ল, হস্টেলে চলে যাবে, ছুটির জন্যে হেড মিস্‌ট্রেসকে বলে নিতে হবে একবার। কিন্তু হেড্‌ মিস্‌ট্রেসের ঘরের দিকে দু পা এগোতেই ক্লাস এইটের মেয়ে শুভ্রা এসে তাকে পেছন থেকে ডাক দিলে।

—অলকাদি ?

বিরক্তিভরে অলকা বললে, কী বলছ ?

—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, বড্ড দরকারী কথা।

—এখন নয়— তেমনি বিরক্ত ভাবে অলকা বললে, কাল বোলো বরং। আজ আমার শরীর ভয়ানক খারাপ, এখন হস্টেলে চলে যাচ্ছি আমি।

—সে কথা নয়—শুভ্রা কাছে এগিয়ে এল, চাপা গলায় বললে, তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছে।

—চিঠি দিয়েছে ? কে ?

—বীণাদি।

—বীণাদি !—অলকার রক্ত উত্তেজনায় দুলে উঠল : কই চিঠি ?

—এসো এদিকে—শুভ্রা ডাকল।

জলের ঘরটার পেছনে নিরিবিলিতে এসে দাঁড়ালো দুজনে। সন্তর্পণে চারদিক তাকিয়ে নিয়ে ব্লাউজের ভেতর থেকে চিঠিটা বার করে দিলে শুভ্রা।

ছোট একটুকরো কাগজে দু-তিনটে লাইন পেনসিলে লেখা। খুব তাড়াতাড়িতে

লিখেছে বোঝা যায়।

'আজ টিফিন পিরিয়ডে শুভ্রার সঙ্গে আসবে একবার। খুব দরকার আছে তোমার সঙ্গে। আসবেই, না এলে চলবে না।'

নীচে ইংরেজী হরফে খুব ছোট্ট করে লেখা : B।

গায়ের মধ্যে শির শির করতে লাগল, জ্বরক্লান্ত দেহে যেন আরো খানিকটা তীব্র উত্তাপ পড়ল সঞ্চারিত হয়ে। মুহূর্তে সরলাদির মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল : মনে রেখো যদি কোনোদিন—

কিন্তু ওসব ভাবনার সত্যি কোনো মানে হয় না। যতদূর এগিয়ে পড়েছে তাতে ও আশঙ্কায় পিছিয়ে যাবার মতো কোনো উপায়ই নেই আর। এতদিন যা ছিল চিন্তা-বিলাস আর কথার আগ্নেয়তা, এবার তার ওপরে এল আঘাত, এল পরীক্ষার কঠোর মুহূর্ত। এ পরীক্ষায় পিছিয়ে গেলে তার চলবে না।

পাহাড়ের চূড়ো থেকে নীচের নিকষ কালো গভীর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার মতো অন্ধ আর অনাসক্ত গলায় অলকা বললে, চলো কোথায় যেতে হবে।

১৩

জাগরণ সংঘের সুভাষ একটা সাইকেল চালিয়ে আসছিল উলটো দিক থেকে। সামনে নীতীশকে দেখেই সে সাইকেলটাকে নামিয়ে নিলে পাশের আলপথের উপর। যেন একটা অত্যন্ত জরুরী কাজ মনে পড়ে গেছে তার—দ্রুতবেগে সরে পড়তে চেষ্টা করল।

নীতীশ ডাকল, ওহে শোনো—

সুভাষ যেন শুনতেই পায়নি—এইভাবে সাইকেলটাকে আরো বেগে চালিয়ে দিলে।

—ওহে সুভাষ—

এবার আর না শোনার ভান করা চলে না। অগত্যা নেমে পড়তে হল সুভাষকে।

—আমাকে ডাকছেন?

—হাঁ, হাঁ, একবার এসো এদিকে।

সুভাষ এল কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় নয়। একবিন্দু খুশি হয়েও নয়। সমস্ত মুখে অপ্রসন্নতা কালো হয়ে ঘনিয়ে আছে তার। যেন এই সাক্ষাৎকারটাকে এড়িয়ে যেতে পারলেই আন্তরিক আনন্দ পেতো সে।

—কী ব্যাপার? অত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছিলে?

—একটু কাজ আছে।—সুভাষ একটা পা দিয়ে সাইকেলের প্যাডেলটাকে একবার ঘুরিয়ে নিলে—যেন যত সংক্ষেপে সম্ভব ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলতে চায়। কিন্তু নীতীশ

তখনো লক্ষ্য করল না।

—তারপর, তোমাদের জাগরণ সংঘের কাজ কেমন চলছে ?

—একরকম।—তাচ্ছিল্যভরা মুখে সুভাষ জবাব দিলে।

—মিটিং-ফিটিং হবে নাকি শীগগিরই ?

—ঠিক নেই—তেমনি উদাস অনাসক্তি সহকারে বললে সুভাষ।

—কেন ? নীতীশ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, অত তো উৎসাহ দেখলাম তখন। সব মিইয়ে গেল এরি মধ্যে ? তোমাদের নাইট্ ইস্কুল, পাঠাগার—

—দেখা যাবে সে সব, আচ্ছা চলি এখন—সুভাষ সাইকেলে চড়বার উদ্যোগ করল।

নীতীশ হঠাৎ সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরল। কিছু একটা সম্ভাবনার সংকেত। খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টি সুভাষের মুখের ওপর ফেলে রেখে সে প্রশ্ন করলে, সত্যি করে বলো তো ব্যাপার কী হয়েছে ?

নীতীশের দৃষ্টির ভেতরে যে ধারালো জিজ্ঞাসাটা ঝলকে উঠেছিল, তার প্রভাবে মুহূর্তে সংকুচিত হয়ে গেল সুভাষ। কী একটা কথা বলতে গিয়েও বলতে পারল না, অপরাধীর মতো আনত চোখে তাকিয়ে রইল মাটির দিকে।

—কিছু বলছ না কেন ? হয়েছে কি ?

নীতীশের গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যাতে সুভাষ মনে মনে শিউরে উঠল। তেম্নি অন্তর্ভেদী চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ছেলেটা। প্রায় নিঃশব্দ গলায় জবাব দিলে, না—ইয়ে তেমন বিশেষ কিছু—

নীতীশ কঠিনভাবে বললে, চেপে যাচ্ছ কেন ? যা হয়েছে খোলাখুলি বলতে আপত্তি আছে কিছু ?

সুভাষ তো-তো করে বললে, না মানে আপত্তি—তবে দারোগা সাহেব—

নীতীশের চোখ দপ করে উঠল : দারোগা সাহেব কী ?

সুভাষ সভয়ে দু পা সরে গেল।

—কী বলেছেন দারোগা সাহেব ?

—বলেছেন মানে, অনর্থক আপনার সঙ্গে মেশামেশি করে পুলিসের ঝামেলা—

—ওঃ।

সুভাষ যেন খানিকটা সাহস ফিরে পেল : তা ছাড়া বাড়ির সবাই নিষেধ করছেন। গ্রামের সংস্কার-টংস্কার করা নেহাত মন্দ ব্যাপার নয়, তাই বলে পলিটিক্স করে অকারণে—

—বুঝতে পেরেছি।—নীতীশ বিমর্ষ ভাবে হাসল : ঠিক কথাই তো। অকারণে আমার জন্যে তোমরা বিপদে পড়বে কেন ? আমি দাগী মানুষ, শেষে আমাকে নিয়ে একটা ফ্যাসাদ বাধবে এটা কোনো কাজের কথাই নয় !

যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল সুভাষ। অপরাধীর মতো ক্ষীণ দুর্বল স্বরে বললে, মানি, কাজটা খুবই অন্যায় হচ্ছে,—কিন্তু জানেনই তো—

—জানি বৈকি। তোমাদের কোনো দোষ নেই সুভাষ—আমি কিছু মনে করিনি। আচ্ছা, এসো তুমি—

সুভাষ আর দাঁড়ালো না। তৎক্ষণাৎ সাইকেলে চেপে বসল। তারপর যেন রেস্ দিচ্ছে, এমনি দ্রুতবেগে প্যাড্‌ল চালিয়ে চোখের পলকে মিলিয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে।

কয়েক মুহূর্ত একটা নিরুপায় নিঃসঙ্গতা যেন নীতীশকে অসাড় করে দিল। মনে হতে লাগল শরীরে তার একবিন্দু শক্তি নেই—যেন অনেকখানি পথ হেঁটে এসে এখানে পৌঁছেছে সে, আর চলবার ক্ষমতা নেই তার। মাথার ভেতর সব ফাঁকা হয়ে গিয়ে খানিকটা ধোঁয়ার মতন জমে উঠেছে সেখানে—যেন শিথিল হয়ে গেছে তার শরীরের সমস্ত গ্রন্থিগুলো। নীতীশ আর দাঁড়াতে পারল না, একটা ছোট ঢিবির ওপরে বসে পড়ল।

সামনে মহানন্দা নয়, মৃত নাগিনীর কঙ্কাল। আজ যেন নদীটাকে আরো রিক্ত, আরো মুমূর্ষু বলে মনে হতে লাগল। বালির ডাঙাগুলোর বুকে একটা বাতাস ঝাপটা দিয়ে গেল, খানিকটা বালির ঘূর্ণি দীর্ঘশ্বাসের মতো আবর্তিত হয়ে উঠল আকাশের দিকে। একটা বনঝাউয়ের গোড়া পেঁচিয়ে হলুদে কালোয় মেশানো একটা ঢোঁড়া সাপ এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল বোধ করি—বাতাসের ঝাপ্‌টা গায়ে লাগায় যেন নিদ্রাভঙ্গ হল তার। আস্তে আস্তে পাকটা খুলে নিলে সে, চেরা জিভটাকে লকলক করলে একবার, তারপর অলসভাবে জলের মধ্যে গিয়ে নামল। বোধ হয় তারই সাড়া পেয়ে ক্ষীণ স্রোতের মধ্য থেকে তিন-চারটে ছোট মাছ লাফিয়ে উঠল জলের ওপর—ছিটকে গেল চারদিকে, রৌদ্রে ঝলসে উঠল খানিকটা রূপালি ঝিলিক। উবুড় করা ভাঙা নৌকাটা বেয়ে বেয়ে লাল রঙের একটা বড় কাঁকড়া সতর্ক দাঁড়া মেলে উঠে আসছিল, আকাশে উৎসুক মাছরাঙার ছায়া দেখেই মুহূর্তে টুপ করে কোথায় মিলিয়ে গেল। ডাঙার ধারে একটুকরো স্রোতহীন আবদ্ধ জলের ভিতর খানিকটা কলমী শাক হাওয়ায় দুলে উঠল, ভেসে এল খানিকটা পচা শ্যাওলার গন্ধ।

মরা মহানন্দা। এখনও বান ডাকে—কয়েক বছর পরে আর ডাকবে না। তারও পরে খানিকটা শুকনো বালির ডাঙা ধূ ধূ করবে শুধু—তার ওপর শুকোতে থাকবে মরা গোরু আর কুকুরের হাড়—শকুনের ভোজসভা বসবে সেখানে। দু'পাশের গ্রামগুলোও মরে যাবে আস্তে আস্তে, মরে যাবে ম্যালেরিয়ায়, শেষ হয়ে যাবে মড়কে। পোড়ো পোড়ো ভিটের ওপর বনতুলসী, আকন্দ, বিছুটি, কুমিরালতা, তেলাকুচো, কাঁটানোটে, শেয়াকুল-কাঁটা আর ভাঁটি ফুলের জঙ্গল; ভাঙা দাওয়ার ফোকরে ফোকরে কিল্‌বিল্ করবে কেউটে

আর চিতি বোড়ার ছানা। আমের বাগানগুলো ক্রমশ জঙ্গল হয়ে আসবে,—দিনের বেলাতেও তার ভেতরে ঘনিয়ে থাকবে স্তব্ধ অন্ধকার—সূর্যের আলো সেখানে ঢুকতে পারবে না ; পথ আড়াল করে দাঁড়াবে মোটা মোটা গুলঞ্চের লতা, বুনো ওল আর ফণি মনসা দুর্গম করে রাখবে পথ। ঘুরে বেড়াবে চিতা বাঘ, লক্কড় আর শেয়াল সতর্ক গতিতে পদচারণা করবে তার প্রান্তে প্রান্তে।

অথচ—

অথচ এভারেস্টের তুষার-চূড়ো থেকে এর জন্ম। দুর্গম গিরিসঙ্কট পার হয়ে ঝর্ণাধারায় নেমে আসছে কুশীনদীর প্রবাহ। হিমানী-গলিত অফুরন্ত জলের অর্ঘ্যে পরিপূর্ণ হচ্ছে মহানন্দার ধারা। সে এখন স্বপ্ন। প্রাণের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—অপমৃত্যু ছাড়া ওর আর পথ নেই এখন।

নীতীশের মনের সঙ্গেও কি কোনো সম্পর্ক আছে এই মৃত মহানন্দার—আছে কোনো একটা আত্মিক যোগাযোগ ? অফুরন্ত আশ্বাস আর বিশ্বাসের যে উৎস থেকে সে প্রাণ পেয়েছিল, মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে না ছিল ভয়, না ছিল সংশয়—সে দিন তার গেল কোথায় ? আজ তার নিজের মনের ভেতরও ডাঙা জেগে উঠেছে—সেও তিলে তিলে মরে আসছে এই মৃতধারার মতো।

বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো মনের মধ্যে চমকে গেল মল্লিকার কথা। মল্লিকা ! এক রাত্রির জন্যে তার কাছে এসেছিল, দেবদাসী মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিল তার সংযমের শাসন, তার নিষেধের প্রাচীর। কিন্তু তারপর ? হঠাৎ যেন নিজেকে অশুচি বলে মনে হতে লাগল নীতীশের। অন্যায় করেছে সে, অপরাধ হয়ে গেছে তারই। তার জানা উচিত ছিল বারো বছর আগে যা ঘটে গেছে তা গতজন্মের ঘটনা ; সেদিনের সম্পর্ক আজ মিথ্যে হয়ে গেছে—সেদিনের মল্লিকা তার আপনার ছিল, আজকের মল্লিকার ওপর কোনো দাবিই তার নেই আর।

আর যতীশ ঘোষ ! পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন বর্তমানে তাঁর সম্পত্তির তিনিই মালিক। এখনো ছেলের নামে সম্পত্তি তিনি দানপত্র করে দেননি। আর দেবেন কিনা তাও নির্ভর করবে নীতীশের ব্যবহারের ওপর, তার নীরব পিতৃভক্তির তুলাদণ্ডের বিচারে। মল্লিকার মতো তাকেও বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করতে হবে ; নিজের সমস্ত বিবেককে বিসর্জন দিয়ে, সমস্ত বিচারবোধকে পঙ্গু আর সংকুচিত করে।

নাঃ—এ অসম্ভব—। এ অসহ্য। একটি মাত্র পথ আছে। এখান থেকে চলে যাওয়া—এই বিষাক্ত পরিবেষ্টন থেকে সরে যাওয়া। গ্রামকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে তুলবে ভেবেছিল, কিন্তু সুভাষের কথা শুনে সে মোহও গেছে ভেঙে। হয়ত অলকার কথাই ঠিক। এ নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা। মস্ত বড় একটা ভুলের মধ্যেই সে পা বাড়িয়ে ছিল।

কিন্তু অলকাও নয়। অলকাকেও সে ভুলে যেতে চায়। অস্বীকার করে কী হবে—অলকা দুর্বলতা জাগিয়ে দিয়েছে তার মধ্যে। যা হয় না, যা হওয়া সম্ভব নয়, সেই অসম্ভবের প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করবার মানে হয় না। তার মনের মধ্যে উজ্জ্বল একটা আবির্ভাবের মতো নামুক অলকা, স্বপ্ন ছড়াক তার ঘুমের মধ্যে, ব্যথা জাগিয়ে তুলুক কোনো নিভৃত নিঃসঙ্গ অবকাশে, তার বেশি আর কিছু নয়।

তাকে চলেই যেতে হবে। মরা মহানন্দার মতো আবার তাকে খুঁজে নিতে হবে কোনো অনিবার্য হিমালয়ের তুষারশিখর, কোনো বরফগলা কুশীনদীর পাহাড়ভাঙা নীল প্রবাহ। কাজ করতে হবে। কিন্তু এখানে নয়—এখান থেকে অনেক, অনেক দূরে সরে গিয়ে। যেখানে মল্লিকা নেই, যতীশ ঘোষ নেই। যেখানে আলেয়ার আলো জ্বালিয়ে চোখের পলকে দৃষ্টির আড়ালে ঘন তমসার মধ্যে হারিয়ে যায় না অলকা। কিন্তু তার আগে—তার আগে শেষ চেষ্টা।

উঠোনে মস্ত একটা কড়াই চাপিয়ে তাতে গাবের রস জ্বাল দেওয়া হচ্ছে। কালো রঙের রস ফুটছে টগবগ করে, তার থেকে—পোড়া কাঠ-কুটরো থেকে একটা কটুস্বাদ গন্ধ ছড়াচ্ছে। আর তার সঙ্গে টানা দেওয়া কতকগুলো জাল থেকে শুকনো মাছের একটা আঁশটে গন্ধও যেন ঐকতান মিলিয়েছে একটা।

দাওয়ায় বসে তিন-চারজন হুঁকো টানছিল। নীতীশ ঢুকতেই তারা সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

—কী রে, সব আছিস কেমন?

একজন শুকনো গলায় বললে, ভালো।

—আর মারামারি করিস না তো?

হঠাৎ হুঁকোটা নামিয়ে সেদিনকার আহত রামকেষ্ট নীতীশের দিকে মুখ ফেরালো। চটাং করে জবাব দিলে, আমরা মারামারি তো করি, তাতে তোমাদের কী বাবু?

কথার সুরে নীতীশ চমকে গেল, মুহূর্তে একটা তীব্র অপমান-বোধে সমস্ত মুখ কালো হয়ে গেল তার। তবু খানিকটা স্বাভাবিক ভাবে হাসতে চেষ্টা করল: সে কি! হঠাৎ এমন মেজাজ গরম হয়ে গেল যে সকলের!

যেন তেড়েফুঁড়ে জবাব দিলে এবারে: মেজাজ গরম হবে না তো কি ঠাণ্ডা হয়ে থাকবে পানির মতো? বাবুদের চিনতে তো আমাদের বাকি নেই।

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল: কেন, কী ব্যাপার?

রামকেষ্ট তেমনি তিরিক্ষি ভাবে কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তৃতীয় আর একজন থামিয়ে দিলে তাকে। লোকটির চুল পাকা, গলায় কণ্ঠি, সমস্ত চেহারায় শান্ত একটা

বিবেচকের ভাব। আপোসের সুরে বললে, আরে যেতে দাও, যেতে দাও। আমাদের ছোটলোকের কথা ভেবে আপনারা আর সময় নষ্ট করবেন কেন বাবু, নিজের কাজ করুন।

—কী হয়েছে?—প্রশ্ন করা অনাবশ্যক অনুভব করেও নীতীশ যান্ত্রিক ভাবেই জিজ্ঞাসা করল : ব্যাপারটা কী? এমন কেন করছ তোমরা?

এবার দ্বিতীয় লোকটি উত্তেজিত হয়ে উঠল। ঠকাস করে হুঁকোটা নামিয়ে রেখে বললে, কেন অনর্থক আমাদের ওপর আপনারা হাম্‌লা করছেন বাবু? মাছ নিলে দাম আদায় করতে দশবার আমাদের হাঁটাহাঁটি করতে হয়, দু টাকার মাছটা বারো আনা ফেলে তুলে নেন আপনারা। আমাদের ভালো আপনাদের আর করতে হবে না!

কণ্ঠিপরা প্রাচীন লোকটি চঞ্চল হয়ে উঠেছে। দুদিকে দুখানা হাত বাড়িয়ে অবস্থাটা শান্ত করবার প্রয়াস পেল সে : আহা ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। কেন ওসব বাজে কথা বলছ। সোজা কথাটা বলে দেওয়াই ভালো। দারোগা সাহেব এসেছিলেন। আমাদের পাড়ায় আপনি যাওয়া-আসা করেন শুনে আমাদের শাসিয়ে দিয়ে গেছেন। বলেছেন আপনি জেলখাটা মানুষ, আপনার সঙ্গে মাখামাখি করলে আমাদের মুশকিলে পড়তে হবে।

—তা ছাড়া যে ডাকাতি করে কালাপানি ঘুরে আসে, তাকে বিশ্বাস কী?—আর একজন বললে।

—আঃ—কী হচ্ছে সনাতন—কণ্ঠিপরা লোকটি একটা ধমক দিলে তাকে। নীতীশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বিনীত গলায় বললে, মাপ করবেন বাবু, আমরা ছোটলোক।

নীতীশ জবাব দিলে না, নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে গেল। শুধু শুনতে পেল, পেছনে একটা আলোচনা উত্তাল হয়ে উঠেছে আর উঠেছে তাকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু সমস্ত কথাগুলো একটা অর্থহীন কোলাহলের মতোই মনে হল—কোনো অর্থবোধ হল না।

তাকে চলেই যেতে হবে। পায়ের তলা থেকে যেন শেষ আশ্রয়টুকুও তার সরে যাচ্ছে। এ ভাবে নয়। নতুন করে আবার কুশীনদীর প্রবাহ খুঁজে নিতে হবে তাকে, সন্ধান করে নিতে হবে কোনো নতুন প্রাণরস সঞ্চয়ের প্রবাহ।

অলকা? অলকাই কি ঠিক বলেছিল?

না। অলকার কাছে সে হার মানবে না। এতদিন যা সে মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারেনি, জেলজীবনে বন্ধুবান্ধবদের হাজার চেষ্টাও যে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নড়িয়ে দিতে পারেনি তার, শুধু মোহ দিয়েই কি অলকা জিতে যাবে সেখানে? শুধু তার কালো চোখের বুদ্ধির উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ, তার সুশ্রী দেহের দীপ্তিভরা ছন্দ—এদের কাছেই কি শেষ পর্যন্ত হার মানতে হবে? গিয়ে বলতে হবে তুমিই ঠিক, ভুলটা আমিই করেছি?

না—তাও সম্ভব নয়।

কলকাতা। সমস্ত পৃথিবী যেখানে এসে আবর্তিত হয়ে পড়ছে। যেখানে মরা মহানন্দা নেই—মহাসাগর উত্তাল হয়ে ফেটে পড়েছে। মরা নদীর ক্ষীণ স্রোত দেখতে দেখতে তার নিজের বুকের মধ্যেই যে মৃত্যুব্যাধি এসে বাসা বাঁধছে। আর নয়। এই গণ্ডি থেকে বেরুতে হবে—জীবনকে জানতে হবে, ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে সেই মহাসাগরের রুদ্র তরঙ্গে।

হ্যাঁ—সেই ভালো।

শুধু যাওয়ার আগে একবার কাকিমার সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে। দীর্ঘ পথযাত্রার একটুখানি পাথেয় কুড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে সেখান থেকে। ব্যাস, আর কিছুই নয়। এই মহানন্দা শুকিয়ে মরে যাক। তার জায়গায় আসুক সপ্ত সমুদ্রের জোয়ার। রৌদ্রঝলকিত বৈশাখী দিগন্তের ওপর দিয়ে অলক্ষ্য সুদূর কলকাতার হাতছানি ভেসে আসছে। আর তার দেরি করা চলবে না।

১৪

ইস্কুলের পেছন দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে, তা থেকে কয়েক পা বাঁক নিলেই একটা সরু গলি। সেই গলির ভেতরেই বাড়িখানা।

পুরোনো আমলের বাড়ি। নতুন শহর ইংরেজবাজার যখন ভালো করে গড়ে ওঠেনি, যে সময় পুরোনো শহর নিমাসরাই তার ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তি বয়ে জমজমাট হয়ে থাকত, সেই তখনকার। গৌড়ের ইট-পাথর এনে বাড়িটিকে তৈরি করা হয়েছিল, বাইরের শিলা-সোপানে এখনো ক্ষয়িত মূর্তি আর পদ্মাঙ্কন আবছা ভাবে চোখে পড়ে। সে যুগের কোনো বড়লোক শখ করে বাড়িটি তৈরি করেছিলেন—বড় বড় থাম আর সিংহদরজার ধ্বংসাবশেষ দেখলে সে সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। তারপর এসেছে কাল—এসেছে পরিবর্তন। এই বাড়িটিকে মাঝখানে দ্বীপখণ্ডের মতো রেখে পরিবর্তনের স্রোত বেয়ে গেছে, এর স্বাতন্ত্র্য, এর আভিজাত্যকে আড়াল করে দিয়েছে নতুন শহরের আধুনিক বাড়িঘর, নতুন রাস্তা, বিদ্যুতের জোরালো আলো! চারিদিকের নবীন জীবনোৎসবের নেপথ্যে এই বাড়িটি যেন অতীতের খানিকটা থমথমে কালো ছায়া বুকে বয়ে স্তব্ধ সমাহিত হয়ে আছে—নতুন কালের কোনো কলরব, কোনো বিদ্যুতের দীপ্তি এখানে আর প্রবেশ করবে না। একে মুখরিত করে তুলবে না, উদ্ভাসিত করে দেবে না কোনো দিন।

বীণার চিঠি আর তার সঙ্গে এই পরিবেশ—দুটো মিলিয়ে যেন অলকার শরীর ছমছম করে উঠল। শুভ্রাকে অনুসরণ করে একটা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে দোতলায় উঠতে

লাগল অলকা। তার ভয় করছে, অস্বস্তির এক-একটা চমক থেকে থেকে শিউরে যাচ্ছে শরীরের প্রান্তে প্রান্তে ; কোথা থেকে যেন একটা শীতার্ত তীক্ষ্ণ বাতাসের স্পর্শ এসে আপাদমস্তক ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল অলকার।

দোতলার একটা ঘরে ঢুকল দুজনে। জানলাগুলো বন্ধ—ভালো করে নজর চলে না, আবছা অন্ধকারে ঘরটা যেন অভিভূত হয়ে আছে। প্রথমটা কিছু দেখা গেল না—শুধু একটা শ্বাসরোধী গুমোট বাষ্প এসে অলকাকে আচ্ছন্ন করে দিতে চাইল।

—আয় অলকা—

প্রায় নিঃশব্দ একটা আহ্বান। চমকে উঠল অলকা। ঘোর-লাগা দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ আর সজাগ হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। এতক্ষণে দেখতে পাওয়া গেল বীণাকে। ঘরের এক কোণে একটা তক্তপোষের ওপর বসে আছে।

বীণা আবার ডাকল, আয়—

প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মতো অলকা এগিয়ে গেল।

—আয়, বোস এখানে—

শাড়ির আঁচলে ঘর্মাক্ত কপালটা মুছে নিয়ে বীণার পাশে বসে পড়ল সে। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে শব্দ উঠছে তার। মনে পড়ে যাচ্ছে বীণার সম্পর্কে পুলিসের আকুল অনুসন্ধানের কথা, সরলাদির সেই শাসানি, আর সেই সঙ্গে এই সাক্ষাতের একটা সম্ভাব্য পরিণামের অশুভ চিন্তাটাও।

খানিকক্ষণ কাটল নীরবতার মধ্যে।

—খুব ভয় করছে, না ?—মৃদু হাসির সঙ্গে বীণা প্রশ্ন করলে।

তার জিজ্ঞাসার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক আছে আর সেই সঙ্গে খানিকটা অনুকম্পাও। আরও অস্বস্তি বোধ হল অলকার। সংক্ষেপে উত্তর দিলে, না।

—তুই আসবার সময় কেউ দেখতে পায়নি তো ?

—না।—তেমনি সংক্ষিপ্ত উত্তর এল অলকার।

এতক্ষণ দরজার পাশে ছায়ার মতো দাঁড়িয়েছিল শুভ্রা। তাকে ডাক দিয়ে বীণা বললে, শুভ্রা, তুই এখন যা।

নিঃশব্দে শুভ্রা চলে গেল।

—কিন্তু আমি যাব কী করে ?—অলকা অসহায় ভাবে প্রশ্ন করল।

—ভয় নেই, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আবার ঘরের মধ্যে নীরবতা ঘনিয়ে এল।

বীণাই ভাঙল সেটা। মৃদুস্বরে জানতে চাইল : খুব আশ্চর্য হয়ে গেছিস, না ?

এতক্ষণে অলকা খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। আর একবার শাড়ির আঁচলে

কপালটা মুছে নিয়ে বললে, সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাপারটা কী? হঠাৎ এমন করে তুমি হস্টেল থেকে পালালে কেন?

—না পালিয়ে উপায় ছিল না যে।

—কেন?

—বুঝিসনি?—একটু চুপ করে রইল বীণা, তারপরে আস্তে আস্তে বললে, পুলিসের নজর পড়েছে কিনা। শীগগিরই আমাদের পার্টিকে 'ব্যান্' করে দেবে। তা ছাড়া আমাকে এত ভালো করে চেনে যে প্রথমেই জালে ফেলত। কাজেই নিরুপায় হয়ে অনাগত বিধাতার দৃষ্টান্তই অনুসরণ করতে হল।

—পুলিস তোমার জন্য খুব তোলপাড় করছে।

—করবেই।—বীণা হাসল: কিন্তু আমাদের mass base সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই কিনা। একবার গ্রামে বেরিয়ে যেতে পারলে হাজার চেষ্টাতেও আর ছুঁতে পারবে না। সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। কালই আমি চলে যাচ্ছি। তার আগে তোকে কতকগুলো ভার দিয়ে যাব—আর সেই জন্যেই ডেকে পাঠালাম।

—কী করতে হবে আমাকে?

—খোলাখুলি আন্দোলন এখন আর চলবে না, যা করতে হবে সব গোপনে। এমন ভাবে এখন অর্গানাইজেশন গড়ে যেতে হবে যাতে কেউ ঘুণাক্ষরে সন্দেহ না করতে পারে। হস্টেলের মেয়েগুলোকে তো দেখেছি। হয় দিনরাত উবুড় হয়ে পড়াশুনো করছে, নইলে শাড়ি আর ব্লাউজের ভাবনাতেই ব্যতিব্যস্ত। কাউকে দিয়েই কিছু হবে না। যতটুকু পারবি তুই করবি।

—আমি একা কতটা করতে পারব?—শুষ্ককণ্ঠে অলকা প্রশ্ন করলে।

—শুভ্রা তোকে হেল্‌প করবে সব রকম। ওর হাত দিয়েই আমাদের আন-অফিসিয়াল্ সেক্রেটারী হেমন্তদা—তুই তো চিনিস তাঁকে—তাঁর সমস্ত ডিরেকশন আসবে। সেই অনুযায়ী কাজ করে যাবি। এখন অবশ্য খালি বই পড়ানো দরকার আর সেই সঙ্গে সিম্প্যাথি সংগ্রহ করা। তুই স্কুলের সেরা মেয়ে বলে তোর পক্ষেই এতে সব চেয়ে সুবিধে হবে।

খাটের বালিশের তলা থেকে একগাদা চটি বই বার করলে বীণা। বললে, এগুলো নিয়ে যা। অবশ্য সবই বে-আইনি, বুঝেসুঝে কাজ করবি!—বীণা আবার হাসল।

কাঁপা হাতে বইগুলো নিল অলকা। রাখল ব্লাউজের ভেতরে।

বীণা বলে চলল, শুভ্রা তোকে নিয়মিত বই পৌঁছে দেবে। সুযোগমতো হেমন্তদাও তোর সঙ্গে দেখা করবেন। যা যা করবার দরকার তাঁকে বলতে পারিস।

—আচ্ছা—শুকনো ভীরু গলায় অলকা জবাব দিলে।

—তুই তা হলে এবার যা—বীণা উঠে দাঁড়ালো, টিফিনের ঘণ্টা পড়বার সময় হল

বোধ হয়। বেশি দেরি করলে কেউ সন্দেহ করতে পারে।

—কিন্তু যাব কার সঙ্গে ?

—ব্যবস্থা করছি—বীণা ডাকল, নান্টু, নান্টু!

দশ-বারো বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে সামনে এসে দাঁড়ালো। শুভ্রার ভাই বোধহয়, অন্তত মুখের চেহারা দেখে সেই রকম মনে হল।

—যাও, অলকাদিকে স্কুল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এস তো ভাই—

—চলুন—সাগ্রহে অলকাকে আহ্বান জানালো নান্টু।

দরজা অবধি এগিয়ে এল অলকা, তারপর কী মনে করে থেমে দাঁড়ালো একবার। প্রশ্ন করল, আবার কবে তোর সঙ্গে দেখা হবে বীণা ?

—বলতে পারি না। হয়তো আর কখনোই দেখা হবে না—বীণা অস্ফুট শব্দ করে হাসল : কিন্তু তাতে ক্ষতি কী। তুই রইলি, আরো অনেকে রইল, আমাদের কাজ আর কখনো থেমে দাঁড়াবে না।

বীণার কথার ভঙ্গিতে আর একবার একটা তীব্র অস্বস্তি শরীরের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ-শিখার মতো চমকে গেল অলকার। সে আর দাঁড়াতে পারল না, বললে, চলো নান্টু।

*　　*　　*　　*

কিন্তু মণ্টুর ব্যবহারে মাথায় যেন খুন চড়ে যায়। আজও ঠিক কালকের মতো ব্যাপার আরম্ভ করেছে। হস্টেলের আলো যখন নিবে গেছে, আর সারাদিনের একটা তিক্ত গুরুভার সমস্ত মস্তিষ্ক আর স্নায়ুর মধ্যে বহন করে যখন শোবার উপক্রম করছে অলকা, তখন যথানিয়মে আবার ফোঁস ফোঁস করে কান্না জুড়ে দিল মণ্টু।

অলকা বিছানার উপর উঠে বসল : তুই কি আজ ঘুমুতে দিবি না মণ্টু ?

মণ্টুর জবাব এল না। শুধু কান্না চাপতে গিয়ে তার উচ্ছ্বাসটা আরো প্রবল হয়ে উঠতে লাগল, খাটটায় খট্ খট্ করে শব্দ হতে লাগল একটা।

অসীম বিরক্তিতে খানিকক্ষণ জ্বলন্ত চোখে মণ্টুর দিকে তাকিয়ে রইল অলকা। হয়তো সহানুভূতি হওয়া উচিত, হয়তো সেই ছেলেটিকেই মন-প্রাণ দিয়ে সে ভালোবেসেছে, হয়তো তাকে না পেলে বেঁচে থাকবার কোনও অর্থ সে খুঁজে পাবে না। কিন্তু এমন করে কেন বেদনা-বিলাস করে নিজের নিরুপায় হতাশাকে নিয়ে, কেন নিজের জোরে সব ভেঙেচুরে বেরিয়ে পড়তে পারে না ? কেন চলে যেতে পারে না যাকে ভালোবেসেছে তারই হাত ধরে ?

তিক্ততায় অলকার মন ভরে উঠল। মণ্টুর কান্নার সঙ্গে তারও সম্পর্ক আছে, আছে তারও মনের একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। নীতীশ—নীতুদা। বেশি নয়, মাত্র পনেরো দিনের পরিচয়। কিন্তু এই সামান্য পরিচয়েই যেন তার মনের মধ্যে ঝড়

এনে দিয়েছে,—এনে দিয়েছে একটা প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর বিপ্লব। মনের মধ্যে যেন প্রেত-চ্ছায়া বিকীর্ণ করে দাঁড়িয়ে আছে নীতীশ—তার হাত থেকে অলকার মুক্তি নেই।

মণ্টুর পক্ষে হয়তো তবু সম্ভব। হয়তো চেষ্টা করলে যাকে সে চায় তাকে পাবেও একদিন। কিন্তু অলকার জীবনে তা স্বপ্নের চেয়েও অবাস্তব। তার মনের যা গোপন কামনা তা কোনোদিন ফলবান হবে না—কোনো উপায়ই নেই তার। সমস্ত জীবন বিষের জ্বালার মতো একটা অসহ্য মর্মদাহী যন্ত্রণাকে তার বয়ে বেড়াতে হবে—যার কোনো প্রতিকার নেই; দুর্বল মুহূর্তে এমন একটা অসত্য তাকে হাতছানি দিতে থাকবে যার সামনে শুধু খানিকটা মরীচিকাই ধূ ধূ করছে।

তীব্র কণ্ঠে অলকা বললে, মণ্টু, এই মণ্টু!

—উঁ?—চাপা কান্নার ভেতরে মণ্টুর জবাব এল!

—তুই থামবি কি না?

—আমি আত্মহত্যা করব লোকা।

—তবে তাই কর্—অলকা বিষাক্ত গলায় বললে, ওই কড়িকাঠের হুকের সঙ্গে ফাঁস দিয়ে এক্ষুনি ঝুলে পড়্। তুইও বাঁচ্, আমিও ঘুমিয়ে বাঁচি।

—কী ভীষণ আন্‌সিম্‌প্যাথেটিক্ তুই—অশ্রুসিক্ত বেদনার্ত অভিযোগ এল মণ্টুর।

—ন্যাকামিকে সিম্‌প্যাথি বলবার একটা মাত্রা আছে—তেমনি ভাবে অলকা বললে, যদি তুই চুপ না করিস তা হলে আমি সরলাদিকে সব বলে আসব।

—উঃ—মণ্টু একটা চাপা আর্তনাদ করল। তারপর আবার জোর করে কান্না চাপতে চাপতে আপাদমস্তক একটা চাদর মুড়ি দিয়ে পাশ ফিরে শুল। হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল অলকা।

…টক্-টক্-টক্—

দরজার কড়া নড়ছে আস্তে আস্তে। অলকা বসল।

—কে?

দরজার ওপার থেকে সরলাদির চাপা গলা এল: আমি। শীগগির দরজা খোলো।

এত রাত্রে সরলাদি! বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো অলকা উঠে বসল। পাশের খাটে মণ্টুও জেগে উঠেছে সন্ত্রস্ত হয়ে।

সরলাদির চাপা গলা আবার ভেসে এল: শীগগির দরজা খোলো অলকা। আর সময় নেই।

অজানা ভয়ে হিমার্ত শরীরে অলকা ঘরের সুইচ জেলে দরজা খুলে দিলে। পাথরের মতো কঠিন মুখে সরলাদি বললেন, একটু বাইরে যাও মণ্টু, অলকার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

একটা বিহ্বল দৃষ্টি মেলে মণ্টু-বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বিহ্বল দৃষ্টি মেলেই অলকাও সরলাদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

চাপা ভয়ঙ্কর গলায় সরলাদি বললেন, পুলিস এসেছে। তোমার নামে সার্চ ওয়ারেণ্ট খুব সম্ভব। ভোর হলেই সার্চ করবে। তোমার কাছে যদি আপত্তিকর কিছু থাকে, আমাকে দিয়ে দাও। আমি তোমাকে বাঁচাতে পারব।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অলকা।

সরলাদি বললেন, শোনো, আর সময় নেই। যদি কিছু থাকে এখুনি দিয়ে দাও। পুলিস এসে হস্টেলে ঢুকলে আর কিছুই করা যাবে না।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অলকা। তার ঠোঁট নড়ল কিন্তু তার নিঃশ্বাস পড়ল না। যেন বুকের সমস্ত স্পন্দন তার থেমে গেছে।

সরলাদি বললেন, কী করবে?

যন্ত্রচালিতের মতো বালিশের তলা থেকে বীণার দেওয়া বইগুলো বের করে আনল অলকা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তুলে দিল সরলাদির হাতে।

—আর কিছু নেই?

অলকার গলা দিয়ে একটা চাপা কান্নার মতো আওয়াজ বেরুল: না।

আঁচলে বইগুলো ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করলেন সরলাদি। দরজার গোড়ায় গিয়ে থেমে দাঁড়ালেন।

—আর শোনো।

চিত্রকরা পুতুলের মতো চোখ তুলে অলকা তাকালো।

—পুলিসের আইন ভাঙলাম কিন্তু হস্টেলের আইন ভাঙা যাবে না। দু'তিনদিনের মধ্যেই হস্টেল থেকে চলে যাবে তুমি আর সেই সঙ্গে চলে যাবে ইস্কুল থেকেও। কালই তোমার বাবাকে চিঠি দিয়ে দিয়ো।

সরলাদি বেরিয়ে গেলেন। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে হস্টেলের দরজায় কড়াটা নড়ে উঠল খট্ খট্ করে।

১৩

রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসে ছিল মল্লিকা।

কদিন থেকে দেবতার ওপরে ভক্তিটা যেন তার চতুর্গুণ বেড়ে উঠেছে। হঠাৎ যেন মনে হয়েছে কোথাও একটা নির্ভর করবার মতো জায়গা চাই তার, চাই দাঁড়াবার মতো একটা কঠিন ভিত্তি, একটা মাটির শক্ত আশ্রয়। টলে উঠবে না পায়ের নীচে, প্রতি

মুহূর্তে মনে পড়িয়ে দেবে না ভূমিকম্প এলে দোলা দিতে পারে, ভাসিয়ে দিতে পারে কোনো আকস্মিক বন্যার আবেগ।

সেই রাত্রিটা দুঃস্বপ্ন হয়ে ঘুরে বেড়ায় স্মৃতির মধ্যে। অনুসরণ করে ফেরে কালো একটা প্রেতছায়ার মতো। চারদিকে এতদিন একটা আলোর বৃত্ত ছিল ছড়িয়ে, সহজ সত্যে উজ্জ্বল, শুচিতায় সুস্নিগ্ধ। কী আশ্চর্য ভাবে শান্ত আর সংহত হয়ে গিয়েছিল মন। যেন পৃথিবীকে তা ছুঁয়ে চলত না, চলত কোনো আকাশবাহী স্রোতের সঙ্গে ভেসে ভেসে, কোনো জ্যোতির্ময় ছায়াপথ দিয়ে। সংসারকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ধূলোর ঝড় ঘূর্ণির পাকে পাকে আবর্তিত হয়ে ওঠে, বৈষয়িকতার যে পঙ্কপ্রলেপ পৃথিবীর মাটিকে রাখে কলঙ্কিত করে—তাদের সীমার বাইরে বহু উর্ধ্বে ছিল তার আসন। তার তপস্যার আসন।

কোথাও কি কোনো ক্ষোভ ছিল? কোনো বেদনা ছিল? ছিল কোনো অপ্রাপ্তির দুঃখ? কখনো কি মনে হয়েছে যে এমন আরো কিছু একটার আকর্ষণ আছে যা তাকে চকিতের জন্যে বিভ্রান্ত, অন্যমনস্ক করে দিতে পারে? না।

সেবার এক বাবাজী এসেছিলেন শ্রীধাম থেকে। চমৎকার গাইতেন। মধুর কণ্ঠে যখন ভজন ধরতেন তখন চোখ দুটো যেন তাঁর ভাবের ঘোরে আবিষ্ট হয়ে আসত, মনে হত যেন অন্য কোনো একটা পৃথিবী থেকে ভেসে আসছে তাঁর গান।

তিনি গাইতেন:

'পায়ো জী, ম্যয় নে নাম রতনধন পায়ো,
বস্তু অমোলক্ দী মেরে সদ্‌গুরু
কিরূপা কর্ আপনায়ো—'

রাজরাণী ছিলেন মীরা। কিসের অভাব ছিল তাঁর? ঐশ্বর্য ছিল, প্রতাপ ছিল, ভোগের পাত্র পূর্ণ হয়ে ছিল। তবু তো কিছুই ছিল না। মনে হত সব অর্থহীন। মানুষের সব চেয়ে বড় পাওয়া, সব চেয়ে পরম রত্ন—কই তা তো তাঁর আয়ত্ত হয়নি। রাজপ্রাসাদের কারাগারে বন্দিনী মীরা অন্তরের ভেতর সারাক্ষণ একটা অসহায় শূন্যতাই অনুভব করতেন। মণিমুক্তাকে মনে হত পথের কাঁকর, ঐশ্বর্যকে মনে হত নাগপাশের বিষাক্ত বন্ধনের মতো। এমনি সময় গুরু এলেন 'রুইদাস'। মুচির ছেলে, থাকতেন গ্রামের প্রান্তে অস্পৃশ্য পল্লীতে, চামড়া কেটে জুতো তৈরি করতেন। কিন্তু সেই অস্পৃশ্যই তাঁকে শোনালেন মুক্তির মহান্ মন্ত্র, কৃপা করে রাজরাণীর হাতে তুলে দিলেন তাঁর প্রার্থিত বস্তু, নামরূপ পরমরত্ন। রাজরাণী বেরিয়ে পড়লেন বৈরাগিনী হয়ে, অন্তঃপুরের অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়ে যাত্রা করলেন গিরিধর নাগরের সন্ধানে, যিনি সংসারের বিষপাত্রকে অমৃত দিয়ে পরিপূর্ণ করে তোলেন।

কানে আসে রাজরাণীর সেই পদ :

'গুরু মিলিয়া মেরে রইদাস জী
যিহ্নি জ্ঞান কি গুট্‌কী—'

গান শেষ করে ব্যাখ্যা করতেন বাবাজী। শুনতে শুনতে শরীরে রোমাঞ্চ জাগত, চোখে ঘনিয়ে আসত প্রেমাশ্রু। মনের কাছে এসে পৌছুত ব্রজমণ্ডলের আহ্বান, যেমন করে পৌছেছিল ঠাকুর নরোত্তম দাসের কাছে ; যেমন করে শুনেছিলেন ভক্ত রঘুনাথ দত্ত, যেমন করে আকুল করে তুলেছিল প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামীর প্রাণ।

আর সংশয় ছিল না, দ্বিধাও না। গান আর ব্যাখ্যা শেষ করে যখন বাবাজী উঠে যেতেন বিশ্রামের জন্যে, তখন শব্দ করে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন যতীশ ঘোষ। বলতেন, বৌমা আর নয়। চলো, এইবেলাই এখানকার পাট তুলে দিয়ে শ্রীধাম ব্রজমণ্ডলে গিয়ে বাসা বাঁধি। মাধুকরী করব আর প্রাণ খুলে গাইব কৃষ্ণনাম। এখানকার বিষয়ের জালে আর ক্রিমিকীট হয়ে পড়ে থাকা নয়।

সঙ্গে সঙ্গেই সায় দিত মল্লিকা।

—হ্যাঁ বাবা, তাই চলুন—

—তা হলে সব বিলিব্যবস্থা করে রাসের আগেই—

—হ্যাঁ বাবা, সেই ভালো।

কিন্তু ভারী জটিল ব্যাপার এই সংসার। অসংখ্য এর ছলনা, অজস্র এর বন্ধন। তাই মায়া কাটানোর চেষ্টা করেও সহজে হয়ে ওঠে না। রাসের পরে আসে ঝুলন, ঝুলনের পরে আসে দোল, আসে নন্দোৎসব। একটা ফসল কাটা হয়ে গেলে নতুন ফসল ওঠে, আধিয়ারদের কাছ থেকে কড়ারী ধানের হিসেব বুঝে নিতে হয়, কর্জ দিতে হয় নতুন করে। জমা দিতে হয় আমের বাগান, তারও হিসেবনিকেশের উৎপাত রয়েছে। আজ হবে, কাল হবে করে আর নিশ্বাসই ফেলতে পারেন না যতীশ ঘোষ।

তাই স্বপ্নেই থাকে ব্রজধাম, কল্পনার মধ্যেই বৃন্দাবন তার মায়া বিকীর্ণ করে রাখে। তার যমুনার নীল জল—যে জলে শ্যামরূপ দেখে ঝাঁপ দিয়ে পড়তেন শ্রীমতী, সে যমুনা বয়ে যায় মায়াকল্লোলের মতো। তার কেলিকুঞ্জ, তার ময়ূর-ময়ূরী, রাধাকৃষ্ণ নাম গেয়ে তার পথে পথে মাধুকরী, এরা কেবল মনের মধ্যে অবাস্তব একটা জ্যোতির্লোকই সৃষ্টি করে চলে।

তবু বেশ ছিল।

কিন্তু আজ সেই বৃন্দাবন আর স্বপ্ন নয়। তা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা অপরিহার্য, নির্মম প্রয়োজন। এখান থেকে ছুটে পালাতে চায় মল্লিকা, পালাতে চায় নীতীশের কাছ থেকে। একদিন একটা আশ্চর্য রাত্রির আচ্ছন্নতায় যে অপরাধ করে

ফেলেছে এখন তিলে তিলে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আর নয়—আর নয়।

সাপ! সাপ!

বাইরে থেকে একটা চিৎকার ভেসে উঠল, মল্লিকা উঠে পড়ল, বারান্দায় বেরিয়ে এল। মজুর রহিমুল্লা আধখানা বাঁশ হাতে নিয়ে ছাইগাদাটার আশেপাশে কী যেন খুঁজে ফিরছে।

কুঁড়োজালি হাতে যতীশও এসে দাঁড়িয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় সাপ রে?

—আইজ্ঞা ওই ছাইগাদার মধ্যে সান্ধাইল্‌ছে। বড় জবর সাঁপ জী—আলাদ। কালা কুচকুচা রঙ।

—থাক থাক, যেতে দে।

—যেতে দিব? ইটা কী বুইলছেন জী? উ শালা ইব্‌লিশের বাচ্চা। কাহুক ছোবল বসাইল্‌ছেন তো বিলকুল ঠাণ্ডা।

—না না, কৃষ্ণের জীব। মেরে-টেরে আর দরকার নেই, তাড়া দে, যেন পালিয়ে যায়।

রহিমুল্লা হাতের বাঁশটা একবার মাটিতে ঠুকল: ই কথাটা বুইলবেন না হামাক। বুঝিলেন জী, সাঁপ দেখি অক্ না মাইল্লে হামাদের গুনাহ্‌ হয়।

—তবে যা খুশি কর্, হরেকৃষ্ণ—যতীশ চলে গেলেন। সাপটা শুধু ওই ছাইগাদার মধ্যেই লুকিয়ে নেই, মল্লিকার মনের ভেতরেও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিলবিল করে। একটা হিংস্র আর দুরন্ত আলাদ সাপ, কালো কুচকুচে তার রঙ। এ বাড়ি আর একমুহূর্তও নিরাপদ নয়।

—বৌমা—যতীশ ডাকলেন।

—যাই বাবা—সাড়া দিয়ে মল্লিকা তাঁর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

রহিমুল্লা সাপটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

* * * *

—কাকিমা?

উঠোনে বসে একখানা টিনের ওপর বড়ি দিচ্ছিলেন কাকিমা। ডাক শুনে ফিরে তাকালেন।

—এসো বাবা। অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই, ভেবেছিলাম বুঝি ভুলেই গেলে।

নীতীশ অপরাধীর মতো একটু হাসল, জবাব দিলে না।

—বোসো বাবা, দাওয়ায় উঠে বোসো।

নিঃশব্দেই বসল নীতীশ। ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে তাকালো চারিদিকে। সাজানো সংসার, সাজানো বাড়ি।

প্রসন্ন স্নিগ্ধতায় ভরা কাকিমার মুখ। নিজের বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে এর যেন আকাশপাতাল পার্থক্য। সেখানে দম আটকে আসতে চায়, এখানে এলে বুকভরে নিঃশ্বাস টেনে নেওয়া চলে।

দৃষ্টি পড়ল তুলসীমঞ্চটার দিকে। এখানে তার তলায় পরিচ্ছন্ন হাতে আলপনা আঁকা, আঁকা শঙ্খ, পদ্মলতা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন। অলকার স্বাক্ষর।

অলকা। নীতীশ কোঁচার খুঁটে কপালটা মুছে ফেলল একবার। এখানেও—এখানেও সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। একদিন এই বাড়িটাকে কী আশ্চর্য ভাবে মুখর আর জীবন্ত বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু আজ বোধ হচ্ছে যেন এ বাড়ি বড় বেশি নির্জন, বড় বেশি স্তব্ধতায় ঢাকা। ইচ্ছার বিরুদ্ধেও চোখটা একবার ঘুরে গেল অলকার ছোট ঘরখানার দিকে। কিন্তু কোনো অর্থ হয় না। শহরের স্কুলে পড়তে চলে গেছে অলকা, সেখানকার পরিবেশ, পড়াশুনো—তার মাঝখানে নীতীশ ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে যোধপুরও।

কুয়োতলায় হাত ধুতে গিয়েছিলেন কাকিমা, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ফিরে এলেন।

—এমন চুপচাপ যে, হল কী ছেলের ?

—না, কিছুই হয়নি—স্বাভাবিক ভাবে জবাব দিতে চেষ্টা করে নীতীশ।

একখানা পিঁড়ি টেনে নিয়ে কাকিমা বসলেন। বললেন, মুখ এমন শুকনো কেন ? শরীর খারাপ নাকি ?

—না, কাকিমা, বেশ আছে শরীর।

—একটু চা খাবে ?

—না, ভালো লাগছে না—অর্ধমনস্ক নীতীশ উত্তর দিলে। এখানে এসেও তার ভালো লাগছে না। অথচ কেন ? কে তাকে সব চেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছে ? যতীশ ঘোষ ? নীতীশকে তা স্পর্শও করেনি। মল্লিকা ? না তাও না। সেই একটি রাত্রির দুর্বলতার জন্য নীতীশ নিজের কাছেই আজ অপরাধী হয়ে আছে। সুভাষ, জেলেরা, কেউ না, কেউ না। তবু সব মিলিয়ে একটা সীমাহীন ক্লান্তি, একটা অর্থহীন বিরক্তি এসে তাকে ঘিরে ধরেছে।

কাকিমা উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কিছু একটা নিশ্চয় হয়েছে। মন খারাপ ?

নীতীশ হাসল, এড়িয়ে গেল প্রশ্নটার উত্তর। বললে, আমি কলকাতায় চলে যাব কাকিমা।

—কেন ? হঠাৎ এসময়ে কলকাতায় যে ?

—এখানে আর ভালো লাগছে না।

—সে কি !—কাকিমা সবিস্ময়ে বললেন, এই তো সেদিন দেশে ফিরলি বাবা। দু-চার দিন থাকবি, বিশ্রাম করবি, এসেই আবার কলকাতায় ছোটা কেন ?

—বিশ্রাম তো অনেক হল কাকিমা।—তেমনি ক্লান্ত গলায় নীতীশ বললে, এবার একটা কাজকর্মের চেষ্টা দেখতে হয়।

—কেন, অভাব কী সংসারে? তা ছাড়া বাপ বুড়ো হয়েছে, এখন তোকেই সব বুঝে-শুনে নিতে হবে, দেখতে হবে বিষয়সম্পত্তি—

—তার দরকার হবে না কাকিমা.

কাকিমা আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলে না, কেবল জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন নীতীশের দিকে। মনের ভেতর একটা অনুমান মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কিছু একটা বুঝতেও পেরেছেন যেন। ও বাড়ির খবর অনেকটাই তো জানা আছে তাঁর। সাত খোপ কবুতর খাবার পর আজ তপস্বী যতীশ ঘোষ, তাই তাঁর ধর্মচর্চার পরিমাণটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে। আর আছে মল্লিকা। কিন্তু মল্লিকাকে তিনি যতটুকু দেখেছেন—

কাকিমা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন, যাওয়া কি নিতান্তই দরকার?

—হ্যাঁ কাকিমা, না গেলে আর চলছে না।

কাকিমা বললেন, যাতে ভালো হয় তাই কোরো বাবা। তুমি তো শুধু আমাদের নীতু নও, তুমি সারা দেশের। যেখানে থাকো তোমার ভালো হোক আর সেই সঙ্গে সকলের ভালো কোরো বাবা।

—তাই আশীর্বাদ করবেন কাকিমা—নীতীশের স্বর হঠাৎ কেমন বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল: সেইজন্যই যাচ্ছি। ভেবেছিলাম এখান থেকে কাজ আরম্ভ করব। কিন্তু এখন দেখছি এখান থেকে বাইরে না গেলে মনটাকে কিছুতেই তৈরি করে নিতে পারছি না। তা ছাড়া—খানিকটা স্বগতোক্তির মতো করেই বললে, এখনো অনেক কিছু জানবার আছে, ভাববার আছে।

কাকিমা তাকিয়ে রইলেন।

অন্যমনস্কের মতো নীতীশ বললে, মরা নদীকে বাঁচিয়ে তুলতে গেলে তার গোড়াটাকেই আগে খুঁজে বের করতে হয়। তারই খোঁজে আমি যাচ্ছি। আর তা যদি না পারি তা হলে মরা নদীর বিষাক্ত বাতাসে নিজেকেই অকারণে অসুস্থ করে তোলা হবে—প্রতীকার করা যাবে না।

নীতীশ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো—যেন জরুরী একটা কাজের কথা মনে পড়েছে তার। অসতর্কভাবে কতগুলো এলোমেলো কথা বলে ফেলেছে কাকিমাকে, যার কোনো প্রয়োজনই ছিল না।

—আজ চলি কাকিমা।

কাকিমা বললেন, এখনি?—কিন্তু জিজ্ঞাসাই করলেন, বসতে বললেন না আর।

কিছু একটা অনুমান মনের মধ্যে এখন একটা নিশ্চিত প্রত্যয়ের মতো শিকড় গাড়ছে। ঠিক কথা—ছেলেটা সুখী হয়নি। বারো বছর পরে জেল থেকে ফেরবার পর সংসারের কাছে তার যেটুকু প্রাপ্য ছিল তা পায়নি; কোথায় যেন একটা অত্যন্ত অবিচার হয়ে গেছে তার ওপরে।

—হ্যাঁ, কাকিমা। একবার থানার দিকে যাব। দারোগাকে একটা খবর দিতে হবে আমি কলকাতায় যাচ্ছি।

—আচ্ছা আয় বাবা। যাবার আগে একবার দেখা করিস মনে করে।

—না কাকিমা, তাতে ভুল হবে না।

নীতীশ বেরিয়ে পড়ল, চলল থানার দিকে। সত্যিই আর থাকা চলে না। এই কদিন ধরে যে কথাটা তার মনের মধ্যে একটা অস্পষ্ট রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যাকে ঠিক পরিষ্কার করে বুঝতে পারেনি, একটু আগেই সেটাকে অকস্মাৎ আবিষ্কার করে বসেছে সে, উচ্চারণ করেছে কাকিমার কাছে।

ঠিক কথা। মহানন্দা মরা নদী, তার জলে আজ স্রোত নেই, নেই তীক্ষ্ণ তীব্র জীবনপ্রবাহ। হিমালয়ের শীর্ষশিখর হিমমজ্জিত এভারেস্ট থেকে গ্লেসিয়ার গলে নামে দুরন্ত নদী কুশী, প্রলয় প্লাবনে ডম্বরু বাজায়; সেই মাতৃস্রোত কুশী থেকে, হিমালয়ের সেই চিরন্তন তুষারের প্রাণসঞ্চয় থেকে সে বঞ্চিত। তাই তার আবদ্ধ ধারা থেকে উঠছে অস্বাস্থ্য, উঠছে বিষবাষ্প। তা সমস্ত শক্তিকে তিলে তিলে আচ্ছন্ন করে ধরে, নিজেকে দুর্বল করে দেয়, ব্যাধিগ্রস্ত করে ফেলে। এই যোধপুরে থেকে, মনের এই চঞ্চলতা নিয়ে জাগরণ সংঘের একটা অতি দুর্বল ভিত্তিকে আশ্রয় করে কিছুই করা সম্ভব নয়। সে মরে যাবে এই মহানন্দার মতো; থেমে যাবে সুদূর এভারেস্টের সমুন্নত চূড়ার মতো আদর্শের উদার প্রেরণা, আর বুকের ভেতর শ্যাওলার মতো জাল বুনতে থাকবে মল্লিকা আর অলকা, অলকা আর মল্লিকা—

না, কেউ নয়। মরা মহানন্দা নয়, সমুদ্র। কলকাতা। নীতীশ জোরে পা চালিয়ে দিল।

দারোগা মফিজর রহমান যত্ন করে বসালেন, সিগারেট দিলেন। তারপর পরম আপ্যায়িতের ভঙ্গিতে জানতে চাইলেন: কী মনে করে?

—একটা খবর দিতে এলাম দারোগা সাহেব।

—বসুন বসুন, কী ব্যাপার?—দারোগা উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।

—আমি আর এখানে থাকব না।

দারোগা চকিত হয়ে উঠলেন: সে কি, কোথায় যাচ্ছেন? আপনার whereabouts তো—

—সেই কথা জানাবার জন্যই এলাম।—নীতীশ হাসল।

—বেশ, বেশ, ভালো কথা। বাঁচালেন আমাকে।—থানায় একটা report করে চলে যান, আপনার অসুবিধে থাকবে না, আমাদের দায়িত্বও না।—পেনসিল আর নোটবই টেনে নিয়ে কী খানিকটা খসখস করে লিখলেন দারোগা, জিজ্ঞাসা করলেন, কবে যাচ্ছেন?

—কালকেই।

লিখতে লিখতেই দারোগা প্রশ্ন করলেন, কোথায়?

—কলকাতা।

—কলকাতা?—একবার চোখ তুলে তাকালেন দারোগা। বললেন, ও। তা কোন্ ঠিকানা?

—এখনও ঠিক নেই।

—সে কি কথা!—মফিজর রহমান শিউরে উঠলেন: আপনার whereabouts সমস্তই যে আমাদের detailsএ চাই। না হলে—

—আচ্ছা,—ভ্রূকুঞ্চিত করে এক মুহূর্ত ভাবলে নীতীশ, যেন কিছু একটা মনঃস্থির করে নিলে। তারপর বললে, তবে লিখুন, দি গ্রীন ক্লাব, —নং হাজরা রোড, ভবানীপুর।

—গ্রীন ক্লাব?—দারোগা সন্দিগ্ধ চোখে আবার তাকালেন, কিন্তু কোনো কথা বললেন না। খসখস করে আবার খানিকটা লিখে জানতে চাইলেন: কতদিন থাকবেন?

—তা এখন কী করে বলি? হয়তো বেশ কিছুদিন থাকতে হবে—

—তবু একটা specific আমাদের চাই যে। তিন মাস লিখব?

—তাই লিখুন।

বিবৃতি শেষ করে নীতীশ উঠে দাঁড়াতে যাবে, দারোগা বললেন, দেখুন যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলব?

—স্বচ্ছন্দে।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে দারোগা বললেন, অনেক তো হল, এবারে ছেড়ে দিন এসব।

—কী ছেড়ে দেব?

—এই রাজনীতি। বুঝতেই তো পারছেন এসব করে ইংরেজ তাড়ানো যাবে না। বারো বছর জেল ঘুরে এলেন, যথেষ্টই করলেন দেশের জন্যে। এবার না হয় দু-চারদিন ঘর-সংসারই করুন!

—আচ্ছা, ভেবে দেখব। এবার চলি, নমস্কার—

—আদাব।

যেমন হয়, বাড়িতে আজও ঢের বেলা হয়ে গেল। সূর্য মাথার ওপরে চড়েছে, আমবাগানটা দুপুরের রোদে যেন ঝিম ধরে পড়ে আছে। ঘুঘুর ডাক আসছে নিয়মিত ছন্দে। মহানন্দার বালিডাঙায় ধুলোর ঘূর্ণি পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে আকাশের দিকে।

বাড়িটায় যেন দুপুর রাত্রের স্তব্ধতা। কোথাও কেউ নেই। শুধু ঠাকুরঘরের ভেতর থেকে ধূপের একটা মৃদু গন্ধ উঠে সমস্ত বাড়িময় সঞ্চারিত হয়ে ফিরছে। দাওয়ার এক কোণায় কতগুলো শুকনো ফুলপাতা জড়ো হয়ে আছে, অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে একটা লম্বা কানওলা রামছাগল মনোনিবেশ করেছে তাদের সদ্‌গতিতে। কুয়োতলায় পাতা ইটের ফাঁকে ফাঁকে যে জল জমেছে সেখানে শুরু হয়েছে গোটাকয়েক চড়ুইয়ের হৃষ্ট স্নানপর্ব।

নিজের ঘরে যাওয়ার আগে হঠাৎ তার মনে হল, কলকাতায় যাওয়ার সংকল্পটা একবার যতীশকে তার জানানো দরকার। কেমন যেন মনে হয়েছে, শুধু মনে হওয়াই নয়, একটা নিশ্চিত প্রত্যয়ের মতোই সে বুঝতে পেরেছে যতীশ আপত্তি করবেন না। তিনিও নিশ্চিন্ত হবেন, নীতীশেরও একটা অসুস্থ আর অস্বস্তির নাগপাশের বন্ধন থেকে মুক্তি ঘটে যাবে।

সেই ভালো। পিতা-পুত্রের মধ্যে এই স্নায়ু-সংগ্রামটা যত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় তাই ভালো। তারা পরস্পরকে চিনতে পেরেছে। বারো বছর ধরে যে রীতি, যে নীতি এখানে স্থায়ী হয়ে বাসা বেঁধেছে, তার মাঝখানে সে অত্যন্ত বেমানান, অত্যন্ত খাপছাড়া ভাবে এসে পড়েছিল। এখানে সে থাকতে পারছে না, তার ওপরেও আজ এ বাড়ির কিছুমাত্র দাবি নেই। ঘর তাকে বাঁধতে পারবে না বলেই অলকা আলেয়ার মতো তাকে হাতছানি দেবে, অতএব আজই এর ঘটে যাক একটা নিশ্চিত সমাপ্তি।

যতীশের ঘরের দরজাটা ভেজানো। আস্তে দরজায় ধাক্কা দিল সে। দরজা খুলে গেল। চোখে পড়ল মল্লিকার কোলে মাথা রেখে যতীশ শুয়ে আছেন। দেবদাসী মল্লিকা সস্নেহে তাঁর মাথায় আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে।

নীতীশ মুহূর্তের জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। হঠাৎ ভূত দেখবার মতো করে যতীশের মাথাটা কোলের থেকে নামিয়ে, মুখের ওপর ঘোমটা টেনে দিলে মল্লিকা।

যতীশের চোখ তন্দ্রার আমেজে বুজে এসেছিল, বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি।

—কে ?

—আমি নীতীশ।—পাথরের মতো শক্ত গলায় নীতীশ জবাব দিল।

—কী চাও ?—যতীশের স্বরে বিরক্তি এবং ক্রোধ যেন শতখান হয়ে ভেঙে পড়ল।

—একটা কথা বলতে এসেছিলাম,—নীতীশ তেমনি শক্ত গলাতেই বললে, কিন্তু পরেই বলব এক সময়—। তার স্বরে ব্যঙ্গের আভাস ফুটে বেরুল : আপনি বিশ্রাম করুন।

কয়েক মুহূর্ত পিতাপুত্র পরস্পরের দিকে অগ্নিস্রাবী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। আর ভুল নেই, সমস্ত রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে, কারুরই আর চিনতে বাকি নেই অপরকে।

কিন্তু মাত্র কয়েকটি মুহূর্তই। তারপর আবার নীতীশ নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। নিজের ঘরের দিকে চলতে চলতে মনে হল, সমস্ত শরীরে তার একটা অস্বাভাবিক লঘুতা, একবিন্দু জোর নেই তার পায়ে। বুঝেছে, সব বুঝতে পেরেছে। বুঝেছে আজ সে এখানে অনাবশ্যক, সে অকারণ অতিরিক্ত।

এ শুধু সেবা, পুত্রবধূর বুড়ো শ্বশুরকে সেবা করা! কিন্তু শুধু সেবাই এ নয়। বাইরে যা সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দেয় না, যা হয়তো অর্ধচেতন ভাবে মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, সেই সরীসৃপচিহ্ন যতীশের চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেছে মল্লিকার লজ্জিত অপরাধবোধে। ওই লজ্জা আর ওই বিরক্তি সাধারণকে এক মুহূর্তে অসাধারণ করে দিয়েছে। আর ভুল নেই।

কিন্তু এত বড় ভয়ঙ্কর একটা আবিষ্কারের পরেও কেন যথেষ্ট আঘাত পাচ্ছে না নীতীশ? কেন বুকের ভেতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় পুড়ে যাচ্ছে না তার? কেন মনে হচ্ছে, কোথা থেকে একটা বাতাসের ঠাণ্ডা ঝলক এসে তাকে যেন জুড়িয়ে দিয়ে গেল?

কী যেন একটা বাঁধন ভেঙে পড়েছে, কোথায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে একটা অবাঞ্ছিত শৃঙ্খল। মুক্তি—মুক্তি এসেছে তার।

এবার আর তার কলকাতায় যেতে কোনো বাধা নেই!

দ্বিতীয় অধ্যায়

১

শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে সমর ঘোষ দেখল, ট্রেনটা আসতে প্রায় কুড়ি মিনিট দেরি আছে। গাড়িটাকে খোলা সার্কুলার রোড দিয়ে প্রায় উড়িয়ে এনেছে, এত তাড়াতাড়ি করবার কোনো দরকারই ছিল না।

কিন্তু উপায় নেই। নতুন ড্রাইভিং শিখেছে, স্পীডোমীটারের কাঁটাটা শেষ ঘর পর্যন্ত ঘুরিয়ে দিলে তৃপ্তি পায় না মন। এই করে লেকের কাছাকাছি একদিন প্রায় মানুষ চাপা দিয়ে বসেছিল, এক ইঞ্চির জন্যে বেঁচে গেল দুর্ঘটনা। মনে মনে অনুতপ্ত হবার আপ্রাণ চেষ্টা করে আবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সে গাড়ি ছুটিয়ে দিয়েছে উল্কা বেগে। বারো হর্স পাওয়ারের ঝকঝকে নিটোল গাড়িটাকে অমন অহিংস শম্বুক গতিতে চালাতে নিজেকে কেমন অপরাধী বলে মনে হয়—মনে হয় একটা উদ্দাম বন্য শক্তির অহেতুক রাশ টেনে রেখে সে একান্ত একটা অবিচার করছে।

কিন্তু তাই বলে গেঁয়ো লোকের মতো কুড়ি মিনিট আগে পৌঁছানো! সমর ঘোষ ভ্রূকুঞ্চিত করলে। ঢিলে সিল্কের পাঞ্জাবির পকেট থেকে সোনার সিগারেট কেসটা বার করলে সে, অ্যামেরিকান লাইটারে জ্বালিয়ে নিলে একটা নাইন-নাইনটি-নাইন, তারপর পাইথনের চামড়ার চটিটা ঠুকতে ঠুকতে উর্ধ্বমুখে ধোঁয়া ছড়াতে লাগল।

—হটিয়ে সাব—

বিরক্ত চোখে সমর তাকালো। মাথার ওপর কাপড়ের পাড় দিয়ে বাঁধা মস্ত একট সতরঞ্চির বিছানা, এক হাতে একটা টিনের সুটকেস, হাঁপাতে হাঁপাতে তাকে অনুরোধ জানাচ্ছে একটা কুলি। ভারী বিছানার চাপে লোকটা প্রায় কুঁজো হয়ে গেছে, ঘাম গড়িয়ে যাচ্ছে তার কালো কপালে। ছেঁড়া নীল কুর্তা থেকে উগ্র ঘামের গন্ধ এসে তাকে আক্রমণ করেছে।

—থোড়া হটিয়ে সাব্—হাঁপাতে হাঁপাতে আর একবার মিনতি জানালো কুলিটা। একটা ভারবাহী ক্লান্ত বলদের প্রতি মানুষ যে দৃষ্টিতে তাকায়, ঠিক তেমনি চোখে লোকটাকে একবার পর্যবেক্ষণ করে সমর সরে দাঁড়ালো। এগিয়ে গেল হুইলারের দিকে।

দি আইডিয়া। কুড়ি মিনিট সময় দেখতে দেখতে এখানেই কেটে যাবে।

সান্-বেদিংয়ের একখানা পত্রিকা হাতে তুলে নিতে না নিতেই সে নিবিষ্ট হয়ে গেল। খাসা ছবি, চমৎকার ফটোগ্রাফী। একটা দেশের মতো দেশ বটে আমেরিকা। মেয়েদের

ফিগার দেখলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। আর যেমন ডেয়ারিং তেমনি আন-অ্যাবাশ্‌ড্‌। কত রকম পোজে ছবি তুলছে, অথচ নট্‌ এ স্টিচ্‌ অব্‌ ক্লোদস্‌। সত্যি এমন একটা হেল্‌দি সাইন অব্‌ লাইফ কবে যে এদেশে আসবে?

—ফ্রেঞ্চি ফ্রলিক্‌ দেব স্যার? মেন্‌স্‌ ওন ম্যাগাজিন?

সেল্‌সম্যান জানতে চাইল। ক্রেতার নির্বাচন দেখেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে তার রুচিটা বুঝে নিতে পারে। কথার সঙ্গে সঙ্গেই সমগোত্রীয় আরো দু-তিনখানা পত্রিকা সে বাড়িয়ে দিলে সমরের দিকে।

অন্যমনস্ক ভাবে পার্সে হাত দিতে যাবে, হঠাৎ কানে এল ঠন্‌ঠন্‌ করে ঘণ্টার শব্দ, ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে হুস্‌ হুস্‌ করে একটা ট্রেন ইন করবার আওয়াজ। একটা কুলি হাঁক দিয়ে উঠল : লালগোলা প্যাসেঞ্জার আ গিয়া!

বই আর কেনা হল না। চকিত হয়ে সমর ঘোষ গিয়ে গেটের সামনে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল যাত্রী আর কুলির তরঙ্গ—গেট দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল প্লাবনের ধারার মতো। সমর ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে লাগল পাল সাহেব যে রকম বর্ণনা দিয়ে দিয়েছেন, ঠিক তাই থেকেই তার উদ্দিষ্টদের সে খুঁজে পাবে কিনা।

কেটে গেল কয়েকটা মিনিট। চোখের দৃষ্টি জলন্ত করে সমর জনতাকে বিশ্লেষণ করতে লাগল। তারপর চকিত হয়ে উঠল সে। ঠিক এরাই বটে। পাল সাহেবের বর্ণনা হুবহু মিলে যাচ্ছে।

খাটো চেহারার আধবুড়ো মানুষ—মাথাজোড়া মস্ত টাক। চশমার মধ্যে দিয়ে কেমন অসহায় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন—কাউকে খুঁজছেন নিশ্চয়। সঙ্গে লাল শাড়ি পরা একটি পনেরো-ষোল বছরের মেয়ে—দিব্যি ফুটফুটে চেহারা। হ্যাঁ—এরাই বটে।

সমর এগিয়ে গেল।

—আপনি মিস্টার ঘোষ? রোহনপুর থেকে আসছেন?

প্রশ্নকর্তার দিকে ভীত বিস্মিত চোখে তাকালেন ভদ্রলোক। এ এক অপরিচিত জগতের মানুষ। পরনে সিল্কের পাজামা, গায়ে সিল্কের ঢোলা পাঞ্জাবি, নাকটেপা সোনার চশমা। চেহারা দেখে হিন্দু কি মুসলমান সেটা নিশ্চয় করে ঠাহর করা শক্ত।

ভদ্রলোক সভয়ে বললে, হ্যাঁ, আমি রোহনপুর থেকেই আসছি। আমার নাম সুদামচন্দ্র ঘোষ।

—রাইট্‌। ঠিক guess করেছি তা হলে। And I suppose she is Miss Ghosh, isn't she?

সুদাম বিব্রত মুখে বললেন, হ্যাঁ, এ আমার মেয়ে অলকা। কিন্তু স্যার আপনি—

—আমায় আপনি চিনবেন না। সম্পর্কে আমি পাল সাহেবের nephew হই। তিনি একটা 'কেস' নিয়ে ব্যস্ত, আসতে পারলেন না, আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। আমার নাম সমর ঘোষ।

—ওঃ—সুদাম ঢোঁক গিললেন একটা।

সমর একটা বক্রদৃষ্টি ফেলল অলকার দিকে। A bit of pretty miss really! ট্রেনে রাত জেগে এসেছে, চোখের কোণে ক্লান্তির কালো রেখা। অসংযত চুলের গুচ্ছ কপালে এসে ছড়িয়ে পড়েছে অনাদরে। নাকটেপা চশমার আড়াল থেকে সমরের চোখ কথা কয়ে উঠল। লালের আভা পড়ল অলকার গালে, বিব্রত ভাবে মাথা নামাল সে।

সমর বললে, তাহলে চলুন। এই কুলি চলো—

সুদাম বললেন, কোন্ দিকে ?

—এই তো বাইরে গাড়ি রয়েছে—হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কুলিটাকে একটা ধমক দিলে সমর: এই কুলি, জলদি চলো—

স্টেশনের বাইরে সমরের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কৃষ্ণাভ সবুজ রঙের বিশালকায় সুপার হাডসন গাড়ি। সকালের রোদে তার পালিশ ঝিকিয়ে উঠছে, চিকচিক করছে এভার ব্রাইট স্টিলের অংশগুলো। গাড়ির দিকে চেয়ে সুদাম থ হয়ে গেলেন, অলকা তাকিয়ে রইল বিমূঢ় চোখে।

পেছনে জিনিসগুলো তুলে দিয়ে সমর 'বো' করবার কায়দায় খুলে ধরল কারের দরজা।

—আসুন—

ইতস্তত করে দুজনে গাড়িতে উঠলেন। সমস্ত অবস্থাটা যেমন রহস্যময়, তেমনি নাটকীয়। দুজনের কারো মুখে কোনো কথা নেই। অলকা গাড়ির এক পাশে যতটা সম্ভব সঙ্কুচিত হয়ে বসেছে, আর সুদাম অসীম অস্বস্তিভরে অনুভব করছেন গাড়ির গদীটা ভারী বিশ্রীভাবে তাঁকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে নীচের দিকে।

গাড়িতে স্টার্ট দিল সমর।

কয়েকটা মিনিট তেমনি নীরবতার মধ্যেই কেটে গেল। মৌলালীর মোড় পর্যন্ত ধীরে সুস্থে ভিড় কেটে এসে ডানা মেলল সুপার হাডসন। যেন উড়ে চলল উল্কাগতিতে।

চলবার পরিতৃপ্তিতে সমর ঘোষের চোখমুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। কপালের ওপর থেকে উড়ে আসা চুলগুলোকে এক হাত দিয়ে সরিয়ে সে তাকালো এঁদের দিকে।

—কাল কখন রওনা হয়েছেন আপনারা ?

—সন্ধ্যে সাতটায়।

—ওঃ, খুব কষ্ট হয়েছে! এ হোল্ নাইট!

—হুঁ—সুদাম সভয়ে জবাব দিলেন।

গাড়ি উড়ে চলেছে। নতুন ড্রাইভিংয়ের আনন্দে সমর উদ্দীপনা বোধ করছে, সেই সঙ্গে মিশে রয়েছে আরো একটা অনুভূতি। A pretty miss! মেয়েদের কাছে শৌর্য ঘোষণার একটা চিরন্তন প্রেরণা চঞ্চল করে তুলেছে সমরকে—দীপ্ত গতিতে চলেছে বারো হর্স পাওয়ারের মোটর।

—আচ্ছা—এতক্ষণে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করেছেন সুদাম, গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, আচ্ছা—

হাসিভরা মুখ ফিরিয়ে সমর প্রশ্ন করল, কিছু বলবেন?

—জগদীশ বুঝি পাঠিয়েছে আপনাকে?

—জগদীশ!—সমর ভ্রূকুঞ্চিত করল, তারপর হেসে বললে, ওঃ, I am sorry. You mean Mr. Paul? হ্যাঁ—তিনিই পাঠালেন। খুব ব্যস্ত ছিলেন, আমাকে ডেকে বললেন, সমর, লালগোলা প্যাসেঞ্জারে আমার দুজন আত্মীয় আসছেন। তুমি গাড়ি নিয়ে যাও—তাঁদের নিয়ে আসবে। তাই আমি এলাম।

বুঝেছি।—একটু চুপ করে থেকে সুদাম বললেন, ভালো আছে ওরা?

—ভালো? ই-য়েস। তবে বড্ড বিজি—আজকাল সিভিল সাইডে দুর্দান্ত প্র্যাক্‌টিস্ কিনা ওঁর।

—হুঁ—সংক্ষেপে জবাব দিলেন সুদাম। সমর আবার তাকালো সামনের দিকে, একটা ট্রামের পাশ কাটিয়ে বোঁ করে গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল।

কিন্তু সুদামের ভালো লাগছে না। আড়চোখে লক্ষ্য করে দেখলেন অলকার দিকে। বাইরের দিকে চোখ মেলে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে সে, তার মনের ভাবটা বোঝা যায় না। কিন্তু এমন অপরিচিত পরিবেশে একটা প্রকাণ্ড মোটর গাড়িতে চেপে খুব যে আরাম পাচ্ছে না, তাতে সন্দেহ নেই। সুদামের মনে পড়ল অন্ধকার আমবাগানের ছায়া-ঘেরা গোরুর গাড়ির এবড়োখেবড়ো পথ—দূরে মহানন্দার শাদা জলের রেখা চলেছে পাশ দিয়ে। বুনো ওলের গাছ, লাটার বন, বিলাতী পাকুড়কে জড়িয়ে জড়িয়ে তেলাকুচোর লতা, পথের পাশে রাঙা টুকটুকে মাকালের দোলন। এ গাছ থেকে ও গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে বাঁদর, কতগুলো আমের কুঁড়ি টুপটুপ করে নীচের শুকনো পাতাগুলোর ওপর ঝরে পড়ল।

সে চেনা দেশ, সেখানকার সব চেনা মানুষ। মাটির প্রতিটি ইঞ্চির সঙ্গে সুগভীর পরিচয় আছে, জড়িয়ে আছে নিবিড়তম মমতা। কিন্তু এ তা নয়। একেবারে আলাদা

—আগাগোড়াই আলাদা। সে ভাঙা গৌড়ের দেশ, এ নতুন কালের কলকাতা।

কিন্তু কাজটা ভালো হল কী ? ভালো হল এই বড়লোক ভায়রার বাড়িতে অলকাকে দিয়ে আসা ? জগদীশ বড়লোক, জগদীশ বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছে—এ সবই সুদাম ঘোষ জানতেন। কিন্তু বড়লোকের যে চেহারার সঙ্গে তিনি পরিচিত—আর তিনি নিজেও তো মোটামুটি বড়লোক—সে পরিচিত রূপটার অথবা তাঁর নিজের সঙ্গে কিছুই তো মিলছে না এর। তাঁর জানা বড়লোকেরা মোষের গাড়িতে পুরু জাজিম পাতে ; কিন্তু তীরের বেগে ছুটে চলা এই প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি চড়তে তারা অভ্যস্ত নয়।

জগদীশের বাড়িতে অলকাকে রাখা। কাজটা বোধ হয় ভালো হবে না। তেলে জলে যে মিশ খেতে চাইবে না, এই বিচিত্র চেহারার ছেলেটিই তার প্রমাণ ; বললে, জগদীশের নেফিউ, আইনসঙ্গত ভাবে তিনি তাঁর গুরুজন, অথচ একটা প্রণাম করা তো দূরের কথা, দিব্যি নির্বিকার মুখে সিগারেটের ধোঁয়া তাঁরই নাকের ডগায় ছড়িয়ে দিতে লাগল।

নাঃ, এ ঠিক নয়।

সমর আবার দৃষ্টি ফেরালো এদিকে।

—মিস্ ঘোষ তখন থেকে তো চুপ করেই রইলেন। একটু আলাপও হল না আপনার সঙ্গে।

বিরক্তি বোধ করে সুদাম এবার বাইরের দিকে তাকালেন আর বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনল অলকা। চোখ দুটো তুলে ধরল সমরের দিকে। সে দৃষ্টিতে ভয় নেই, বিস্ময় নেই, শুধু আছে খানিকটা ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা।

—কী বলব ?—মৃদু স্বরে জবাব দিলে সে।

সমর যেন থতমত খেয়ে গেল। বার দুই হর্ন বাজিয়ে সে কোনো পথচারীকে সতর্ক করে দিলে আর সেই সঙ্গে সামলে নিলে নিজের অপ্রতিভ ভাবটাকেও। তারপর মুখে জোর করে একটা হাসি টেনে এনে বললে, বাঃ, চুপ করে থাকবেন সেজন্যে ? ভারী shy আপনি বাস্তবিক !

অলকা এবার শুধুই হাসল, কোনো কথা বললে না।

—আচ্ছা, বাড়িতে গিয়ে দেখা যাবে—সমর জবাব দিলে, মনোনিবেশ করলে তার নতুন হাডসন গাড়িতে। আসলে, অমন স্মার্ট মানুষটা কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গেছে। এত উদ্যম নিয়ে বলবার উপক্রম করতে গিয়েই যেন টের পেয়েছে একখণ্ড পাথরে হাত লেগেছে তার—একটা শীতলতা এসে তার সমস্ত উত্তপ্ত আবেগকে মুহূর্তে দিয়েছে প্রশমিত করে।

সমর মনে মনে বললে, একেবারে 'র' ভিলেজ টাইপ। তবে মানুষ হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবে না। পাল সাহেবের বাড়ির আবহাওয়ায় ম্যাজিক আছে। ও বাড়ির

কাকাতুয়াটা পর্যন্ত ইংরেজি ধরনে ডাকে।

কিন্তু অলকা ভাবছিল অন্য জিনিস। ইস্কুল থেকে ট্রানস্ফার নিয়ে বাড়িতে এসেই শুনেছিল নীতুদা চলে এসেছে কলকাতায়। খবরটা মা-ই দিলেন। এমন ভাবে দিলেন যে মনে হল এ শুধু চলে আসাই নয়, আরো কিছু আছে এর পেছনে। কোনো একটা গভীর ব্যথা, কোনো একটা প্রচ্ছন্ন আঘাত।

কী সে? কী হতে পারে? সঙ্গে সঙ্গেই আকুল প্রশ্ন জেগেছে অলকার মনে, বুকের মধ্যে কেমন একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা সাড়া দিয়েছে। কিন্তু মাকে কোনো কথাই জিজ্ঞেস করতে পারেনি, শুধু কয়েকটা দিন বয়ে বেড়িয়েছে তীব্র খানিকটা অস্বস্তির জ্বালা।

কলকাতায় আসবার যখন সব ঠিক হয়ে গেল, তখন দুরু দুরু করে উঠেছিল মন। এখানে ঠিক দেখা হয়ে যাবে—হয়তো স্টেশনে নেমেই দেখতে পাবে একমুখ হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীতীশ, আছে তারই জন্যে প্রতীক্ষা করে।

কিন্তু এ তো তাদের যোধপুর নয়, তাদের মহানন্দার দেশও নয়। কত বড় এ—কী সীমাহীন বিরাট! মহানন্দার স্রোত সে চেনে—এ যে মহাসাগর। এর ভেতরে কোথায় সে পাবে নীতুদাকে, কেমন করে তার সন্ধান মিলবে এই মহাসমুদ্রে?

বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে স্তব্ধ বেদনায় এই কথাই ভাবছিল অলকা।

ভোঁ—

একটা তীব্র শব্দ করে সুপার হাডসনের ভেঁপু বাজল। গাড়িটার গতি মন্থর হয়ে উঠল, রাস্তা থেকে ফুটপাথের দিকে ঘুরল। খুলে গেল পথের ধারের মস্ত লন-ওলা একটা বাড়ির লোহার ফটক, দারোয়ান দাঁড়িয়ে উঠে সেলাম দিলে।

দুপাশের শ্যামলতার বুকে সীজন ফ্লাওয়ার, বিকসিত চন্দ্রমল্লিকা; অ্যাশফল্টের পথের ওপর দিয়ে রাজহাঁসের মতো ভাসতে ভাসতে হাডসন গিয়ে দাঁড়ালো 'জে-সি পাল, বার-য়্যাট্-ল'র গাড়িবারান্দায়।

লাফিয়ে নেমে পড়ে তেমনি 'বো' করার ভঙ্গিতে দরজাটা খুলে ধরল সমর।

২

দি গ্রীন ক্লাব।

নামটি বেশ রোমাঞ্চকর হলেও এমন কিছু বিশেষত্ব নেই তার। সেই চিরাচরিত মেস। ছাত্র, কেরানী, আর ইন্সিয়োর কোম্পানীর দালালের চিরকেলে মাথা গুঁজে থাকবার আস্তানা।

প্রতি ঘরে তিনখানা করে তক্তপোষ। তিনটি করে মানুষ থাকে আর থাকে তিন

কোটি করে ছারপোকা। গ্রীন থাকবার চেষ্টা করেও কোনো লাভ নেই, দুদিনেই তারা গ্রে করে ছেড়ে দেবে।

সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই উঠোনের বিশাল চৌবাচ্চাটায় কাক-স্নান পর্ব। নটার মধ্যে বেশির ভাগের নাওয়া-খাওয়া শেষ। সাড়ে দশটার পরে ঘরে ঘরে ঝুলন্ত তালা আর সীমাহীন নির্জনতা। সারা দুপুর চাকরদের কথালাপ, বিচিত্র সুরে হিন্দুস্থানী ঠাকুরের হনুমান চরিতামৃত পাঠ।

পাঁচটা থেকে আবার উজান-পর্ব। কেউ ঘরে এসে লম্বা হয়, কেউ ধড়াচূড়ো ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে রওনা দেয় সিনেমা অভিমুখে, কেউ বা লেকে বেড়াবার উদ্দেশ্যে। কোথাও জমে তাসের আড্ডা। একজন বেসুরো গলায় বেসুরো হারমোনিয়ামে গান ধরে, আর একজন তারও চাইতে ভয়ঙ্কর বোলে ঠোকে তবলা। সে গানের আশেপাশের বাড়ির দরজা-জানালাগুলো সশব্দে বন্ধ হয়ে যায়, একেবারে লাগালাগি বাড়িটার ভাড়াটে টেঁকে না।

যে বন্ধুটির কাছে নীতীশ এসে উঠল, তার নাম প্রকাশ দত্ত।

ফরিদপুর অঞ্চলে বাড়ি। একসঙ্গে বিপ্লবী কর্মী হিসেবে প্রচুর খ্যাতি ছিল, কাজও করেছে যথেষ্টই। কিন্তু কিছুদিন ডিটেন্‌শনে থেকে এখন একেবারে একান্ত নিরামিষ হয়ে গেছে। একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করে, খায় দায়, খেলা দেখে, মাসে মাসে বাড়িতে নিয়মিত টাকা পাঠায় আর বৌকে বড় বড় চিঠি লেখে নীল খামে। একটু বেশি বয়েসে বিয়ে করেছে বলে প্রায়ই বেয়ারিং হয় চিঠিগুলো।

প্রকাশ অভ্যর্থনা করে বললে, আরে এসো—বোসো এইখানে! এই কুলি—মাল রাখ্‌ এখানে। পঞ্চা, আর এক কাপ চা আর টিফিন এ ঘরে—অত্যন্ত দ্রুতবেগে কথাগুলো বলেই প্রকাশ একটা হাঁক পাড়লে, ম্যানেজারবাবু?

নীতীশ হেসে বললে, আরে, এত ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ কেন।

—না, না, বুঝতে পারছ না ভাই। দেরি হলে শেষে আর অ্যারেঞ্জ্‌ করা যাবে না—মণিবন্ধের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে প্রকাশ বললে, তা ছাড়া অফিস রয়েছে। ম্যানেজার-বাবু!

গোলগাল চেহারার এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন পাশের ঘর থেকে।

প্রকাশ বললে, আমার গেস্ট্‌। আমি তো দাঁড়াতে পারছি না, সাড়ে নটা বাজে। আপনি একটু দেখেশুনে থাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন।

—সে বলতে হবে না, ঠিক হয়ে যাবে সব—নীতীশের আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে নিয়ে ম্যানেজারবাবু সামনের তিনটি বাঁধোনো দাঁত বিকসিত করে হাসলেন: আপনি ভাববেন না।

প্রকাশ সশব্দে জুতোটা ব্রাশ করে পায়ে পরে নিল। নীতীশের দিকে তাকিয়ে বললে, তাহলে চান করে খেয়েদেয়ে তুমি রেস্ট্ নাও—লজ্জিতভাবে শেষ করল : এখন বড় তাড়া, বিকেলে কথা হবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও অফিসে। ভদ্রতা করবার দরকার নেই আমার সঙ্গে—নীতীশ প্রকাশকে তার বিপন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করল।

—চলি তা হলে। একটু নজর দেবেন ম্যানেজারবাবু—তেমনি টেলিগ্রাফের টরে-টক্কার মতো দ্রুতবেগে কথা বলতে বলতে প্রকাশ নেমে চলে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

তারপর থেকে নিজেকে এখানে স্থায়ী বাসিন্দা করে নিয়েছে নীতীশ।

মহানন্দার স্রোত নয়, সমুদ্র। তবু এই সমুদ্রে দিশেহারা হয়ে যায় সে। কী করবে জানে না। কিসের জন্যে পালিয়ে এল কলকাতায় তাও তার কাছে অর্থহীন ঠেকে আজকাল।

নিঃসঙ্গ ভাবনায় প্রায় নিঃসঙ্গ দিন কাটে।

প্রকাশের সঙ্গে একটু যা দেখাশোনা তা ওই সন্ধ্যের দিকেই। কিন্তু সে আলোচনা মেসের খাওয়া নিয়ে, ব্যাঙ্কের গল্প নিয়ে, কখনো কখনো বউ নিয়ে। কোনো-কোনোদিন তেমন মেজাজ থাকলে চুপি চুপি বউয়ের চিঠি থেকে পড়ে শোনায় দু'একটা ভালো ভালো লাইন। কেমন বিগলিত মুখে বলে, বেশ লিখেছে, না?

কথার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুতভাবে টেনে টেনে হাসে, বউয়ের কথা বলবার সময় কী আশ্চর্য পরিমাণে যে বোকা দেখায় মানুষকে! অশ্রদ্ধা বোধ করে নীতীশ। মনে পড়ে যায়, ইংরেজ তাড়ানোর কল্পনাতে একদিন এই প্রকাশ দত্তের চোখ কী অদ্ভুত আলোয় জলজল করে উঠত।

সে মানুষটা মরে গেছে অনেকদিন। রাজবন্দীর সার্টিফিকেটে চাকরিটা যোগাড় করবার পরেই প্রকাশ সাধারণ হয়ে গেছে—অবিশ্বাস্য রকমের সাধারণ! চিঠি লেখার নীল খামগুলো তার প্রমাণ, তার প্রমাণ তিনদিন পর পর ডাকের আশায় তার অবিশ্রান্ত ছটফটানি।

রাজনীতি চর্চা পারতপক্ষে করতেই চায় না। আর যাও করে, তা নিছক খবরের কাগজের রাজনীতি। রাম-শ্যামের মতোই সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলোকে নিজের মতামত করে নিয়ে সগর্বে তাই ঘোষণা করে।

আর বউয়ের গল্প।

নীতীশের মাঝে মাঝে মনে পড়ে মল্লিকাকে। কিন্তু সেটা স্মৃতি নয়—দুঃস্মৃতি। পাশাপাশি আর একখানি মুখ ভেসে ওঠে—অলকা।

অস্থিরভাবে উঠে পড়ে নীতীশ, এসে বসে ক্লাবের রিডিং রুমে।

অন্য মেসের সঙ্গে এইটুকুই যা পার্থক্য গ্রীন ক্লাবের, তার আভিজাত্যও বলা যেতে পারে। যিনি এক সময়ে এর পরিকল্পনা করেছিলেন, মেজাজী লোক ছিলেন তিনি। দেওয়ালে গোটাকয়েক বিলিতী ল্যাণ্ডস্কেপ,—সূক্ষ্ম বসনাবৃতা কয়েকটি লাস্যময়ী মেমমূর্তি। ছবিগুলির ফ্রেমে সোনালি জল এখন কালো হয়ে গেছে। এককালে বোধ হয় কার্পেট ছিল মেঝেতে—ঘরের কোণায় ধুলোভরা একটা স্তূপ তার ধ্বংসাবশেষ।

রং-ওঠা গোটা কয়েক টেবিল আছে, আছে গোটা কয়েক গদি-ছেঁড়া সোফা। একটা টেবিলে স্টেকে তাস খেলা হয়, বাকিগুলোতে মাসিক দৈনিকের স্তূপ। কাচভাঙা আলমারীতে খানকতক দেশী বিসিতী বিবর্ণ উপন্যাস, 'বিলিতী গুপ্তকথা'র পাশে একখানা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও শোভা পাচ্ছে। জীবনরসিক থেকে ধর্মরসিক—সকলেরই রুচি রক্ষার সাধু আর সর্বজনীন প্রয়াস।

দুপুরবেলা এই ঘরে এসেই ঝিম মেরে পড়ে থাকে নীতীশ। ঘড়িটায় দুটোর সময় ঢং ঢং করে পাঁচটা বেজে যায়।

কী করবে সে কলকাতায়?

ল্যাণ্ডস্কেপ্‌গুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে এখানে কী তার কাজ, কোন্ ক্ষেত্রের মধ্যে সে নিজেকে উপযুক্ত ভাবে প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারে?

যোধপুরে ক্ষেত্র মেলেনি, খুঁজে পায়নি সে। বুঝেছে ভুল হচ্ছে। নতুন কাজ চাই। তাই কলকাতায় এসেছিল পুরোনো সহকর্মীদের সঙ্গে খানিক আলাপ-আলোচনা করে নিতে। কারা কারা এখানে আছে জানা নেই, ঠিকানাও জানে না কারুর। ভেবেছিল প্রকাশ খানিকটা সাহায্য করবে তাকে। কিন্তু যা নমুনা দেখা যাচ্ছে তা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। নিজেকে নিয়েই প্রকাশ এত বিব্রত হয়ে আছে যে ওসব ব্যাপারে মাথা গলাবার সময় পর্যন্ত নেই তার।

একা বসে বসে ভাবে—ভাবে ল্যাণ্ডস্কেপ্‌গুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

আবার কি ফিরে যাবে যোধপুরে? গ্রামে গিয়ে নতুন করে ওইখানেই তার নতুন কর্মক্ষেত্র গড়বার পরিকল্পনা নেবে একটা? অলকা যা বলেছিল—

না, অলকা নয়। ও তার দুর্বলতা। সাংঘাতিক আর মারাত্মক দুর্বলতা। এতদিনে ও সম্পর্কে সম্পূর্ণ আত্মদর্শন ঘটে গেছে নীতীশের। আগুনটাকে সময় থাকতেই নিবিয়ে রাখা ভালো, নইলে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে যে কোনো একটা দুর্বল মুহূর্তের সুযোগে।

এ আর ভালো লাগে না। অসহ্য লাগে একটা মালগাড়িতে চেপে বসবার মতো মেসের এই জীবন। কোনোকালে এ অভিজ্ঞতা নেই—সেইজন্যেই আরো দুঃসহ বোধ হয়।

কাজ চাই।

বাইরে স্তব্ধ দুপুর। আশুতোষ মুখুয্যে রোডের ওপর ট্রামের শান্ত ঘণ্টার শব্দ। একটা মাসিকপত্র পড়তে চেষ্টা করে, কিন্তু একটা বর্ণও বুঝতে পারে না তার। সব যেন এলোমেলো হয়ে গেছে।

—আরে, এখানে বসে তুমি!

নীতীশ চমকে উঠল। তাকিয়ে দেখে, গেঞ্জী গায়ে একটি চটি পরে প্রকাশ এসে উপস্থিত।

—কী ব্যাপার, অফিস থেকে এমন অসময়ে যে?

—ছুটি হয়ে গেল।—প্রকাশ পাশে এসে বসল ধীরেসুস্থে।

—কিসের ছুটি?

—ওই ম্যানেজিং এজেণ্টের নাতি না কে মরেছে, তারই মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে—তাচ্ছিল্যভরে কথাটা বললে প্রকাশ। স্বরে শোক ফুটে বেরুল না, বেরুল একটা আরামের অনুভূতি।

—আমি তোমাকে খুঁজছিলাম—প্রকাশ আস্তে আস্তে বললে।

—ব্যাপার কী?

—আজ হিমাংশু রাহার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—হিমাংশু রাহা?—নীতীশ চকিত হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই শ্যামনগর বম্ কেসের হিমাংশু। ছাট্ ধানী লঙ্কা।

এই নামেই হিমাংশু বন্ধুদের মধ্যে পরিচিত ছিল সে সময়ে। যেমন খাটো তেমনি রোগা। চোয়ালের হাড়গুলো অত উঁচু না হলে ওকে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দেওয়া যেত পনেরো-ষোল বছরের ছেলে বলে।

কিন্তু দেখতে শুনতে ছোট হলে কী হয়, একটা দুর্দান্ত লোক ছিল হিমাংশু। ভেতরে যেন টগবগ করে রক্ত ফুটত সব সময়ে। কথা বলত না, যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারত এক-একটা জলন্ত আগুনের টুকরো। জেলারের সঙ্গে সামান্য একটু বচসা হওয়ায় ঝাঁ করে সাতদিন টানা হাঙ্গার স্ট্রাইকই চালিয়ে গেল।

হিমাংশুকে ভয় করত না এমন ওয়ার্ডার ছিল না জেলে।

নীতীশের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: ধানী লঙ্কা? কী করছে সে?

—লঙ্কা দহনের তালে আছে।

—তার মানে?

—মানে ক্যাপিটালিস্টদের স্বর্ণলঙ্কা দহন করবে ঠিক করেছে—প্রকাশ ব্যঙ্গভরে হাসল। এই নতুন রাজনৈতিক থিয়োরীটা সে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেনি, এদের

সম্পর্কে বরং একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ রয়েছে তার।

—আর একটু স্পষ্ট করে বলো।

—মানে সোজা কথা। লেবার স্ট্রাইক—ওয়ার্কার্স অব্ দ্য ওয়ার্লড্ ইউনাইট্—কমিউনিস্ট্ ম্যানিফেস্টো!—যেন গদ্য কবিতার ধরনে কথাগুলোর প্যারডি করল প্রকাশ।

একটু চুপ করে থেকে নীতীশ বললে, ও ওই দলে ভিড়েছে বুঝি?

—ভিড়েছে মানে? ভিড়িয়ে বেড়াচ্ছে দলসুদ্ধ। ঘুরে বেড়াচ্ছে মেটেবুরুজ থেকে মানিকতলার বস্তি অবধি। ধানী লঙ্কা নয় আর—প্রকাশের ব্যঙ্গটা প্রায় গালাগালির রূপ নিলে: এখন ছিটকে ছিটকে বেড়াচ্ছে ছুঁচোবাজির মতো। বিপ্লবের আগুন জ্বালাবে বোধ হয়।

নীতীশ চুপ করে রইল।

প্রকাশ বলে চলল, আসবার সময় দেখা হল এসপ্লানেডের মোড়ে। কাঁধে একটা ব্যাগ নিয়ে ছুটছে হনহন করে। আমি বললাম তোমার কথা।

—চিনল?

—চিনল মানে? লাফিয়ে উঠল। বলেছে আসবে আজ সন্ধ্যায়।

—আজ আসবে?

—হ্যাঁ।—প্রকাশ হাসল: ভেবেছে বোধ হয় একটা নতুন রিক্রুট জুটল তার। আমার সঙ্গে তো বিস্তর চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে, এবার তোমার পালা।

নীতীশও মৃদু হাসল।

—কী, ভিড়ে যাবে নাকি ওই ফায়ার ব্র্যাণ্ডদের দলে?

—না, অতটা 'কমবাস্টিব্‌ল' এখনো হয়ে উঠিনি—শান্ত অন্যমনস্ক স্বরে জবাব দিলে নীতীশ। অলকাও একদিন এ ধরনের কয়েকটা কথা বলেছিল, কিন্তু সেদিন বশ মানেনি সে। আর অলকা যা পারেনি, হিমাংশুও তাই পারবে এ অসম্ভব।

—যাক, বাঁচালে। এই লাল-বিপ্লবীদের উৎপাতে প্রায় ঝালাপালা হয়ে উঠেছি—বিজ্ঞের মতো বললে প্রকাশ। রাজবন্দী প্রকাশ নয়, ব্যাঙ্কের কেরানী, নীল খামে বৌকে চিঠি লেখা প্রকাশ দত্ত।

—ধরো—সমস্ত আলোচনাটার ওপর ছেদ টেনে দিয়ে সে নীতীশের দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিলে। ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, ইন্ অ্যান্টিসিপেশন অব্ হিজ রেভোলিউশন, এই ফাঁকে আমরাও একটু আগ্নেয় হয়ে নিই।

৩

পাল সাহেবের বাড়িতে বেশিদিন আতিথ্য নিলেন না সুদাম। মোজাইকের মেজে থেকে শুরু করে এর বিচিত্র চেহারার সমস্ত ফার্নিচার, এর অপরিচিত আইন-কানুন, আর তারও চাইতে অপরিচিত মানুষগুলো ক্রমশ তাঁকে অতিষ্ঠ করে তুলল। কোনোমতে চোখকান বুজে তিনটি দিন কাটালেন, আধপেটা করে খেলেন টেবিল-ম্যানার্সের আইন-কানুনগুলো বাঁচিয়ে, তারপরেই স্থির করে ফেললেন, আর নয়—যথেষ্ট হয়েছে।

পাংশু মুখে অলকা বললে, তুমি চলে যাচ্ছ বাবা?

ইস্কুল-পালানো ছাত্র হঠাৎ মাস্টারের মুখোমুখি পড়ে গেলে যেমন চেহারা হয় তার, তেমনি অপরাধীর ভঙ্গীতে অপাঙ্গে তাকালেন সুদাম: হ্যাঁ মা, আমাকে যেতেই হচ্ছে এখান থেকে। খামারে ধান তোলা হচ্ছে এখন, নিজে দেখাশোনা না করলে সব পাচার করে দেবে লোকগুলো।

—আমি একা থাকব?—সভয়ে তাকালো অলকা।

বিপদের গুরুত্বটা সম্পর্কে সুদাম অচেতন নন। তিনটি দিনই যেখানে সুদামের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছে, সেখানে মাসের পর মাস কাটিয়ে যাওয়া অলকার পক্ষে যে কী নিষ্ঠুর পরীক্ষা, এ সত্যটাও বুঝতে বাকি নেই তাঁর। কিন্তু যেমন করে হোক আরো সাত-আটটা মাস এখানে কাটিয়ে ম্যাট্রিকুলেশনটা অন্তত দিতেই হবে তাকে। তারপর যা হওয়ার হবে। কিন্তু আপাতত উপায়ান্তর নেই আর।

তা ছাড়া এ অবস্থার জন্যে দায়ী তো অলকাই। ইস্কুল থেকে যখন তাকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, তখন অবশ্য ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন হেড্‌মিস্ট্রেস। দুঃখ করে বলেছিলেন, এত ভালো ছাত্রী, এখান থেকে পরীক্ষা দিলে নিশ্চয় জেনারেল স্কলারশিপ পেতো একটা, স্কুলের প্রেস্টিজ্‌ বাড়ত।

সুদাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তবে রাখতে চাইছেন না কেন?

হেড্‌মিস্ট্রেস বলেছিলেন, পুলিস রিপোর্ট। একটি আপত্তিকর মেয়ের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতার জন্যেই ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে। তা ছাড়া—হেড্‌মিস্ট্রেস গলা নামিয়ে বলেছিলেন, এ ট্রান্সফার সার্টিফিকেট বরং ভালোই হচ্ছে ওর পক্ষে। এখানে আর কিছুদিন থাকলে হয়তো পুলিসে ধরত, সমস্ত ফিউচারটাই নষ্ট হয়ে যেতো ওর—গলার স্বরে হিতৈষণার রেশ এনে বলে গিয়েছিলেন: কলকাতায় পড়ুক, বেশ সেফ্‌ থাকবে সেখানে। তবে একটা ব্যাপারে একটু নজর রাখবেন। বেশি পলিটিক্স-ফলিটিক্স না করে —বোঝেনই তো অবস্থা—

পারতপক্ষে মেয়েকে কিছু বলেন না সুদাম, কিন্তু খুব খানিকটা গালাগালি করেছিলেন

এযাত্রা। অলকা কিন্তু কোনো উত্তর দেয়নি। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে গুম হয়ে বসে ছিল শুধু।

শেষ পর্যন্ত সুদাম বলেছিলেন, তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু সেখানে যদি কোনোরকম গণ্ডগোল হয়, তাহলে তোমাকে আর আমি পড়াবো না—এ কথা পরিষ্কার জানিয়ে রাখলাম।

পাল সাহেবের বাড়িতে অলকার খানিকটা শাস্তি হবে এটা ঠিক, কিন্তু সুদামের মনে হচ্ছিল সেটা যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে একটু। হস্টেলে রাখবার কথা অলকা অবশ্য বলেছিল একবার, কিন্তু হস্টেলের ওপর বিন্দুমাত্র আর আস্থা নেই সুদামের। একবারের শিক্ষাই যথেষ্ট হয়েছে তাঁর পক্ষে। জগদীশের বাড়ি সম্পূর্ণ নিরাপদ আর নির্ভরযোগ্য সে দিক থেকে। এ বাড়ির আবহাওয়ায় আর যাই হোক, রাজনীতির মতো বিজাতীয় ব্যাপারের একেবারেই প্রবেশ নিষেধ।

তবু অলকা যখন জিজ্ঞাসা করল: আমি একা থাকব, তখন সুদাম যেন নিজেকে অপরাধী বোধ করলেন খানিকটা। টাকের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, না, না, একা কেন। এঁরা সবাই তো রইলেন—সবাই তো আপনার লোক।

আপনার লোক! তা বটে। বিষণ্ণ করুণ ভঙ্গিতে হাসল অলকা। কিন্তু সুদামও আর কথা বললেন না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, যাই, গোটাকতক জিনিসপত্র কিনে ফেলি গে।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি রওনা হয়ে যাওয়ার পরে অলকা একা এসে লনে বসল। পাল সাহেবের টাকা আছে, রুচিও আছে সেই সঙ্গে। হেনার কুঞ্জের নীচে যেখানে ইলেকট্রিকের ধারালো আলোটা সম্পূর্ণ এসে পড়েনি—জড়িয়ে রয়েছে খানিকটা আবছায়া অন্ধকার—ছড়িয়ে রয়েছে মহানন্দার ধারে সেই বহুদূরের যোধপুরের আমবাগানে ফিকে জ্যোৎস্না পড়বার মতো, সেইখানেই এসে বসল সে। মনটা যেন অদ্ভুতভাবে নিস্তেজ আর স্তিমিত হয়ে গেছে। কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই, প্রয়োজনের লেশমাত্র অবশেষ বেঁচে নেই কোথাও। যেন দীর্ঘদিনের মতো একটা নির্বাসন দণ্ড জুটেছে তার—নিজেকে একটা প্রতিকারহীন অনিবার্যতার হাতে ছেড়ে দিয়ে তাকে প্রহরের পর প্রহর গুনে চলতে হবে।

ওদিকের গাড়িবারান্দায় সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনখানা মোটর—তাদের উজ্জ্বল মসৃণ শরীর চকচক করছে বিদ্যুতের আলোয়; পাল সাহেবের দামী দামী মক্কেল। বসবার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে খানিকটা দুর্বোধ্য আর উত্তেজিত আলোচনা। ডিস্‌কাশন চলছে ল-পয়েণ্টের। দোতলার কোণার ঘরটায় যেখানে সবুজ রঙের আলো জ্বলছে, ওখানে মিসেস্ পাল চা খাচ্ছেন তাঁরই মতো পদমর্যাদাসম্পন্ন কয়েকটি বান্ধবীর সঙ্গে। নীচের তলায় একখানি ঘরে পাল সাহেবের ছোট ছোট তিনটি ছেলেমেয়ে পড়ছে

প্রাইভেট টিউটারের কাছে।

এ বাড়িতে তার সঙ্গী নেই কেউ। সস্ত্রীক পাল সাহেব তাকে খানিকটা সস্নেহ প্রীতির চোখে দেখেন, ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে সহজ লৌকিক সম্পর্কের অতিরিক্ত কিছুই নেই। একদিক থেকে এই ভালো। এই অপরিচিত আবহাওয়া, একেবারে অনভ্যস্ত জীবনযাত্রা, এর মাঝখানে কেউ যদি তার সম্বন্ধে অতিরিক্ত মনোযোগ দিত, তা হলেই দুঃসহ হয়ে উঠত সেটা। এত বড় বাড়ির এইটেই সুবিধে, নিজের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার সুযোগ মেলে খানিকটা।

কিন্তু মনোযোগ কেউ দেয় না এ কথা বললে ভুল করা হবে। একজন তার সম্বন্ধে কিছুটা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। সেই প্রথম দিনের লোকটি। সৌখিন মানুষ, পরনে পায়জামা, মুখে সিগারেট আর সেই সঙ্গে চকচকে একখানা দামী মোটর। সমর ঘোষ।

এর মধ্যেই নানাভাবে বারকতক আলাপ জমাতে চেষ্টা করেছে সমর। কাল বিকেলেই এসেছিল। একেবারে বিনা নোটিশে এসে ঢুকল অন্ধকার ঘরে।

—এমন চুপচাপ বসে যে মিস্ ঘোষ?

—এমনিই।

—গ্লাম্—এ?—ককনি টানে সমর বললে, ইট্‌স সো ব্যাড্! চলুন, বেড়িয়ে আসা যাক।

—নাঃ, থাক।

—বাঃ, থাকবে কেন। কী চমৎকার বিকেল। দ্য আওয়ার ফর দ্য বেস্ট্ ড্রাইভ। চলুন, লম্বা একটা রাইড্ দেওয়া যাক।

—মাপ করবেন, ভালো লাগছে না।

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেল সমর, কিন্তু সহজে যে হাল ছেড়ে দেবে, সে জাতের ছেলেই নয় সে। এন্‌ডিয়োরেন্স। স্লো অ্যাণ্ড্ স্টেডি উইন্‌স দ্য রেস্। তা ছাড়া একেবারে গ্রাম্য মেয়ে, যতটা অনিচ্ছা, তার চাইতে ঢের বেশি তার সংকোচ। সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে সিদ্ধান্তটাকে নিশ্চিত করে নিতে চাইল সমর।

অলকা নতমুখে একটা বইয়ের পাতা উল্টে চলেছে, কী করবে না করবে ভাবতে ভাবতে সমর তার সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল অলকা, বিরক্তিতে ভরে উঠল মন। আচ্ছা লোক! একেবারে আঠার মতো লেপটে ধরতে চায়, সহজে নড়বার পাত্রই নয় যেন।

কী ভাবে কথা আরম্ভ করবে কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলে সমর। তারপর জানালা দিয়ে সিগারেটটাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, এক্‌সকিউজ্ মি, গান গাইতে জানেন আপনি?

শুষ্কস্বরে অলকা বললে, না।

—গান জানেন না? এনি ইন্‌স্ট্রুমেণ্টাল মিউজিক?

—না, তাও নয়।

—আই অ্যাম সো সরি—সত্যি সত্যিই অত্যন্ত দুঃখিত মনে হল সমরকে। কপালের ওপর নেমে আসা একরাশ কোঁকড়া চুলকে সযত্নে আঙুল দিয়ে সরাতে সরাতে বললে, আমি অবশ্য কিছু কিছু ইনস্ট্রুমেণ্টালের চর্চা করি।

—ও:।

উৎসাহিত ভাবে সমর বললে, ভায়োলিন। ভালো নয়?

—হুঁ—বইয়ের পাতায় দৃষ্টি রেখেই নিরাসক্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলে অলকা।

কিন্তু সমর এমন ধাতের মানুষ যে এসব গ্রাহ্য করে না। তা ছাড়া আর একটা বিশেষত্বও তার আছে। নিজের ঝোঁকে যখন সে কথা শুরু করে, তখন দম না ফুরোনো পর্যন্ত সেটা চলতে থাকে একটানা। অনেকটা একশো মিটার দৌড়ের মতো। পথ ফুরিয়ে গেলেও দমের ঝোঁকে আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তবেই সে থেমে দাঁড়ায়।

একটা চোখ বুজে আত্মবিস্মৃতের মতো সমর বলে চলল, হ্যাঁ, বাজনা যদি বলেন তা হলে তা ভায়োলিন। যেমন মিউজিক্যাল, তেমনি রোম্যাণ্টিক। একেবারে স্বপ্ন এনে দেয়। সাউথ-সী থেকে শুরু করে এনে ফেলে প্রেইরি পর্যন্ত, এভারগ্রীন্ ফরেস্ট্ থেকে একেবারে অরোরা বোরিয়ালিস। তা ছাড়া এমন করে মানুষের মনের আকুতি আর কিছুতেই প্রকাশ করতে পারে না। ভায়োলিন ইজ্ দ্য ওন্‌লি ইনস্ট্রুমেণ্ট দ্যাট ক্যান ডিপ্‌লি এক্সপ্রেস্ দ্য ইটার্নাল ওয়েলিং অব্ হিউম্যান হার্ট। মানে মানবহৃদয়ের চিরন্তন কান্না একমাত্র এরই সুরে ধরা পড়তে পারে।

সমরের কথার স্রোতে যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে অলকার। গভীর মনোযোগ দিয়ে সে পত্রিকাটার পাতায় একটা টিন্‌ড হেরিংয়ের বিজ্ঞাপন পড়তে লাগল।

সমর বললে, একদিন নিয়ে আসব আমার ভায়োলিন। বাজনা শোনাবো আপনাকে।

—বেশ।

এরপরে আর কথা চলে না, কিন্তু কথা তো থামাতে চায় না সমর। বড় ভালো লাগছে এই মেয়েটিকে, ভালো লাগছে গ্রাম্যতার সুরভি জড়ানো এই শুচিস্মিত শান্ত ভঙ্গিটা। শহরের রঙীন মেয়েদের সমর চেনে, কিন্তু এই মেয়েটি তার কাছে অনেকটাই বিস্ময়। তাই স্পষ্ট করে এই মেয়েটিকে জেনে নিতে চায় সে, চায় একান্ত করে চিনে নিতে।

—ওয়েস্টার্ন মেলডি ভালো লাগে আপনার?—সমর আবার জানতে চাইল।

—ওয়েস্টার্ন মেলডি? মানে বিলিতী গান? ইচ্ছের বিরুদ্ধেও মৃদু হেসে ফেলল অলকা।

রেডিওর কল্যাণে বিলিতী গান শোনবার দুর্ভাগ্য তার হয়েছে অনেকবার। বাজনা-গুলো তবু ভালো, কেমন একটা গম্ভীর রেশ আছে তার, গভীর রাত্রে জেমস্ সাহেবের কুঠি থেকে বিলিতী রেকর্ডের বাজনা শুনে মাঝে মাঝে কেন যেন তার গা ছমছমিয়ে উঠেছে। যেন ওই গানের মধ্য দিয়ে শুনেছে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙবার গর্জন—ঝোড়ো আকাশের সংকেত। কিন্তু গান! হুলো বেড়ালের ঝগড়ার সঙ্গেই তার একমাত্র মিল খুঁজে পায় অলকা।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সমরের কথার কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু যেন ভগবান বাঁচালেন। একটা চাকর এসে সমরকে খবর দিলে, মেমসাহেব ডাকছেন।

ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠে দাঁড়ালো সমর। বললে, আচ্ছা, এখন আসি তা হলে। পরে আপনার সঙ্গে ভালো করে আলাপ করা যাবে আবার।

বসে বসে অলকা ভাবছিল সমরের এই গায়ে-পড়া ধরনটার কথাই। রাত বাড়ছে, সামনে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে ভাঁটার টান ধরেছে গাড়ির স্রোতে। পাল সাহেবের বাগান থেকে আসছে ফুলের গন্ধ।

নীতীশ—নীতুদা! এই কলকাতাতেই আছে—কিন্তু কোথায়? মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে বিশেষ একখণ্ড প্রবাল খোঁজবার মতোই তাকে পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্যতার কাছাকাছি। হঠাৎ যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল অলকার, হঠাৎ যেন মনে হল বাতাসটা থেমে দাঁড়িয়ে গেছে। এখন যদি একঝলক হাওয়া আসত—হাওয়া আসত অন্ধকার আম-বাগানের ঘুমন্ত পাতায় পাতায় দোলা দিয়ে—যদি আসত মরা মহানন্দার জলের গন্ধ বয়ে রাত্রির দীর্ঘশ্বাসের মতো?

*　　*　　*　　*

প্রকাশের সেই গ্রীন ক্লাবে যথাসময়ে হিমাংশু এসে হাজির। সেই ধানী লঙ্কা। বেশি অদলবদল হয়নি চেহারায়। সেই বেঁটেখাটো রোগা মানুষটি, চেহারা দেখে বয়েস অনুমান করা যায় না। মুখে যেন কথার তুবড়ী ফুটছে।

এসেই কাঁধে প্রচণ্ড একটা থাবড়া দিয়ে বললে, কী করছ?

নীতীশ মৃদুভাবে হাসল: কাজ খুঁজছি।

হিমাংশু তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ: চাকরি?

—আছে তোমার খোঁজে?

হিমাংশু হেসে উঠল: হ্যাঁ, বিনে মাইনে, আপখোরাকী। কাঁধে একটা রেশনের থলি নিয়ে টালা থেকে টালীগঞ্জ। কি হে প্রকাশ, বলোনি ওকে আমার চাকরির কথা?

প্রকাশ মুখ বিকৃত করে বললে, বলেছি বই কি। তা তুমি বুঝি ওকে সে চাকরিতে ভিড়িয়ে দিতে চাইছ!

—হ্যাঁ, তোমার সহযোগিতা থাকলে।

—মাপ করো ভাই, তোমাদের ও রেড্-সার্ভিস আমার বরদাস্ত হয় না।—প্রকাশ হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো : আচ্ছা, তোমরা বোসো। আমি বাইরে যাচ্ছি, একটু কাজ আছে।

প্রকাশ বেরিয়ে গেলে খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইল হিমাংশু। পকেট থেকে আধপোড়া একটা চুরুট বের করে অগ্নিসংযোগ করল তাতে।

—আমাকে আজকাল ভয় করে প্রকাশ, জানো?—সহাস্যে মন্তব্য করল হিমাংশু।

—কেন, তোমাকে ভয় কেন?

—খুব স্বাভাবিক নিয়মে। ডি পোলিটিক্যালাইজ্ড হয়ে গেলে যা হয়।

—কিন্তু রাজনীতিতে ওর তো এখনো যথেষ্ট উৎসাহ দেখতে পাই।

—কী জাতীয় সেটা?—চুরুটটা নিবে গিয়েছিল, আর একবার তাতে দেশলাই জ্বেলে বাঁকা চোখে চিবিয়ে চিবিয়ে জিজ্ঞাসা করল হিমাংশু : কী রকম রাজনীতি?

—রোজ সকালে খবরের কাগজ নিয়ে—

হিমাংশু এবার সজোর কণ্ঠে হেসে উঠল : হ্যাঁ, ওই পর্যন্তই। খবরের কাগজের সিদ্ধান্ত পর্যন্তই সীমানা। আর সে রাজনৈতিক দৃষ্টি সুবিধাবাদীর, যথাসাধ্য সংগ্রামকে এড়িয়ে চলার।

—সংগ্রামকে এড়িয়ে চলা?

—নিশ্চয়।—হিমাংশু সজোরে সামনের টেবিলটায় একটা কিল মারল : নইলে একটা লোক, অত বড় স্যাক্রিফাইসের ট্র্যাডিশন যার—এমন করে ঝিমিয়ে পড়তে পারে সে, মরে যায় এমন করে! আজ শুধু নীল খামে বৌকে চিঠি লেখা আর যত্রতত্র বউয়ের গল্প করে বেড়ানো—এই ওর পরিণতি!

কথাটায় নীতীশও খানিকটা একমত, তাই জবাব দিলে না।

হিমাংশু বললে, একদিন আলোচনা করো ওর সঙ্গে। দেখবে কী পুয়োর আইডিয়া, কী হোপ্‌লেস মূর্খতা। একসময় ইমোশন নিয়ে রাজনীতিতে নেমেছিল, সেদিন রক্ত দেবার রোমান্স ছিল একটা। কিন্তু জেল খেটে আর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের সেই রোমান্টিকতার অপমৃত্যু হয়েছে। আজ ও ক্লান্ত, লুকিয়ে পড়তে চায়, চায় ছায়ার নীচে বসে থাকতে।

—বেশ তো, তাই থাকতে দাও না।

—তাতে আপত্তি ছিল না।—চুরুটটা নিবে গিয়েছিল, বার-দুই বৃথা টান দিয়ে হিমাংশু সেটাকে জানালা গলিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলে : যদিও নন্‌পোলিটিক্যাল্ লোক মাত্রেই ক্ষতিজনক, তবু পেছনের দিনগুলোকে সম্মান জানিয়ে ওদের আমরা পেনশন দিতে রাজী ছিলাম। কিন্তু মুশকিল কী দাঁড়িয়েছে জানো? এরা কাজ করবে না, পথও ছাড়বে না!

—কি রকম ?

—ভ্যানিটি। এককালে ঘি খেয়েছিল বলে আজও তার গন্ধ শোঁকাতে চায় সকলকে। অহমিকা আছে, অথচ নেই কাজের আগ্রহ, নেই জীবনকে নতুন করে জানবার, বোঝবার চেষ্টা। তাই নিজেরা পিছিয়ে আছে বলে সেই কম্‌প্লেক্সে অগ্রগামী-দের পদে পদে এরা মূঢ় সমালোচনা করে, বাধা দিতে চায়।

নীতীশ নীরবে শুনে যেতে লাগল।

তীক্ষ্ণতায় হিমাংশুর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগল : সব চাইতে ট্র্যাজেডী কী জানো ? এক সময়ে যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় কর্মী ছিলেন, যাঁদের ত্যাগ আর দুঃখভোগের তুলনা ছিল না, আজ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে তাঁদেরই একদল দেশের সব চাইতে বিপজ্জনক শত্রু হয়ে উঠেছেন।

—তুমি কি বলতে চাও, দেশের জন্যে একদিন যাঁরা সর্বস্ব পণ করেছিলেন, আজ তাঁরাই ইচ্ছে করে দেশের বিরোধিতা করছেন ?

—কথাটা নগ্ন করে বললে ওই রকমই রূঢ় শোনাবে বটে। এরা নিজেরাও সব সময়ে বোঝে না, ব্যক্তিত্বকে চরিতার্থ করবার মোহে কত বড় সর্বনাশ করে চলেছে সমস্ত দেশের। চামড়া বাঁচিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে বড় বড় বুলি কপচায় একদিকে, অন্যদিকে সুবিধা-বাদের সুযোগ নিতে গিয়ে হয়ে ওঠে প্রতিক্রিয়াশীল।

নীতীশ বললে, ঠিক মানতে পারলাম না।

—সেটা তোমার খুশি। সূর্য ডুবলে সন্ধ্যা হয় এটা যদি না মানো, তবে এও মেনো না। যাক সে কথা। কিন্তু সত্যিই, কী করতে চাও তুমি ?

—বললাম তো, কাজ করতে চাই।

—কিছু আরম্ভ করেছিলে ?

নীতীশ বিষণ্ণভাবে হাসল : চেষ্টা করেছিলাম, হল না।

—ওঃ !—হিমাংশু কিছুক্ষণ মিটমিটে চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে : আসবে আমাদের সঙ্গে ? কাজ যদি করতে চাও তা হলে এনাফ্ স্কোপ—এনাফ্ ফিল্ড।

—কিন্তু তোমাদের সঙ্গে তো আমার মত মেলে না।—আস্তে আস্তে নীতীশ জবাব দিলে।

—কী করে জানলে ?—হিমাংশু হাসল : আমাদের লিটারেচার পড়েছ কিছু ?

—বিশেষ নয়।

—না পড়েই রায় দিয়ে দিলে ?

—তোমাদের সঙ্গে গোড়াতেই আমার মতভেদ।

শিশুর কথায় যেমন করে লোকে হাসে, তেমনি সস্নেহ আর প্রশান্ত ভাবে হাসল

হিমাংশু : লক্ষ্যটা যদি ঠিক থাকে, মতও ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া তুমি কর্মী মানুষ, ফসিল হয়ে থাকবে কেন ? একটা কিছু তো তোমাকে বেছে নিতে হবেই।

—তা হবে।—চিন্তিতভাবে নীতীশ বললে, সেই জন্যে তো আসা।

—বেশ, তা হলে এসো, একদিন তোমাকে আমাদের কাজের নমুনা দেখাই। আপত্তি আছে তাতে ? সংস্কারে বাধবে না তো কোনোরকম ?

নীতীশ হাসল : না, অতটা গোঁড়ামি নেই আমার।

—তা হলে আসছে রবিবার যদি আমার সঙ্গে বেরোও—

—বেশ, যাব।

—কিন্তু রবিবার ?—হিমাংশু হঠাৎ চিন্তিতভাবে মাথা নাড়ল : নাঃ থাক, রবিবার নয়। আর একদিন হবে বরং।

—কেন, অসুবিধে কিসের ?

—অসুবিধে ? তা একটু আছে। রবিবারের কাজটা খুব মুখরোচক নয়, কিছু রিস্‌ক্‌ আছে।

—রিস্‌ক্‌ ? কী রিস্‌ক্‌ ?

হিমাংশু কয়েক মুহূর্ত পরীক্ষকের দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল : গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে। লাঠি আর ছোরা দিয়ে গুণ্ডার ব্যবস্থাও হয়েছে শুনেছি।

নীতীশের রক্ত হঠাৎ দপ করে উঠল : তা হলে তো ওইটেই যাওয়ার দিন।

—ভয় পাবে না ?

নীতীশের চোখে আগুনের কণা ঠিকরে বেরুল : তোমাদের সঙ্গে মত না মিলতে পারে, তাই বলে আর সবাই কাপুরুষ হয়ে গেছে এ ধারণা কী করে হল তোমাদের ?

—দ্যাট্‌স ইট কমরেড্‌—হিমাংশু হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিলে নীতীশের দিকে। ওর হাতে মস্ত একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, তা হলে কথা ঠিক রইল। রবিবার দিন কাঁটায় কাঁটায় বিকেল পাঁচটায় আমি আসব। রেডি থাকবে তো ?

—থাকব।

৪

খোল বাজছে, করতাল বাজছে, ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে চারদিক। আর সব কিছু ছাপিয়ে উঠছে কীর্তনের সমুচ্চ কলরব :

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু

পেখনু পিয়ামুখ চন্দা,

জীবন যৌবন সফল করি মানমু
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা।

সত্যিই, অন্যান্য দিনের মতো বহু সৌভাগ্যের রাত্রি প্রভাত হয়েছে আজও। সামনে রূপোবসানো চন্দন কাঠের সিংহাসনে যুগলমূর্তি। পঞ্চপ্রদীপের আলো পড়ে রাধাকৃষ্ণের চোখমুখ থেকে ঠিকরে পড়ছে স্বর্গীয় আর অলৌকিক দীপ্তি; সমস্ত ঘরে শুচিতা আর দৈবী মহিমার একটা অলক্ষ্য প্রভাব পড়েছে বিকীর্ণ হয়ে।

প্রেম-বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের নিত্য রাস। শাশ্বত আনন্দের প্রকাশ ওই যুগলমূর্তি।

ওই যুগলরূপের দিকে তাকিয়ে যেন কেমন লাগে; কেমন যেন নেশা ধরে—ঘুমের মতো কী একটা মাদক প্রভাব ছড়াতে থাকে চেতনার ওপরে। ওই ধূপের ধোঁয়ায়, ওই আলোতে সমস্ত বোধটা যেন মিলিয়ে যেতে থাকে, নিজের ব্যক্তিসত্তাটা হারিয়ে যায় ক্রমশ সূক্ষ্ম হয়ে, বিন্দু থেকে বিন্দুতমর মধ্যে—যেন নিজেকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না, যেন "সাযুজ্য মুক্তির" আস্বাদ আসে; মনে হয় সামনে শ্যামরূপের তরল প্রবাহ হয়ে বয়ে যাচ্ছে অনাদিকালের বিরহবাহিনী নীল-যমুনা—ওই কালো কালিন্দীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ব্রজগোপিনীর চির-আকাঙ্ক্ষিত আত্মসমর্পণ। কখনো কখনো মল্লিকার মনে হয় সেও বুঝি রাজরাণী মীরার মতো একদিন নিঃশেষে ওই যুগল শ্রীরূপের মধ্যে লীন হয়ে যাবে।

কীর্তনের সুর উঠেছে :

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা,
আজু বিধি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা।—

সত্যিই কি বিধি অনুকূল হয়েছেন আজ? আজ কি এসেছে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদনের পালা? নিজের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সব কিছু ভার—সব কিছু বোঝা নামিয়ে দেবার বহুপ্রার্থিত লগ্ন? কোনো সন্দেহ নেই আর, অবশিষ্ট নেই অণুমাত্রও সংশয়?

কেমন যেন মনে হচ্ছে নিজেকে বইতে বইতে অসহ্য ক্লান্ত হয়ে গেছে মল্লিকা। কী যে চায় সে জানে না—কী পেলে সে খুশি হবে তাও বুঝতে পারছে না। সাযুজ্য মুক্তি? হয়তো তাই। কিন্তু তাই কি?

মনের মধ্যে কোথায় একটা দোটানা চলছে। বারো বছরের শান্ত সমুদ্রে হঠাৎ একটা জলস্তম্ভ উঠেছে ফেনিয়ে, তারপর ভেঙে পড়েছে প্রবল একটা গর্জনের শব্দে। তার ফেনা, তার দোলা—এখনো শিউরে শিউরে, কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ওঠা-পড়ায়; রক্তের প্রবাহে প্রবাহে।

নীতীশ ?

না।

মল্লিকা হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে চোখ দুটো সম্পূর্ণ করে মেলে দিয়ে তাকালো। কীর্তন থেমে গেছে, ভক্তেরা সকলে প্রণাম করছেন সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে।

প্রধান বৈষ্ণব—আসরের নামকরা কীর্তনিয়া মোহান্ত প্রভু বিষ্ণুচৈতন্য হঠাৎ স্নিগ্ধদৃষ্টি মেলে তাকালেন মল্লিকার দিকে। একটা কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছেন কোথাও।

—আমার শ্রীমতী মাকে আজ এরকম দেখছি কেন ?

শ্রীমতী মা! এই নামেই মল্লিকাকে সম্ভাষণ করেন বৈষ্ণবেরা।

মল্লিকা ম্লানমুখে জবাব দিলে, কিছু না।

—কিছু না ? কথাটা কি ঠিক ?—বিষ্ণুচৈতন্য প্রশান্ত ভাবে হাসলেন আবার।

হঠাৎ বিরক্ত ভাবে মল্লিকা বলে ফেলল, একবার তো বলেইছি, তবু এক কথা বারবার জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

বজ্র পড়ল।

সমস্ত বৈষ্ণব মোহান্তেরা স্তব্ধ-চকিত দৃষ্টিতে তাকালেন এদিকে। গোস্বামী বিষ্ণু-চৈতন্যের মুখের ওপর এমন বিরক্ত কটুকণ্ঠে কেউ জবাব দিতে পারে, এ কারুর কল্পনাতেও ছিল না। আরো বিশেষ করে শ্রীমতী মা—ভক্তিতে, নিষ্ঠায় যার তুলনা নেই!

বিষ্ণুচৈতন্যের মুখ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল মুহূর্তে, তবু নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। জোর করে একটুখানি হাসি টেনে এনে বললেন, না, না, কিছু মনে কোরো না, এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

যতীশ এতক্ষণ একটা কথাও বলতে পারেনি। প্রথমে মনে হয়েছিল তিনি বোধ হয় ভুল শুনছেন। কয়েক মুহূর্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকবার পরে গোস্বামী বিষ্ণুচৈতন্যের কথায় যেন চমক ভাঙল তাঁর।

বজ্রকণ্ঠে যতীশ ডাকলেন: বৌমা ?

মল্লিকা কোনো উত্তর দিলে না, উঠে চলে গেল ঘরের মধ্যে। কিছুক্ষণ বৈষ্ণবেরা বসে রইলেন বিমূঢ়ের মতো। তারপরে স্তব্ধতা ভাঙলেন গোস্বামী বিষ্ণুচৈতন্যই।

মৃদু হেসে বললেন, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু। বিচিত্র এই সংসারের লীলা, কত সামান্য কারণেই যে মানুষের মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে!

যতীশ এগিয়ে এলেন। বিষ্ণুচৈতন্যের পায়ে হাত রেখে বললেন, প্রভু ক্ষমা করুন।

বিষ্ণুচৈতন্য জিভ কেটে হাতটা সরিয়ে দিলেন পা থেকে। বললেন, নারায়ণ, নারায়ণ, ছেলেমানুষের কথা ধরতে নেই।—তারপর অবস্থাটা সহজ করে নিয়ে চারদিকে তাকিয়ে বললেন, কি হে, সব চুপচাপ যে ? নাও ধরো।

বসে, তিনি নিজেই আরম্ভ করলেন :

কী কহব রে সখি, আনন্দ ওর,
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল,
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল—

কিন্তু মহারাদের অমন আনন্দঘন পদাবলীও যতীশের মনে কোন সাড়া জাগাল না, জাগাল না কোনও ভাবমুগ্ধ ব্যাকুলতা। যে পথ দিয়ে মল্লিকা চলে গেছে, তিনি সেই দিকেই তাকিয়ে রইলেন একান্ত অবৈষ্ণবোচিত অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে।

সমস্ত দিন বাড়িটা থমথম করতে লাগল। ঘন আর জমাট হয়ে রইল বাতাস। যেন ঝড়ের আকাশের সংকেতময়তা।

যেমন প্রত্যেক দিন করে, তেমনি ভাবেই নিঃশব্দে প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ নিখুঁত আর নিপুণ হাতে করে গেল মল্লিকা। বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা, দেবতার ভোগরাগ, বৈকালী, আরতি; শয়ন—সব কিছু করে গেল নিঃশব্দে নিষ্ঠার সঙ্গে। যতীশের সেবাযত্নেও বিন্দুমাত্র ত্রুটি রইল না কোনোখানে।

সব ঠিক আছে, অথচ সব কিছুই বেসুরো বাজতে শুরু হয়েছে। যতীশ ঘোষ গুম হয়ে রইলেন আর জ্বলে যেতে লাগলেন মনের মধ্যে একটা শ্বাপদ জিঘাংসায়। তিল তিল করে যাকে তিনি গড়ে তুলেছেন এই বারো বছর ধরে, দিনের পর দিন যার মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন কৃষ্ণৈকপ্রাণা দেবদাসীকে, আজ স্পষ্ট বিদ্রোহ করছে সে। শুধু বিদ্রোহই করেনি—অমর্যাদা করেছে যতীশের, এতগুলি মাননীয় বৈষ্ণবের সামনে তাঁর উঁচু মাথাটাকে লুটিয়ে দিয়েছে মাটিতে।

কে এর জন্যে দায়ী তিনি জানেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন কোথা থেকে কোন্ অবাঞ্ছিত উপদ্রব এসে ফাটল ধরিয়েছে তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তিতে। নীতীশ যেদিন থেকে তাঁকে ভালো করে কোনো কিছু না বলেই কলকাতায় চলে গেল, সেদিন বিরক্তি বোধ করলেও তার সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাসও পড়েছিল তাঁর, ধর্মবোধহীন ছেলের স্লেচ্ছাচার তাঁকে পীড়ন করছিল, মনে হয়েছিল দেবমন্দিরে একটা অস্পৃশ্য জীব প্রবেশ করেছে এসে।

শুধু তাই নয়। কোনোমতেই যেন ছেলেকে তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। প্রতি পদে পদে অস্বস্তির কাঁটা বিঁধছিল তাঁকে—মনে হচ্ছিল, একেবারেই মিশছে না—মিলছে না—সব কিছু এলোমলো হয়ে যাচ্ছে। আর মল্লিকা? তারও ব্রত ভ্রষ্ট হচ্ছিল, সেও—

তাই নীতীশ চলে যাওয়াতে এক দিক থেকে একটা মানসিক মুক্তিই যেন বোধ

করছিলেন তিনি। নিজের কাছে প্রবঞ্চনা করে লাভ নেই—মনে মনে খুশিও হয়েছিলেন খানিকটা। কিন্তু এই মুহূর্তে যতীশ বুঝলেন, কিছুই ঠিক হয়নি। নীতীশ চলে গেলেও রেখে গেছে তার বিষাক্ত বীজ, আর সেই বীজে যথানিয়মে মাথা তুলে উঠেছে একটা অনিবার্য অঙ্কুর।

সমস্ত শরীর যেন অসহ্য একটা জ্বালায় জ্বলে গেল, অকারণ হিংসায়, অর্থহীন মনো-যন্ত্রণায় ইচ্ছে করল, এই মুহূর্তে তাঁর বিষয়সম্পত্তি বৃন্দাবনে গুরুর আশ্রমে দান করে দেন, ত্যাজ্যপুত্র করেন ছেলেকে।

রাত হয়েছে অনেক। ঘুমিয়ে গেছে সমস্ত গ্রাম। নিজের ঘরে বসে কুঁড়োজালিতে ভগবানের নাম জপ করতে করতে কখন যে এই সমস্ত অবান্তর ভাবনা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল তিনি জানেন না। অসীম বিরক্তিভরে হাতের মালা ঝুলিয়ে রেখে উঠে পড়লেন যতীশ, খড়মের ঠকঠক শব্দ তুলে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়।

একটু হাওয়া নেই কোথাও। হয়তো ঝড়বৃষ্টি হবে, তারই সূচনায় থেমে গেছে বাতাস, বাড়ির চারদিকে আমবাগানে ঘন কালো জমাট অন্ধকার একটুও কাঁপছে না। শুধু ওদিকে একটা ঝুপসী গাছে কী একটা লাফ দিয়ে পড়ল হঠাৎ—গাছটা মস্ত ঝাঁকুনি খেল—শব্দ করে ডেকে উঠল আচমকা ঘুমভাঙা দু'তিনটে পাখি। বানর নিশ্চয়।

যতীশ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আকাশে তারা দেখা যায় না—মেঘ জমেছে খানিকটা। দূরে মহানন্দা দিয়ে নৌকো চলে গেল একখানা, দাঁড় আর জলের শব্দ খানিক-ক্ষণ ধরে ভরে রইল রাত্রির বুক। চারদিক থেকে ঝিঁঝিঁর একটানা স্বর বেজে উঠছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন, কী ভাবছিলেন খেয়াল নেই। অন্যমনস্ক ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ঠাকুরঘরের দিকে—কপাটের জোড়ের ফাঁক দিয়ে ভেতরের প্রদীপের একটা সরু আলোর রেখা এসে পড়েছে বাইরে। শয়নআরতির মৃদু ধূপের গন্ধ যেন সঞ্চারিত হয়ে আছে এখনো।

খুট করে একটা শব্দ হল। চমকে উঠলেন।

মল্লিকার ঘরের দরজা খুলে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসেছে মল্লিকা; তাঁরই মতো নিঃশব্দ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে। তাঁকে এখনও দেখতে পায়নি।

যতীশের কপালের একটা শিরা দপ দপ করে উঠল, চঞ্চল হয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। উত্তেজনার বিদ্যুৎ বয়ে গেল শরীরে। যে কথাগুলো সারাটা দিন মনের মধ্যে খানিক তপ্ত বাষ্পের মতো আবর্তিত হয়ে ফিরেছে অথচ আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়নি, তারা যেন অকস্মাৎ বিদীর্ণ হয়ে পড়বার উপক্রম করল।

কিছুক্ষণ একটা অদ্ভুত সংশয়ে দোল খেতে লাগল যতীশের মন, ঝিঁঝিঁর তীব্র শব্দের সঙ্গে দুর্বোধ্য একটা কোলাহলে যেন হারিয়ে যেতে লাগল সমস্ত ভাবনাগুলো:

তার পরেই নিজেকে দৃঢ় করে নিলেন তিনি, প্রতিষ্ঠা করে নিলেন একটা নিশ্চিত প্রত্যয়ের মধ্যে। হ্যাঁ—এই সুযোগ। এমন সুযোগ আর আসবে না।

যতীশ গলা-খাঁকারি দিলেন।

সীমাহীন স্তব্ধতায় শব্দটা এমন বিসদৃশ আর বিকট শোনালো যে যতীশ নিজেই চমকে উঠলেন আর ঘর থেকে পড়া লণ্ঠনের আলোয় তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন থরথর করে কেঁপে উঠল মল্লিকা। একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল তার মুখ দিয়ে।

যতীশ বললেন, বৌমা, আমি।

মল্লিকা উত্তর দিলে না, দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে।

যতীশ আর একবার গলা-খাঁকারি দিলেন, যেন নিজের বিব্রত আর অস্বস্তিকর অবস্থাটাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যেই; তারপর বললেন, ঘুমোওনি এখনও?

মল্লিকা সংক্ষেপে জবাব দিলে, না।

—ওঃ।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতায় কেটে গেল।

মল্লিকা একটু উসখুস করে হয়তো নিজের ঘরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল, যতীশ ডাকলেন, বৌমা?

—বলুন।

—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

সারাদিন যে ভয়ঙ্কর দুর্যোগ-মুহূর্তের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল মল্লিকা, এইবারে বোধ হয় ভেঙে পড়ল সেটা। পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে, চকিতের জন্যে মনে হল তার পায়ের নীচে দোলা খেয়ে উঠেছে মাটিটা। যতীশ আবার বললেন, কথা আছে তোমার সঙ্গে।

—বলুন—নিষ্প্রাণ গলায় মল্লিকা জবাব দিলে।

—এখানে নয়, আমার ঘরে এসো।

মল্লিকা নড়ল না, তেমনই দাঁড়িয়ে রইল পাষাণ হয়ে।

—কী, আমার ঘরে আসতে আপত্তি আছে নাকি তোমার?—যতীশের কণ্ঠস্বরে উত্তাপ ফুটে বেরুল।

—চলুন—পুতুলের মতোই উত্তর এল এবার।

আজ যেন সব অন্যরকম হয়ে গেছে। অন্যদিন দ্বিধা ছিল না কোথাও, সংকোচ ছিল না কোনোখানে। এই ঘরে কত বেশি রাত পর্যন্ত জেগে যতীশের পদসেবা করেছে সে, পড়ে শুনিয়েছে কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত। দুই আর দুইয়ে চারের মতো সহজ ছিল তা; ছিল একান্ত ভাবে স্বাভাবিক। কিন্তু আজ সব অন্যরকম। একরকম যতীশের বিছানার ছোঁয়াচ বাঁচিয়েই একটু দূরে টুল টেনে নিয়ে বসল মল্লিকা।

ভ্রূকুটি করে যতীশ লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। একসঙ্গে দুজনের একই কথা মনে হয়েছে। এ ভাঙন সেদিনই শুরু হয়েছে—যেদিন রাত্রে আকস্মিক ভাবে এ ঘরে পা দিয়েই অপরাধীর মতো চলে গিয়েছিল নীতীশ।

সেদিন ঠিক সেই সময় থেকেই একটা অলক্ষ্য প্রাচীর মাথা তুলে উঠেছে। সেই থেকেই অবচেতন ভাবে দুজনেরই মনে হয়েছে যা স্বাভাবিক তাই স্বাভাবিক নয়। যা ছিল দৈবী—অম্লান শুভ্রতায় স্নিগ্ধ—লৌকিক স্পর্শের গ্লানি এসে অকস্মাৎ একটা কালো ছাপ এঁকে দিয়েছে তার ওপরে। যতীশের সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল।

আবার কিছুটা সময় পার হয়ে গেল নিশ্ছেদ স্তব্ধতায়।

স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টায় যতীশ দেওয়াল থেকে আবার কুঁড়োজালিটা নামিয়ে নিলেন।

—তোমার মন বিক্ষিপ্ত হয়েছে?

মল্লিকা নত দৃষ্টিতে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল, জবাব দিল না।

—আজ তুমি গোস্বামী প্রভুকে অত্যন্ত কটু আর অশোভন কথা বলেছ।

মল্লিকা উত্তর দিল না।

যতীশের দৃষ্টিতে উত্তাপ প্রকাশ পেল : কেন এমন হল?

মল্লিকা চোখ তুলল। বিবর্ণ নিস্প্রভ চোখ।

—আমি বলতে পারব না।

—কেন পারবে না?—যতীশের স্বরে উত্তেজনা। তীব্র গলায় জানতে চাইলেন, তোমার হয়েছে কী?

—জানি না।

—না, এভাবে এড়িয়ে গেলে চলবে না—যতীশের চাপা উত্তাপটা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে লাগল : তোমার কাছ থেকে এ ব্যবহার আমি আশা করি না। রাধাকৃষ্ণের সেবার ব্রত তোমার। মন যদি চঞ্চল হয়ে ওঠে, সে ব্রতের অধিকার তুমি হারাবে।

নত নিরুত্তর দৃষ্টি মল্লিকার।

যতীশ বললেন, তুমি সব কিছুই করো অথচ কোনো কিছুতে তোমার মন নেই : তোমার নিষ্ঠা নেই আর। কেন?

মল্লিকা জবাব দিলে না।

এবার যতীশের দু চোখ শিখায়িত হয়ে উঠল : তবে কি দেবসেবা ছেড়ে তুমি লৌকিক জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে চাও?

—সে কথা তো আমি বলিনি—নতদৃষ্টি মল্লিকার নিঃশব্দ-প্রায় উত্তর এল।

—না, তুমি বলোনি। কিন্তু না বললেও অনেক কথাই বুঝতে পারা যায়।

—আপনি কী বুঝেছেন জানি না, কিন্তু আমার বলবার কিছু নেই।

হঠাৎ অধৈর্যের মতো যতীশ চেঁচিয়ে উঠলেন।

—বুঝি, আমি বুঝতে পারি সব। তোমার চিত্তবিকার হয়েছে। তুমি সংসারের মোহে আকৃষ্ট হয়েছ। তাই দেবতা আজ তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে, আমার রাধাকৃষ্ণের অসম্মান করছ তুমি।

—রাধাকৃষ্ণের অসম্মান!—হঠাৎ তীব্রবেগে মাথা তুলল মল্লিকা, না বাবা, একথা মিথ্যে।

—মিথ্যে! আমি মিথ্যেবাদী!—যতীশ চিৎকার করতে লাগলেন: এত বড় সাহস হয়েছে তোমার? আজ তুমি আমাকে মিথ্যেবাদী বলো! অথচ আজ সকালেই গোস্বামী প্রভুকে অপমান করেছ তুমি। আমার কাছে আসতে তুমি ভয় পাও!

—অনর্থক আপনি রাগারাগি করছেন বাবা।

—অনর্থক!—যতীশ ফেটে পড়লেন: জানো, এ বাড়ি আমার? এখানে আমার ঠাকুরের কোনো অমর্যাদা আমি সইব না?

—জানি।—এবার মল্লিকার চোখও দপ দপ করে উঠল: জানি। আর অমর্যাদা যদি কখনো করবার দুর্বুদ্ধি হয় আমার, তার আগেই আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব বাবা।

অসহ্য ক্রোধে যতীশ আড়ষ্ট হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর কথা বলবার মতো স্বাভাবিক অবস্থা যখন তাঁর ফিরে এল, তার আগেই ঘর থেকে চলে গেছে মল্লিকা—সত্যি সত্যিই বিদ্রোহিনীর মতো বেরিয়ে গেছে।

শুধু যে কথাটা সব চেয়ে আগে বলা উচিত ছিল, সে কথাটা কেউই বললেন না। সব চেয়ে নিষ্ঠুর কণ্টকটা রয়ে গেল সব চাইতে আড়ালেই। সে নীতীশ।

আর ঝিঁঝিঁ-ডাকা কালো রাত্রিতে একটা কালো মুখ ব্যাদান করে বিরাট ফাটলটা যতীশের দৃষ্টির সামনে জেগে রইল।

৫

যে ইস্কুলে পাল সাহেব অলকাকে ভর্তি করে দিলেন সেখানে ঢুকে যেন অস্বস্তির আর সীমা-পরিসীমা রইল না তার। পাল সাহেবের বাড়ির মতোই তা অপরিচিত।

এ ইংরেজ বাজারের সেই চুন-বালি-খসা দেওয়াল আর ভাঙা চেয়ার-বেঞ্চির ইস্কুল নয়। অতিকায় বাড়ির নিখুঁত সুন্দর সব ঘরগুলি—পরিচ্ছন্ন মেজেতে পা দিতে দ্বিধা হয়, পায়ের জুতো পিছলে যেতে চায়। বেঞ্চি নয়—নতুনের মতো চকচকে ডেস্ক আর টুল;

পরস্পরের গা ঘেঁষে বসবার আত্মীয়তা নেই—যেন আগে থেকেই একটা স্বাতন্ত্র্য আর দূরত্ব রচনা করে রেখেছে। কাঠের প্ল্যাটফর্মে শিক্ষয়িত্রীর টেবিল চেয়ার—নতুন ধরনের স্ট্যাণ্ডে নতুন রকমের ব্ল্যাক্‌বোর্ড। মাথার ওপরে একরাশ পাখার নিঃশব্দ আবর্তন। এখানে পা দিতে কেমন সংশয় আর সংকোচ বোধ হয়—আপনা থেকেই যেন একটা দীনতা ঠেলে উঠে মনকে আচ্ছন্ন করে ধরে।

নতুন রকমের পড়ানোর ভঙ্গি, নতুন রকমের কায়দাকানুন। যাঁরা পড়ান, তাঁদের মুখের চেহারা পর্যন্ত আলাদা। যেন অনেক দূরের মানুষ তাঁরা—অনেকখানি দূরত্ব বাঁচিয়ে তাঁদের কথাগুলো ছুঁড়ে দেন। এ ইংরেজ বাজার নয়—যেখানে দিদিমণিদের সঙ্গে সহজ পরিচয়, সহজ অন্তরঙ্গতা। এখানকার প্রতিটি মানুষ সব সময়ে যেন অন্যের সঙ্গ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়, রাখতে চায় স্পর্শ বাঁচিয়ে।

প্রেয়ার হল—টিফিন রুম—আরো কত কী, ইয়ত্তা নেই তার। বেশ কিছু সময় লাগে সব কিছুর সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে নিতে। কিন্তু ইস্কুলটাকে যদি বা একরকম করে চিনে নেওয়া যায়, সহপাঠিনীদের সঙ্গে নিজের যোগাযোগ ঘটানোর ব্যাপারটাই সব চাইতে শক্ত।

স্মার্ট আর তুখোড় ছাত্রী হিসেবে ইস্কুলে প্রতিষ্ঠা ছিল অলকার কিন্তু এখানে এসে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে। আজ সাতদিনের মধ্যেও কারো সঙ্গে ভালো করে কথা অবধি বলতে পারল না।

বলতে না পারাই স্বাভাবিক। দশটার সময় বড় বড় মোটর এসে ইস্কুল গেটের সামনে থামে, নানা রঙের শাড়ি পরে তাই থেকে নামে মেয়েরা। ওই মোটরগুলোর দিকে তাকিয়েই তাদের সঙ্গে কথা বলার স্পৃহা মিলিয়ে যায় অলকার। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, এরা ভিন্ন জগতের জীব। আর এমন একটা জগতের—যার সঙ্গে পাল সাহেবের বাড়ির মতোই বিজাতীয় সম্পর্ক অলকার।

প্রথম দিন যখন ইস্কুলে ঢুকল, তখন একবার ক্লাসের মেয়েদের জিজ্ঞাসু চোখ এসে তার ওপর পড়েছিল, তাদের দৃষ্টি ঘুরে গিয়েছিল তার পা থেকে মাথা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বত্র। যেন বিচার করে বুঝে নিতে চেয়েছিল এই নতুন মেয়েটি তাদের সগোত্র কিনা।

কিন্তু অলকার সন্ত্রস্ত বিপন্ন ভঙ্গি দেখেই কিছু আর বুঝতে বাকি থাকেনি তাদের। তার সস্তা শাড়িটাও হয়তো তাদের নজরে পড়ে থাকবে। তারপর থেকেই কেউ আর তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করেনি ; সেও না।

শুধু পাশের ডেস্কের মেয়েটি ভদ্রতা রক্ষার জন্যেই বোধ হয় জিজ্ঞাসা করেছিল, কোন্‌ ইস্কুল থেকে আসছেন আপনি ?

—মালদহ।

—মালদহ !—চশমার ভেতর দিয়ে মেয়েটি বিস্মিত কৌতূহলে বলেছিল, ওঃ, সেই

যেখানকার আম মার্কেটে বিক্রি হয় ?

—হুঁ।

—খুব আমগাছ বুঝি সেখানে ?

—অনেক।

মেয়েটি সংক্ষেপে বলেছিল, ওঃ। তারপর হয়তো আর কোনো কথা খুঁজে পায়নি আলাপকে দীর্ঘায়িত করবার। নিজের বই খাতা খুলে নিরুত্তরে একটা অ্যাল্জেব্রার অঙ্কে মনোনিবেশ করেছিল। অলকা চেয়ে চেয়ে দেখেছিল ভুল ফরমূলায় অঙ্কটা সে আরম্ভ করেছে কিন্তু সংশোধন করে দেবার কোনো স্পৃহা অনুভব করেনি সে। প্রবৃত্তিই হয়নি তার।

এই হল এখানে নতুনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের নমুনা !

অথচ, তাদের ইস্কুল ? সেখানকার ব্যাপার একেবারে আলাদা। 'আপনি' সম্ভাষণ দিয়ে সে আলাপ শুরু হয় না। পাশে এসে বসে, গলা জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন : তুমি কোথা থেকে আসছ ভাই ?

তাকে নিয়ে হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়। তারপরেই হয়তো তার ইন্স্ট্রুমেন্ট বক্স থেকে বেরিয়ে আসে গোটাকয়েক ডাঁসা কুল, ব্লাউজের ভেতর থেকে আত্মপ্রকাশ করে কাগজে মোড়া আচার। ভাব জমে উঠতে দশ মিনিটেরও বেশি সময় অপব্যয় হতে পারে না।

আর এখানে ?

ছোট ছোট দলে এখানে যে জটলা না জমে তা নয়। উচ্চকিত আলোচনার তরঙ্গও ওঠে মাঝে মাঝে, ছড়িয়ে যায় কথালাপের কলধ্বনি। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ আলোচনাই যেন গ্রীক ভাষার মতো দুর্বোধ্য বলে মনে হয় অলকার—সে যেন ভালো করে তাদের মর্মোদ্ধার করতে পারে না।

—আমাদের একটা নতুন ভেমলার এসেছে, জানিস ? কী চমৎকার গাড়ি—কালকে ট্রায়েল হল। বটানিক্স থেকে বেড়িয়ে এলাম আমরা।

—দাদা কন্টিনেন্ট্ থেকে কতগুলো ছবি পাঠিয়েছেন আমাকে। কাল নিয়ে আসব দেখিস।

—জানিস আইভি, আসছে অক্টোবরে আমরা সবাই সুইজারল্যাণ্ড বেড়াতে যাচ্ছি। মাস দুয়েকের আগে আর ইস্কুলে আসব না। কী মজা !

অনেক দূর নক্ষত্রলোকের বার্তা এসব। আকাশের দিকে তাকিয়ে দুর্গম মঙ্গলগ্রহের অরণ্যে প্রান্তরে পরিক্রমা করার মতো অবাস্তব।

চুপ করেই ছিল অলকা, চুপ করে থাকতও। শুধু একা বসে বসে ভাবত কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছে। বীণার কাছে, ভূপেনদার মুখে, বইতে, স্টাডি ক্লাবে যে প্রতিপক্ষ-

দের কথা শুনেছে, এরা তারাই। জীবনের সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে আকাশ-রঙা উঁচু প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায় এদের বাস—সেখানে লাল মেঘ, সেখানে ইন্দ্রধনু, সেখানে জ্যোৎস্না গলে যাওয়া রাত্রিতে বহু বিচিত্র সৌরভের ঐকতান। অথচ এদেরই খিড়কি দিয়ে আসে মানুষের রক্তাক্ত শ্রমের পশরা—নরম দামী গদী আর গরম ভালো খাবারের নীচে মিশে থাকে দুর্লক্ষ্য রক্তের কণা।

এ কোথায় এল অলকা? তাকে জেল থেকে বাঁচাতে গিয়ে যেন আর একটা নতুন জেলে এনে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন সুদাম। অথবা এ শুধু জেলও নয়—তার চাইতেও বেশি, যেন ফাঁসি সেল।

শুধু সেই চশমা পরা মেয়েটি মাঝে মাঝে আলাপ করতে আসে। ঠিক আলাপ নয়, যেন কেমন কৌতূহল বোধ করে, তাদের মধ্যে একান্ত বেমানান এই জাতীয় বস্তুটিকে মাঝে মাঝে এক-একটা ঠোকর দিয়ে যাচাই করে নিতে চায়। চিড়িয়াখানায় কোনো নতুন জন্তু আমদানি হওয়ার সকৌতুক কৌতূহল।

—সব সময় অত মনমরা হয়ে থাকেন কেন আপনি? কী ভাবেন?

—কিছুই না।

মেয়েটির গলায় লঘু কৌতুকের সঙ্গে যেন সহানুভূতির সুরও লাগে একটুখানি: দেশের জন্যে বুঝি মনখারাপ করছে?

অল্প করে হাসে অলকা, জবাব দেয় না।

—মায়ের জন্যে খুব বুঝি কষ্ট হয় আপনার?

অলকা এবার চোখ তুলে তাকায়। কী ভেবেছে তাকে? একেবারে ছেলেমানুষ? হঠাৎ হস্টেলের সেই বিরহিণী মণ্টুকে তার মনে পড়ে যায়। সে যেমন করে তাকে সান্ত্বনা দিত, এক্ষেত্রে এরাও যেন সেই অভিভাবকতার দায়িত্ব নিয়েছে তার।

তেমনি মৃদু হেসে অলকা বলে, আমাকে যতটা ছোট ভাবছেন আমি তা নই কিন্তু।

চশমাপরা মেয়েটি অপ্রতিভ হয় না। বরং যেন আলাপ জমাতে চেষ্টা করে: আপনার চোখমুখ দেখে কিন্তু সেই রকম মনে হয়।

—ওঃ।

মেয়েটি আরও অন্তরঙ্গ হতে চায়, ঘনিষ্ঠ হতে চায় আরো বেশি করে। সম্বোধনটা হঠাৎ আপনি থেকে 'তুমি'তে নেমে আসে।

—তোমার সঙ্গে গল্প করতে ভাই আমার ভালো লাগে। আমি কখনো পাড়াগাঁ দেখিনি কিনা। যাবে একদিন আমাদের বাড়িতে?

—বেশ, যাবো।

—আর গ্রামের কথা শুনব। গ্রামের গল্প শুনতে আমার বেশ লাগে।

—আমের সৌভাগ্য।

আলাপটা মাঝপথেই থামিয়ে দেয় অলকা, হঠাৎ অ্যাল্‌জেব্রাটা খুলে খাতায় অঙ্ক কষতে শুরু করে।

মেয়েটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তারপর ঠোঁট ফুলিয়ে উঠে যায় তার কাছ থেকে।

কিন্তু তবু দিন কাটে না। সাতদিনের পর এক মাস—এক মাসের পরে দু'মাস—শুধু একটানা ক্লান্তির অনুবৃত্তি করে!

পাল সাহেবের বাড়িতে একা একা তবু একরকম লাগত। কিন্তু সমর ঘোষ তার প্রতি এত বেশি মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেছে যে বিরক্তিতে পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যায় অলকার। অথচ বলতেও পারে না কিছু। এ কলকাতার রেওয়াজ, এখানকার সমাজজীবনের রীতি। তাদের যোধপুরে এক কথায় যে ঘনিষ্ঠতার দরজাটা বন্ধ করে দেওয়া যেত, এখানে সেটাকে এড়াবার চেষ্টা করা যেমন অন্যায়, তেমনি অভদ্রতা।

তা ছাড়া সমর এ বাড়িতে ঘরের ছেলের মতো অন্তরঙ্গ—একান্ত আপনার জন। সাধারণ বন্ধু বান্ধবের চাইতে তার প্রশ্রয় এখানে অনেক বেশি। সমরকে আমল না দিলে পাল সাহেবও বিরূপ হয়ে উঠবেন, বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার অবকাশ নেই এ বিষয়ে।

রবিবারের ছুটির দিন। যথাসময়ে বাইরে হাডসন সুপার সিক্স্ এসে থামল। লাফিয়ে নেমে পড়ল সমর।

অলকা একটা সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসেছিল। জুতোয় উল্লসিত শব্দ তুলে ঘরে ঢুকল সমর: মিস ঘোষ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে অলকা নামিয়ে রাখল সেলাইটা: আসুন।

—এই সকালবেলায় কী করছেন বসে বসে?

—কিছু না—আড়ষ্ট জবাব দিলে অলকা।

—চলুন তবে—

—কোথায়?

—একটু বেড়িয়ে আসি।

—ক্ষমা করবেন, এখন ভালো লাগছে না।

—আঃ, আপনি হোপ্‌লেস। দিনরাত শুধু ঘরে বসে থাকতেই ভালোবাসেন। ইট্‌স্ ব্যাড্—সো ব্যাড্। চলুন চলুন।

—কিন্তু—

—নাঃ, কোনো কিন্তু নেই। আমি মামীমার পারমিশন নিয়ে এলাম।

মনের মধ্যে সীমাহীন বিরক্তি নিয়ে অলকা চুপ করে রইল।

—আচ্ছা, আপনিএমন কেন বলুন তো? একটু 'লাইভলি' তো হয়ে উঠতে হয় মধ্যে মধ্যে। আজ থেকে প্রায় দশদিন ধরে আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি, অথচ এমন নিষ্ঠুর আপনি যে সে অনুরোধটুকু রাখছেন না।—সমরের স্বরে একটা স্পষ্ট কাতরতা ফুটে বেরুল।

—কিন্তু আমি কে যে খালি খালি এভাবে অনুরোধ করে আপনি পণ্ডশ্রম করছেন? —হঠাৎ অলকা খরদৃষ্টিতে তাকালো সমরের দিকে: এই অনুরোধটুকু রাখলেই কি খুশি হবেন আপনি?

সে দৃষ্টি সমর চিনতে পারল না—কেমন চমকে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে তিন পা পিছিয়ে গেল সে। এ দৃষ্টির মধ্যে সে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে, ভিন্ন জগতের, আলাদা গোত্রের। তবু মুখের ওপর একটা হাসি টেনে এনে বললে, নিশ্চয়।

অলকার খরদৃষ্টি আরো খর হয়ে উঠল: আমাকে নিয়ে মোটরে আপনি বেড়াতে চাইছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয় জানেন কি আমার?

—মানে?—সমর যেন নার্ভাস হয়ে গেল: আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে হয়তো একটু সময় লাগবে আপনার—অলকা তিক্তভাবে হাসল: হয়তো সেদিন আজকের অন্তরঙ্গতাকে অস্বীকার করতে পারলেই খুশি হবেন আপনি—তার দৃষ্টি তীরের ফলার মতো সমরের মুখের ওপর গিয়ে পড়ল।

এবার সমরের চোখও জ্বলে উঠল।

—হতে পারে। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের জন্যে বর্তমানকে তুচ্ছ করতে আমি রাজি নই।

—কিন্তু সে ভবিষ্যতে এর জন্যে অনেক বেশি দাম দিতে হতে পারে—অলকা আলোচনাটাকে হঠাৎ যেন নগ্ন করে ফেলল: সে সাহস আছে আপনার?

—পরীক্ষা না দিয়ে জবাব দেব কেমন করে?—একটা সিগারেট ধরিয়ে জবাব দিলে সমর: কিন্তু পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরিই আছি আমি।

—আগুনে হাত পোড়ে, জানেন তো?

—জানি। মশালও জ্বালানো যায়—সিগারেটের ধোঁয়া পাকাতে পাকাতে জবাব দিল সমর: একটার সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে আর একটা হয় না।

—তবে চলুন।—অলকা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল: চলুন, কোথায় যেতে চান।

বেরিয়ে পড়ল সুপার হাডসন, ছুটে চলল চৌরঙ্গীর তৈল-মসৃণ পথ বেয়ে। নিঃশব্দে পাশাপাশি দুজন। কেউ কোনো কথা বলছে না। সমরের সমস্ত চিন্তায় কতগুলো এলো-মেলো জট পাকিয়ে গেছে যেন। এত স্মার্ট মানুষ, এত প্রখর; কিন্তু কোনো কথা মনে

আসছে না তার। একটা অপ্রত্যাশিত আর বিস্ময়কর অবস্থার মধ্যে পড়ে কেমন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে যেন।

গাড়ি চলেছে। রবিবারের ব্যস্ততাহীন চৌরঙ্গীর পথ দিয়ে। কোথায় যাবে সে কথা সমর নিজেও জানে না, অলকাও প্রশ্ন করেনি কোনো রকম।

হঠাৎ অলকা চেঁচিয়ে উঠল : থামান, থামান, গাড়ি থামান।

—কী হল ?

—গাড়ি থামান বলছি—

বিস্মিত সমর ব্রেক কষল। অলকা পেছনে মাথা বাড়িয়ে ডাকল : শুনুন, শুনুন—

কাকে ডাকল সমর দেখতেও পেল না। এবং যাকে ডাকল সেও অলকাকে দেখতে পেল কিনা কে জানে। কিন্তু পরক্ষণেই ওদের পাশ দিয়ে পোড়া মবিলের কটুগন্ধ ছড়িয়ে বেরিয়ে গেল ডবলডেকার বাসখানা।

চকিতে অলকার সমস্ত মুখটা যেন পাথর হয়ে গেল। তারপরেই হিংস্রভাবে ঠোঁটে দাঁত চেপে বসল তার।

—ব্যাপার কী ? কাকে ডাকছিলেন ?—বিহ্বল সমর জিজ্ঞাসা করল।

—না, ও কেউ নয়—অলকা কঠিন ভাবে বললে। তীব্র চোখে সমরের দিকে তাকিয়ে বললে, কতদূরে যেতে পারে আপনার গাড়ি ?

সমর উৎসাহিত হয়ে উঠল : যতদূর আপনি যেতে চান। গ্রাণ্ড্ ট্রাঙ্ক রোড আছে, যশোর রোড আছে—ডায়মণ্ড হারবারের রাস্তা আছে—'পথ বেঁধে দেবে বন্ধনহীন গ্রন্থি—'

—তবে তাই চলুন—অনেক দূর থেকে বেড়িয়ে আসি—

—রাইটো।—স্মার্ট ভাবে 'প্রাগ্' করলে সমর, একটা চকচকে চোখের কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে ভালো করে দেখে নিলে অলকাকে। গাড়ি দক্ষিণের দিকে ঘুরিয়ে গীয়ার দিয়ে বললে, চলুন—

* * * *

গভীর রাতে অলকা সারা ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। বেড্ল্যাম্পটার সবুজ আলো তার জাগ্রত চোখের ওপর একটা অপরিচিত দীপ্তিতে ঝিকিয়ে উঠতে লাগল থেকে থেকে।

সমর। উদ্দাম, বে-হিসেবী। তিরিশ মাইল মোটর বিহারের পথেই নিজেকে স্পষ্ট করে বলে ফেলেছে, ঢেকে রাখতে পারেনি আর। কোন জবাব দেয়নি অলকা, শুধু একটা নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে থেকে শুনে গেছে তার কথাগুলো। গ্র্যানাইটের মতো শক্ত পাথরেও জলের রেখামাত্রও যেন থাকবে না; একথা জানে অলকা। বরং

অদ্ভুত আনন্দ পেয়েছে যেন—একটা বিচিত্র বিজয়ের উল্লাস মনের মধ্যে উঠেছে মাথা চাড়া দিয়ে। যাদের জগতে এতকাল নিজেকে একান্ত অনধিকারী বলে বোধ হয়েছে, দেখেছে সেখানে শুধু সে গ্রাম্য মেয়ে অলকাই নয়, তার মধ্যে আর একটা কঠিন শক্তি আছে, আছে একান্ত ভাবে নিষ্ঠুর হওয়ার সুযোগ। হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে তারও পায়ের নীচে পাথরের বেদী আছে একটা যেখানে মাথা খুঁড়ে রক্তাক্ত হওয়ার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছে মুগ্ধের দল।

একটা তীব্র জ্বালার মতো মনের মধ্যে চাবুক দিয়ে যাচ্ছে ডবলডেকার বাসটা। যেন বুকটাকে গুঁড়ো করে দিয়ে এগিয়ে গেছে সেটা—খানিক কঠিন কৌতুকের মতো ছড়িয়ে দিয়ে গেছে পোড়া মবিলের গন্ধ। অকস্মাৎ সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেল অলকার।

চিরদিনের সত্যটা নতুন করে দেখা দিল তার মধ্যে, পায়ের নীচে পাথরের বেদী-টাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সে।

তাকে দেখেও সে দেখেনি, চিনেও চিনতে চায়নি। বেশ, তাই ভালো। তারও জগৎ আছে—সেও নিজের মূল্য বুঝেছে, অন্যের চোখের আয়নায় যেন দেখতে পেয়েছে নিজের প্রতিচ্ছবি। তবে তাই হোক। পথ আলাদা হওয়া অনিবার্য ছিল, তাই হয়ে যাক এবার থেকে।

ডবলডেকারের চাকাগুলো যেন হৃৎপিণ্ডকে পিষে দিয়ে গেছে। যন্ত্রণায় খানিকক্ষণ চুপ করে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইল অলকা। কিন্তু এ আর চলবে না। সময় রইল—সে যাক। কিন্তু এখন কাজ করতে হবে, আর বসে থেকে এ মনোবিলাসকে প্রশ্রয় দিতে পারবে না।

বেড্ ল্যাম্প নিবিয়ে জোরালো আলোটাকে জ্বালালো সে। এসে বসল টেবিলে। একটা প্যাড আর কলম টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসল ভূপেনদাকে।

"আমার কাজ চাই। এখানে এসে সম্পূর্ণ disconnected হয়ে পড়েছি। কোথায় কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে জানাবেন। মোটামুটি instruction চাই আপনার। বীণার খবর যদি জানেন তাও জানাবেন।"

চিঠিটা খামে বন্ধ করে সে আলো নেবালো, তারপর এগিয়ে এল বিছানার দিকে। কয়েক ঘণ্টার অসহ্য অস্থিরতার পরে যেন বুকের ভারটা খানিক পরিমাণে হালকা হয়ে গেছে, এইবারে হয়তো খানিকটা ঘুমুতে পারবে সে।

পাল সাহেবের বড় হলঘরে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ঢং ঢং করে বাজল—রাত দুটো।

৬

বাসে ভিড় ছিল যথেষ্ট। সেই ভিড়ের চাপে দুজনে ছিটকে পড়েছিল দুদিকে, কথা-বার্তার সুযোগ ছিল না। নইলে স্পষ্ট দেখতে পেতো হিমাংশু, নীতীশের মুখের চেহারাটা অদ্ভুত ভাবে বদলে গেছে। ছায়া নেমেছে কপালের ওপর দিয়ে, ঘনবদ্ধ জোড়া ভ্রূতে মনোবিকারের একটা কুটিল রেখাপাত।

কিন্তু দেখবার সময় ছিল না হিমাংশুর। একে বাসে প্রচণ্ড ভিড়, তার ওপর তাকে ঝুলে পড়তে হয়েছিল রডটাকে আশ্রয় করে। বেঁটে আর ছোটখাটো মানুষ, লোকের চলাফেরার তরঙ্গে তরঙ্গে যেন দোল খাচ্ছিল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো। শ্যামবাজারের মুখোমুখি এসে সে চেঁচিয়ে ডাকল : ওহে নীতীশ, নামো নামো।

দুজনে নেমে পড়ল। কিন্তু তখনো কথা বলবার সময় নেই হিমাংশুর। চৌমাথার ওদিকটায় বাসটা তখন ছাড়বার উপক্রম করেছে। নীতীশের দিকে না তাকিয়ে আর কনুইয়ের গুঁতোয় পথ করতে করতে হিমাংশু সংক্ষেপে বললে, Hurry up, পা চালিয়ে চলো। ওটা মিস করলে আবার ঝাড়া পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

এ বাসটায় বসবার জায়গা ছিল। আরাম করে হেলান দিয়ে আর বিবর্ণ জুতো পরা অপরিচ্ছন্ন পা দুটোকে সামনের সীটের পেছনে তুলে দিয়ে একটা বিড়ি ধরাল হিমাংশু। শান্ত, নিরাসক্ত ভঙ্গি। যেন লাঠি আর গুলির মুখোমুখি দাঁড়াতে যাচ্ছে না, বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে চলেছে কোথাও।

—আঃ—চোখ বুজে বিড়িতে একটা টান দিয়ে বললে, মিনিট দশেকের জন্যে তবু একটু বসতে পারা গেল। নইলে সেই সকাল থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত হাঁটছি তো হাঁটছিই।

নীতীশ বাইরে একটা পানের দোকানের দিকে তাকিয়ে রইল, জবাব দিলে না।

হিমাংশু বললে, একটা কিছু হয়ে গেলে তখন দিন কয়েক গ্যাঁট হয়ে বসতে পারব। ছোকরাদের বলব, বিপ্লবের কাজটা আমরা করে দিলাম, এবারে ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানটা তোমরাই চালিয়ে যাও কিছুদিন। সেই ফাঁকে আমাদের একটু ঘুমিয়ে নিতে দাও—হিমাংশু হাসল : একেবারে রিপ ভ্যান উইংকলের মতো লম্বা আর একটানা ভাবে।

নীতীশ তবুও জবাব দিলে না।

একবার হিমাংশু লক্ষ্য করল। আড়চোখে তাকিয়ে বললে, হ্যালো, কী হলো তোমার ?

—কিছুই না।

সন্দিগ্ধভাবে হিমাংশু কয়েক মুহূর্ত তাকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করল, অনুতাপ হচ্ছে না তো ?

—কেন ?—শুক্‌নো ভাবে নীতীশ হাসবার ভঙ্গি করলে একটা।

—এইভাবে আমার সঙ্গে চলে আসবার জন্তে ? এন্‌নি করে একটা অবাঞ্ছিত ঝামেলার মধ্যে পা বাড়িয়ে দেবার জন্তে ?

—না, ওসব কিছু নয়। অন্য কথা ভাবছিলাম—অনিচ্ছাভরে জবাব দিলে নীতীশ।

—ওয়েল—হিমাংশু চুপ করে গেল।

বাসটা ভরে উঠছে একটু একটু করে। দূরের যাত্রীবাস—পাড়াগাঁর মধ্য দিয়ে পথ, তাই একটু আলাদা এর ধরনধারণ। বাসের বুড়ো ড্রাইভার নিজেই গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে গলা ফুলিয়ে সচিৎকারে লোক ডাকছে—কলকাতার বাসের মতো তাড়াহুড়ো কিছু নেই। হরলিক্‌সের বোতল থেকে শুরু করে পুঁইশাক পর্যন্ত বাজার নিয়ে যাত্রী উঠে আসছে দু'চারজন। ড্রাইভারের পাশের 'দেড়া ভাড়া' লেখা সিটটাতে বুক পর্যন্ত ঘোম্‌টা টেনে জড়োসড়ো হয়ে চলেছে দুটি পল্লীবধূ।

—আঃ, কী বিশ্রী গরম! গাড়িটা ছাড়লেও তো পারে—বিরক্তিভরে আবার স্বগতোক্তি করলে হিমাংশু, পকেট থেকে একটা রুমাল টেনে বের করে হাওয়া খেতে লাগল।

নীতীশ তেমনি তাকিয়ে ছিল শূন্য দৃষ্টিতে। বাইরে করকরে রোদ—কলকাতা যেন জ্বলে যাচ্ছে। টায়ারের এলোমেলো ছাপ পড়ে যাচ্ছে পথের ওপর। কোথাও কোথাও সেটা ফেটে গিয়ে জমাট কালো রক্তের মতো পিচের বিন্দু ফুটে বেরিয়েছে। রোয়াকের উপর বসে একটা কুকুর জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে—আঠার মতো লালা ঝুলে পড়ছে সে জিভ থেকে। পথের একপাশে পড়ে থাকা একটা থ্যাত্‌লানো বিড়ালছানার ওপরে ছোঁ দিয়ে পড়ল একটা চিল, সাপের মতো খানিকটা কালো নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে নিয়ে নক্ষত্রবেগে উড়ে গেল আবার—খানিকটা দুঃসহ দুর্গন্ধ পাক খেয়ে গেল বাতাসের মধ্যে।

নীতীশের সমস্ত মানসেন্দ্রিয়গুলোও যেন ওই রকম খানিকটা কটুস্বাদ গন্ধে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। হ্যাঁ—সেও দেখেছে বইকি, বিন্দুমাত্র ভুল হবার তো কথা নয়। উজ্জ্বল মসৃণ দেহ, এভারব্রাইট স্টিলের অংশগুলি ঝকঝক করে জ্বলছে। নিরঙ্কুশ পথের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে অতিকায় গাড়িটা। হাডসন সুপার সিক্‌স্‌।

ট্যাক্সি নয়, প্রাইভেট গাড়ি। গাড়ি যে ড্রাইভ করছে সে যে ড্রাইভার মাত্র নয় তা বোঝা যায় তার চেহারা থেকে, স্মার্টকাট সার্টের খাড়া কলার আর ঠোঁটের কোণে সিগারেট চেপে রাখবার ভঙ্গি দেখে; আর তার পাশে বসে কৌতুকের উচ্ছলিত হাসিতে যে ভেঙে পড়ছে সে অলকাই। আর কেউ নয়, আর কেউ হতেই পারে না।

না, ভুল হয়নি। ট্রাফিক পুলিসের সংকেতে প্রায় তিন মিনিট আটকে ছিল গাড়িটা। নির্ভুল দৃষ্টিতে দেখে নেবার পক্ষে শুধু যথেষ্ট সময় নয়—কল্পান্ত। অবশ্য স্বপ্ন দেখছে

এমন একটা কিছু ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করা যেত, কিন্তু বেলা এগারোটার সময় চৌরঙ্গির ফুটপাথে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখবার কল্পনাও অসম্ভব।

অলকা কলকাতায় পড়তে এসেছে এমনি একটা উড়ো খবর গ্রামের কারো মুখে একবার যেন পেয়েও ছিল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তার এ পরিণতি যে-কোনো সম্ভাব্য চিন্তারও বাইরে ছিল। যোধপুরের সেই ছায়া-ঘেরা বাড়িতে, সেই বেলা ডুবে আসা পড়ন্ত রোদের সোনায় স্নান করা দোতলার ছাদে অথবা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বসে রাজনৈতিক বিতর্কের অবকাশে যে অলকা নিজের একটা সম্পূর্ণ পরিচয় রচনা করেছিল, তার সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র মিলছে না। ঘরের মধ্যে যা ছিল সেতুবন্ধনের প্রত্যাশা, এখন সেখানে আদিগন্ত সমুদ্রের অসীম শূন্যতা এসে ছড়িয়ে পড়েছে।

হিমাংশু হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, একটু দেরি হয়ে গেল।

—হুঁ।

—একটার মধ্যে পৌঁছোনোর কথা। ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

—মিনিট পনেরো দেরি হবে বোধ হয়।

—উঁহু, বেশি।—ঘড়িটার দিকে চোখ রেখে হিমাংশু বললে, প্রায় আধঘণ্টা। ঠিক হল না কাজটা। এমনিতেই সব যা তেতে আছে, একটু প্রভোক করলেই যা-তা কাণ্ড করে ফেলতে পারে। আর মালিকও তাই চায়, তা হলেই গুলি-টুলি চালাবার সুবিধে পাওয়া যাবে।

চিন্তিতভাবে আর একটা বিড়ি ধরালো হিমাংশু। উৎসুকভাবে সেও মাথাটা বাড়িয়ে দিলে পাশের জানালার দিকে, যেন ব্যগ্রতার তাগিদে পথটাকে সংক্ষেপ করে আনতে চায় খানিকটা।

আবার নিজের ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গেল নীতীশ। মনের সামনে ভেসে উঠছে একটা ঝকঝকে মোটর—প্রসারিত চৌরঙ্গির প্রখর রোদে চকচক করছে তার এভারব্রাইট স্টিলের অংশগুলি। হাডসন্ সুপার সিক্স্। এঞ্জিনের গায়ে লেখা হরফগুলি শুধু জ্বলন্ত নয়, জীবন্তও বটে।

ঈর্ষা নয়, দুঃখও নয়; ঈর্ষার প্রশ্নই ওঠে না—সে অধিকার তার কোথায়? সেখানেও তো ছিল এই আসমুদ্র ব্যবধান,—সেখানেও তো দেবদাসীর মূর্তিটা একটা প্রেতচ্ছায়া ফেলে মাঝখানে এসে দাঁড়াতো। দুর্বল মুহূর্তে যখন মনের সঙ্গে তার মুখোমুখি হয়েছিল, তখন নিজের অন্তঃশীলা ভাবনার একটুখানি আভাস পেতেই সে চমকে উঠেছিল, যেন কড়া একটা চাবুকের আঘাত এসে পড়েছিল তার পিঠের ওপর। সেদিন থেকেই নিজের দুর্বিনীত ভাবনাকে সে শাসিয়ে রেখেছে রক্তচক্ষু দিয়ে। এ জিনিসকে কখনো বাড়তে দেওয়া যাবে না, একে কিছুমাত্র স্বীকৃতি দেওয়া যাবে না আর। না—ঈর্ষা নয়। সে

অধিকারই নেই তার।

তবে কি দুঃখ? কিন্তু কেন?

অত বড় একটা দামী মোটর চড়েছে অলকা, উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাসছে একজনের পাশে বসে বসে, তারই জন্যে কি? তাই কি মনে ভেবেছে অলকা ব্রতভ্রষ্ট হয়েছে? তার মধ্যে যে আদর্শদীপ্ত মনটির সন্ধান মিলেছিল—এই থেকে কি অনুমান করা যায় যে সে মনটির অপমৃত্যু ঘটে গেছে? মৃতপ্রায় মহানন্দার ধারে ধারে, ভাঙাচুরো জেলেপাড়ার মধ্য দিয়ে, মর্মান্তিক দুঃখ, যন্ত্রণা আব ক্ষুধায় অভিষিক্ত বাংলার যে পল্লীপ্রাণের মধ্য দিয়ে অলকার পথ করে নেবার কথা ছিল, সেই পথ কি তার হারিয়ে গেছে? হারিয়ে গেছে চৌরঙ্গীর প্রশস্ত নিরঙ্কুশ নির্বাধায়, হাডসন সুপার সিক্স্-এর মোটা মোটা টায়ারের নীচে?

কানের কাছে হিমাংশু হঠাৎ কথা কয়ে উঠল। যেন আচমকা একটা বাজ পড়বার আওয়াজ শুনে চমকে উঠল নীতীশ।

—আরও মিনিট আষ্টেক এখনো।

—তবে তো এসে গেলাম—ভদ্রতা করেই যেন জবাব দিল নীতীশ, দৃষ্টিটা তার তেমনি বাইরের দিকেই বিকীর্ণ। বাস ছুটে চলেছে হু হু করে। কলকাতার বাধা-ব্যারিকেড আর ট্রাফিক কণ্ট্রোলের নিষেধবিধি থেকে বেরিয়ে এসে যেন ছুটে চলেছে একটা অকৃপণ মুক্তির আনন্দে।

—এতক্ষণ পাতিপুকুরে এলাম—আবার নিজে থেকেই যেন স্বগতোক্তি করলে হিমাংশু। তার মনের অবস্থাটা নীতীশ বুঝতে পারছে। অসহ্য একটা অস্থিরতায় ছট্‌ফট করছে সে। আর সে অপেক্ষা করতে পারে না—প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার কাছে দুর্মূল্য। বিউগ্‌লের বাজনা বাজছে তার বুকের মধ্যে—অথচ বন্দুক হাতে করে শত্রুর উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়বার সুযোগ সে পাচ্ছে না এখনো। শুধু সীমাহীন উত্তেজনায় একটার পর একটা বিড়ি ঘন ঘন টানে শেষ করে চলেছে।

—নাঃ, আর পারা যায় না—যেন বিড়বিড় করে বললে হিমাংশু।

কী বললে হিমাংশুকে ঠিক সান্ত্বনা দেওয়া যায় নীতীশ বুঝতে পারল না, তেমনি করেই চেয়ে রইল সে। দুধারে ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে বাস ছুটেছে এখন। ঠিক মাঠ নয়—বহুদূর প্রসারিত জলা জমির ওপর অজস্র কচুরিপানা মাথা তুলে যেন সবুজ মাঠের মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে। সেই জলার ওপর নুয়ে নুয়ে পড়েছে কতকগুলো ঝাঁকড়া বুনো গাছ—তাদের একটার ওপর এক ঝাঁক বক বসে আছে—যেন সাদা সাদা ফুল ফুটে আছে একরাশি। আকাশ থেকে সূর্যের ধারালো আলো সোজা মুখে এসে পড়েছে—গরম বাতাস পোড়া পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে বয়ে আনছে পচা পাঁকের গন্ধ।

কিন্তু—

অলকার যদি ব্রতভ্রষ্ট হয়েই থাকে তা হলেই বা ক্ষতি কী নীতীশের? তাদের পথ তো এক নয়। অলকার মতবাদকে তো সে স্বীকার করতে পারেনি। আজ হিমাংশুর সঙ্গে সে এসেছে বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তাদের দলে সোজাসুজি ভিড়ে পড়েছে সে। তার আসল উদ্দেশ্য এদের কাজের ধারাটাকে ভালো করে জানা, কতটা সত্য আছে এদের মধ্যে সেইটেকে ভালো করে বুঝে নেওয়া। অলকাও হয়তো এই দলের, তা হোক। কিন্তু তাই বলে—

এইখানেই সব বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে—কোন কিছুর খেই মিলছে না। একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে মাথার ভেতরে। হঠাৎ যেন বুকটা আশ্চর্য ভাবে ফাঁকা হয়ে গেছে। নীতীশ চোখ তুলে সোজাসুজি সূর্যের দিকে তাকালো—একঝলক আগুন যেন চোখ দুটোকে পুড়িয়ে দিলে এসে! কিন্তু—এভারব্রাইট স্টিলের জ্বলন্ত অংশগুলো কি এরও চাইতে প্রখর আর ভয়ঙ্কর ছিল না?

বাসের ভেঁপু বাজল। মন্দা হয়ে এল গতি। তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ে হিমাংশু ত্রস্তকণ্ঠে বললে, এসো নীতীশ, চট্‌পট নেমে পড়া যাক। পৌঁছে গেছি আমরা।

কারখানায় লক্‌-আউট।

ওদের তিনজন সহকর্মীকে বরখাস্ত করেছে লালমুখো ম্যানেজার। যারা দরবার করতে গিয়েছিল, সোজা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে তাদের দিকে। দেশে সবে দল বাঁধছে শ্রমিক আন্দোলন—তার নরসিংহমূর্তিটা এখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি সাহেবের কাছে। কিন্তু আশঙ্কার ছায়া পড়েছে, তাই গোড়াতেই সব কিছুর মূলোচ্ছেদ করে দিতে চায়। গণ্ডগোল একটু দানা বাঁধতেই কারখানার গেট বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রায় চারশো মানুষ বেকার। ভেতরে ভেতরে লোক যোগাড়ের আয়োজন চলছে। এরই মধ্যে তিন লরি লোক ঢুকিয়েছে কারখানার মধ্যে। সঙ্গে পুলিসের পাহারাও ছিল।

কারখানা থেকে একটু দূরে খানিকটা পোড়ো জমি। ফ্যাক্টরীর যত ফেলে দেওয়া আবর্জনা স্তূপাকারে ছড়িয়ে রয়েছে সেখানে। ছেঁড়া চট, অজস্র লোহালক্কড়ের মরচে ধরা টুকরো, ভাঙা পচা প্যাকিং বাক্সের ধ্বংসাবশেষ, পোড়া কয়লার গুঁড়ো, ভাঙা ইলেকট্রিক বাল্‌বের রাশি রাশি ধারালো কাঁচ। এ পাশে একটা ছোট জলা—একসময় তাতে জল ছিল কিন্তু এখন তার ওপর পোড়া ক্রুড্‌ অয়েলের পুরু স্তর জমেছে একটা; প্রখর রৌদ্রের সঙ্গে তার উগ্র গন্ধ মিশে মস্তিষ্কটাসুদ্ধ ঝাঁকানি দিতে থাকে।

সেইখানেই মিটিংয়ের বন্দোবস্ত। ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের মানুষ, পুরুষ মেয়ে, সব জড়ো হয়েছে একসঙ্গে। তেলকালি মাখা অদ্ভুত চেহারায় একটা মানুষ দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। কুঁজো, ক্ষুধার্ত চেহারা, কোটরের কালো গর্তের ভেতর থেকে দুটো শাদা চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে তার।

বক্তা নয়, গুছিয়ে বলতে জানে না। কী বললে চটাপট হাততালির সৌভাগ্য অর্জন করা যায় সে বিদ্যেটাও আয়ত্ত নেই। বার বার থেমে যাচ্ছে, গুলিয়ে ফেলছে কথাগুলোকে। কিন্তু ভদ্র মার্জিত শ্রোতাদের মতো কেউ তাতে উস্‌খুস্‌ করে উঠছে না, পাশ ফিরে কথা বলছে না আর একজনের সঙ্গে, মুখে পাণ্ডিত্যের সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা নিয়ে করুণার দৃষ্টিতেও তাকিয়ে নেই কেউ।

এরা আলাদা, এরা নতুন শক্তি! নীতীশের চমক লাগল। এ শক্তিকে তো এর আগে তার চোখে পড়েনি! শোনা কথা ওপর থেকে আউড়ে যাচ্ছে না, একটা অগ্নিগর্ভ স্টিম এঞ্জিনের মতো ভেতরের উত্তাপে কেঁপে উঠছে থর থর করে। আরো চারশো নির্বাক নিঃশব্দ মানুষের সঙ্গে গা মিলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীতীশ। দাঁড়িয়ে রইল সেই আবর্জনাভরা পোড়ো মাঠটার মধ্যে—প্রখর রৌদ্রের ধারালো আঘাতের নীচে। ভদ্রলোক বলে তাদের কেউ আলাদা করে অভ্যর্থনা করল না, সমাদরে চেয়ার পেতে দিল না বসবার জন্যে। সংগ্রামী মানুষের কাছে ভদ্রতার মূল্য ধরে দেবার বিলাসিতা আর নেই—নিজেদের প্রশ্ন আজ তাদের কাছে সব চেয়ে বড়।

লোকটা বলে চলেছে। বলে চলেছে অন্যায়ের কথা, দৈনন্দিন অত্যাচার আর অবিচারের কথা। হঠাৎ নীতীশের মনে হল চারদিক থেকে একটা আগ্নেয় উত্তাপ ঠেলে উঠছে। জ্বালিয়ে দিতে চাইছে, পুড়িয়ে দেবার উপক্রম করছে তাকে। আকাশের রোদের চাইতেঅনেক বেশি এর জ্বালা, হাডসন সুপার সিক্স্‌-এর এভারব্রাইটস্টিলের অংশগুলোর চেয়েও তীব্র এর অনুভূতি।

শুধু হিমাংশুর দিকে মাঝে মাঝে নীরব দৃষ্টি এসে পড়ছে তাদের। সে দৃষ্টি পরিচয়ের, সে দৃষ্টি কৃতজ্ঞতার। হিমাংশু তাদের আত্মীয়, তাদের আপনার জন। কিন্তু নীতীশ?

হঠাৎ হিমাংশু তাকে স্পর্শ করল। ফিরে তাকালো নীতীশ।

—কী মনে হয়?

—হুঁ।

আগ্রহভরা গলায় হিমাংশু বললে, এদের বিশ্বাস করতে পারো তো?

—কিসের?

—বিপ্লবের।

—হুঁ।

হিমাংশুর স্বর উত্তেজিত হয়ে উঠল: একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো এদের দিকে। এরাই তো সত্যিকারের সর্বহারা। বিপ্লবের এরাই তো পুরোধা।

—হুঁ—তেম্‌নি সংক্ষিপ্ত জবাব এলো নীতীশের।

—তোমার গ্রামের চাষাভূষো এরা নয়। ক্ষেতে ফসল না ধরলে, হাজাশুকো হলে, বান ডাকলে দেবতাকে বরাত দিয়ে এরা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এদের শত্রু প্রত্যক্ষ, এদের শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়। এরা পরিষ্কার করে জানে কোথায় এদের জীয়ন-কাঠি, শত্রুর মারণ-মন্ত্রও অজানা নয়।

—তা হলে গ্রাম?

—সে তো বিপ্লবের অগ্রদূত নয়—অনুচর। যারা সেনাপতি তাদের তৈরি করবার ভার সকলের আগে নিতে হবে সেই জন্যে। তাদের ডাক শুনলে সৈনিকেরা আপনা থেকেই এগিয়ে আসবে—বেশি প্রতীক্ষা করতে হবে না।

—এ কি শুধু থিয়োরী নয়? এই অস্থিসার মানুষগুলো—দুর্বল পেশী, রক্তহীন শরীর, বিপ্লবের মুখোমুখি দাঁড়াবার কতটুকু সামর্থ্য আছে এদের?

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল হিমাংশু।

—নতুন কথা নয় ভাই, এ সংশয় এর আগে আরো অনেক তুলেছে। কিন্তু এই হাড়েই বজ্র তৈরি হয়—কোনো কামান-বন্দুক তাকে রোধ করতে পারে না। তার সাক্ষী দেবে পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাস—সাক্ষী দেবে ডেনিকিন কোল্‌চাকের প্রেতাত্মারা—হিমাংশু হাসল অল্প একটু: যদিও আত্মা-প্রেতাত্মায় আমার বিশ্বাস নেই।

হিমাংশুর কথার জবাবে নীতীশ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এর মধ্যেই কাণ্ড ঘটে গেল একটা। বক্তা আর্তনাদ করে বসে পড়েছে—মাথা ফেটে রক্তের ধারা নেমে এসেছে তার। ফ্যাক্টরীর ঘেরা পাঁচিলের ওপার থেকে একখানার পর একখানা ইট গোলাবর্ষণের মতো এসে পড়ছে জনতার মাঝখানে।

একটা আকাশ-ফাটানো কোলাহল উঠল। তারপরেই দেখা গেল চারশো জনতা নুয়ে পড়েছে মাটিতে। তুলে নিয়েছে লোহার টুকরো, ইট, পোড়া কয়লার ঢিবি। ভেতরে বাইরে গোলা-বর্ষণের সমান প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেছে।

বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল হিমাংশু। দু হাত আকাশে তুলে চেঁচিয়ে উঠল: থামো, থামো—কী হচ্ছে এ সব! থামো, থামো!

কিন্তু খোঁচা লেগেছে ঘুমন্ত সিংহের গায়। দেশলাইয়ের কাঠি পড়েছে বারুদের স্তূপে। আগামী দিনের অবশ্যম্ভাবী বিপ্লব নিজের তাগিদেই শিখা মেলে দিয়েছে তার।

মাঝখান থেকে আর একখানা ইট এসে পড়ল হিমাংশুর মাথায়। লুটিয়ে পড়ল হিমাংশু। নীতীশ ক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে গেল সেদিকে। সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ল কারখানার সামনেকার লাল সুরকির পথ বেয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে একটা পুলিসের লরি, উদ্যত রাইফেলের শানানো বেয়নেটগুলো রোদের আলোয় ঝলক দিচ্ছে ক্ষুধার্ত কতগুলো সাপের

জিহ্বার মতো।

এগিয়ে যেতে যেতে নীতীশ শুনল, বিড়বিড় করে হিমাংশু বলছে, চালিয়ে যাও কমরেড্‌—থেমো না।

৭

চৌধুরী ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন বড় অফিসার। মাথার চুলে ছাইরং ধরেছে, কপালের চামড়াটা সব সময়েই অল্প-বিস্তর কুঞ্চিত। চোখের দৃষ্টি স্বভাবতই কিছুটা সন্দিগ্ধ, খানিকটা সতর্কও। ঠোঁটের একদিকের কোণটা একটু বাঁকানো—যেন সব সময়েই একটা মৃদু ব্যঙ্গের হাসি থম্‌কে আছে সেখানে।

বললেন, চা? না, চা আমি খাই না। সিগারেটও না। কোনো নেশা আমার নেই।

সঙ্গের পুলিস অফিসারটি ততক্ষণ একটা পেয়ালা টেনে নিয়েছে: একেবারে কোনো নেশাই নেই স্যার?

ঠোঁটের বাঁকা কোণাটা বাঁক নিলে আর একটু: নেশা একেবারে নেই সেটা বললেও মিথ্যে বলা হয়। আছে—মানুষ শিকারের নেশা। দশ গ্যালন কড়া হুইস্কি একসঙ্গে খেলেও নেশা হতে পারে না ওরকম—নিজের রসিকতায় এবার স্পষ্ট উচ্চারিত ধ্বনে হাসলেন ভদ্রলোক।

পুলিস অফিসারটি হেসে উঠল। কিন্তু হাসতে পারলেন না পাল সাহেব, মিসেস্ পালও নয়। মিসেস্ পাল থমথমে মুখে একটা ইংরেজী ফ্যাশান পত্রিকার পাতা ওল্‌টাতে লাগলেন, পাল সাহেব হীরের আংটি পরা মোটা মোটা আঙুল দিয়ে কতগুলো নকশা মক্‌সো করতে লাগলেন টেবিলের ওপর।

চৌধুরী ওদের মুখের উপর করুণার দৃষ্টি ফেললেন: কাজটা অত্যন্ত অপ্রিয় মিস্টার পাল। আপনার প্রেস্টিজ্ আর পোজিশনের কথাটা আমাদের ভালো করে জানা আছে বলে আমাকে ছুটে আসতে হল। এসব পোলিটিক্যাল্ ইন্ট্রিগে আপনি কোনোমতে জড়িয়ে না যান—সেইটে দেখাই আমার প্রধান কর্তব্য বলে মনে করি।

পাল সাহেব শুষ্কস্বরে বললেন, অনেক ধন্যবাদ।

মিসেস্ পাল কোনো কথা বললেন না, শুধু কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টি তুলে ধরলেন একবার।

পাল সাহেব বললেন, চিঠিটা এনেছেন আপনি?

—এই যে—পুলিস অফিসার পকেট থেকে বের করলে এন্‌ভেলপটা।

—দেখব?—পাল হাত বাড়ালেন।

—এক্সকিউজ্ মি—পুলিস অফিসার সরিয়ে নিলে খামখানা : এগুলো আমাদের ডকুমেণ্ট্—

—না হে, রহমান, দাও ওঁকে। ওঁরা আমাদের নিজেদের লোক—উই মাস্ট ডিল্ উইথ্ দেম ইন্ এ কোয়াইট্ ডিফারেণ্ট ম্যানার। দাও—দাও—

পাল সাহেবের মুখে রক্তের আভা পড়েছিল : না, না ; থাক।

—থাকবে কেন, দেখুন না—চৌধুরী নিজেই চিঠিটা এগিয়ে দিলেন।

পাল পড়লেন। তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে মিসেস্ পালও পড়ে নিলেন। না, কোনো সন্দেহ নেই। আর যাই হোক, এ চিঠি জাল নয়। স্বামী-স্ত্রীর মুখের ওপর মেঘের ছায়াটা ছড়িয়ে গেল আরো ঘন হয়ে।

নীচের ঠোঁটটাকে বার করে চিবিয়ে নিয়ে পাল সাহেব বললেন, এ চিঠি আপনি পেলেন কোথায় ?

চৌধুরীর বাঁকা ঠোঁটটি আবার বেঁকে গেল একটুখানি : তাতে অসুবিধে হয়নি। একেবারে হাতের মধ্যেই এসে পড়ল কিনা।

—কি রকম ?

—যার নামে চিঠি, সে অ্যাব্সকণ্ডার। কাজেই তার নামেই চিঠিপত্র সবই পোস্ট-আফিসে ইণ্টারসেপ্ট্ করা হয়। ওখানকার আই. বি. ডিপার্টমেণ্ট্ এটা আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। আর দেখতেই পাচ্ছেন—এভ্রিথিং ইজ এভিডেণ্ট্—সো ক্লিয়ার !

—হুঁ !

চৌধুরী টেবিলের ওপর থেকে পাল সাহেবের সোনার সিগারেট কেসটা তুলে নিলেন। তারপর মনোযোগ দিয়ে তার এন্গ্রেভিং লক্ষ্য করতে করতে বললেন, তা ছাড়া ডিটেল্ড্ রিপোর্টও পেয়েছি। মেয়েটি আগে থেকেই সাস্পেক্ট। বীণা মিত্র নামে আর একটি ডেঞ্জারাস্ এলিমেণ্টের সঙ্গে বেশি মাখামাখির জন্যে বরাবরই নজর ছিল ওর ওপর। তারপর ট্রেস করে দেখা যায় সন্দেহ অমূলক নয়। ফলে অবস্থা চরমে ওঠে এবং অ্যাট্লাস্ট শি ওয়াজ র‍্যাদার কম্পেল্ড্ টু টেক ট্রান্সফার সার্টিফিকেট্ ফ্রম হার ইন্স্টিট্যুশন।

—কই, তা তো কিছু জানতাম না—পাল সাহেব চমকে উঠলেন : ওর বাবা তো সে সব কিছু আমাকে জানাননি। শুধু বললেন, মেয়েটার শরীর ওখানে ভালো টিঁকছে না। বড় ম্যালেরিয়ায় ভুগছে—

—হোয়াট্ এল্স ডু ইউ এক্সপেক্ট্ অফ্ হিম ?—সত্যি কথা বললে আপনি কি আর অ্যাকোমোডেট্ করতেন ?

—কী অন্যায় ! এভাবে ঠকানোর মানে কী ? আমরা তো ভালো লোক বলেই

জানতাম। এখন দেখছি—বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম করে নিজেকে সামলে নিলেন মিসেস্ পাল। রাগে মুখ রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে, সুদাম এখন সামনে থাকলে কাণ্ড ঘটে যেতো একটা।

চৌধুরী বললেন, সে যাক, ওটা আপনাদের পারিবারিক কথা। ইউ আর টু সেট্‌ল অ্যামং ইয়োরসেলভ্‌স। কিন্তু আমার যা বলবার আছে আমি জানিয়ে যাই। আর কারো ব্যাপার হলে এক্ষুনি আমি অ্যারেস্ট করতাম—কারণ দে আর ওয়ার্স এনিমি এভ্‌ন দ্যান দা টেরোরিস্ট্‌স। কিন্তু আপনি জড়িত আছেন বলেই আমি একটা চান্স দিতে চাই। মেয়েটিকে ডেকে আপনি ওয়ার্নিং দিয়ে দিন।

—ওয়ার্নিং! এক মুহূর্ত আর ও মেয়ে বাড়িতে রাখব না: মিসেস পাল প্রায় কেঁদে ফেললেন: উঃ, একটু হলেই আমার সর্বনাশ করত!

—সেটা আপনাদের পারিবারিক ব্যাপার—চৌধুরী আবার বললেন, ও আপনারাই ডিসাইড্‌ করবেন। শুধু আমার যা জানাবার জানিয়ে যাই। স্টিল দেয়ার ইজ টাইম। মেয়েটিকে ভালো করে বুঝিয়ে দিন। যদি এসব ছেড়ে দেয়—সি ইজ্‌ অল ও-কে। আর তা যদি না হয়—উই কান্ট্‌ সেভ্‌ হার এভ্‌রি টাইম।

—ঠিক কথা—বিবর্ণ মুখে মাথা নাড়লেন পাল সাহেব।

—তা হলে আমরা উঠি আজ: চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন: চলো হে রহমান।

—অনেক কষ্ট করেছেন আপনি, অশেষ ধন্যবাদ—পাল সাহেব কৃতজ্ঞতা জানাতে চেষ্টা করলেন।

—না, এ কিছু না, মিয়ার ডিউটি—বাঁকা ঠোঁটের কোণে আর একটু বাঁকা হাসি হেসে বিদায় নিলেন চৌধুরী। পেছনে পেছনে রহমান।

* * * *

বাড়িতে একটা তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেল এর কিছুক্ষণ পরেই।

মিসেস্ পাল সিংহীর মতো গর্জন করতে লাগলেন।

—কী দরকার ছিল মিথ্যে কথা বলবার? এমন করে একটা বিপজ্জনক মেয়েকে আমাদের ঘাড়ে গছিয়ে দেবার কী মানে হয়?

অলকা নিথর হয়ে বসে রইল। ভূপেনদাকে লেখা সেই চিঠি। তাই থেকেই তুফান উঠেছে চায়ের পেয়ালায়। বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে পাল সাহেবের নিরুদ্বিগ্ন নিশ্চিন্ত সংসারে।

পাল সাহেব বললেন, দিজ্‌ ভিলেজ্‌ পিপল আর অকেসনালি সো ডেঞ্জারাস্।

মিসেস্ পালের চোখে আগুন জ্বলতে লাগল।

—কেমন হল এবার? আমি তো তখনি বলেছিলুম যে যাকে-তাকে বাড়িতে এভাবে অ্যাকোমোডেট কোরো না, নানারকম ঝামেলা বাধতে পারে। বেশ হয়েছে এখন। হ্যাভ

ইয়োর প্রপার লেশন নাউ।

অপমানে সর্বাঙ্গ অলকার যেন জ্বলে যেতে লাগল। লাজুক, গ্রামের মেয়েটি হঠাৎ দীপ্ত চোখ মেলে সোজা উঠে দাঁড়ালো।

—আপনাদের আমার জন্যে এত দুশ্চিন্তা করতে হবে না মেসোমশাই। আমি চলে যাবো এখান থেকে।

—চলে যাবে এখান থেকে?—পাল সাহেবের পাইপটা পর্যন্ত বুঝি আড়ষ্ট হয়ে গেল: চলে যাবে মানে? হোয়াট ডু মীন?

—আমি এখানে থেকে আপনাদের বিব্রত করবার তো কোনো মানে হয় না।—নির্ভীক নিঃসংশয় শোনালো অলকার স্বর।

—কোথায় যাবে?—মিসেস্ পাল চশমার মধ্য দিয়ে বিকট চোখে তাকালেন।

—একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই—অলকা বললে।

—বেশ, তাই ভালো।—রুদ্রকণ্ঠে মিসেস্ পাল বললেন, কিন্তু তোমার বাবা তোমার ভার আমাদের ওপর দিয়ে গেছেন। তার কী হবে?

—সে দায়িত্বও আমি নিচ্ছি—ঝোঁকের মাথায় বললে অলকা। ঝড়ের মতো বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

নিজের ঘরে ঢুকে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে। এ কী করল জেদের ওপর? কোথায় যাবে সে? এই মহাসমুদ্রের মতো মহানগরীতে কোন্ দ্বীপখণ্ড তার চেনা, যেখানে গিয়ে আশ্রয় সে খুঁজে নিতে পারে?

অথচ এরপরে আর থাকা চলে না। এ না করলেও থাকা চলত না। পাল সাহেবের মতো বিশ্বস্ত রাজভক্তের বাড়িতে আর স্থান নেই তার। বাবার আসার জন্যে দুদিন হয়তো ওঁরা সময় দিতেন। কিন্তু সেই দুদিন? সেই দুদিনের দুঃস্বপ্নও কল্পনা করা চলে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল পথে বেরিয়ে পড়বে, তারপর রাস্তায় লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে কোনো হস্টেল কিংবা বোর্ডিংয়ের খোঁজ। এই সমুদ্রে সবাই তো আর বাঘ-ভালুক নয়। দু-একটা ভেলারও সন্ধান মিলে যেতে পারে হয়তো। যাই হোক, চেষ্টা একটা করতেই হবে।

ঠিক এই মুহূর্তে একজন হয়তো তার সব সমস্যার সহজ মীমাংসা করতে পারত একটা। সে নীতীশ—নীতুদা। কিন্তু অভিমানে আর তিক্ত একটা ব্যথার উচ্ছ্বাসে মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে গেল অলকার মন। তার ডাক শুনেও সেদিন শোনেনি নীতীশ, চিনেও চিনতে চায়নি। তবে তাই হোক। এবার তারও না চেনবার পালা।

তার চেয়ে পথই ভালো। আর আছে মহাসমুদ্র। সহস্র ফণায় মানুষের ঢেউ ভেঙে

পড়ছে উত্তাল দোলায় দোলায়। কূল না থাকুক, একটা তল অন্তত আছে তার। আর কিছু না হয়, তার জন্যেও প্রস্তুত অলকার মন।

দোরগোড়ায় কার যেন ছায়া পড়ল।

—কে?

সমর। এগিয়ে এল সামনে। ঋজু দৃষ্টি। বললে, আমি সব শুনেছি। চলুন এবার।

—কোথায়?

—ভয় নেই, আমার বাড়িতে।—সমর হাসল: সেখানে আমার মা আছেন। আপনার ভার তিনিই নিতে পারবেন।

অলকা অদ্ভুত ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সমরের দিকে।

—আমার জন্যে আপনার আত্মীয়দের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবেন আপনি?

—অনেক বেশি পাবার জন্যে এটুকু ক্ষতি হয়তো সইতে হয়—সমর বললে, বলুন, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?

দুজনের দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে মিশল কয়েক মুহূর্তের জন্য। যেন বুঝে নিতে চাইল, জেনে নিতে চাইল, নিতে চাইল বিশ্লেষণ করে। তারপর শান্ত সুনিশ্চিত গলায় অলকা বললে, চলুন!

৮

আর সেদিন নেই। সব কিছুতে ফাটল ধরেছে, চিড় খেয়েছে এখানে ওখানে। যেন একটা বিরাট ভূমিকম্প জীবনটাকে ধরে একটা ক্ষ্যাপার মতো নাড়াচাড়া দিয়ে গেছে হিংস্র উল্লাসের সঙ্গে।

নীতীশ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে যতীশ আর মল্লিকা এতকাল একটা চোরাবালির ওপর পা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এতক্ষণে সেই বালিটা সরতে আরম্ভ করেছে একটু একটু করে। তার তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা অতলান্ত কালো গহ্বর। নিজের অবস্থা দেখে ভয়ে শিউরে উঠল মল্লিকা।

যতীশ বললেন, বউমা, পূজা-অর্চনায় আর সে মন নেই তোমার।

মল্লিকা উত্তর দিল না।

—দিনরাত তুমি আজকাল বড় বেশি অন্যমনস্ক থাকো—আবার ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললেন যতীশ। এবারও উত্তর দিল না মল্লিকা। দেবে না যতীশ জানতেন; জানতেন, সুর কেটে গেছে—আর তা জোড়া লাগবার সম্ভাবনা নেই। নীতীশ চলে গেছে, কিন্তু যাবার আগে একটা ধূমকেতুর মতো সমস্ত দিয়ে গেছে ওলটপালট করে!

—এবার তা হলে বৃন্দাবন যাওয়ার কথাটা ভেবে দেখতে হয়—শেষ চেষ্টা করে প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি ফেললেন যতীশ : আর এখানে মায়া বাড়িয়ে লাভ কী?

তবু উত্তর নেই। যেন পাথর হয়ে গেছে মল্লিকা। যেন তন্ময় হয়ে গেছে ভাবাবিষ্টা শ্রীরাধার মতো—মথুরানাথের ধ্যানে অসাড় নিশ্চেতন হয়ে গেছে তার সমস্ত চিত্তবৃত্তি।

কিন্তু যতীশ এও জানেন যে এ ধ্যান দেবতার উদ্দেশ্যে নয়, কোনো ভাব-গভীর আত্মমগ্নতাও নেই এর ভেতরে; এ নিছক মানবিক, এ দুর্বলতা নিতান্তই রক্তমাংসের। স্বামী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ভাবান্তর ঘটেছে মল্লিকার।

তবু চেষ্টার ত্রুটি করতে নেই। সত্যি এর কোনো মানে হয় না, মল্লিকা দেবদাসী, নীতীশ যখন নিজে থেকেই সরে গেছে তখন আর প্রশ্রয় দেবার দরকার নেই এসব চিত্তবিকারের।

যতীশ নানাভাবে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন। একবার, দুবার, চারবার। একদিন, দুদিন; তারপর দিনের পর দিন।

কোনো কথা যেন শুনেও শোনে না—যেন বুঝেও পরিষ্কার বুঝতে পারে না মল্লিকা। মাঝে মাঝে তাকায়—তার ভাষাহীন নিষ্প্রভ চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন চমক লাগে যতীশের—মনে হয় যেন আকস্মিকভাবে খানিকটা বরফ স্পর্শ করে ফেলেছেন তিনি। সব সহ্য হয়—ওরকম মৃত দৃষ্টিকে সহ্য করা যায় না।

—একটু চৈতন্যভাগবত পড়ো বউমা, মনটা ভালো থাকবে—একটা অযাচিত উপদেশ দিয়ে পলাতকের মতো সামনে থেকে সরে যেতে চান যতীশ ঘোষ।

কিন্তু কী আছে চৈতন্যভাগবতের পাতায়? কোন্ সান্ত্বনা, কতটুকু আশ্বাস? একটা অসহায় আক্রোশে যেন নিজের হাতটাকে কামড়ে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করে মল্লিকার। হঠাৎ মনে হয় তার সারা শরীরের রক্তটা জ্বলছে—সর্বাঙ্গের সমস্ত শিরাগুলো রাশি রাশি অগ্নিরজ্জুর মতো তাকে বেঁধে ফেলছে একটা আগ্নেয় বন্ধনে। তার দেহের ভেতরে যে অগ্নিপতঙ্গ বাসা বেঁধেছে, প্রতি মুহূর্তে সে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে, তাকে একেবারে ছাই করে না দিয়ে তার নিষ্কৃতি নেই বুঝি।

জানালার গরাদে মাথা দিয়ে সে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

বুঝেছে সে। সন্দেহের আর লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই কোথাও। তার পক্ষে এই অভিজ্ঞতা প্রথম বটে, কিন্তু জানে সব, শুনেছে সব কথাই। এর মধ্যে আর ভুল নেই। প্রথম টের পাবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরে মনে এই তীব্র জ্বালা ধরেছে তার—নিজের ভেতরকার এই মর্মান্তিক দাহনকে সে আর বইতে পারছে না। এ তার পরাজয়, তার দুর্বলতার সাক্ষী। তার স্বর্গচ্যুতির নির্দেশপত্র।

এইখানেই শেষ নয়। শৃঙ্খল। চলতে চলতে পায়ে বাজবে। নিজের জীবনের কত

মূল্যবান মুহূর্ত, তার ভাবতন্ময়তার কত দুর্লভ অবকাশ, তার ব্রতচর্যার কত অখণ্ড অবসর—সব কিছুকে এর কাছে বলি দিতে হবে। সর্বগ্রাসী একটা দাবি নিয়ে সে আসবে, একবিন্দু অনাদর তার সইবে না, কণামাত্র অশ্রদ্ধাও না। ষোলো আনায় তার পাওনা সে মিটিয়ে নেবে। ছিনিয়ে নেবে—কেড়ে নেবে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে তাকে ফিরিয়ে দেবার মতো শক্তি অর্জন করেনি কেউ।

তার রাধাগোবিন্দ ? তার সোনার গৌরাঙ্গ ? তার সেবা ?

সব কিছুর পরিণামই যেন অমোঘভাবে চোখের সম্মুখে ফুটে উঠেছে মল্লিকার। সে ফুরিয়ে গেল—সে মিথ্যে হয়ে গেল। ফুটো করা একটা টাকার মতো মুহূর্তে ষোলো আনা থেকে পরিণত হয়ে গেল কানা-কড়িতে। সোনার গৌরাঙ্গের চোখে আজ তার প্রতি অসীম ঘৃণা—অপরিসীম অসন্তোষ। এর চাইতেও মৃত্যুও হয়তো ছিল ভালো, অনেক সম্মানের—অনেক গৌরবের।

কিন্তু না—না।

সমস্ত শরীর মল্লিকার ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল দুর্বার একটা দুঃসহ উত্তেজনার চকিত আক্রমণে। মাথার ভেতরে একঝলক রক্ত প্রচণ্ড বেগে আছড়ে পড়ল একটা বিশাল সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো। লোহার গরাদ শক্ত করে চেপে ধরল মল্লিকা। মনে হল তার চারপাশে সব কিছু যেন পাক খাচ্ছে—এখুনি হয়তো সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে মাটিতে।

না—না। সে পারবে না। মরবার জন্যে প্রস্তুত নয় সে। সে পথ তো খোলাই আছে তার, এমন কী কঠিন কাজ আত্মহত্যা করাটা ? কাপড়ে এক বোতল কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিলে কতক্ষণ সময় লাগবে নিজের পালাটা মিটিয়ে দিতে ?

তবু তা পারবে না মল্লিকা। তার ভেতরে যে সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তারই জন্য সে পারবে না। নীতীশ যেদিন রাত্রে তাকে বুকের ভেতরে টেনে নিয়েছিল সেদিন হয়তো তা একেবারে অসম্ভব ছিল না ; কিন্তু যেদিন থেকে সে নিজে বুঝতে পেরেছে, সেই মুহূর্ত থেকেই আত্মধিক্কার, গ্লানি আর বেদনাকে ছাপিয়ে একটা আশ্চর্য আনন্দে ভরে গেছে মন ; অনাস্বাদিত প্রত্যাশার একটা অপরূপ পদ-সঞ্চার তার সমগ্র চেতনাকে তুলেছে রোমাঞ্চিত করে। হঠাৎ চোখ বুজে যেন নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ নিজেই শুনতে পেয়েছে সে ; মনে হয়েছে—ও শব্দটা আর কিছুই নয়, কোনো এক নবীন আগন্তুকের বিস্ময়-বিচিত্র পদধ্বনি।

জানে না, সে নিজেই কখন থেকে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। জানে না কখন তার পরাজয়কেই মনে হয়েছে জয়ের রাজটীকা ; অনুভব করেছে তার সমস্ত ফাঁকা যেন ভরে উঠল যেখানে যতটুকু ব্যর্থতা আর শূন্যতা ছিল তার। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নিজের স্বপ্ন দিয়ে, আশা দিয়ে আর কণায় কণায় রক্ত দিয়ে সে গড়ে তুলতে শুরু করেছে একটা আশ্চর্য

নতুনকে। সোনার গৌরাঙ্গকে হারিয়ে তার যে ক্ষতি, মনে হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে তার অনেকখানিই পূরণ হয়ে যাবে, সে নিজে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে আর একটা নতুন মূল্যবোধে।

না, না, কিছুতেই পারবে না মল্লিকা। নিজের জন্য না হোক, এর জন্যেই তার বাঁচবার প্রয়োজন। এর জন্যেই তাকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে; আজ যাকে চরম দুর্বিপাক বলে মনে হচ্ছে, তার ভেতরে একটা পরম সত্য মূল্য কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা সে কথাও তো স্পষ্ট করে জানা নেই মল্লিকার।

জানালার গরাদ ধরে সে তাকিয়ে রইল। দুপুরের রোদে বাইরের পৃথিবীটা যেন সর্বাঙ্গে উজ্জ্বল ওড়না জড়িয়ে বসে আছে। ঘুঘুর ডাক উঠছে সামনের আমবাগান থেকে। কত সুখী, কত পরিতৃপ্ত পাখিগুলি। নিজেদের মধ্যেই যেন সারাক্ষণ তন্ময় হয়ে আছে—কোথাও দুঃখ নেই—সমস্যার লেশমাত্র নেই কোথাও। শুধু মানুষের জীবনই সীমাহীন জটিলতা দিয়ে ঘেরা—উত্তরবিহীন অগণিত কূটপ্রশ্নে নির্মমভাবে কণ্টকিত। প্রতি মুহূর্তে সেই কাঁটা তাদের লক্ষ লক্ষ সূচিমুখ তুলে আঘাত করে, বিদ্ধ করে, রক্তাক্ত করে। পাখির মতো জীবন কেন হয় না মানুষের? কেন তার বাধে?

প্রশ্নটা মনে উঠতেই হঠাৎ মল্লিকার চোখ চকিত হয়ে উঠল। আর একটা নতুন—পরম কৌতূহলোদ্দীপক জিনিস তার চোখে পড়েছে।

এদিকের আমগাছটায় একটা শালিকের বাসা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে একটা কাক উড়ে বসল সেখানে। পরক্ষণেই অন্ধ হিংস্র উল্লাসে কাকটা একটা পৈশাচিক কাজ আরম্ভ করে দিলে। তীক্ষ্ণ ঠোঁটের আঘাতে শালিকের ডিমগুলো ঠুকরে ঠুকরে খেতে আরম্ভ করল সে—নীলাভ ডিমের কুচি আর আঠার মতো শ্বেতসার তার কালো ঠোঁটের সঙ্গে জড়িয়ে গেল।

অসহায় আর্তনাদের সঙ্গে উড়ে এল মা-শালিক। করুণ কান্নার সঙ্গে কাকের মাথায় ঠোকর দিয়ে দিয়ে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল তাকে। কিন্তু পারল না। তার আগেই উন্মত্ত জিঘাংসায় কাক তার কাজ শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। ধ্বংসের যেটুকু বাকি ছিল ঠোঁটের ঘা দিয়ে দিয়ে ধীরেসুস্থে সেটুকুও সারা করল, তারপর কর্কশ কণ্ঠে একটা জয়ধ্বনি তুলে কালো কালো দুটো কদাকার ডানা মেলল আকাশে।

বুকের ভেতরটা পুড়ে যেতে লাগল মল্লিকার। হু-হু করে একটা কান্নার বেগ যেন ঠেলে উঠতে চাইল। মনে হল যেন তারও নীড়ের ওপর কেউ ওইরকম দুটো কালো কালো বিপুল ডানার ছায়া ফেলেছে। কে সে? যতীশ? মল্লিকা কেঁপে উঠল।

—বৌমা?—যতীশ ডাকছেন।

দূরে থেকে ওই কাকটার কঠোর কর্কশ কণ্ঠ কি শোনা যাচ্ছে এখনো?

—বৌমা—যতীশ আবার ডাকলেন।

নিজের মনকে স্থির করে নিলে মল্লিকা। আত্মগোপনের চেষ্টা করে লাভ নেই আর। এবার যতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে সোজা, সরল, স্পষ্ট কণ্ঠেই আত্মঘোষণা করতে হবে তাকে। জানাতে হবে একটা দৈবী-মহিমার ইন্দ্রজালে বন্দিনী একজন দেবদাসী মাত্রই সে নয়, তার ভেতরে নতুন সম্ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছে আজ—আজ নতুন হয়ে আত্ম-প্রকাশ করতে চলেছে সে।

সাড়া দিয়ে যতীশের ঘরের দিকে এগোল মল্লিকা।

'নির্মল সে অনুরাগে, না লুকায় অন্যদাগে
শুক্ল বস্ত্রে যেসে মসীবিন্দু—'

পড়ছিলেন যতীশ ঘোষ। বই বন্ধ করলেন ঘরে মল্লিকাকে ঢুকতে দেখে। তারপর একটা বিস্তৃত আলোচনা আরম্ভ করবেন এমনি ভঙ্গিতে চশমাটাকে খাপে মুড়তে মুড়তে বললেন, কী ঠিক করলে ?

—কিসের কথা বলছেন বাবা ?—সোজা জিজ্ঞাসা করলে মল্লিকা।

তার স্বরের স্পষ্টতায় যতীশের ভ্রূদুটো কুঁচকে এল একটা প্রচ্ছন্ন বিরক্তিতে। টের পেলেন কোথায় একটুখানি দুর্বিনয় ঘনিয়ে আছে মল্লিকার ভেতরে।

—বৃন্দাবনে যাবার ?

এক মুহূর্তের জন্যে নীরব রইল মল্লিকা, কিন্তু আর তো সময় নেই। আত্মপ্রকাশ তাকে করতেই হবে। এই সুযোগে, এই মুহূর্তেই।

—আমার পক্ষে কি এখন বৃন্দাবন যাওয়াটা ঠিক হবে বাবা ?

—ঠিক-বেঠিকের কী আছে ?—মেঘটা আরো ঘন হয়ে এল যতীশের মুখের ওপর : আমার সুযোগ হলে তোমারও সুযোগ হবে নিশ্চয়।

—না বাবা, তা নয়।

—নয় ?—যতীশ যেন চাবুক খেলেন : কেন ?

মল্লিকা নিরুত্তর হয়ে রইল।

বিরক্তি গোপন না রেখেই যতীশ বললেন, নয় কেন ? তোমার আপত্তিটা কোথায় ? স্পষ্ট করে বলো বউমা, কী তুমি বলতে চাও ?

বলবার আগে কে যেন মল্লিকার গলা টিপে ধরতে চাইল, পুঞ্জীভূত লজ্জায় পা দুটো তলিয়ে যেতে চাইল মাটির নীচে। তবু সময় নেই, উপায় নেই সংকোচের। ধীরে ধীরে চোখ তুলে মল্লিকা মৃদু অথচ উজ্জ্বল স্বরে বললে, আমার যে নতুন বন্ধন এসে গেছে বাবা, আপনার নাতি আসছে।

—কী বললে ?—যতীশ অদ্ভুত একটা আওয়াজ করলেন। নাতি হওয়ার আনন্দে নয়, পথ চলতে চলতে অসতর্ক পথিকের মাথার ওপর পেছন থেকে একটা ধারালো দায়ের

চোট পড়লে যেমন হয় তেমনি।

মল্লিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অভিভূতের মতো যতীশ বসে রইলেন।

এরই এক সপ্তাহ পরে যতীশ সুতাহাটিতে বামদেব ঘোষের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেলেন। বামদেবের বিধবা বোন যতীশকে পরিবেশন করল। মধ্যবয়সী মেয়েটি। রসকলি আঁকা মুখ, মধ্যযৌবনের পূর্ণতাভরা গোলগাল চেহারা, কথায় কথায় উচ্ছ্বসিত আর উচ্চকিত হয়ে হাসবার ভঙ্গিটা বড় ভালো লাগল যতীশের। নিজের অজ্ঞাতেই কখন যে তিনি একবাটি ক্ষীর খেয়ে ফেললেন, টেরও পেলেন না।

খাওয়ার পরে বললেন, তোমার বোনটি কিন্তু বেশ বামদেব।

—হ্যাঁ, মেয়েটা ভালো।—বামদেব কী ভাবছিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, ভাবছি ওর আবার বিয়ে দেওয়াব কণ্ঠী বদল করে।

—সেটা মন্দ কথা নয়—যতীশ বললেন। মেয়েটির হাসিমুখখানা ঘুরে ঘুরে তাঁর মনের কাছে ধরা দিতে লাগল, বার বার মনে পড়তে লাগল পরিবেশন করবার সময় তার সুগোল হাতের সেই লীলায়িত ছন্দটি।

—হরে কৃষ্ণ—যতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা।

৯

সমর ঘোষ ভায়োলিন বাজাচ্ছিল।

বাইরে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়ে থেমেছে এইমাত্র। মেঘে আকাশ এখনো অন্ধকার —তাই বিকেল ঘন হয়ে আসবার আগেই সন্ধ্যা নেমেছে; পাশেই কোনো বাড়ির ছাতে জমা জলগুলি মুক্তি পেয়েছে এতক্ষণ পরে—ঝর ঝর করে সশব্দে ঝরে পড়েছে নীচে। অকাল সন্ধ্যার বুকে শব্দটা যেন বিষণ্ণতার মতো ধ্বনিত হচ্ছে।

সমরের মা নীচে গেছেন খাবার তৈরি করে আনতে। রাশভারী চেহারার গম্ভীর-মূর্তি মহিলা। স্নিগ্ধ দৃষ্টির আলোয় মুহূর্তের মধ্যে যেন চিনে নিলেন অলকাকে, জেনে নিলেন।

তারপর বললেন, বেশ মা, ভালোই করেছ। ওদের বাড়িতে থাকা তোমার মতো মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। এখন এখানেই কিছুদিন থাকো তা হলে। আমরা তো তোমার পর নই—একটুখানি আত্মীয়তাও তো রয়েছে। তোমার বাবাকেও একখানা চিঠি লিখে দাও—তিনি আসুন, তারপর যা ভালো মনে হয় করবেন।

বেশ লাগল ভদ্রমহিলাকে। সমরের সাহেবীয়ানা যত উগ্রই হোক, তার মাকে চিনতে পারা যায়। সে মা বাংলা দেশের নিজস্ব—মিসেস্ পালের মতো একটা অজানা

পৃথিবী থেকে কড়া পাউডার আর চড়া প্রসাধনের ঝাঁঝ ছড়িয়ে নেমে আসেনি। কাছে যেতে ভয় করে না, কেমন একটা আশ্বাস পাওয়া যায় বরং।

মা নীচে নেমে গেছেন। হঠাৎ যেন মনে হল আত্মরক্ষার কবাটটা খুলে গেছে অলকার। এ সমরের ঘর—যেখানে সমর ছাড়া আর কেউ নেই। অকাল-সন্ধ্যাকে আরো বিচিত্র করে তুলেছে নীল বাল্‌বের একটা মৃদু আলো—দেওয়ালের অদ্ভুত সমস্ত ছবিগুলো কোন্ রহস্য-রণিত সুদূরতায় গেছে হারিয়ে। কোণের একটা শাদা টিপয়ের ওপর ব্রোঞ্জের ছোট মূর্তিটা যেন ধ্যানমগ্ন। মাথার ওপর ঘুরন্ত পাখাটার ছায়া ঘরের মধ্যে একটা অদৃশ্য-প্রায় ঢেউয়ের মতো কেঁপে কেঁপে ফিরছে।

অলকা চুপ করে বসে ছিল। একটু দূরেই উঁচু টেবিলের ওপর কনুই রেখে সমর দাঁড়িয়ে লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরালো একটা। ক্ষণিকের একটা আলোক-জিহ্বা দুলে গেল রূপালি কেস্‌টার উজ্জ্বল শিয়রে—সেই আলো লেগে কেমন নতুন দেখালো সমর ঘোষকে। তার কপালটা বড় বেশি প্রশস্ত, তার চোখ দুটো বড় বেশি জ্যোতির্ময়। হঠাৎ ভয় করল অলকার। মনে পড়ল ঘন সবুজ পদ্মপাতার বনে একবার একটা কুণ্ডলি পাকানো চন্দ্রবোড়া সাপ দেখেছিল সে—আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়েছিল চিক্কন শ্যামলতার পটভূমিতে প্রচণ্ড বিষধরের সেই অপরূপ রঙের ছটা।

সমর কি তাই? সমরের মধ্যে কোথাও কি—

ছিঃ ছিঃ! কী অকৃতজ্ঞ সে! পরম বিপদের সময় যে তাকে আশ্রয় দিল, তার সম্বন্ধে এ সব সে কী ভাবছে!

সমরই কথা বলল প্রথমে।

—কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো আপনার?

—অসুবিধে! না—অলকা ম্লান হাসল : অসুবিধে হবে কেন! নিজে কত কষ্ট করে আমায় বাড়িতে নিয়ে এলেন ; কত যত্নআত্তি করছেন আমার, কষ্ট হতে যাবে কিসের জন্যে?

—সত্যি বলছেন?

—কী আশ্চর্য, মিথ্যে বলতে যাব কেন!

—কী জানি!—সমর গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা। পাশের সোফাটায় বসে পড়ে বললে, আপনাকে ঠিক আমি বুঝতে পারি না। প্রথমে মনে হয়েছিল, টু সিম্প্‌ল, টু ইজি। এখন মনে হচ্ছে যাকে দেখবামাত্র অত্যন্ত সোজা বলে ধারণা হয়, আসলে সে হয়তো একটা আন্‌সলিউব্‌ল রিড্‌ল।

অলকা কিছু বুঝতে পারল না। কিন্তু এটা অনুভব করল কথার মধ্যে কেমন যেন একটা রেশ সঞ্চারিত হয়েছে সমরের। যেন যেখানে সে থেমে যাচ্ছে, কথাটা সেইখানেই

থামছে না ; অর্থগূঢ় একটা ধ্বনির মধ্যে তা মিলিয়ে যাচ্ছে, কথার সীমানা ছাড়িয়ে অনুসরণ করছে কথাতীতকে। স্বরের সঙ্গে সুরের সঙ্গম ঘটছে তার প্রতিটি বাক্যের শেষে।

—কত এলোমেলো যে আপনি ভাবতে পারেন।—বিব্রত ভাবে বললে অলকা।

সমর সে কথার জবাব দিলে না। আঙুল বাড়িয়ে নির্দেশ করল সম্মুখের দেওয়ালে একখানা অভিনব ছবির দিকে। উজ্জ্বল রঙে টানা কতকগুলো এলোমেলো রেখা। ছবিটা গোড়াতেই অলকার চোখে পড়েছিল ; কিন্তু কোনো মানে বুঝতে পারেনি।

সমর বললে, ওই ছবিটা দেখেছেন ?

—দেখেছি।

—কার আঁকা, জানেন ?

—না। অলকা মাথা নাড়ল।

—খুব নামকরা শিল্পীর ছবির রিপ্রোডাকশন ওটা—পিকাসোর। দেখুন কত সহজ ওই রেখাগুলো—যেন একটা চাইল্ডিশ সিম্প্লিসিটি। হঠাৎ মনে হয় কত সোজা কাজ—যে কোনো ছেলেমানুষের হাতে একটা তুলি আর রঙের বাটি পেলে ওই ছবি আঁকতে পারে। অথচ কী জটিল ওর চিন্তা—আধুনিক জীবনের কী ভয়ঙ্কর ট্র্যাজেডি রূপ পেয়েছে ওতে, জীবনের একটা আদিতত্ত্ব যেন ব্যাখ্যা করা হয়েছে ওখানে।

নিঃশব্দে অলকা শুনে যেতে লাগল।

—ওই ছবির মতোই আপনাকে মনে হয় আমার। এত সহজ, তবু আপনি এত দুর্বোধ্য। বয়েসে আপনি ছেলেমানুষ, কিন্তু এমন আশ্চর্য চোখ আমি আর দেখিনি। দ্য ডেপ্থ অব এ মিস্টিরিয়াস্ ব্লু ল্যাগুন।—কথা শেষ করে সমর খানিকক্ষণ হাতের সিগারেটের জলন্ত মাথাটার দিকে তাকিয়ে রইল : আপনাকে বলেছিলাম আমার ভায়োলিনের কথা। শুনবেন ?

—বেশ তো, বাজান না।—নিরুৎসুক গলায় অলকা বললে, ভালোই তো।

—হ্যাঁ—ভালো বইকি।

সমরের এই অর্থহীন কথার জাল বুনে চলার চাইতে ঢের ভালো। মানে বোঝা যায় না, অথচ অস্থিরতা স্নায়ুকে পীড়ন করে চলে। যেন ঝড় আসবার আগে হঠাৎ থম্থমে হয়ে আসা পৃথিবী ; বাতাস একখণ্ড বরফের মতো জমাট বেঁধে গেছে, নিশ্বাস টানতেও কষ্ট হয় যেন।

তার চেয়ে ঢের ভালো ভায়োলিন। একটা সুরের ঝড়। সমস্ত গুমোট আড়ষ্টতাকে চুরমার করে দেবার মুক্তি। হৃৎপিণ্ডটাকে পরিপূর্ণভাবে ভরে নেবার জন্যে খানিকটা দুরন্ত প্রচণ্ড বাতাস।

—বাজান আপনি।

কেস্ থেকে ভায়োলিন বার করে তাতে ছড়ের প্রখর টান দিলে সমর। একটা আর্ত কান্নার মতো তার শব্দটা ভেঙে পড়ল ঘরের মধ্যে। তেমনি আশ্চর্য প্রশস্ত ললাটে আর অদ্ভুত জ্যোতির্ময় চোখে অলকার দিকে তাকালো সমর।

তারপরে ঝড়।

সুরের ঝড় এল। মুহূর্তে ভেঙে-চুরে তছনছ করে দিয়ে গেল সব। মিলিয়ে গেল চোখের সামনেকার সব কিছু আবরণ, চারদিকের বাধার স্তূপ। পাথরের দেওয়ালটা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে গিয়ে একটা অবারিত অসীম আকাশকে জায়গা করে দিল সেখানে।

সেখানে ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি করে সুরের বিদ্যুৎ কাঁপে। মহাব্যোমের আদি-অন্তহীন ইথার-সমুদ্রে সৃষ্টির শাশ্বত রাগিণী তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। বজ্রের আলোয় যেন উন্মীলিত হয় একটির পর একটি অগ্নিশতদল। হু-হু করে ঝড় ভেঙে পড়ে—সেই সমুদ্রে তুফান জাগিয়ে, প্রচণ্ড গতির উল্লাসে গীতপদ্মের দলগুলিকে ছিন্নদীর্ণ করে ঝড় বয়ে যায়—প্রাণকেও সেই উন্মত্ত আবেগের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে যায় শুকনো একটি তৃণখণ্ডের মতো।

কিন্তু শুধু কি সুরের সমুদ্রেই ?

সমরের ভায়োলিনে কোথা থেকে বিদেশী সঙ্গীতের মূর্ছনা ভেঙে পড়ে। সে গানের কিছুই জানে না অলকা—তবু আপনা থেকেই একটা অপরূপ রূপলোক যেন তার মনের সামনে উদ্ঘাটিত হয়—উন্মোচিত হয়, আশ্চর্য কোন্ এক মতিমহলের রুদ্ধ দ্বার। চোখে স্বপ্ন নেমে আসে।···নীল—গাঢ় নীল এক সমুদ্র। ঢেউ উঠছে সেখানে—তুফান জেগেছে। রাশি রাশি শ্বেতকরবীর মতো ফেনা উছলে উছলে পড়ছে। আর সেই ঢেউ এসে মাথা কুটছে সেখানে—যেখানে নারিকেল বনে হু-হু করে বাতাসের কান্না ; সেখানে ঢেউয়ের আঘাত-লাগা শিলাস্তরের ঊর্ধ্বে রাশি রাশি সমুদ্রপাখীর একটানা পাখার শব্দ। হঠাৎ যেন তারি মাঝখানে অদ্ভুত বেদনার একটা ছবি ভেসে আসে। যেন মর্মান্তিক যন্ত্রণা আর সইতে না পেরে কে একজন পাখির ডানার শব্দ, নারিকেল বীথির মর্মর আর সমুদ্রের কলগর্জনে ভরা সেই পাহাড়ের চূড়োর ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায় না তাকে. চিনতে পারা যায় না তার মুখ। শুধু মনে হয় তার কপালটা বড় বেশি প্রশস্ত, তার চোখ দুটো অসাধারণ জ্যোতির্ময় !

আর বিকেলের ম্লান আলোয় ভরা আকাশে, পাহাড়ের চূড়োয় দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে আছে সে ; তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে সেইখানে—যেখানে পাহাড়ের গায়ে ঢেউ ভেঙে পড়ার এক রাক্ষস গর্জন। কী ভাবছে সে ? কী তার সংকল্প ? সে কি আত্মহত্যা করবে ? ঝাঁপ দিয়ে পড়বে ওই সমুদ্রে ?

হঠাৎ ঝড় এল। সুরের ঝড়। ঝিক-মিক করে উঠল সুরের বিদ্যুৎ। প্রচণ্ড আঘাত

লেগে কোনো সেতারের তার যেমন আর্তরাগিণীতে ছিন্ন হয়ে যায়—তেমনি ভাবে হাহা-কার করে উঠল নারিকেল বন। গুরু গুরু মাদলের মতো ধ্বনি তুলল সমুদ্রের ফেনোদ্বেল তরঙ্গমালা।

হা হা করে একটা হাসির শব্দ আকাশ-পাতালকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দিল যেন! পাহাড়ের উপর যে দাঁড়িয়ে ছিল, ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে সে মত্ত ফেনতরঙ্গের মধ্যে,তার চূর্ণ-বিচূর্ণ দেহটা চক্ষের পলকে মিলিয়ে গেল।…

তীব্র তীক্ষ্ণ ঝঙ্কারের সঙ্গে ভায়োলিন থামল।

অলকা নিস্পন্দ হয়ে বসে ছিল। একটা সম্মোহন মন্ত্রের ইন্দ্রজাল কখন নেমেছে তার চারপাশে, একটা মাকড়সা যেন তাকে জড়িয়ে ফেলেছে নিজের সহস্রমুখ লূতাবন্ধনে। নিজের ওপর কোনো কর্তৃত্ব নেই তার—নড়বার ক্ষমতা পর্যন্ত যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

সমর উঠে এল নিজের সোফা থেকে। বড় বেশি কাছে এসে দাঁড়ালো। তার তপ্তশ্বাস লাগল অলকার কপালে। নীল বাল্‌বের আলোয় ঘরখানা অদ্ভুত রহস্যময়তায় ঘিরে রইল।

—অলকা?

সমর ডাকল। সবুজ পদ্মপাতার ওপর নড়েচড়ে উঠল চিত্র-বিচিত্র চন্দ্রবোড়াটা। হয়তো গ্রাসও করত। ক্লোরোফর্মের নেশাভরা অলকা হয়তো বিন্দুমাত্র বাধাও দিতে পারত না তার গ্রাসের মুখে। কিন্তু—

—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!

সুরের ঝড়কে উড়িয়ে দিলে জীবনের ঝড়। ভাববিলাসকে এক আঘাতে চূর্ণ চূর্ণ করে দিলে ক্ষুধিত বিক্ষুব্ধ মানুষের দুর্জয় শপথ।

—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—

রক্তে রক্তে অভ্যস্ত সাড়া। ঘুমন্ত ক্লোরোফর্মের মায়ার স্পর্শে অভিভূত অলকা জেগে উঠল নিজের স্বভাবধর্মে, আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্ত ভিত্তির ওপরে।

দ্রুত উঠে পড়ল সে। এসে রেলিং ধরে দাঁড়ালো বারান্দায়। তাকিয়ে দেখল নিচের শোভাযাত্রাটার দিকে। ক্ষুধার্ত বিদ্রোহী মানুষের দুর্দম অভিযান।

কিন্তু কে? কে ওদের মাঝখানে? মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ও কি নীতীশ নয়? ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে নীতীশও কি চলছে না পা ফেলে?

মুহূর্তে মুক্তিস্নান ঘটে গেল। সমস্ত গ্লানি, যা কিছু রোমাণ্টিক দুঃস্বপ্ন সব কিছু অতিক্রম করে গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালো অলকা। দাঁড়ালো মাথা সোজা করে।

—নীতুদা— চিৎকার করে সে ডাকল। তারপর তর্‌ তর্‌ করে ধরল সিঁড়ির পথ।

—কোথায় যাচ্ছ অলকা?—পথরোধ করে দাঁড়াতে চাইল সমর।

—প্রোসেশনে—

উত্তর পাওয়ার আগেই সমর দেখল পিকাসোর ছবি কখন জনতার সমগ্র জীবনের মধ্যে লীন হয়ে গেছে। মানুষের চোখে যে আগ্নেয় সূর্যতেজ, তার স্পর্শে সুরের সেই বহু-বর্ণিল কুয়াশা মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কোন্ অবাস্তবতার অলীক-লোকে।

১০

প্রচণ্ড একটা ঝড় থেমে গেল যেন।

রাত অনেক হয়ে গেছে, বাইরের পথে বিরাজ করছে একটা ঘনীভূত নিঃসীম স্তব্ধতা। এমন কি কলকাতার এই জনাকীর্ণ অঞ্চলেও যেন অদ্ভুত ভাবে মৌন হয়ে গেছে মানুষগুলো —শোনা যাচ্ছে না কোনো প্রগল্‌ভ বেতারযন্ত্রেও সুরে-বেসুরে একটানা শব্দশৃঙ্খল গেঁথে চলা।

দুজনের মনের ওপরেও সেই স্তব্ধতা যেন চেপে বসেছে পাষাণের ভারের মতো। বিদ্যুতের আলোয় শ্রীহীন ড্রয়িংরুমের বিবর্ণ ছবিগুলোকে ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া বাল্‌বটার জোর নেই—ধুলোর আস্তর পড়ে আলোটা হয়ে গেছে আরো দীপ্তিহীন। এলোমেলো পত্রপত্রিকাগুলো জানালা দিয়ে আসা বাতাসের ঝাপ্‌টায় উড়ছে অল্প অল্প—একটা বিচিত্র শব্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন কারা কোন্ নিঃশব্দ চক্রান্ত করে চলেছে ফিস্‌-ফিসে বর্ণহীন গলায়।

দুজনে মুখোমুখি নিথর হয়ে বসে আছে।

প্রথমে মুখ তুলল অলকাই। চোখের কোণায় মুক্তার বিন্দুর মতো জল টলটল করছে।

—খুব লেগেছিল বুঝি?

মাথার ব্যাণ্ডেজটার ওপর একবার মৃদুভাবে হাত বুলিয়ে নিলে নীতীশ। বললে, ডিপ উণ্ড্ নয়—সাত-আটদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে।

আঁচল তুলে অলকা চোখের জল মুছে ফেলল। আত্মগোপনের প্রয়োজন নেই আজ, উপায়ও নেই। যুক্তি দিয়ে, বিচার দিয়ে সমাজের আর নীতির কথা ভেবে যে মনকে বারণ করা যায়নি, আজ এই মুহূর্তে তাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখবার চেষ্টা বৃথা। এ প্রেমের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কোনো পূর্ণতা নেই। শুধু জ্বলবে, শুধু জ্বালিয়ে যাবে—

অলকা বললে, কষ্ট হচ্ছে?

অল্প হাসল নীতীশ, জবাব দিলে না।

কিন্তু না বললেও বোঝা গেল কপালে তার যন্ত্রণার বিসর্পিল রেখা ফুটে উঠেছে, থেকে থেকে কুঁচকে যাচ্ছে ঠোঁটের কোণা। বুকের মধ্যে একটা কী যেন ঠেলে উঠছে, বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে নিশ্বাস—কষ্ট হচ্ছে দস্তুরমতো। অলকার প্রবল একটা আগ্রহ জাগছে নীতীশের মাথাটা কোলের মধ্যে টেনে নিতে—কপালের উপর আঙুল বুলিয়ে পরম যত্ন আর একাগ্রতায় তার সমস্ত যন্ত্রণা মুছে দিতে।

কিন্তু উপায় নেই। মাঝখানে সমুদ্রের ব্যবধান। একটা অন্তহীন কালো সমুদ্র—যা পাড়ি দিয়ে পরস্পরের কাছে পৌঁছোনো যাবে না কোনোদিন। এই মুহূর্তে এত কাছাকাছি বসে আছে দুজনে, আজ থেকে চলবার পথও হয়তো এক হয়ে গেল, তবু এই ব্যবধান কোনোদিন দূর হবে না—, সত্য হয়ে থাকবে অবারিত আকাশের দিগন্ত সন্ধান, কিছু নীচে যেখানে সবুজ অরণ্যের হাতছানি, নীড় রচনার কোনো অবকাশ সেখানে মিলবে না কোনোদিন।

ঘরের ম্লান আলোতে পূর্ণদৃষ্টি মেলে অলকাকে দেখল নীতীশ। দেখল কয়েকটা সমাহিত স্তব্ধ মুহূর্তের অবকাশে।

—তুমিও কি সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠছ লোকা?

—না—ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ছোট আর একটা কথা উচ্চারণ করলে অলকা।

পকেটে হাত দিয়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া একটা সিগারেট বের করল নীতীশ, অগ্নিসংযোগ করলে তাতে।

—তোমারই জিত হল শেষ পর্যন্ত।

—কিসে?

—তোমাদেরই দলে নেমে এলাম। কতদূর চলতে পারব জানি না, হয়তো পার্থক্যও থেকে যাবে দৃষ্টিভঙ্গির। কিন্তু সেটা বড় নয়। লড়াই যখন শুরু হয়ে গেছে তখন ভবিষ্যৎ ভারতে শাসনতন্ত্র কী হবে, তা নিয়ে ভাবনা না করে পথে নেমে পড়াই সব চেয়ে বেশি দরকারী।

অলকা হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাসতে পারল না। সত্যি কথা, আজ তার সুখী হওয়ার দিন, আজ সত্যি-সত্যিই জয় হয়েছে তার। যাকে অকুণ্ঠ ভাবে সে শ্রদ্ধা করতে চায়, তার সম্পর্কে এতটুকু অবিশ্বাসের কালো ছায়াও মিলিয়ে গেছে মন থেকে। আজ নীতীশ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে তার কাছে, তার মনের প্রতিটি প্রান্তে প্রান্তে নিজেকে বিস্তীর্ণ করেছে সে—বিকীর্ণ করেছে, কোনোখানে একবিন্দুও ফাঁকি নেই আর। এখন সে তলিয়ে যেতে পারে, তদ্গত হয়ে যেতে পারে তার মধ্যে। আজ আর হৃদয়ের সঙ্গে জীবন-চিন্তার বিরোধ নেই, নিজেকে কোনো বিজাতীয়ের পায়ে সমর্পণ করে দেবার গ্লানিও সে কণামাত্র

অনুভব করছে না।

তবু দুর্বলতা যায় না। তবু মনটা যেন অবশ হয়ে পড়ে থাকে মৃদু একটা জ্বরের উত্তাপে। মাঝখানে দুলছে কালো সমুদ্র, কোনোদিন তা পাড়ি দেওয়া যাবে না, তা চিরদুস্তর হয়ে রইল। কাজের মধ্যে যে একান্ত করে কাছে আসবে, নিজের একান্ত মুহূর্তগুলোতে সে কেউ নয়। মনের সাদা পর্দাতে যদি এতটুকু ছায়াপাত ঘটে, তা হলে চোখ বুজে থাকতে হবে, নিজেকে নির্যাতন করতে হবে সব চাইতে নিষ্ঠুর শাসনের তাড়নায়।

কোনোদিন কথাগুলো বলা যাবে না। তুমি থাকবে, আমি থাকব। কিন্তু তুমি আমি এক হয়ে থাকব না কোনোদিন।

দেওয়ালের প্রেত-পাণ্ডুর ছবিগুলোর দিকে কিছুক্ষণ অর্থহীন ভাবে তাকিয়ে রইল অলকা। তারপর বললে, কী করবে এখন ?

—কাজ করব।

—কলকাতাতেই ?

—তাই ভাবছি।

—কেন, গ্রামে ফিরে যাবে না ?—অলকা সাগ্রহ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে রাখল নীতীশের মুখের ওপর : পথ খুঁজতে এসেছিলে, পেয়েছ। যে মহাসাগর থেকে বিপরীতমুখী জোয়ার আসবে মরা মহানন্দায়, তারও সন্ধান তো তোমার মিলেছে।

—তা মিলেছে—মাথা নীচু করে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল নীতীশ। লক্ষ্য করতে লাগল, টেবিলের তলায় একটুকরো জমাট অন্ধকারে ছাইয়ের কণাগুলো ক্ষণস্থায়ী আগুনের ফুলঝুরি হয়ে কী ভাবে ঝরে যাচ্ছে।

—গ্রামেই তো কাজ করতে চেয়েছিলে তুমি। বলেছিলে সে-ই তোমার সত্যিকারের কর্মক্ষেত্র—অলকার কণ্ঠস্বরের আগ্রহ যেন আকুলতায় রূপান্তরিত হয়ে উঠল।

এবার চোখ তুলল নীতীশ। ঠোঁটের কোণায় যন্ত্রণার্ত কুঞ্চনটাকে একটা ক্লিষ্ট হাসিতে পরিবর্তিত করে বললে, বুঝতে পারছ না ?

হয়তো বুঝতে পারছিল অলকা, তবু বললে, না।

—না কেন ? ভয় ?

—হয়তো তাই।—নীতীশের হাসি মিলিয়ে গিয়ে আবার ফুটে উঠল: ক্লিষ্ট কাতরতাটা।

—পারিবারিক জীবনে মিশ খেলো না বলেই তুমি নিজের দেশের কাছ থেকে পালাতে চাও ?

নীতীশ ক্লান্ত গলায় বললে, কথাটা রূঢ় শোনালো। তবু সত্যি। দুর্বলতা আমার

অনেক আছে লোকা, সমালোচনার উর্ধ্বে নই আমি। এও তার মধ্যে একটা।

—বৌদির সঙ্গে কি কিছুতেই নিজেকে আর খাপ খাইয়ে নিতে তুমি পারবে না?—নিজের একটা আঙুলকে পাথরে হাতুড়ি দিয়ে ঘা মারার মতো এই আত্মদাহী প্রশ্নটাকে অলকা সংবরণ করতে পারল না।

—আকাশের দেবতা আর মাটির মানুষের চলবার পথ কখনো এক হয় না লোকা—অত্যন্ত দুঃসহ যন্ত্রণাটাকেও নীতীশ বলতে চেষ্টা করল তরল ভঙ্গিতে। শুধু কপালের কুঞ্চিত রেখাগুলো আলোড়িত হয়ে উঠল আর একবার—আর একবার ঠোঁটের কোণায় যন্ত্রণার রেখাটা বয়ে গেল ঝিলিক দিয়ে।

আর একটা কথা নীতীশ বলতে পারবে না। অলকাকেও না। একখণ্ড অঙ্গারের মতো তা জ্বলতে থাকবে প্রতিটি শিরাসন্ধিতে, প্রতিটি মাংসপেশীতে। সেই রাত্রির ঘটনা। মল্লিকার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে ছিলেন যতীশ। তাতে অপরাধ ছিল না, অপরাধ ফুটে উঠেছিল দুজনের চোখে-মুখে—কয়েকটি মুহূর্তের মধ্য দিয়ে যেন সেই কল্লান্ত প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

নীতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার জল আসবার উপক্রম করছে অলকার চোখে। অথচ সেই সঙ্গে কেমন একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করছে সে—যেন কোথায় একটা শিকলের গিঁট আল্‌গা হয়ে গেছে তার।

—তা হলে কলকাতাতেই থাকবে?

—জানি না। যেখানে ডাক পড়বে সেইখানেই যেতে হবে। সেজন্য ভাবনা ছিল না, ও ভারটা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছি হিমাংশুর ওপরেই, তবে এটা ঠিক যে যোধপুরে আর নয়।

—ওঃ—অলকা সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে।

—আর তুমি?—কৌতূহলহীন গলায় জানতে চাইল নীতীশ।

—আমার খবর তো সবই বলেছি। যে পুলিস মালদায় থাকতে দিল না, কলকাতাতেও থাকতে দেবে না। কাজেই এখান থেকেও ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে হবে।

—কোথাও থাকবার ব্যবস্থা করা যায় না কি? কোনো মেসে হস্টেলে?

—হয়তো যায়। কিন্তু তার দরকার নেই।

—কেন?

—সব কথার উত্তর দেওয়া যায় না, দিয়ে কোনো লাভ আছে?—মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলে অলকা, এড়িয়ে গেল নীতীশের প্রশ্নটাকে।

না, আর সে কলকাতায় থাকবে না। কিছুতেই না। যুক্তি আছে তার, হিসেবী মন আরও হিসেবী হয়ে গেছে, তা ছাড়া পথের যারা দিশারী, তাদেরও হদিস মিলেছে এখানে। তবু কিছুদিনের মতো কলকাতার বাইরেই পালাতে চায় সে। এ ভালোই হল

যে নীতীশ আর ফিরে যাবে না যোধপুরে—হয়তো আর কোনোদিন দেখাও হবে না তার সঙ্গে। প্রতিদিন চোখের সামনে এই কালো সমুদ্রটার তরঙ্গ-আস্ফালন সইতে পারবে না অলকা।

আর তা ছাড়া—তা ছাড়া—

সময়। সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের জীব – এমন জীব যাদের সম্পর্কে মনের মধ্যে এতকাল সে রাশীকৃত ঘৃণাই এনেছে বহন করে। পরশ্রমজীবী পরগাছার দল ওরা—ওদের যা রং-চং, যা কিছু আভিজাত্যের পালিশ, তার সবটাই সেই অর্কিডের নানারঙের বাহার। ওদের মোটরের 'মবিলে' মানুষের রক্তের গন্ধ, ওদের মুখের সিগারেটে যেন শ্মশানের চিতার ধোঁয়া কুণ্ডলিত হয়ে ওঠে।

তবু তো সেই অর্কিডও মন ভোলায়। এক-একদিন হয়তো এক-একটা বসন্ত বাতাসের দোলায় তার ফুলগুলো নেশা ধরিয়ে দেয় মনে, ক্ষণিকের জন্য ভুলিয়ে দেয়, মানুষের মেদমজ্জার গভীরে জালের মতো নিজের শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে কী ভাবে ওরা পুষ্ট করে তুলছে নিজেদের। চোখ ভোলে, মন ভোলে, অবিশ্বাস্য ভাবে পথও ভুলিয়ে দিতে পারে—নিয়ে যেতে পারে চোরাবালির অপঘাতে।

বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যায় তার ভায়োলিনে সুরের ঝড়। নারিকেল-কুঞ্জ-উতরোল-করা সেই সুরের লেখা যেন সর্বনাশের হাতছানি দিচ্ছিল তাকে; গ্রীক পুরাণের মায়ারাক্ষসীদের বাঁশীর গানের মতো ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল মৃত্যুদ্বীপের তটাভিমুখে।

রাজপথে ক্ষুব্ধ জনতার মত্ত মিছিল সেই যাদুমন্ত্রের জাল কেটে দিয়েছে, বাঁচিয়ে দিয়েছে একটা অতি ভয়ঙ্কর পরিণতির হাত থেকে। তবু বিশ্বাস কই, আর জোর কই নিজের ওপরে। অরণ্যের বঞ্চনা জেনেও পতঙ্গ উড়ে যেতে পারে ভেনাস ফ্লাই-ট্র্যাপের মৃত্যুবাসরে, ধূ ধূ করা জলন্ত তৃষ্ণা আর উড়ন্ত 'সাইমুম'কে জেনেও মরীচিকার মোহ কাটতে চায় না!

মাথাটাকে ঘাড়ের ওপর সোজা করে ধরল অলকা: না, কলকাতায় আমি আর থাকব না। বাড়িতে গিয়েই প্রাইভেট পরীক্ষা দেবার চেষ্টা করব আগে। তারপর—

—তারপর?—আল্‌গা ভাবে শিমুলের উড়ন্ত তুলোর মতো কথাটাকে ছেড়ে দিলে নীতীশ।

উত্তরে অলকা একটু আগেই বলা নীতীশের কথারই প্রতিধ্বনি করলে: তারপর আমার আর বলবার কিছুই নেই। ভূপেনদা জানেন।

—ভূপেনদা?—নীতীশের স্বরে ছায়ার আভাস।

—আমাদের ওখানকার পার্টি-সেক্রেটারী।

—যাক, ভালোই—চেষ্টা করে আবার হাসল নীতীশ।

—বাবু—

গ্রীন ক্লাবের চাকর শম্ভু দরজা খুলে থেমে দাঁড়িয়ে গেল। বিস্মিত চকিত ভাবে তাকালো অলকার দিকে।

—কি রে?—ভ্রুকুঞ্চিত করে নীতীশ জিজ্ঞাসা করলে।

—আপনার ফোন এসেছে—আড়চোখে অলকাকে লক্ষ্য করতে করতে শম্ভু জবাব দিলে।

—ফোন এসেছে? কোত্থেকে?

—হাসপাতাল।

—হাসপাতাল?—নীতীশের বিস্ময়ের সীমা রইল না: কেন?

—তা তো জানি না। বললে, খুব জরুরী দরকার।

—ওঃ!—নীতীশ উঠে দাঁড়ালো: বোসো লোকা, আমি আসছি।

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে গেছে শম্ভু। রিসিভার তুলে নিতেই কে একজন বললে, হ্যালো, হ্যালো, আপনি নীতীশ ঘোষ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি?

—আমি কারমাইকেল্ হস্‌পিট্যাল থেকে কথা বলছি। এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে আপনার একটি আত্মীয়া মৃত্যুশয্যায়—এখুনি চলে আসুন।

—আমার আত্মীয়া!—যেন আকাশ থেকে পড়ল নীতীশ: আপনি ঠিক জানেন?

ফোনের ওপার থেকে দ্রুত গলায় আওয়াজ এল: আপনার সঙ্গে রসিকতার সময় নয় এটা নিশ্চয়। আত্মীয়াটি নিজের পরিচয় দিতে বাধ্য হচ্ছেন না। যদি শেষ দেখা করতে চান, আর এক সেকেণ্ডও দেরি করবেন না।

—হ্যালো—হ্যালো—

আর সাড়া পাওয়া গেল না। ও পক্ষ রিসিভার ছেড়ে দিয়েছে।

কয়েক মিনিট নীতীশ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল টেলিফোনের সামনে। কিছু বুঝতে পারছে না, একটা দুর্বোধ্য রহস্যের মতো সব কিছু যেন মাথার মধ্যে তার ঘুরপাক খাচ্ছে। আত্মীয়া—কারমাইকেল্ হস্‌পিট্যাল! এ কী ব্যাপার!

ড্রয়িংরুমে আসতে তার দিকে তাকিয়ে অলকা সবিস্ময়ে বললে, কী হয়েছে?

—কিছু বুঝতে পারছি না। কারমাইকেল্ হাসপাতালে কে যেন মৃত্যুশয্যায়, তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। আমাকে এখুনি সেখানে ছুটতে হবে।

—কে মৃত্যুশয্যায়?

—বুঝলাম না। ফোনে কিছুই বললে না।

—ও—অলকা উঠে দাঁড়ালো: তবে আমি যাই।

—কোথায় যাবে? বালীগঞ্জে?

মুহূর্তের জন্যে অলকা অনিশ্চিত হয়ে রইল, তারপর বললে, না।

—তবে?

—রাস্তায় বেরিয়ে ভেবে দেখব।

—পাগল! এত রাত্রে! কলকাতাকে চেনো না—এ হাঙর-কুমীরের জায়গা।

—কিন্তু কোথাও তো ঠাঁই খুঁজে নিতেই হবে।

—এসব রোমান্সের ব্যাপার নয় লোকা—দ্রুতকণ্ঠে নীতীশ বললে, যা হয় করা যাবে কাল সকালে। আজ রাত্রিটা তুমি এখানে থেকে যাও।

—এই মেসে?

—ভয় পেয়ো না।—নীতীশ হাসল: এর তেতলায় অন্যরকম বন্দোবস্ত আছে, সেখানে দু-তিনটি পরিবার বাস করেন। তাঁদের একজনের ওখানেই তোমার রাত কাটানোর ব্যবস্থা করা শক্ত হবে না।

—কিন্তু—

—না, কিন্তু নেই কিছু—নীতীশ জোর দিয়ে বললে, কষ্ট হয়তো তোমার কিছুটা হবে, তার জন্যে এ রকম বাজে রিস্‌ক্ তোমায় নিতে দেওয়া যাবে না। আপাতত তুমি আমার গেস্ট হিসেবে এই ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করো। আমি ম্যানেজারকে বলে যাচ্ছি, কেউ তোমাকে ডিস্‌টার্ব করবে না; অসুবিধেও হবে না কোনো রকম।

—কিন্তু একা একা—অলকার সুন্দর চোখ দুটিতে আশঙ্কার ছায়া কাঁপতে লাগলো।

—কোনো ভয় নেই। ট্যাক্সি করে আমি যাব আসব—ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগবে না। তুমি দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বোসো—কেউ এখানে আসবে না এখন।

জুতোর আওয়াজে সিঁড়ি কাঁপিয়ে তর্ তর্ করে নেমে গেল নীতীশ।

ফিরল এক ঘণ্টা নয়, প্রায় দু ঘণ্টা পরে। টেবিলের উপরে মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল অলকা। মানুষের ভাবনার যখন আর শেষ থাকে না, তখনই হয়ত এত সহজে ঘুমে ভারী হয়ে আসে চোখের পাতা। ভেবে যখন আর কোনো লাভ নেই, তখন নিজেকে নির্ভয়ে ছেড়ে দেয় নির্ভাবনার হাতে।

নীতীশ ফিরেছে শ্মশানের একটা প্রেতের মতো। চোখ দুটো যেন দু খণ্ড অঙ্গারের মতো জলছে তার।

ঘুমের ঝোঁকটা কেটে গিয়ে অলকা আতঙ্কে শিউরে উঠল।

—কি হয়েছে?

—এই মাত্র মারা গেল মল্লিকা।

—কে? বৌদি? কলকাতায়?—বিস্ময়ে বেদনায় একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল অলকার বুক চিরে।

দম দেওয়া পুতুলের মতো বারকয়েক নিঃশব্দে ঠোঁট নড়ল নীতীশের। আশ্চর্য, তারপরে টেবিলে ভর দিয়ে একটু দাঁড়াতেই অপ্রত্যাশিত আর অদ্ভুত স্বাভাবিক গলায় সবটা সে বলে যেতে পারল।

বামদেব ঘোষের মেয়েটির সঙ্গে কণ্ঠী বদলের পর নতুন বৈষ্ণবীকে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে গেছেন যতীশ। বিষয়-সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিয়ে গেছেন। মল্লিকাও রওনা হয়েছিল সঙ্গে, পথে একটা জংশন স্টেশনে নিঃশব্দে নেমে পড়ে, ওঠে কলকাতার গাড়িতে।

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অলকা তাকিয়ে রইল, কথা বলতে পারল না।

গর্ভে তার সন্তান ছিল, নীতীশের সন্তান। শরীরের ওপর চরম অবিচারের ফলে বেদনা ওঠে শিয়ালদহ স্টেশনেই। প্ল্যাট্‌ফর্মেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অ্যাম্বুলেন্স আসে—নিয়ে যায় হাসপাতালে। অতিরিক্ত হেমারেজ হয়েছিল—বাঁচল না।

দেওয়ালে প্রেতপাণ্ডু বিবর্ণ ছবিগুলো দুলছে, আরো নিস্তব্ধ, আরো নিষ্প্রাণ কলকাতার পথ। সব কিছু থমথম করছে—যেন একটা লাসকাটা ঘর। আর অলকার বিহ্বল চোখ দুটো আবিল হয়ে গেছে অশ্রুতে।

মিনিট খানেক পরে গলাটা পরিষ্কার করে নিলে অলকা।

—আর খোকা?

—না, সেটা মরেনি। আশ্চর্য জীবনীশক্তি—অদ্ভুত জবাব দিলে নীতীশ: সে যাক, আমি চললাম। তোমার শোয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, তুমি ঘুমোও। আমাকে আবার পোড়ানোর যোগাড় করতে হবে—নীতীশ বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলে।

—দাঁড়াও—বাধা দিলে অলকা। চটিটাকে টেনে নিলে পায়ে: চলো, আমিও যাব।

—তুমি কোথায় যাবে?

—হাসপাতালে।—অলকার কণ্ঠ স্থির হয়ে গেছে: নিজের লোক না হলে খোকার ভার নেবে কে এখন?

—কিন্তু তুমি?—নীতীশ যন্ত্রচালিতের মতো উচ্চারণ করল।

—আর তুমিও তো আছো। তা ছাড়া দেশে মা আছেন, বাবা আছেন—খোকার কষ্ট হবে কেন?

বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নীতীশ, অলকা এসে হাত ধরল তার। এতদিন পরে এই প্রথম স্পর্শ করল তাকে। কিন্তু দুজনের কারো শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল না, হিমের মতো

একটা কঠিন শীতলতার সমস্ত বোধগুলো যেন জমাট বেঁধে গেছে। অসাড় আর আড়ষ্ট।

—কিন্তু এর পর ?—যেন ঘুমের ঘোরে নীতীশ একটা অস্ফুট প্রশ্ন করল।

—এরপর যোধপুর। মহানন্দার জলে নতুন জোয়ার আসবে। কিন্তু দাঁড়িয়ো না তুমি, আর সময় নেই। খোকার হয়তো কত কষ্ট হচ্ছে।

দু' জোড়া জুতোর শব্দ সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশ বাইরের থমথমে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভাঙা বন্দর

উৎসর্গ

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

নতুন এবং অপেক্ষাকৃত পুরোনো কয়েকটি গল্পের সমষ্টি 'ভাঙা-বন্দর'। 'আনন্দ-বাজার' 'যুগান্তর' 'বসুমতী' 'শনিবারের চিঠি' 'অলকা' 'বর্ষশেষ' প্রভৃতি কাগজে লেখাগুলি বেরিয়েছিল। শেষ গল্প 'আত্মহত্যা' একান্ত হাতে-খড়ির রচনা—প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৪ সালের 'বিচিত্রা' পত্রে; ইতিহাসের ধারা রক্ষার জন্য সে যুগের এই একটিমাত্র লেখাকে এখানে স্বীকৃতি দিলাম।

বইটির প্রকাশ-ব্যাপারে বন্ধুবর বিশু মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সিটি কলেজ
কলিকাতা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভাঙা বন্দর

এখন যেন সে সব রূপকথা।

এক নয়, দুই নয়, তিন-তিনশো ঘর। যেখানে লোহার বড় পুলটার তলায় খালের ওপর মস্ত বড় বাঁধা ঘাট নেমেছে, ওরই আশেপাশে সমস্ত পাড়াটা জুড়েই বসতি ছিল ওদের। সবুজ ঘন শ্যাওলার নিচে আজ প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে বটে, কিন্তু ভালো করে তাকালে এখনো স্পষ্ট পড়া যায়: সুখমণি দাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সন ১২৯৫।

রূপোপজীবিনী। এক নয়, দুই নয়, তিন-তিনশো ঘর। এই বন্দরই কি সেদিন এমন ভেঙেচুরে সুনন্দার জলে লোপ পেতে বসেছিল? আজ যেখানে বড় বড় মাল-বোঝাই ফ্ল্যাট এসে নোঙর করে, সেখানে আগে ছিল বিখ্যাত চীনেবাজার। তখন এই চীনেবাজারে প্রত্যেক দিন লাখ লাখ টাকার সুপুরির কারবার চলত, রাতের বেলা দেড়শোটা ডে-লাইটের আলোয় ঝলমল করত সুনন্দার জল।

আজ সে চীনেবাজার নদীর অতল জলে ডুব দিয়েছে। সেই জমজমাট ব্যবসার চিহ্ন-স্বরূপ এক টুকরো ইটকাঠও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বন্দরের পশ্চিম পাশে যে মগবাজারটি আজ পর্যন্ত টিকে আছে, কঙ্কালের কঙ্কাল বললেও যেন তাকে বেশি সম্মান দেওয়া হয়। আর সাহাপট্টি! এই তিনশো রূপোপজীবিনীদের পায়ে হাজার হাজার টাকা যারা প্রতি রাত্রে খোলামকুচির মতো ছড়িয়ে দিত, তাদের জঙ্গলে ঢাকা বড় বড় বাড়ির ফাটলে আজ যত বিষাক্ত সাপ এসে বাসা বেঁধেছে। তাদের যৎসামান্য বংশধরেরা দু'চারটি ছোটখাটো কারবারের ভেতর দিয়ে এই বিখ্যাত বন্দরটির নাম কোনমতে জীইয়ে রেখেছে এখনো।

স্টিমারঘাটে হারাণের ছোট স্টলটিতে বসে চা খেতে খেতে অনেক কথা শ্রীধর মিস্ত্রিরের মনে পড়ে।

সদর নয়, মহকুমাও নয়। তবু অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষীর মতো ছোট একটি মিউনিসিপ্যালিটি আজ অবধি রয়েছে। দু'একটি রাস্তার মোড়ে জরাজীর্ণ কাঠের পোস্টে আধভাঙা চৌকোণা আলোগুলো এখনো কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় মিটমিট করে। ওয়াটার ওয়ার্কসের বড় চৌবাচ্চাটা ভাঙাচোরা অবস্থায় শূন্যে ঝুলে রয়েছে, রিজার্ভ ট্যাঙ্কের জলে এখন বাসন মাজার কাজ চলে।

বহুদিন থেকে শ্রীধর মিত্তির এই মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান। আজ পর্যন্ত

তাঁর সে গৌরবের আসনটির কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। শুধু ভাইস-চেয়ারম্যানও নয়। এখানকার ছয়-আনি জমিদার কাছারির তিনি নায়েব এবং সব দিক থেকে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

হারাণের স্টলে হাতল-ভাঙা একটা চেয়ারে উবু হয়ে বসে শ্রীধর মিত্তির জিজ্ঞাসা করলেন: তারপর, কাল ত্রিনাথের গান কেমন শুনলে হে?

—উঃ, সারারাত ঘুমুতে পারিনি!—হারাণ মস্ত একটা হাই তুললে।

মিত্তির মশাই হাসলেন: সারা রাত্তির! তার মানে, ছোট কলকেতে দু'একটা—হেঁ—হেঁ—ইঙ্গিতপূর্ণ একটা টানের ভেতর দিয়ে তিনি কথাটা শেষ করলেন।

—রাম, রাম, কী যে বলেন! ছিঃ ছিঃ!—হারাণ প্রকাণ্ড রকমে জিভ কাটল। স্বাভাবিকের চাইতে আর এক ইঞ্চি বেশি। হয়তো নিছক রাত্রি জাগরণের জন্যেই তার চোখের লাল রঙটা এখনও মিলিয়ে যায়নি।

মিত্তির মশাই বললেন, তাতে আর দোষটা কি ভায়া? দেব-সেবা, অন্যায় তো নয়। আর গানখানাই বা কি? না—

"আমার ঠাকুর তেবৃনাথ কিছু নাহি চায়,
এক পয়সার গাঁজা দিয়া তিন কলকি সাজায়
রে সাধু ভাই,
দিন গেলে তেবৃনাথের নাম লইয়ো।"

অপ্রতিভ বোধ করতে লাগল হারাণ। প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে বললে, নতুন মাখন-বিস্কুট আনিয়েছি মিত্তির মশাই, দেব দু'খানা?

অনাসক্তের মতো শ্রীধর মিত্তির বললেন, দাও।

সামনে সুনন্দার জল জোয়ারের বেগে ফুলে উঠেছে, ফেঁপে উঠেছে। আস্তে আস্তে দুলছে স্টিমারঘাটের পণ্টুনটা। নদীর সমস্ত মাঝখানটা জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বেড়াজাল—বাঁশের আগাগুলো কালো কালো মাথার মতো ভাসছে। ওপারের খেয়া নৌকোখানা সকালের প্রথম পাড়ি জমিয়েছে, ওখানা এ পারে এসে পৌঁছুলে তবে বন্দরের বাজারে দুধ উঠবে।

ত্রিনাথ—ত্রিনাথ! ত্রিনাথের পুজোর সে সব আয়োজন এখন কি এরা কল্পনাও করতে পারে! এখন যেখানে রোজ সকালে মানপাশা সরমহলের 'কেরায়া' নৌকাগুলো যাত্রীর আশায় লগি পুঁতে বসে থাকে, ঠিক ওইখানেই ছিল কালীমোহন সাহার গদি। লোকে বলত, বড়ঘর। ছোটখাটো যে কোনো একটা কিছুকে উপলক্ষ্য করেই ওখানে ত্রিনাথের পাঁচালি বসত। আশেপাশের দশখানা গাঁয়ের যত গাঁজাখোর সব এসে ভিড় জমাত সেদিন। একরাত্রে এক সের গাঁজা পুড়ত, ত্রিরিশটা কলকে ফাটত এবং তিন মণ

রসগোল্লা যে মন্ত্রবলে কোথায় উড়ে যেত, তার আর ঠিকঠিকানাই মিলত না।

শুধু কি গাঁজাখোরের তাণ্ডব চিৎকার! ঢপও হত মাঝে মাঝে। গৌরাঙ্গিণীর ঢপ বিখ্যাত ছিল সে যুগে। অমন দরদ দিয়ে পদাবলী গাইতে মিত্তির মশাই কাউকেই শোনেননি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কত কাণ্ড হয়ে গেল ওই গৌরাঙ্গিণীকে নিয়ে।

একদিন বর্ষার সন্ধ্যায় কালীমোহনের ভাইপো ব্রজমোহন একখানা ধারালো রামদা দিয়ে খুড়োকে টুকরো টুকরো করে কাটল। সে দৃশ্য মনে পড়লে গা এখনও ছমছম করে ওঠে। রক্তনদীর মাঝখানে পড়ে রয়েছে কালীমোহনের পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড শরীরটা। পেটের ঠিক মাঝখান দিয়ে রক্তের ছিটে দেওয়া হলদে একটা চর্বির পিণ্ড বাইরে ঝুলে পড়েছে, অর্ধচ্ছিন্ন শ্বাসনালীটা রাক্ষুসে ধরনে হাঁ করে রয়েছে, আর তাই থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত তখনো কাঁধের দু'পাশ বয়ে মাটিতে চুঁইয়ে পড়ছে।...

বাঁশি বাজিয়ে সকালবেলাকার এক্সপ্রেস স্টিমারঘাটে এসে ভিড়ল। দোতলার রেলিঙে যাত্রীদের সদ্যোজাগ্রত চোখের অলস দৃষ্টি। 'হাফিজ, হাফিজ' চিৎকার করে কালিমাখা পায়জামা পরা খালাসিরা মোটা মোটা তারের দড়ি ছুঁড়ে ফেলতে লাগল,—তারপর কয়েক মিনিট ধরে বাঁধাবাঁধি, কষাকষি। যাত্রীদের ওঠা-নামা, ডাকের ব্যাগ, খবরের কাগজ, বাঁশির গম্ভীর আওয়াজ—চাকার ঘায়ে জল ফেনায় ফেনায় ভরে উঠল। কিছুক্ষণ পরেই আর সাড়াশব্দ নেই—। সুনন্দার জলে ধরল ভাঁটার টান, পণ্টুনটা চুপচাপ পড়ে ঝিমোতে লাগল। কেরায়া নৌকার মাঝিরা ছোট ছোট ছিপ ফেলে পণ্টুনের তলা থেকে বোয়াল মাছ ধরছে, সকালের রোদে থেকে থেকে এক-একটা মাছ রূপোর মতো চিকচিক করছিল।

একটা বিড়ি ধরিয়ে শ্রীধর মিত্তির ভাবতে লাগলেন। এই বন্দর হয়তো আবার তেমনি করেই উঠবে বড় হয়ে। সামনে ওই যে তেলের কলটা আজ প্রায় তিন বছর ধরে তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে, ওই মিলটাও হয়তো চলতে শুরু করবে সেদিন। আবার এই বন্দরে কোটি টাকার লেনদেন চলবে, দক্ষিণের তালবনটার পাশ ঘেঁষে চীনে-বাজার বসবে আবার।

—হাঁসের ডিম আছে হারাণবাবু?

ঠিক মিত্তির মশাইয়ের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে একটি যুবতী মেয়ে। কাপড়-চোপড়ের ধরন দেখলেই তাকে চেনা যায়। কিন্তু বারবনিতা হলেও এখনো তার এক-ধরনের শ্রী আছে।

কয়লার উনুনটাতে বাতাস দিতে দিতে হারাণ বললে, হাঁসের নেই, মুরগীর আছে। নেবে?

—মুরগী ? মুরগী কি হিঁদুতে খায় বাবু ? থাক, একটা সিগ্রেট দাও বরং।

হারাণ সিগারেট বার করলে।

—কাঁচি ? কেন তোমার ঠেঁয়ে ক্যাভেণ্ডার নেই ? একটু কড়া না হলে আবার—

মেয়েটি হাসল।

একটু রসিকতার সুযোগ পেয়ে যেন বর্তে গেল হারাণ। বললে, কড়া ? খুব ভালো দা-কাটা তামাক আছে, চাও তো দিতে পারি।

মেয়েটি মুখের একটা অপরূপ ভঙ্গি করলে। তার শরীরের সর্বত্রই কেমন যেন একটা ছন্দ ছড়িয়ে রয়েছে। আকারে-প্রকারে, চলায়-ফেরায় সে ছন্দটি যেন আলোর মতো ঠিকরে পড়ে।

—তোমার সঙ্গে এখন আমার মস্করার সময় নেই বাপু। আঁচল দুলিয়ে সে দোকানের ভেতর থেকে বাইরে নেমে গেল।

কয়লার উনুনটা প্রায় ধরে উঠেছে। এলুমিনিয়মের টোল খাওয়া অপরিচ্ছন্ন কেটলিটা তার ওপর চাপিয়ে দিয়ে পরিতুষ্ট মুখে হারাণ বললে, চিনলেন ?

শ্রীধর মিত্তির সপ্রশ্ন ভাবে তাকালেন : না, সেইটেই তোমায় জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলুম। এ বিদ্যেধরীটি আবার কোত্থেকে আমদানী হল ?

—আরে, এ যে মালতী। রামকুমার পোদ্দারের ছেলে জগন্নাথকে চেনেন না ? সেই-ই কোত্থেকে জুটিয়ে এনেছে, একরকম তারই রক্ষিতা বললেই চলে।

মিত্তির মশাইয়ের মুখখানা কালো হয়ে উঠল। তাঁর মনে কোথায় যেন আকস্মিক ভাবে একটা আঘাত লেগেছে। এই একটা ঘর এই ভাঙা বন্দরে কোনোরকমে টিকে আছে এখনো। রামকুমার পোদ্দার কখনো হাঁটুর নিচে কাপড় পরেনি, আধপেটা খেয়ে দিন গুজরান করেছে। বুড়ো অথর্ব হয়েও যখন সে হাঁটতে পারত না, তখনও সে এতটুকু আলসেমিতে সময় কাটায়নি। সকালের রোদে দাওয়াটা ভরে গেলে সেই রোদে বসে সে দড়ি পাকাত। আর কিছু না হোক, এই দড়িগুলো তো অন্তত সংসারের কাজে লাগবে।

আর সেই রামকুমার পোদ্দারের ছেলে এই জগন্নাথ। প্রত্যেক শনিবারে সে শহরে যায়, ফ্ল্যাস আর বিলিতী মদে দুটো দিন কাটিয়ে আসে। কোনো অজ্ঞাত কারণে মাসিক একবার করে কলকাতা না গেলে তার চলে না।

শ্রীধর মিত্তির উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এই বন্দর ! আজ পঁচিশ বছর ধরে তিনি চোখের ওপর এর জীবনের গতিটা লক্ষ্য করে আসছেন। তখন এমনি ভাবে মাড়োয়ারীরা এসে দাদন দিয়ে সুপুরির বাগানগুলো একচেটিয়া করে নেয়নি, লাখে লাখে টাকার মুনাফা প্রত্যেক বছর ভাটিয়ারা ট্যাঁকে গুঁজে নিয়ে যেতে পারেনি। রাধানাথ সাহা, হরিমোহন

সাহা তখন এ তল্লাটের মুকুটহীন রাজা। তখন বড় বড় ডেসপ্যাচ স্টিমার এসে নদীর বুক জুড়ে থাকত—তখন কোথায় ছিল ঝালকাঠি বন্দরের এত ডাক-হাঁক, এত জাঁকজমক।

কিন্তু সে সব দিন স্বপ্নের মতো ক্ষীণ হয়ে আসছে। সেই রাধানাথ সাহা বটে-অশথে বিয়ে দিয়ে হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে দিলে, যথাসর্বস্ব নিবেদন করে বসল সারদা বোষ্টমীর পায়ে। আর হরিমোহন সাহার ছেলেরা? তাদের থ্যামটার দলের নামই এক-আধটু যা টিকে আছে—অত বড় ব্যবসাটা জলের লেখার মতো নিঃশেষে মুছে গিয়েছে বললেই হয়।

শ্রীধর মিত্তির বললেন, উচ্ছন্নে যাবে, তারই পথ খুঁজছে আর কি! এতদূর যখন হয়েছে, তখন আর বড় বাকিও নেই।

কয়লার উনুনটাতে আবার জোরে জোরে বাতাস দিতে দিতে হারাণ বললে, ইচ্ছে করে উচ্ছন্নে গেলে কে ঠেকিয়ে রাখবে বলুন?

শ্রীধর মিত্তিরের কণ্ঠস্বর বেদনার্ত হয়ে এল: উঃ, এত কষ্টের টাকা! একটা পয়সাকে বুড়ো বুকের এক ফোঁটা রক্ত বলে মনে করত। সেই সব পয়সা এমনি ভাবে যাচ্ছে অবিদ্যের সেবায়!

হঠাৎ যেন মিত্তির মশাই ক্ষেপে উঠলেন: একটা বন্দুক দিতে পারো আমাকে, বন্দুক?

চোখ দুটো কপালে তুলে হারাণ বললে, বন্দুক? বন্দুক দিয়ে কী করবেন?

—গুলি করব—গুলি করে মেরে ফেলব সব। অ্যাঁ, বলো কি হে! এমনি করে সবই গেলে বন্দরের আর রইল কি? আর ক'দিন পরে যে মানুষ থাকবে না এখানে। চরে বেড়াবে—শেয়াল শকুন চরে বেড়াবে খালি।

হারাণ চিন্তিতের মতো মাথা নাড়তে লাগল।

—আজ্ঞে সে তো ঠিক কথা। কিন্তু যার পাঁঠা সে যদি ন্যাজের দিকে কাটে, তা হলে আপনি আমি আর—

—পাঁঠা? কার পাঁঠা? তুমি বলতে চাও এ বন্দরে আমাদের কিছু নেই? উঃ, কী ছিল আর কী হয়েছে! তখন কোথায় থাকত নারায়ণগঞ্জ আর কোথায় দাঁড়াত ঝালকাঠি! হাওয়ায় উড়ে আসত টাকা—আকাশে আগুনের মতো উড়ত টাকার ফুলকি। পাট আর সুপুরির মরশুমে এখানে এসে জড়ো হত সমস্ত বাংলাদেশ। আর আজ—বল কি, দুঃখ হয় না?

হারাণ সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে। বললে, কী আর করবেন বলুন? ভগবানের মার বই তো নয়।

—ভগবান? ভগবান এর মাঝে কোত্থেকে এলো হ্যা? নদীতে চড়া পড়ে গিয়েছে?

বরিশালের বাগানে আর সুপুরি হয় না? মদে আর মেয়েমানুষে সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে ছাই করে দিলে, আর দোষ হয়ে গেল ভগবানের?

হারাণ কথা খুঁজে পেল না।

—তুমি দেখো হারাণ, এ বন্দর আবার জোড়া লাগবে—ভাঙা বন্দর চিরদিনই ভাঙা থাকবে না। একবার তেলের কলটা চললেই হয়। সব তৈরি হয়ে আছে—বিরেনব্বই-খানা কলের ঘানিতে সর্ষে ফেলে তেল বের করবে, সোজা কথা তো নয়। কিন্তু এ-ও বলে রাখছি, তা হলে মিউনিসিপ্যালিটির চৌহদ্দিতে আর একঘরও পেশাকার থাকতে দেব না আমি। চাল কেটে সব তুলে দেব—নিশ্চয়ই।

হারাণ বোকার মতো খানিকটা হেসে বললে, যা বলেছেন।

বেলা বেড়ে উঠেছে। আকাশে অসংখ্য উড়ন্ত গাংচিল; ভাঁটার টানে নদীর বুকের ওপর দিয়ে কচুরির স্তর ভেসে চলেছে। ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়ায় ফুলে উঠেছে মহাজনী নৌকোর পাল। ওপারের মুসলমানদের গ্রাম থেকে কালো কালো একদল ছেলেমেয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে সুনন্দার জল তোলপাড় করে তুলছে। পণ্টুনের পাশে বাঁধা কেরায়া নৌকাগুলো থেকে বাতাসে চারিয়ে যাচ্ছে রসুন মেশানো মাছের ঝোল আর ফুটন্ত ভাতের গন্ধ।

সাহাপট্টির বাঁধা ঘাটে মিত্তির মশাই স্নান করতে এলেন। ঘাট নদীতে নয়—খালের ওপর। লোহার বড় পুলটার তলায় রাণা দেওয়া পাথর বাঁধানো মস্ত ঘাটটা। নীল শ্যাওলার তলায় প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এলেও এখনো পড়া যায়: সুখমণি দাসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সন...

প্রথমে স্নান, তারপরে আহ্নিক। কিন্তু বেশিক্ষণ জলে থাকবার জো নেই আজকাল। খালের জলে বেজায় 'কামটের' উপদ্রব হয়েছে ইদানীং। সেদিন কোন্ এক বৈরাগীর পা কেটে নিয়েছে।

আহ্নিকে মন বসতে চায় না। নিজের অজ্ঞাতেই গুরুমন্ত্র ভুলে গিয়ে মিত্তির মশাইয়ের সমস্ত চিন্তা চেষ্টা যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঘাটের এ পাশে বসে তিন-চারটি যুবক সাবান মাখছে। তারাই আলোচনা করছিল। ভাঁটার মুখে নেবে আসা জলের প্রখর কলতানের ভেতর দিয়েও তাদের চাপা আলোচনা কানে এল।

—মালতী—হ্যাঁ হ্যাঁ মালতী। কাল যা কেত্তন গাইলে মাইরি, কী বলব?

—ঐ বারোয়ারীতলায় তো? তা হলে যেতেই হবে আজ সন্ধ্যেয়। কী গাইলে বল দিকি? গরানহাটী? মনোহরশাহী? ঢপ? সেই যে—'না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ,—না

ভাসাইয়ো জলে'—

আহ্নিকের মন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে মন থেকে। মিত্তির মশাইয়ের সমস্ত মস্তিষ্কটা যেন মশালের মতো জলে উঠতে চায়। মালতী—সেই মেয়েটা। প্রদীপের চারপাশে যেন পুড়ে মরবার জন্মেই উড়ে বেড়াচ্ছে পতঙ্গের দল। দস্যু আর অগ্নিভীতি নিবারক লোহার সিন্দুককে ফাঁকি দিয়ে সোনার তালগুলো বেরিয়ে আসছে—হাওয়ায় হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে বুদ্বুদের মতো। অথচ রামকুমার পোদ্দার কোনদিন হাঁটুর নিচে কাপড় পরেনি—আধপেটা খেয়ে ইঁদুরের মতো শুকনো, চিমসে হয়ে মরেছে লোকটা।

অসহ্য বিরক্তি আর ক্ষোভে ভিজে কাপড়টা গুছিয়ে নিয়ে শ্রীধর মিত্তির নিঃশব্দে ঘাট থেকে উঠে গেলেন।

জমিদারী কাছারির কাজ।

সামনে কাঠের হাতবাক্সটার ওপরে খেরো খাতা লিখছিলেন মিত্তির মশাই। হাটবারেই যা দু'একখানা চেক কাটা যায়। তবুও আদায়ের অবস্থা এবারে অত্যন্ত মন্দা। প্রজাদের তো কথাই নেই—বড় বড় মহাজনরা পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। চারদিকেই যেন অলক্ষ্মীর অশুভ নিশ্বাস অনুভব করা যায়।

তেলের কলটা একবার বসলে কিছু রক্ষা হয় তবু। আর ওই অবিছেপাড়া! কম করে এখনো তো পঁচিশ ত্রিশ ঘর হবেই। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে চেষ্টা করে দেখতে হবে একটা আলাদা ট্যাক্স বসিয়ে ওদের উঠিয়ে দেওয়া চলে কিনা।

—পেন্নাম হই বাবু!

চমকে শ্রীধর মিত্তির দেখলেন এক-পা ধুলো নিয়ে সদরের পেয়াদা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।—অ্যাঁ দাশু যে! তারপর খবর কী?

দাশু একগাল হাসলে। বললে, খবর কিছু আছে বই কি। এবার লাটের কিস্তি আদায়ে স্বয়ং নতুন ম্যানেজার আসছেন যে। কালতক এখানে পায়ের ধুলো দেবেন, কাগজপত্তর যেন সব ঠিক থাকে।

—নতুন ম্যানেজার,—মানে মদনবাবু আসবেন? সে কি হে!

—আজ্ঞে সেই খবরই তো দিতে এলুম। আইনটাইন মিলে তিন-চারটে পাস করা মানুষ, একটু সাবধান হয়ে থাকবেন আর কি।

মিত্তির মশাই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই নতুনের দলকে ভয় করেন তিনি। এদের সর্বাঙ্গ ঘিরে একটা বিচিত্র ঔদ্ধত্য তীব্র দ্যুতিতে ঝকমক করে। সব সময় সেটাকে চোখে দেখা যায় না—কিন্তু বিদ্ধ করতে থাকে। তা ছাড়া এই নতুন ম্যানেজারের মেজাজ সম্পর্কেও নানারকম জনশ্রুতি কানে এসেছে। যত রকমের মন্ত্র-মন্ত্রণা, সব কিছু প্রয়োগ

করেও তাঁর আমলা-কর্মচারীর দল তাঁকে খুশি করবার কৌশলটি আয়ত্ত করতে পারেনি।

একটা অপরিসীম দুশ্চিন্তায় মিত্তির মশাইয়ের সারারাত ঘুম এল না। এই ভাঙা বন্দরে আজ আর মানুষ নেই। নিতান্তই যাদের ছেঁড়া শিকড় কোন রকমে জড়িয়ে রয়েছে, তারাই দায়ে পড়ে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে এখনো। কিন্তু দিন তাদেরও শেষ হয়ে এল। বারোয়ারীতলায় মালতীর কীর্তন শুরু হয়েছে: যেটুকু বাকি আছে তাও একদিন নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে যাবে সুনন্দার জলে। দেড়শো ডে-লাইটের সঙ্গে সঙ্গে চৗনে-বাজারটা যেমন ভাবে লোপ পেয়েছে—তেমনি ভাবে।

কিন্তু আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে এই বন্দরও আধুনিক ছিল। নতুন ম্যানেজার মদনবাবু পঁচিশ বছর আগে এলেই ভালো করতেন। আজকের এই স্তূপাকার শূন্যতা তাঁকে খুশি করবে কী দিয়ে?

তবু শেষ পর্যন্ত মদনবাবু ভাঙা বন্দরে এসেই পা দিলেন।

সারা সকাল হারাণের স্টল থেকে একবারটি ঘুরে আসবারও সময় পেলেন না মিত্তির মশাই। রাশীকৃত কাগজ আর হিসাবপত্তর নিয়ে তাঁকে বেলা বারোটা পর্যন্ত তটস্থ ভাবে কাটাতে হল ম্যানেজারের সঙ্গে। দুপুরবেলা কাছারির বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে হাত পা ছড়িয়ে ম্যানেজার বললেন, বড্ড নোংরা জায়গাটা আপনাদের। এখানে আধঘণ্টা থাকলে মানুষের যেন দমবন্ধ হয়ে আসে মশাই।

শ্রীধর মিত্তির যেন ঘা খেলেন একটা। এ কথাটা শোনবার জন্যে যেন তিনি প্রস্তুত ছিলেন না মনের দিক থেকে। আজ দুর্দিন এসেছে বলে চিরটাকালই কি এরকম ছিল? লোকে বলত—এই বন্দর যেন ছবির মতো সাজানো। ঝকঝকে তকতকে—মানুষে এখানে হাওয়া বদলাতে আসত। তিন মাস এখানে থাকলে যক্ষ্মা সেরে যেত, আর আজ—

শ্রীধর মিত্তিরের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: বলেন কি স্যার, নোংরা! আজ এর অবস্থা এমন হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু পঁচিশ বছর আগে…

পঁচিশ বছর আগেকার গল্প বলতে লাগলেন তিনি। এই মুহূর্তে যেন আধুনিক কালটা দৃষ্টির আড়াল সরিয়ে সামনে থেকে মিলিয়ে গেছে কালো একটা পর্দার মতো। বর্তমান আর সত্য নেই। সুনন্দার সমস্ত দক্ষিণপাড়টা জুড়ে কুণ্ডুদের প্রকাণ্ড লবণের গোলা। চৗনে-বাজারের নিচে দশ-বারোখানা ডেসপ্যাচ স্টিমার নোঙর করে রয়েছে। কাটা ঘুড়ির মতো রাশিরাশি কারেন্সি নোট বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে—আকাশ থেকে ফুলঝুরির মতো ফুটে পড়ছে টাকার ফুল্‌কি।…

মিত্তির মশাইয়ের গলা কাঁপতে লাগল। উত্তেজনায়—আনন্দে। মনের অজ্ঞাত প্রান্ত

থেকে ভেসে এসেছে একটা দুঃসহ প্রেরণা। অনুভূতির সমস্ত তন্ত্রীগুলোর ওপর দিয়ে সে সমস্ত দিন যেন মীড়ের মতো রণিত হয়ে উঠছে। কালীমোহন সাহার গদিতে সেই ত্রিনাথের পাঁচালি। বাংলাদেশে কোথাও এমন হয়নি, কোথাও এমন হবে না—হতে আর পারেও না।

বলা শেষ হয়ে গেল, তবু সেই বলার ঝঙ্কারটা এখনো যেন স্নায়ুগুলোর ওপর ক্রিয়া করছে। তাঁর চোখে জল এল।

কিন্তু মদনবাবু হাসলেন। সে হাসিতে কৌতূহল নেই—সহানুভূতি নেই। আধুনিকেরা কৌতূহলী হতে চায় না। স্পর্ধার একটা তীক্ষ্ণাগ্র ছুরি দিয়ে অতীতের সব কিছুকেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়।

নিতান্ত সাধারণ, অনাসক্ত ভাবে হেসে মদনবাবু বললেন, তা হবে।

শ্রীধর মিত্তিরের সমস্ত মনটা যেন চিৎকার করে প্রতিবাদ করবার জন্যে উদ্যত হয়ে উঠেছে। এই নিঃশব্দ অবজ্ঞাটা তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করতে লাগল। অনেক চেষ্টায় নিজেকে সংযত করলেন তিনি।

—বিকেলে একবার দয়া করে বেরোবেন স্যার। দেখবেন কী ছিল এখানে। মানুষ নেই বটে, কিন্তু জঙ্গলের মাঝখানে এখনো পড়ে রয়েছে সব রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। বারোয়ারীতলার আখড়াবাড়িতে রথযাত্রার সময় দু'হাজার লোক প্রসাদ পেত, সে সব—

মদনবাবু হাই তুললেন। আলস্যজড়িত স্বরে বললেন, যাই বলুন, তিনটে দিনও এখানে কাটানো আমার পক্ষে কঠিন হবে। একেবারে আড়ষ্ট বদ্ধ-জীবন। লাটের টাকাটার ব্যবস্থা করতেই দায়ে পড়ে আসা একরকম। আপনারা একটু চেপে আদায়-তশিল করলে এ দুর্ভোগ আমাকে বইতে হত না।

মিত্তির মশাই অধৈর্য হয়ে উঠলেন। এ উদাসীনতা সহ্য হয় না। বর্তমানের ঝাঁঝালো উগ্রতা ছাড়া আধুনিকদের বিশ্বাস করানো অসম্ভব। অতীতের পটভূমিটাকে অস্বীকার করতে পারলেই যেন তারা সান্ত্বনা পায়।

—একটা তেলের কল বসবে স্যার। মস্ত কল। বিরানব্বইখানা ঘানি। আসছে অঘ্রাণ মাসে এসে দেখবেন এখানকার চেহারা বদলে গেছে। লোকজনের কিছু আমদানী হলেই এই ভাঙা বন্দরের শ্রী ফিরে যাবে। তখন বলবেন—

—ওঃ! মদনবাবু একটা সিগারেট ধরালেন।

অসহ্য, ভাষাতীত অপমানের বেদনায় শ্রীধর মিত্তিরের যেন কান্না আসতে লাগল। এই বন্দর! পঁচিশ বছর আগে যারা এখানে আসেনি, তারাই কেবল একে অস্বীকার করতে পারে। কালের অবরুদ্ধ ঝাঁপিটা একবার খুলে দিয়ে আধুনিকদের চোখে সেদিনকার মণি-মুক্তোর ঝলস দেখিয়ে কে ধাঁধা লাগিয়ে দিতে পারে? কোন্ যাদুকরের

হাতে বন-মানুষের হাড় ভেল্‌কি দেখিয়ে সে অসম্ভবটাকে সম্ভব করে তুলতে পারে? কালস্রোতে যা বিস্মৃতির দিগন্ত-সমুদ্রে লীন হয়ে গেছে, কোন্ যাদুমন্ত্রে এতগুলো বছরের মৃত-কঙ্কাল মাড়িয়ে তা আবার সম্মুখে এসে দাঁড়াবে?

সমগ্র মানসিকতায় যেন তাঁর বিশৃঙ্খলার দোলা লাগল। এই মুহূর্তে,—একটা অস্বাভাবিক, অপরিচিত উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি যেন নিজেকে অতিক্রম করে গেলেন। তাঁর সমস্ত সংস্কার, আজন্মলালিত সমস্ত বিশ্বাস যেন মদনবাবুর অনাসক্ত হাসির পেছনে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে এল মিলিয়ে।

কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল তাঁর। কপালের শিরাগুলো দপদপ করতে লাগল অত্যধিক রক্তের চাপে। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে হৃৎপিণ্ডটা ঘা মারতে লাগল পাঁজরের ওপর।

সমস্ত শক্তিকে কণ্ঠে একত্র করে এনে মিস্তির মশাই বললেন, সময় কাটাবার ভালো ব্যবস্থা এখানেও আছে স্যার। কিছু যদি মনে না করেন—

মদনবাবু চোখ দুটোকে কুঁচকে প্যাঁচার মতো ছোট করে আনলেন। বললেন, না না, মনে করব কেন! স্বচ্ছন্দে বলুন না আপনি।

শুকনো ঠোঁট দুটোকে শ্রীধর মিস্তির একবার চাটলেন জিভ দিয়ে। জীবনের সব চাইতে বড় অসত্য, সব চাইতে কুৎসিত কথাটা আজ উচ্চারণ করতে হবে তাঁকে। অধঃপতনের মাত্রা যে কোন্ স্তরে পৌঁচেছে তা কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু অতীত আর বর্তমানের দ্বন্দ্বে জয়লাভ করতেই হবে অতীতকে। আর এই জয়ের মূল্য দিতে তাঁর এত দিনকার যা কিছু প্রতিষ্ঠা, যা কিছু শুভবুদ্ধি, সব কিছুকেই ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে হাতের পাশার মতো।

—যদি, যদি কিছু মনে না করেন স্যার। এখানে মালতী বলে একটা মেয়েমানুষ আছে। যেমন চেহারা, গানবাজনাতেও তেমনি।—একটা ঢোক গিলে মিস্তির মশাই বললেন, যদি ইচ্ছে করেন, তা হলে—

মদনবাবুর মুখের ওপর দিয়ে শাণিত তলোয়ারের মতো আধুনিকতার একটা বাঁকা হাসি ঝকঝক করে গেল। একটা চাবুকের আঘাত খেয়ে চমকে উঠলেন মিস্তির মশাই।

মদনবাবুর কথার মধ্যে উত্তাপ নেই। অস্বাভাবিক প্রশান্ত স্বরে আধুনিকেরা অদ্ভুত রকমের নিষ্ঠুর কথা বলতে পারে। ভেতরকার বহ্নিকুণ্ডটা চোখে দেখা যায় না—কিন্তু তার নির্নিরীক্ষ্য তাপে সমস্ত শরীর যেন ঝলসে দেয়।

—মাপ করবেন মিস্তির মশাই। ওতে আমার রুচি নেই। আপনার সম্পর্কে যা শুনেছিলুম তাতে তো আপনাকে অন্য রকমের বলেই জানতুম। যাক, বুড়ো হয়েছেন—এখন ওসব ছেড়ে দিন। পরকাল বলে আছে তো একটা, কী বলেন?

হৃৎপিণ্ডটা যেন বুকের ভেতর একখণ্ড পাথরের মতো ভারী আর জমাট হয়ে গেছে। কপালের শিরাগুলো দিয়ে যেন তিরতির করে সমস্ত শরীরের ভেতর একটা বরফের স্রোত নেমে গেল। ত্রেতাযুগ আর নেই, তাই এত বড় লজ্জা আর অপমানের পরেও পৃথিবীর মাটিতে এতটুকুও চিড় ধরল না। শুধু খেরো খাতার অক্ষরগুলো জীবন্ত হয়ে উঠে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকার মতো মিত্তির মশায়ের চারপাশে ছিটকে পড়তে লাগল।

সন্ধ্যার সময় চায়ের স্টলে একটা বিড়ি এগিয়ে দিতে দিতে হারাণ বললে, আর শুনেছেন তেলের কলটা যে ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে।

যান্ত্রিক ভাবে মিত্তির মশাই বললেন, কেন ?

—যুদ্ধের যে রকম বাজার, সাহস পাচ্ছে না কোম্পানী। শুনেছি লোহালক্কড়গুলো সব বিক্রি করে দেবে।

—ওঃ।—নিতান্ত সংক্ষেপে, নিতান্ত নির্বিকার ভাবে মিত্তির মশাই এটুকু উচ্চারণ করলেন। আশ্চর্য, মদনবাবুর সঙ্গে তাঁর উচ্চারণ-ভঙ্গির যেন এতটুকু তফাত নেই। অনাসক্তির একটা সুরে এসে দু'জনেই এক হয়ে গেছেন।···

···সামনে সুনন্দার বুকে কালো অন্ধকার। ভাঙা বন্দরের খাড়া পাড়ের গায়ে জোয়ারের স্রোত আঘাত করে চলেছে। কোথায় সেই মগবাজার, সেই চীনেবাজার, সেই জমজমাট সাহাপট্টি। কালিজিরার নদীর মুখে কিছুদিন থেকে যে মস্ত চড়াটা জেগে ওঠবার উপক্রম করছে, তাঁর সঙ্গে হয়তো সে ইতিহাসের কোনো যোগাযোগ থাকতে পারে। সুনন্দার জলে জেলে-নৌকার অসংখ্য আলো, কিন্তু সে আলোগুলোর রঙ অতিমাত্রায় লালচে। কালীমোহন সাহার প্রকাণ্ড শরীরটার ওপর ছিটকে পড়া যেন একরাশ রক্ত।···

লজ্জা অপমানের কিছু আর বাকি নেই আজকে। চরম মিথ্যার কাছে, পরম অসত্যের কাছে আত্মবিক্রয় করে মিত্তির মশাই বর্তমানকে জয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাশা উল্‌টে পড়েছে।

ভাঙা বন্দর কোনোদিন আর জোড়া লাগবে না।

কবর

চমৎকার গাড়িটা। যেন প্রজাপতির মতো পাখা মেলে উড়ছে। পি. ডব্‌লু. ডি.-র পীচ ঢালা মসৃণ রাস্তা—এক-একটা কালভার্টের কাছে এসে যেন উটের মতো উঁচু হয়ে উঠছে, আবার নেমে যাচ্ছে তরঙ্গের মতো। শাদার ওপরে কালো কালো ডোরাকাটা মাইল-পোস্টগুলো যেন হাত ধরাধরি করে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে পেছনে। পুরু স্প্রীংয়ের গদিতে মৃদুমন্দ দোলা লাগছে, শরীরের মধ্যে শিরশির করে উঠছে গতির একটা বিচিত্র শিহরণ।

ড্রাইভ করছে শা-নওয়াজ নিজেই। আমি ওর পাশে বসে আছি। ওর চোখে কালো গগ্‌লস্‌, আমি সে ছুটো দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি কী গভীর গৌরবে আর চরিতার্থতায় সে ছুটো ঝকঝক করে উঠছে। এই যুদ্ধের বাজারেও পাঁচগুণ দাম দিয়ে এবং বহু সন্ধান করে নতুন গাড়ি কিনেছে শা-নওয়াজ। পেট্রোল কোথা থেকে যোগাড় করেছে কে জানে, কিন্তু আমাকে নিয়ে পি. ডব্‌লু. ডি,-র রাস্তায় লম্বা রাইড দিচ্ছে সে।

বেলা বেড়ে উঠেছে, সকালের রোদে উদ্ভাসিত হয়েছে প্রকাণ্ড রাস্তা। অ্যাকসিলেটারে চাপ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পীড বাড়ছে ক্রমাগত। পথটা যেন মহাকায় সরীসৃপের মতো ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকিয়ে মোটরের তলায় এসে ঢুকছে, কালভার্ট, মাইলপোস্ট, টেলিগ্রাফের তার আর বনজঙ্গল—সব কিছুই যেন পিছিয়ে যাওয়ার একটা দীর্ঘ-শৃঙ্খলে বাঁধা। সমস্ত শিরা-স্নায়ুগুলোকে শিথিল করে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দটা দেহেমনে অনুভব করছি।

—গাড়িটা কেমন রঞ্জন?

এ প্রশ্ন শা-নওয়াজ আমাকে আরো অনেকবার করেছে এবং আমিও উচ্ছ্বসিত ভাষায় তার জবাব দিয়েছি। তাই এবারেও সংক্ষেপেই বললাম, মার্ভেলাস!

—সত্যিই মার্ভেলাস! একেবারে নীট, টিপটপ। নাইন্টিন ফরটিফোর মডেল। অনেক ঘুরে কেনা, বাজে হওয়ার মতো জিনিসই নয়।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

—আমার কতদিনের স্বপ্ন!—শা-নওয়াজের গলা গভীর হয়ে এল: পাশ দিয়ে যখন বড়লোকের মোটর ছুটে বেরিয়ে গেছে, ধুলোয় অন্ধ হয়ে চোখে কাপড় দিয়ে ভেবেছি, দিন আমার কখনো কি আসবে না? নিজেকে এত ছোট লেগেছে, এমন অপমানিত বোধ হয়েছে!

—তাই যুদ্ধের বাজারে গাড়ি কিনে বুঝি সে অপমানের প্রতিশোধ নিলে?

—নিশ্চয়—অনেকটা যেন অপত্যস্নেহে অভিভূত হয়েই শা-নওয়াজ স্টিয়ারিঙের গায়ে হাত বুলোতে লাগল: এ আমার স্বপ্নের বাস্তব রূপ। সত্যি বলতে কি ভাই, গাড়িটার আমি প্রেমে পড়ে গেছি।

—তাই বলে অ্যাক্‌সিডেন্ট ঘটিয়ো না এখন।

আমি সাবধান করে দিলাম। বোঁ-ও-ও—নক্ষত্রবেগে ছুটে বেরিয়ে গেল আমাদের গাড়িটা। একটুর জন্যে চাপা পড়েনি একটা নেড়ী কুকুর।

—নন্‌সেন্স,—মুখ বাঁকিয়ে শা-নওয়াজ বললে, নন্‌সেন্স! কী হয় একটা কুকুর চাপা পড়লে? মোটর চিরকালই চলবে এবং যারা চাপা পড়বার চিরদিনই চাপা পড়বে তারা। সি. এস. পি. সি. এ. কিংবা ওই সব প্রাণী-হিতৈষণায় আমার কোনোরকম সহানুভূতি

নেই। মানুষের সমস্যার সমাধানই যেখানে হচ্ছে না, সেখানে ইতর জীবের জীবন-মরণ নিয়ে ভাবতে যাওয়া pure and simple idiocy !

আমি ব্যথিত হয়ে উঠলাম : তাই বলে শুধু শুধু কুকুরটাকে চাপা দেবে নাকি ?

—ধ্যাৎ।—স্টিয়ারিঙের ওপর শা-নওয়াজের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে আঁকড়ে পড়ল : তোমার রোমান্টিসিজ্‌ম বড্ড বেশি অ্যানিম্যাল-ধর্মী, রঞ্জন। পঞ্চাশ লাখ মানুষের মরণ সয়ে গেলে নির্বিবাদে, আর একটা কুকুরের কথা ভুলতে পারছ না ?

বিরক্ত হয়ে বললাম, কী করতে বলো তুমি ?

—কিছুই করতে বলি না—কথাটার মাঝখানে হঠাৎ যেন একটা থাবা দিয়ে সব কিছুকে থামিয়ে দিলে শা-নওয়াজ। গগ্‌ল্‌সের আড়ালে ওর চোখ দুটো অদৃশ্য, কিন্তু মুখের ওপর একটা কঠিনতার নির্মম রেখা আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম। এটা ওর চরিত্রের সত্যিকারের বৈশিষ্ট্য। যেমন দৃঢ়ব্রত, তেমনি নিষ্ঠুর। সি-পি-র জঙ্গলে গিয়ে তাঁবু গেড়ে মিলিটারী কণ্ট্রাক্টের বাঁশ কেটেছে, বাঘের ভয়ে চারদিকে মশাল জেলে দিয়ে রাত কাটিয়েছে ; আসামের আরণ্য-দুর্গমতায় পাগ্‌লা হাতীর উপদ্রবের মধ্যেও কাঠ ভাসিয়েছে ডিহাং নদীর জলে। যুদ্ধের বাজারে না নিয়েছে এমন কণ্ট্রাক্ট নেই। জীবনের সংকল্পে নির্ভীক এবং একনিষ্ঠ।

বিপরীত-ধর্মী মানুষের পরস্পরের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—অনেকটা বৈদ্যুতিক নিয়মে। তাই আমার মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের বাসিন্দা এবং একান্ত ভাবে ঘরকুনো অতি সাধারণের সঙ্গে বন্ধুতা হয়েছে ওর। ওর নানা অভিজ্ঞতা থেকে গল্প লেখার প্লট পাই আমি। তা ছাড়া নতুন কোনো কণ্ট্রাক্টের টাকা পেলেই ও পেট ভরে বিলিতী খাবার খাইয়ে দেয় আমাকে। সুতরাং শা-নওয়াজকে আমি ভালোবাসি।

মোটর চলেছে। বাইরের গতিহীন পৃথিবী ছায়াছবি হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে মুহূর্তে। নিচের আলোর রাস্তায় একটা বাছুর প্রাণপণে ছুটছে মোটরের সঙ্গে, হয়তো পাল্লা দিচ্ছে, অথবা এই ভয়ানক জন্তুটার হাত থেকে কোন্ পথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে তারই দিশে পাচ্ছে না হয়তো। দু'দিকে ধানের ক্ষেতে বয়ে যাচ্ছে সবুজের জোয়ার, চকচক করে উঠছে বিল, কখনো বা এক-একটা পদ্মবন। কাদা মেখে দুটো মহিষ বিলের মধ্য থেকে মাথা তুলেছিল, কিছু একটা বিপদ আশঙ্কা করে আবার চট করে মাথা নামিয়ে নিলে তারা। পি. ডব্‌লু. ডি.-র রাস্তাটা একটা কালো ফিতের মতো গুটিয়ে আসছে ক্রমাগত।

সামনের কাঁচটা কাঁপছে, তার ওপরে একপর্দা ধুলো। শা-নওয়াজের গগ্‌ল্‌সের ওপরেও লাল ধুলোর হালকা আবরণ পড়েছে একটা। রুমালে গগ্‌লস্‌টা মুছে নিয়ে ও তাকালো আমার দিকে।

—কী ভাবছ ?

—কিছুই না—বাইরের দিকে চোখ রেখে আমি জবাব দিলাম।

শা-নওয়াজ কয়েক মুহূর্তে চুপ করে রইল। একটা মোষের গাড়িকে সচেতন করে দেবার জন্মে হর্ন বাজালে বারকতক। তারপরে আবার ফিরে তাকালো।

—পঞ্চাশ লাখ লোক মরে গেল। ভালোই হল। বেশি লোক থাকলেই অসুবিধে, সবাই পথ চলতে চায়, অনাবশ্যক ভিড করে রাস্তায়। তার চাইতে ভিড়টা বরং কিছু পাতলা হওয়া দরকার, মোটর চালানো যায় আরামে।

—তোমার ফিলসফিটা ঠিক ধরতে পারছি না—বেশি সিনিক্যাল্ ঠেকছে।

ও একটু হাসল। কঠিন মুখের রেখাগুলো কেমন বিচিত্র আর কোমল হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্মে।—সিনিসিজ্‌ম নয়। এটা জীবনদর্শন।

—তার মানে ?

ভোঁপ—ভোঁপ। একটি সাঁওতাল-দম্পতি। পুরুষটির কাঁধে মাদল, মেয়েটির খোঁপায় শিরীষ ফুল আর একরাশ সবুজ পল্লব, কষ্টিপাথরে তৈরি দুটো কালো মূর্তি সুঠাম, সুছাঁদ। বিভোর হয়ে পথ চলেছে দু'জনে, হয়তো প্রথম প্রেম, হয়তো সদ্যোবিবাহিত। তাই বাইরের জগৎ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন নয়। কিন্তু আর একটু হলেই দু'জনকে একসঙ্গে সহমরণে যেতে হত।

—ইডিয়ট্‌স। চাপা পড়ত এক্ষুনি।

আমি হাসলাম: ওরা এখন আলাদা মানুষ। নিজেদের বাইরে পৃথিবীর কোনো জিনিসই ওদের চোখে পড়ছে না।

—তাই বলে পৃথিবী ওদের ক্ষমা করবে না কোনোদিন। একচক্ষু হরিণের মৃত্যু হয়েছিল এম্‌নি করেই—শা-নওয়াজ কথটা যেন ছুঁড়ে মারল আমার মুখের ওপর।

ভারী আশ্চর্য লাগছে আমার। এতদিন ওকে শুধু লাভ-ক্ষতির হিসেব করতেই শুনেছি; উধ্বশ্বাসে ছুটতে দেখেছি বড়বাজারে, ড্যালহাউসি স্কোয়ারে, শেয়ালদা আর হাওড়া স্টেশনে, মিলিটারীদের হেড কোয়ার্টারে। কিন্তু এই ঝকঝকে দামী নতুন মোটরে, জনবিরল গ্রামের পথ দিয়ে চলতে চলতে ও যেন নতুন মানুষ হয়ে গেছে। অথবা এই ধানক্ষেত আর বিস্তীর্ণ গ্রামের প্রান্তরের মধ্যে এসে সত্যিকারের মানুষটারই পরিচয় পাচ্ছি হয়তো।

বললাম, আজ তোমার হয়েছে কী ?

মুখের রেখাগুলো আবার কঠিন হয়ে উঠেছে ওর। অ্যাক্‌সিলেটারে চাপ পড়ছে আবার। খুব আস্তে আস্তে কথা বললে ও। বাতাসে শব্দের অনেকটা উড়িয়ে নিয়ে গেল, তবুও আমি শুনতে পেলাম: নিজের কথাই ভাবছি।

—নিজের ?

—হাঁ, নিজের বই কি। কম দুঃখে মানুষ হইনি ভাই। ছেলেবেলায় বাপ মরে গেল। বড়লোকের ঘরে জন্মাইনি, মা করত মোড়লের বাড়িতে বাঁদীর কাজ। পানের থেকে চুন খসলে মোড়লের ছোট বিবি মাকে লাথি মারত; সেই লাথির ফলে বেচারার সামনের দুটো দাঁত ভেঙে গিয়েছিল। মরবার সময় পর্যন্ত সে চিহ্ন মা সগৌরবে বহন করেছে।

—সে কথা এখন ভুলে যাও—আমি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম : তুমি তো মানুষ হয়েছ আজকে।

—মানুষ ? তা হবে।—ওর মুখে আবার এক টুকরো হাসি রেখায়িত হয়ে উঠল : আইনসঙ্গত ভাবে—কথাটার ওপরে জোর দিয়ে শা-নওয়াজ বললে, আইনসঙ্গত ভাবে মানুষ হয়ে উঠতে গেলে যা যা দরকার, তার কিছু কিছু আমার ছিল বই কি। লেখাপড়ায় খারাপ ছিলাম না। মাইনারে বৃত্তি পেয়েছিলাম ডিভিশনে ফার্স্ট হয়ে, ম্যাট্রিক পর্যন্ত চালিয়েছিলামও মন্দ নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাট্রিকটা আর পাস করতে পারলাম না।

—কেন পারলে না ?

—কী করে পারব। পড়ছিলাম অবশ্যি খেটেখুটেই, মাস্টাররাও অনেক আশা করতেন আমার ওপর। পরীক্ষার তখন আর দিন পনেরো বাকি। খুব মন দিয়ে অ্যাল্‌জাব্রার অঙ্ক কষছি। হঠাৎ মা-র হাঁউমাউ কান্না শুনে বাইরে ছুটে এলাম।

শা-নওয়াজ একটু একপেশে করে নিলে গাড়িটা—কীপ্‌ টু ইয়োর লেফ্‌ট। উল্টো দিক থেকে বেরিয়ে গেল বিরাট মূর্তি মিলিটারী ট্রাক। খালি গায়ে অসংখ্য উল্‌কি-আঁকা দু'জন আমেরিকান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। আমাদের ঝকঝকে নতুন গাড়িটার ওপর কিছুটা যেন ঈর্ষার দৃষ্টি ফেলে গেল।

—বাইরে বেরিয়ে দেখি—ও আবার শুরু করলে : মা উঠোনে দাঁড়িয়ে। সারা গায়ে মারের দাগ, কোথায়ও ফুলে উঠেছে, কোথাও কেটে বসেছে। ময়লা ফতাটা রক্তে রাঙা। ব্যাপারটা শুনলাম। মোড়লের বড় ছেলে এসেছে শহর থেকে, তারই জামার পকেট থেকে চুরি গেছে দু'খানা দশ টাকার নোট। বাড়িতে অবশ্য বাজে লোকের অভাব ছিল না, কিন্তু যে সব চাইতে নিরীহ আর অসহায় তাকেই তো অপরাধী করা সব চাইতে সহজ। তাই মোড়লের ছোট বিবি, বড় আদরের নিকার বিবি সন্দেহ করেছে, এ মার-ই কাজ। অস্বীকার করাতেও চোরের মারটা বাদ যায়নি। অথচ মার সম্বন্ধে এ অপবাদ দেওয়া যে কতটা মিথ্যে তা ওরা নিজেরাও কিছু কম জানত না। কিন্তু—শা-নওয়াজ বিকৃত ভাবে হাসল : অন্যায় হয়ে গেলে কাউকে তো শাস্তি দিতেই হবে ভাই। হবুচন্দ্র রাজার বিচার এই কথাই বলে। চুরি করতে গিয়ে চোর যদি দেয়াল চাপা পড়ে মরে তা হলে কুমোরকে ধরে ফাঁসি দাও। আইনের মর্যাদা তো রাখতে হবে।

—কী ভয়ানক অন্যায় !—আমি অভিভূত হয়ে বললাম।

—না, না, অন্যায় নয়।—শা-নওয়াজের মুখে হাসিটা তেমনি করেই লেগে রইল : এইটেই তো আইন। কিন্তু তখন প্রথম যৌবন, রক্ত গরম, আইন-কানুনের এত সব খুঁটিনাটি ব্যাপার কি আর জানতাম। আমার মাথার মধ্যে দপ করে আগুন জ্বলে গেল। হাতের কাছ থেকে কী একটা কুড়িয়ে নিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই, হয়তো লাঠি, হয়তো আস্ত একটা বাঁশের টুকরো। মা চিৎকার করে কেঁদে আমাকে নিষেধ করলে, কিন্তু আমি শুনতে পেলাম না। ছুটে বেরিয়ে গেলাম মোড়লের বাড়ির উদ্দেশে। পড়বি তো পড়—সামনেই মোড়লের বড় ছেলে। হাতে হুইল, মুখে সিগারেট, পুকুরে মাছ ধরতে চলেছে। কী একটা জিজ্ঞেস করলাম, উত্তর পেলাম কদর্য আর কটুভাষায়। 'বাঁদীর বাচ্চা', কথাটা কানে ঢোকবামাত্র আমার আর হিতাহিত জ্ঞান রইল না। হাতের বাঁশটা চলতে লাগল নির্বিচারে। যখন খেয়াল হল, তখন তাকিয়ে দেখি মোড়লের বড় ছেলে মাটিতে পড়ে আছে নিঃসাড় হয়ে, মাটি ভিজে গেছে রক্তে।

আমি শিউরে উঠলাম : খুন করে ফেললে ?

শা-নওয়াজ এবারে শব্দ করে হেসে উঠল : পারলাম কই। ইচ্ছে তাই ছিল বটে, কিন্তু বড়লোকের জান কড়া, অত সহজে ওরা মরে না। ঠিক সেরে উঠল।

—আর তুমি ?

—আমি ? বুঝতে পারছ না এখনো ?—শা-নওয়াজ একবার বাইরের দিকে তাকালো। কালো পীচের পথ দুলে দুলে অদৃশ্য হচ্ছে। দু'পাশে শৃঙ্খলিত মাইল-পোস্টগুলোর অভিযান। বাঁশের বনে বাতাস ঢেউ দিয়ে যাচ্ছে।

—মোড়ল ছিল ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। থানার দারোগা মাসে পনেরো দিন তার বাড়িতে পোলাও খেত। আমি সদরে চালান হয়ে গেলাম। হাকিম ছিলেন দয়ালু—সাক্ষাৎ ড্যানিয়েল। সবটা শুনে মাত্র তিন মাস জেল দিলেন আমার।

—তিন মাস ! জেল খাটলে ?

—খাটলাম বইকি।—গগ্‌লসের ভেতরে শা-নওয়াজের চোখ জ্বলছে, বাইরে থেকেও আমি তা টের পেলাম। সে বলতে লাগল : জেলখানা না দেখলে মানুষ গড়বার এমন সার্থক যন্ত্রটির পরিচয় অজানাই থেকে যেত। পাথর ভাঙলাম, বুটের লাথি খেলাম, সরকারকে সেলাম দিয়ে রাজভক্তি শিখলাম। তিন মাস ধরে সরকারের সযত্ন পরিচর্যায় একেবারে বিশুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে এলাম আগুনে-পোড়া খাঁটি সোনা যাকে বলে। তখন আমার চরিত্রের উৎকর্ষ দেখলে দেবতাদেরও হিংসে হত। ম্যাট্রিক তো ওই পর্যন্তই, বেরিয়ে দেখি মা-ও মরে বেঁচেছে।

আমি চুপ করে রইলাম। মনে হল, কুকুর চাপা দেবার অধিকার শা-নওয়াজের

নিশ্চয়ই আছে।

—তারপর গ্রাম ছাড়লাম। কী জন্যে আর গ্রামে থাকব? সামনে এসে দাঁড়ালো প্রকাণ্ড পৃথিবী, ডেকে বললে, আমাকে জয় করে নাও। এসে ভিড়লাম উত্তরপাড়ার এক চটকলে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলাম, চাকরি টিকল না। মালিক জেলে পাঠাবার উপক্রম করলে। সরকারী রিফাইনারীর সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা করবার ইচ্ছে ছিল না, সটকে পড়লাম। চিৎপুরের হোটেলে খাতা লিখলাম, ক্যানিং স্ট্রীটে মনোহারীর দোকান নিলাম, কত কী করলাম, কিন্তু কোনোটাই পোষাল না। জীবনের মূলমন্ত্র তখনো জানিনি কিনা।

—তারপরে জানলে?—আমি অন্যমনস্কের মতো জিজ্ঞাসা করলাম।

—জানলাম বই কি—হঠাৎ অ্যাক্সিলেটারে আবার চাপ পড়ল। গাড়িটার স্পীড বাড়ছে ক্রমাগত, ট্রাফিক পুলিস থাকলে এতক্ষণে আইনের আওতায় আসতাম আমরা।—তার ফলেই এই গাড়ি। অনেক ঠেকে-শেখা, অনেক অভিজ্ঞতার পরে এই পুরস্কার। তাই তো গাড়িটাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি।

শা-নওয়াজ পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেট ধরালে আর একটা বাড়িয়ে দিলে আমার দিকে। দু'জনে নীরবে সিগারেট টানতে লাগলাম। মোটরের চাকার তলায় পথটা আছড়ে পড়তে লাগল ক্রমাগত।

নিঃশব্দ কয়েকটা মুহূর্ত। শুধু গাড়ির চাকার গতির ছন্দ। স্প্রীংয়ের গদিতে মৃদুমন্দ দোলা লাগছে: শা-নওয়াজের কথাগুলোই ভাবছি আমি। এইজন্যেই ও এত লোভী, এত উদগ্র। ক্ষমা করতে চায় না, যা কাছে আসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় দু'হাত দিয়ে। পৃথিবীর ওপরে ও যেন প্রতিশোধ নেবে।

আমার মনের কথাটা কি বুঝতে পারলে ও? একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে আবার আরম্ভ করলে: তারপর এল যুদ্ধ। টোট্যালিটারিয়ান ওয়ার। পৃথিবীর সবকিছু নিয়ে টান পড়ল একসঙ্গেই। আমার মতো অকেজো লোকও বাদ গেল না। সি. পি.-র জঙ্গল থেকে বাঁশ কেটে আনবার কণ্ট্রাক্ট পেলাম, দু'বার মরতে মরতে বেঁচে গেলাম—একবার বাঘ, একবার ভালুকের হাত থেকে। আসামের পাহাড়ে মাতলা হাতী যখন মড়মড় করে আমার ছাউনি ভেঙে ফেললে তখন কী করে যে বেঁচে গিয়েছিলাম আজও জানি না। কিন্তু এইটে বুঝেছিলাম, মানুষের চেয়ে হিংস্র নয় ওরা। আর টাকা পেয়েছিলাম—অনেক টাকা। তারপরে নিলাম ধানচালের কণ্ট্রাক্ট। তারও পরে কী যে হল সে তো তুমি জানোই।

—তুমি ব্যবসায়ে লাল হয়ে গেলে।

—হ্যাঁ লাল হয়ে গেলাম—একধার থেকে পারচেজ করতে লেগে গেলাম, রাশি রাশি মিথ্যে কথায় ঠকালাম নিজেকে, নিজের দেশের লোককে। আর পঞ্চাশ লাখ মরা মানুষের রক্তমাখা টাকায় বাড়ি কিনেছি গাড়ি কিনেছি। কলকাতার রাস্তায় পায়ের নিচে

মাড়িয়ে গেছি মড়া। ভাতের ফ্যানের জন্যে যখন জীবনের অপমান তার কঙ্কালসার হাত বাড়িয়ে দুয়োরে দুয়োরে কেঁদে বেড়িয়েছে, তখন দামী দামী খাবার কিনে কুকুরকেই খেতে দিয়েছি, মানুষকে নয়। মানুষ হাত পাতলে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি।

ওর কথাগুলো চাবুকের মতোই আঘাত করছে—আমি চমকে উঠলাম। গাড়ির স্পীড বাড়াচ্ছে শা-নওয়াজ, পাগলের মতো স্পীড বাড়াচ্ছে। মাইল-পোস্টগুলোর ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে, স্প্রীংয়ের গদির দোলাটা যেন ঝাঁকানিতে রূপান্তর নিয়েছে। শা-নওয়াজের মুখটা অস্বাভাবিক রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, গগ্‌লসের ওপরে ধুলোর আবরণ। গতিকটা ভাল ঠেকছে না, অত্যন্ত অস্বাভাবিক লাগছে কথাবার্তাগুলো। একটা অ্যাকসিডেন্ট ঘটাবে না তো?

বললাম, কী করছ পাগলের মতো? এমন র‍্যাস চালাচ্ছো কেন?

—ভয় করছে?—একটা স্নিগ্ধ হাসিতে ওর মুখ উজ্জল আর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল: না না, ভয় নেই। আমাদের মোটর এমনি স্পীডেই চলবে অনেকটা, অনেকদিন। অপঘাত একদিন তো আসবেই—কাজেই যতটা পারি চলার সাধ মিটিয়ে নিই, যতগুলো পারি কুকুরকে চাপা দিয়ে যাই। কিন্তু শা-নওয়াজ আবার হাসল: আজকে অন্ততঃ অ্যাকসিডেন্ট ঘটবে না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। পি. ডব্‌লু. ডি.-র চমৎকার রাস্তা, দেখতে পাচ্ছ না?

আমি চুপ করে রইলাম।

তেমনি স্নিগ্ধস্বর বেজে উঠল শা-নওয়াজের গলায়: আচ্ছা থাক, আস্তেই চালাচ্ছি। কিন্তু তুমি তো এখনো গাড়ি কিনতে পারনি রঞ্জন, তাই চলার আনন্দটা বুঝতে পারবে না। ব্লেসেড আর দোজ্‌—।

রোদ প্রখর হয়ে উঠেছে। বিল আর ধানক্ষেতের দাক্ষিণ্য। কল্পনাই করা যায় না এত ধান সত্ত্বেও বাংলাদেশের ওপর দিয়ে কেমন করে এতবড় একটা মৃত্যুর স্রোত বয়ে গেল।

—আজ গ্রামে চলেছি। আর কোন উদ্দেশ্য নেই। শুধু দেখব যারা আমার ওপর এতখানি অত্যাচার করেছিল তাদের কতখানি প্রতিশোধ দিতে পেরেছি। দেখব আজ আমার মোটরের পথে কতটা বাধার সৃষ্টি করতে পারে ওরা।

নিঃশব্দে কাটল আরো খানিকটা। তার পরেই ঝপ্‌-ঝপাং। গাড়িটা একটা বাঁক নিয়েছে। পি. ডব্‌লু. ডি.-র রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়েছে কাঁচা মাটির পথে। লোক্যাল বোর্ডের রাস্তা—প্রায় দুর্গম।

আমি বললাম, এই গ্রামের পথ?

—হ্যাঁ, সামনেই গ্রাম।—শা-নওয়াজ যেন ঘুমের মধ্যে থেকে জেগে উঠল: আমার

হোম্—সুইট হোম্।

হেলে-দুলে এগোতে লাগল গাড়ি, কমতে থাকলো স্পীড। সামনেই বড় একটা খামারবাড়ি। শূন্য গোলা, ওপরের খড় ঝরে পড়েছে। দু'তিনটে বড়বড় ঘর মাটিতে লুটোবার উপক্রম করছে। বিষণ্ণ আম-বাগানের ছায়ায় যেন মৃত্যুর মধ্যে ঝিমিয়ে গেছে সমস্ত। শুধু কোথায় ঘুঘু ডাকছে—ক্লান্ত আর করুণ একটানা স্বর।

শা-নওয়াজ বললে, এই মোড়লের বাড়ি।

—মোড়লের বাড়ি?

—হ্যাঁ।—বিকৃত মুখে শা-নওয়াজ বললে, কিছু আর বাকী নেই। মন্বন্তর এদের শেষ করে দিয়েছে, এদের চাল কিনে আমি বিক্রি করেছি চোরাবাজারে। অথচ একদিন—একদিন এদের বাড়িতে দু'বেলায় পঞ্চাশ জনের শান্কি পড়ত।

ঘ্যাঁচ্—ব্রেকে চাপ পড়েছে। মোটর থেমে দাঁড়াল।

ঘুঘুর ডাকটা বন্ধ হয়ে গেল—সামনে থেকে এই দিন-দুপুরেই দৌড়ে পালালেই শেয়াল। কোথা থেকে ছড়িয়ে পড়ল কোনো একটা মৃত প্রাণীর জান্তব দুর্গন্ধ। আর ভেঙেপড়া সেই বাড়িটার থেকে বেরিয়ে এল একটা বুড়ি—পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিচিত্র একটা সামঞ্জস্য নিয়ে। অনাহার আর ব্যাধিবিশীর্ণ চেহারা—চোখে মুখে যুগান্তরের ক্ষুধা, অসংখ্য মৃত্যুর শোকচিহ্নে যেন রেখায়িত। অনাহার-বিহ্বল চোখে আমাদের গাড়ির দিকে সে তাকিয়ে রইল। তার সর্বাঙ্গে একটা অর্থহীন আতঙ্ক, পাণ্ডুর ছায়াভাস। সে ভালো করে কিছু বুঝতে পারছে না, কিন্তু ভয় পেয়েছে।

—যা দেখছি—চাপা নিষ্ঠুর গলায় শা-নওয়াজ বললে, একজন টিকে আছে এখনো। ওকেও যদি শেষ করতে পারতাম তাহলে অনুষ্ঠানটার কোথাও কিছু বাকি থাকত না। কী বলো রঞ্জন?

আমি আর কী বলব? যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি, আমার মাথার মধ্যে কী একটা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। হয়তো অতিরিক্ত পথ চলবার ক্লান্তিতেই। ও কি নিষ্ঠুর, ও কি সিনিক্? অথবা যা বলছে তার উল্টোটাই ও মানে করতে চায়? আমি শুধু নির্নিমেষভাবে ওই বুড়িটার দিকেই তাকিয়ে রইলাম। বুভুক্ষু বাংলার প্রতিচ্ছবি।

—চলো, আরো এগিয়ে যাই। জাস্ট্ দি শো বিগিন্‌স্।

আম-বাগানের মধ্য দিয়ে ছায়াচ্ছন্ন দুর্গম পথ। ক্রমশই ঝাঁকানি লাগছে। নাইন্টিন ফরটিফোর মডেল টিপটপ আমেরিকান গাড়ি বাংলার পল্লীর এই গ্রাম্যতাকে ঠিক বরদাস্ত করতে পারছে না। স্প্রাংয়ের গদিতে বসেও ব্যথা পাচ্ছি।

কিন্তু ঘস্-স্—আবার গাড়িটা থেমে গেল।

—কী হল?

শা-নওয়াজ বললে, আর পথ নেই, সব কবর।

—কবর ?

—হ্যাঁ, কবর—রাস্তাঘাট সব জুড়ে কবর দিয়েছে, আল্লাতলী—অর্থাৎ আল্লার দরবারে এত লোকের ঠাঁই হয়নি একসঙ্গে। তাই বাংলা-দেশের মানুষ বাংলার পথে-ঘাটে সব জায়গাতেই ছড়িয়েছে মৃত্যুশয্যা। আমার ধানচালের কণ্ট্রাক্ট সার্থক হয়েছে।

শা-নওয়াজ হাসল। হাসল কি ? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—মানুষ নেই, কিন্তু কবর আমার মোটরের পথ আটকে দিয়েছে। চলো শহরেই ফিরে যাই। সেখানে সাফ্ রাস্তা। সরকারী লরী আছে, ডেস্টিট্যুট ক্যাম্প আছে, মড়ায় পথ আটকাবার ভয় নেই।—চাকার নিচে একরাশ ভাঁট-ফুলের অরণ্যকে মর্দিত করে শা-নওয়াজ গাড়ির মোড় ঘুরিয়ে দিলে।

আবার কাঁচা-রাস্তায় ঝাঁকানি খেতে খেতে আমাদের নতুন মোটর এগিয়ে চলল পি. ডব্লু. ডি.-র মখমল মসৃণ রাজপথের দিকে। আর, শোনা যায় না প্রায় এমনি নিঃশব্দ গলাতে আমার কানের কাছে মুখ এনে শা-নওয়াজ বললে, আচ্ছা বলতে পারো, রঞ্জন, মরা-মানুষ আবার কি বেঁচে ওঠে কোনোদিন ? কবর ফুঁড়ে তারা কি উঠে আসে কখনো ?

তীর্থযাত্রা

মেঘনার জল কালীদহের মতো কালো। কালো কালো ঘূর্ণি যেন সাপের মত কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। টলমল করে উঠেছে এতবড় ভাওলী নৌকাখানা। নরোত্তম বললে, হুঁসিয়ার ভাই হুঁসিয়ার।

কঠিন মুঠোতে হালের আগা আঁকড়ে ধরে ফরিদ মাঝি তাকালে আকাশের দিকে। উত্তরে যেখানে তীরতটের কাছে গাংশালিকের ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে আর নিরবচ্ছিন্ন খানিকটা সবুজ অরণ্যকে দেখা যাচ্ছে ঝাপসা ভাবে, ঠিক ওইখানে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের রাশ জমে উঠেছে। ফরিদ মাঝি জানে লক্ষণটা ভালো নয়। কালো কালিন্দীর মতো মেঘনার জল থেকে কালীয়নাগের বিষ-নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে যে কোনো মুহূর্তে ওই হাঁসের পাখার মতো মেঘ কষ্টিপাথরের রঙ ধরে দিগদিগন্তকে গ্রাস করে ফেলতে পারে। তারপর মাতাল মেঘনা তো রইলই।

ঘূর্ণির আকর্ষণে ভাওলী নৌকা থরথর করে কাঁপছে। নিজের অজ্ঞাতেই নরোত্তমের একখানা হাত চলে গেছে মলিন পৈতার গুচ্ছের ভেতরে। নাঃ—নিজের প্রাণের ভয়

করে না নরোত্তম। জীবন তো পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো, একদিন টপ করে ঝরে যেতে পারে। দেহতত্ত্বের গানে বলেছে ধূলোর দেহ একদিন ধূলো হয়ে যাবেই—কালের অনিবার্য করাল স্পর্শকে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না কোনোদিন। ধূলো না হয়ে দেহটা জলে জলাঞ্জলি হয়ে গেলেও নরোত্তমের দিক থেকে আক্ষেপ নেই কিছু। কিন্তু এতগুলো প্রাণীকে জলে ডুবিয়ে মারলে যে মহাপাতক এসে তার ওপরে অর্শাবে, তার জন্যেই নরোত্তম খুব বেশি পরিমাণে চিত্ত-চাঞ্চল্য বোধ করেছে।

—ও মাঝি ভাই, হুঁসিয়ার। দেখো, সবসুদ্ধ জলে ডুবিয়ে মেরো না যেন।

ক্যাঁচ্। নৌকাটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাল ঘুরে গেল। বিন্দু বিন্দু ঘামে ফরিদের দু'হাতে কঠিন মাংসপেশী দুটো জ্বলছে—শক্তি আর আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। করকরে ভাঙা-গলায় ফরিদ বললে, তুমি চুপ করে বসো না ঠাকুর। পাঁচপীরের নাম নিয়ে পাড়ি ধরেছি—যা করবার আল্লা করবেন।

ফরিদের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল নরোত্তম। লোকটা দেখতে কুৎসিত। শুধু কুৎসিত নয়—ভয়ঙ্কর। পুরু পুরু প্রকাণ্ড ঠোঁট দুটো কাত্‌লা মাছের মতো বাইরের দিকে ঝুলে পড়েছে। অসংখ্য লাল লাল শিরায় রেখাঙ্কিত চোখে যেন একটা ক্ষুধার্ত বন্য জন্তুর পিঙ্গল হিংস্রতা। গালে আর কপালে রাশি রাশি ব্রণের ক্ষতচিহ্ন। নিষ্ঠুর উদ্দাম মেঘনার সঙ্গে যেন কোথায় ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে লোকটার।

কিন্তু পাঁচপীর! বিশাল মেঘনার দিকে তাকিয়ে যেন আশ্বাস পায় না নরোত্তম। শুধু পাঁচপীরেই কুলোবে না। এই নদী পাড়ি দিতে তেত্রিশ কোটি দেবতার দরকার—নইলে উনপঞ্চাশ পবনকে ঠেকাবে কে? একটা বরুণ-মন্ত্র জানা থাকলে সুবিধে হত, জপ করা যেত এই সময়ে। ময়লা পৈতার ভেতরে নরোত্তমের আঙুলগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল।

নৌকায় অনেকগুলি প্রাণী। সবাই মিলে তারস্বরে কোলাহল জুড়ে দিয়েছে তারা। নরোত্তমের মেজাজ আরো বেশি করে বিগড়ে গেল। একা কত দিক সামলানো যায়!

ভাদ্রের ভরা গাঙ্। আকাশে শরতের নীলাঞ্চল মায়া ছড়িয়েছে। দূরে আধডুবো চরের উপরে চিকচিক করছে সোনা-মাখানো বালি, গুবকে গুবকে ফুটে উঠেছে কাশের ফুল। পাড়ের কাছে গাংশালিকের ঝাঁক উড়ছে। আশ্বিন আসন্ন।

পূর্ব-বাংলার নদী দিয়ে এই সময়ে চলাচল করে অসংখ্য ভাউলী নৌকা—নরোত্তমের এই নৌকাখানার মতো। ঘরে ঘরে দুর্গাপূজা—আনন্দ-মুখরিত শারদীয়ার আয়োজন। দেশ-বিদেশ থেকে ব্যবসায়ীরা বড় বড় নৌকায় বোঝাই দিয়ে পাঁঠা বিক্রি করতে আনে। মহিষমর্দিনী চণ্ডিকার মহাপ্রসাদ।

কিন্তু তেরশো পঞ্চাশ সালের আশ্বিন মাস। বাংলার সীমান্তে যুদ্ধের মেঘ

ধ্বনিয়েছে—মেঘনার উত্তর দিগন্তে মহানাগের বিষ-নিঃশ্বাসের মতো। এসেছে সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপে সাপ আর শেয়াল এসে বাসা বেঁধেছে। বোধনতলায় ছড়িয়ে আছে নরমুণ্ড। দেবী এবার আদৌ মর্তে আসবেন কি না পঞ্জিকায় উল্লেখ নেই। কিন্তু তাঁর দোলা-চৌদোলা যে আগে থেকেই পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ করবে কে? শাস্ত্র বলেছে, ফল মড়কং।

তাই পাঁঠার নৌকায় এবার পাঁঠা নেই। এবার নতুন পদ্ধতিতে দেবী-পূজার ব্যবস্থা। শহরের পূজামণ্ডপে ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্ত স্বর্ণযজ্ঞের আহুতি। বাংলার ঘরে ঘরে মঙ্গল-প্রদীপের শিখা নিবে গেছে, ছায়াকুঞ্জের নিচে সোনার পল্লীতে কল্যাণী গৃহবধূর কাঁকন আজ আর ছলভরে বেজে উঠছে না। ব্ল্যাক-আউটের দিনেও নিবে যাওয়া তুলসীতলার প্রদীপ সহস্র ছটায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে মহানগরীর গণিকা-পল্লীতে। সন্ধ্যাশঙ্খের শেষ পরিণতি হয়েছে ঘুঙুরের শব্দে, হারমোনিয়ামের বেতালা মত্ততায়, মাতালের জড়িত চিৎকারে। যুদ্ধের কণ্ট্রাক্ট যাদের রাতারাতি গৌরীসেনের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে, আজ সোনার বাংলা তাদের কাছে প্রতিফলিত হয়েছে সোনালী মদের ফেনিল পাত্রের ভেতরে।

নতুন পুজোর নতুন ব্যবস্থা। দেবী আর ভোলা মহেশ্বরের ভিখারিণী গৃহিণী নন—কুলত্যাগ করে তিনি কুবেরের অঙ্কলক্ষ্মী হয়েছেন। বাংলার নারীত্বও তাই আজ বিশ্ব-মাতার দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করেছে। যাজন-যজন নরোত্তমের পৈতৃক ব্যবসা, নতুন কালের হাওয়ায় তার রূপান্তর ঘটেছে। পাঁঠার নৌকায় একদল নারী বোঝাই দিয়ে নরোত্তম বিক্রি করতে চলেছে শহরে। শ্মশান বাংলার গ্রামে গ্রামে রিক্ত মহেশের দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ঘূর্ণি হাওয়ায় কেঁদে বেড়াচ্ছে।

নৌকার ভেতরে কলহ কোলাহল আর দাপাদাপি। ভাউলীখানা বাঁদিকে কাত হয়ে পড়ল। বলিষ্ঠ মুঠিতে নৌকার হালে মোচড় দিয়ে ফরিদ বললে, তোমার সোয়ারীদের একটু থামাও না ঠাকুর। যে হট্টগোল বাধিয়েছে। ঝড় আসবার আগেই ওরা ডুবিয়ে দেবে দেখছি।

ছইয়ের ভেতর মুখ বাড়িয়ে দিলে নরোত্তম।

—এই কী হচ্ছে ওখানে? একটু ক্ষান্ত হয়ে বোসো না সবাই।

কিন্তু ক্ষান্ত হবার মতো মনের অবস্থা নয় কারো। তেরো থেকে ত্রিশ পর্যন্ত নানা বয়সের এক দঙ্গল মেয়ে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাদুড়ের ছানার মতো ঝুলে রয়েছে তিন-চারটি শিশু। নরোত্তমের মতে এরা নিতান্তই অনাবশ্যক বোঝা, কিন্তু বর্জন করাবার উপায় নেই। কালো কালো জীর্ণ দেহ কতগুলো মানবের সমষ্টি। দেখলে বাৎসল্য জাগে না, পা ধরে টেনে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে মেঘনার অথই জলের মধ্যে। আরো যত বিড়ম্বনা ওই অপোগণ্ডগুলোকে নিয়েই।

ছোট ছেলেটাকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে প্রাণপণে চিৎকার করছে সরলা। ছেলেটার অঙ্গ-সংস্থান দেখলে মনে হয় কারো অসতর্ক খেয়াল কালো চামড়ায় ঢাকা অসংলগ্ন কতগুলো অপরিণত অবয়বকে জুড়ে দিয়েছে এক সঙ্গে। ঘাড়ে পিঠে দগদগ করছে ঘায়ের চিহ্ন—চোখ মেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকলে ঠেলে যেন বমি আসতে চায়। কিন্তু ওই বিকৃত জীবনটাকেই ঐকান্তিক ক্ষমতায় আঁকড়ে রেখেছে সরলা—বাইরের এতটুকু কাঁটার আঁচড় অবধি যেন সইতে দেবে না।

—তুমিই এর বিচার করো ঠাকুর। অমন ভালোমানুষ সেজে বাইরে বসে থাকলে চলবে না।

—কী বিচার করব আবার?—খেঁকিয়ে উঠল নরোত্তম।—জোড় হাত করে বলছি, জিবে শান দেওয়াটা একটু বন্ধ রাখো সকলে। শুকনো ডাঙায় উঠে যত খুশি চেঁচিয়ো, কিন্তু এখন—

সরলা কিন্তু থামতে চায় না। অদ্ভুত গলা—কানের মধ্যে শাণিত হয়ে বিঁধে যায় এসে। মাথার রুক্ষ চুলগুলো ঘাড়ের দু'পাশে গোছায় গোছায় ভেঙে পড়েছে—যেন রক্ষা-চণ্ডীর মূর্তি। দেখে নরোত্তমের ভয় করে।

—জানি, জানি, সুখীর ওপরেই তোমার যত নেকনজর। ওকে একটা কথা বলতে গেলেই তোমার বুক চড়চড় করে ফেটে যায়। অতই যদি এক-চোখোমি, তা'হলে ওকে নিয়ে মনের সাধে নৌকা-বিলাস করলেই তো পারেন। সবগুলোকে এক নৌকোয় ঠেলে তুলেছ কেন?

—আহা-হা থামো না। কেন এমন করে চিৎকার করছ, থামো না।—গলার স্বর শান্ত আর কোমল করবার চেষ্টা করলে নরোত্তম—বোঝাই তো সব, একসঙ্গে চলাফেরা করতে গেলে—

আড়চোখে নরোত্তম তাকালো সুখীর দিকে। আঠারো-উনিশ বছরের সুশ্রী মেয়ে। জাতে জেলে, কিন্তু মুখের শ্রী-ছাঁদ দেখলে সে কথা মনে হয় না কারো। বাইরে নৌকোর গায়ে কালো জল খেলা করছে, তার নির্নিমেষ চোখ দুটো নিবদ্ধ হয়ে আছে সেই জলের ওপর। নিজের ভেতরেই যেন একান্তভাবে নিমগ্ন হয়ে আছে সে। তাকে কেন্দ্র করে এত কলহ আর কোলাহল, কিছুই যেন তার কানে যাচ্ছে না।

দেখে অদ্ভুত একটা মায়া হল নরোত্তমের। মেয়েটার ভেতরে এমন একটা কিছু আছে যা সমস্ত মনকে অকস্মাৎ যেমন ব্যথিত, তেমনি পীড়িত করে তোলে। কিন্তু কী করতে পারে নরোত্তম? ব্যবসা ব্যবসাই, তার ওপরে কারো কোনো কথা চলে না।

সরলার চিৎকারের কিন্তু বিরাম নেই।

—খামোকা? খামোকা আমি চেঁচিয়ে মরছি, না? জিজ্ঞেস করো না তোমরা ওই

আদরের সুখীকে। আমার ছেলের গায়ে ঘা, আমার ছেলে মরে যাবে? তোর গায়ে ঘা হোক হারামজাদী, তুই মর্—মর্—মর্—

মট্ মট্ করে আঙুল মট্কাবার শব্দ কানে এল। সরলার চোখ রাক্ষসীর মতো জলছে। চমকে ছইয়ের বাইরে গলা টেনে নিলে নরোত্তম। যেন সরলার অভিশাপটা সাপের ফণার মতো উদ্যত হয়ে উঠে ঠকাস্ করে তারই বুকে একটা ছোবল মারবে।

দুর্বল গলায় নরোত্তম বললে, যাচ্ছ একটা ভালো কাজে, কালীঘাটে মা কালীর দরবারে। কিন্তু যা আরম্ভ করেছ তাতে মাঝ গাঙে নাও ডুবিয়ে তবে তোমরা ছাড়বে।

হালের মাচায় ফরিদ মাঝি পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে নিশ্চল হয়ে। উত্তরের আকাশে পেঁজা তুলোর মতো যে মেঘের টুকরোটা দেখা দিয়েছিল, হাওয়ার মুখে আবার যেন তা দিকচিহ্নহীন নীলিমার বুক বেয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। গাংশালিকের ঝাঁক চক্রাকারে ঘুরছে মাথার ওপর। গলুয়ের সামনে বসে যে দু'জন মাল্লা দাঁড় টানছে, তাদের পিঠে শুকনো ঘামের ওপর চিকচিক করছে শাদা শাদা লবণের বিন্দু।

কাত্লা মাছের মতো প্রকাণ্ড মুখখানায় খানিকটা ভয়ঙ্কর হাসি ফুটিয়ে তুলেছে ফরিদ।

—আর ভয় নেই ঠাকুর। ঝগড়ার চোটেই তুফান পালিয়েছে। যা সোয়ারী তুমি নিয়েছ, মেঘনার সাধ্য নেই যে এদের গিলে হজম করতে পারে।

—তা ঠিক।—অন্যমনস্ক ভাবে হেসে বিড়ি ধরালো নরোত্তম।

সত্যি এ এক মহা ঝকমারির কাজ। পরোপকার করতে গেলেও বিঘ্ন অনেক, অনেক বিড়ম্বনা। গাঁটের কড়ি খরচ করে সে এদের কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে, কালীঘাটে কালী দর্শনও করাবে, তাতেও তো মিথ্যে নেই কিছু। তারপরে? তারপরে যা হবে তার জন্যে তো আর দায়ী করা চলে না নরোত্তমকে। দেশ-গাঁয়ে পড়ে থেকে ভিটে কামড়ে মরে যাচ্ছিল সমস্ত, তার চাইতে এ সহস্র গুণে ভালো। তাসের গড়া সংসার তো দুর্ভিক্ষের একটা দমকাতেই ভেঙ্গে পড়েছে। ঠুন্কো আত্মসম্মান; পেটে ভাত না পড়লে যে তার এতটুকুও দাম নেই, এ সত্য নরোত্তম ভালো করেই জানে।

তাছাড়া এমন দোষই বা আছে কোন্খানে। কলকাতায় যারা এই জীবনকে মেনে নিয়েছে সহজ ভাবে, কেমন সুখে আছে তারা। শহরের সমস্ত বড়লোক তাদের পায়ের তলায় মাথা বাঁধা দিয়ে বসে আছে। রাত্রির আলোয় তাদের রঙ্মাখা মুখগুলো দেখে অপ্সরা বলে মনে হয়, ঋষি-মুনিরও বিভ্রম জাগে তাতে। গায়ে জড়োয়ার গয়না, দামী দামী শাড়ির চটক। ওদের একটি হাসির জন্যে মানুষ ভিটে-মাটি বন্ধক দেয়, ওদের অবজ্ঞার অপমানে লাখপতি আত্মহত্যা করে। ঘুঁটেকুড়ুনি থেকে রাজরাণী হতে পারে সবাই, নরোত্তমের সান্ত্বনা শুধু যৎকিঞ্চিৎ দালালী ছাড়া আর কিছুই নয়। নিঃস্বার্থ সেবাব্রত

ছাড়া আর কোন আখ্যা দেওয়া চলে একে ?

ফরিদ হাসে।

—ভালো ব্যবসা তোমার ঠাকুর। ধান চাল পাটের চাইতে ঝক্কি ঢের কম, কাঁচা পয়সা অনেক বেশি। আগে জানলে কে এমন করে নৌকো ঠেলে মরত ?

নৌকোর ভেতর দিকে আড়চোখে তাকালো নরোত্তম। সন্ত্রস্ত গলায় বললে, চুপ চুপ।

ফরিদ তবুও হাসছে। কিন্তু সত্যিই কি হাসছে! ওর চোখ দুটো দেখে নরোত্তমের সন্দেহ হল।

—তুমি তো বামুন। সমাজের ইজ্জত বজায় রাখা তোমার কাজ। ঘরের পর ঘর উজাড় করে মেয়েদের বিক্রি করে দিচ্ছ পেশাকারদের কাছে—সমাজের মুখে হাজার বাতির রোশনাই জ্বলে উঠছে নিশ্চয়।

নরোত্তম জবাব দিল না, কথাটা সে যেন শুনতেই পায়নি। নীরবে চিন্তাকুল মুখে সে শুধু বিড়িটা টেনে চলল। ফরিদের কথায় মাথার মধ্যে হিন্দুত্বের রক্ত চন চন করে উঠল একবার। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিবাদ বাধাবার মতো সময় এ নয়, মনের অবস্থাও নয়। এই হিংস্র উন্মত্ত নদীর কাণ্ডারী ওই লোকটা ইচ্ছে করলেই পাকের মধ্যে নৌকো ফেলে দিয়ে সবসুদ্ধ একসঙ্গে পাতালপুরীতে পৌঁছে দিতে পারে।

ফরিদ আবার বললে, ঠাকুরমশাই, মরে তুমি বেহেস্তে যাবে।

নরোত্তম তবু জবাব দিল না। বলছে বলুক। ও সব ছোট কথায় কান দিতে গেলে অনেক কাল আগেই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে হত। বিপন্ন নারীর একটা সুবন্দোবস্ত করে দিলে পাপ হবে এমন কথা শাস্ত্রে লেখা নেই কোথাও। কিন্তু ফরিদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। শাস্ত্রের গভীর রহস্য যবনে কেমন করে বুঝবে ?

মেঘনার মেঘবরণ জল প্রশান্ত মন্থর গতিতে চলেছে সমুদ্রের দিকে। অজস্র হাওয়ায় রাশি রাশি ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, নদীর বুকে ফুটছে ফেনার ফুল। যেন কালীয়নাগের হাজার ফণা ছোবল তুলছে একসঙ্গে। মহানাগের কুণ্ডলীর মতো এখানে ওখানে চক্রাকারে 'উলাস' দিচ্ছে শুশুকের দল। নৌকোর পচা কাঠ আর জলের একটা মিষ্টি গন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে বাতাস।

নৌকোর ভেতর থেকে গুনগুন করে একটা গানের আওয়াজের মতো কানে আসছে। সরলার চিৎকার থেমে গেছে, কিন্তু গান গাইছে কে ? সাগ্রহে কান পাতল নরোত্তম। না, গান নয়। সুমতি কাঁদছে। তারই চোখের সামনে তার স্বামী একরাশ বুনো লতা চিবিয়ে ভেদবমি হয়ে মরেছে, সেই শোকেই কাঁদছে।

কাঁদছে—কাঁদছে! নরোত্তমের মেজাজ যেন সপ্তমে চড়ে যায়। কেন কাঁদে, কার কাছে কাঁদে ? কে আছে কান্না শোনবার জন্যে ? অথচ সবাই কাঁদছে। মরবার আগে

সপ্তমে চেঁচিয়ে কাঁদছে, মরবার সময় অব্যক্ত যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে কাঁদছে। তবু ভালো, মরবার পরে মানুষের কান্না শোনা যায় না। তা'হলে সে কান্নার শব্দে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে যেত।

গুনগুন করে সুমতি কাঁদছে। নরোত্তমের দু'হাতে কান চেপে ধরতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে গলার ভেতর একটা গামছা ঠেসে দিয়ে সে কান্না বন্ধ করে দেয় সুমতির। তাদের পাশের গাঁয়ে একবার একটা খুন দেখেছিল নরোত্তম। সম্পত্তির লোভে বিধবা বড় ভাজের গলার ভেতর একখানা আস্তো থান কাপড় ঠেলে দিয়েছিল ছোট দেবর। মেয়েটার অস্বাভাবিক হাঁয়ের চেহারা দেখে তাকে মানুষ বলে মনে করবার উপায় ছিল না, চিরে যাওয়া গালের দু'পাশ দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত নেমে তার গলা পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছিল। উঃ, কত রকম বীভৎস ভাবেই যে মরতে পারে মানুষ! এই দুর্ভিক্ষের সময় পূর্ব-বাংলার গ্রামে গ্রামে যে তার রঙবেরঙের ছবি দেখেছে।

ঝপ ঝপ ঝপাস্। পাশ দিয়ে বারো দাঁড়ের একখানা ছিপ বেরিয়ে যাচ্ছে। মেঘনার জল থেকে উঠে আসা প্রেতমূর্তির মতো একদল অস্থিসার মানুষ দুর্বল হাতে দাঁড় টেনে চলেছে। বড় ভাউলীখানা দেখে বারো জোড়া কালিমাখানো চোখ জলজ্বল করে উঠল।

সমস্বরে প্রশ্ন এল: চাল আছে নৌকায়?

—না।

—ধান আছে?

—না।

বারো জোড়া হাতের দাঁড়ের টানে ছিপ এসে ভিড়ল ভাউলীর গায়ে। পাটাতনের ভেতর থেকে দু'তিনটে ল্যাজার ফলা ঝিকিয়ে উঠল একসঙ্গে।

—ধান চাল থাকে তো না দিয়ে এক পা এগুতে পারবে না।

হালের মুখে ফরিদ মাঝির পেশী কঠিন হয়ে উঠেছে।—হুঁসিয়ার। নৌকোয় সব জেনানা। ধান চালের দরকার থাকে অন্য তল্লাটে যাও, একটা দানাও মিলবে না এখানে।

পৈতে আঁকড়ে ধরে নরোত্তম দুর্গানাম জপছে, নৌকোর ভেতর থেকে উঠেছে মেয়েদের কান্না। কিন্তু একটিবার ভেতরে উঁকি দিয়েই বারো জোড়া চোখের আগুন নিবে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

—জাহান্নামে যাও।—বারোটি কণ্ঠে চাপা অভিসম্পাত। ঝপ ঝপ ঝপাস্। বারো দাঁড়ের ছিপ স্রোতের টানে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

নরোত্তমের ঠোঁট তখনো থরথর করে কাঁপছে। বড় রক্ষা পাওয়া গেছে এ যাত্রা। প্রাণে আর বল ছিল না, বুকের রক্ত শুকিয়ে গিয়েছিল একেবারে। ল্যাজা দিয়ে ফুঁড়ে

নদীর জলে ভাসিয়ে দিলে মা বলতেও নেই বাপ বলতেও নেই।

—ব্যাটারা ডাকাত নিশ্চয়।

কুশ্রী কুৎসিত মুখে ফরিদ ভয়ঙ্কর একটা হাসি হাসল।

—হ্যাঁ ঠাকুর, ওরা ডাকাত। তোমার মতো সাধু ফকির নয়।

সাধু ফকির! কথাটা কানে গিয়ে লাগে। সন্দিগ্ধ চোখে ফরিদের দিকে তাকালো নরোত্তম। হাঁ, ঠাট্টাই করছে। কিন্তু যা বলে বলেই যাক—উত্তর দেবার সময় এখনো আসেনি।

পালে জোর বাতাস লেগেছে, তর্‌তর্‌ করে ঢেউ কেটে বেরিয়ে চলেছে নৌকো। চরের ওপর শাদা কাশবনে চখা-চখী উড়ছে। বহু দূরে কোথা থেকে ভেসে আসছে ঢাকের অস্পষ্ট শব্দ। আজ থেকে কি মহাপূজোর বোধন লাগল?

উপরে নির্মেঘ নীল আকাশ। বাংলাদেশের শরৎ যেন তার স্নিগ্ধ নীলাঞ্জন আঁখি মেলে দিয়েছে। সোনার শরৎ। ঘরে ঘরে নতুন ধান—নবান্নের শুভ-সম্ভাবনা। ফুলে আর পাতায় পদ্মদীঘির জল দেখা যায় না। শিশির আর শেফালী ফুলের গন্ধ মেখে বাংলার মাটি যেন শারদার পূজামণ্ডপ।

কিন্তু সে কোন্ বাংলা? কবেকার বাংলা, কত শতাব্দী আগেকার? এখানে মেঘনার জল কালীয়নাগের নিঃশ্বাসে কালো হয়ে গেছে। এখানে মড়কে জর্জরিত বাংলার বুক থেকে গৃহচ্যুত গৃহলক্ষ্মীরা পণ্য হতে চলেছে শহরের গণিকা-পল্লীতে। অভিশপ্ত শরৎ—দুঃস্বপ্নের শরৎ। ভিখারী মহেশ্বরের গৃহিণী আজ কুলত্যাগিনী।

নৌকোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সুখী দাঁড়িয়েছে নরোত্তমের পাশে। তার দু'গাল বেয়ে টপটপ করে চোখের জল পড়ছে।

—কিরে সুখী, হল কি তোর?

—ঠাকুরমশাই, ছেড়ে দাও আমাকে। দোহাই তোমার—আমাকে ছেড়ে দাও।—দু'হাতে নরোত্তমের পা জড়িয়ে ধরেছে সুখী।—আমি তীর্থদর্শন করতে চাই না, আমি কলকাতায় যেতে চাই না। আমাকে বাবার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

—আহা-হা, কেন পাগ্‌লামি করিস!—সন্ত্রস্ত হয়ে টেনে পা সরিয়ে নিলে নরোত্তম। —বাপের কাছে ফিরে যাবি। কী করবি সেখানে গিয়ে? না খেয়ে শুকিয়ে মরবি যে।

—মরি মরব। আমার সেই ভালো ঠাকুরমশাই। আমি কলকাতায় যাবো না। আমাকে ছেড়ে দাও—আমি চলে যাই।

—ছেড়ে দেব!—সুখীর অসঙ্গত আবদারে বিস্ফারিত চোখে নরোত্তম তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। দেড়শো টাকা বাপকে গুণে দিয়ে তবে মেয়েটিকে আনতে হয়েছে। সেই দেড়শো টাকা সুদে-আসলে একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে! যতই

ধর্মে মতি থাকুক না, নরোত্তম দাতাকর্ণের পোষ্যপুত্র নয়।

সুধীর চোখ থেকে এক ফোঁটা জল পড়ল নরোত্তমের পায়ের ওপর। কী উষ্ণ জলটা—সমস্ত শরীর তার স্পর্শে যেন চমকে উঠেছে। অপূর্ব সুন্দর সুধীর মুখখানা। নরোত্তমের মনটা হঠাৎ যেন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

অনেক দূরে নদীর ওপারে গ্রামের আভাস। কত আশা, কত স্বপ্ন দিয়ে গড়া মানুষের আশ্রয়। কিন্তু কি আছে ওখানে? রিক্ত ধানের মরাই ভেঙে মাটিতে পড়েছে। উড়ছে শকুন। ওইখানে ফিরে যেতে চায় সুধী। কী করবে গিয়ে? আরো দশজনের মতো না খেয়ে ছটফট করে মরে যাবে, নয়তো মেঘনার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সমস্ত দুঃখের অবসান করবে। তার চাইতে—

—আচ্ছা, এখন চুপ করে বোস তো গিয়ে। ঘাটে নৌকো লাগুক তারপর দেখা যাবে।

কিন্তু ঘাট কোথায়! নদী চলেছে তো চলেইছে! বাঁকের পর বাঁক ঘুরছে, পেছনে ফেলে যাচ্ছে খাড়া পাড়ি। ভেঙে-পড়া গ্রাম। সন্ধ্যার আগে আর কোনো বাজার বা গঞ্জ পাওয়া যাবে না।

নৌকোর ভেতরে কোলাহলের বিরাম নেই। সুমতি কাঁদছে, সরলার ছেলেটা চিৎকার করছে। এক গা দগদগে ঘা নিয়ে ছেলেটা বাঁচবে না, কবে যে চোখ উল্টে শেষ হয়ে যাবে তারও ঠিক নেই। তবু অসীম মমতায় সরলা ওই বিকৃত শিশুটাকে বুকে আঁকড়ে ধরে আছে। বিরক্তিতে নরোত্তমের সমস্ত মনটা বিস্বাদ আর বর্ণহীন হয়ে যায়। ওদিকে মালিনী সুর টেনে কৃষ্ণযাত্রার গান ধরেছে। দলের মধ্যে ওই মেয়েটা যা একটু হাসি-খুশি—নিজের সম্বন্ধে ভাবনা নেই, দুশ্চিন্তাও নেই কিছু। অল্পবয়সে বিধবা হওয়ার পরে গাঁয়ের অনেকগুলো ছেলের সে মাথা খেয়েছে এই রকম জনশ্রুতি শুনতে পাওয়া যায়। তাকে আনবার জন্যে নরোত্তমের বেশি কিছু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়নি, এক কথাতেই সে প্রসন্ন-মুখে নৌকোয় উঠে এসেছে।

—'কালো রূপে মোর মজিল যে মন, ঝাঁপ দেব কালো যমুনায়'—

মালিনী বেরিয়ে এসে বসেছে ঠিক নরোত্তমের পাশটিতে।

—জলের রংটি দেখেছ ঠাকুর? ঠিক যেন কালো যমুনা।

—হুঁ।

—আমি রাধা হলে ঠিক ওই জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম—অপূর্ব একটা ভ্রূভঙ্গি করে হাসল মালিনী: তারপর ঠাকুরের যে বাকিা হয়ে গেল। আমার মুখের দিকে একবার তাকালেও দোষ নাকি?

—না, না, অমন কথা কে বলে!—জোর করেই হাসবার চেষ্টা করলে নরোত্তম:

কিন্তু মতলবটা কী ?

—একটা পান খাওয়াতে পারো না ? সকাল থেকে পান না খেয়ে মাথা ধরে গেল যে।

—এখন কোথায় পাবে পান ? একটা ঘাট আসুক, তার পরে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

—তুমি বড় বেরসিক ঠাকুর। 'আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না'—চটুল একটা কটাক্ষপাত করে লীলায়িত ভঙ্গিতে ভেতরে চলে গেল মালিনী।

নরোত্তম একটার পর একটা বিড়ি টেনে চলেছে বিষণ্ণ মুখে। সুখীর জন্যেই ভাবনা। মেয়েটা চুপ করে বসে, নির্নিমেষ চোখ মেলে চেয়ে থাকে জলের দিকে। সরলা, সুমতি কিংবা অন্যান্য মেয়েদের জন্যে চিন্তার কিছু নেই। যতই হট্টগোল করুক, শেষ পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া চলবে। কিন্তু সুখীকে বিশ্বাস নেই, ওর চোখের জলকে বিশ্বাস নেই। যখন তখন ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে মেঘনার কালো জলের মধ্যে, ঘটাতে পারে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড।

তাই নরোত্তম আগে থেকেই সুখীর জন্যে একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। গোলাম মহম্মদের সঙ্গে কথা হয়েছে তার।

আরো দুটো বাঁক পেরোলেই কাশীপাড়ার চক। সেখানে ঘন কাশবনের ওপারে কী আছে দেখা যায় না। আর সেইখানেই খালের মাথায় মিলিটারী কলোনীর ঠিকাদারের নৌকো থাকবার কথা।

কিন্তু মনের দিক থেকে কেমন যেন জোর পায় না সে। সুখীর কথা ভাবলেই একটা অন্যায়—একটা বিচিত্র অপরাধ-বোধ এসে যেন তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। মেয়েটার মুখখানা সত্যিই ভারী সুন্দর, নরোত্তমের মাঝে মাঝে লোভ হয়, এক একটা দুর্বল মুহূর্তে ভাবে—

হঠাৎ নৌকোর মধ্যে সরলার তুমুল চিৎকার। কলহের কলরোল নয়, বুকফাটা ডুকরে কান্না।

—কী হয়েছে, হল কী ওখানে ? ডাকাত পড়ল নাকি ?

—না।—মালিনীর গলা ভেসে এসেছে : না। সরলার ছেলে মরে গেছে।

কান্না আর হট্টগোল। তবু নরোত্তমের মনটা খুশি হয়ে উঠেছে—যেন একটা ভার নেমে গেছে চেতনার ওপর থেকে। ছেলেটা মরে গেছে, বোঝা কমেছে একটা। একে একে সবগুলো ছেলেপিলে অমনি করে মরে শেষ হয়ে যেতে পারে না ? নৌকোর ভার কমে, শান্তি ফিরে আসে অনেকখানি। তাছাড়া চিরযৌবনের রাজ্যে সবৎসার চাইতে অবৎসার কদর বেশি

মরা ছেলেটাকে সরলা বুক থেকে নামাতে চাচ্ছে না। আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদছে। কৌতুক। শহরের আলোয় ওই কান্না মিলিয়ে যেতে কতক্ষণ লাগবে? সেখানে চিরবসন্তের দেশ। রাত্রির অপ্সরাদের চোখে কখনো জল দেখতে পায় না কেউ।

আর ফরিদ তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। তুফানের কোনো সংকেত নেই সেখানে, কিন্তু তার মনের প্রান্তে কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। একটা কিছু ভাবছে, কিন্তু স্পষ্ট কোনো রূপ দিতে পারছে না।

তীর্থযাত্রীদের নৌকো চলেছে কালীঘাটে দেবতা দর্শনে। কুবেরের পূজামণ্ডপে নতুন কালের নতুন বলি। কণ্ট্রাক্টের টাকায় ফেঁপে উঠেছে নারীমাংসের কশাইখানা। নরোত্তমের মতো পরহিতব্রতীর সান্ত্বনা দালালীর কয়েকটা টাকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাথার ওপরে শরতের নির্মল নীলিমা। দূরে বোধনের বাজনা। অকাল রোধন নয়, আকাল বোধন। কিন্তু কে জাগবে এই বোধন মন্ত্রে? চৌরঙ্গীর হোটেলে সে আজ রঙ-মাখানো মুখে মদের গেলাসে চুমুক দিয়েছে।

বাঁকের পর বাঁক ঘুরে চলেছে নৌকো। দূরে যেখানে ঘূর্ণি হাওয়ায় লাল বালি উড়ছে, ওইখানে কাশীপাড়ার কাশবন। আস্তে আস্তে নৌকো এসে ভিড়ল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখলে নরোত্তম, দূরে মিলিটারী কলোনীর ঠিকাদারের নৌকোর মাস্তুল ঠিক আছে।

—সুখী, সুখী।

প্রত্যাশায় সমুজ্জ্বল মুখে সুখী এসে দাঁড়ালো। গালের দু'পাশে শুকিয়ে যাওয়া অশ্রুর চিহ্ন। নরোত্তম কানে কানে বললে, এখানে তোকে নামিয়ে দিলে চলে যেতে পারবি? নদীর পার দিয়েই সোজা রাস্তা—

অগ্রপশ্চাৎ ভাববার মতো মনের অবস্থা নয় সুখীর। সমস্ত প্রাণ তার চিৎকার করে কাঁদছে। বাবাকে ছেড়ে সে থাকতে পারে না, থাকতে পারে না তার ছোট ভাইটিকে ছেড়ে। না খেয়ে যদি মরতে হয়, সবাই একসঙ্গেই মরবে। তবু সে যাবে না কলকাতায়। মা-কালী দর্শন করে তার কোনো লাভ নেই।

ঘন জঙ্গল আর কাশবন। ওপারে দৃষ্টি চলে না। নরোত্তম বললে, চল্, তোকে পথ দেখিয়ে দিয়ে আসি। নদীর ধারে উঠলেই সোজা শড়ক।

কাশবনের মধ্যে অদৃশ্য হল দু'জনে। নরোত্তম বললে, একটু দাঁড়াও মাঝি ভাই, আমি আসছি।

কিন্তু ফরিদ নিদারুণ ভয়ে চমকে উঠেছে। সমস্ত মাথাটা ঝিমঝিম করছে তার। এ কী? কী করছে সে? যে অস্ত্রে শাণ দিচ্ছে একদিন সে অস্ত্র কি ওর নিজের গলাতেই এসে লাগতে পারে না? গ্রামে তারও স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে। ছেলের বউ আছে। আজ যদি সে মরে যায়? কাল টাকার লোভে আর একজন যে এমনি করে তাদের নিয়ে

মেঘনা পাড়ি দেবে না কে বলতে পারে? ফরিদের সমস্ত শিরাস্নায়ুর মধ্যে আগুন জ্বলে গেল। নরোত্তম ঠাকুরের মতো লোকের অভাব হয় না কোথাও—কোনোদিন।

ভয়ংকর মুখখানাকে আরো ভয়ংকর করে ফরিদ হাঁক দিলে মাল্লাদের।

—রহিম, কামাল, এদিকে আয় দেখি। তামাক সাজ্ তো এক ছিলিম।...

কাশবনের ওপারে রহস্যময় নীরবতা। হঠাৎ সেই নীরবতা ভেঙে সুখীর আর্ত চিৎকার: ছাড়ো, ছাড়ো, বাঁচাও আমাকে—

চমকে ফরিদের হাত থেকে আগুনসুদ্ধ কলকেটা পড়ে গেল মেঘনার জলের মধ্যে। ও কার কান্না? মনে হল তার মেয়েই যেন চিৎকার করে কেঁদে উঠেছে। তার মেয়ে, তার স্ত্রী, আরো কত জন।

কিন্তু পরক্ষণেই সব নিস্তব্ধ। আর কাশবন ঠেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে নরোত্তম।

—মাঝি, মাঝি, শীগ্‌গির নৌকো ছেড়ে দাও। মস্ত কুমীর। কাশবন থেকে বেরিয়ে সুখীকে মুখে নিয়ে জলে নেমে গেল।

মেয়েরা একসঙ্গে আতঙ্কে কিলবিল করে উঠেছে। এমন কি সরলার কান্না পর্যন্ত গিয়েছে থেমে।

—কুমীর?

—হ্যাঁ হ্যাঁ—মস্ত কুমীর।—গোলাম মহম্মদের দেওয়া নোটগুলো ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে নরোত্তম লাফিয়ে উঠে পড়ল নৌকোতে, আর এখানে দাঁড়িয়ে কাজ নেই। হায় হায়, সুখীর কপালে এই ছিল—

ছইয়ের ওপর থেকে লম্বা একখানা লগি টেনে নিলে ফরিদ। কুৎসিত মুখে একটা অমানুষিক হাসি হাসল।—কত বড় কুমীর ঠাকুরমশাই? কী নাম?

নরোত্তম কিছু একটা জবাব দেবার আগেই প্রচণ্ড বেগে লগির ধারালো খোঁচা তার চোখে এসে লাগল। উল্টে নৌকো থেকে কাদা আর বালির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল নরোত্তম। একটা চোখ কেটে দরদর করে রক্ত পড়ছে, আর একটা অন্ধ হয়ে গেছে কচ্‌কচে বালিতে।

ভাউলী নৌকো ততক্ষণে অথই জলে। দূর থেকে ফরিদের করকরে গলা কানে ভেসে এল: এতখানি সহ্য হয় না ঠাকুরমশাই। না খেয়ে মরে তো মরুক, তবু গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।

মূর্ছিতের মতো একরাশ জল-কাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো নরোত্তম। ওঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু উঠতে পারছে না। ওদিকে অদূরে জলের মধ্যে ভেসে উঠেছে পোড়া কাঠের মতো একখানা প্রকাণ্ড মুখ—তার দুটো চোখে জ্বলন্ত ক্ষুধা

নিয়ে নরোত্তমকে লক্ষ্য করছে। অন্ধ না হলে নরোত্তম দেখতে পেতো ওটা সত্যি সত্যিই কুমীর।

ছলনাময়ী

এমন কত আসে, কত যায়, কেহ কাহারও কথা মনে করিয়া রাখে না। দেওয়ালের গায়ে কাঠকয়লায় মৃতের নাম স্থায়ী করিয়া রাখার চেষ্টা নিত্য নূতন লেখার অন্তরালে অস্পষ্ট হইয়া আসে, তারপর খুব ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেও একটা নামেরও স্পষ্ট পাঠোদ্ধার করা চলে না। চিতার পোড়া কয়লার স্তূপ জমিতে জমিতে আদি-গঙ্গার গর্ভ ভরিয়া ওঠে, হিন্দুর পাপ-ক্ষালনের বোঝা টানিতে টানিতে জননী ভাগীরথী শীর্ণা হইতে শীর্ণতরা হইয়া আসেন। ভাঁটায় নামিয়া যাওয়া ঘোলাটে জল আর পঙ্কিল তীরের অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ স্বর্গযাত্রার পথে নরকের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই শ্মশানঘাটেই দুইজনে দেখা হইয়া গেল। দক্ষিণ কলিকাতার অতি বিখ্যাত এই শ্মশানে কত সন্ন্যাসী-সাধু আসিল গেল, কত ধুনির আগুনের কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া ছাতের জ্বলিয়া-যাওয়া সাদা রংটার উপর কালোর প্রলেপ বুলাইয়া দিল ; তুলসীদাসের রামায়ণ, শঙ্করের মোহমুদ্গর, কামরূপের মন্ত্রসিদ্ধ অভিচার-তন্ত্র অথবা বেদ-বেদান্ত-উপনিষদের বহু আলোড়নে এখানকার আকাশ-বাতাস মুখর হইয়া উঠিল ; বাঙালী বিহারী পাঞ্জাবী মাদ্রাজী,—তাহাদের আর সীমা সংখ্যা নাই। ইহারা তাহাদেরই দুইজন।

মনের মিলটা যেমন দুর্লভ, সুলভও তেমনই ; সারা জীবনের চেষ্টাতেও অনেক সময় এ বস্তুটি ঘটিয়া উঠে না, আবার অতি সহজেই কোন্ একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে পরস্পরে কাছে আসিয়া পড়ে, সেটা একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

কাপালিক ভৈরবানন্দের তখন তুরীয় অবস্থা। কল্কেতে এক সিকি গাঁজা পুরিয়া একটি প্রচণ্ড টানেই সে প্রায় তাহার বারো আনা পরিমাণ পোড়াইয়া ফেলিয়াছে এবং নাক-মুখের সমস্ত ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করিয়া মুদিত চোখে ধোঁয়াটাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে পাঠাইয়া ব্রহ্মমার্গ পাইবার চেষ্টা করিতেছে।

বলি, ও দাদা, শুনছ ?

আহ্বানটা করুণ এবং মিনতিপূর্ণ ; কিন্তু ভৈরবানন্দের ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

ওহে ভায়া, শুনতে পাচ্ছ ?

অগ্রজ সম্বোধনে কাজ হয় নাই, কিন্তু ভায়া ডাকটা সার্থক হইল। মনে হইল, হঠাৎ যেন একটা গ্যাসের বোমা নিঃশব্দে ফাটিয়া গিয়াছে। পোড়া গাঁজার আকস্মিক বিকট

দুর্গন্ধ আর পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য ভৈরবানন্দের দাড়িগোঁফজটাশোভিত বিরাট মাথাটিকে দৃষ্টির আড়াল করিয়া দিল। তারপর আস্তে আস্তে ধোঁয়াটা স্বচ্ছ হইয়া আসিল এবং আগুন-রাঙানো কাঠকয়লার মতো দুইটি অসন্তুষ্ট চোখ মেলিয়া ভৈরববানন্দ তাকাইল।

যে ডাকিতেছিল সেও সন্ন্যাসী, অর্থাৎ সন্ন্যাসীর বেশধারী। বয়স বেশি নয়, সুতরাং দাড়িটা এখনও তেমনই ভাবে উলুবনের মতো যথেচ্ছ বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তবে দুই এক বছরের মধ্যেই বোধ হয় আর খেদ করিবার কারণ থাকিবে না। লোকটি শৌখিন, জটাগুলিকে সযত্নে মাথার উপর চূড়া করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

কি চাও ?

উত্তরে লোকটি অতিশয় মোলায়েম ধরনে হাসিল। গোঁফের আগাছার জঙ্গল ভেদ করিয়া ফাটা ঠোঁট জোড়া দুই ফাঁক হইয়া গেল এবং কোকেন খাওয়া কালো দাগে চিহ্নিত গজদন্তের মতো দুইটি দাঁত উপরের পাটি হইতে উদ্ধতভাবে সামনে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিল।

সবটাই টেনে মেরে দেবে দাদা ? সামনে মা গঙ্গা বয়ে যাচ্ছেন, মহা পুণ্যির স্থান এই শ্মশানক্ষেত্তর, এখানে একাই ছিলিমটা পুড়িয়ে শেষ ক'রে দিও না। এই তো আমরা সাধু-সন্ন্যাসী ব'সে রয়েছি, আমাদের দান কর—পুণ্যি হবে, পুণ্যি হবে।

বলার ভঙ্গিতে ভৈরবানন্দ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কাকের মাংস কাকে খায় না বাপু, সন্ন্যাসীর আবার দান-পুণ্য কিসের ?

সে কথার উত্তর না দিয়াই লোকটি কহিল, এই তো দাদার হাসি ফুটেছে, একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং নয় তা হলে। মাইরি, যে করে চোখ উল্টে শিবনেত্তর হয়ে বসে ছিলে, তাতে যে দণ্ড তিনেকের মধ্যে মুখ খুলবে এমন ভরসাই ছিল না; দাও তা হলে—এক-টান টেনেই নিই।

মনে কী যে ভাবান্তর ঘটিয়া গেল, কল্কেটা না বাড়াইয়া দিয়া ভৈরবানন্দ থাকিতে পারিল না। তারপর তেমনই হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে এখানে নতুন আমদানি দেখছি। কবে এলে, কোত্থেকে এলে ?

নবাগত কল্কেতে ভাল করিয়া ন্যাকড়াটা জড়াইয়া লইল এবং তারপর কষিয়া একটা টান মারিবার পূর্বক্ষণে এক চোখ বুজিয়া এবং আর একটা ঈষৎ ট্যারা করিয়া কহিল, বলছি, একটু দাঁড়াও।'

আলাপটা সেই হইতে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে দিনের গাঁজার ক্ষোভ ভৈরবানন্দের মিটিয়া গিয়াছে।

আসল কথা, নবাগত অর্থাৎ ভূমানন্দের অবস্থাটা বেশ সচ্ছল। কোথা হইতে সে যেন

একটা শাঁসালো ভক্ত সংগ্রহ করিয়াছে, প্রত্যেক দিন সওয়া পাঁচ আনার গাঁজা সে গুরুকে নিবেদন করে, প্রসাদ পায়। পাটের বাজারে ফাট্‌কা খেলিয়া তাহার যাহা আয়, সে আয়ের যথাসর্বস্ব নেশা এবং আনুষঙ্গিকের পিছনে ব্যয় করিয়া উদ্বৃত্ত অংশটি সে গুরু-সেবায় নিয়োগ করে। শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইলেই, কেন কে বলিবে, হঠাৎ তাহার এই বিশাল বিশ্বসংসার এবং দারা-পুত্র-পরিবারকে নিতান্তই মায়াপ্রপঞ্চময় বলিয়া মনে হয়, গাঁজার ধোঁয়া মগজের মধ্যে যতই ঘন হইয়া জমিতে থাকে, ততই তাহার মানসিক বৈরাগ্য যেন সেই ধোঁয়ায় বেলুনের মতো ফাঁপিয়া উর্ধ্বলোকে আরোহণ করিয়া চলে। বিকৃত কণ্ঠে সে শ্যামাসঙ্গীত জুড়িয়া দেয়—

"তোর খাঁড়ার ঘায়ে মায়ার বাঁধন
ঘুচিয়ে দে মা শ্মশানকালী—"

ভূমানন্দ খুশি হইয়া বলে, সাবাস বেটা, সাবাস। তোর হয়ে যাবে, এ যাত্রা তুই তরেই গেলি।

কিন্তু এটা উহাদের বাহিরের মুখোশ। সত্যকারের পরিচয়ের দিক হইতে কেহ কাহাকেও ঠকায় নাই, অসঙ্কোচে বিগত জীবনের ইতিহাস পরস্পরের সামনে মেলিয়া ধরিয়াছে। এবং সবচাইতে এইটাই বিস্ময়কর যে, দুইজনেরই অতীত কাহিনীর মূলে একটা বিশেষ বস্তু বিরাজ করিতেছে এবং সে বস্তুটি হইতেছে নারী।

ভৈরবানন্দ হঠাৎ যেন সমাধিস্থ অবস্থা হইতে জাগিয়া ওঠে। প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে, তারা তারা! মেয়ে জাতকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই, ওরা সব পারে।

ভূমানন্দ মুখের উপর এমন একটা শ্মশানবৈরাগ্যের ভাব টানিয়া আনে যে, এই মুহূর্তে তাহাকে দেখিলে ভুল হওয়াও বিচিত্র নয়।

বলে, শঙ্কর বলেছেন—নারী ছলনাময়ী, ত্রিভুবনকে ওরাই ছলনার নাগপাশ দিয়ে বেঁধে রেখেছে।

ইহাদের এই নারীবিদ্বেষ কিন্তু নিছক সন্ন্যাসব্রতের জন্যই নয়। কারণটা তা হইলে খুলিয়াই বলি।

ভূমানন্দের অবস্থা এককালে এ রকম ছিল না। তাহার আদি নাম বা পরিচয় এখানে ঘাঁটিয়া লাভ নাই, হয়তো-বা পুলিসে আমাকে লইয়াই টানাটানি করিবে। শুধু একটু বলিতে পারি, উত্তর-বঙ্গের এক বিখ্যাত জমিদার-বংশে তাহার জন্ম। দলে পড়িয়া তাহার পাখা গজাইল এবং অতি অবলীলাক্রমে দশ বৎসরের মধ্যেই জমিদারি আকণ্ঠ ঋণের চাপে মারোয়াড়ীর খেরো-খাতার কালো কালো অক্ষরের নিচে তলাইয়া গেল। ভূমানন্দের তাহাতে খেদ ছিল না, কিন্তু গোল বাধাইল—নারী।

অর্থাৎ জমিদারির বারো আনা পরিমাণ যে বিদ্যাধরীর সেবায় সে নিঃশেষে উৎসর্গ

করিয়া দিয়াছিল, সে-ই যখন দুর্দিনে তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাহারই দেওয়া হিলম্যানের গাড়িতে চাপিয়া এক ভাটিয়ার সঙ্গে লেকভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল, তখন ভূমানন্দের আর সহিল না। নির্জন গলিতে রাত্রিতে জানালা বাহিয়া সে ঘরে ঢুকিল এবং লম্বা ছুরিখানা এক দিকের বুকের কোমল মাংসপিণ্ডটাকে ভেদ করিয়া সোজা ফুসফুস পর্যন্ত চালাইয়া দিয়া পথে নামিয়া আসিল।

অতঃপর তাহাই শেষ পথ।

ভৈরবানন্দেরও প্রায় একই দশা। নমঃশূদ্রের ছেলে হইয়া সে গ্রামের এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবারের কুমারী মেয়েকে বাহির করিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু বেশি দিন হজম করিতে পারিল না। মাসখানেক পরে একদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখিল, তাহার কাশীর বাড়ির চারদিকে পুলিস গিজগিজ করিতেছে। অতএব উপায়ান্তর আর না দেখিয়া সামনে যাহাকে পাইল, তাহারই মাথায় একটা মদের বোতল চূর্ণ করিয়া সে অদৃশ্য হইল। লোকটা সেই আঘাতেই খুন হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহার সন্ধানে পুলিসের হুলিয়া গোটা দেশটাকেই যেন চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিছুদিন এদিক ওদিক গা-ঢাকা দিয়া থাকিয়া ভৈরবানন্দ দাড়ি-গোঁফ জটাভারকে যথেচ্ছ বাড়িতে দিল, তারপর চার পয়সার গিরিমাটি কিনিয়া সমস্ত কাপড়চোপড়গুলাকে রাঙাইয়া লইয়া এবং গায়ে প্রচুর ছাই মাখিয়া সে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটেই জাঁকিয়া বসিল।

এবং এইভাবে প্রায় অর্ধেক ভারতবর্ষটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত সে এখানে আসিয়াই জুটিল।

কিন্তু তারপর হইতে এই জীবনটাই ইহাদের সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। অতীতের কথা কখনও কখনও দিবা স্বপ্নের মতো হইয়া মনের সামনে ভাসিয়া ওঠে, কিন্তু তাহা লইয়া খুশি হওয়া ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে স্মৃতির সঙ্গে ফাঁসির দড়িটা এমন অবিচ্ছেদ্যভাবেই জড়াইয়া আছে যে, সেদিনের কথা স্মরণ করিলেও ইহারা শিহরিয়া ওঠে।

সন্ধ্যা হইয়া আসে। ওপারে চেতলার আলো দুই-একটি করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, আদি-গঙ্গার মন্থর জলে জোয়ারের চেতনা লাগে। একটু একটু করিয়া জল বাড়িতে থাকে, কাদা-মাখা তীর ছাপাইয়া জল একেবারে স্নানঘাটের ফাটা সিঁড়িটা স্পর্শ করে। হিন্দুর একান্ন পীঠের এক পীঠ, অদূরের ভারত-বিখ্যাত কালী-মন্দির হইতে আরতির বাজনা শুনিতে পাওয়া যায়।

তাহারই মধ্যে মিলিত একটা হরিধ্বনি যেন চারিদিকে সুর কাটিয়া দেয়।

ভৈরবানন্দ বলে, ওই এল আর একটা

সেদিকে চোখ বুলাইয়া ভূমানন্দ জবাব দেয়, বুড়ো। এর জন্যে আবার এত ঘটা কেন রে বাবা?

তা ঘটা একটু বেশিই বটে। সঙ্গে লোকজন প্রচুর আসিয়াছে, যে পরিমাণ ফুল দিয়া তাহারা মড়া সাজাইয়া আনিয়াছে, তাহাতে সমস্ত ফুলের বাজারই নিঃশেষ হইয়া যাওয়ার কথা। খোল করতাল লইয়া সেই যে তাণ্ডব তালে কীর্তন চলিতেছে তো চলিতেছেই।

কিন্তু কথাটা তাহা লইয়াই নয়।

আরও একটা মর্মান্তিক দৃশ্য সকলের চোখেই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া বাজিতেছিল। বছর ষোল-সতরোর একটি মেয়ে, চোখের জলে তাহার সুশ্রী গাল দুইটি ভাসিয়া যাইতেছে, মাথার রুক্ষ চুলগুলি এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সমস্ত গালে মুখে কপালে তাহার সিঁদুর লেপা, মৃতের পায়ের কাছে পাগলের মতো মাথা কুটিতেছে।

এমন যে ভৈরবানন্দ, সে অবধি চোখ ফিরাইয়া আনে। একটা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া বলে, বুড়ো ঘাটের মড়ার প্রাণে এত রস! একটা কচি মেয়েকে পথে বসালে তো!

ভূমানন্দ হঠাৎ যেন কেমন বিকৃতভাবে হাসিয়া উঠে, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা! কিন্তু বুড়োর দোষ নেই ভায়া, নারী ছলনাময়ী—ছলনাময়ী!

তারপর অনেকক্ষণ দুইজনেই নিস্তব্ধ হইয়া থাকে; কী যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি উহাদের মনের উপর দিয়া অন্ধকারের মতো বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। ওদিকে এত আলো থাকিলেও এদিকটা অপেক্ষাকৃত ছায়াচ্ছন্ন। দুই-তিনটা চিতা হইতে পোড়া কাঠকয়লা এখনও সরানো হয় নাই, তাহাদের চোখের সম্মুখে ধ্বংসাবশিষ্ট চিতাগুলির সে রিক্ত রূপ কেমন যেন খাপছাড়া দেখাইতেছিল।

ওদিকে আর একটা চিতা প্রায় নিবিয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে, কাঠকয়লার রাশি রাশি অঙ্গারের মধ্য হইতে দগ্ধাবশিষ্ট হাড়ের নিদর্শনস্বরূপ কয়েক টুকরা জমাট ক্যাল্‌-সিয়াম ফস্‌ফেট আর কালো একটা কাঠের গুঁড়ির খানিকটা গাঢ় রক্তের মতো আগুনের রঙে রঙিন হইয়া হিংস্রভাবে চাহিয়া আছে। মাথায় পাগড়ি আঁটিয়া কালো জোয়ান চেহারার একজন হিন্দুস্থানী লম্বা একটা বাঁশের সাহায্যে চিতার পোড়া কয়লাগুলি পরিষ্কার করিতেছে। কাঁচা কাঠ, বাঁশ আর পোড়া মাংসের পরিচিত একটা তীব্র গন্ধে জায়গাটা বিষাক্ত হইয়া আছে।

ভৈরবানন্দের যেন চটকা ভাঙিয়া যায়। একটা হাই তুলিয়া একান্ত উদাসীন কণ্ঠে বলে, নাঃ, মায়া, সব মায়া। সেই যে তুলসীদাস বলেছেন না? 'দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী'—

ওইখানেই তো আমাদের মিল, দাদা।

ভূমানন্দ আবার তেমনই অকারণেই হাসিয়া ওঠে। শ্মশানে মৃতের চারিদিকে খোল-করতালে নামসংকীর্তন চলিতেই থাকে, আদি-গঙ্গার জলে জোয়ারের অস্ফুট কলতান তাহার নিচে চাপা পড়িয়া যায়, কালীমন্দিরের আরতির বাজনা ক্রমশ নিস্তব্ধ হইয়া আসে; ধুনির আগুনে দেওয়ালের গায়ে লেখা মৃতের অজস্র নামগুলি যেন অদ্ভুত রকমের জটিল হইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে; গঙ্গার ওপারে চেতলার ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া রাশি রাশি দেওয়ালি পোকা প্রদক্ষিণ করে; আর থাকিয়া থাকিয়া সেই মেয়েটির কান্না যেন কেমন একটা অস্বস্তির মতো বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে।

ভূমানন্দের কথাটার জের টানিয়াই অনেকক্ষণ পরে ভৈরবানন্দ উত্তর দেয়, হুঁ, মেয়েমানুষ! বড় জটিল ব্যাপার ভায়া, কিচ্ছু বোঝবার জোটি নেই।

সুতরাং দুইজনের বন্ধুত্বই সুগভীর। নারীজাতির প্রবঞ্চনা সম্পর্কে তাহারা উভয়েই একটা সুচিন্তিত সমাধানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মানুষের চরিত্রগত অসামঞ্জস্য যেখানে যাহাই থাক, একটা বিশেষ ক্ষেত্রে তাহারা এমন নিভাঁজ ভাবেই মিলিয়া যায় যে, তখন সে অসামঞ্জস্যগুলিকে আর আলাদাভাবে খুঁজিয়া লওয়া চলে না।

অতএব বলিতে পারা যায়, স্ত্রীজাতির ছলনাকে ঘিরিয়াই তাহাদের এই বন্ধুত্বটা এমনভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে।

এবং সে বন্ধুত্বের পরিচয় পাওয়াও এমন কিছু কঠিন নয়। বসিবার জায়গার অধিকার লইয়া একটা নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভূমানন্দের ঝগড়া বাধিয়া গেল। বাক্যবলে কুলাইল না তো বাহুবল আসিল। কুস্তি-করা ডাল-রুটি-চিবানো বিহারীর সঙ্গে নেশাখোর ক্ষীণপ্রাণ বাঙালীর পারিবার কথা নয়, ভূমানন্দকে কাঁধে তুলিয়া একটা আছাড় বসাইবার পূর্বক্ষণে ভৈরবানন্দ আসিয়া জুটিল; এবং ভূমানন্দ শুধু যে রক্ষা পাইল তাহা নয়, চিমটার ঘা খাইয়া কপালের রক্ত মুছিতে মুছিতে সেই রাত্রেই নাগা সন্ন্যাসী শ্মশানঘাট ছাড়িয়া সরিয়া পড়িল।

রাত বাড়িয়া চলে, জোয়ারের জল স্তিমিত হইয়া থমথম করিতে থাকে; এখনই ভাঁটার টান আসিবে। শুকতারাটা ঘুরিতে ঘুরিতে মাথার উপরে আসিয়াছে, ইলেক্‌ট্রিক লাইটের চারদিকে দেওয়ালি পোকারা মরিয়া মরিয়া প্রায় শেষ হইয়া গেল, শ্মশানের অবশিষ্ট চিতাটাও নিবিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে। অস্বাভাবিক নির্জন এই পৃথিবী, অস্বাভাবিক নির্জন এই শ্মশানঘাট। কোথাও কেহ নাই। শুধু দূরে একটা দড়ির খাটিয়ার উপরে সেই হিন্দুস্থানীটা পড়িয়া পড়িয়া নাক ডাকাইতেছে।

আর শুধু জাগিয়া আছে ইহারা—এই দুইটি মানিকজোড়। ঝুলির মধ্য হইতে ভূমানন্দ একটা বোতল বাহির করিল, কারণ করিবার এইটাই উপযুক্ত অবসর।

ভৈরবানন্দ তান্ত্রিক, অর্থাৎ তন্ত্রের কতকগুলো বীভৎস আচার-অনুষ্ঠানকে সে নিজের

সঙ্গে অসঙ্কোচভাবে মিলাইয়া লইয়াছে। ভয়-লজ্জার প্রতিবন্ধক তো গৃহস্থাশ্রমেই লোপ পাইয়াছিল, ধর্মের আশ্রয় পাইয়া ঘৃণা জিনিসটাকেও সে ধুইয়া মুছিয়া বেমালুমসাফ করিয়া ফেলিয়াছে। এই অঘোরপন্থীরা না করিতে পারে এমন নোংরা অনুষ্ঠান পৃথিবীতে বিরল।

তাই মাটির পাত্রে ঢালিয়া দুই-এক চুমুক টানিবার পরে ভৈরবানন্দ কহিল, উঁহু, জুৎ হচ্ছে না ভায়া, চাট নেই।

ভূমানন্দ হাসিয়া বলিল, এত রাত্রে তোমার জন্যে কে পাঁঠার কালিয়া নিয়ে ব'সে আছে বাপু?

দাঁড়াও।

টলিতে টলিতে ভৈরবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল, জ্বলন্ত চিতাটার দিকে আগাইয়া গেল। তারপর মড়া ঠেলিবার পোড়া বাঁশ আর চিমটার সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুনের মধ্য হইতে কী একটা সাদা জিনিস লইয়া ফিরিয়া আসিল, কহিল, এই যে, চাট এনেছি।

ভূমানন্দ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল।

আরে এ যে মড়ার খুলি!

হি হি করিয়া ভৈরবানন্দ হাসিতে লাগিল, কহিল, তাতে কী হয়েছে, পুড়ে দিব্যি চানাচুর হয়ে আছে হে! মদের সঙ্গে জমবে চমৎকার। খেয়েই দেখ না এক কামড়।

বলিয়া খুলিটা মুখের মধ্যে এক গ্রাসে খানিকটা পুরিয়া দিয়া কড়মড় করিয়া চিবাইতে লাগিল। একটা চোখ বুজিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিল, আহা-হা মহাশঙ্খ! সাক্ষাৎ অমৃত রে! এ রসে বঞ্চিত থাকতে নেই।

নেশা আকণ্ঠ না হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু ভূমানন্দও এ রসে বঞ্চিত রহিল না।

অশ্লীল একটা শব্দ করিয়া ভৈরবানন্দ প্রমত্ত স্বরে বলিল, এসব 'ম'কারে আর জোর নেই দাদা। এখন যদি একটা মেয়েমানুষ থাকত—

জড়াইয়া জড়াইয়া ভূমানন্দ জবাব দিল, উঁহু, উঁহু, আমি ওতে নেই। ভায়া—ওই 'ম'কারটাই মারাত্মক।

মাথার উপরে শুকতারাটা দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে—আদি-গঙ্গার মরা জল নিদ্রিত মহানগরীর অবচেতন পঙ্কিল চিন্তাধারার মতো বহিয়া যাইতেছে। নিবিয়া-আসা চিতার শেষ আগুনের শিখায় ইহাদের শ্মশানচারী প্রেতের মতোই বীভৎস মনে হইতেছিল।

এমনই করিয়া দিন চলিতেছিল। স্বভাবের দিক দিয়া অমিল অনেক আছে, মিলেরও অভাব নাই। খুঁটিনাটি বিরোধ একেবারে না বাধে এমনও নয়। কিন্তু সে বিরোধ যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি তাহার মূলও মনের মধ্যে বেশি দূর পর্যন্ত নিজেকে বাড়াইয়া দিয়া

দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকিতে পারে না।

সেদিন কিন্তু দুইজনেরই টনক নড়িল।

একে গঙ্গার ঘাট, তার উপর শ্মশান। মানুষের অন্ধ শ্রদ্ধা, তাই এখানে স্নানের জন্য ভিড় করিয়া আসে। জাহ্নবীর জলে স্নান করিবার পুণ্যটাই পরম লাভ, তাহার সঙ্গে মহাশ্মশানের যোগাযোগ ঘটিলে তো আর কথাই নাই।

সুতরাং এখানে সাধু সাজিয়া বসিয়া থাকা নিছক পারমার্থিক নিষ্কৃতির জন্যই নয়। নানা বয়সের বহু কিশোরী তরুণী বা যুবতী স্নান করিয়া অর্ধনগ্নভাবে জল হইতে উঠিয়া আসে, সেগুলি ফাউ, স্নান করিয়া যাইবার পথে দানের পুণ্য হিসাবে সাধু-সন্ন্যাসীর দিকে অনেকেই দুই-একটা পয়সা ছুঁড়িয়া দিয়া যায়, প্রলোভনটা প্রধানত তাহারই।

এখানকার সন্ন্যাসীদের মধ্যে ইহা লইয়া অনেক সময় রেষারেষি চলে। প্রত্যেকেই প্রাণপণ চেষ্টা করে, কেমন করিয়া অন্যের চাইতে নিজেকে বেশি পরিমাণে খাঁটি প্রমাণ করিবে।

ইহারা দুইজন বহুদিন যাবৎ একচ্ছত্র হইয়াই ছিল, কিন্তু কোথা হইতে সেদিন এক ভৈরবী আসিয়া হাজির।

ভৈরবীই বটে। চেহারা তাহার সুশ্রী না হইলেও সুগঠিত, মুখের উপরে অত বেশি পরিমাণে ছাই না মাখিলে বোধ হয় আরও একটু ভালো দেখাইত। দৃঢ় শরীরের গড়ন, অপচয় হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কপালে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের ত্রিশূল আঁকিয়া আশেপাশে গোটা কয়েক মড়ার মাথা ছড়াইয়া লইয়া সে দিব্য জাঁকিয়া বসিল।

আর সঙ্গে সঙ্গেই যেন রাতারাতি ইহাদের কারবার ফেল পড়িয়া গেল।

ভিড়—ভৈরবীর চারিদিকে চব্বিশ ঘণ্টাই ভিড়। ভৈরবী সাধারণ স্ত্রীলোক নয়, সে স্বয়ং মা কালীর ডাকিনী-যোগিনীদের একজন। যাহার হাত দেখিয়া যে কথা সে বলিয়া দেয়, তাহাই যেন নির্ঘাত লাগিয়া যায় একেবারে, এতটুকুও ভুল নাই।

দাঁতে দাঁত চাপিয়া ভৈরবানন্দ বলে, তা তো নির্ঘাত লাগবেই, সোমত্ত বয়েস যে!

ভূমানন্দ চিমটা দিয়া ক্ষিপ্তের মতো মাটিটা খুঁড়িতে থাকে, বলে, ওকে যে করে হোক তাড়াও দাদা, এখানে ও মাগী আর দিন কয়েক থাকলেই আমাদের পাত্তাড়ি গুটিয়ে সরে পড়তে হবে।

ভৈরবানন্দ দাঁতের পাটির মধ্য হইতে চিবাইয়া চিবাইয়া অস্ফুট স্বরে বলে, ইচ্ছা করে, ওর গলার মধ্যে সোজা ত্রিশূলটা চালিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা ক'রে দিই।

উঁহু, ও কাজ করতে যেও না—পুলিসের হাঙ্গামাটা বড্ড খারাপ, ঠেকে শিখেছ তো।

পুলিস! তা সত্য। ভৈরবানন্দের মেজাজ শান্ত হইয়া আসে।

পুলিসের বিভীষিকা এখনও তাহার যায় নাই। মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে তাহাদের

স্বপ্ন দেখিয়া সে চমকাইয়া ওঠে। কাছাকাছি তাহাদের দুই-একজনকে দেখিলে এই পাঁচ বছর পরেও বুকের মধ্যে দুপ দুপ করিয়া ঢেঁকির পাড় পড়িতে থাকে।

ভূমানন্দ বলে, এমন একটা কিছু কর, যাতে এখানে টিকতে না পেরে তিন দিনেই সটকে যায়।

চিন্তিত ভাবে ভৈরবানন্দ জবাব দেয়, তাই দেখতে হচ্ছে।

উদ্যোগপর্বে বেশি সময় নষ্ট হইবার কথা নয়। অতএব দুপুরের খররৌদ্রে সমস্ত শ্মশান-ঘাটটাই যখন নির্জন হইয়া আসিয়াছে, তখন গলাখাঁকারি দিয়া ভৈরবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কী মনে ক'রে?

ভৈরবী ঝকঝকে দাঁতগুলি বাহির করিয়া হাসিল, হাসিটা তাহার চমৎকার! কহিল, মায়ের স্থানে এসেছি, এতে আবার মনে করা-করির কি আছে?

ভূমানন্দ উগ্রস্বরে কহিল, আরে রেখে দাও তোমার মায়ের স্থান, ওসব ন্যাকামি ভালো লাগে না। ওই তো নিমতলা, কাশীমিত্তির, বরানগর রয়েছে, ওসব জায়গায় না গিয়ে এখানে মরতে এলে কেন?

এলুম, ইচ্ছে।—ভৈরবী তেমনি অকুণ্ঠিতভাবে হাসিল।

ভৈরবানন্দ ভৈরবস্বরে কহিল, না, ওসব ইচ্ছে চলবে না এখানে। এখান থেকে যেতেই হবে তোমাকে।

যদি না যাই?

বলছি, তোমাকে যেতেই হবে। নইলে—

নইলে মারবে নাকি?—কৌতুকোজ্জ্বল নির্ভীক চোখ তাহাদের দিকে মেলিয়া ধরিয়া ভৈরবী বিদ্রূপ করিয়া কহিল, আহা-হা, কী সব বীরপুরুষ রে! দুটো ষাঁড়ের মতো ষণ্ডা জোয়ান মিলে একটা মেয়েমানষের গায়ে হাত দিতে এসেছ, লজ্জা করল না?

সত্যই এতক্ষণে লজ্জা করিল। তাহা ছাড়া ভৈরবীর হাসিতে এমন একটা বিচিত্র কিছু ছিল যে, ইহাদের মনের মধ্যে এতক্ষণের উদ্যত উদ্দীপ্ত পৌরুষটা যেন ধূলাপড়া লাগিয়াই হঠাৎ নিস্তেজ হইয়া আসিল।

এমন কি ভৈরবানন্দ, ভূমানন্দ সেই প্রথম পরিচয়ের পর হইতে যাহাকে সচেতন অবস্থায় আর হাসিতে দেখে নাই, সে কিনা অনায়াসে সম্মুখের দাঁতের পাটিটা বিকশিত করিয়া ফেলিল! আর ভূমানন্দ—চোখ দুইটা তাহার তীব্রভাবে জ্বলিতে লাগিল বটে, কিন্তু সেটা ক্রোধে নয়, অন্য কারণে।

ভৈরবানন্দ কাশিয়া কহিল, আহা-হা, সে কি কথা, রাগ করছ কেন? এসেছ, বেশ, থাকবে। সে তো ভাল কথাই। আমাদের তাতে আপত্তির কি আছে?

ভূমানন্দ সঙ্গে সঙ্গেই খেই ধরিয়া কহিল, ওটা—ওটা, তোমাকে একটু ঠাট্টা, তা

বুঝতে পারছ না ?

ভৈরবী বুঝিল এবং বুঝিল বলিয়াই রাগ করিল না। নিরুত্তরে খানিকটা হাসিল শুধু।

আদি-গঙ্গার জলে তেমনই জোয়ার-ভাঁটা খেলিয়া যায়, শ্মশানঘাট নিত্য নূতন শবযাত্রীর কোলাহলে আর হরিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া ওঠে, দেওয়ালের হোয়াইট-ওয়াশের উপর আরও কয়লার লেখা পড়িতে পড়িতে মৃতের নামগুলি আরও একটু অস্পষ্ট হইয়া আসে। ওপারে ইলেক্‌ট্রিক লাইটের চার পাশে ঘাসের উপরে সকালবেলা তেমনই করিয়াই অসংখ্য মৃত দেওয়ালি পোকা জমিয়া থাকে।

কিছুই বদলায় নাই, ইহাদের মনের মধ্যে কোথায় একটু একটু করিয়া বিচ্ছেদ ঘনাইয়া আসিতেছে শুধু। জোর করিয়া কেউ সেটা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে না, কিন্তু তাহার অস্বস্তিটা যেন পলে পলে অনুভব করা যায়।

ভূমানন্দের শিষ্যটি তেমনই করিয়াই গাঁজার অর্ঘ্য আনিয়া নিবেদন করে, ভূমানন্দ নিজে কয়েকটা সুখটান টানিয়া আবার কল্কেটা শিষ্যের দিকেই বাড়াইয়া দেয়। পাশে যে ভৈরবানন্দ অনেকক্ষণ হইতে তৃষিত চোখে চাহিয়া আছে, সেটা তাহার নজরেই আসে না।

ভৈরবানন্দ গাঁজার কল্কেটার গতিবিধি লক্ষ্য করে, কিন্তু কোন কথা বলে না। নীরবে তাহার চোখ উগ্র হইয়া উঠে, কি ক্ষুধিতভাবেই না ভূমানন্দ ভৈরবীর সর্বাঙ্গ দৃষ্টি দিয়া গ্রাস করিতে চাহিতেছে! ভৈরবানন্দের কঠিন হাতের মধ্যে চিমটাটা শক্ত হইয়া ওঠে, রক্তে রক্তে সে যেন ঝড়ের সঙ্কেত অনুভব করে। সেই যে কবে মদের বোতল বসাইয়া একটা মানুষের মাথা সে চুরমার করিয়া দিয়াছিল, রক্তের ছিটায় আর স্পিরিটের গন্ধে তাহার নাক মুখ চোখ ভরিয়া গিয়াছিল, সেই স্মৃতিটাই বার বার করিয়া মনের সামনে ভাসিয়া ওঠে।

আর ঠিক তাহাদের মুখোমুখি বসিয়া ভৈরবী অর্থপূর্ণভাবে হাসে, দুইজনের দিকে চাহিয়া লীলায়িত কটাক্ষ করে। বলে, কি গো ঠাকুররা, অমন ক'রে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছ যে? কী দেখছ এত করে?

ভূমানন্দ লজ্জা পাইয়া বলে, কই, না।

কিন্তু ভৈরবানন্দের ধরনটা অপেক্ষাকৃত নির্বোধ হইলেও এ ক্ষেত্রে সে সপ্রতিভতার পরিচয় দেয়, ফস করিয়া বলে, দেখবার জিনিস যে, দেখব না?

ভৈরবী মুখের একটা ভঙ্গি করিয়া বলে, ই—স!

ভূমানন্দ ভৈরবানন্দের দিকে কটমট করিয়া তাকায়।

মন্থর দিন, মন্থরতর রাত্রি। পিছনে মহানগরীর এমন গতি-চঞ্চল জীবন এখানে আসিয়া যেন শ্মশানের মৃত্যুর মধ্যেই ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। সেই একঘেয়ে দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি চলে। শুধু কাঁধে করিয়া যাহাদের বহিয়া আনা হয়, তাহারাই নূতন; অনুষ্ঠানটার কোথাও কোনও বৈচিত্র্য নাই।

সন্ধ্যার রঙ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হয়, তারপর রাত্রি বাড়ে। যেদিন মড়া আসে, সেদিন সারা রাত্রিই শ্মশান জাগিয়া থাকে। আর যেদিন আসে না, সেদিন গভীর রাত্রে যেন শ্মশানকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া মৃত্যু ঘুরিয়া বেড়ায়, যেন অশরীরী প্রেতাত্মাদের নিশ্বাসে গঙ্গার জল শঙ্কিত সঙ্কীর্ণ গতিতে বহিয়া চলে।

মধ্যরাত্রি। চারিদিকে অস্বাভাবিক নীরবতা, সামনে কেবল একটা গ্যাস-পোস্ট জ্বলিতেছে।

ভৈরবানন্দ উঠিয়া বসিল। কতদিন সে নারীসঙ্গ পায় নাই, অসংযত উপবাসী কামনা তাহার শিরাস্নায়ুগুলির মধ্যে যেন বিপ্লব চালাইতেছে। এপাশে নেশার ঝোঁকে ভূমানন্দ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, আর ওধারে ভৈরবী অঘোরে ঘুমাইতেছে, তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ অবাধে যেন ভৈরবানন্দের কানে আসিতেছিল।

ভৈরবানন্দ হিংস্র একটা জানোয়ারের মতো হামাগুড়ি দিয়া ভৈরবীর দিকে অগ্রসর হইল। ওই গ্যাসটা এখন যদি কেহ নিবাইয়া দিতে পারিত, বেশ হইত তাহা হইলে।

সমস্ত দেহের উপর আকস্মিক একটা ভারী চাপ পড়িয়া নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম, ভৈরবী রুদ্ধশ্বাসে আর্তনাদ করিয়া উঠিতে গেল, কে?

তাহার মুখে হাত চাপিয়া ভৈরবানন্দ বলিল, চুপ, আমি।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই ভূমানন্দ সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, বিকৃত বীভৎস স্বরে চিৎকার করিয়া কহিল, শা—লা তোকে আমি খুন করব।

তারপর খুনোখুনি রক্তারক্তি পর্ব অনেক দূর পর্যন্ত যখন অগ্রসর হইয়াছে, তখন নিজের ঝুলি কাঁথাগুলি একসঙ্গে গুছাইয়া লইয়া ভিড় ঠেলিয়া ভৈরবী নিঃশব্দে অন্ধকার পথে নামিয়া গেল।

নারী—ছলনাময়ী। ইহাদের দুইজনকে যত সহজে কাছে টানিয়া আনিয়াছিল, তত সহজেই অবলীলাক্রমে আবার দূরে সরাইয়া দিল।

সাদর অভ্যর্থনা করলেন ছাত্রের বাবাই। ঘোরতর বৈষয়িক এবং অত্যন্ত গম্ভীর মূর্তি লোকটি। আমার দিকে তাকিয়ে ভালো করে হাসেননি কখনো, ভালো করে কথাও বলেননি আমার সঙ্গে। কিন্তু আজ তাঁর প্রকাণ্ড গম্ভীর মুখে আড়াই যোজন হাসি দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। এমন অঘটনটা ঘটালো কে এবং কী উপায়ে?

—আসুন, আসুন মাস্টার মশাই, বসুন। বিধু সিনেমায় গেছে।

মনে মনে আশান্বিত হয়ে উঠেছি। ছাত্র এবারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছে, দু-একদিনের মধ্যেই ফল বেরুবার কথা। নিতান্ত নিরেট মস্তিষ্ক—তরে যাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ ছিল সে বিষয়ে। পুরো ছ' মাস গলদ্‌ঘর্ম হয়ে খাটতে হয়েছে। আমার সে আপ্রাণ পরিশ্রমটা তা হলে নিতান্তই বৃথা যায়নি, সহজ ও সঙ্গত ভাবে এই অনুমানটাই করে নিলাম।

—কোনো খবর আছে বিধুর?

—হ্যাঁ আছে।—ছাত্রের বাবা সিদ্ধেশ্বরবাবু তখনো হাসছেন।

—তা হলে পাস করেছে তো?—তৃপ্তি আর আনন্দের উচ্ছ্বাসে মনটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল। নিজে কোনো পরীক্ষায় পাস করবার পরেও কখনো এতটা খুশি হয়ে উঠিনি: কোন্ ডিভিসনে গেল?

—কোন্ ডিভিসনে যাবে আবার?—সিদ্ধেশ্বরবাবু দুলে দুলে হাসতে লাগলেন: পাসই করতে পারেনি। আপনি বিশ্বাস করেন রঞ্জনবাবু, আমার ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করবে?

নীল মেঘ থেকে বজ্রাঘাত। আমি নির্বোধের মতো হাঁ করে রইলাম। পঞ্চাশ টাকা করে মাসে মাসে আমাকে মাইনে দিয়েছেন সিদ্ধেশ্বরবাবু, অথচ বিধুকে শেষ পর্যন্ত পাস করাতে পারলাম না। সিদ্ধেশ্বর খাঁটি ব্যবসাদার মানুষ; তেলের কল, আটার কল, আরো অসংখ্য কাজকারবারের মালিক। একটি পয়সা অপব্যয় করতে বুকের ভেতরটা চড়চড় করে ওঠে তাঁর। আর বিধু পাস করতে পারেনি বলে সেই সিদ্ধেশ্বরবাবু অত্যন্ত খুশি হয়ে হাসছেন, অত্যন্ত প্রসন্নদৃষ্টি বর্ষণ করছেন আমার মুখের ওপর? আচমকা মনে হল হয় আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, নয় সিদ্ধেশ্বরবাবুর, নতুবা দুজনেরই।

আমার বিস্ফারিত বিহ্বল দৃষ্টি লক্ষ্য করে সিদ্ধেশ্বর এবার সশব্দে হেসে উঠলেন।

ভদ্রলোক রসিকতা করছেন না তো আমার সঙ্গে? নাকি ছেলে খুব ভালো করে পাস করেছে বলেই আমাকে একটু বোকা বানিয়ে আমোদ করতে চান? ধাঁধা লাগল। আজ তো পয়লা এপ্রিল নয়।

—সত্যি বলছেন? পাস করেনি?

—না, না, না।—যেন ভারী একটা মজার ব্যাপার হয়েছে এমনি কৌতুকোচ্ছল কণ্ঠে সিদ্ধেশ্বর বললেন, ভেতরে ভেতরে খবর নিলাম, একেবারে তিন-তিনটে ঢ্যাঙা। আরে মশাই, আমিই দু বারে ছাত্রবৃত্তি পাস করতে পারিনি আর ও ব্যাটা এক চান্সেই ম্যাট্রিকুলেশন ডিঙিয়ে যাবে? ছাত্র কমে যাওয়ার ভয়েই না হেড মাস্টার বছর বছর ওকে ক্লাসে তুলে দিত? নইলে ওর ফিফ্‌থ ক্লাসের বিদ্যে আছে বলে মনে করেন নাকি আপনি?

তা অবশ্য আমি কোনোদিন মনে করিনি এবং এ বিষয়ে সিদ্ধেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমার কিছুমাত্র মতদ্বৈধ নেই। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য এই যে ছেলে পাস করতে পারেনি বলে তিনি আন্তরিক খুশি হয়েছেন এবং অতিশয় কৌতুক বোধ করছেন। নির্বাক বিস্ময়ে আমি ভাবতে লাগলাম কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার আছে নাকি এর ভেতরে? কোনো কম্‌প্লেক্স? নিজে পাস করতে পারেননি, কাজেই ছেলেও ফেল করে বসেছে বলে মনে মনে খুশি হয়েছেন তিনি?

সিদ্ধেশ্বরবাবুর কণ্ঠে এবার সান্ত্বনার সুর লাগল : না, না, আপনি ঘাবড়ে যাবেন না মাস্টার মশাই। আপনার ওপরে একটুও অনুযোগ নেই আমার। আপনি খুব খেটেছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন সে তো নিজের চোখেই দেখেছি আমি। কিন্তু কী করা যাবে বলুন, ওর মগজে জিনিস না থাকলে পঁচিশ বছরেও কিছু হওয়ার নয়।

কিছু বলবার নেই। শুনে যেতে লাগলাম।

—এ ভালোই হয়েছে। পাস করলেই কলেজে পড়তে চাইত। আর কলেজে একবার ঢুকলে ছেলেকে তখন পায় কে। না হক টাকার শ্রাদ্ধ। বাবু হয়ে যেতো, কতগুলো বখা ছেলের কাপ্তেন সেজে ঘুরে বেড়াত। বাপু, জাত-ব্যবসাদারের ছেলে তুই; ও সব নবাবী দিয়ে তোর হবে কী? এখন বরং বলতে পারব, মাস মাস পঞ্চাশ টাকা দিয়ে মাস্টার রেখে দিলাম, তবু পাস করতে পারলি নে হতভাগা!

এতক্ষণে সিদ্ধেশ্বরবাবুর মনোভাবটা স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে। ভাবলাম প্রতিবাদ করি, উচ্চশিক্ষার নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে বক্তৃতা করি খানিকটা। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরবাবুকে সে কথা বলা বৃথা। সিদ্ধিদাতা গণেশের আশীর্বাদে খেরো খাতার কালো কালো অক্ষরগুলো ব্যাঙ্ক নোট হয়ে যাচ্ছে। স্বর্ণপদ্মাসীনা সরস্বতী মূর্তিমতী হয়ে বরদান করতে এলে সিদ্ধেশ্বরবাবু সোনার পদ্মটাই চেয়ে বসবেন, বাজারে আটাত্তর টাকা ভরি চলেছে আজকাল।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বরবাবুকে যেন নেশায় পেয়েছে। ছেলে ফেল করাতে মনের দরজাটা যেন আকস্মিক ভাবে খুলে গিয়েছে তাঁর। বুঝলাম আজকে বড় গোছের একটা দাঁও মেরেছেন তিনি, হয়তো নিরাপদে এবং নির্ঝঞ্ঝাটে হাজার কয়েক টাকা চলে এসেছে পকেটে। নইলে আমার মতো নিতান্ত একটা নৈতিক অপদার্থের সঙ্গে এতটা সময় তিনি অপব্যয় করছেন কী করে। লক্ষ্য করলাম: প্রকাণ্ড মুখে আড়াই যোজন হাসিটা সাড়ে তিন যোজনে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

টেলিফোনটা গুঞ্জন করছে।

রিসিভার তুলে কানের কাছে ধরলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু।

—হ্যাঁ আমি। সিদ্ধেশ্বর। কে যোগেন নাকি? ওঃ ম্যাক্‌ফার্সন—হ্যাঁ? সাড়ে তিন শো? সাড়ে তিন শো তো? মন্দ হবে না—ছেড়ে দিতে পারো। না, না, নাইন্‌টিটু পারসেন্ট্‌। হ্যাঁ তার কমে নয়। আচ্ছা ঠিক হবে।

কতগুলো সাংকেতিক বাক্য। কলেজে বার্কের বক্তৃতা পড়েছি, কার্লাইলের ফেনিল উচ্ছ্বাস পড়ে রোমাঞ্চিত হয়ে গেছি। কিন্তু এত কথা শিখেও মাস্টারীর শূন্য হাঁড়িতে আরসোলার সুড়সুড়ি ছাড়া কিছুই নেই। আর মাত্র কয়েকটা সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যেই কুবেরের রত্নভাণ্ডারের রহস্য সঞ্চিত—চিচিংকে ফাঁক করবার চাবিকাঠি। হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা।

টেলিফোন নামিয়ে সিদ্ধেশ্বর তেমনি হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার দিকে তাকালেন। নিশ্চয় আরো কিছু ভালো খবর। ভাবলাম, রাস্কিন আর ম্যাথ্যু আর্নল্ড আজ এ দেশে জন্মালে নিশ্চয় এখন কালোবাজারে ব্যবসা করতে নেমে পড়তেন।

—দেখুন, কী লাভ পড়াশুনো করে? মারোয়াড়ীরা কিন্তু বলে ভালো। ছেলে দশ বছর লেখাপড়া না শিখে সেই সময়টা ব্যবসায় নামলে অন্তত ত্রিশ হাজার টাকা ঘরে আনবে। আর কেরানী যদি রাখতে হয়, তা হলে পঁচিশ টাকা মাইনে দিলেই তো বাঙালী গ্রাজুয়েট এসে পা ধরে পড়ে থাকবে। এই তো মশাই লেখাপড়ার দৌড়—আর সরস্বতীর আশীর্বাদের পরিণাম।

অকাট্য যুক্তি। দীনতায় মাথা নীচু করে রইলাম। হায়, স্কুলে পড়বার সময় কেন আমার সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরবাবুর দেখা হল না! তা হলে এতদিনে সিদ্ধিদাতার পদরজঃ কি যৎকিঞ্চিৎও সঞ্চয় করতে পারতাম না? জীবনের এতগুলো বছর নিতান্তই বৃথা গেল।

বললাম, ঠিকই বলেছেন।

—এই দেখুন তা হলে, দেখুন—অপরিমিত খুশি হয়ে উঠলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু: টাকাই সব মশাই, টাকাই সব। নইলে আমার মতো গোমুখ্যু আপনার মতো একজন এম. এ.

পাসকে ছেলের মাস্টার রাখতে সাহস পাই কখনো ? জীবনে উন্নতি চান তো ব্যবসা ধরুন রঞ্জনবাবু। বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—আপনাকেও কি বলে দিতে হবে ?

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, কী ব্যবসা করব ?

—কী ব্যবসা করবেন ?—হঠাৎ যেন জ্বলে গেলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু, চোখ মুখ একসঙ্গে শাণিত হয়ে উঠল। ঠিক এই মুহূর্তে আমি যেন তাঁর প্রকৃত চেহারাটা দেখতে পেলাম।

মেঘমন্দ্রস্বরে সিদ্ধেশ্বর বললেন, ব্যবসা ? যা ধরবেন তাই ব্যবসা। ধুলোকেও সোনা করা যায়, কাঁকরকেও টাকা করা চলে। আজ আপনাকে একটা গোপন কথা বলব রঞ্জনবাবু। বিশ্বাস করা হয়তো শক্ত, কিন্তু প্রত্যেকদিনই আপনারা তার পরিচয় পাচ্ছেন।

সিদ্ধেশ্বর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তার আগে একটু চা করতে বলে আসি। আপনাদের মতো লোকের সঙ্গে তো আলাপ-আলোচনার সৌভাগ্য আমাদের হয় না, তাই আজ একটু মন খুলে গল্প করব। আপনি বসুন।

চটির শব্দ করে তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

চুপ করে বসে আছি। সিদ্ধেশ্বরবাবুর কথাগুলো নতুন নয়, এমন উপদেশ আরো অনেকের কাছে শুনেছি, অনেকবারই শুনেছি। কম্বল মাত্র সম্বল করে জেঠুমল আগরওয়ালা কলকাতায় পাঁচ-পাঁচখানা বাড়ি ফেঁদেছে। এক গদীর সাতজন মারোয়াড়ী বাইরে বেরুতে হলে একজোড়া জুতো দিয়েই কাজ চালায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র থেকে নিস্তারিণী কেবিনের রসিকমামা পর্যন্ত সকলেই সে সব রোমাঞ্চকর কাহিনী হাজার বার শুনিয়ে দিয়েছেন। তার জন্যে কোনো আগ্রহ নেই, কিন্তু কী গোপন কথা আমাকে বলবেন সিদ্ধেশ্বরবাবু! সোনা তৈরির মন্ত্র ? বিনা খরচায় বড়লোক হওয়ার উপায় ? ফাঁকতালে কিছু যদি হয়ে যায় তো মন্দ কী। হাতে এখন কোনো কাজ নেই, তাই অলস কৌতূহলে বসে বসে সিদ্ধেশ্বরবাবুর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

কলকাতার উত্তর-পূর্বাঞ্চল। একটু দূরেই মানিকতলার খাল। বড় বড় বাড়িগুলোর সঙ্গে কাঠের খাঁচা আর অসংলগ্ন বস্তির বিচিত্র সংমিশ্রণ এখানে। রেডিয়োর গানের সঙ্গে ঐকতান জমায় পাশের তেলের কল থেকে ছন্দোহীন কর্কশ কোলাহল। দূরে সার্কুলার রোড থেকে ট্রামের শব্দ আসে, আর এখানে খোয়া-ওঠা পাথুরে রাস্তায় খট খট করে চলে মাল বোঝাই গোরুর গাড়ি। সিনেমা হাউসে আলোর দীপালি জ্বলে, আর বস্তির ভেতরে কেরোসিনের ম্লান রক্তশিখায় বদনচন্দ্র অধিকারীর দলের 'দক্ষযজ্ঞ' গীতাভিনয়।

এ একটা অপূর্ব জগৎ। পূর্ণ আর ভগ্নাংশের অচ্ছেদ্য বন্ধনে গলাগলি করে আছে। কালিমাখা কলের মানুষ আর ধোপদুরস্ত নাগরিক। সন্ধ্যায় প্রজাপতি সেজে মেয়েরা রিক্‌শা চেপে সিনেমায় যায়, আবার কেউ কেউ রূপোর গয়না পরা কালো কালো হাতে মেটে দেওয়ালে ঘুঁটে থাবড়ায় তখনো। আর সকলের মাথার উপরে চূড়ো তুলে জেগে

আছে পরেশনাথের মন্দির। রাজবৈভব ঐশ্বর্য-বৈরাগী মহাপ্রাণ জৈন তীর্থংকরদের আবার রাজপ্রাসাদে এনে বসিয়েছে কুবেরের বরপুত্রেরা। ত্যাগী সন্ন্যাসীদের জন্যে ব্যয়িত বিপুল অর্থের অভ্রভেদী চূড়া নিশ্চয়ই বস্তির নিরন্ন মানুষগুলোকে ত্যাগ আর বৈরাগ্যের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করছে।

চটকা ভেঙে গেল। তেমনি চটির শব্দ করে সিদ্ধেশ্বর ঘরে এসেছেন। চেয়ারটাতে বসে পড়ে এবার তিনি সাড়ে চার যোজন হাসি হাসলেন। বললেন, কী ভাবছিলেন ?

—আপনার কথাগুলোই।

ভারী আপ্যায়িত হয়ে গেলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। বললেন, ভাববার কথাই। আচ্ছা মাস্টারমশাই, আন্দাজ করুন তো, যুদ্ধের বাজারে কত টাকা কামিয়েছি আমি।

কঠিন প্রশ্ন। তবু আন্দাজে বললাম, দশ লাখ ?

—একটু বাড়িয়ে বলেছেন—সোনাবাঁধানো দাঁতগুলো মাড়ি পর্যন্ত উদ্ঘাটিত করে দিলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। বললেন : অত নয়, কিছু কম। কিন্তু সে যাক। বলছিলাম, ব্যবসা করুন। ইচ্ছা থাকলে কাঁকর দিয়েও ব্যবসা জমানো চলে।

—কাঁকর ?

—হ্যাঁ—বিশুদ্ধ কাঁকর। ধান নয়, চাল নয়—অকেজো কচ্‌কচে কাঁকর। আর এই কাঁকরের টাকাতেই দমদমে আমি দুখানা নতুন বাড়ি কিনেছি—বিশ্বাস করেন আপনি ?

বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে আমি বললাম, কাঁকরের টাকাতে ?

—বিশ্বাস করা শক্ত ? কিন্তু আমি বলছি, এতটুকু অতিরঞ্জন নেই এতে, মিথ্যে নেই এতটুকু। আপনাকে মিথ্যে বলে আমার লাভ কী ?

—সবটা বলি শুনুন, ব্যস্ত হবেন না—সিদ্ধেশ্বর চেয়ারটাকে আমার আরো কাছে টেনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন : প্রথম যখন কণ্ট্রাক্ট পেলাম, আমার নিজেরই বিশ্বাস হয়নি ব্যাপারটা। তারপরে দেখলাম এর মধ্যে জটিলতা নেই একবিন্দুও, সব কিছুই জলবৎ তরলম্।

—কী রকম ?

পরেশনাথের মন্দিরের উদ্ধত চূড়োটার দিকে তাকালেন সিদ্ধেশ্বরবাবু। অন্যমনস্কভাবে বিড়ি ধরালেন একটা।

—কাঁকরের ফরমাস যারা দিয়েছিল তাদের নাম করব না। কিন্তু যে দাম তারা দিতে চাইল তাতে মনে হল যুদ্ধের বাজারে আর সব জিনিসই সোনা হয়ে গেছে—এক মানুষের প্রাণ ছাড়া। প্রচুর কাঁকরের অর্ডার তারা দিয়েছিল—পাঁচ মণ, দশ মণ, পাঁচশো মণ। কেন জানেন ?

—বলুন।

—চালে মেশাবার জন্যে।

আমি একটা অস্ফুট শব্দ করলাম।

সিদ্ধেশ্বর বিড়িটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, না, না, চমকাবেন না। ভাতে যে কাঁকর আপনারা খান, তা নিতান্তই অ্যাক্সিডেণ্ট্ নয়, বাড়তি ফসলের মতো ধানক্ষেত থেকে উঠেও আসেনি। বহু খরচ করে লরী বোঝাই দিয়ে তা আমদানি করতে হয়েছে, অনেক হিসেব করে, অনেক যত্ন করে তাকে চালের সঙ্গে মিশাল দিতে হয়েছে। ভগবানের কোনো কাজ-কারবার নেই এখানে, মানুষের কেরামতিই ষোলো আনা।

আমি বোকার মতো বললাম, কী অন্যায়। এ তো জোচ্চুরি। আপনি সাপ্লাই দিলেন কাঁকরের?

—নিশ্চয় দিলাম। কেন দেব না? ব্যবসা—ব্যবসাই। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির সেজে কোন্ ব্যাটা বসে আছে? আর আপনি জোচ্চুরি বলছেন কাকে? আপনাদের ওই এক দোষ মাস্টারমশাই, বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের গোপাল বড় সুবোধ বালক ছাড়া কিছুই আর শিখলেন না।

—তাই বলে মুখের গ্রাসে—

—মুখের গ্রাসে!—সিদ্ধেশ্বরবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: কিসে ভেজাল নেই বলতে পারেন? তেলে, আটায়, ঘিয়ে, ডালে। আটার ভেতরে মুঠো মুঠো ধুলো। ধুলোর দর কত জানেন?

—না, জানি না।

—জানা উচিত ছিল। প্রথম ভাগ পড়া মনটাকে একটু ঝালিয়ে নিন রঞ্জনবাবু। এ যুদ্ধের সময়। যা গুছিয়ে নিতে হয় এইবেলা। কাঁকর থেকেও যদি সোনার দানা কুড়িয়ে নেওয়া যায়, তা হলে সে সুযোগ কে ছাড়ে বলুন?

—কত মণ কাঁকর সাপ্লাই দিয়েছেন আপনি?

—তার কি ঠিক আছে কিছু?—সোনাবাঁধানো দাঁতগুলো আবার ঝলক দিয়ে উঠল: হাজার হাজার মণ। নৌকোয় বোঝাই হয়ে এসেছে, লরীতে বোঝাই হয়ে এসেছে, তারপর চালের সঙ্গে মিশে গেছে কলকাতার দোকানে দোকানে, গেছে বাংলাদেশের শহরে গ্রামে। এক মণ চালের সঙ্গে তিন সের কাঁকর গৃহস্থের পেট ভরিয়েছে, ব্যবসায়ীর পকেট ভরিয়েছে।

—গৃহস্থের পেট ভরিয়েছে?

—ভরায়নি? চাল সহজেই হজম হয়ে যায়, একটু পরেই ক্ষিদে পায় আবার। কিন্তু কাঁকর সে বান্দাই নয়। একবার ঢুকল তো বসে রইল পাকাপোক্ত কায়েমি বন্দোবস্ত

করে। ক্ষিদে পাবে কি, তখন পেটের ভারেই লোককে ছটফট করতে হয়।

আর একটি মূল্যবান যুক্তি। কিন্তু আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালাম সিদ্ধেশ্বরবাবুর মুখের দিকে। ঠাট্টা করছেন না তো ভদ্রলোক ?

না, ঠাট্টা নয়। সিদ্ধেশ্বর আবার বললেন, তাছাড়া দেশে চাল কম। যা আছে তাও তো মাটির নিচে—মানে চোরাবাজারে। এই কাঁকর দেওয়ার ফলে দেখুন তার পরিমাণ বেড়ে গেল কতখানি। তা ছাড়া পেটে ভার পড়াতে লোকেরও ক্ষিদে মরে গেল, দু'দিক থেকেই চমৎকার সাশ্রয় হল। আপনিই ভেবে দেখুন।

আমি আর ভেবে দেখব কী ? আমার চাইতে ঢের বেশি ভেবে রেখেছেন সিদ্ধেশ্বর। ডিম্যাণ্ড অ্যাণ্ড সাপ্লাই নীতির এই অপূর্ব ব্যাখ্যা মল্লিনাথ পর্যন্ত করতে পারতেন না।

টেবিলের ওপরে টেলিফোনটা আবার সাড়া দিয়ে উঠছে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে সিদ্ধেশ্বর রিসিভার কানে তুলে নিলেন। সেই সাংকেতিক শব্দের বিনিময়। রত্নভাণ্ডারের দরজা খোলবার সেই অক্ষয়মন্ত্র।

ফোন নামিয়ে সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, তাই বলছিলাম মাস্টারমশাই। যা ধরবেন তাই সোনা হয়ে যাবে—ব্যবসায় নেমে পড়ুন। কাঁকর, ধুলো, সোরগুজা, চর্বি। কিছুই ফেলা যায় না, এক বছরের মধ্যে তা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।

হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধে ভরে গেল ঘরটা। চাকর দু'থালা মনোরম আর ধূমায়মান ফুলকো লুচি নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। তিন-চার রকমের মিষ্টি, ডাল, আলুর দম। ছাত্রকে ফেল করাবার পরে প্রাইভেট টিউটরের এমন অভ্যর্থনা ইতিহাসে লেখে না।

বিনয়ে গলে গিয়ে সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, আসুন মাস্টারমশাই, একটু চা খান। গরীবের বাড়িতে যৎসামান্য—

মুহূর্তে লুচির ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। টাটকা ঘিয়ের এমন চমৎকার লুচি কতদিন খাইনি। দেখতে দেখতে থালা খালি হয়ে গেল। নাঃ—সিদ্ধেশ্বরবাবুর লুচিতে কাঁকর নেই, ময়দায় বালি নেই। কাঁকরের বিনিময়ে বাজারের সেরা জিনিস তিনি সংগ্রহ করেছেন।

রাস্তায় যখন নেমে পড়লাম, তখন পেছনে পেছনে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন সিদ্ধেশ্বরবাবু।

—বড় আনন্দ হল মাস্টারমশাই আপনার সঙ্গে আলাপ করে। আমরা দোকানদারীই করি, আপনাদের মতো পণ্ডিত লোকের সঙ্গ পাওয়ার সুযোগ-সুবিধে তো হয় না।

ভারী সদালাপী ভদ্রলোক। এবারে আপ্যায়িত হওয়ার পালা আমারই। বললাম, না, না, আমারই বড্ড উপকার হল। আমরা নিতান্তই মাস্টার, প্র্যাকটিক্যাল কাজের কথা

আর ক'জনের কাছে শুনতে পাই বলুন ?

প্রত্যুত্তরে এবার পুরো পাঁচ যোজন পরিমিত হাসি হাসলেন সিদ্ধেশ্বরবাবু: কী যে বলেন।

দু'পা এগিয়েছি, হঠাৎ পাশের বস্তির ভেতরে মড়াকান্নার আকুল শব্দ। থমকে থেমে গেলাম।

সিদ্ধেশ্বরবাবু বললেন, ও কিছু নয়, বস্তিতে কলেরা লেগেছে। একটু সাবধান থাকবেন মাস্টারমশাই, টিকে নিয়েছেন তো ?

হন হন করে চলতে শুরু করেছি। কিন্তু একটা মোড় ঘুরেই আবার থেমে পড়তে হল। কণ্ট্রোলের দোকান। ছোট রাস্তা প্রায় সম্পূর্ণ জুড়ে 'কিউ' করেছে বস্তির দরিদ্র নরনারীর দল। চালের জন্যে, আটার জন্যে, আর হয়তো সিদ্ধেশ্বরবাবুর ধুলো-বালি-কাঁকরের জন্যে। ওদিকে বস্তিতে কলেরা লেগেছে—এখান থেকেও শুনতে পাচ্ছি মড়াকান্না।

হঠাৎ গলার মধ্যে লুচির একটা তীব্র ঢেঁকুর উঠল। আর চোখে পড়ল পরেশনাথের মন্দিরের একটা উদ্ধত চুড়ো বস্তির মাথার উপরে সগৌরবে শোভা পাচ্ছে। আচমকা একটা খেয়ালের বশেই আমার মনে হল: ওই মন্দিরটা ভেঙে ফেললে কত মণ কাঁকর বেরুতে পারে ?

পাণ্ডুলিপি

স্টেশনের বাইরে নিম গাছের নিচে গোরুর গাড়িখানা রেখে তারাকান্ত প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকলেন।

রাত শেষ হয়ে এসেছে। আকাশে অসংখ্য তারার রক্তাভ রঙ দেখতে দেখতে বিবর্ণ হয়ে গেল। ফিকে অন্ধকারের ভেতর টুপটুপ করে শিশির পড়ছে, স্টেশনের ঠিক সামনেকার বড় আলোটা একটু পরেই নিবে যাবে হয়তো।

তারাকান্ত পকেট থেকে চেনে বাঁধা সোনার ঘড়িটা বের করে সময়টা দেখে নিলেন। রাত সাড়ে চারটে। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস আসতে দু'ঘণ্টা দেরি আছে এখনো।

একটু বেশি তাড়াতাড়িই এসে পৌঁছেছেন তারাকান্ত। তা হোক। বারো মাইল পথ—গোরুর গাড়িকে বিশ্বাস নেই। সময়মত পৌঁছুতে না পারলে বিলক্ষণ কষ্ট হবে বিভূতির। যা স্টেশন—কতগুলো তেলেভাজা জিলিপি আর ছ'মাসের পুরানো একরাশ জিভেগজা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না এখানে। আর চা! তার স্বাদ, গন্ধ এবং বর্ণের

কথা না ভাবাই ভালো।

চায়ের কথা মনে পড়তেই তারাকান্ত চকিত হয়ে উঠলেন :

—কৈলেস, বলি ও কৈলেস ?

বলদ দুটোকে পোয়াল নামিয়ে দিতে দিতে কৈলাস সাড়া দিলে, আজ্ঞে ?

—টিফিন-বাস্কেট, স্টোভ ঠিক আছে তো সব ?

—আজ্ঞে হাঁ, আছে বই কি।

যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ট্রেন আসবার দশ মিনিট আগে চায়ের জলটা চাপিয়ে দিলেই চলবে। তা ছাড়া ডিম আছে, লুচি, আলুভাজার বন্দোবস্ত আছে, কিছু ভালো টাটকা কাঁচাগোল্লাও সঙ্গে আনতে তারাকান্ত ভুল করেননি।

মোটা একটা চুরুট ধরিয়ে তারাকান্ত কাঁকর বিছানো প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপর পায়চারি করতে লাগলেন। আফিস ঘরের কাঁচের দরজার ভেতর দিয়ে বাইরে অল্প অল্প আলো পড়েছে, যাঁর ডিউটি, তিনি নিশ্চিন্তে সুখস্বপ্ন দেখছেন বোধ করি। পৃথিবীর এখনো জাগবার সময় হয়নি, অথচ চারদিকে একটা তরল প্রশান্তি, যেন জাগরণের পূর্বাভাসে তার নিশ্বাস অবধি লঘু হয়ে আসছে। শান্ত নিস্তব্ধতার ভেতর কেবল ভেসে আসছে বন-ধুত্‌রোর একটা মাদক-গন্ধ, আর তারাকান্তের ভারী জুতোটার সঙ্গে কাঁকরের একটা কর্কশ মিশ্রধ্বনি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। প্ল্যাট্‌ফর্ম-ল্যাম্পের আলো পিছলে পড়ে রেল লাইনের ঘষা ইস্পাত যেন রূপোর মতো চিকচিক করছিল।

কতদিন পরে বিভূতি আসবে। বিভূতি, তারাকান্তের নিজের হাতে গড়া বিভূতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাতে সোনার মেডেল পেয়ে সে দেশে ফিরছে। তারাকান্তের সমস্ত স্বপ্ন এতদিনে সার্থক, সমস্ত কল্পনা বাস্তবের মধ্য দিয়ে পূর্ণতার সিদ্ধিলাভ করেছে। এ সাফল্যের গৌরব বিভূতির খালি একারই নয়।

অথচ, মামার বাড়িতেই মা-মরা ছেলেটা মানুষ হয়ে চলছিল। গ্রামের টোলে ব্যাকরণের আদ্য অবধি পাস করেই যখন সে পৈতৃক যজমানী ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে, এমনি সময় তারাকান্ত তাকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে এলেন। তাঁর বিপত্নীক নিঃসন্তান জীবনে দূর-সম্পর্কের এই ভাইপোটিই হয়ে দাঁড়াল একমাত্র সান্ত্বনা এবং অবলম্বন।

শোনা যায় যৌবনে তারাকান্ত অ্যানার্কিস্ট বলে পরিচিত ছিলেন। এটা ইতিহাস অথবা কিংবদন্তী আজকে তা যাচাই করে নেবার উপায় নেই। কিন্তু অতীতের মানুষ হয়েও তাঁর মন একটা বিচিত্র ব্যাপকতায় কেমন করে যেন বর্তমানকে স্বীকার করে নিয়েছে। তারাকান্তের চরিত্রে এটা বিস্ময়কর বিশেষত্ব ; পঞ্চাশোর্ধ্বে তিনি আধুনিক।

পেশল দু'খানি শক্তিশালী পায়ের ছন্দোবদ্ধ আঘাতে সজাগ হয়ে উঠল সমস্ত প্ল্যাট্‌ফর্ম। যৌবন : কোথায় গেল যৌবনের সে সমস্ত আশা—সেদিনের প্রসারিত দৃষ্টির

সামনে বর্ণোজ্জ্বল স্বর্ণদিগন্ত। গতানুগতিকতার চাপে তারাকান্তের বহির্মুখী মনটা বাধ্য হয়ে ফিরে এল নিজের নির্ধারিত গণ্ডিটারই মাঝখানে। তারপরে দৈনন্দিন জীবন, জমিদারীর অসংখ্য জটিলতা এবং সাংসারিকতার চিরন্তন সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ইতিকথা।

স্বপ্নভঙ্গের আঘাত তারাকান্তের সমস্ত জীবনটাকেই ব্যথায় বিষাক্ত করে দিয়েছিল। সাধারণ, অতি সাধারণের সঙ্গে বেঁচে থাকবার পূর্বানুবৃত্তি। সবাই যেমন করে বাঁচে, সবাই যেমন করে মরে। লক্ষকোটি জল-বুদ্বুদের ভেতর আর একটি। যাচাই করা যায় না, বাছাই করা যায় না, অবশ্যম্ভাবী ক্ষণভঙ্গুরতায় সকলের দৃষ্টির সামনে থেকে একদিন যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে। কবে একদিন সূর্যের আলো ইন্দ্রধনুর সাতটি রঙে তাকে রাঙিয়ে দিয়েছিল, সে ইতিহাস সেদিন কে জানে?

কিন্তু তারপরেই এল বিভূতি। না, এল বললে কম বলা হয়, বলতে হয় আবির্ভাব। অদ্ভুত বুদ্ধি, আশ্চর্য প্রতিভা। ফটোগ্রাফির কাঁচের মতো তার মন, তারাকান্ত ভাবলেন তাঁর নিজের সমস্ত ভাবনাকে, সমগ্র অনাগত ভবিষ্যৎকে সেই কাঁচের ওপর ফুটিয়ে তুলবেন। বিভূতির স্বচ্ছ বুদ্ধি ও প্রতিভার পটভূমিকায় তারাকান্ত এঁকে চললেন নিজের প্রতিকৃতি। কিন্তু মাথায় রইল তার মুকুট, চোখে রইল আলো আর হাতে রইল রাজদণ্ড; বিভূতির ভেতর দিয়ে তারাকান্ত নতুন করে নিজেকে রচনা করলেন।

বারো বৎসর আগেকার কথা, অথচ মনে হয় যেন সেদিন। তারাকান্তের দৃষ্টির সামনে সে সব ছবির মতো ভাসছে। বাইরে মলিন সন্ধ্যা। ঘরের ভেতর লণ্ঠনের আলো। কাঁচের আলমারীতে তারাকান্তের ইতিহাস আর রাজনীতির মরক্কো বাঁধানো মোটা মোটা বইগুলো ঝকমক করছে।

—তারপর পিটার দি গ্রেট কী করলেন কাকামণি?

—তারপর, তারপর পিটার দি গ্রেট সমস্ত দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলবার কাজে মন দিলেন। সমাজে কত সব বিশ্রী নিয়মকানুন ছিল, পিটার আইন করে দিলেন, সে সব যারা মানবে, কঠিন শাস্তি হবে তাদের। দেশের অশিক্ষিত বোকা লোকগুলো পিটারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইল, আর এই বিদ্রোহীদের নেতা হলেন কে জানো? তিনি পিটারের নিজের ছেলে যুবরাজ আলেক্সিস।

বিভূতি ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, ভারী দুষ্টু ছেলে তো।

—তা বৈকি। কিন্তু তাই বলে পিটার ছেলের অন্যায়টাকে ক্ষমা করলেন না। রাজ্যের অন্যান্য বিদ্রোহীদের সঙ্গে তিনি আলেক্সিসেরও প্রাণদণ্ড দিলেন।

বিভূতি রুদ্ধনিশ্বাসে বললে, প্রাণদণ্ড দিলেন?

—নিশ্চয়ই দিলেন। যাঁরা বড়লোক, তাঁদের এমনি করেই ন্যায় বিচার করতে হয় যে। নইলে লোকেই বা তাঁদের মানবে কেন? আমাদের দেশেও একজন বড় রাজা

এইরকম কাজ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন মহারাজ রামপাল। ছেলে যক্ষপালের একটা মস্ত অপরাধে তিনি তাকে শূলে চড়িয়ে মেরে ফেলেন।

এমনি করে দিনের পর দিন অক্লান্ত চেষ্টায় তারাকান্ত বিভূতিকে গড়ে তুলেছেন। রাশিয়া কোথায়, কাইজার কে, মহাত্মা গান্ধী কি করেছেন, নায়াগ্রা প্রপাত আবিষ্কার করতে মানুষ কেমন করে এগিয়ে চলেছে সহস্র বিপদের মধ্যে, হিমালয় অভিযানে কেমন করে দুঃসাহসী মানুষ স্বেচ্ছায় মরণকে বরণ করে এনেছে।

তারপর বিভূতি বড় হয়ে উঠল, কুড়ি টাকার একটা বৃত্তি পেল ম্যাট্রিকুলেশনে। পাবেই—এ যেন তারাকান্ত একটা জন্মগত সংস্কারের ভেতর দিয়ে জানতেন। তাঁর এত কল্পনাকে বিভূতি মিথ্যে করতে পারে না কখনো। যেমন করে গড়ে উঠেছে য়্যাব্রাহাম লিঙ্কল্‌ন্ আর জর্জ ওয়াশিংটনের জীবন, গ্যারিবল্‌ডী, ম্যাট্‌সিনি আর মুসোলিনীর সার্থকতা, কাভুর আর বিস্‌মার্কের ভবিষ্যৎ, ঠিক তেমনিভাবে বিভূতিকে নির্মাণ করতে চেয়েছেন তারাকান্ত। সাধারণের মাঝখানে সে মাথা তুলে দাঁড়াবে অনন্যসাধারণ হয়ে, নিজেকে সে কেবল একটা বুদ্‌বুদের মতোই নিশ্চিহ্ন করে দেবে না; বাঁচা-মরার একটানা স্রোতে সে বয়ে আনবে প্রাণবন্যা—বিভূতির মধ্যে হয়তো আরো একটা বৃহত্তর সত্তাকে তিনি আবিষ্কার করবেন যা তাঁর নিজের মনোজগতেরও বাইরে ছিল।...

আকাশে ভোরের রঙ। প্ল্যাট্‌ফর্মের বড় আলোটা এই মাত্র দপ করে নিবে গেল। পোড়া কেরোসিনের একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বন-ধুত্‌রোর গন্ধ উগ্রতর হয়ে আসছে।

বিভূতি—ক্যানভাসের ওপর আঁকা তারাকান্তের নিজের নিখুঁত প্রতিমূর্তি। অথবা শাদা কাগজে লেখা একটা আত্মকাহিনী। ঠিক আত্মকাহিনী নয়। সেখানে ব্যর্থতা নেই, স্বপ্নভঙ্গের রূঢ় আঘাত নেই। তারাকান্ত এণ্ট্রান্সে জলপানি পাননি, সরকারের তিন আইন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সোনার মেডেল পেতে দেয়নি। বিভূতি পেয়েছে। তাকে পেতেই হত।

ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে বিভূতি চলে গেল কলকাতায়। যাওয়ার আগের দিন সে কেঁদে ফেললে।

—কাকামণি, তোমাকে ফেলে আমি কেমন করে থাকব?

তারাকান্ত জোর করে হাসলেন—আজীবন বুদ্ধিবাদী, বাস্তবপন্থী তারাকান্ত। সংসারের ক্ষেত্রে এরকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে নেই:

—Now, now, don't be carried by sentiment! পুরুষমানুষকে বিদেশে যেতেই হয়। তা ছাড়া তুমি যাচ্ছ লেখাপড়া শিখতে, বীরের মতোই যে যেতে হবে তোমাকে।

বিভূতি তবু কাঁদতে লাগল।

সান্ত্বনা দিয়ে তারাকান্ত বললেন, ছি ছি, বড় হয়েছ, এখন কি ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে হয়? আর কলকাতা তো ঘরের কাছে, এর পরে তোমাকে বিলেত পাঠাবো যে।

বিভূতি ভিজে চোখ দুটোকে বড় বড় করে কাকামণির দিকে তাকালো।

—বিলেত?

—তা ছাড়া কি? ওয়ার্ডসোয়ার্থ, মেকলে, গ্ল্যাড্‌স্টোনের দেশ না দেখলে কেউ কি বড় হতে পারে? যাদের ভেতর থেকে ড্রেক, নেলসন কিংবা কিচেনারের জন্ম হয়, সে জাতিটাকে না চিনলে কেউ কি সত্যিকারের মানুষ হয় কখনো?

বিভূতি তবু কিন্তু উৎসাহিত বোধ করলে না।

—তা হোক, আমি কিন্তু কিছুতেই একা একা বিলেত যেতে পারব না কাকামণি!

অসীম স্নেহে দৃষ্টি গভীর হয়ে এল তারাকান্তের।

—আচ্ছা তার তো দেরি আছে, পরে দেখা যাবে সে সব। এখন তো দিগ্বিজয়ীর মতো কলকাতা চলে যাও। আর মনে রেখো, শুধু মানুষ হলেই তোমার পরিচয় শেষ হবে না, you must be a superman!

বিভূতি অতি-মানব হয়েছে কি না সে কথা জানবার দরকার নেই তারাকান্তের। কিন্তু সে যে ভালোয় মন্দে মিশিয়ে ঠিক তাঁরই নির্দিষ্ট বাঁধা ফরমূলাতে গড়ে উঠেছে এইটাই আজকে সব চেয়ে বড় কথা। পাথর কুঁদে কুঁদে মূর্তি গড়া এতদিন সমাধা হয়েছে, পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় এতদিনে পড়েছে সমাপ্তির কালির আঁচড়।...

ঘট্ ঘট্ ঘটাং—

তারাকান্তের অন্যমনস্কতার ভেতর দিয়ে এর মধ্যেই কখন জেগে উঠেছে সমস্ত স্টেশনটা। নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস আসবার প্রথম ঘণ্টাটা বাজল, আরো কয়েক মিনিট। একটা হিন্দুস্থানী ঝাড়ুদার কোন্ ফাঁকে এসে প্ল্যাট্‌ফর্মটা ঝাঁট দিতে শুরু করেছে, উদ্গত ধুলোর গন্ধে বনধুতুরোর গন্ধটা চাপা পড়ে গেল।

—কৈলেস, ও কৈলেস?

সারা রাত গাড়ি হাঁকিয়ে এসে কৈলাস একপাশে বসে ঝিমুচ্ছিল। তারাকান্তের ডাকে সে ধড়মড় করে উঠে বসল।

—আজ্ঞে, ডাকছেন কর্তা?

—আর ঘুমোসনি। স্টোভটা জেলে ফেল্ এবেলাই, গাড়ি এসে গেল রে।

কৈলাস শশব্যস্তে চলে গেল জলখাবারের বন্দোবস্ত করতে।

সদ্য নিদ্রোত্থিত স্টেশনমাস্টার এতক্ষণে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন। বয়স অল্প, চুলের ছাঁট আর চশমার আধুনিক ফ্রেম তাঁর সৌখীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়।

বার তিনেক বড় বড় হাই তুলে তিনি গুনগুন করে সিনেমার একটা গান ধরলেন।

আলাপ করবার জন্যে এগিয়ে এলেন তারাকান্ত।

—ইয়ে শুনছেন!

সশ্রদ্ধ চোখে তারাকান্তের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে স্টেশন মাস্টার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

—মানে, নর্থ বেঙ্গলের স্টপেজ আর টাইমিং-এর ভেতর কিছু বদলে যায়নি তো?

নিজস্ব প্রসঙ্গের সুযোগে স্টেশন মাস্টার উৎসাহিত হয়ে উঠলেন: আজ্ঞে না, দু বছরের ভেতর এর আর কোনো অদল-বদল হয়নি। সেই ট্র্যাডিশন নিয়েই চলছে। আপনার দার্জিলিং মেল বলুন, আসাম মেল বলুন, এ লাইনের এটাই সেরা ট্রেন কিনা।

আপ স্টেশনের ফোনটা ক্লিং ক্লিং শব্দে সাড়া দিয়ে উঠল। উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার মাঝখানেই স্টেশন মাস্টার থেমে গেলেন।

—ওই, ট্রেন এল বুঝি। আসুন না, ভেতরে বসুন এসে—স্টেশন মাস্টার দ্রুতপদে অফিসের ভেতর তিরোধান করলেন।

কিন্তু ভেতরে গিয়ে বসবার সময় নেই আর। তারাকান্ত শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ট্রেন এসে পড়ল, মানে এসে পড়ল বিভূতি। চা-জলখাবারের বন্দোবস্ত সময়মতো করে না রাখলে ঢের দেরি হয়ে যাবে গোরুর গাড়িতে উঠতে। তা ছাড়া কৈলাস যা আনাড়ি—কতদূর কী করে বসে আছে কে জানে।

সিগন্যালগুলো নেমে পড়লো। আর দেরি নেই গাড়ির। কৈলাস যা হোক করে জলখাবারটা নামিয়ে ফেলেছে শেষ পর্যন্ত, ট্রেনটা এসে গেলে চা ভিজিয়ে দিলেই হবে।

বিভূতি তা হলে সত্যিই আসছে। তারাকান্তের হাতে গড়া বিভূতি। সুচিন্তিত গল্পের সুসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি। নিপুণ হাতে খোদাই করা নিখুঁত ভাস্কর্যের মূর্তি। বিভূতির ভেতর দিয়ে তারাকান্ত নিজেকেই নতুন করে সৃষ্টি করেছেন।

ট্রেন এসে গেল। বাঁকের মুখে খানিকটা হাল্কা অস্পষ্ট ধোঁয়া—তারপরে দীর্ঘ সরীসৃপের মতো নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের যান্ত্রিক দেহটা। সরীসৃপ নয়—লোহার ঝড়। প্রচণ্ড গতিবেগে স্টেশনটাকে থর থর করে কাঁপিয়ে প্ল্যাট্‌ফর্মে এসে ভিড়ল।

ইণ্টার ক্লাস থেকে নামল খদ্দর পরা বিভূতি। কতদিন—কতদিন পরে। উদ্বেলিত বুকে তারাকান্ত এগিয়ে গেলেন। নত হয়ে বিভূতি দু'হাতে তাঁর পায়ের ধূলা নিলে।

—তারপর, তারপর বেশ ভালো আছে তো শরীর?

—আছে কাকামণি। তুমি ভালো তো?···এই যে অজিত, প্রদ্যোৎ, এদিকে এসো।

আরো দুটি সুদর্শন ছেলে এগিয়ে এসে তারাকান্তকে প্রণাম করলে।

—বেশ, বেশ।—প্রগাঢ় বিস্ময়ভরে তারাকান্ত বললেন, এরা বুঝি তোমার সঙ্গেই

এলেন ? তা এঁদের কথা আগে তো কিছু জানাওনি।

লজ্জিত হাসি ফুটে উঠল বিভূতির মুখে।

—এরা আমার বিশেষ বন্ধু, হিতৈষীও বটে। খেয়ালের ঝোঁকে হঠাৎ চলে এল, তাই আগে থেকে জানাতে পারিনি।

বন্ধু এবং হিতৈষী! শপাৎ করে যেন একটা চাবুকের আঘাত নিষ্ঠুরভাবে এসে পড়ল তারাকান্তের মুখের ওপর। এই শব্দ দুটো তাঁর কানে বিস্ময়করভাবে অপরিচিত। আজ বিভূতির বিশেষ বন্ধু এবং হিতৈষীর অভাব নেই, আজ বিলেত যাওয়ার পথে কাকামণিকে না হলেও হয়তো বিভূতির চলে!

অদ্ভুত একটা অকারণ বেদনায় তারাকান্তের সমস্ত বুকের ভেতরটা যেন আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। মনে হল: কোথায় কী যেন একটা ভুল রয়ে গেছে। মূর্তি রচনা হয়তো সম্পূর্ণ হয়নি, হয়তো, হয়তো এখনও তারাকান্তের বাঁধা ফর্মুলার বাইরে কোথায় একটা স্বতন্ত্র সত্তা প্রচ্ছন্ন রয়েছে বিভূতির।

তারাকান্ত শুষ্ক স্বরে বললেন, তা বেশ বেশ। ভারী খুশি হয়েছি এঁদের দেখে।

কোথা থেকে স্টেশন মাস্টার ছুটতে ছুটতে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—নমস্কার, নমস্কার বিভূতিবাবু! আপনি এখানে? আপনাদের মতো লোককে এসব জায়গায় দেখতে পাব এমন আশাই তো করি না।

বিভূতি স্মিত মুখে প্রতিনমস্কার করে বললে, এখানেই তো আমার বাড়ি। আর ইনি আমার, কাকা। কিন্তু আপনি আমাকে কী করে চিনলেন?

—ইনিই আপনার কাকা? নমস্কার। বাঃ, আপনাকে চিনব না, বলেন কি। বাঙলা দেশে এমন কে আছে যে শ্রেষ্ঠ আধুনিক সাহিত্যিক বিভূতি মৈত্রকে চেনে না? কলকাতায় আপনাকে কতবার দেখেছি—স্টেশন মাস্টার অত্যন্ত আপ্যায়নের হাসি হাসলেন: আসুন, আজ আমার এখানে চা খেয়ে—

অত্যন্ত রূঢ়ভাবে কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বসলেন তারাকান্ত। বললেন, সাহিত্যিক! তার মানে তুমি লিখছ নাকি আজকাল? কই, আমি তো কিছুই জানি না!

তারাকান্তের কণ্ঠস্বরে বিভূতি চমকে উঠল। বিস্মিত চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললে, লিখছি সামান্য সামান্য, কিন্তু সে তো তোমাকে জানাবার যোগ্য নয় বলেই জানাইনি কাকামণি!

বিভূতির শেষ কথাটা তারাকান্তের কানে গেল না। মনে হল: স্বপ্ন হয়তো সার্থক হয়েছে, হয়তো তাঁর নিজের হাতে গড়া প্রতিকৃতির নৈপুণ্যে কারো এতটুকু সন্দেহ করবার কারণ নেই। কিন্তু সৃষ্টি কখন যে স্রষ্টাকে অতিক্রম করে গিয়েছে তারাকান্ত তা কি জানতেন? আজ তাঁর আর বিভূতির মাঝখানে সমস্ত পৃথিবী এসে ভিড় করে

দাঁড়িয়েছে। তার ভেতর থেকে নিজের গড়া বিভূতিকে আর আলাদা করে, একান্ত করে খুঁজে পাবেন না তিনি। তাঁর রচনা তাঁকে ছাড়িয়ে এত দূরে চলে গেছে যে সেখানে তাঁর আর এতটুকুও দাবি নেই। তাঁর নিজস্ব পাণ্ডুলিপি আজ যে তাঁরই হাতের লেখাকে নিশ্চিহ্নভাবে মুছে দিয়ে ছাপার অক্ষরে সমস্ত পৃথিবীর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে মুক্ত হয়ে গেছে, এই কি তিনি চেয়েছিলেন ?

স্টেশন মাস্টার আবার বললেন, আসুন, আসুন, চা-টা না খাইয়ে কিছুতেই এ বেলা ছেড়ে দেব না আপনাদের।

নক্র-চরিত

দরজায় ঠক্ ঠক্ করে তিন-চারটে টোকা পড়ল। খেরো-খাতায় কষ-কালির আঁচড় টানতে টানতে ভ্রূকুঞ্চিত করে মুখ তুলে তাকালো নিশিকান্ত কর্মকার। শব্দটার অর্থ সে বুঝতে পেরেছে।

বাইরে কালো রাত—তারস্বরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, আর ঘরে মিট মিট করে জ্বলছে কেরোসিনের আলো। বেশি তেল পুড়বার ভয়ে নিশি কখনো আলোটাকে বাড়াতে চায় না। আধা-অন্ধকারে কাজ করতে করতে শকুনের চাইতেও সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে তার চোখের দৃষ্টি। খেরো-খাতায় কষ-কালির লেখাগুলোকে সে পিঁপড়ের সারির মতো সাজিয়ে চলেছে—আজকের দিনের জমাখরচ।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। শব্দটা চেনা, তবু—তবু কে জানে! নিশি কর্মকারের শকুনের মতো চোখ দুটোর ওপর সংশয়ের ছায়া এল ঘনিয়ে, কপালে দেখা দিলো এলোমেলো সরীসৃপ রেখা। বাতির অস্পষ্ট আলোয় ঘরের কোণে বিলিতী লোহার সিন্দুকটার হাতল আর ভারী হব্‌সের তালা দুটো ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে। কাঁচা সোনায়, গয়নাতে, নোটে এবং নগদে প্রায় বিশ হাজার টাকা অলংকৃত করেছে ওই সিন্দুকটার জঠর।

কলম রেখে নিশি উঠে দাঁড়াল। লোকটা কুঁজো। বয়সের চাপে নয়, খাতা আর হাতুড়ির সংস্রবেই অকালে তার পিঠটা বেঁকে গিয়েছে ধনুকের মতো। অত্যন্ত সতর্ক হাতে দরজার ভারী খিলটা সরিয়ে দিলে সে।

ঘরে ঢুকল চারজন লোক—মুখ চেনা না থাকলে নিশি আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠত। তাদের কারো চেহারাই উজ্জ্বল দিবালোকে দেখবার বা দেখাবার মতো নয়। মালকোচা আঁটা, মুখের উপর চুন আর ভূষা-কালির বর্ণ-বিন্যাস চালিয়ে বিকট চেহারাকে বিকটতর করে তুলেছে তারা। হাঁটু পর্যন্ত কাদা। হাতে তাদের তেল-

পাকানো বাঁশের লাঠি, ক্ষুরের মতো ধারালো চকচকে দীর্ঘ হাসুয়া। একজনের মাথায় ভারী একটা টিনের ট্রাঙ্ক, আর একজনের হাতে একটা পুঁটলি, শাড়ি দিয়ে বাঁধা।

নিঃশব্দে পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

ট্রাঙ্ক আর পুঁটলি সামনে নামিয়ে তারা শ্রান্তভাবে বসে পড়ল। চার মাইল পথ ছুটে আসতে হয়েছে, ক্লান্তিতে ভারী ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে তাদের। আট-দশটা হাটের গাড়ি তাদের পিছনে পিছনে আসছিল, একটু হলেই ধরা পড়ে যাওয়া আশ্চর্য ছিল না। যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে একজন পায়ের দিকে তাকালো। ইটের ঘা লেগে বেমালুম নখ উড়ে গেছে একটা। মাটি মেশানো কালো রক্ত সেখান থেকে টপ টপ করে ঝরে পড়ছিল।

নিশি কর্মকার জিজ্ঞাসু চোখে একবার ট্রাঙ্ক আর একবার পুঁটলির দিকে তাকালো।

—আজকের শিকার?

—হুঁ।

—সোনাদানা মিলেছে?

—খুলে দেখ না। গয়না যা পাওয়া গেছে তা ওই পুঁটলিটাতেই।

আলোটা চড়িয়ে দিয়ে নিশি পুঁটলি খুলল। একরাশ সোনারূপোর গয়না চকিত আলোর স্প.র্শ ভয়াতুর চোখের মতো উঠল ঝিলিক দিয়ে। রূপোর মল, চুড়ি, ভারী টোড়া একছড়া, সোনার দু'ছড়া হার, বালা, আংটি একটা। পাথর বসানো কানের দুল একজোড়া, সেটা স্পর্শ করেই নিশি চমকে হাত সরিয়ে নিলে। নরম একটা মাংসের টুকরো এখনো লেগে রয়েছে তাতে, আর সেই সঙ্গে আঠার মতো রক্ত। সময় সংক্ষেপ করবার জন্য কানসুদ্ধই দুল জোড়াকে ছিঁড়ে এনেছে ওরা।

—ইস্, খুন হয়েছে নাকি!

সব চাইতে যে মোটা আর জোয়ান সে-ই জবাব দিলে। কেউ না বলে দিলেও বুঝতে পারা যায় স্বতঃসিদ্ধ নিয়মমতোই সে এদের দলপতি। মোঙ্গলসুলভ খর্ব নাকের নিচে বিড়ালের মতো অল্প কয়েকগাছা লালচে গোঁফ খাড়া হয়ে রয়েছে, চোখ দুটো এত ঘোলাটে আর নিষ্প্রভ যে হলুদ মাখানো বলে মনে হয়। সমস্ত শরীরটা তার গাঁটে গাঁটে পাকানো, যেন পেশী দিয়েই তৈরি সেটা। নাম তার মদন।

মদন তিনটে উঁচু উঁচু বেঢপ আর নোংরা দাঁত বের করে হাসল।

—না, খুন হয়নি। দিতে চায়নি, তাই কেড়ে আনতে হয়েছে।

দলের মধ্যে সব চাইতে ছোট যোগী চুপ করে বসে ছিল। রাহাজানির কাজে এই বছরই সে হাতে খড়ি দিয়েছে। অন্ধকার রাত্রিতে অসহায় পথিকের আর্তনাদ এখনো তার বুকের মধ্যে ঢেউ জাগিয়ে তোলে, হাসুয়ার কোপ যখন হিংস্র একটা হাসির

মতো মাথার ওপর ঝকমক করে ওঠে, তখন মৃত্যু-ভীতের বিস্ফারিত দৃষ্টি সে সহ্য করতে পারে না। তার স্নায়ু এখনো এই নিশাচরের জীবনটাকে সহজভাবে আয়ত্ত করে নিতে পারেনি।

যোগী বললে, উঃ, কী রকম কাঁদছিল মেয়েটা। ওভাবে কেড়ে না নিলেই—

মদন হো হো করে হেসে উঠল।

—এসব তোর কাজ নয়। ভূঁইমালীর নাম ডুবিয়েছিস তুই। কাল থেকে ঘরে চলে যা, ধামা-কুলো তৈরি করগে বরং। মেয়েমানুষের মন নিয়ে এসব জোয়ানের কাজ করা যায় না।

অপ্রতিভ যোগী নীরব হয়েই রইল। সে ভয় পায়নি, কিন্তু সংশয় দেখা দিয়েছে তার মনে। জোয়ানের কাজ! জোয়ানের কাজ কি এইরকম! কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত ঘুটঘুট করছে চারদিকে, ফাঁকা মাঠের এখানে ওখানে মিশকালো শ্যাওড়ার জঙ্গল—তার সর্বাঙ্গে অজস্র জোনাকি জ্বলছে ভূতের চোখের মতো। তারি মাঝখান দিয়ে গোরুর গাড়ির 'লিক', মাঝে মাঝে জল আর কাদা জমে রয়েছে তাতে। আর শ্যাওড়া গাছের ছায়ার নিচে নিজেদের প্রায় মিশিয়ে দিয়ে ওরা বসে আছে আকুল প্রতীক্ষায়, কখন একখানা সোয়ারী গাড়ি আসবে সেই পথ দিয়ে এগিয়ে। দূরে মাঠের মাঝখানে বড় একটা আলো দেখা দেয়, ওদের উদগ্র ধমনীতে নামে চঞ্চলতার জোয়ার। মদন সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়—অন্ধকারের মধ্যেও যোগী দেখতে পায় তার চোখ দুটো বাঘের মতো পিঙ্গল লুব্ধ আলোয় ঝকে উঠেছে, আর হাতের মুঠোয় কাঁপছে হাসুয়ার ফলাটা। আলোটা আশাপ্রদভাবে দপ দপ করে খানিকটা এগিয়ে আসে, তারপরেই মরীচিকার বিভ্রম জাগিয়ে অন্ধকারের অথই সমুদ্রে তলিয়ে যায় কালো একটা বুদ্‌বুদের মতো। নাঃ, আলেয়া।

হতাশায় বেঢপ দাঁতগুলো দিয়ে নিচের ঠোঁটটাকে হিংস্রভাবে কামড়ে ধরে মদন। একটা অশ্রাব্য গালাগালি বেরিয়ে আসে তার মুখ থেকে।

—আজ রাত্তিরটাই বৃথা গেল, এক শালা গাড়িরও কি আসতে নেই রে! ভগবানের এ কি অবিচার বল্ দেখি?

সত্যিই তো, ভগবানের এ কি অবিচার। যোগী বিস্মিত হয়ে ভাবে। আরো একটু বিবেচনা থাকা উচিত ছিল ভগবানের তরফ থেকে। এই যে সারাটা রাত তারা শিকারের সন্ধানে অতন্দ্র হয়ে বসে আছে, মাঠের যত মশা সুযোগ পেয়ে চারপাশ থেকে প্রাণপণে এসে ছেঁকে ধরেছে তাদের, এত কষ্ট আর পরিশ্রমের কোনো পুরস্কারই কি নেই? ভারী ভারী গয়না পরা তিন-চারটে মেয়েমানুষসুদ্ধ দু'একখানা গাড়ি এই রাত দেড়টার সময় তিনি তো ইচ্ছে করলেই পাঠিয়ে দিতে পারেন। জীব সৃষ্টি করেছেন অথচ তাদের

আহার যোগাবার বেলায় এত কার্পণ্য কেন ?

কিন্তু সাধনার সিদ্ধি আছেই। একখানা গাড়ি দেখা দেয় শেষ পর্যন্ত। ফস করে একটা মশাল জ্বালিয়ে নেয় মদন, তারপর বিকট একটা চিৎকার করে ওরা আটকে দাঁড়ায় পথ। মশালের লাল আলোয় গরুর বড় বড় চোখগুলো অদ্ভুত ভয়ার্ত মনে হয়। গাড়োয়ানটা লাফিয়ে পড়ে জঙ্গলের দিকে ছুটে পালায়, যাত্রীদের অসহায় কোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে দিগ্‌দিগন্ত।

জোয়ানের কাজ ! কথাটা যোগী ঠিক বুঝতে পারে না।

তার চেতনাকে সজাগ করে দিয়ে নিশি কর্মকার কথা কয়ে উঠল।

—বারো ভরি রূপো।

—আর সোনা ?—মদনের কণ্ঠস্বর উৎকণ্ঠিত শোনালো।

—সোনা ? সোনা কোথায় ? কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তিন ভরিও হবে না বোধ হয়।

—বল কি !—মদন চমকে উঠল : এই হার, চুড়ি—

—সব গিল্‌টি।

—গিল্‌টি !—মদন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল নিশি কর্মকারের মুখের দিকে। সে মুখের একটি পেশীও কাঁপছে না, কেবল কপালের রেখাগুলো সরীসৃপের মতো সর্পিল হয়ে উঠেছে মাত্র। তার মুখ থেকে একটি কথারও পাঠোদ্ধার করা যাবে না, আবিষ্কার করা যাবে না তার মনো-জগতের এতটুকুও সংবাদ। অরণ্যের মতোই তার মন দুর্গম আর রহস্যময়—শুধু নিকেল ফ্রেম দেওয়া পুরু কাঁচের চশমার ভেতর দিয়ে তার দৃষ্টি অসম্ভব রকম লোভাতুর হয়ে উঠেছে।

নিশি কর্মকার ভ্রূকুঞ্চিত করলে।

—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? তা হলে তোমাদের মাল তোমরাই নিয়ে যাও, বদনামের মধ্যে আমি নেই।

মুহূর্তে মুষড়ে গেল মদন। নিশি কর্মকার রাগ করলে উপায়ান্তর নেই তাদের। এ সব কাজে এমন বিশ্বাসযোগ্য হুঁসিয়ার লোক আর পাওয়া যাবে না। গোলাপাড়া হাটের সে জাঁদরেল মহাজন ; শুধু সোনাদানা নয়, ধানচালের আড়ৎ, কাটা কাপড়ের ব্যবসা। গোলাপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সে প্রেসিডেণ্ট, সদর থেকে ছাপানো সব সরকারী খাম আসে তার নামে। তা ছাড়া হবিবগঞ্জ থানার দারোগা ইব্রাহিম মিঞাকে সে যে কী মন্ত্রে বশ করেছে কে জানে, পুলিসের হাঙ্গামা থেকে অন্তত নিশ্চিন্ত।

—না, না, তা ব'লনি। তবে –

—এর মধ্যে তবে নেই আর—চশমাটা খুলে নিশি একটা টিনের খাপে পুরল : অধর্ম আমি কখনো করি নে, পরকাল বলে একটা জিনিস আছে তো ! পৌনে দুশোর বেশি

কিছুতেই হয় না, তা আমি পুরোপুরি দুশো টাকাই ধরে দিচ্ছি, নিয়ে যাও।

—দু—শো!—চারজনের স্বরেই নৈরাশ্য ফুটে বেরোল। কলাইগঞ্জের সাহাদের গাড়ি ধরেছিল তারা। ঐশ্বর্যের দিক থেকে সাহারা বিখ্যাত ব্যক্তি, তাদের বাড়ির মেয়েদের গা থেকে মাত্র দুশো টাকার গয়না বেরোল! ব্যাপারটা বিশ্বাস করা কঠিন।

মদন একবার শেষ চেষ্টা করলে, অন্তত আড়াইশো—

—আর এক পয়সাও পারব না। ইচ্ছে না হয় ঘুরিয়ে নিয়ে যাও, দেড়শোর বেশি যদি কেউ দিতে রাজী হয় তো আমার কান মলে দিও।

—তা কি হয়।—অসহায় স্বরে মদন বললে, দাও, দুশোই দাও তবে।

এতক্ষণে নিশি কর্মকার হাসল। তার হাসিটা সস্নেহ এবং স্বর্গীয়।

—কেন এত অবিশ্বাস বলো তো। তোমাদের এত কষ্টের রোজগার, মিথ্যে প্রবঞ্চনা যদি করি তা হলে তা কি ধর্মে সইবে কখনো। তা ছাড়া পরলোকে জবাবদিহিও তো করতে হবে। যথা ধর্ম তথা জয়—অধর্মের রোজগার গোমাংস আর গোরক্ত।

বিরস মুখে টাকাগুলো নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। অন্ধকারে মদনের কালি-মাখা ভুতুড়ে মুখটা আরো কালো আর ভয়ানক হয়ে উঠেছে। চাপা দাঁতগুলো একবার সশব্দে কড়মড় করে উঠল তার। নিশি কর্মকারের রুদ্ধ দরজার দিকে সে একবার অগ্নি-দৃষ্টিতে তাকালো।

—বলে অধর্মর টাকা গোমাংস আর গোরক্ত! শালা বুড়ো শকুন কোথাকার! গিল্টি আর আসল সোনা আমরা চিনতে পারি না! ইচ্ছে করছে লোহার বড় হাতুড়িটা তুলে মাথাটা ফাটিয়ে চৌচির করে দিই ওর। কিন্তু কী করব, ব্যাটা সরকারের পেয়ারের লোক, নইলে অ্যাদ্দিন—

মদনের কথার ভঙ্গিতে যোগীর হাসি এল। মদন বুনো ওল, কিন্তু নিশি বাঘা তেঁতুল।···

আর, ওরা বেরিয়ে গেলে আর একবার লণ্ঠনের আলোটা চড়িয়ে দিয়ে নিশি কর্মকার গয়নাগুলোকে পরীক্ষা করলে। এখনো যেন নারীদেহের উত্তাপ আর স্বেদের গন্ধ সেগুলোতে জড়িয়ে রয়েছে। কম করেও হাজার টাকার জিনিস, সাহাদের নজরটা যে উঁচু আছে সে কথা মানতেই হবে। কিন্তু অধর্মের টাকা গোমাংস আর গোরক্ত! নিজের কথাটা মনে পড়তেই রেখাজটিল মুখে খানিকটা হাসি প্রকট হয়ে উঠল: অধর্মের সংজ্ঞা আলাদা বই কি। চোরের উপর বাটপাড়িকে কোনো আহাম্মুখই অধর্ম বলবে না।

রাত্রে নিশির ভালো ঘুম হয় না। এই বহুবাঞ্ছিত অনিদ্রাটা অনেক আয়াস স্বীকার করে তবে আয়ত্ত করতে হয়েছে তাকে। বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গাছের পাতা খস্ খস্ করে নড়ে। আর বিছানার মধ্যে নিদ্রাহীন চোখ সজাগ হয়ে থাকে সন্দেহের

প্রখরতায়। ঘাসবনের ভেতর দিয়ে সাপ চলে যায়, কান খাড়া করে সে অনুধাবন করে তার চলার ক্রমবিলীন শব্দটাকে। ঘরের মধ্যে তরল অন্ধকার, তবু তার ভেতর সে স্পষ্ট দেখতে পায় বড় লোহার সিন্দুকটার ঝক্‌ঝকে হাতল আর ভারী হব্‌সের তালা দুটো সতর্ক প্রহরীর মতো জেগে রয়েছে। বুভুক্ষু ইঁদুরগুলো মখমলের মতো ছোট ছোট পা ফেলে ঘরময় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু নিশি কর্মকারের ঘরে কুড়িয়ে খাওয়ার মতো এতটুকু উদ্বৃত্ত অপচয় খুঁজে পায় না তারা।

প্রহরে প্রহরে শিয়ালের জয়ধ্বনি চিহ্নিত করে রাত্রিকে। তারপর বাইরের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসবার আগেই উঠে বসে নিশি কর্মকার। বৈষ্ণব মানুষ। মালা জপ শেষ করে জুড়ে দেয় বেসুরো গলায় কীর্তন। সমস্তটা দিন নানা বিষয়-কর্মে সংসারের আবিলতার মধ্যে কাটাতে হয়, তাই ব্রাহ্মমুহূর্তে যতটুকু পারে পুণ্য অর্জন করে নেয় সে।

সকালবেলা একধামা খই আর একথাবা আখের গুড় নিয়ে এসে দেখা দেয় বিশাখা। নিশির সেবাদাসী।

বিশাখা নামটা তারই দেওয়া। ভেক নেবার আগে বিশাখা ছিল হাড়ির মেয়ে, নাম ছিল কষ্টবালা। কিন্তু গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে তার সমস্ত কষ্ট দূর করে দিয়েছে বৈষ্ণব-তিলক নিশি কর্মকার। আপাতত সে শ্রীরাধার অনুচারিণী এবং নিশির বৃন্দাবন লীলার লীলাসঙ্গিনী।

আজো সকালে নিয়মমতো খইয়ের ধামা হাতে বিশাখার আবির্ভাব হল।

বহুদিন পরে নিশি একবার চোখ তুলে তাকালো বিশাখার দিকে। আজ প্রায় পাঁচ বৎসর ধরে সে এমন করে ওর মুখের দিকে তাকাতে ভুলে গিয়েছে। বার্ধক্য এসে ওকে সরিয়ে নিয়েছে তার জীবন থেকে; কিন্তু এই সকালে বিশাখা সদ্য স্নানের পর চন্দন সেবা করে এসেছে, তেল আর চন্দনের চমৎকার সুগন্ধের সঙ্গে খানিকটা প্রথম সূর্যের আলো ওর মুখের ওপর পড়ে ঝলমল করে উঠল। তড়িৎচমকের মতো নিশির মনে হল: তারই বয়স বেড়েছে শুধু, তারই জীবনগ্রন্থির সমস্ত রস গেছে শুকিয়ে; কিন্তু যৌবনের ভরা লাবণ্যে বিশাখা এখনো টলমল করছে শতদল পদ্মের মতো। এত মধু—এত প্রচুর মাধুরী, আজ তার এ আস্বাদন করবার অধিকার নেই, সামর্থ্যও নেই। সিন্দুকের জমানো সোনার তালগুলোর মতো রূপের এই প্রতিমাকে সে পাহারাই দিয়ে চলেছে, রাজভাণ্ডারে সে প্রহরী মাত্র। হাত বাড়িয়ে খইয়ের ধামাটা নেবার কথা তার মনেই রইল না।

—আজ তোকে ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে সখী।

সখী মুখ ঘুরিয়ে নিলে। নিশির স্তুতিবাক্যে তার দেহেমনে আর আলোড়ন জাগে না আজকাল। বললে, বুড়ো বয়সে রস তো খুব উথ্‌লে উঠছে দেখছি!

—বুড়ো !—তা বটে। সমস্ত শরীর দিয়ে সে আজ অনুভব করে তার শিরাস্নায়ুগুলোর নিরুপায় পঙ্গুতা। অথচ এককালে গ্রামের কোন্ সুন্দরী মেয়েটাকে অন্তত সে দু'দিনের জন্যে আয়ত্ত করেনি ? আর এই মুহূর্তে তার নিজের বিশাখাই তার ক্ষমতার বাইরে ! অথচ এখন কি অপূর্বই না দেখাচ্ছে বিশাখাকে ! হাড়ির মেয়ে হলেও রংটা তার ফর্সা, প্রৌঢ়-যৌবনে মুখখানা আজকাল দিব্যি ভারী আর গোলগাল হয়ে উঠেছে ; পাকা সিঁদুরে-আমের মতো তার গালের রং, পানের রসে পাতলা ঠোঁট দুটি টুক্ টুক্ করছে। কপালে ছোট একটা উল্‌কির দাগ, সমস্ত মুখখানার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যেন। অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় নিশির বুকের ঠাণ্ডা রক্ত যেন হঠাৎ শিউরে উঠল শির শির করে।

—একবারটি কাছে আসবি বিশাখা ?

বিশাখার চোখে সন্দেহের ছায়া পড়ল।

—ব্যাপার কী, নেশাটেশা ধরেছ নাকি ?

—নেশা ধরিনি, নেশা লাগছে।—নিশি বিগত যৌবনের মতো প্রগল্‌ভ হবার চেষ্টা করছে : কাল রাতে দু'ছড়া হার বাগিয়েছি, নিবি তার একগাছা ?

বিশাখার চোখে সন্দেহ ঘনীভূত হল : ওরে বাপ্‌রে, এত কপাল ! আমি বাঁচব তো ?

—কেন, কোনদিন কিছু তোকে দিইনি বুঝি ?

ক্রিং ক্রিং করে বাইরে সাইকেলের ঘণ্টা শোনা গেল, তারপরেই জুতোর মচ্ মচ্ শব্দ করতে করতে কে উঠে এল দাওয়ায়। ডাক শোনা গেল : কর্মকার বাড়ি আছ হে ?

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো নিশি চমকে উঠল : ইব্রাহিম দারোগা এসেছে।

বিশাখার গৌর মুখে রঙীন আভা দেখা দিয়েছে। আচম্‌কা হাওয়া-লাগা দীঘির জলের মতো একটা চকিত-চাঞ্চল্য তার সর্বাঙ্গে লাবণ্যের ঢেউ খেলিয়ে গেল। ব্যাপারটা নতুন করে বোঝবার কিছু নেই, তবু একটা তীব্র ঈর্ষা এসে ক্ষণিকের জন্যে নিশিকে আচ্ছন্ন করে দিলে।

—ওঃ, তাই আমি বুড়ো হয়ে গেছি ! এই জন্যই আমাকে মনে ধরে না আর।

নিশির মনের কথা বিশাখা বুঝতে পেরেছে। দরিদ্রের ব্যর্থ লোভ দেখে তার সহানুভূতি হয়। কিন্তু সহানুভূতি ছাড়া আর কী সম্ভব।

—এত হিংসে কেন ? এ নইলে অনেক আগেই যে হাতে দড়ি পড়ে যেত, সেটা খেয়াল নেই বুঝি।

সত্যি, খুব সত্যি কথা। ইব্রাহিম দারোগার মতো মদহস্তী এই বাঁধনেই তো এমন ভাবে বাঁধা পড়েছে ! হিংসা করে কোনো লাভ নেই, শুধু বুকের ভেতর থেকে ঠেলে মস্ত

বড় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস এল বেরিয়ে।

ততক্ষণ ঘর থেকে দ্রুত-চরণে অদৃশ্য হয়ে গেছে বিশাখা। মহামান্য অতিথি এবং মূল্যবান প্রেমিক। বাইরে তাকে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখা চলে না। খানিকটা মিষ্টি হাসি উপহার দিতে হবে তাকে। এক কাপ চা, এক খিলি পান। মাঝে মাঝে দারোগা রাতটাও কাটিয়ে যায় নিশির বাড়িতেই। গ্রামের সবাই ব্যাপারটা জানে, কিন্তু একটি কথা বলবারও সাহস নেই তাদের। জলে বসতি করে কুমীরের সঙ্গে বিরোধ না করার প্রাজ্ঞতাটুকু অন্তত আশা করা যায় তাদের কাছ থেকে। গোলাপাড়া হাটের সবচেয়ে বড় মহাজন নিশি কর্মকার; আর দারোগার প্রতাপ সম্বন্ধে কিছু না ভাবাই ভালো—যুদ্ধ বাধবার পর থেকে ভারতরক্ষা আইনের অস্ত্রেশস্ত্রে সে আপাদ-মস্তক মণ্ডিত হয়ে আছে।

ইব্রাহিম দারোগাকে কিছুটা অপ্রসন্ন মনে হল আজকে। তিন-চারটে ডাকাতি হয়েছে তার এলাকায়, অথচ কোনোটারই কোনো কিনারা হয়নি। ওপর থেকে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কড়া অর্ডার এসেছে, এভাবে চললে ট্রান্সফার করে দেওয়া আশ্চর্য নয়।

হাতের বেতটাকে জুতোর ওপর ঠুক্ ঠুক্ করে ঠুকতে লাগল ইব্রাহিম দারোগা।

—একটু সামলে চালাও কর্মকার। তোমার জন্যে কি আমার চাকরিটা যাবে?

নিশির শকুনের মতো চোখ দুটো বিনয়ে কাতলা মাছের মতো নির্বোধ হয়ে এল: হুজুরের যেমন কথা।

—না, না, সত্যি। ওপর থেকে বড্ড তাগিদ দিচ্ছে। ফস করে তোমার নামটা বেরিয়ে পড়লে আর আটকাতে পারব না। ইন্‌সপেক্টার ব্যাটাকে তো জানো? শালা স্রেফ রাঘববোয়াল। ওর মুখটা বন্ধ না করলে আর—

নিশির মুখে হাসি দেখা দিল। কথাটার অর্থ সে বোঝে। সিন্দুকটা খুলে ছোট একটা নোটের তাড়া সে দারোগার দিকে এগিয়ে দিলে। আর প্রাপ্তি মাত্রেই দারোগা অত্যন্ত সহজ ভাবেই নোটগুলো নিয়ে পুরল পকেটে, কালো চাপদাড়ি মণ্ডিত মুখখানা খুশিতে ভরে উঠেছে তার। লোকটার শরীরে বোধ হয় কিছুটা পাঠানের রক্ত আছে, সবটা মিলিয়ে একটা অমার্জিত আদিমতার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু কোন্ পাষণ্ড বলে যে, আজকাল রাজভক্তি লোপ পেয়ে গেছে বঙ্গদেশ থেকে? স্বদেশীওলারা যত লম্ফঝম্পই করুক না কেন, ভারতবর্ষের প্রান্তে প্রান্তে নিশি কর্মকারের মতো বিবেচক আর বুদ্ধিমান লোক পাওয়া যাবে। এ নইলে আর পুলিসে চাকরি করে সুখ ছিল কী!

একখানা রূপোর ডিশে পান আর জরদা নিয়ে ঘরে ঢুকল বিশাখা। আড়চোখে তার দিকে একবার তাকিয়ে একমুঠি পান আর ছটাকখানিক জরদা হাঙরের মতো প্রকাণ্ড হাঁয়ের মধ্যে চালিয়ে দিলে দারোগা। পান খেয়ে খেয়ে দারোগার মুখটা কী অস্বাভাবিক লাল! হঠাৎ দেখলে মনে হয় লোকটা রক্ত খায় বুঝি।

—হ্যাঁ, আর একটা কথা। চাল তো পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও। তোমার আড়তে কিছু আছে নাকি ? ওপরে একটা রিপোর্ট দিতে হবে।

—চাল ? আমার আড়তে ?—নিশি বিস্ময়ে হতবাক : কোথায় চাল ! জৈষ্ঠ মাসেই সব সাবাড় করে দিয়েছি। নিজের জন্যে সামান্য যা আছে তাতেই তো নতুন ধান ওঠা পর্যন্ত চলবে না—টান পড়ে যাবে।

কালো চাপ দাড়ির ফাঁকে দারোগার জন্তুর মতো মুখে দন্তুর হাসি দেখা দিলে : তুমি বাবা একটি সাক্ষাৎ ঘোড়েল—ভুঁড়ো কুমীর। তোমার আড়ত সার্চ করলে যে এখুনি পাঁচশো মণ চাল সীজ করা যায়, সে খবর আমি পাইনি ভাবছ ?

নিশি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল : হরে কৃষ্ণ ! আমার আড়ত ! এমন শত্রুতা আমার সঙ্গে কে করলে ! আমার কি ধর্মভয় নেই একটা ! পরলোকে জবাবদিহি তো করতে হবে।

ইব্রাহিম দারোগা সবিদ্রূপে বললে, থাক থাক। এই সকাল বেলা একরাশ মিথ্যের সঙ্গে ধর্ম বেচারাকে আর জড়াচ্ছ কেন ? বিস্‌মিল্লা বলে আমার দরগাতেই মুরগী জবাই করে দিয়ো, আমি বহাল তবিয়তে থাকলে তোমাকে ছোঁয় কে !

—সেই ভরসাতেই তো আছি হুজুর।

—চলি তা হলে—দারোগা উঠে দাঁড়াল। তারপর বিশাখার মুখের ওপর দৃষ্টি-ভোজনের মতো দুটো ক্ষুধার্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, আজ বড্ড ব্যস্ত, কাল আসব।

ঝরঝরে একটা হার্কিউলিস্ সাইকেলের আওয়াজ জেলা-বোর্ডের বন্ধুর পথ বেয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

দারোগা চলে গেলে নিশিকান্ত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। চাল,—তা চাল তার কিছু আছে বইকি। ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গেলে কোনো ব্যাটাই ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির হতে পারে না। তুমি যদি পরকে না ঠকাও, তাহলে পরে তোমার মাথায় আছড়ে কাঁঠাল ভাঙবে এই হচ্ছে দুনিয়ার নিয়ম। তবে দারোগা খাঁটি খবরটা পায়নি—পাঁচশো নয়, আটশো মণ। বারো টাকা দরে কেনা, বর্ষার বাজারে অন্তত চল্লিশে ছাড়া চলবেই। দু-চারজন লোক তো এর মধ্যেই আনাগোনা শুরু করেছে, মিলিটারীর কণ্ট্রাক্ট নাকি পেয়েছে তারা ; টাকার জন্যে আটকাবে না, একরাশ ঝকঝকে তকতকে নতুন নোট দিয়ে যে কোনো দরেই কিনে নিতে রাজী হয়েছে। তবু বাজারের হালচাল আরো একটু দেখে-শুনে নেওয়াটাই ভালো।

—আপনার কাছেই যে এলাম কর্মকার মশাই।

গোলাপাড়া হাটের তিনজন মহামান্য মহাজন এসে দর্শন দিয়েছে। মধুসূদন কুণ্ডু, নিত্যানন্দ পোদ্দার আর জগন্নাথ চক্রবর্তী।

—এসো, এসো, তামাক খাও ভায়ারা। তারপর সবাই মিলে! ব্যাপারটা কি?

—ব্যাপার আর কিছু নয় দাদা, হরিসভায় একটা অষ্টপ্রহরের বন্দোবস্ত করছি। শুনছি সত্যযুগ আসছে, কল্কি অবতার নামবেন মর্ত্যে মহাপাপীদের বিনাশ করতে। দেশের যা অবস্থা হচ্ছে, তাতে নামকেত্তনটা—

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! কলির কলুষ দূর করতে ওর মতো জিনিস কি আর কিছু আছে! কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব—

—কাল সন্ধ্যেয় তা হলে যেয়ো দাদা। কিছু চাঁদাও দিতে হবে।

হরিসভায় অষ্টপ্রহর কীর্তনের বিপুল আয়োজন। আট-দশটা কাটা কলাগাছের ওপর মোমবাতি বসিয়ে আর লণ্ঠন ঝুলিয়ে তৈরি করা হয়েছে আসর। তলায় ছেঁড়া মাদুর পাতা, তার ওপর গাঁজার কল্কে সাজিয়ে নিয়ে গোলাপাড়া হাটের মহাজনেরা জমিয়ে বসেছে। গাঁজার কল্কের একটা অসামান্য মহিমা আছে—নেশাটা কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হলে যুগপাবন কল্কি প্রভুর অবতরণটা মনশ্চক্ষেই দেখা যায়। পাপীতাপীর এবার পরিত্রাণ নেই বটে, কিন্তু নাম এবং নেশার গুণে গোলাপাড়া হাটের মহাজনেরা যে সত্যযুগ অলংকৃত করতে চলেছে, কোনো পাষণ্ডই এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করতে পারে না।

আশপাশ থেকে একদল বোষ্টম-বোষ্টমী জড়ো হয়েছে—অষ্টপ্রহরের পরে বৈষ্ণব-ভোজনের ব্যবস্থা আছে। নেশায় রক্তাক্ত তাদের চোখ, আর ব্যভিচারে ম্লান পাণ্ডুর মুখ। যে আলোচনা তাদের মধ্যে চলছে, তা আর যাই হোক আধিভৌতিক বা আধ্যাত্মিক কিছু নয়। ওদিকে একপাশে তিনটে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি আগুনে রক্তাভ হয়ে জ্বলছে, —থেকে থেকে একজন ধূপ ছড়াচ্ছে তাতে, অষ্টপ্রহরের ধুনী। একটু দূরেই বড় একটা হাঁড়িতে খিচুড়ি চাপানো হয়েছে—বৈষ্ণবদের চোখ থেকে থেকে সেদিক থেকে ঘুরে আসছিল।

—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—আসরের চারদিকে ঘিরে ঘিরে চলেছে অসংলগ্ন কীর্তন। অল্পবিস্তর পা টলছে দু-একজনের, শুধু গাঁজা নয়, ভাবের সাগরে নিঃশেষে তলিয়ে যাওয়ার জন্যে কেউ কেউ তাড়িও টেনে এসেছে। একজন এমনভাবে খোলের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে যে, দেখে মনে হয় ওটা সে যেমন করে হোক ভাঙবেই—এই তার স্থির-সংকল্প। আর একজন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে তাণ্ডবতালে আকাশের দিকে লম্ফপ্রদান করছে, যেন ওপর থেকে কী একটা পেড়ে নামাবে; বোধ হয় ভক্তিবৃক্ষের মুক্তিফল।

নিশি কর্মকারের চোখ নিদ্রিত। সমস্ত দেহে তার কদম্ব কেশরের মতো রোমাঞ্চ—

অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব একে একে প্রকট হয়ে উঠছে বুঝি। গোটা সভার উপর দিয়েই যেন ভাবের ঘোর লেগেছে। পোড়া মোমবাতি, গাঁজা, ধুনো, পোড়া কাঠ আর অর্ধসিদ্ধ খিচুড়ির একটা মিশ্রিত গন্ধে যেন নিশ্বাস আটকে আসে। মোমবাতির আলোগুলো দু-একটা করে নিবতে নিবতে ক্রমশ ম্লানতর হয়ে আসছে; ধুনির আগুনের লাল আভা বোষ্টম-বোষ্টমীদের ব্যভিচার-চিহ্নিত অপরিচ্ছন্ন মুখগুলোকে অদ্ভুতভাবে একাকার করে দিয়েছে। পেট ভরে যারা তাড়ি টেনে এসেছিল, তাদেরই একজন নাচতে নাচতে ধড়াস করে আছড়ে পড়ল—দশা লেগেছে নিশ্চয়। উধ্বর্বাহু লোকটির লম্ফপ্রদান আরো উদ্দাম হয়ে উঠেছে, একটুর জন্যে ফসকে যাচ্ছে ফলটা।

—বাবু, বাবু, প্রিসিডেণ্ট বাবু?

সুর কেটে গেল। সাক্ষাৎ ভগ্নদূতের মতো ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদার এসে দেখা দিয়েছে, নিশ্চয় জরুরী ব্যাপার আছে কিছু। নাঃ, প্রেসিডেণ্ট-গিরি করা আর পোষাল না। নির্বিঘ্নে একটু ধর্মকর্ম করবারও যদি জো থাকে।

—কি রে, কী খবর?

—উঠে আসতে হবে বাবু। সরকারী কাজ।

সরকারী কাজ। নিশি একবার ক্ষুব্ধ দৃষ্টিটা আসরের ওপর বুলিয়ে নিলে।

—কীর্তন চলতে থাকুক আপনাদের। আমি ঘুরে আসছি একটু।

বাইরে এসে নিশি ভ্রূকুটি করলে: কি রে, তোদের আর সময় অসময় নেই নাকি। এই রাত বারোটায় এত তাগিদ কিসের?

চৌকিদারের কণ্ঠে উত্তেজনা: মতি পালের বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে বাবু। এক-বার যেতে হবে।

—আর মতি পাল?

—সেটাও মরেছে।

—আপদ গেছে।—বিরক্তিতে নিশির মুখ কালো হয়ে উঠল। কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে বটে, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট হওয়া সত্যিই ঝকমারি। গ্রামে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কিংবা কেউ অপঘাতে মরলে ছুটতে হবে সেই মড়া দেখবার জন্যে, থানায় রিপোর্ট করতে হবে। এই রাত বারোটার সময় যখন কীর্তনের আসরে ভাবের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ নিজে এসে ভর করেছেন ভক্তের ওপর, আর নামগানে কলির কলুষ ধুয়ে মুছে নির্মল হয়ে যাচ্ছে, তখন কোথায় কে মতি পালের বৌ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে তাই দেখবার জন্যে উধ্বর্শ্বাসে ধাবমান হতে হবে! হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ।

বিরস মুখে নিশি বললে, চল্ তা হলে। কিন্তু বৌটা না হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, মতি পাল মরল কী করে?

—বাঁচবে কী করে বাবু?—সমবেদনা এবং ক্ষোভে চৌকিদারের স্বর রুদ্ধ হয়ে এল : না খেয়ে মরেছে। আগে ভিক্ষে করত, তিরিশ টাকা চালের বাজারে কে ভিক্ষে দেবে এখন? বৌটাও আর পেটের জ্বালা সইতে পারেনি, তাই গলায় দড়ি দিয়েই ঝামেলা মিটিয়েছে।

—হুঁ।

চৌকিদার উৎসাহিত হয়ে উঠল : শুধু এই একটা বাড়িই নয় বাবু। এরকম চললে দু' মাসে দেশ উজাড় হয়ে যাবে। যে আগুন চারদিকে জ্বলছে, কারো রেহাই পাবার জো আছে! দেখুন না, দু-তিন দিনের মধ্যে আরো পাঁচ-সাতটা মরার খবর—

—হয়েছে, থাম্ থাম্।—নিশি ধমকে থামিয়ে দিলে তাকে। এসব কথা ভালো লাগে না শুনতে। যারা মরছে, মরুক তারা। কাল পূর্ণ হলে মানুষকে মরতেই হবে, কেউ তো আর লোহা দিয়ে মাথা বাঁধিয়ে আসে না। না খেয়ে মরেছে, সে তো কৃতকর্মের ফল। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির দেনা এ জন্মে শোধ করতেই হবে—হুঁ হুঁ বিধাতার রাজ্যে অবিচার হওয়ার জো নেই।

কালো অন্ধকারে আচ্ছন্ন পথ। দুধারে বাঁশের ঝাড় বাতাসে শব্দ করছে। সেই শব্দে নিশি চমকে গেল। মনে হল : সেই বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে এখুনি বেরিয়ে আসবে মাংসচর্মহীন অস্থিময় কতগুলো ছায়ামূর্তি—তিলে তিলে যারা না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে তাদের প্রেতদেহ। আচমকা একটা ভয়ে নিশ্বাস আটকে এল তার। মনে হল : সেই মূর্তিগুলো আর্তনাদ করে উঠবে—আমাদের খাদ্য, আমাদের জীবন নিয়ে লোভের ভাণ্ডারে জমা করেছ তুমি। তোমার ক্ষমতা, তোমার খত, তোমার আইন আমাদের প্রতিহিংসার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তোমাকে। কিন্তু—এখন? এখন? এখন?

নিশি প্রাণপণে জপ করতে লাগল : হরের্নামৈব হরের্নামৈব হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব—

মতি পালের বাড়ি। চারিদিকে নানা জাতের আবর্জনা—বৃষ্টির এক পসলা জল পড়ে সে আবর্জনাগুলো আরো কদর্য হয়ে উঠেছে। ভাঙা চাল, বাঁশ, খুঁটি, খসে পড়া দাওয়া। সারা বাড়ি ভরে একটা গুমোট ভাপ্সা আবহাওয়া—তার মাঝখানে যেন ঘন হয়ে রয়েছে বাসি মড়ার গন্ধ। নাকে কাপড় চেপে ধরে নিশি সন্তর্পণে এগোতে লাগল। কোথায় অষ্টপ্রহরের আসর, আর কোথায়—

মতি পাল বারান্দায়ই পড়ে আছে। পেটের জ্বালায় দাওয়া থেকে বুঝি খানিকটা মাটি কামড়ে খেয়েছিল, একরাশ কর্দমাক্ত বমি গালের দু'পাশে জমে রয়েছে। পুরো বত্রিশটা দাঁতই তার বেরিয়ে আছে, মরবার আগে কী একটা অসীম কৌতুকে খানিকটা পৈশাচিক হাসি হেসেছিল বলে মনে হতে পারে। পেটটা লেপ্টে রয়েছে পিঠের সঙ্গে,

কালো নগ্ন পা দুটোকে দেখাচ্ছে অস্বাভাবিক দীর্ঘ—যেন ভূতের পা। আর সব চাইতে অমানুষিক তার চোখ—যেন ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড ঠেলা লেগে বাইরে বেরিয়ে এসেছে তারা। একটা চোখের অর্ধেকটা খাওয়া, নিশ্চয়ই ইঁদুরে খেয়ে ফেলেছে!

সামনেই ঘরের দরজাটা হাট করে খোলা। আর তার মধ্যে—

চৌকিদারের লণ্ঠনের আলোটা সেখানে পড়বার অপেক্ষা মাত্র। অবর্ণনীয় একটা আতঙ্কে দাওয়া থেকে সোজা লাফ দিয়ে নিশি একেবারে হুড়মুড় করে চৌকিদারের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। মতি পালের বৌ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। শেষ সম্বল ছিন্ন লজ্জাবাস দিয়েই গলায় ফাঁস পরিয়েছে—লণ্ঠনের আলোয় সেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অস্বাভাবিক নারীদেহটা একটা দানবীয় বিভীষিকা যেন!

কম্পিত গলায় নিশি বললে, হয়েছে, চল চল।

চৌকিদার বললে, লাস দুটো কী হবে বাবু?

থানায় খবর দে, ওরা যা খুশি করুক। যত সব কর্মভোগ—হরে কৃষ্ণ!

আবার অন্ধকার বাঁশঝাড়ের পথ। হাওয়ায় বাঁশবনের একটানা শব্দ—ঘুণে খাওয়া ছিদ্রপথে যেন পেত্নীর কান্না বাজছে। ভয়ে নিশি কর্মকারের কোনো দিকে চোখ তুলে চাইতে সাহস হল না। অসীম আতঙ্কে কেবলই মনে হতে লাগল—সমস্ত বাঁশবনের পথ জুড়ে অসংখ্য মড়া ছড়িয়ে রয়েছে—তাদের কালো কালো শুকনো পাগুলো যেন ভূতের পা। আর বাঁশের আগায় আগায় গলায় কাপড়ের ফাঁস পরিয়ে ঝুলে রয়েছে অগণ্য নারীদেহ—তাদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেহগুলো একটা ভয়ানক দুঃস্বপ্ন। চারদিকে কি আজ মৃত্যুর সভা বসেছে!

উত্তপ্ত কপাল বেয়ে টপ্ টপ্ করে ঘাম পড়তে লাগল নিশির। এই মৃত্যু—এই অপঘাত, এদের জন্ম দায়ী কে? দৈব?

—হরিসভা পর্যন্ত এগিয়ে দেব বাবু?

চৌকিদারের প্রশ্নে একটা আকস্মিক প্রচণ্ড কম্পন নিশির পা থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে ঝাঁকুনি দিয়ে গেল। তারপর সামলে নিয়ে শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করে সে বললে, না চল্, বাড়িতেই পৌঁছে দিবি আমাকে। কাজ আছে।

হাটখোলা পেরিয়ে নিশি কর্মকারের বাড়ি। সামনে ছোট একটা আমের বাগান, ভালো ভালো ফজলী আর ল্যাংড়াই আমের কলম লাগিয়েছে সে। নিজের বাড়ি—চেনা পথ—তবুও নিশির ভয় করতে লাগল। আজকের রাত্রিটা বিচিত্র—আজ এই কৃষ্ণপক্ষের ঘন-অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যেন মতি পালদের প্রেতমূর্তি উঠে এসেছে! আকাশ বাতাস অরণ্য যেন তাদের অশরীরী ভৌতিক নিঃশ্বাসে আকীর্ণ।

বাড়ির সামনে পৌঁছতেই চোখে পড়ল দরজার গোড়ায় সেই ঝরঝরে হার্কিউলিস্

সাইকেলটা। ইব্রাহিম দারোগা অভিসারে এসেছে। শোনা যায় ছুটো বিবি আর তিনটে বাঁদী আছে লোকটার, কিন্তু আগুনে ঘৃতাহুতির মতোই তাতে তার নিবৃত্তি নেই। বিশ্বগ্রাসী লালসা যাকে বলে।

বিশাখার ঘরের দরজাটা বন্ধ—ভেতরে অন্ধকার। তার মাঝখান থেকে চাপা গলার ফিস্ ফিস্ আওয়াজ কানে এল। ক্ষুব্ধ নিরাশ্বাসে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল নিশির। তারও যৌবন একদিন ছিল…

নিজের ঘর থেকে লণ্ঠনটা বার করে সেটাকে সে জ্বালালো। তারপর লণ্ঠন হাতে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল তার গোলাঘরের দিকে। আটশো মণ চাল সে মজুত করে রেখেছে। বর্ষার বাজারে চল্লিশ টাকা দরে এই চালটা ছেড়ে দিলে সে শুধু লাস নয়—রক্তের মতো টকটকে লাল হয়ে যাবে। যুদ্ধের দিনকাল—মন্বন্তর যাকে বলে। কিছু যদি করে নিতে হয় তো এই-ই সুযোগ।

গোলাঘরের দরজাটা খুলতেই বাতির আলোয় আটশো মণ চালের বিশাল শুভ্র স্তূপটা ঝক্‌ঝক্ করে উঠল। যেন একটা রূপোর পাহাড়। রূপোর পাহাড় বইকি। মণ প্রতি যদি আটাশ টাকা লাভ হয়, তাহলে আটশো মণে—

হঠাৎ একটা পচা গন্ধ এল নাকে। এখানেও পচা গন্ধ!

ঘরের টিন দিয়ে চুঁইয়েছে বর্ষার জল। সেই জলের স্পর্শে ওপরের চালগুলো পচে গন্ধ ছড়াচ্ছে—কী বীভৎস গন্ধ! মানুষের খাদ্য,—মর্ত্য জননীর শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, কী বিশ্রী বিকৃত রূপ তার!

অন্তত পঞ্চাশ-ষাট মণ যে 'ন দেবায় ন ধর্মায়' গেল কোনো সন্দেহ নেই তাতে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কাতর একটা খেদোক্তি: এই ছুর্বৎসরে এমন অপচয়! বর্ষা পর্যন্ত বোধ হয় রাখা চলবে না। কালই মিস্ত্রী ডেকে ঘরটা সারিয়ে ফেলতে হবে, আর পচা চালগুলোও ফেলে দিতে হবে বাইরে। নইলে ওগুলোর সংস্রবে সবটা চালই নষ্ট হয়ে যাবে—ভাগ্যে সময় থাকতে তার চোখে পড়েছিল ব্যাপারটা।

হঠাৎ নিশির মনে হল, কেন কে জানে, অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে মনে হল: ঠিক এই রকম একটা পচা গন্ধই সে পেয়েছিল আর একবার। শিবপুরের হাট থেকে সে ফিরছিল। চোখে পড়েছিল—মাঠের মাঝখানে একটা গলিত গোরুর দেহ আগলে বসে আছে একটা ঘেয়ো কুকুর; চারিদিক থেকে শকুনেরা উড়ে উড়ে সেই মড়াটাকে ঠোকর মারবার চেষ্টা করছে, আর কুকুরটা অস্বাভাবিক প্রচণ্ড চিৎকার করে ক্ষুধার্ত শকুনগুলাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

আত্মহত্যা

কাগজে বাহির হইয়াছিল : সুবিখ্যাত ধনীর একমাত্র পুত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম রত্ন পিনাকী চৌধুরী আত্মহত্যা করিয়াছে সাহারাণপুরে। এ আত্মহত্যার কোনো কারণ জানিতে পারা যায় নাই, সমগ্র ব্যাপারটাই বিস্ময়করুরূপে রহস্যাচ্ছন্ন।

পিনাকী আসিয়াছিল শ্বশুরবাড়ি।

এই আসিল বিয়ের প্রায় পাঁচ বৎসর পরে, ইচ্ছা থাকিলেও ঘন ঘন আসিবার জো নাই। এম. এ. পরীক্ষা আসন্নপ্রায়, ভালো রেজাল্ট ওকে করিতেই হইবে। গোল্ড মেডালিস্ট হইবার আশাটাও যে নিতান্তই দুরাশা নয় সেটা যে-কোনো অধ্যাপকই স্বীকার করিবেন।

বাস্তবিক পৃথিবীতে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে সেটা এমনি করিয়াই। সম্মুখে প্রসারিত সম্ভাবনাময় বিপুল ভবিষ্যৎ, আর সে কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। লক্ষ্মী-সরস্বতীর এমন বরপুত্র কয়টি বা দেখিতে পাওয়া যায়! ঝরিয়া অঞ্চলে ওদের মস্তবড় লাভের কোলিয়ারী, আসামের চা-বাগানের শেয়ার আছে। তাছাড়া দেশে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকার জমিদারী, ধনকুবের বলিলেও বেশি বলা হয় না। কমলা এবং বাণীর প্রচলিত দ্বন্দ্বের জনপ্রবাদকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াই পিনাকী রেসের সেরা ঘোড়াটির মতো গ্যালপে গ্যালপে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সগুলো ডিঙাইয়া চলিয়াছে, মাথায় সার্থকতার সেরা মণিমুকুটটি পরিয়া। মেধার সঙ্গে তাল দিয়া চলিতে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য কেহই এতটুকুও পিছাইয়া পড়ে নাই, মোটের উপর পিনাকী গল্পের আদর্শ নায়ক।

শ্বশুর নামজাদা সরকারী চাকুরে, বর্তমানে পেন্সন্ লইয়া পশ্চিমেই বসবাস করিতেছেন, বাঙলা দেশের 'ম্যালেরিয়া দুষ্ট' জলহাওয়া মোটেই সহ্য করিতে পারেন না, আসেনও খুবই কম। মেয়ে সুপ্রভা কিন্তু জেদ ধরিয়াই আসিল কলিকাতার কলেজে পড়িতে, থাকিবে হস্টেলে এবং ছোটখাটো ছুটির দিনগুলো কাটাইবে বালীগঞ্জে মাসীমার বাড়িতে। বালীগঞ্জেই পিনাকীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তারপর যথানিয়মে পূর্বরাগ ঘটিল কি না জানি না, কিছুদিনের মধ্যেই মাসীমার প্রবল ঘটকালিতে পিনাকী এবং সুপ্রভার বিয়ে হইয়া গেল।

সুপ্রভার কথা বলিতে গেলেই আমার চেনা একটি মেয়ের কথা মনে পড়িয়া যায়, দু'জনে ঠিক এক রকম। আয়ত চোখ দুটিতে একটু ভীরু সঙ্কোচ জড়াইয়া আছে, কারো মুখের পানে সহজে চাহিতে পারে না। কথা সম্পর্কে অতিরিক্ত সংযমী, বলার চাইতে যেন বেশি করিয়া অনুভব করিতে চায়, পরিহাসের সামান্যতম ইঙ্গিতেও শুভ্র

কপোল দুটি ডালিমের মতো রাঙা হইয়া আসে। পথ চলিবার সময়ে অনিচ্ছাসত্বেও বিদ্রোহী জুতার হিল যদি বেশি করিয়া শব্দ করিতে থাকে, তাহা হইলে ক্ষুদ্র শরীরটি আরো জড়োসড়ো হইয়া যায়, অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়ে শাড়ির আঁচলখানিকে লইয়া। সমগ্র অবয়বে এমনি একটা করুণ বিষণ্নতা, স্নিগ্ধ শ্রী, যে ওকে দেখিলে মায়া হয়।

আর এই জন্যই তো ওকে পিনাকীর এত ভালো লাগিয়াছিল। সত্যি এখানে ওর সঙ্গে আমার মত বেশ মিলিয়া যায়। শিক্ষার সংস্পর্শে যে ওর বাঙালী মেয়েত্বটুকু নষ্ট করিয়া ওকে ধার করা স্মার্টনেসের মুখোস-পরা রুক্ষদর্শনা 'ভ্যানিটি-ব্যাগে' পরিণত করে নাই, পিনাকী এতে খুশিই হইয়াছে।

—তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল।

নিচে চায়ের পাট সারিয়া পিনাকী একটু অসুস্থতার দোহাই দিয়াই উপরে উঠিয়া আসিল, ও ধরনের মজলিশ ও বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারে না। জুট প্রোডাক্শান ব্যাপারে বাঙলা দেশের কতখানি দাবি, বর্তমান শাসনতন্ত্রে কম্যুনালিজম কতটা কাজ করিতেছে, অমুক কমিশনারের আমলে চাকুরিতে কতখানি সুযোগ সুবিধা মিলিত, ছাগল রাম এবার ইন্সলভেন্সি লইবে কি না অথবা ক্লার্ক গেবল্ এবং রোনাল্ড কোলম্যানের মধ্যে কে ভালো অভিনেতা, ইহা লইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাতামাতি করাটা পিনাকীর চোখে দেখায় অত্যন্ত বিসদৃশ আর সেইজন্যই এই সব ব্যাপারের বাইরে থাকিতেই ও ভালোবাসে।

পিনাকী উঠিয়া আসিল দোতলার খোলা বারান্দায়।

বেশ হাওয়া আসিতেছিল, একপাশে একটা ডেক্চেয়ার টানিয়া লইয়া ও গা এলাইয়া দিল। বারান্দাটার এখানে-ওখানে ঘরের খোলা দরজা হইতে খাপছাড়া আলো পড়িয়াছে, কিন্তু এই কোণটা একটুকরো তরল শান্ত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন,—আলোর ভিতর হইতে হঠাৎ এখানে আসিলে চোখ দুটো যেন জুড়াইয়া যায়। চারিদিকে অনেকগুলি ফুল ও পাতাবাহারের টব, তাদেরই কোনো একটিতে বোধ হয় একগুচ্ছ জুঁই ফুল ফুটিয়াছিল, বাতাসে তার অলস গন্ধটা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল নেশার মতো, মনটা তাহাতে ঝিমাইয়া আসে।

উপরে নিকষ অন্ধকার আকাশটা জুড়িয়া অসংখ্য তারা,—একটিও ফুটিতে বাকি নাই। ছায়াপথের ধোঁয়াটে রেখাটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বলজ্বল করিতেছে একেবারে চোখের সামনে। ধ্রুবতারাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, ওধারের বড় বাড়িটার চিলকুঠুরির আড়ালে হারাইয়া গেছে। নিচে সাহারাণপুর শহরের অসংখ্য ইলেকট্রিকের আলো, অন্ধকার দিগন্তের অনেকখানি উপর পর্যন্ত ভাসিতেছে একটা আলোর কুয়াশা।

পিনাকীর মনে হইতে লাগিল : সুন্দর, কী সুন্দর এই জীবনটা! প্রতি অণুতে অণুতে

ইহার মাধুরী, ইহার প্রতিটি পলক অমৃত রসে অভিসিঞ্চিত। এই যে শান্ত নির্মল রাত্রিটি, দ্বিধাহীন নক্ষত্রের অসংখ্য দীপোৎসব, বাতাসের এই নিঃশব্দ স্বপ্নালস অভিসার আর ভীরু প্রণয় নিবেদনের মতো জুঁইয়ের মৃদুমন্থর সুবাস, ইহারা সকলে মিলিয়া এই রাত্রিটিকে কী বিচিত্রই না করিয়া তুলিয়াছে! পৃথিবীর সংখ্যাতীত প্রয়োজনের আবর্তমুখে অনবরত অভিঘাত এবং সে সংঘাতের যে সুতীব্র যন্ত্রণা, এমন একটি অনুভবনীয় নিশীথে তাহারা সকলেই যেন শান্ত হইয়া আসে, কর্মক্ষুব্ধ দিনের ক্ষতগুলির কোনো অস্তিত্বই যেন অকস্মাৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

—হঠাৎ—পিনাকী যেন এক সময়ে দার্শনিক হইয়া উঠিল: এইজন্যই মানুষ মরিতে ভয় পায়, মরিতে চায় না। জীবনের কাছে হইতে বার বার ঘা খাইয়াও সে জীবনকেই সবলে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। এমনো হয়তো হয় যে, পৃথিবীর কাছে তাহার সমস্ত প্রয়োজন যায় নিঃশেষ হইয়া, হয়তো তাহার বাঁচিয়া থাকাটাই এক সময় পরম অসত্য হইয়া ওঠে, হয়তো যক্ষ্মারোগীর মতো প্রতিটি দুর্বহ মুহূর্তকে অতিকষ্টে টানিয়া টানিয়া চলে, তবুও নিজেকে মুছিয়া ফেলিতে চায় না এই পৃথিবীর বুক হইতে। যেখানে দৃষ্টিসীমার বাহিরে রহস্যের উত্তাল সমুদ্র অন্ধকার তরঙ্গবিক্ষেপে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, সে সমুদ্রের পরপারে কী আছে, সে কথা সাহস করিয়া বলিতে পারে কে! কে জানে, সেখানে কোন্ অমৃতলোকের দুয়ার উদ্ঘাটিত হইয়া আছে অথবা নির্নিরীক্ষ্য পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের অন্ধকূপে বাসনা-কামনা বিক্ষুব্ধ লক্ষ কোটি বিদেহী-আত্মা পথ হাতড়িয়া হাতড়িয়া পাষাণ-প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া মরিতেছে! সেখানকার আনন্দকলরব মানুষ শুনিতে পায় না, সেখানকার তৃষাবিদীর্ণ কণ্ঠের আর্ত হাহাকার পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া আমাদের কানে আসিয়া বাজে না।

—এই তো সে জগৎ, কিছুই নিশ্চিত করিয়া বলা চলে না। আর এখানে? এখানে বসুন্ধরা তাহার নির্ধারিত কক্ষ-কেন্দ্রের মাঝখানে অনবরত ঘূর্ণিপাক খাইয়া চলিয়াছে, কখনো তাহার একচুল অদল-বদল হইতে দেখা যায় না। প্রতি অমাবস্যায় আকাশ কাজলের রঙে রঙিন হইয়া ওঠে, প্রতি পূর্ণিমায় দিগদিগন্ত জুড়িয়া তরল রূপার স্রোত বহিয়া যায়। বসন্তের বাঁশি আর বর্ষার মন্দিরায় সুর তুলিয়া চিরন্তন বাউল পথ চলিতে থাকে, শাশ্বত তাহার চলা, নীতিনির্ধারিত তাহার গতি। এখানে মানুষ ভালোবাসে, ভালোবাসা পায়, এখানে মানুষ নিজের আনন্দ সম্পদ লইয়া নিজের সীমার মাঝখানেই চরিতার্থ হইয়া ওঠে…

চরিতার্থ?

—নয় তো কী! নিজের দিকে চাহিয়াই পিনাকী এ প্রশ্নের জবাব পাইল। ওর সামনে জীবন বিচিত্র সুখদুঃখময় বঙ্কিম ধারায় বহিয়া চলিয়া গেছে। কখনো বন্ধী-

বীথিকার ছায়ায় ছায়ায় তাহার যাত্রা, কখনো নীপ-নিকুঞ্জে বেণুধ্বনি বাতাসে অণুরণিত হইয়া ফিরিতেছে ; আবার কখনো সাহারার কঙ্কালাকীর্ণ ধূ ধূ মরুভূমি,—পথ যেমনি দুর্গম, তেমনি জটিল।

এমনি করিয়াই তো চলিতে হইবে, এমনি করিয়াই বহু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ওদের যাত্রা শুরু হইবে জীবনের পথে। সে পথ চলায় সুপ্রভা ওর উপযুক্ত সঙ্গিনী বৈকি। নিজের পরিকল্পনার সঙ্গে মিলাইয়াই যেন ও সুপ্রভাকে পাইয়াছে। ঠিক যেমনটি চাহিয়াছিল। সুপ্রভার গভীর চোখ দুটির মধ্যে ও যেন কিসের ইঙ্গিত পায়, ওর ব্রীড়া-জড়িত হাসি ওর মনকে কেমন করিয়াই যেন বিলোড়িত করিয়া তোলে। ও যেন পারে ওর দিশেহারা মনকে পথ দেখাইতে, ধ্রুবতারার শাশ্বত জ্যোতির্ময় সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া। ধ্রুবতারা! ওই বড় বাড়িটার আড়ালে হারাইয়া যাওয়া, ধ্রুবতারার দীপ্তি সুপ্রভার চোখেই ফুটিয়া উঠিল নাকি ?

—জীবন ! সত্যি কী সুন্দর জীবন ! পৃথিবীতে ওরা বাঁচিতে চায়, পৃথিবীর অমৃত-পাত্রে রসধারা উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, সে বেদনানন্দ মিশ্রিত অমিয় ওরা পান করিবে, দু'জনে দু'জনকার মুখের পানে চাহিয়া পরম নির্ভয়ে বলিতে পারিবে :—

'উড়াবো উর্ধ্বে প্রেমের নিশান
দুর্গম পথ মাঝে,
দুর্গম বেগে দুঃসহতম কাজে—'

…খট করিয়া সুইচে টান পড়িল।

অন্ধকার কোণটা একঝলক নীলাভ তীব্র সাদা আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ছেদ পড়িয়া গেল পিনাকীর সমস্ত ভাবনা-চিন্তার উপরে। শান্ত মৃদু কণ্ঠে সুপ্রভা বলিল, 'একা একা অন্ধকারে বসে কার কথা ভাবছিলে বলো তো ?'

পিনাকী হাসিয়া একখানা হাত বাড়াইয়া দিল, 'এসো সু বোসো। তোমার কথাই কিন্তু ভাবছিলুম মনে মনে।'

—'বটে ?' সুপ্রভা ঠোঁটের কোণে কোণে স্নিগ্ধ একটু হাসিল (এমন হাসি ওকেই মানায়) :—

—'কী সৌভাগ্য আমার ! কিন্তু টুক্ করে ওখান থেকে এমন ভাবে চলে যে এলে, মাথাধরাটা এখন একটু ছেড়েচে তো ?'

—'আর মিথ্যে বলব না সু, মাথা আমার মোটেই ধরেনি। ওই মজলিশী গালগল্প-গুলো আমার একেবারে সয় না, সেইজন্যেই—'

—'সেই জন্যেই বীরপুরুষ বুঝি পালিয়ে এসে আত্মরক্ষা করলে ?'

সুপ্রভা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল চেয়ারটার পাশে, পিনাকী ওকে টানিয়া হাতলটার

উপরে বসাইয়া দিল, তারপর ওর একখানি হাত ওর নিজের হাতের ভিতরে ধরিয়া ওর সোনার চুড়িগুলোকে লইয়া খেলা করিতে করিতে বলিল, 'ঠি-ক ধরে ফেলেছ অভিসন্ধিটা। তোমাকে কী করে ফাঁকি দেব, বলো? মানুষের মনের খবর এক আঁচড়ে জেনে নেবার এমনি বিধিদত্ত শক্তি তোমাদের যে, কোনো কথা গোপন রাখবার উপায় নেই।'

সুপ্রভার গভীর চোখ দুটি আরো গভীর হইয়া আসিল, ওর করুণ মুখখানা একটা অপূর্ব শ্রী-সম্পাতে যেন করুণতর হইয়া উঠিয়াছে! এ কথায় ও কোনো জবাব দিল না, শুধু নাড়াচাড়া করিতে লাগিল পিনাকীর আঙুল কটি লইয়া।

পিনাকী ওর মুখখানা নিজের মুখের কাছে টানিয়া লইল…

—'দেখচ সু, কী সুন্দর আজকের এই অমাবস্যার কালো রাতটা!'

সুপ্রভা অস্ফুটভাবে বলিল, 'সুন্দর বই কি!'

…কিছুক্ষণের জন্য ওদের সাম্‌নেকার জগৎটা একটা অপরিসীম আনন্দলোকে হারাইয়া গেল…

ঘণ্টাখানেক।

মুখ তুলিয়া সুপ্রভা বলিল, 'জানো, তবু এই বারান্দাটায় একা আসতে আমার ভয় করে?'

—'ভয় করে? কেন বলো তো?'

—'সে ব্যাপারটা ঘটেছিল আমরা এ বাড়িতে আসবার বছর দুয়েক আগে। তখন এখানে থাকতেন একজন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান, অন্ সার্ভিস এসেছিলেন। তাঁরই একটি বছর পনেরোর ছেলে, তার যে কী খেয়াল চাপল একদিন, এই বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়তে গেল ওবাড়ির ছাতে। যেমনি লাফ দিয়েচে, পা পড়েচে গিয়ে কার্নিসে, আর তক্ষুণি কার্নিস ভেঙে এক্কেবারে নিচেয়। তারপরে আর কী?'

—'মারা গেল ছেলেটা?'

বিষণ্ণ স্বরে সুপ্রভা বলিল, 'গেল বই কি! এতটা ওপর থেকে পড়লে কেউ বাঁচে কখনো?'

—'যাক, বেঁচেছে তাহলে। জীবনটাই তো একটা স্ট্রাগল্, কী বলো সু? এখানে কারো জিতবার পালা আর কেউ বা ক্রমাগত হারতেই এসেছে। তার চাইতে এক-বারেই সুনিশ্চিত সমাপ্তি, ফুরিয়ে গেল জঞ্জাল।…চমৎকার নয়?'

—'হ্যাঁ চমৎকার না আরো কিছু!'—ঠোঁট উলটাইল সুপ্রভা—'এ কথা বলবে উইপিং ফিলসফারের দল। মানুষের যা কিছু সুন্দর এবং মহীয়ান, সে তো জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে! তাকে এড়িয়ে—'

পিনাকী বাধা দিল: 'কিন্তু মুশকিল এইটেই সু, কোন্‌টা যে তোমার সুন্দর এবং

মহীয়ান, সে প্রশ্নের জবাব আজো মেলেনি। আজ যদি কেউ বলে যে জীবনটা একটা 'ড্রাজারি', তার বিজ্ঞান মিথ্যে, তার অগ্রগমন অর্থহীন, তার ব্যক্তিগতই বলো আর সোশ্যালই বলো, যে-কোনো রকম সুনির্দিষ্ট পারফেক্শানের স্বপ্ন দেখা নিছক আকাশ-কুসুম, তবে এই পেসিমিজম্‌কে কিছুতেই এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারবে না।'

মাথার খোঁপাটা শিথিল হইয়া গিয়াছিল, সেটা ভালো করিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে সুপ্রভা বলিল, 'দরকার নেই উড়িয়ে। এখন তোমার ও ফিলসফি রাখো, আমি যাই, নিচে কাজ আছে।'

পিনাকী বাঁ হাতে ওকে জড়াইয়া ধরিল: 'বোসো না আরো একটু, এত ব্যস্ত কেন?'

—'না, না, ছাড়ো লক্ষ্মীটি, নৈলে মা-ই হয়তো আমাকে খুঁজতে খুঁজতে নিজেই এখানে এসে পড়বেন। তখন কী বিশ্রী ভাববেন বলো তো?'

—'এলেনই বা! মেয়ে জামাই প্রেমালাপ করচে দেখলে বিশ্রী ভাববেন আমি কক্ষনো ওঁকে এতটা অনাধুনিকা ভাবতে পারি নে।'

—সুপ্রভা বিপন্ন স্বরে বলিল, 'সত্যি বলচি, আমার কাজ রয়েচে, আচ্ছা, আচ্ছা, আবার ফিরে আসব, এই কথা দিয়ে গেলুম, কেমন?'

পিনাকী আবার একা—

—প্রহরের পর প্রহর চলিয়াছে, জ্যোতিষ্ক-জগৎ একটু একটু স্থান পরিবর্তন করিতেছে, হয়তো, হয়তো একটু একটু করিয়া অন্ধকারের আবেশ ছড়াইয়া পড়িতেছে দিকে দিকে—

পিনাকীর সমগ্র অনুভূতিটা যেন অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিল: পলকে পলকে রাত্রির আয়ু নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে, বিলীয়মান মুহূর্তগুলি ওই যে নক্ষত্রলোকের পথ বাহিয়া অনন্তের সাগরের অতলতায় নিজেদের সঁপিয়া দিতে চলিয়াছে, তাহাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, বিশ্লেষাতীত, ক্ষীণতর হইতে ক্ষীণতম ক্লান্ত পদধ্বনি যেন ওর কাছে অকস্মাৎ বিচিত্ররূপে স্পর্শাতুর হইয়া ওর মনের মাঝখানে ধ্বনিয়া উঠিল! তাহাদের অন্তিম দীর্ঘনিঃশ্বাস রাত্রির উষ্ণ বাতাসের সঙ্গে—জুঁইয়ের গন্ধের অব্যক্ত বেদনার সঙ্গে সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে মিলিয়া গেছে। তাহাদের শেষ অশ্রু আগামী কালের অরুণ আভায় শিশির রেণুতে ঝলমল করিবে।

—জীবন, সেও তো এমনি পলাতকার মতো পাখা মেলিয়া নিঃশব্দ প্রয়াণের নীরব বন্দনা মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। অন্ধকার সমুদ্রের খেয়াতরীতে পাড়ি জমাইয়া যে প্রহরগুলি চিরবিস্মরণের অভিমুখে যাত্রা করিল, তাহাদের তরণীতে যে পাথেয় তাহারা লইয়া গেল, সে পাথেয় কিসের? মানুষের জীবনের সঞ্চয় হইতেই তো তাহারা একটি করিয়া কণিকা তুলিয়া লইতেছে, কোনোটি অমৃতের কোনোটি বা বিষের। কিন্তু একদিন

এই পাত্র রিক্ত হইবে, সুধাই বলো আর গরলই বলো, সেদিন তোমার জন্য কোনটিই তো অবশিষ্ট থাকিবে না! পিনাকীর আবার মনে হইল: পৃথিবীর কাছে যে অকর্মণ্য দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্তের সমস্ত প্রয়োজনটুকুই নিঃশেষ হইয়া ফুরাইয়া গেছে, সেও এই মাটিকেই আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকিতে চায়, রহস্যমগ্ন অলক্ষ্যের প্রতি তাহার বিচিত্র বিভীষিকা। কিন্তু উপায় নাই যে!

পিনাকী যেন একটা অলৌকিক দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, ওর সামনে নির্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছে প্রদীপের শিখাটা, ম্লান, আরো ম্লান, আরো আরো—এই নিভিল বলিয়া। ওদিক হইতে শোনা যায় শ্মশানের ঝড়ো হাওয়ার কান্না, বুকের রক্ত তাহাতে হিম হইয়া আসে, ভাসিয়া বেড়ায় চিতার ধোঁয়ার একটা উৎকট গন্ধ। আর এদিকে কোথায় যেন শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, সাতবার উলুধ্বনি কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছড়াইয়া পড়িল নৈশ দিগদিগন্তে, সদ্যোজাত শিশুর কান্না ও স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছে—

কিন্তু কী বিদ্রূপ! একটু আগে ও ভাবিতেছিল পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকাটাই সব চাইতে বড়ো, সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ একান্তই যেন ওর জন্য তাদের ভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছে। ওর আনন্দে আকাশ বসন্তের দোলায় দুলিয়া ওঠে, ওর বেদনায় দিগঙ্গন মেঘ-মন্থর হইয়া যায়। হাসি আর অশ্রু, রৌদ্র ও মেঘের লীলা সব কিছুই একান্ত ভাবে ওদের জন্য, সেইখানেই তো সৃষ্টির সফল সার্থকতা।

কিন্তু কেমন করিয়া ও উচ্চারণ করিবে এত বড় কথাটা: সফল সার্থকতা কী শুধু ওদের জন্যই। এই যে তারালোকিত কৃষ্ণা রাত্রিটি, এই অভিনব স্বপ্নাচ্ছন্নতা, ইহা একটি আজিকার রাত্রিশেষের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যাইবে? এই যে ওর অন্তর-দৃষ্টির সামনে তিলে তিলে সময়ের মৃত্যু-বরণ, এইখানেই কী সমাপ্তি যবনিকা নামিয়া আসিবে? অতীতের সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে। আরো সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ইহারই পুনরাবৃত্তি চলিবে। এমনি করিয়াই শ্লেটের মতো কালো গগনের পটভূমিতে এমনি অসঙ্কোচ জ্যোতির্লেখন বারে বারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এমনি করিয়াই স্বপ্নমুগ্ধ মন কালের বিদায় ছন্দে সহসা উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে। এমনি করিয়াই ফাল্গুনের তরুণ বক্ষে আগুন জ্বলিয়াছে, মিলন-মাধুরীতে অমৃত আধারটি কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গেছে, এমনি করিয়াই আষাঢ়ের প্রথম দিনটি বারে বারে বিরহী চিত্তে অব্যক্ত বেদনায় গুরু গুরু মৃদং বাজাইয়াছে।

আর তাহাদের মতো মানব-মানবী সৃষ্টির এই শাশ্বত আবর্তনের ছন্দকে নিজেদের ক্ষণিকত্বের সঙ্গে সঙ্গেই মিলাইয়া দেখিয়াছে, ভাবিয়াছে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এই যে ঋতুর উৎসব এই যে ফুলের ডালি, এ বুঝি তাহাদের জন্যই সাজাইয়া আনা! এ যে কত বড় ভুল, সেটা আজ ওর কাছে একেবারেই স্বচ্ছ হইয়া গেছে। রাত্রির হারাইয়া-যাওয়া

প্রহরগুলি আবার ফিরিয়া আসে, কিন্তু জীবনভাণ্ডার হইতে যে অণুটিকে তাহারা তুলিয়া লয়, সেটিকে তো আর ফিরাইয়া দেয় না।

তারপর—

সঞ্চয় যায় ফুরাইয়া, দারিদ্র্য আসে ঘিরিয়া ঘিরিয়া। মধু ক্রমশ বিষে পরিণত হইতে থাকে। পিনাকী স্বপ্ন দেখে :—

তিরিশটা বৎসর গড়াইয়া গেছে, দীর্ঘ তিরিশ বৎসর। নীল আকাশের রঙ রোদে পুড়িয়া তামাটে দৃষ্টিকটু হইয়া গেছে, সেদিকে চাহিলে চোখ জ্বলিয়া যায়। ফুলের পাপড়ি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, শুক্ল-জ্যোৎস্নার রূপ-তরঙ্গ অস্তদিগন্তে নামিয়া শবের মতো পাণ্ডুর, বিবর্ণ হইয়া গেল—

ওর মনশ্চক্ষের সম্মুখে এক বিচিত্র নাট্যশালার পটোন্মোচন হইল, সেখানে ওই-ই নায়ক। বার্ধক্যের জড়তা ওকে নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে, শীতের অস্তগামী সোনালী রৌদ্রে ওর কর্মহীন আড়ষ্ট দেহটাকে যথাসাধ্য আবৃত করিয়া একটা আরামকেদারায় ও নিজেকে এলাইয়া দিয়াছে। বাইরের প্রাণচঞ্চল পৃথিবীর কাছে ও নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন হইয়া গেছে, সেদিন ওর এতটুকুও মূল্য নাই কোনখানে। সেদিনকার তরুণ দল চলিয়াছে ওকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াই, তথাকথিত সম্মানের হয়তো অপ্রতুল নাই, কিন্তু প্রয়োজনের জগতে ওর স্থান কোথায়? ও যেন লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে সযত্নে তুলিয়া-রাখা সিন্দুর-মাখানো কড়ি! হাঁ, শুধুই একটা কড়ি, তার বেশি নয়।

কুড়ি-বাইশ বছরের একটি সুশ্রী তরুণ সুট পরিয়া টেনিস র‍্যাকেট বগলে ওর ঘরে আসিয়া ঢোকে হয়তো। বলে, 'আজ কেমন আছেন, বাবা?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ও হয়তো বলে, 'একই রকম, বরঞ্চ বাতের ব্যথাটা একটু বেশি বেড়েছে বলেই যেন মনে হয়।'

ছেলেটি হয়তো জোর করিয়াই মুখের উপর একটু উদ্বেগের রেখা টানিয়া আনে: 'তাই তো, বড্ড কষ্ট দিচ্ছে ক'দিন থেকে! ওষুধটা ঠিকমতো খাচ্ছেন তো? আর মালিশটাও চল্‌চে?'

নিতান্ত বিরস সুরেই হয়তো পিনাকী জবাব দেয়, 'হুঁ।'

ছেলে হাতের রিস্টওয়াচটার দিকে চাহিয়া চঞ্চল হইয়া ওঠে, আজ ওর টেনিস্ কম্পিটিশন। তারপরে তেমনিই ধার-করা বিষণ্ণতার সুরে বলে, 'ডাক্তার বোসকে একবার দেখালে,—আচ্ছা—'

চিন্তিতের মতো পা ফেলিয়া ছেলে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়।

পিনাকীর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি জাগিয়া উঠিতে উঠিতে মিলাইয়া যায়, করুণ ক্লান্ত হাসি। ওরও দেহ-মন ঘিরিয়া একদা এমনই উচ্ছল জীবনের ঢল নামিয়া আসিয়া-

ছিল, এমনি করিয়াই বাইরের জগতে ছিল ওর অবাধ প্রবেশ অধিকার। কিন্তু এখন—

হয়তো চাকরটা এক পেয়ালা ওভ্যালটিন লইয়া আসে। মনটা মুহূর্তের মধ্যে বিরূপ হইয়া ওঠে: 'তোর মাঈজী কোথায় রে?'

হিন্দুস্থানী চাকরটা খৈনী-খাওয়া কালো দাঁত কটা বা'হর করিয়া জবাব দেয়, 'মাঈজী আভি পূজামে বৈঠেছেন, আসতে পারবেন না।'

—আসতে পারবেন না। ত্রিশ বৎসর পরের পিনাকী আবার ত্রিশ বৎসর আগে ফিরিয়া আসে। একদিন সামান্য একটু মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া সুপ্রভা সারারাত না ঘুমাইয়া ওর মাথায় জলপটি দিয়াছে, সামান্য একটু জ্বরের জন্য তিনদিন বিছানার পাশ ছাড়িয়া ওঠে নাই। আর আজ! সমস্ত পৃথিবী ওর দিক হইতে মুখ ফিরাইয়াছে, ওকে আজ আর কেউ চায় না, এমন কি ওর একান্ত আপনার সুপ্রভাও নয়। যৌবনের আগুন ওর ভিতর হইতে কবে নিবিয়া গেছে, ও তো আর ইব্‌সেনের ডাক্তার স্টকম্যান্ নয়, যে অসঙ্কোচে দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারিবে: 'The strongest man is he, who stands most alone'

পিনাকী হঠাৎ সচেতন হইয়া উঠিল—তিরিশ বৎসর পরে। হয়তো ওর কল্পনা উদ্দাম, অসংযতই হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু এই কি সত্যি নয়? প্রত্যেকটি দিনের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ওর আশা, আনন্দ, উৎসবকেও ঘিরিয়া ঘিরিয়া বিসর্জনের বাঁশি বাজিতেছে। ভবিষ্যৎ ওর জন্য সাজাইয়া রাখিয়াছে বিরাট্ বার্থতা এবং আরো পরে মৃত্যুর অলক্ষ্য অভিযান! কোথায় কেমন করিয়া, এ প্রশ্নের জবাব আজ পর্যন্তও মেলে নাই।

কিন্তু এই যে মুহূর্ত, এই যে প্রেম, এদের মাধুরীর পরিমাণ কে করিবে? জীবনে মানুষের যতটুকু কাম্য, যতটুকু তাহার প্রত্যাশ, সবটুকুই তো ও পাইয়াছে ওর পর্ণপুট ভরিয়া। আর পাইয়াছে নারীর ভালোবাসা, সমস্ত চাওয়া-পাওয়া যাহাতে সার্থক হইয়া যায়।

এখন ও কী করিবে, কী করিতে পারে ও। কেমন করিয়াই যেন ওর মনের মাঝখানে সাড়া দিয়া উঠিল: 'Porphyria's lover!' জীবনের এই মুহূর্তটিকেই কী সোনার সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া সমাপ্তির সীমারেখা টানিয়া দেওয়া যায় না?—'এই ক্ষণটুকু শুধু হোক চিরকাল'—সেজন্যই তো Porphyria মরিয়াছে, সেইজন্যই ও-ও তো মরিতে পারে।

—মৃত্যু! সেই রহস্যময়ের অন্তরালে, দৃষ্টির অতীত লোকে। কিন্তু ওর আর ভয় করিতেছে না, এমনি করিয়া বাঁধাধরা নিয়ন্ত্রিত ব্যর্থতাকে আজ ওর প্রয়োজন নাই। যাহাকে জানা যায় না, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া শুধু বিচিত্র বিভীষিকার তরঙ্গই উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতি যাত্রা করিবার দুঃসহ আকাঙ্ক্ষা আজ ওর মনে উদগ্র হইয়া

উঠিল। ইহাই তো অভিযানের অনুপ্রেরণা, সাহারার মরুভূমি অতিক্রম করিয়া, আফ্রিকার মৃত্যু-তরঙ্গিত নীল অরণ্যের মাঝখানে···

পিনাকীর মন একটা বিচিত্র প্রশান্তিতে স্থির হইয়া গেল।

সুপ্রভা আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

—'বাঃ রে, এখনো এখানে চুপটি করে বসে! কত রাত হয়ে গেল, নিচে চলো, খাবার দিয়েছে যে।'

সমস্ত সাহারাণপুর শহরটা ঝিমাইয়া পড়িয়াছে, থামিয়া গেছে জীবনের সামান্যতম কোলাহলটুকুও। চারিদিকে মৃত্যুর প্রশান্তি। পিনাকী গভীর স্বরে বলিল, 'ব্রাউনিঙের সেই লাইনটা তোমার মনে পড়ে সু? 'Who knows but the world may end to-night?'

সুপ্রভা বিস্মিত স্বরে বলিল, 'হঠাৎ ও লাইনটা মনে পড়বার মানে?'

পিনাকী জোরে হাসিয়া উঠিল, টানিয়া টানিয়া হাসি, থামিতেই চায় না। বলিল, 'এমনি। কিন্তু আজ রাত্রে তোমাকে ভা—রী সুন্দর দেখাচ্ছে, এত সুন্দর যেন কখনো দেখিনি।'

—আজ রাত্রে! কথাটা পিনাকীর মনে বার বার করিয়া বলিয়া উঠিতে লাগিল: আজকে পৃথিবী শেষ না হইয়া গেলেও নিজের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের ভার তো ওর নিজের উপরেই! বিদায় যদি লইতেই হয়, তাহা হইলে অমৃত পাত্র পরিপূর্ণ থাকিতে থাকিতেই সে বিদায় লইতে হইবে। আনন্দের চরমতম মুহূর্তটিতেই সমাপ্তির ছেদ পড়িয়া যাক্—

কিন্তু সুপ্রভা তেমনি আশ্চর্য হইয়াই চাহিয়া রহিল ওর মুখের দিকে।

দুঃশাসন

উৎসর্গ

সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

যেদিন স্পর্শ করিল বসন কুরু সভাতল মাঝে,
নতমুখী তুমি ছিলে কি দ্রৌপদী ঘৃণা অপমানে লাজে ?
পুত্তলিবৎ রহিল স্তব্ধ পঞ্চকেশরী বীর,
কপট দ্যূতের শৃঙ্খলে বাঁধা—আঁখিতে অগ্নি-নীর।
ব্যথাতুর নীল-নয়নে হেরিয়া কোন্ বিবসনা নারী,
অদৃশ্য হাতে জোগালে বসন তুমি হে দর্পহারী।
আজ এক নয়—শত পাঞ্চালী কাঁদিতেছে রাজপথে—
পার্থ-সারথি আসিবে কি তুমি পাণ্ডব রণরথে !
আজ এক নয়—শত কৃষ্ণার লাজ রাখ নারায়ণ,
সহস্র হাতে হরিছে বসন যুগের দুঃশাসন।
নাই ভীমসেন, নাই গাণ্ডীবী—বীরহীন সভাতল
কৌরব-পুরে মানুষ মেষেরা মূর্খ স্তাবক দল।
পাঞ্চজন্যে হুঙ্কার হানো, চক্র লহ গো হাতে,
নব কুরুভূমে মোরা জেগে আছি তোমারি প্রতীক্ষাতে॥

আশা দেবী

দুঃশাসন

অনেকক্ষণ ধরে তীর্থের কাকের মতো বসে আছে লোকটা। সুতরাং অভিনয় পর্বটা তাড়াতাড়ি শেষ করাই ভালো। খাতা থেকে মাথাটা তুলে অল্প একটু ঘাড় বেঁকিয়ে দেবীদাস বললে, তারপর ?

লোকটা প্রায় হাউ হাউ করে উঠল। চোখের কোণে চিক চিক করছে জল। বললে, আর তো মান ইজ্জত থাকে না বাবু। একটা ব্যবস্থা না করলে—

—ব্যবস্থা—ব্যবস্থা ? অন্যমনস্কের মতো দেবীদাস কলমটাকে কামড়ে ধরলে, তারপর খোলা জানালা দিয়ে তাকালো বাইরের দিকে। ছোট নদীর খেয়া পার হয়েই ধুলোয় ভরা পথটা হারিয়ে গেছে ধূ ধূ করা দিকচিহ্নহীন মাঠের ভেতর, প্রখর সূর্যের আলোয় নিজেকে মেলে দিয়েছে নগ্ন অনাবৃত পৃথিবী। একসারি বনঝাউয়ের গাছ হাওয়ায় হাওয়ায় যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

—অন্তত একজোড়া কাপড় নইলে আর—

—কাপড় ?—দেবীদাস যেন চমকে জেগে উঠেছে ঘুম থেকে : কাপড় পাওয়া যাবে কোথায় ? চালান নেই। সব সাফ করে বসে আছি। ব্যবসা-বাণিজ্য গেল—লোকেরও দুর্গতির একশেষ।

লোকটা তবু নাছোড়বান্দা। দেবীদাসের পা আঁকড়ে ধরলে দু' হাতে। চোখ দিয়ে এবার তার টপটপ করে জল পড়তে শুরু করেছে : আপনি ইচ্ছে করলে সব হয় বাবু! একজোড়া কাপড়ও কি গদী থেকে বেরুবে না ?

অসীম বিরক্তিতে সমস্ত শরীর শিরশির করে শিউরে উঠল—লোকটাকে যেন একটা লাথি মারতে পারলে মনটা খুশি হয়ে ওঠে। কিন্তু কিছুই করলে না দেবীদাস। ভারী গলায় বললে, কী করবি বল্—সবই ভগবানের মার। কেন যে এই যুদ্ধ বাধল আর আকাল দেখা দিল এক ভগবানই বলতে পারেন সে কথা। কাপড় থাকলে কি আর তোকে দিতাম না ? আমার কাজই তো ব্যবসা করা—ঘরে মাল পচালে আমার কোন লাভ আছে বলতে পারিস ?

না, লাভ নেই। একজোড়া কাপড়ের জন্যে পা আঁকড়ে পড়ে থাকলেও লাভ নেই কিছু। জলভরা চোখে লোকটা পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল খানিকক্ষণ, তারপর উঠে বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

ভাইপো গৌরদাস এক কোণে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। এইবার চোখ তুলে বললে, ওকে অন্তত একখানা—

—ক্ষেপেছিস তুই ?—দেবীদাস ভ্রূভঙ্গি করলে : ওকে একখানা দিলে দু' ঘণ্টার মধ্যেই দোরগোড়ায় উল্টো চণ্ডীর মেলা বসে যেতো না ? ও ব্যাটাদের কাছ থেকে এক পয়সাও তো আর বেশি নেবার উপায় নেই। পর পর কতগুলো মামলা হয়ে গেল—দেখছিস না ?

—তা বটে।—গৌরদাস আবার খবরের কাগজে মন দিলে।

দেবীদাস খোলা জানলার পথে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল। রিক্তশ্রী পাণ্ডুর পৃথিবী, বৈশাখের রোদ যেন শ্যামলতার শেষ চিহ্নটুকুও মুছে নিয়ে গেছে। জলন্ত আকাশটার তলা দিয়ে উড়ে চলছে 'সামকল' পাখীর ঝাঁক—পিপাসায় কাতর হয়ে কোন সুদূর বিল কিংবা জলার সন্ধানেই চলেছে হয়তো। মেটে পথটার ওপর হাওয়ায় ধুলোর ঘূর্ণি উড়ছে—শাঁ শাঁ করে শব্দ করছে বনঝাউয়ের দল। কোনোখানে একটি মানুষ নেই—যেন শ্মশান—

এপাশে ছোট গাঁয়ের ছোট বন্দর। দেবীদাসের কোঠাবাড়ির পেছনে আর সব দীনতায় ম্লান হয়ে আছে। টিনের চাল, চাঁচের বেড়া। করোগেটেড্ টিন জলছে শানানো ইস্পাতের মতো। আমগাছের নিচে গোরুর গাড়ি বিশ্রাম করছে। অনেক দূরে থানার লাল রঙের বাড়িটা—দেবীদাসের দোতলা থেকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ওটাকে। রুক্ষ মাটির বুক ফুঁড়ে যেন একটা রক্তজবা ফুটে উঠেছে।

ছোট গাঁয়ের ছোট বন্দরে বড় ব্যবসায়ী দেবীদাস। কাপড়ের আড়তদার সে—খুচরা পাইকারী সবই চলে। আশেপাশেই আট-দশখানা হাট তারই কৃপার ওপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু এবার সে অনুগ্রহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করতে হয়েছে দেবীদাসকে। চালান নেই। যা যোগাড় করা যায়, সরকারী দরে বিক্রি করতে গেলে পড়তা পোষাবে না। অতএব দোকানে ডবল তালা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকাই ভালো। ব্যবসাও নেই—প্রফিটিয়ারিংয়ের বিড়ম্বনার হাত থেকেও মুক্ত।

গৌরদাস কিন্তু অস্থিরভাবে উস্‌খুস করছে। এখনো সত্যিকারের ব্যবসাদার হয়ে ওঠেনি, তাই মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারছে না ব্যাপারটাকে। সভয়ে একবার দেবীদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করে বললে, কিন্তু এভাবে চলবে কদিন ? যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে—

দু চোখে হঠাৎ আগুন জ্বলে গেল দেবীদাসের। কোন কারণ নেই—হঠাৎ দপ দপ করে উঠল চোখের তারা দুটো। বাইরের জলন্ত পৃথিবী থেকে খানিকটা জ্বালা কি প্রতিফলিত হয়ে পড়ল ?

স্থির গলায় দেবীদাস প্রশ্ন করলে, কী করতে হবে ?

—না কিছু না।—অখণ্ড মনোযোগ সহকারে গৌরদাস একটা সাবানের বিজ্ঞাপন

পড়তে লাগল : স্বনামধন্যা অভিনেত্রী চঞ্চলা দেবী বলেন—

ঝনাৎ করে নিচে একখানা সাইকেল আছড়ে পড়ল।

তারপরেই দোতলার সিঁড়িতে টক টক করে ভারী জুতোর শব্দ। বীর পদদাপে সমস্ত বাড়িটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে দোতলায় উঠে আসছে কেউ। আর যেই হোক—অন্তত চোখের জলে একজোড়া কাপড়ের জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে আসছে না নিশ্চয়ই। তারা আসে ভিক্ষুকের মতো—ছায়ার মতো নিঃশব্দ পা ফেলে। গদির বাইরে দাঁড়িয়ে তিনবার দেবীদাসকে সেলাম করে তারা।

তিন বছর আগে? তখন ছিল অন্যরকম। একজোড়া পছন্দ না হলে দশজোড়া নামানো হত।

থানার এল্. সি. কানাই দে এসে ঘরে ঢুকল। চৌদ্দ টাকা মাইনের সাধারণ কনেস্ট-বল, কিন্তু সেরেস্তার খাতা লেগে বলে মুহুরীবাবু নামে সে সম্মানিত। দরকার হলে পাগড়ি বেঁধে লাঠি হাতে তাকে পাহারাও দিতে হয়। তবু নিজের সম্বন্ধে কানাই দের এক ধরণের আভিজাত্য বোধ আছে। দু-এক বছরের মধ্যেই সে যে জমাদার হয়ে যাবে এ প্রায় পাকাপাকি খবর।

রোদের চাইতে তেতে-ওঠা বালির তেজটা প্রবল। কানাই দের গলার স্বর যেন এস. পি.র মতো উদাত্ত আর গভীর : কি হে সরকার, ফুলছ কেমন?

অভ্যর্থনা করবার আগেই সশব্দে একখানা চেয়ারে আসন নিলে কানাই দে। লোকটার ধরনধারণ দেখলে পিত্তি চড়ে যায় দেবীদাসের। কিন্তু যা সময় পড়েছে, এখন শত্রু বাড়ানো কোনো কাজের কথা নয়। চারিদিকে অসংখ্য রন্ধ্র, যে কোনোটার ভেতর দিয়ে শনি প্রবেশ করতে পারে।

উত্তরে খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসল দেবীদাস। তারপর এগিয়ে দিলে সিগারেটের প্যাকেটটা।

অভিজাত ভঙ্গিতে ঠোঁটের এক পাশে সিগারেট ধরে সেটাকে জ্বালালো কানাই দে। একটা চোখ বন্ধ করে তাকালো বিচিত্র তির্যক দৃষ্টিতে। যেন আগেই জমাদার হওয়ার জন্য মহড়া দিয়ে নিচ্ছে : এইবারে পঞ্চাশটা টাকা বার করো দেখি। চাঁদা।

—পঞ্চাশ টাকা?—বিস্ফারিত চোখে দেবীদাস বললে, পঞ্চাশ টাকা চাঁদা?

—আলবৎ। সমুদ্র থেকে এক আঁজলা।—বন্ধ চোখটাকে আধখানা খুলে কানাই দে বললে : দারোগাবাবু শচীকান্ত বলে দিয়েছেন।

ক্ষুব্ধ স্বরে দেবীদাস বললে, এ জুলুম।

—জুলুম?—সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে সশব্দে যতখানি হেসে ওঠা যায়, সেই পরিমাণে কানাই দে হাসলো। বললে, পাঁচ পয়সার গাঁজাতেই শিব তুষ্ট থাকেন, কিন্তু তাতেই

যদি হাত মুঠো করে বসো তা হলে দক্ষযজ্ঞ বাধতে পারে, জানো তো সরকার ?

—হাঁ—দেবীদাস আবার চুপ করে রইল। শুধু পাঁচ পয়সার গাঁজাই ? এই ছোট বন্দরে সৃষ্টি স্থিতি লয়ের যিনি দেবতা, সেই শিবটির খাঁই যে পাঁচ পয়সার চাইতে অনেক বেশি, সে কথা দেবীদাস যেমন জানে, কানাই দেও তার চাইতে এতটুকু কম জানে না। কিন্তু কী হবে সেকথা বলে।

পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে কানাই দে উঠল। অন্যমনস্ক ভাবে যেন সিগারেটের বাক্সটাকে পুরে নিলে নিজের পকেটে। বললে, সন্ধ্যাতেই যাত্রার আসর বসবে। যেয়ো কিন্তু। দারোগাবাবু বার বার করে বলে দিয়েছেন।

ক্লিষ্ট স্বরে দেবীদাস জবাব দিলে, আচ্ছা।

বীর পদদাপে সিঁড়ি আর ঘরবাড়ি কাঁপিয়ে নিচে নেমে গেল কানাই দে। উৎকর্ণ হয়ে দেবীদাস যেন শুনতে লাগল বিলীয়মান শব্দটা। এ জুলুম—অসহ্য জুলুম। থানায় যাত্রা হবে—দারোগাবাবুর সখ। কিন্তু তার জন্যে কী দায় পড়েছে দেবীদাসের যে পঞ্চাশটা টাকা তাকে চাঁদা দিতেই হবে ?

বাইরে রৌদ্রতপ্ত পৃথিবী। রিক্ত মৃত্যুপাণ্ডুর বাংলা দেশ। ওদিকে বন্দরের টিনের চালগুলো ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে থানার লাল টকটকে বাড়িটা, নিষ্প্রাণ মাটির ফাটা বুকের ভেতর থেকে তার হৃৎপিণ্ডের মতো যেন বেরিয়ে এসেছে একটা রক্তজবা। সেদিকে তাকিয়ে দেবীদাস যেন উদ্দীপ্ত হয়ে গেল।

—জানিস গৌর, থানার বাড়িটার রঙ অত লাল কেন ?

খবরের কাগজে হাঁপানির মহৌষধের বিজ্ঞাপন পড়তে পড়তে গৌরদাস সবিস্ময়ে মাথা তুলে তাকালো।

—জানিস কেন এত রাঙা হয়েছে ? রক্তে।

—বটে ? এবার গৌরদাস সত্যিই হাঁ করে চেয়ে রইল। দেবীদাসের মগজেও রস-কস বলে কিছু একটা ব্যাপার আছে তাহলে। শচীকান্তের মহিমা আছে সত্যিই। মূকং করোতি বাচালং—।

দেবীদাসের সাদা বাড়িটা সম্বন্ধে মানুষের হাড় জাতীয় একটা তুলনা গৌরদাসের মনে এসেছিল। কিন্তু বলতে ভরসা হল না। কাকার আশ্রয়ে মানুষ, কাকার অনুগ্রহেই কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছে। সংক্ষেপে ছোট্ট একটা হুঁ দিয়ে সে পাকা চুল কাঁচা হওয়ার একটা যুগান্তকারী বিজ্ঞাপন পড়তে লাগল।

অনেক দূর থেকেই যাত্রার আসরের আলোগুলো চোখে পড়ছে। অতগুলো ডে-লাইট একসঙ্গে কোথা থেকে যে যোগাড় করা গেল একমাত্র সর্বশক্তিমান শচীকান্ত বলতে

পারে সে কথা। কেরোসিনের অভাবে আজকাল অন্ধকারেই তলিয়ে থাকে গ্রামগুলো। বাঁশবনের ছায়ায় জংলাপথের পাথুরে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে মানুষ আজকাল চলাফেরা করে—মানুষ, শেয়াল আর সরীসৃপ। কার মন্ত্রবলে সমস্ত জগৎটা যেন আদিম একাত্মতায় ফিরে গেছে। রোজ দু'তিনটে করে সাপে কাটার এজাহার আসে থানাতে,—মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে পৃথিবীর হিংসা যেন নির্মম হয়ে উঠেছে। ওদিকে মুচিপাড়ায় একটি মেয়ে চিৎকার করে কাঁদছে, পরশু দিন নিষুতি রাত্রে ওর ঘরের বেড়া ভেঙে শেয়ালে ছেলে চুরি করে নিয়েছে। পরদিন সকালে বাড়ি থেকে তিরিশ হাত দূরেই ছেলের অভুক্ত মাথাটা খুঁজে পাওয়া গেছে। এত কাছে বসে খেয়েছে অথচ একটা আলোর অভাবে ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না।

যাত্রার আসরের আলোগুলো অস্বাভাবিক দীপ্তি ছড়াচ্ছে। প্রায় আধ মাইল পর্যন্ত তার রেশ এসে পড়েছে—আকাশের অনেকটা শাদা হয়ে গেছে বিচিত্র একটা আলোর কুয়াশায়। গৌরদাসের হঠাৎ মনে হলো শচীকান্ত যেন ক্ষতিপূরণ করতে চায়। এদিনের সঞ্চিত অন্ধকারকে পাঁচ-পাঁচটা জোরালো ডে-লাইটের আলো ছড়িয়ে যেন দূর করে দেবার সঙ্কল্প করেছে সে!

আসরের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে কালো কালো মানুষের দল। এত ঝাঁঝালো আলো ওদের চোখে সহ্য হচ্ছে না—ধাঁধা লেগে যাচ্ছে যেন। রাশি রাশি আলোয় ওদের চোখের নিচে কালো কালো ছায়াগুলো আরো বেশি কালো হয়ে পড়েছে, বুকের হাড়-গুলো জ্বলে উঠেছে ঝক্‌ঝক্ করে। গৌরদাস ভাবতে লাগল শরীরী দেহ ছাড়িয়ে লোক-গুলো যেন অশরীরী হওয়ার চেষ্টা করছে—সর্বাঙ্গ থেকে ঠিক্‌রে পড়ছে আত্মিক একটা জ্যোতির্ময়তা।

শচীকান্তের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, এ যেন তার মেয়ের বিয়ে। সৌজন্য এবং অমায়িকতার বহর দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে লোকগুলো।

—ওরে বোস্, বোস্ তোরা—বসে পড়্। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? তোদেরই তো গান—তোদেরই তো জন্যেই দেড়শো টাকা খরচা করে বৈকুণ্ঠ অধিকারীর দল আনলাম। নে—বসে পড়্।

সদাশয়তার সীমা নেই। অর্ধনগ্ন অর্ধভুক্ত মানুষগুলো যেন কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পায় না।

শচীকান্তর আদ্দির পাঞ্জাবিটা হাওয়ায় উড়ছে। যুদ্ধের বাজারে অমন চমৎকার আদ্দি কোথায় পাওয়া গেল—সে রহস্য দেবীদাস জানে। একটা প্রফিটিয়ারিংয়ের মামলার জাল কেটে বেরুতে একথান আদ্দি খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু শচীকান্তকে মানিয়েছে বেশ—যেন দশ বছর বয়স কমে গেছে।

—বসুন, বসুন দেবীদাসবাবু, বসো হে গৌরদাস। না, না, বেঞ্চিতে নয়—এই তো চেয়ার! তারপর কানাই, ওদের আর দেরি কত?

কানাই সে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাচ্ছে না। ঘর্মাক্ত দেহে প্রাণপণে একটা আলোকে পাম্প করছে সে। মুখ ফিরিয়ে শশব্যস্তে জবাব দিলে, আর বেশি দেরি নেই বড়বাবু, ওদের সাজ হয়ে গেছে। নারদ এসে পড়বে এক্ষুনি।

রুমাল দিয়ে চোখমুখ মুছলেন শচীকান্ত। ক্লান্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর এসে বসলেন দেবীদাসের পাশের চেয়ারটাতে। মদ আর সিগারেটের একটা মিলিত গন্ধ অনুভব করলে দেবীদাস।

আসরে বেহালার ছড়ে টান পড়েছে। টুম্ টুম্ করছে তবলা। থেকে থেকে ঝমর ঝমর করে উঠছে করতাল। সব মিলে বেশ একটা অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছে। কালি-পড়া কোটরের ভেতর থেকে চকচক করে উঠছে কালো মানুষগুলোর চোখ। সমস্ত দিনের অতি-বাস্তব সংঘাতের পরে একটি রাত্রের মায়ালোক।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আর একটা দেবীদাসের দিকে বাড়িয়ে দিলেন শচীকান্ত।

—দুঃশাসনের রক্তপান লাগিয়ে দিলাম। ভালোই হবে—কী বলেন সরকার মশাই?

আপ্যায়িত হয়ে দেবীদাস হাসল: আজ্ঞে হাঁ, ভালো হবে বৈকি!

বেহালার ছড়ে সুরের আবেশ এসেছে। তবলায় তাল পড়ছে। তারপরেই আসরের পেছন থেকে গানের আওয়াজ। হস্তিনাপুরে রাজসভার নর্তকীদের প্রবেশ। ঘুঙুরের শব্দে আর গানে যেন ঝড় বয়ে গেল।

শচীকান্ত বললেন, সাবাস্ ভাই। গলার স্বরে জড়তা। নেশাটা বেশ ভালো করে জমে উঠছে। দেবীদাসের দিকে ঘোলাটে চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগছে?

দেবীদাস সংক্ষেপে বললে, বেশ।—মনের মধ্যে পঞ্চাশটা টাকার শোক তখনও কাঁটার মতো বিঁধছে। কিন্তু এ কথা সত্যি যে, দলটা ভালো গায়। শচীকান্তর রুচি আছে।

সমস্ত পৃথিবীটা বদলে গেছে মুহূর্তে। আলো আর গানে বাংলা দেশের ছোট এই গ্রামটা হাজার হাজার বছর আগেকার কুরুক্ষেত্রে ফিরে চলে গেছে। অর্জুনের কপিধ্বজ রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে কৌরব সৈন্য—পাঞ্চজন্যের শব্দে—দূর রাজপ্রাসাদে বসে থরথর করে কেঁপে উঠছেন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র। কর্ণ এসে বলছেন: ভয় নেই। সূতকুলে আমার জন্ম—সেজন্যে দায়ী দৈব। কিন্তু আমার পৌরুষ—সে আমার নিজস্ব গৌরব।

শচীকান্ত বললেন, বাঃ বাঃ, কর্ণ বেড়ে অ্যাক্ট্ করছে। ওকে একটা মেডেল দিতে হবে সরকার মশাই।

ইতিহাস চলেছে বজ্রগর্জিত ঝড়ের আবেগে! রক্ততরঙ্গিত কুরুক্ষেত্র। একটির পর

একটি মহারথী বীরশয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছে। শকুনির হাতের পাশা আজ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজমুকুট নিয়ে জুয়া খেলছে। আত্মগ্লানিতে পীড়িত হয়ে দুর্যোধন বলছেন : মাতুল, তোমার জন্যেই আজ আমার এই সর্বনাশ হল!

শচীকান্ত ঝিমুতে ঝিমুতে বললেন, না, দুর্যোধনটা কোন কাজের নয়। মুখটা বড্ড বেশি বোকাটে।

ওদিকে দ্রৌপদীর চোখে ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছে আগুন। অযত্নবিন্যস্ত রুক্ষ চুল তাঁর সর্বাঙ্গে যেন প্রলয়ের মেঘের মতো ভেঙে পড়েছে। সেই দীপ্ত নারীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে দিগ্বিজয়ী অর্জুন পর্যন্ত সলজ্জ দীনতায় মাথা নিচু করে আছেন।

—শোন কেশব, শোন ভীমসেন—শোন ধনঞ্জয়! প্রকাশ্যে রাজসভায় সেই মর্মান্তিক অপমানের পরে শুধ্ তোমাদের মুখ চেয়েই পাঞ্চালী আত্মহত্যা করেনি। কিন্তু আর নয়। দুঃশাসনের রক্তরঞ্জিত হাতে যদি বেণীবন্ধন না করতে পারি, তাহলে জেনে রেখো, সতীর অভিশাপে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল সমস্ত ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

সমস্ত আসরটা গম্ গম্ করে উঠছে। ঝিমন্ত চোখ তুলে শচীকান্ত বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকালেন। মানুষগুলো সমস্ত মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে—থেকে থেকে বেহালার ছড়ে এক-একটা তীব্র আর্তনাদ যেন দ্রৌপদীর বজ্রবাণীর প্রতিধ্বনি করছে।

অদ্ভুত জমেছে গান। দেবীদাস ভুলে গেছে নিজেকে—এমন কি পঞ্চাশ টাকার ক্ষতিটাও এখন আর তত তীব্র বলে মনে হচ্ছে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ফিরে এসেছে বাংলা দেশে। গৌরদাসের মনে হতে লাগল—সারা পৃথিবী জুড়েই যেন দ্রৌপদীর মতো আর্তনাদ উঠছে আজকে। কিন্তু তার অভিশাপে কি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ভস্ম হয়ে যেতে পারে? কে বলবে!

শচীকান্তর আদ্দির পাঞ্জাবিটা হাওয়ায় উড়ছে। দীপ্ত হয়ে উঠেছে নেশায় নির্বাপিত চোখ দুটো। ইতিাসের চাকা চলেছে ঘুরে। ওদিকে রাত শেষ হয়ে গেল। ডে-লাইটের আলোগুলো ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে। ওপাশে নদীর বুক থেকে শিরশির করে আসছে শেষ রাত্রির হাওয়া। মানুষগুলোর রাত-জাগা চোখ জ্বালা করছে, কিন্তু সে চোখ তারা বুজ্তে পারছে না। ঘটনার গতি উড়ে চলেছে প্রতি মুহূর্তে—একটুখানি চোখ বন্ধ করলেই তারা পিছিয়ে পড়বে।

শচীকান্ত একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললেন, সাবাস্—সাবাস্।

চরম সঙ্কট মুহূর্ত। দ্রৌপদীর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবার সময় এসেছে। মানুষগুলো প্রতীক্ষা করছে নিশ্বাস বন্ধ করে। ভীমের গদার ঘায়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল দুঃশাসন। আসরের চারিদিকে কটাকট হাততালি।

কিন্তু বিস্ময়ের আরো বাকি আছে। দুঃশাসনের বুকে বিঁধেছে ভীমের খর-নখর।

আর কী আশ্চর্য—ভীমের নখের মুখে উছলে উঠছে রক্ত—হাঁ—রক্তই তো!

সেই রক্ত মুখে মেখে পৈশাচিক মূর্তিতে ভীম উঠে দাঁড়ালো। দর্শকেরা বিস্ফারিত বিহ্বল চোখে তাকিয়েই আছে।

একটা প্রচণ্ড অট্টহাসি করে ভীম বললে, এই রক্তাক্ত হাতে দ্রুপদ-নন্দিনীর বেণী বেঁধে দেব। প্রতিশোধ যজ্ঞের প্রথম আহুতি দেওয়া হল আজকে।

দশ মিনিট ধরে টানা হাততালি। শচীকান্ত চেয়ারের হাতল ধরে উঠেছেন। আদ্দির পাঞ্জাবির হাতায় খানিকটা পানের পিক লেগেছে—যেন রক্তের ছোপ। জড়িত গলায় বললেন, চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার! সরকার মশাই, দলকে দল একটা করে মেডেল দিয়ে দিন। সাবাস্ ভাই সাবাস্।

বেহালা ফেলে অধিকারী উঠে এল তড়িৎগতিতে। আভূমি নমস্কার করে বিগলিত হাস্যে বললে, হুজুরের অনুগ্রহ।

ভোরের আলোয় ঝল্মল্ করছে পৃথিবী। সারারাত জেগে বসে থেকে সমস্ত শরীর আড়ষ্ট আর অসাড় হয়ে উঠেছে। মস্ত একটা হাই তুলে দেবীদাস বললে, চল গৌর, যাওয়া যাক্।

ধুলোয় ভরা পথ দিয়ে দুজনে এগিয়ে চলল নিঃশব্দে। ধানকাটা মাঠ থেকে হাওয়া এসে খেলা করছে গৌরদাসের বিশৃঙ্খল চুলের মধ্যে। দেবীদাস অন্যমনস্কের মতো বললে, বেশ গাইলে, না রে?

—হাঁ।

একটু এগিয়ে মুচিপাড়া। পুত্রহারা মা ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে এখনো। তার ছেলেকে চুরি করে খেয়েছে শেয়ালে, আর খেয়েছে তার ঘরের পাশে বসেই। আকাশভরা এত আলো—এমন অকৃপণ সূর্য। রাত্রির অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে যায় এই আলো? এই সূর্য ডুবে যায় কোন্ অতল সমুদ্রে?

দেবীদাস বললে, চল, লক্ষ্মণ মুচিকে একটা ডাক দিয়ে যাই। দুজোড়া জুতো পাঠিয়েছিলাম—দিয়ে গেল না তো।

ওরা মুচিপাড়ায় পা দিতেই তিন-চারটে কুকুর চিৎকার করে উঠল তারস্বরে। প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে ডোবায় গিয়ে নামল কতগুলো পাতিহাঁস। প্রকাণ্ড একটা মাটির গামলায় নীল জল, চামড়া-ধোয়া গন্ধ উঠছে তার থেকে। কতগুলো ছোট-বড় চামড়া ট্যান করবার জন্যে ছোট ছোট বাঁশের খুঁটো দিয়ে আঁটা। মুচিদের ভাঙা ঘরগুলো ভগবানের দয়ার ওপরে আত্মসমর্পণ করে বেঁকেচুরে অসহায় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

—লক্ষ্মণ, লক্ষ্মণ আছিস?

ঘাটের দিক থেকে একটি ষোড়শী মেয়ে জল নিয়ে আসছিল, মানুষের গলা শুনেই

বিদ্যুৎগতিতে কোথায় মিলিয়ে গেল আবার। আর একসঙ্গেই চমকে উঠল দেবীদাস আর গৌরদাসের দৃষ্টি—ছলছল করে উঠল রক্ত। মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন। কোনোখানে এক ফালি কাপড় নেই—কাপড় পাবার উপায়ও নেই। যুগের দুঃশাসন নির্লজ্জ পাশব হাতে বস্ত্রহরণ করেছে তার, তার সমস্ত লজ্জা, সমস্ত মর্যাদাকে নিষ্ঠুর উপহাসে মেলে দিয়েছে লোলুপ পৃথিবীর সামনে।

ভেতর থেকে সন্ত্রস্ত নারীকণ্ঠ শোনা গেল : লক্ষ্মণ বেরিয়ে গেছে।

—ওঃ আচ্ছা।

দুজনে আবার নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। গৌরদাসের মনে হল : যে দুঃশাসন বাংলাকে বিবস্ত্রা করেছে, তারও কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে একদিন? তাকেও কি রক্ত দিতে হবে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে?

রাত্রি জাগরণে দেবীদাসের মুখটা অদ্ভুত বিষণ্ণ আর পাণ্ডুর। ওদিকে ফসলহীন রিক্ত মাঠ। তারই ভাঙা আলের উপর দিয়ে একদল লোক কাজ করতে চলেছে—তাদের ধারালো হেঁসোগুলোতে সূর্যের আলো ঝিকিয়ে উঠছে। অকারণে—অত্যন্ত অকারণে বড় বেশি ভয় করতে লাগল গৌরদাসের। অমন ঝক্‌ঝক্ করে কেন হেঁসোতে শান দেয় ওরা?

কালো জল

লম্বা কালো চেহারার মানুষটা। নাক দুটো একটু চাপা বলে গলার স্বর খানিকটা অনুনাসিক হয়ে বেরিয়ে আসে। সমস্ত শরীরটায় বাড়তি কিছু নেই, যেন রাশি রাশি পেশীর সমষ্টি। পূর্ব বাংলাতেও আজকাল অসম্ভব ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। কচুরিপানার অত্যাচারে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে নদীর জল। তাই বায়ান্ন বছর বয়সেই জীর্ণতা দেখা দিয়েছে শীতলের দেহে। অথচ ওর বাপের কথা মনে করলে লজ্জায় শীতলের মাথা নত হয়ে আসে। বায়াত্তর বছরেও কী চেহারা ছিল তার, আর কী শক্তি। ভোলার ঝড়ে যদি সে ঘরচাপা পড়ে না মরত, তাহলে আরো দশ-বারো বছর সে যে আরো বে-ওজর বেঁচে থাকতে পারত তাতে আর সন্দেহ কী।

নৌকার হাল ধরে এলোমেলো ভাবে কত কী ভেবে চলে শীতল। আড়িয়াল খাঁর শাদা জলে পশ্চিমের রাশি রাশি বাতাস বৃষ্টি-বিন্দুর মতো জলের কণা উড়িয়ে দিচ্ছে—যেন সৃষ্টি হয়েছে স্পর্শ আর ধ্বনির একটা বিচিত্র ঘূর্ণিপাক। হালকা একটুকরা মেঘে নদীর এদিকটায় ছায়া পড়েছে, বাঁকের ওপারে খররৌদ্রে ঝলমল করছে জল, খালের মুখে কচুরিপানার সবুজ ছোপ—নদীটা যেন বহুরূপী। পলি মাটির জমিতে বৈশাখী

মেঘের রঙধরা পরিপুষ্ট ধানের ক্ষেতে জোয়ারের জল খেলা করে বেড়াচ্ছে।

এই পথ—কতদিনের চেনা পথ। ফরিদপুর থেকে, মাদারীপুর থেকে কতবার সে সোয়ারী নিয়ে গেছে এই পথ দিয়ে। কতবার বৈশাখী ঝড় আর জলের রাক্ষস উল্লাস তার নৌকাখানাকে নাচিয়েছে খেলার খেয়ালে। চোখের সামনে স্টিমারের ঢেউ লেগে নৌকো ডুবে গেছে, শুনেছে দূরের অন্ধকারে ডাকাতের আক্রমণে অসহায় নৌকোযাত্রীর আর্তনাদ। তবু কী চমৎকার গেছে সে দিনগুলো। পুজোর সময় পরদেশীরা ঘরে ফিরেছে, হাসি আর গানে মুখর হয়ে উঠেছে নদীর জল, বাঁশীতে ভাটিয়ালীর সুর মনকে ব্যাকুল করে দিয়েছে। বাইচের নৌকায় ঝমঝম করে করতাল বেজেছে—উঠেছে উদ্দাম চিৎকার। গ্রামের হরিসভা থেকে কীর্তনের সুর এসেছে, গাঁটছড়া বাঁধা বরকনে নিয়ে আনন্দিত মুখে গাঁয়ের মেয়েরা 'জলসই' করতে এসেছে গাঙের ঘাটে। কিন্তু এই তিন বছরে কোথা থেকে কী হয়ে গেল সমস্ত।

—ও মাঝি, আর কয় বাঁক?

ঘুম থেকে উঠে একটা বিড়ি ধরিয়েছে সোয়ারী তারাপদ। উৎসুক ব্যাকুল চোখ বাইরে নদীর দিকে মেলে দিয়ে বলছে, সন্ধ্যার আগে পৌঁছে দিতে হবে যে।

মেঘের ছায়াটা একটু একটু করে সরে যাচ্ছে—যেন একটা বিরাট পাখী সূর্যের ওপর থেকে ডানার আড়াল সরিয়ে নিয়ে ভেসে গেল দিগন্তের দিকে। শীতলের পাকধরা চুলগুলো চিকচিক করে উঠল, ঘর্মসিক্ত চওড়া কপাল জ্বলে উঠল জ্বলজ্বল করে।

—ভাঁটায় বড় জোর টান দিয়েছে বাবু। পালের ওপর তো চলছি, বাতাস ঠিক থাকলে সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারব।

কথায় মন মানতে চায় না, পথ কি সোজা নাকি।—নইলে গুণ টেনে চল্ না বাপু।—তারাপদ অধৈর্য হয়ে উঠেছে: সাঁঝের ভেতর না পৌঁছুলে আমার চলবে না।

—গুণ টানার এখন দরকার হবে না বাবু।—শীতল হাসল।—বাতাস পড়ে গেলে টানব তখন। আপনি স্থির হয়ে বসুন।

কিন্তু স্থির হয়ে বসবার জো কোথায় তারাপদর। মনটা যদি পাখী হত তা হলে কখন হাওয়ার আগে উড়ে যেত সে। মানুষ না হতে পারলে দেশে ফিরব না—উত্তেজিত তারাপদ নাটকীয় ধরনে আস্ফালন করে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তাই বলে সম্পূর্ণ নাটকীয় নয়, অভিমান এবং অপমানবিদ্ধ অবস্থায় সেদিন আর হিতাহিত জ্ঞান ছিল না তার।

ভয়ার্ত ব্যাকুল কণ্ঠে অরুণা জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাবে?

—বালাই ষাট ষাট। কবে আসবে?

—তোমরা মরলে।

এবার আর ঘাট ঘাট বলেনি অরুণা। হয়তো নিজের মৃত্যুই কামনা করেছিল, এ অপমান আর লাঞ্ছনার জন্যে নিজেকেই ষোল আনা দায়ী ভেবেছিল হয়তো। তাই ময়লা শাড়ির আঁচলে চোখের জল মুছে ফেলে বলেছিল, আমি তোমার পথে কাঁটা দেব না বেশিদিন, কিন্তু মেয়েটা তো কোনো দোষ করেনি।

তারাপদ সে কথার কোন জবাব দেয়নি। সমস্ত মাথাটা যেন বিস্ফোরকে পূর্ণ হয়ে আছে, জবাব দিতে গেলেই যেন ভয়ংকর একটা কাণ্ড হয়ে যাবে। নিরুত্তরে স্যুটকেশটা হাতে করে সে নৌকায় এসে উঠেছিল।

হুঁকো হাতে শ্বশুর জানকী চক্রবর্তী বেরিয়ে এসেছিলেন। অল্প বিষণ্ণ হেসে বলেছিলেন, ঘরে বসে তাস-পাশায় সময় না কাটিয়ে চাকরিবাকরির চেষ্টা করাই ভালো। পৌঁছেই চিঠি দিয়ো বাবাজী।

তখন নৌকা ছেড়ে দিয়েছে, লগির খোঁচায় চক্রবর্তী-বাড়ির ঘাট ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। মুখ বার করে কঠিন তিক্ত গলায় তারাপদ জবাব দিয়েছিল, হাঁ, আপনার আধ সের চালের সাশ্রয় করে দিয়ে গেলাম।

জানকী চক্রবর্তী কী জবাব দিয়েছিলেন তা শোনা যায়নি। শুধু চোখে পড়েছিল, ঘাটের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

তারপরে তারাপদ চলে গেল পশ্চিমে। শুধু পশ্চিম নয়, পশ্চিম ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে। দিল্লী, লাহোর, লয়ালপুর। আত্মীয় নেই, পরিচিত নেই, সহায়সম্বল কিছু নেই। শ্যামশ্রীহীন রুক্ষ কঠিন মাটি, আগুনের পিণ্ডের মতো সূর্য, উত্তপ্ত লুয়ের ঝাপটা, পাঞ্জাবের শহরে দুর্গন্ধ নোংরা গলি। কত দিন কেটে গেছে অনাহারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুসময় এলো। একটা পশমের কারখানায় ছোটমতো একটা চাকরি জুটেছিল—এই পাঁচ বছরে মাইনে দাঁড়িয়েছে দেড়শো টাকায়। আজ অন্তত তারাপদ কারো মুখাপেক্ষী নয়, অন্তত অরুণাকে কাছে নিয়ে গিয়ে দুটি খেতে দেবার মতো সংগতি তার হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়েছে বাংলা দেশের শ্যামল মাটি, নদীর গেরুয়া জল, স্নিগ্ধ আকাশ। তাই এক মাসের ছুটিতে দেশে ফিরছে তারাপদ। জলে স্থলে বাংলার স্নেহগভীর স্পর্শ যেন তাকে আকুল করে দিয়েছে।

আর ক্রমাগত অরুণার কথা মনে পড়ছে, জেগে উঠছে একটা অতি তীব্র অনুতাপ বোধ। এতটা করবার কী দরকার ছিল। তা ছাড়া অরুণা কোনো দোষ করেনি। কোনোদিন একটি কথা বলেনি সে। শ্বশুরের অন্নে দিনযাপনের গ্লানিকে তারাপদর জীবনে যথাসম্ভব সহজ আর স্বাভাবিক করে তুলবার চেষ্টাই বরং সে করেছে। তবু কেন

অরুণাকেই সে আঘাত করল সব চাইতে বেশি, কেন এই পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা চিঠি লিখেও তাদের খোঁজ নেয়নি? কী যেন একটা ঝোঁক চেপে গিয়েছিল, অপমানিত পৌরুষের কোন্ কেন্দ্রবিন্দুতে ঘা লেগেছিল একটা। আজ তার জন্যে সে অনুতপ্ত, ক্ষতি-পূরণ করবার যথাসাধ্য চেষ্টাও সে করবে।

—ও মাঝি, সাঁঝের আগে কি কিছুতেই পৌঁছনো যাবে না? হাওয়া তো তেমন জোর ঠেকছে না। নইলে গুণই নাও না।

শীতল আবার হাসল।

—ব্যস্ত হবেন না বাবু, গুণের সময় হয়নি এখনো।

পাড়ের দিকে একবার তাকাল শীতল। খাড়া পাড় প্রায় আট-দশ হাত ওপরে উঠে গেছে পাহাড়ের মতো—থেকে থেকে ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ছে মাটির চাঙাড়—খানিকটা ঘোলা জল ঘুরপাক খেয়ে উঠছে ঘূর্ণির মতো। আড়িয়াল খাঁর শ্রান্তিহীন ভাঙন। এদিকের একটা গ্রাম প্রায় আদ্ধেকের বেশি নদীর জলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, দু-তিনটে পত্রহীন শুকনো নারকেল গাছ এখনো জলের মাঝখানে তির্যক রেখায় দাঁড়িয়ে স্রোতের টানে থরথর করে কাঁপছে; উঁচু পাড়ের এখানে ওখানে খাঁড়ির মতো হয়ে নদীর জল ঢুকে গেছে—মাটির গায়ে অজস্র ফাটল, কাঁটা গাছ আর হিজলের ঘন সারি দুর্ভেদ্য হয়ে আছে। ওখানে গুণ নিয়ে নামা অসম্ভব। কিন্তু তারাপদর তাগিদ অত্যন্ত বেশি, বড় বেশি স্বার্থপর মানুষের মন।

তারাপদর দোষ নেই অবশ্য। বহুদিন পরে সে ফিরছে—দূরপ্রবাসীর এই স্বার্থব্যাকুল মনোভাব অপরিচিত বা অস্বাভাবিক নয় শীতলের কাছে। আজ পঁচিশ বছরের ওপর সে মাঝিগিরি করছে, মানুষের এই দুর্বল ব্যগ্রতা বিরক্তি জাগায় না তার—সহানুভূতিই আকর্ষণ করে বরং।

কিন্তু এই নদী—এই গ্রামগুলো। তিন বছরে কী আশ্চর্য পরিবর্তন। শীতলের চোখের সামনে দিয়েই তো দুর্ভিক্ষের এত বড় একটা ঝাপটা বয়ে গেল। এই নদী দিয়ে সে কত মরা মানুষ ভেসে যেতে দেখেছে, দেখেছে উজাড় হয়ে গেল গ্রামের পরে গ্রাম। আড়িয়াল খাঁর অনিবার্য ভাঙনের মতো মৃত্যুর নিষ্ঠুর হাত নির্মমভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে গেছে সমস্ত। শ্রীহীন শূন্যপ্রায় গ্রামগুলো যেন শ্মশানের মতো দাঁড়িয়ে। চরের ওপরে ওই বাড়িগুলো থেকে কীর্তনের সুর এসেছে কতদিন, এসেছে রয়ানী গানের উত্তাল কণ্ঠ। কিন্তু দু'বছরের মধ্যেই সব আশ্চর্যভাবে নীরব আর নিঃসাড় হয়ে গেছে। মানুষ যারা আছে তারা যেন মানুষ নয়, কতগুলো আকারহীন, অবয়বহীন ছায়ামূর্তি মাত্র।

হাওয়ার গতি লক্ষ্য করে পালের মুখটা বদলে দিলে শীতল।

—কদ্দিন পরে দেশে আসছেন বাবু?

—কদ্দিন? সে অনেক দিন হল বই কি—পাঁচ বছর।

—দেশের কিছুই জানেন না বুঝি?

—নাঃ।—তারাপদ ভ্রূ কুঞ্চিত করলে, না, বিশেষ কিছুই—! এদিকে খুব দুর্ভিক্ষ গেছে না মাঝি? কাগজে যেন দেখছিলাম। আচ্ছা, মধু গাঁয়ের কোনো খবর জানো তুমি?

না, শীতল জানে না। না জানলেও কিছু অনুমান করা কঠিন নয় তার পক্ষে। কিন্তু কী হবে সে কথা তারাপদকে বলে। দুঃসংবাদ দিয়ে তার লাভ কী। তা ছাড়া তারাপদ হয়তো বড়লোক। হয়তো তার আত্মীয়স্বজন সুখেস্বচ্ছন্দেই দিন কাটিয়ে চলেছে। দেশের সব লোকই তো আর না খেয়ে মরেনি। কত মানুষ তো এই ফাঁকে দস্তুরমতো রাজা বাদশা বনে গেল।

অন্যমনস্কের মতো তারাপদ আবার বললে, গুণটা টেনে গেলে—

শীতল সে কথার জবাব দিল না।

বাঁকের পর বাঁক। পথ যেন আর ফুরোয় না। ভাঁটার টান প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে আসছে, পালের বাতাস মন্দা। শুধু খাড়া পাড়ের গায়ে নদীর অচেতন হিংসা আঘাত করে যাচ্ছে। ঝুপঝাপ শব্দে অবিশ্রাম ভাঙন। ঘোলা জলে একরাশ ফেনা ফুটে উঠছে, তারপরেই ছিন্ন মালা থেকে ছড়ানো রাশি রাশি ফুলের মতো খরস্রোতে ভেসে চলে যাচ্ছে। তারাপদর নৌকোর ওপর একটা কাক বারকয়েক অকারণে চক্র দিয়ে কা কা করে উড়ে চলে গেল।

অসীম বিরক্তি আর অসহিষ্ণুতা নিয়ে একটার পর একটা বিড়ি টেনে চলল তারাপদ। মাঝিটার যেন গরজ নেই কিছু, গুণ টেনে গেলে এতক্ষন—! কিন্তু বলে বলে হয়রান হয়ে গেল সে। এত স্বার্থপর হয় মানুষ! একটুখানি গা ঘামালে এমন কি ক্ষতি হতে পারত লোকটার! পাঁচ বছর পরে সে দেশে ফিরছে অথচ যেন কোনো তাগিদ নেই, এতটুকু সমবেদনা নেই তার জন্যে।

অরুণা কী করছে এখন! হয়তো বিকেলবেলায় গা ধুয়ে ভিজে কাপড়ে খিড়কির ঘাট থেকে ঘরে ফিরছে। বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে জানকী চক্রবর্তী পাশার আসরে মেতে উঠেছেন। বড় শালা এইমাত্র হুইল আর তিনটে মাছ নিয়ে বাড়িতে ঢুকল। মেয়েটা হয়তো দাদুর কোলের কাছে বসে তাঁর গুড়গুড়ির নলটা নিয়ে খেলা করছে।

বুকের ভেতরে চনচন করে উঠল, মনটা আর বাঁধন মানতে চায় না। নদীতে আজ

কি আর জোয়ার আসবে না ? অথবা এই পাঁচ বছরে বদলে গেছে সমস্ত, শুধু ভাঁটাই আসে আজকাল, জোয়ারের টান বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে ?

—ও মাঝি ?

—আর দেরি নেই কর্তা। সামনের বাঁক ঘুরলেই খাল ধরব।

সামনের বাঁক, সামনের বাঁক। তারাপদর ইচ্ছে করল মাঝিটাকে কষে একটা চড় বসিয়ে দেয়। লোকটা যেন ইয়ার্কি করছে তার সঙ্গে। ওদিকের রোদের রঙ রাঙা হয়ে উঠেছে, সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে, পূবের আকাশে কে যেন হালকা তুলি দিয়ে ছায়ার রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। সন্ধ্যা আসছে। অথচ—

সামনের বাঁক। সামনে তো যতটা চোখ যায় ধু ধু করছে সোজা নদী, তারপর ওই দিকচক্রবালে—যেখানে স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না, ওখানে ওইটেই বাঁক নাকি। তাই হয়তো হবে। কিন্তু ওখানে যেতে যেতেই তো সন্ধ্যা লেগে যাবে। তারাপদ বিরক্ত ও হতাশ মনে আর একটা বিড়ির জন্যে শার্টের পকেটে হাত ঢোকালে, কিন্তু সময় বুঝে বিড়িগুলোও ফুরিয়ে গেছে সব।

ক্লান্তি আর বিরক্তিতে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সে। উজ্জ্বল নীল আকাশ। রাজহাঁসের পাখার মতো মেঘের রঙ। হাল ধরে শীতল বসে আছে স্থির। নদীর জল বয়ে চলেছে কলকল করে। ওই আকাশটার দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ জুড়ে এল, তারাপদ আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

—উঠুন বাবু, এই তো ঘাট।

এক লাফে তারাপদ উঠে বসল। এতক্ষণে তাহলে পথ সত্যিই ফুরিয়েছে। যেন বিশ্বাস হতে চায় না সহজে : মধু গাঁয়ের চক্কোত্তি-বাড়ির ঘাট ?

—হাঁ বাবু।

—তা হলে—শার্টটা গায়ে চড়িয়ে লাফিয়ে তারাপদ নেমে পড়ল—হাঁটু পর্যন্ত মাখা-মাখি হয়ে গেল কাদায়। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই বললে, আমি এগোই, তুমি জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে এসো।

তারাপদ যেন হাওয়ার আগে উড়ে চলে গেল। এই তো চক্রবর্তী-বাড়ি। সন্ধ্যার অন্ধকারে সব যেন থমথম করছে। সুপুরি গাছের ঘন ছায়ায় স্তব্ধ হয়ে আছে ম্লান আর নিরানন্দ অন্ধকার। এই সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে একটাও আলো জ্বলে না কেন ? চণ্ডীমণ্ডপটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, তার অন্ধকার কোণ থেকে একটা তক্ষক আকস্মিকভাবে তারাপদকে অভ্যর্থনা করে উঠল : ঠক্-কো ঠক্-কো—ঠক্-কঁ-অঁ-অঁ—

বাড়ি ভুল হয়নি তো ! না, কেমন করে হবে ? এই তো সামনে বড় গাব গাছটা, ওই তো পশ্চিমের ঘর—তবে ?

—অনন্তদা, অনন্তদা! ও ভুনি! এই সন্ধ্যাবেলাতেই ঘুমিয়ে পড়ল নাকি সমস্ত?

পশ্চিমের ঘরে একটা মিটমিটে আলো জলছে। কাঁপা বিরক্ত গলায় কে বললে, এখন আবার কে ডাকাডাকি করে। আমার জ্বর এসেছে, বেরোতে পারব না।

—আমি তারাপদ।

—কে, কে?

—তারাপদ।

—তারাপদ!—একটা আর্ত প্রতিধ্বনি, পরক্ষণেই আবার নিঝুম মেরে গেল সমস্ত। দ্রুত হুড়কো খোলার একটা শব্দ হল, একটা মাটির প্রদীপ হাতে বেরিয়ে এল বড় শালা অনন্তের স্ত্রী প্রতিমা। নিরাভরণ হাত, ছিন্ন শাড়ির অন্তরালে একটা কংকালসার দেহ, প্রতিমা নয়, প্রেতিনী। দরজার গোড়ায় অনন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, গায়ে একটা কাঁথা—প্রদীপের আলোয় তার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি তারাপদর চোখে পড়ল।

—এতদিন পরে এলে ভাই! কেন এলে?—একটা বুকফাটা কান্নায় প্রতিমা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। হাত থেকে প্রদীপটা পড়ে নিবে গেল। বাড়ির পেছনে গাব গাছ থেকে প্যাঁচা ডাকতে লাগল: নিম্-নিম্-নিম্—

পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সব শুনে গেল তারাপদ। কলেরায় মারা গেছেন জানকী চক্রবর্তী। ভুনি একদিন বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, শোনা যায় কারা নাকি তাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতায় বিক্রি করে দিয়েছে। আর অরুণা! পেটের ভাত আর পরনের কাপড় যার জোটে না, যার স্বামী থেকেও নেই, তার শেষ পথই খুঁজে নিয়েছে সে। ঘরে মাটির কলসী ছিল এবং খালে জলের অভাব ছিল না।

আশ্চর্য, তারাপদ তবু সোজা দাঁড়িয়েই রইল। মাটিতে পড়ে গেল না, মাটিতেই বা তার অবলম্বন কোথায়। শুধু পা দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগল, আর পেছনে শীতলের ছায়ামূর্তিটা অনুভব করে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে তার দিকে বাড়িয়ে দিলে।

—তুই যা মাঝি। সিধে আর তোকে দিতে পারব না।

—ভাড়া তো আট টাকা ঠিক হয়েছিল বাবু। আমার কাছে খুচরো নেই।

—থাক, ওই দশ টাকাই তুই নিয়ে যা।

সমস্ত নাটকটার নীরব এবং একমাত্র দর্শক শীতল নিঃশব্দে অভিশপ্ত চক্রবর্তী-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এমন সে আরো দেখেছে দু'চারবার। কিন্তু আজ যেন বুকের মধ্যে বড় বেশি দোলা লাগল, বড় বেশি করে মনের সামনে ভাসতে লাগল তারাপদর বিহ্বল বিস্ফারিত দৃষ্টি—যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। শীতলও তো এক মাসের মধ্যে

দেশে যায়নি, তার পরিবার পরিজন—!

অন্ধকার গাব গাছটার তলা দিয়ে আসতে আসতে সে শুনতে পেল মাথার ওপরে অলক্ষণে প্যাঁচাটা তখনো ককিয়ে চলেছে—নিম্ নিম্ নিম্। আর কী নিবি, নেবার আছেই বা কী। অহেতুক বিদ্বেষে একটা মাটির চাঙাড় কুড়িয়ে নিয়ে সে প্যাঁচাটার উদ্দেশে ছুঁড়ে দিলে, ঝটপট শব্দে একটা ছোট কালো পাখী খাল পার হয়ে কোথায় উড়ে চলে গেল। পেছন থেকে তখনো কান্নার স্বর আসছে : এতদিন পরে কেন এলে ভাই, কেন এলে ?

আর মনে পড়ে গেল পলাশপুরের দত্তবাড়ির ছোট বউকে। স্বামীর অসুখের খবর পেয়ে বাপের বাড়ি থেকে এসেছিল শীতলের নৌকোতেই। বয়স অল্প, স্বামীর অসুখের সংবাদেও তার কচি কোমল সুন্দর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপটা গাঢ় হয়ে পড়েনি। আশায় আনন্দে তখনো উচ্ছল, মাথায় টকটকে সিন্দুরের ফোঁটা, গায়ে রাশি রাশি গয়না। অসুখ মানুষের হয়, আবার সারেও তো। মাঝে মাঝে খুশিমনে ছোট ছোট শাদা আঙুল দিয়ে খালের জল নিয়ে খেলা করেছিল, পান খেয়ে আরো রঙিন করেছিল রঙিন ঠোঁট দুটি—একেবারেই ছেলেমানুষ! তারপর বাড়ির ঘাটে যখন নৌকো ভিড়েছিল, তখন দেখেছিল সামনের ভিটাবাড়িতে একটা চিতা জ্বলছে, তার স্বামীর চিতা।

লগির খোঁচ দিয়ে শীতল নৌকোটাকে চক্রবর্তী-বাড়ির ঘাট থেকে বের করে নিয়ে এল। বাজারের নিচে রান্নাবান্না করে একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার রওনা দেবে শেষ রাতে। সারা গায়ে অসীম ক্লান্তি এসে বাসা বেঁধেছে যেন। মাত্র বাহান্ন বছর বয়েস, এর ভেতরেই এত বুড়ো হয়ে গেল শীতল। অথচ ওর বাপের কথা মনে করলে—

খালের দু বাঁক উজানে নামতেই মধু গাঁয়ের বাজার। আলো নেই, মানুষ নেই, চক্রবর্তী-বাড়ির মতোই ঝিম মেরে পড়ে আছে। খোঁজ করতে গেলে বাজারে হয়তো কিছুই মিলবে না। চাল নয়, তেল নয়, একটুখানি নুনের ভাবনা ভাবা তো পাগলামি মাত্র! আর এই বাজার! পাঁচ বছর আগেও শীতল একে দেখেছে, আলোয় ঝলমল করত, হঠাৎ দেখলে ভুল হত শহরের বাজার বলে। সেদিন আর এদিন।

সঙ্গে যা ছিল তাই দিয়েই চালে ডালে পেঁয়াজে খানিকটা খিচুড়ি রাঁধলে শীতল। কিন্তু আশ্চর্য, একটা দুটো গ্রাস মুখে দিয়েই আর সে খেতে পারল না। অনিচ্ছুক শরীর, অনিচ্ছুক মন। কেবলই যেন সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে তারাপদর বিহ্বল মুখখানা।

একপেট জল খেয়ে হাঁড়িটাকে সে ঢেকে রাখল। ভোরবেলা নৌকো ছাড়বার আগে খেয়ে নিলেই চলবে। ক্লান্তির জন্যেই বোধ হয় এত খারাপ লাগছে তার। একটু ঘুমিয়ে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কাপড়টা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে সে শুয়ে পড়ল।

খালের ওপরে বাজারটা নিস্তব্ধ। শুধু নৌকোর তলা দিয়ে কলকল করছে কালো

জল—মাথার ওপর দিয়ে পাখা মেলে মেলে উড়ে চলেছে রাত্রির পাখি। বাতাসটা ঠাণ্ডা নয়—খানিকটা উত্তপ্ত বাষ্পের মতো, যেন কারো নিঃশ্বাসের মতো গরম। পূর্ব বাংলার শ্মশানে যেন প্রেতের উষ্ণ নিঃশ্বাস। শীতলের গায়ের মধ্যে ছমছম করতে লাগল।

তবু ভালো, বাজারে এখনো মানুষ আছে, বেঁচেও আছে। একটি কোমল কিশোরী কণ্ঠে 'মনসা মঙ্গলের' কয়েকটি পংক্তি ভেসে এল কানে :

"বিষ নয়ান এড়িয়া দেবী অমৃত চোখে চাও, ত্রিভুবন রক্ষা করো ত্রিভুবনের মাও"—

গলার স্বরে করুণ কাতরতা। যেন এই বাজারটা, এই গ্রামটা সমস্ত দেশটাই অসহায় স্বরে কেঁদে উঠছে, বাঁচাও আমাদের, বিষ নয়ান এড়িয়া দেবী অমৃত চোখে চাও। কিন্তু ত্রিভুবন কি সত্য সত্যই রক্ষা পাবে? আকাশের নিচে এই জমাট কালো অন্ধকার ভেদ করে সে প্রার্থনা কি গিয়ে পৌঁছুবে দেবতার কানে? কে বলবে।

অনেক রাত্রে একটা লণ্ঠনের আলো পড়ল চোখের ওপর। কে যেন চাপা গলায় ডাকছে।

—ও মাঝি, ও মাঝি, ভাড়া যাবে?

আঃ, কে বিরক্ত করে এত রাত্রে। এখন সে কোথাও ভাড়া যেতে পারবে না। তারও মানুষের শরীর, তারও তো সুখদুঃখ আছে।

—না ভাড়া যাব না।

—ও মাঝি, শোনো শোনো। বড় জরুরী। ভাড়া ডবল দেব। বিপদে পড়ে গেছি, উদ্ধার করে দাও একটুখানি।

আর শুয়ে থাকা চলল না। অসীম বিরক্তির একটা হাই তুলে শীতল উঠে বসল, কে?

লণ্ঠন হাতে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। যে কথা বলছে তার গায়ে হাতকাটা বেনিয়ান, ছোট ছোট করে ছাঁটা মাথার চুল। ডান হাতে তিনটে আংটি, বাহুতে সোনার তাবিজ, গলায় বেনিয়ানের ভিতরে সোনার একছড়া হার চিকচিক করছে। বড়লোক এবং মহাজন নিঃসন্দেহ।

—কী হয়েছে বাবু?

—কিছু মাল নিয়ে যেতে হবে। এই বেশি নয়, বস্তা দশেক।

—কিন্তু আমার নৌকো তো মালের নয় বাবু, সোয়ারীর।

—জানি রে বাপু জানি।—লোকটা বিরক্ত ভ্রূভঙ্গি করলে : সেটুকু বোঝবার বুদ্ধি আমার আছে। বড় নৌকোয় নেবার যদি উপায় থাকত, তা হলে কি একমাল্লাই নৌকোর মাঝিদের তোয়াজ করি না তিনগুণ ভাড়া দিই! যত সব অকর্মা ছোকরারা জোট বেঁধেছে, গাঁয়ের থেকে চাল ডাল কিছু নিয়ে যেতে দেখলেই ক্যাঁক করে এসে ধরে। আইনও নাকি হালে কী সব হয়েছে। পয়সা দিয়ে ব্যবসা করব, তবু এসব কিরে বাবা।

—তা আমি কী করব বাবু।

—বেশি কিছু করতে হবে না।—লোকটা এদিকে ওদিকে তাকাল একবার : বস্তা দশেক মাল নিয়ে রাতারাতি, বল্লভপুরের মথুরা দাসের গোলায় পৌছে দেবে। আমিই মথুরা দাস, বুঝেছ। সঙ্গেই থাকব তোমার। খুশি করে ভাড়া দিয়ে দেব, কোন ভয় নেই।

একটা অকারণ নিষেধ মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এ অন্যায়, এ অত্যন্ত অন্যায়।

—না বাবু, পারব না।

—আরে বাপু, কত তোষামোদ করব আর। ওই যে কথায় বলে, 'মাতঙ্গ পড়িলে দয়ে, পতঙ্গ প্রহার করে'—এও হয়েছে তাই। আর দর বাড়াস নে, গা তোল্ দয়া করে।

—দেবেন কত ?

—দশ টাকা।

—কুড়ি টাকার কম হবে না।

—কুড়ি টাকা! বলিস্ কিরে!—মথুরা দাস চোখ দুটোকে ছানাবড়া করে তুলল : কুড়ি টাকায় তো একখানা নৌকাই কেনা যায়।

—তবে তাই কিন্নগে না।—শীতল আবার শুয়ে পড়বার উপক্রম করল।

—আহা মাঝি শোন শোন—মথুরা দাসের গলায় ব্যাকুলতার আমেজ লাগল : নে, ওই পনের টাকাই পাবি, আর দিক করিস্ নে বাপধন। বড় বিপদেই পড়েছি, নইলে—

—কুড়ি টাকার কম পারব না, যদি রাজী থাকেন তো মাল আনুন কর্তা।

—আঁ্যাঃ, এ যে ভদ্দরলোকের এক কথা। তবু তো ভাগ্যিস ভদ্দরলোক নোস। আচ্ছা যা, তাই হবে। বাগে পেয়েছিস কিনা। হুঁঃ, যত সব—

অনিচ্ছুক শরীরটাকে টেনেটুনে শীতল উঠে দাঁড়াল। বাগে পেয়েছে। সে আর পেয়েছে কতটুকু ? তার চাইতে ঢের বেশি পেয়েছে মথুরা দাস। শুধু একটা মানুষকে নয়, এই গ্রামকে, এই দেশকে। শ্মশানের ওপর হাড়ের স্তূপ যত আকাশ-ছোঁয়া হতে থাকবে, তত উঁচু হয়ে মাথা তুলবে মথুরা দাসের কড়ির পাহাড়। আড়িয়াল খাঁ ভেঙে চলেছে দুর্নিবার ভাবে, গ্রামের পর গ্রাম, নীড়ের পর নীড়,দুর্ভিক্ষে শ্মশান হয়ে চলেছে সমস্ত। আর সেই জনহীন চড়ায় একটা ভাঙা নৌকো উবুড় হয়ে আছে। তা থাক, মথুরা দাসের নৌকোর অভাব হবে না কোনো দিন।

তারাপদ কী করছে এখন ? চকিতের জন্যে শীতলের মনে পড়ল : তারাপদ কী করছে এখন ? অন্ধকার উঠোনের মাঝখানে এখনো কি সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ? কত আশা করেই না এসেছিল লোকটা। দেশে ফিরবার জন্যে কত ব্যস্ততা, কত তাগিদ।

কতদিন যে সে আপনার জনের মুখ দেখেনি। নাঃ, এমন জানলে কিছুতেই ভাড়া নিত না শীতল।

—আর কত মাল চাপাবেন বাপু? আমার নৌকো যে ডুবে যাবে।

—যাবে না বাপু, যাবে না। মোটে দশটা তো বস্তা। দু কোশ রাস্তা যাবি, কুড়ি টাকা কবুল করেছি। কিন্তু খুব হুঁসিয়ার—কেউ জিগেস্ করলে—হাঁ, যা বলে দিয়েছি মনে আছে তো?

একবার ইচ্ছা হল টান মেরে বস্তাগুলোকে জলে ফেলে দেয়।

মুখে চোখে জল দিয়ে শীতল নৌকো খুলে দিলে। অন্ধকারে জল বয়ে চলেছে তরল খড়্গের মতো তীক্ষ্ণ খর ধারায়। দুপাশের বন জঙ্গল আর বেত কাঁটায় লগির আগা আঁকড়ে ধরে, কচুরির জাঙ্গাল পথ আটকে নৌকোটাকে বাধা দেয় বারে বারে, যেন যেতে দেবে না। দূরে কোথায় কারা চিৎকার করে কাঁদছে, মড়াকান্না নিশ্চয়। মৃত্যুর এমন সমারোহের মাঝখানে লোকের এখনো কাঁদবার মতো কণ্ঠ যে অবশিষ্ট আছে এইটেই আশ্চর্য।

আকাশে অনেকগুলো জ্বলজ্বলে তারা একসঙ্গে ছায়া ফেলেছে খালের জলে। জলটা ঝিলমিল করছে যেন বাঘের থাবা। পচা মাটি আর পাতার অত্যুগ্র গন্ধ ভাসছে বাঘের গায়ের গন্ধের মতো। একটা রক্তাক্ত হিংস্র হাসির আভায় দিগন্তকে উদ্ভাসিত করে চাঁদ উঠল—শেষ প্রহরের খণ্ড চাঁদ। সমস্ত পৃথিবীটা যেন বিস্ময়করভাবে কুটিল আর হিংসাতুর হয়ে উঠেছে; রাত্রিটা যেন উঠে এসেছে শ্মশানের কোল থেকে, যেন রাশি রাশি চিতার ধোঁয়ায় রূপ নিয়েছে এই অন্ধকার। আর এই রাত্রিতে মথুরা দাস চাল চুরি করে নিয়ে চলেছে—চুরি করে নিয়ে চলেছে মানুষের মুখের গ্রাস। সমস্ত পরিপার্শ্ব—সমস্ত পটভূমিই তার অনুকূলে।

—নৌকো কার? কোথায় যাবে?

কড়া গলায় প্রশ্ন এল। আর সঙ্গে সঙ্গেই দু'তিনটে টর্চের ঝাঁঝালো আলো এসে পড়ল শীতলের চোখে মুখে—কী আছে নৌকোয়?

নৌকোর ভেতরে ততক্ষণ একটা চাদর মুড়ি দিয়ে লম্বা হয়ে পড়েছে মথুরা দাস। ফিসফিস করে ভীরু গলায় বললে, মাঝি, ও মাঝি?

—কী আছে নৌকোতে? থামাও, ভিড়াও নৌকো।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করলে শীতল।

—সোয়ারী আছে বাবু, ভেদবমি ধরেছে। ভয়ানক বিপদ। তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে না পারলে—

—ভেদবমি! টর্চের আলোগুলো সঙ্গে সঙ্গে নিবে গেল: মিথ্যে বলছ না তো?

মাল-পত্তর নেই তো কিছু ? চাল-টাল ?

—এসে দেখুন না বাবু।

—আচ্ছা, যাও যাও। বুড়ো মানুষ তুমি, নিশ্চয় মিথ্যে বলবে না।

—আজ্ঞে না।

জোরে জোরে আরো কয়েকটা খোঁচ দিয়ে শীতল নৌকোটাকে অনেক দূরে নিয়ে চলে গেল। খালের জলে বাঘের থাবা ঝকঝক করছে—শেষ প্রহরের লালাভ ম্লানতায় সে থাবার নখগুলো যেন রক্তাক্ত। দিগন্তে চাঁদের রক্ত-হাসি। অন্ধকারটা যেন চিতার ধোঁয়ায় ঘনীভূত।

নিরাপদ জায়গায় এসে মথুরা দাসও হাসতে শুরু করে দিলে। দাঁতগুলো জ্বলে উঠলো উল্লাসে।

—বেড়ে—বেড়ে বলেছিস মাঝি। ভেদবমির রুগী! হি-হি-হি! এখন বাকিটা ভালোয় ভালোয় পেরিয়ে যেতে পারলে—হি-হি-হি।

শীতলের মনের মধ্যে বার বার করে একটা তীব্র ধিক্কার বেজে উঠছে, বুড়ো মানুষ তুমি, নিশ্চয় মিথ্যে বলবে না। মথুরার হাসির শব্দে হঠাৎ যেন তার চমক ভেঙে গেল। অবচেতন জিঘাংসার একটা প্রেরণা হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠল : কথা ক্ষণেও ফলে, অক্ষণেও ফলে। সত্যি সত্যিই কি এই মুহূর্তে ভেদবমি দেখা দিতে পারে না মথুরার ?

খালের জলে অতি তীব্র জোয়ার এসেছে। দিনের আলোয় উজ্জ্বল আড়িয়াল খাঁর প্রশস্ত প্রসারিত স্রোত নয়—অবিশ্রান্ত পাড় ভেঙে চলা শ্মশানের উদাস রিক্ততাও নয়। রাত্রির অন্ধকারে খালের সংকীর্ণ প্রচ্ছন্ন পথে কালো জল কলকল করে বয়ে চলেছে, যেন একটা সাপ নিঃশব্দে দংশন করে ক্ষিপ্রগতিতে লুকোতে চলেছে নিজের বিষাক্ত বিবরে।

পুষ্করা

তর্করত্ন কালীপূজোয় বসেছিলেন।

শুক্লা চতুর্দশীর রাত। আশ্বিনের জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশ, কোথা থেকে রাশি রাশি কালো মেঘ এসে সে শুভ্রতাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। সন্ধ্যায় নদীর যে জল গলানো রূপোর মতো ঝলমল করছিল, তার রঙ এখন কালো আর পিঙ্গলে মিশে যেন হিংস্রতার রূপ নিয়েছে। আর একবার খানিকটা কারণ গলাধঃকরণ করে তর্করত্ন ভয়ার্ত বিহ্বল চোখে তাকালেন। ওপারের বনজঙ্গলগুলো রাশি রাশি বিচ্ছিন্ন আর আকারহীন বিভীষিকার মতো জেগে রয়েছে। বাতাসে শীতের আভাস, তর্করত্নের মনে হল তবুও তাঁর

সমস্ত শরীরের মধ্যে আগুন জ্বলছে, রোমকূপের রন্ধ্রপথে আগুনের কণার মতো বেরিয়ে আসছে ঘামের বিন্দু।

শুক্লা চতুর্দশীর রাতে কালীপূজো—কথাটা শুনতে অশোভন আর অশাস্ত্রীয় ঠেকছে। কিন্তু এ সাধারণ কালীপূজো নয়। আশেপাশে দশখানা গ্রাম জুড়ে মড়ক দেখা দিয়েছে, কলেরার মড়ক। আর সে কি মৃত্যু! ছ মাসের শিশু থেকে ষাট বছরের বুড়ো—দিব্যি আছে, কোন রোগব্যাধির বালাই নেই, হঠাৎ কাটা কই মাছের মতো ধড়ফড় করে মরে যাচ্ছে। তাই দেবীর কোপ শান্ত করবার জন্যে শ্মশানে শ্মশানকালী পূজোর আয়োজন। অসহায় বিপন্ন মানুষ তিথি-নক্ষত্রের দোহাই মানে না।

পাশেই একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। তার শাদা দীপ্তিটা কেমন নীলাভ হয়ে আসছে, তেল ফুরিয়ে গেছে বোধ হয়। আলোটার ওপরে নিচে নানা জাতের ছোট বড় পোকা এসে জমেছে স্তূপাকারে। তারই অদূরে বসে কাশী কুমোর গাঁজা খাচ্ছে আর গায়ের ওপর থেকে পোকা তাড়াচ্ছে ক্রমাগত।

মুখ থেকে গাঁজার কলকে নামিয়ে কাশী কুমোর বললে, এল ?

অসহায় কাতর দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে তর্করত্ন বললেন, নাঃ, কোনো পাত্তাই তো দেখছি না।

কাশী বললে, রাত তো প্রায় কাবার। ভোগ হয়ে গেছে কতক্ষণ। ও আজ আর আসবে না।

—আসবে না ? আসবে না মানে ? বীরাসনে বসেও রক্তবস্ত্রধারী তর্করত্নের আপাদমস্তক থরথর করে কেঁপে উঠল।

—না এলে কী হবে জানিস ? পুরুরা পাবে। কারো রক্ষা থাকবে না, তোর নয়, আমার নয়—শ্মশানকালীর খাঁড়ায় কেটেকুটে একজাই হয়ে যাবে সমস্ত। একটি মানুষেরও আর বাঁচবার জো থাকবে না।

কাশী কুমোরের হাত থেকে গাঁজার কলকে খসে পড়ে গেল।

—ডাকো না ঠাকুর, ভালো করে মাকে ডাকো। এতকাল পূজোআচ্চা করলে, এতবড় পণ্ডিত তুমি, আর দেবীকে ভোগ খাওয়াতে পারলে না ? ডাকো, ডাকো, প্রাণ-পণে ডাকো।

শুকনো মুখে তর্করত্ন বললেন, ডাকছি তো, কিন্তু—

একটু দূরে আধো অন্ধকারের মধ্যে বড় একখানা কলাপাতায় স্তূপাকারে লুচি সাজানো আর খানিকটা মাংস। তার ওপরে বড় একটা জবাফুল, পেট্রোম্যাক্সের আলোতে চাপবাঁধা খানিকটা রক্তের মতো দেখাচ্ছে। সেদিকে দুখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তর্করত্ন আবেগ-ভরা কম্পিত গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন, দেবি প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও।

তোমার ভোগ গ্রহণ করো, জগৎকে রক্ষা করো—

কিন্তু কোথায় দেবী!

নিশিরাত্রের শ্মশান। শুধু শ্মশান বললে কম বলা হয়, এ মহাশ্মশান। অগভীর আর পঙ্কস্রোতা নদীর ধারে ধারে প্রায় তিন মাইল জুড়ে এই শ্মশান ছড়িয়ে পড়ে আছে, কত যে মড়া এখানে পুড়তে আসে তার হিসেব দেওয়া দুঃসাধ্য। আধপোড়া হাড়, মানুষের মাথা, চিতার কয়লা, পোড়া বাঁশ আর রাশি রাশি ভাঙা কলসী। প্রতি বছর বানের সময় নদী পাড় ভাঙে, মুছে নিয়ে যায় অসংখ্য চিতার অঙ্গার-চিহ্ন, মড়ার মাথা আর পোড়া হাড়ের টুকরোয় তার গর্ত ভরাট হয়ে ওঠে। তারপরেই আবার নতুন চিতা জ্বলে, লক্লকে আগুনের শিখা প্রতিফলিত হয় অস্বাস্থ্যকর কালচে জলের ওপর, শ্মশান ক্রমশ এগিয়ে আসে লোকালয়ের কোল পর্যন্ত। আগে যেখানে মড়া নিয়ে যেতে হলে পর পর তিনখানা পোড়ো জমির মাঠ পেরিয়ে যেতে হত, এখন সেখান থেকে হরিধ্বনি দিলে গ্রামের ঘরে ঘরে তার সাড়া জেগে ওঠে।

তর্করত্ন পেছনে ফিরে তাকালেন। নিঃশব্দ ঘুমন্ত গ্রাম। ঘুমন্ত! আতঙ্কে মূর্ছিত—মৃত্যুতে অসাড়। যে বাড়িতে সাতটি লোক ছিল তার চারটিই হয়তো মরে শেষ হয়ে গেছে, একজনের হয়তো ভেদবমি ধরেছে আর বাকি দুজন খুব সম্ভব শহরে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। শুক্লা চতুর্দশীর রাতকে কালো মেঘ অমাবস্যার মুখোস পরিয়েছে—এক কোণে থেকে থেকে বিদ্যুতের সর্পিল চমক; একটা নিষ্ঠুর রক্তাক্ত হাসির মতো নদীর কালো জলকে উদ্ভাসিত করে দিচ্ছে।

—দেবি, প্রসীদ, প্রসীদ—

কাতর আর্তকণ্ঠে তর্করত্ন আহ্বান করছেন। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলেছে রাত্রির প্রহর, একপাশে রাখা টাইম-পীসটার কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে আড়াইটের ঘরে। তর্করত্নের হৃৎপিণ্ডে উচ্ছলিত রক্তের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘড়ির কাঁটার তাল পড়ছে—টিক্ টিক্ টিক্। রাত যদি ভোর হয়ে যায়, দেবী যদি শিবাভোগ গ্রহণ না করেন, তা হলে—তা হলে—তর্করত্ন আর ভাবতে পারছেন না। অনিবার্য পুষ্করা। আর তার ফলে শুধু এই গ্রাম নয়, সমস্ত দেশ শ্মশানকালীর কোপে শ্মশান হয়ে যাবে। পুরোহিত, কুমোর—কারো রক্ষা নেই। টাকার লোভে বিদেশে এসে শেষে তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেল!

গাঁজার ঝোঁকে কালী কুমোর ঝিমুচ্ছে। কেশব ঢুলী ঢাকের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কেমন করে ওরা ঘুমুচ্ছে—আশ্চর্য। গ্রামের দিক থেকে মাঝে মাঝে এক-একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে—নিজের রক্তের মধ্যেও যেন তর্করত্ন শুনতে পাচ্ছেন সেই কান্নার প্রতিধ্বনি। বাতাসে পচা মড়ার গন্ধ ভাসছে—মুখে আগুন ছুঁইয়েই গ্রামের লোক মড়া ফেলে গেছে এখানে ওখানে। নদীর দুর্গন্ধ আবদ্ধ জলে শাদা মতন

ওটা কী ভাসছে? একটা মানুষ যে অমন অতিকায়ভাবে ফুলে উঠতে পারে এ যেন কল্পনাই করা যায় না! ঝোপে-ঝাড়ে শেয়ালের ডাক উঠছে, আর তার জবাব দিচ্ছে মড়াখেকো শ্মশানকুকুরের একটানা কান্নার মতো অস্বাভাবিক আর্তনাদ।

চারিদিকে এত শেয়াল, অথচ দরকারের সময় একটার দেখা নেই!

শিবাভোগ। শেয়াল এসে ভোগ গ্রহণ না করলে পূজো ব্যর্থ হয়ে যাবে। তর্করত্ন বৈজ্ঞানিক যুগের চিন্তাধারায় মানুষ নন; তিনি শাস্ত্র বিশ্বাস করেন, দেবীর মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন। সারাজীবন এই করেই তাঁর কেটেছে। পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি আছে, নানা জায়গা থেকে ক্রিয়াকর্মে তাঁর ডাক আসে; বাংলা দেশের বহু বড়লোকের বাড়ি থেকে সসম্মানে বিদায় পান তিনি। তিনশো টাকা দক্ষিণার লোভ দেখিয়ে গ্রামের সমৃদ্ধ মহাজন আর তালুকদার বলাই ঘোষ তাঁকে ডেকে এনেছে দেবীর কোপ শান্ত করবার জন্যে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর নিজের হাত কামড়ে খেতে ইচ্ছে করছে, সমস্ত চেতনা চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চাচ্ছে। এমন বিপদে তিনি জীবনে আর পড়েননি।

বলাই ঘোষও সামনে নেই। তাঁকে পূজোয় বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়িতে গিয়ে বোধ হয় ঘুম লাগিয়েছে। হয়তো ভেবেছে আর ভাবনা নেই। তর্করত্নের মতো সিদ্ধপুরুষ, পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে যিনি দৈনন্দিন কালীপূজো করেন, তিনি অনায়াসেই গ্রাম থেকে সমস্ত মড়ক আর আধিব্যাধির বালাই দূর করে দিতে পারবেন। কিন্তু তর্করত্ন যে কী সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে বলির পশুর মতো কাঁপছেন, এ কথা বলাই ঘোষের ভাববারও ক্ষমতা নেই। একবার বলাই ঘোষকে সামনে পেলে—তর্করত্ন হিংস্রভাবে ভাবতে লাগলেন—বলাই ঘোষকে সামনে পেলে তিনি পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিতেন: সবংশে দেবীর উদরে যাও তুমি, তুমি উচ্ছন্নে যাও।

ঝিমুতে ঝিমুতে কাশী কুমোর হঠাৎ যেন চমকে উঠল।

—কী ঠাকুর, কী খবর?

—খবর আবার কী? যা কপালে আছে, তাই হবে।—কথার শেষদিকটা কান্নায় কাঁপতে লাগল।

—শেয়াল এল না?

—নাঃ। তর্করত্নের চোখে এবার অশ্রু ছলছল করে উঠল।

—ও আর এসেছে। কত মড়া পাচ্ছে খেতে, খিদেতেষ্টা তো নেই। আর তাজা মানুষের রক্তেই দেবীর পেট ভরছে। তোমার ওই শুকনো চিমসে লুচি আর পোয়াটাক্ বোকা পাঁঠার মাংস খেতে তো বয়েই গেছে তাদের।

—তুই থাম হারামজাদা—বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন তর্করত্ন: যা বুঝিসনে, তার ওপর কেন কথা কইতে যাস।

—হে-হে-হে—নির্বোধ শব্দ করে কাশী কুমোর হেসে উঠল। গাঁজার নেশায় তার ভয়ডর ভেঙে গেছে।—আচ্ছা, আমি থামলাম। ন্যাংটোর আবার বাটপাড়ের ভয়। আমার তো সবই ওলা-দেবীর পেটে গেছে। বউ ব্যাটা সমস্তই। পুষ্করাই লাগুক আর ঘোড়ার ডিমই লাগুক—ওতে আমার আর কী হবে ঠাকুর।

তা বটে, তার কিছুই হবে না। কিন্তু তর্করত্নের তো তা নয়। তাঁর ঘর আছে, সংসার আছে, ছেলেপিলে আছে। তিনি মরলে তাদের খেতে দেবে এমন কেউ নেই। তিনশো টাকা তাদের বাঁচিয়ে রাখবে কদিন! আর এই দুর্ভিক্ষের বাজার। মৃত্যু যেন চারিদিক থেকে কালো কালো হাত বাড়িয়ে মানুষকে তেড়ে আসছে—একেবারে সমস্ত গ্রাস না করে তার খিদে আর মিটবে না। না খেয়ে মরছে, খেয়ে কলেরা হয়ে মরছে। পুষ্করার বাকি আছে কোথায়।

সামনে কালীমূর্তি। কাঁচা কালো রঙ জ্বলজ্বল করছে, ঘামের মতো টপটপ করে তার দু'এক বিন্দু ঝরে পড়ছে দেবীর পায়ের তলায়—মহাদেবের সমস্ত মুখে এঁকে দিয়েছে বিষাক্ত ক্ষতের চিহ্ন। সমস্ত মূর্তিটা যেন জীবন্ত—চোখ দুটি রক্তে মাখা। এ মূর্তিও সাধারণ নয়, তৈরি করতে হয় শ্মশানে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয় শ্মশানচিতার কয়লা, তারপর রাতারাতি বিসর্জন দিতে হয়। তাড়াতাড়িতে তৈরি করতে গিয়ে কাশী কুমোর দেবীর মূর্তিকে ঠিক দেবী করে গড়ে তুলতে পারেনি, সবটা মিলিয়ে একটা পৈশাচিক বীভৎসতার সৃষ্টি হয়েছে। পেট্রোম্যাক্সের আলোয় তার একটা দীর্ঘ ছায়া পেছনে নদীর জলে গিয়ে পড়েছে, স্রোতের টানে সেই ছায়াটা কাঁপছে—পচা মড়ার দুর্গন্ধে যেন নিঃশ্বাস আটকে আসছে তর্করত্নের।

কাশী কুমোর আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ঢোলের ওপর মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছে কেশব ঢাকী। কী আশ্চর্য রকমে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ওরা। সমস্ত শ্মশান, সমস্ত দিক-প্রান্তর যেন কার মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শেয়াল ডাকছে না—গ্রামের দিক থেকে আবার কান্নাটা গেছে থেমে। শুধু মাথার ওপর শুক্লা চতুর্দশীর আকাশ মেঘের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে আতঙ্কে যেন থমথম করছে।

হাওয়ায় অল্প শীতের আমেজ। পরনের খাটো রক্তবস্ত্রে শরীরের সবটা ঢাকা পড়ছে না। ভয়ের সঙ্গে শীতের শিহরণ মিশে গিয়ে তর্করত্ন কাঁপতে লাগলেন, কম্পিত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল: দেবি, প্রসীদ, প্রসীদ—

দূরে কলাপাতার ওপর শিবাভোগ শীতের স্পর্শে ঠাণ্ডা আর বিবর্ণ হয়ে আসছে। আর এক পাত্র তীব্র কারণ গলায় ঢেলে নিলেন তর্করত্ন। মুহূর্তে সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেল। দেবী আসবে না? নিশ্চয় আসবে, আসতেই হবে তাকে। সারাজীবন ধরে ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে দেবীর আরাধনা করছেন তিনি। সাধারণ পূজারী যেখানে এগিয়ে যেতে

সাহস করে না, সেই তান্ত্রিক পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে তিনি নিত্যপূজা করেন। তাঁর আহ্বান দেবীকে শুনতে হবে—শুনতেই হবে।

ঘড়ির কাঁটায় রাত তিনটে। তা হোক।

তর্করত্ন নিজের মধ্যে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন।

কতক্ষণ ধ্যান করছিলেন খেয়াল নেই, হঠাৎ এক সময়ে চমকে জেগে উঠলেন তিনি। দপ-দপ-দপ। আকস্মিকভাবে খানিকটা উগ্র দীপ্তিতে শিখায়িত হয়ে উঠেই পেট্রোম্যাক্সটা নিবে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকের অন্ধকার যেন হুড়মুড় করে এসে ভেঙে পড়ল বিরাট একটা বন্যাস্রোতের মতো। গুঁড়োয় গুঁড়োয় জলের কণা ছড়িয়ে পড়ছে, বৃষ্টি নামল নাকি?

উঠে আলোটা জ্বালবার একটা প্রেরণা বোধ করেই সঙ্গে সঙ্গে তর্করত্ন নিঃসাড় হয়ে গেলেন। বৃথা হয়নি, মিথ্যে হয়নি তাঁর সকাতর প্রার্থনা। দেবী এসেছেন। কালির মতো কালো অন্ধকারেও তর্করত্ন ভীত রোমাঞ্চিত দেহে দেখলেন শিবাভোগের সামনে দুটো চোখ আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দু হাতে সে শিবাভোগ গোগ্রাসে খাচ্ছে, তার দাঁতে লুচি আর মাংস চিবোনোর একটা হিংস্র শব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে তর্করত্নের কানে ভেসে এল।

কিন্তু দু হাতে? দু হাতে কি রকম? তর্করত্ন আবার তীব্র চমক অনুভব করলেন নিজের মধ্যে। শেয়ালের তো হাত থাকে না। তা হলে—তা হলে—দেবী কি নিজের মূর্তি ধরেই তাঁর ভোগ গ্রহণ করতে এসেছেন?

নিজের মূর্তি ধরেই? ভয়ে যেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যেন কোথা থেকে ঠেলে উঠল একটা দুঃসহ আনন্দের জোয়ার। সারাজীবন ধরে যে সাধনা তিনি করেছেন, আজ তা সম্পূর্ণ সার্থক হল। এই মহাশ্মশানে আর মৃত্যুর বিরাট উৎসবের মধ্যে দেবী এবার মূর্তি ধরেই নেমে এসেছেন। বিস্ফারিত চোখ মেলে তর্করত্ন দেখতে লাগলেন কী ক্ষুধার্তভাবে চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি নিশাচরের মতো তীক্ষ্ণতা পেয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি। তার দাঁতের চাপে হাড়গুলো মড় মড় করে ভেঙে যাচ্ছে।

শিউরে উঠে তর্করত্ন চোখ বুজবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। কে যেন সে দুটোকে জোর করে টেনে ধরে রেখেছে। কাশী কুমোর আর কেশব ঢুলী বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক, ঘুমুক, দেবীকে স্বচক্ষে দেখবে এত পুণ্য ওরা করেনি। চারদিকে রন্ধ্রহীন কালো অন্ধকার, পচা মড়ার গন্ধ, আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় কালো বৃষ্টি গলে পড়ছে।

—দেবী, প্রসন্না হও, প্রসন্না হও। তোমার ভোগ গ্রহণ করো, মারীভীতদের রক্ষা করো। প্রসন্না হও, প্রসন্না হও—

ভীত শুক্‌নো গলায় উচ্চারিত হতে লাগল ক্ষীণ প্রার্থনা। কিন্তু এত নিঃশব্দে যে তর্করত্ন নিজেই তা শুনতে পেলেন না।

ঘড়ির কাঁটায় তাল পড়ছে—টিক্-টিক্-টিক্। তর্করত্নের বুকের মধ্যে তার প্রতিধ্বনি। কালো অন্ধকারের পাষাণপ্রাচীর ভেদ করে সময় যেন এগিয়ে যেতে পারছে না. বার বার করে থমকে দাঁড়াচ্ছে। হাড় চিবোনোর শব্দটা তারই মধ্যে ক্রমাগত কানে আসছে। তর্করত্নের গলা শুকিয়ে আসছে, সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। আর একবার একপাত্র কারণ খেয়ে নিতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু নড়বার সাধ্য নেই, কে যেন তাঁর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে অসাড় আর অনড় করে দিয়েছে।

—হি-হি-হি—

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ হাসিতে সমস্ত শ্মশানটা থরথর করে কেঁপে উঠল। তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল দিকে-দিগন্তে। মরা নদীর জল আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল, ওপারের ন্যাড়া শিমুলগাছে ডুকরে উঠল শকুনের বাচ্চা। তর্করত্নের হৃৎপিণ্ডটো যেন লাফিয়ে গলার কাছে উঠে এসেই আবার ধড়াস করে আছড়ে পড়ে গেল।

কাশী কুমোর আর কেশব ঢুলী চমকে জেগে আর্তনাদ করে উঠল। অমানুষিক ভয়ে বুজে-আসা চোখ দুটো খুলে তর্করত্ন দেখতে পেলেন, সে মূর্তিটা অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে. যেন দূর থেকে ভেসে আসছে একটা দ্রুত বিলীয়মান লঘু পদধ্বনি।

—জয় মা শ্মশানকালী, জয় মা—তর্করত্ন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন।—ওরে বাজা, বাজা। আর ভয় নেই, দেবী নিজে এসেছিলেন, তাঁর ভোগ নিজেই গ্রহণ করে গেছেন। বাজা—বাজা। জয় মা শ্মশানকালী, জয় মা মহাকালী।

আবার পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলে উঠল। শিবাভোগ নিঃশেষিত। এমন হাতে হাতে প্রত্যক্ষ ফল সচরাচর দেখা যায় না।

কেশব ঢুলী প্রাণপণে ঢাকে ঘা লাগাল। কারণের বাকিটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করলেন তর্করত্ন। কাশী কুমোর গাঁজার কলকেটা নতুন করে সাজতে বসল।

রাত ভোর হয়ে আসছে। সাড়ে চারটে। মাথার ওপর থেকে কালো মেঘ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, তার একপাশ দিয়ে অস্তগামী চাঁদের উজ্জ্বল আলো এতক্ষণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল। যেন মৃত্যুর যবনিকা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে শ্মশানকালী প্রসন্ন হাসিতে হেসে উঠেছেন।

ভোরের আগেই এই অদ্ভুত ঘটনার কথা গ্রামের ঘরে ঘরে আলোড়ন জাগিয়ে দিলে। শ্মশানকালী নিজে এসে ভোগ গ্রহণ করেছেন, কলিযুগে দেবীর এমন প্রত্যক্ষ

আবির্ভাবের কথা আর শোনা যায় না। এখন আর ভয় নেই, এবার গ্রাম রক্ষা পাবে, দেশ রক্ষা পাবে। মারী থাকবে না, মন্বন্তর থাকবে না। মৃত্যুমগ্ন গ্রামের ওপর উল্লাসের তরঙ্গ জেগে উঠল। তর্করত্নের চোখ দিয়েও দরদর করে জল পড়তে লাগল। তাঁর সাধনা এতদিনে সফল হয়েছে—দেবী এসে সশরীরে তাঁকে দর্শন দিয়েছেন।

বেলাবেলিই স্টেশনে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তর্করত্নের। কিন্তু গ্রামের লোক তাঁকে যেতে দিলে না। বলাই ঘোষ তো গলায় কাপড় জড়িয়ে সারাদিনই তাঁর পদতলে পড়ে রইল। ধুলো দিতে দিতে পায়ের একপর্দা চামড়াই উঠে গেল তর্করত্নের। আর সমবেত জনতাব কাছে সত্যিমিথ্যেয় রঙ ছড়িয়ে ব্যাপারটা ফলাও করতে লাগল কালী কুমোর।

—মাকে দেখবার পুণ্যি তো করিনি, তাই পাপচোখে কী মোহনিদ্রাটাই নেমে এল। সবই তাঁর লীলে। আর সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মা নিজেই নেমে এসে শিবাভোগ খেলেন। গলায় মুণ্ডমালা, হাতে খাঁড়া, জিভ থেকে টক টক করে পড়ছে রক্ত। তারপর সে কি ভয়ানক হাসি! শুনলে যেন পেটের পিলে ফুসফুস একসঙ্গে চড়াৎ করে ফেটে যায়। চমকে তাকিয়ে দেখি—

সমবেত জনতার উদ্‌গ্রীব ভয়ার্ত মুখের দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুরু করলে : চম্‌কে তাকিয়ে দেখি—

সন্ধ্যার পরে তর্করত্ন গরুর গাড়িতে চেপে স্টেশনে যাত্রা করলেন। শেষরাতে ট্রেন ধরতে হবে। তারপর শহর।

গাড়ির অর্ধেকটা দানে আর দক্ষিণায় বোঝাই। কলা, মুলো, নারিকেল, কাপড়—আরো কত কী। এদিকে দিয়ে বলাই ঘোষের কার্পণ্য নেই, ধানের ব্যবসা করে সে মেলা টাকা কামিয়েছে এবারে। তা ছাড়া ঘোষপাড়া গ্রামটাই তালুকদার আর মহাজনের দেশ। যুদ্ধের বাজারে তারা মুঠো মুঠো টাকা কুড়িয়ে নিয়েছে। দক্ষিণার অঙ্কে তিনশো টাকার জায়গায় তারা পাঁচশো টাকা তুলে দিয়েছে তাঁর হাতে। তর্করত্ন প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করেছেন। পাঁচশো টাকা একটা কালীপুজোর দক্ষিণা! যুদ্ধে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি না হলে এমন কথা কি কেউ ভাবতে পারত।

অত্যন্ত প্রসন্ন মনে তর্করত্ন একটা বিড়ি ধরালেন। গাড়ি চলেছে মন্থরগতিতে। আজ কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমা। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আলো করে দিয়ে চমৎকার চাঁদ উঠেছে। কালকের মেঘাচ্ছন্ন শ্মশানের সঙ্গে এর কত তফাৎ। শহরের অনেকগুলো লক্ষ্মীপুজো আজ তর্করত্নের নষ্ট হয়ে গেল—তা যাক, বলাই ঘোষ অনেক বেশী পরিমাণে তার ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে।

দুপাশে দূরবিস্তৃত মাঠ। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দিকে দিগন্তে ধানের শীষ দুলছে—

চমৎকার ফলন হয়েছে এবার। মাঝে মাঝে এক-একটা দীর্ঘ তালের গাছ প্রহরীর মতো কালো ছায়া ফেলছে। পথের দু'পাশে কাঠমল্লিকার ফুল যেন গন্ধের মায়া বিস্তার করে দিয়েছে। এখানে ওখানে গ্রাম, এত শস্য—এত জীবনের মধ্যেও মৃত্যু আর মন্বন্তরের স্পর্শে নিস্তব্ধ।

—হুঃ—হুঃ—হুঃ—

জিহ্বা-তালু স যোগে একটা প্রবল শব্দ করে গাড়োয়ান গাড়িটাকে থামিয়ে দিলে।

—কী হল রে?

তর্করত্ন চমকে উঠলেন। এই নির্জন মাঠের মধ্যে—ডাকাত নয় তো? সঙ্গে পাঁচশো নগদ টাকা, বিস্তর জিনিসপত্র। বড় ভরসাও নেই।

—রাস্তার ওপর ডোমপাড়ার পাগলিটা পড়ে আছে বাবু।

—কে ডোমপাড়ার পাগলি? কী হয়েছে?

—ওই—গাড়োয়ানের স্বরে বেদনার আভাস লাগল : আকালে ওর তিনটে বেটা আর সোয়ামী না খেয়ে মরে গেছে বাবু। তাই পাগল হয়ে গেছে। রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে, যমে ধরেছে বোধ হয়।

তর্করত্ন সভয়ে গাড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিলেন।

—থাক, থাক যেতে দে। পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁকিয়ে চলে যা। যে রোগ, বিশ্বাস নেই বাবা।

গাড়ি চলতে লাগল। কোজাগরী পূর্ণিমার রাশি রাশি জ্যোৎস্না—সাঁওতালপাড়ায় মাদলের মৃদু-গম্ভীর শব্দ, ওরাও কি লক্ষ্মীপূজো করে নাকি? কোজাগরী। লক্ষ্মী ঘরে ঘরে ডাক দিয়ে যান—কে জাগে? চাঁদের দুধে ধানের শীষ পূর্ণায়ত হয়ে উঠছে। ফসলের ভরা ক্ষেতের মধ্যে থেকে থেকে একটি করে প্রদীপের শিখা। শস্যলক্ষ্মীকে আহ্বান করছে মাটির মানুষেরা, তাঁর পায়ের ছোঁয়া লেগে ক্ষেতের ধান সোনা হয়ে যাবে। কাঠ-মল্লিকার সুরভিতে কি তাঁরই শ্রীঅঙ্গের পদ্মগন্ধ?

তর্করত্নের মনটা হঠাৎ বিহ্বল হয়ে উঠল। দু হাত কপালে ঠেকিয়ে তিনি গদগদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, দোহাই শ্মশানকালী, কৃপা করো মা। পুষ্করা কেটে যাক, মানুষ আবার বেঁচে উঠুক। মা মহাকালী, তুমি মহালক্ষ্মী হয়ে এসে দেখা দাও।

এত ধান, এত ফসল, পুষ্করা কেটে যাবে বই কি। কিন্তু একটা জিনিস তর্করত্ন বুঝতে পারেন নি। তাঁর শ্মশানকালী এসেছিল ওই ডোমপাড়ার পাগলিটার রূপ ধরেই—আর এখনো পথের ধুলোয় পড়ে সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছে—কালীর মতো জিভ মেলে হাঁপাচ্ছে একফোঁটা জলের জন্যে। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারে নি।

কিন্তু তবুও পুষ্করা কেটে যাবে। মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়।

ভাঙা চশমা

মফঃস্বল শহরে ষাট টাকা মাইনের স্কুল-মাস্টারী। তার সঙ্গে কুড়ি টাকা করে দুটো ট্যুশনি। মোট তা হলে দাঁড়ালো একশো টাকা। একজন ফার্স্ট ক্লাস এম. এ'র জীবনে চূড়ান্ত আর্থিক পরিণতি। উচ্চাকাঙ্ক্ষার চতুর্বর্গ।

কণ্ট্রোল আর কালোবাজার। ইন্‌ফ্লেশন। রেশন কার্ডের অবরুদ্ধ অঞ্জলি দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় যা চুঁইয়ে পড়ে তাতে চিঁড়ে ভেজে না। অণুর মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো অন্ধকার। বাইরে ঝড়ঝাপটা যদি বা সহ্য হয়, প্রেয়সীর অপ্রসন্ন মুখ দেখে বাণপ্রস্থ নিতে ইচ্ছে করে। কয়েকবারই ভেবেছি, কা তব কান্তা বলে একদিন যাত্রা করব হরিদ্বারের পথে। কিন্তু দার্জিলিং মেলের হ্যাণ্ডেলে পঞ্চভূতের দোদুল্যমান অবস্থা দেখে বৈরাগ্য ছাড়িয়ে নির্বেদ আসে। সন্ন্যাস নেওয়াটা শক্ত নয়, কিন্তু ট্রেনে কাটা পড়ে অপঘাত মৃত্যুটা কেমন যেন লোভনীয় বলে মনে হয় না।

স্কুলমাস্টার আমরা—ভাবী যুগের দেশনেতা, সমাজনেতা—অথবা হয়তো বুদ্ধ-চৈতন্যের মতো মহামানবেরাই আমাদের মন্ত্রবাণীতে লালিত হয়ে উঠছে। বুনো রামনাথের মতো তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়েই অবশ্য আমাদের মতো জ্ঞানতপস্বী আচার্যের খুশি হয়ে থাকা উচিত—কিন্তু দেখলাম কিছুতেই মানসিক প্রশান্তির ঐ স্তরটাতে নামা যাচ্ছে না —বিশেষ করে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতো লর্ড ওয়াভেল এসে একদা আমার অনুপপত্তির সন্ধান নেবার জন্য পনের টাকা ভাড়ার এই টিনের চালায় পদার্পণ করবেন—এতখানি আশাবাদী হওয়া শক্ত। সুতরাং দিক্‌বিদিক্ লক্ষ্য না করেই মস্ত একটা ঝাঁপ দিলাম। যুদ্ধের বাজার মানেই তো স্পেকুলেশন। অতএব—

অতএব টিঁকে যাই তো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্, নতুবা পুনর্মূষিক। 'ত্বয়া হৃষীকেশ'—শাস্ত্রের শাঁসবাক্য তথা সারবাক্য উচ্চারণ করে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করলাম।

ব্যাপারটা আর একটু স্পষ্ট করা দরকার। শহরে একজন বিশিষ্ট নাগরিকের মৃত্যুতে প্রথম ঘণ্টার পরেই স্কুল ছুটি হয়ে গেল। ছেলেরা তাদের উদগ্র শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার জন্যে কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ পেয়ারা গাছে উঠল, কেউ কেউ ক্রিকেট নামিয়ে স্কুলের মাঠে পিটোতে শুরু করলে। আবার দল বেঁধে জনকয়েক যাত্রা করলে শহরের বাইরে ডাসা কুলের সন্ধানে। আর আমরা টীচার্স রুমে বসে চীনেবাদাম আর

সিগারেট সহযোগে অবিলম্বে বর্তমান যুদ্ধটা শেষ করে দেবার জন্যে একটা অত্যন্ত জরুরী খসড়া তৈরী করতে লেগে গেলাম।

এমন সময়ে অকুস্থলে হেড্ মাস্টারের প্রবেশ। পরম বৈষ্ণব-লোক—গলায় কণ্ঠী। সেক্রেটারীর বাড়িতে খোল বাজিয়ে নামকীর্তন করেন। অত্যন্ত বিনয়ী, ছেলেদের বেত মারবার আগে সনিশ্বাসে বলেন, কৃষ্ণের জীবের ওপর কৃষ্ণের কাজ করতে হবে—কৃষ্ণের ইচ্ছা। দপ্তরী বলে, ওঁর বেতের সঙ্গে নাকি সুতো দিয়ে তুলসীপাতা বাঁধা আছে।

হেড্ মাস্টার ঘরে ঢুকলেন হাতে একখানা ছাপানো চিঠি নিয়ে। বললেন,একটা খবর আছে আপনাদের জন্যে। দেখুন, কৃষ্ণের ইচ্ছেয় কারো কারো হয়তো সুবিধে হয়ে যেতে পারে।

জার্মানীকে আপাতত বিপন্ন রেখে আমরা একসঙ্গেই চিঠিখানার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। রোমাঞ্চিত হওয়ার মতো খবরই বটে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানাচ্ছেন গ্রামে গ্রামে রিলিফ ওয়ার্ক করার জন্যে সাব-ডেপুটি গ্রেডের কয়েকজন অফিসার নিয়োগ করা হবে। আমাদেরই নাকি প্রেফারেন্স দেওয়া হবে সর্বাগ্রে। যদিও অস্থায়ী চাকরি, তবুও যদি কেউ ইচ্ছুক থাকেন তা হলে হেড্ মাস্টারের মনোনয়ন অনুসারে—

স্কুল-মাস্টারের বরাতেও শিকে ছেঁড়ে তা হলে। অতএব উকিল বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে প্যান্টালুন আর বেমানান কোট পরে ইণ্টারভিউ দিয়ে এলাম। এবং বললে আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না—চাকরি হয়ে গেল। বারোয়ারী কালী পাঁচসিকের ভোগ পেলেন আর অণু অচির ভবিষ্যতে হাকিম-গৃহিণী হওয়ার মধুময় স্বপ্ন দেখতে লাগল। একে বনিয়াদী পরিবারের মেয়ে, তার ওপরে গ্রাজুয়েট স্কুলমাস্টারের স্ত্রী হয়ে ওর শিক্ষাদীক্ষা প্রত্যেক দিন ওকে ধিক্কার দিচ্ছিল। মনে মনে ভাবলাম হোক্ না আবু হোসেনের নবাবী, তবু অন্তত কয়েকটা দিন অণুর মুখে হাসি ফুটে উঠুক।

হেড্ মাস্টার বললেন, কন্‌গ্র্যাচুলেশনস্। যান, কৃষ্ণের ইচ্ছেয় হয়তো উন্নতি হয়ে যেতে পারে। আর আপনাদের মতো ব্রাইট ইয়ং ম্যান—

আমি সনিশ্বাসে বললাম, আজ্ঞে হাঁ, সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা।

কিন্তু হাকিম হতে চাইলেই যে হাকিম হওয়া যায় না, কয়েক দিনের মধ্যেই সেটা মর্মে মর্মে টের পাওয়া গেল। মাসের মধ্যে কুড়ি দিনই টুরে বেড়াতে হয়। সাইকেলের চাকার নিচে পেরিয়ে যাই মাইলের পর মাইল, দুর্ভিক্ষ আর ম্যালেরিয়াজীর্ণ গ্রাম আমার প্যাণ্টের ক্রীজ আর হ্যাটের ঔদ্ধত্য দেখে চমকে ওঠে। অবিশ্রান্ত সেলাম পাই, দলে দলে লোক সাহায্যপ্রার্থী হয়ে ডাকবাংলোর সামনে এসে ভিড় করে। প্রভুত্বের আস্বাদ নতুন রক্ত-খাওয়া বাঘের মতো চেতনায় মত্ততা জাগিয়ে তোলে। মনে হয় —এই তো জীবন—এম-এতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার সত্যিকারের সম্মানটা এতদিনে আমি

আদায় করে নিয়েছি। 'আপনি মনিব, আপনি মা-বাপ, আপনি জেলার কর্তা।' টেস্টের নম্বর জানবার জন্যে ছেলেরা এসে যখন দ্বারস্থ হত, তখন অবচেতন গৌরবে বুকটা ভরে উঠত সত্যি। কিন্তু তার সঙ্গে এর তুলনা!

ওষুধ-কম্বল-রেশনের ব্যবস্থা। সরকারী দাক্ষিণ্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মুক্তধারার মতো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেটে যায় অবিশ্রান্ত কাজের চাপে, তবুও মাঝে মাঝে মনটা ক্লান্ত আর সংশয়গ্রস্ত হয়ে ওঠে। শ্মশানের ওপর অনুগ্রহ বৃষ্টি করে কী লাভ।

শ্মশান। তা বই আর কী। মন্বন্তর নির্বিবাদে বয়ে গেছে—এসেছে ম্যালেরিয়া। শীতের সন্ধ্যায় ঝোপজঙ্গল থেকে খানিকটা বিষাক্ত আর শ্বাসরোধী অন্ধকার এসে যেন আচ্ছন্ন করে দেয় পৃথিবীকে। এনোফিলিসের গুঞ্জনে সন্ধ্যাবেলাতেই মশারির মধ্যে আশ্রয় নিই। বাইরের ধানকাটা মাঠ তারার আলোয় বিষণ্ণ পাণ্ডুর হয়ে পড়ে থাকে—পচা ডোবার জলে আলেয়া। দূরে দূরে শেয়ালের ডাক শুনি—শকুনের আর্তনাদ অবরুদ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু মানুষের গলা শুনতে পাই না—শিশুর কান্না ভেসে আসে না। ম্যালেরিয়া আর দুর্ভিক্ষে হতশেষ মানুষ ইঁদুরের মতো চিঁ চিঁ করে। আর না খেয়ে মায়ের বুকে ছটফট করে শুকিয়ে মরে গেছে শিশুরা—ভাবী স্বাধীন ভারতের মানবকের দল।

নানা দুর্বল মুহূর্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায় স্কুল-মাস্টারের নিরীহ সত্যসন্ধ মন। যেন একটা বিরাট প্রহসনের বিদূষক বলে মনে হয় নিজেকে। যাদের মৃত্যুর জন্যে শেষে কৈফিয়ৎ দিয়েই আমরা পাপক্ষালন করতে পারব না, তাদের কবরের ওপর রিলিফের সান্ত্বনা ছড়ানো যেন তাদের অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কী প্রয়োজন ছিল এর। যারা মরতে বসেছে শান্তিতেই মরতে দাও তাদের। যাদের নগ্ন করোটি নিয়ে আজ শেয়ালেরা নদীর চড়ায় টানাটানি করছে—তাদের কংকাল মুখে আজ নিশ্চয়ই আমাদের দাক্ষিণ্য দেখে আনন্দের হাসি উৎসারিত হয়ে উঠছে না। কোটরসর্বস্ব চোখে যদি আগুন থাকত, তা হলে এতদিনে সে আগুনের জ্বালায় আমরা নিঃশেষে ভস্ম হয়ে যেতাম।

কিন্তু কী হবে এ-সব অবাস্তর ভাবনায়। চাকরি করতেই এসেছি। আবু হোসেনের রাজতক্ত—পরমায়ু তিন মাস না ছ মাস কে জানে। তবুও হাকিমী তো বটে।

আর্দালী হৃদয় প্রামাণিক খাবার নিয়ে আসে। মশারির মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে বসেই আহারপর্বটা শেষ করে নিই। তারপরেই ডাকবাংলোর ফিতের খাটে লেপের তলায় আলস্যমন্থর তন্দ্রা জড়িয়ে আসে। ভয়ানক শীত পড়েছে এবার। স্বপ্নের ভেতর অণুর মুখখানা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়, মনে পড়ে বাইরে শীতার্ত দিক-প্রান্তর মৃত্যুর মধ্যে থরথর করে কাঁপছে।

……দুঃখে সুখে দিন যায়। মাইনে ছাড়াও কিছু কিছু মেলে। স্কুল-মাস্টারী বিবেক আগে মাঝে মাঝে চাবুক মারতে চাইত, কিন্তু এখন সমস্ত সহজ হয়ে গেছে। আগাগোড়া যন্ত্রটাই একসুরে বাঁধা। বিবেকের তাগিদে যে মূর্খ বেসুর গাইতে যায়, তিন দিনেই কানে মোচড় খেয়ে তারস্বরে ঐকতান তুলতে হয় তাকে। মনে ভাবি সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা।

সেদিন সকালে চা খেয়ে ডাকবাংলোর বারান্দায় এসে বসলাম। শীতের রোদ মধুর উষ্ণতায় সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের ওপরে পা তুলে দিলাম। ভারী ভালো লাগছে। দু মাস আগে ঠিক এমনি সময় ছাত্রকে নিয়ে মল্লযুদ্ধে লেগে যেতাম—মূর্তিমান নির্বুদ্ধিতা দেখে মনে হত নিরেট মাথাটার ওপরে সবেগে নেস্‌ফিল্ডখানা আছড়ে ফেলে বেরিয়ে চলে যাই। কিন্তু মাসান্তে কুড়িটি করে টাকা। পড়বার জন্যে নয়, প্রাইভেট টিউটর রাখবার জন্যেই।

তার সঙ্গে কী আকাশ-পাতাল তফাৎ। জিতেছি নিশ্চয়ই--জীবনের চক্রনেমি উল্টো গতিতে ঘুরতে শুরু করেছে। ভালো করে 'কোরাস্‌' গাইতে পারলে পাকাপাকি হয়তো হয়েও যেতে পারি, এমনি একটা আশা উপরিওলা সেদিন দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের জয় হোক্‌—রিলিফের জন্যেই তো এমন চাকরিটা আমি পেয়ে গেলাম। মড়ক বিশেষ না হলে জীববিশেষের পার্বণ হয় না, আমাদের দিকটাও তো দেখতে হবে।

ডাকবাংলোর নিচে ভিড় জমেছে। হৃদয় প্রামাণিক নাম-ধাম লিখছে খাতায় আর রামদুলাল কম্বল বিতরণ করছে দুঃস্থদের। অমানুষিক মানুষের একটা বীভৎস সমাবেশ। ছেঁড়া কাপড়ের ভেতরে হাড় বের করা অতীতের মানুষগুলো ঠক ঠক করে কাঁপছে। কাঁধ পর্যন্ত জটাবাঁধা চুল, মুখে এলোমেলো দাড়ি, চোখের দৃষ্টিতে ঘষা কাঁচের মতো অর্থহীন শূন্যতা।

হঠাৎ হৃদয়ের ওপর লক্ষ্য পড়তেই আমার নিশ্চিত আরামটা যেন চমক খেল একটা।

উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ে। এতদিনে কেন যে দালালে নিয়ে যায়নি, সেইটেই আশ্চর্য। অনাহারে শীর্ণ হলেও যৌবনশ্রী এখনও প্রকট, আর শতজীর্ণ গাত্রবাসের ভেতর দিয়ে সেই যৌবন অসহায় করুণতায় নিজেকে বাইরের আলোতে মেলে ধরেছে। দেখলাম, হৃদয়ের চোখে আগুন। খাতায় সে নাম লিখছে বটে, কিন্তু দৃষ্টিটা মরা-গোরুলোভী শকুনের মতো তীক্ষ্ণ আর নির্লজ্জ।

রাগে আর বিরক্তিতে শরীর জ্বালা করে উঠল। ডাকলাম, হৃদয়।

হৃদয় উঠে এল তটস্থ হয়ে।

—আজ্ঞে?

—কে ওই মেয়েটা?

হৃদয় যেন হকচকিয়ে গেল একটু। সন্দিগ্ধ এবং সংকুচিত ভাবে একবার তাকাল আমার দিকে। তারপরে ঠোঁট চেটে বললে, আজ্ঞে, ওই কমলপুরের—

—ওকে কম্বল দিয়ে এক্ষুনি বিদায় করে দাও, বুঝেছ?

—আজ্ঞে।—ঘাড় নেড়ে সবিনয়ে জবাব দিলে হৃদয়, তারপর ফিরে গেল নিজের জায়গায়। বেশ বুঝতে পারছি, নিজের মনে মনে কদর্য ভাষায় নিশ্চয় গালাগালি দিচ্ছে আমাকে। কিন্তু স্কুল-মাস্টারী মনটাকে এখনো জয় করে উঠতে পারিনি—এসব ইতরতা দেখে আপনা থেকেই সেটা বিষিয়ে ওঠে।

সকালের সোনালি রোদটা মনের সামনে বিস্বাদ হয়ে গেল। হৃদয়ের চোখে যে আগুন দেখলাম এ কি আমাদের সকলের পক্ষেই সত্যি নয়? মানুষের চরম দুর্গতির সুযোগ কি আমরা সবাই নিচ্ছি না? ষাট টাকা মাইনের স্কুলমাস্টার থেকে হাকিমীর এই রাজতক্ত—মাঝখানের পথটা কিসে তৈরি? চকিতের জন্য মনে হল এর চাইতে নগণ্য মাস্টারীটাই বোধ হয় ছিল ভালো, অন্তত—

—নমস্কার স্যার।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক—অথবা ভূতপূর্ব ভদ্রলোক বললেই বোধ হয় নির্ভুল হয় সংজ্ঞাটা। গায়ে অত্যন্ত ময়লা কাঁধছেঁড়া লংক্লথের পাঞ্জাবি—যেন চামড়ার সঙ্গে সেঁটে রয়েছে সেটা। ধূলিধূসর কাপড়টা, লাল ক্যাম্বিশের জুতোর আগা দিয়ে তিন-চারটে আঙুল বেরিয়ে পড়েছে। বুক পর্যন্ত শাদা কালো দাড়ি, চোখে কাঁচভাঙা চশমা।

নিজের অজ্ঞাতেই মনটা সংকুচিত হয়ে উঠল। সেই দুঃখের চিরন্তন ফিরিস্তি শুনতে হবে। পুত্র-কন্যা-গৃহিণীর দুর্গতি, ধানের দর, দেশের অবস্থা। উপসংহারে কিঞ্চিৎ বেশি পরিমাণে সাহায্য পাওয়ার সকাতর আবেদন।

বললাম, কী বলবেন, বলুন।

কিন্তু ভদ্রলোক আমার অনুমানের ধার দিয়েই গেলেন না। সগর্বে বললেন, আমি এখানকার মাইনার স্কুলের হেড্ মাস্টার। আপনাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞেস করতে এলাম।

বললাম, বসুন—বসুন।

ভদ্রলোক প্রবল বেগে মাথা নাড়লেন: না, বসব না। আমরা কি আর হাকিমের সামনে চেয়ারে বসতে পারি। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে। আচ্ছা বলুন তো, প্রিপোজিশন না পড়লে কি ইংরেজী শেখা যায় কখনো?

এবার আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকালাম। হ্যাঁ—যা ভেবেছি তাই।

ভদ্রলোক ঠিক আত্মস্থ নেই। ঘোলা চোখ দুটো লাল টকটক করছে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে সে যেন আমার দিকে তাকাচ্ছে না—তাকাচ্ছে আমার শরীরের ভেতর দিয়ে পেছনের দেওয়ালটার দিকে। কালো বিবর্ণ ঠোঁটের দু পাশে শুকিয়ে রয়েছে লালার দাগ, তার ওপর কোথা থেকে উড়ে এসে বসেছে নীল রঙের একটা প্রকাণ্ড মাছি। আমি বিব্রত হয়ে বললাম, সে তো নিশ্চয়। প্রিপোজিশনই তো ইংরেজীর আসল জিনিস।

—এই দেখুন, দেখুন। এত করেও একথা আমি ওদের বোঝাতে পারলাম না। এইজন্যেই তো আজকালকার এম.-এ. পাস করা ছেলেরা অবধি এক লাইন ইংরেজী লিখতে গিয়ে পাঁচটা ভুল করে বসে থাকে। আচ্ছা, নমস্কার।

ভদ্রলোক ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন।

দেখলাম লোকগুলো তাঁর দিকে কেমন একটা অদ্ভুত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমার মানসিক জিজ্ঞাসাটা অনুভব করে মৃদু হাসল হৃদয়। বললে, ও কিছু না হুজুর, পাগল।

—পাগল?

—হ্যাঁ, পাগল হয়ে গেছে। আগে হেড্ মাস্টার ছিল, এখন—

হৃদয়ের কথাটা শেষ হতে পেল না। একদল লোক এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কাজের আবর্তে তলিয়ে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে। মৃত্যুর এত প্রাচুর্যের মধ্যেও যে দুর্ভাগারা মরতে পারেনি তারা বাঁচবার জন্যে এখনো একটা প্রাণান্তিক প্রয়াস করতে চায়।

সন্ধ্যার ডাকে অণুর চিঠি পেলাম।

পুরু নীল রঙের খাম—অভ্যস্ত রীতিতে কোণাকুণিভাবে ঠিকানা লেখা। ওর হাত-বাক্সের মিষ্টি গন্ধ চিঠিটার সর্বাঙ্গে যেন জড়িয়ে রয়েছে। আজ পনের দিন ধরে অবিশ্রান্ত 'টুরে' ঘুরছি, ওর সঙ্গে দেখা নেই। নির্জন আর নিরানন্দ গ্রামের মধ্যে আড়ষ্ট সন্ধ্যায় মনটা হু হু করে উঠল। বিয়ের পরে দুজনে কখনও একসঙ্গে এতদিন আলাদা হয়ে থাকিনি। মাস্টারী জীবনে দুঃখ ছিল অনেক, অতৃপ্তি ছিল অগণিত ; কিন্তু শীতের এই ক্লান্ত সন্ধ্যায় অন্তত অণুর কাছ থেকে আমাকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারত না। সমস্ত দিনের অতি বাস্তবতার পরে সন্ধ্যার রোম্যান্স আসত ঘনিয়ে। মোমবাতির আলো জ্বেলে দুজনে বৈষ্ণব পদাবলী পড়তাম : সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ, লাখ উদয় করু চন্দা—

সত্যি তো চাঁদ উঠেছে। শীতের মরা জ্যোৎস্না—কুয়াশায় আড়ষ্ট আর বিষণ্ন। দূরের মাঠ পাণ্ডুর আলোতে মায়াময় হয়ে আছে। গ্রামগুলো যেন খণ্ড খণ্ড কালো অন্ধকারের সমষ্টি। মাঠের পাশ দিয়েই একটা ক্ষীণস্রোতা নদী জ্যোৎস্না আর হিমের মলিদা জড়িয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। শীতের জ্যোৎস্না যেন ডাকছে। ওই মাঠের ভেতর দিয়ে একটু বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? গায়ে একটা ওভারকোট চড়িয়ে নেমে পড়লাম।

পায়ে চলা ছোট পথ। ঘন ঘাস জমেছে দুপাশে। কণ্টিকারী আর সেয়াকুল কাঁটা মাথা তুলেছে এখানে ওখানে। শিশিরে ভিজে রয়েছে সমস্ত, আমার জুতোটাকেও ভিজিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের চোখের জলের মতো শিশিরবিন্দু চাঁদের আলোয় টলমল করছে। শীতের দিনে সাপের ভয় নেই, আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মতো হেঁটে চললাম।

কুয়াশার আড়ালে চাঁদ হাসছে। অণুর অশ্রুসজল মুখখানির মতো। বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা ধূ ধূ করছে। নাঃ আর পারা যায় না। যেমন করে হোক অন্তত দুদিনের জন্যেও একটিবার ওর কাছ থেকে ঘুরে আসা দরকার।

হাঁটতে হাঁটতে ছোট নদীটার কাছে চলে এলাম। খাড়া পাড়ি পর্যন্ত ঘাসে ঢাকা জমি, নিচে নদীর ঘোলা জল তির তির করে বয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে একটা বেড়ার মতো টানা রেখায় কতগুলো ডালপালা মাথা তুলে রয়েছে, বোধ হয় মাছ ধরবার কোনো বন্দোবস্ত রয়েছে ওখানে। তার গায়ে জমে রয়েছে একরাশ কচুরি—বাতাসে তারই গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

মাটির খেয়ালে মাথা তুলেছে এলোমেলো কতগুলো ঢিবি—ইতস্তত বিকীর্ণ একরাশ ছিন্নমুণ্ডের মতো। তারই একটার ওপরে রুমাল পেতে বসে পড়লাম। ওপারে বালুচর—ফুল ঝরে যাওয়া মুমূর্ষু কাশের বন। সামনে চাঁদ জ্বলছে। শূন্য দৃষ্টিতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। অণু পাশে থাকলে—

—নমস্কার স্যার।

চমকে উঠলাম। যেন মাঠ ফুঁড়ে মাইনার স্কুলের সেই হেড্ মাস্টার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় ভালো করে চেনা যায় না—শুধু ভাঙা চশমার কাচটা জ্বলজ্বল করছে।

—হাওয়া খাচ্ছেন বুঝি? কিন্তু বড্ড ঠাণ্ডা স্যার, অসুখ করবে। তার চাইতে চলুন না, আমার স্কুলটা দেখে আসবেন। অনেক কষ্টে একা হাতে এটাকে গড়ে তুলেছি, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ছাত্র যোগাড় করেছি। আসুন একবার দেখে যান।

আমি সভয়ে বললাম, রাত্রে কিসের স্কুল মশাই?

—আজকাল সব সময়েই স্কুল হয় স্যার। দিন রাত সব সময়। দয়া করে একবার পায়ের ধুলো দিতেই হবে। আপনাদের মতো লোককে পাওয়ার সৌভাগ্য তো আর সব সময়ে হয় না।

হেড্ মাস্টার আমার মুখের সামনে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল। চশমার পেছনে দুটি অপ্রকৃতিস্থ চোখের দৃষ্টি আমি যেন শিরাস্নায়ু দিয়ে অনুভব করতে পারলাম। একটা দুর্গন্ধ নিশ্বাস

এসে আমার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল—বন্যজন্তুর নিশ্বাসের মতো।

ইচ্ছা হল ছুটে পালিয়ে যাই—চিৎকার করে লোক ডাকি। কিন্তু ভাঙা চশমা দুটো আমার দিকে মেলা রয়েছে জ্বলন্ত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে—যেন আমাকে হিপ্‌নটাইজ্‌ করে ফেলছে।

বরফের মতো ঠাণ্ডা আর অতিকায় মাকড়শার পায়ের মতো কালো কালো কতগুলো বাঁকা আঙুলে হেড্‌ মাস্টার আমার একখানা হাত চেপে ধরলে। সমস্ত শরীরটা আমার ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু আমি কথা বলতে পারলাম না—কেবল জ্বলন্ত চশমার আড়ালে দুটো দুর্বোধ্য চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। লোকটা সত্যি সত্যিই মানুষ তো? না দূরের বাঁকের ওই শ্মশানঘাটা থেকে উঠে এল কোনো একটা অশরীরী আত্মা, মৃত বাংলার প্রেতমূর্তি?

—আসুন স্যার দয়া করে, আসতেই হবে আপনাকে।

অতিকায় মাকড়শার হিমশীতল পাগুলো হাতের উপর চেপে বসেছে—চামড়ায় খোঁচা লাগছে নখের, যেন বরফের দাঁত বসে যাচ্ছে। ছাড়িয়ে নেবার ইচ্ছে হল কিন্তু পারলাম না। পৌষের শীতের সঙ্গে ভয়ের শিহরণ মিশে গিয়ে আমার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপিয়ে দিতে লাগল।

আমি কম্পিত গলায় বললাম, কাল সকালে—

—না স্যার, কোন ওজর আপত্তি শুনব না আপনার। এক্ষুনি আসতে হবে। হাতে ধরে মিনতি করছি স্যার। বুড়ো মানুষ, আধপেটা খেয়ে ইস্কুলটাকে গড়ে তুলেছি। আপনি একবার দেখবেন না?

কেন জানি না, আমি চলতে শুরু করে দিলাম। শিশিরে ভেজা মাঠ পেরিয়ে অন্ধকার আমের বন। পায়ের নিচে ঝরা পাতা আর ধুলোর গন্ধ। বাগানটা ছাড়িয়ে আসতেই সামনে দেখা দিলে থোড়ো একটা আটচালা বাড়ি। অর্ধেকটা ধ্বসে পড়েছে—বাকিটার খড় ঝরে যাওয়া চালের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নার পাণ্ডুর আলো চিত্র-বিচিত্র একটা বিরাট বোড়া সাপের মতো ঘরের মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়েছে। হেড্‌ মাস্টার আমার হাত ধরে টেনে তারই ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমি শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পচা খড় আর গোবরের ভাপসা-গন্ধ নিশ্বাসে নিশ্বাসে টানতে লাগলাম।

—এই আমার স্কুল স্যার। সারাজীবন তিল তিল করে গায়ের রক্ত দিয়ে একে গড়ে তুলেছিলাম। বৌয়ের হার বিক্রি করে চালা উঠিয়েছি, মনে আশা ছিল দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাব, হেড্‌ মাস্টার হবো। কিন্তু স্যার, কেন এল দুর্ভিক্ষ? কোথায় গেল আমার ছাত্রেরা? না খেয়ে মরে গেল, পালিয়ে গেল শহরে। আমার সারাজীবনের সব কিছু স্বপ্ন এমন করে কে শেষ করে দিলে বলতে পারেন!

আমি কথা বলতে পারলাম না। শুধু বিস্ফারিত চোখে জ্বলন্ত ভাঙা চশমার দিকে তাকিয়ে রইলাম।—না, না, স্যার—এ হতেই পারে না। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল হেড্ মাস্টার, ভাঙা বাড়িটা আতঙ্কে যেন শিউরে উঠল: আছে, সবাই আছে। তারা কোথাও যায়নি, যেতে পারে না। আপনি শুনুন স্যার, কেমন পড়াতে পারি আমি।

ভাঙা বেড়ার গায়ে কবাটশূন্য একটা জানলার দিকে তাকিয়ে হেড্ মাস্টার শুরু করলেন: বয়েজ, আজ তোমাদের প্রিপোজিশন পড়াব। তোমরা জানো, ভালো করে যদি ইংরেজী শিখতে হয়—

আমি প্রাণপণে সংযত করে নিলাম নিজেকে। পালাতে হবে, পালাতে হবে এখান থেকে। একবার হেড্ মাস্টারের দিকে তাকালাম। যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছেন, আমার উপস্থিতির কথা ভুলে গেছেন তিনি। নিঃশব্দে রোমাঞ্চিত কলেবরে আমি বেরিয়ে এলাম, তার পরে দ্রুত পায়ে আমবাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। শুধু দূর থেকে হেড্ মাস্টারের দরদ ভরা গলা কানে আসতে লাগল: প্রথমেই ধরা যাক 'ইন' আর 'অন'। এ দুটোর ব্যবহার—

পায়ের নিচে ঝরা আমের পাতাগুলো মড়্ মড়্ করতে লাগল। যেন চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছি আমি। মনে হল, বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই—আমার ছোঁয়াতেও এখানকার সব কিছু শুচিতা মলিন হয়ে যাবে। আমি ব্রতচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর।

আমার দামী কোটের ক্রীজগুলো জ্যোৎস্নার আলোয় ঝকঝক করতে লাগল। হাকিমী জুতোর উদ্ধত পদক্ষেপে আর্তনাদ করতে লাগল ধুলোয় ভরা গ্রামের পথ। হেড্ মাস্টারের মন্ত্র উচ্চারণের মতো টানা কণ্ঠস্বর দূরে অস্পষ্ট হয়ে এল আর নদীর ওপারে কাশবনের মধ্যে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল শেয়াল।

বন-বিড়াল

মধ্যস্থ হয়ে মুশকিলে পড়ে গেছি। কোন্ দিকে রায় দিই। একদিকে জাগ্রত নারীত্বের জ্বালাময়ী রূপ, আর একদিকে বর্তমান সমাজের সব চাইতে বড় সমস্যা—সাম্যবাদ, সারপ্লাস ওয়েল্থ, সামাজিক অত্যাচার ইত্যাদি বিবিধ জটিল পরিস্থিতি আমার চিন্তায় তালগোল পাকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কিছু একটা অবিলম্বেই করে ফেলা উচিত, নইলে মান থাকে না। অতএব গম্ভীর মুখে পর পর দুটো সিগারেট নিঃশেষ করে বললুম, তাই বলে স্বামীকে ছেড়ে যাবি? হিন্দুর মেয়ে না তুই?

মেয়েটা কাঁইমাই করে উঠল। বোঝা গেল আর্যধর্মের সারগর্ভ আর্য বাক্যগুলো ওকে কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। মাথাটাকে বার কয়েক ঝাঁকুনি দিয়ে বিদ্রোহিণীর মতো সতেজ তীক্ষ্ণ গলায় জবাব দিলে, সে তুমি যাই বলো মামাবাবু, ওকে নিয়ে আমি কিছুতেই ঘর করতে পারব না।

পতি দেবতাটি ধৈর্য ধরে বসেছিল এতক্ষণ। খড়ি-ওড়া রুক্ষ শরীর, তামাটে রঙের চুলগুলোতে তেলের সংস্পর্শ ঘটেনি অনেক কাল। শ্বাপদের মতো কটা চোখগুলো একবার ধক ধক করে জ্বলে উঠল। কিন্তু লোকটা দাগী চোর, আর কিছু না হোক মনের ভাবটা গোপন করবার ক্ষমতা বহুকাল আগেই আয়ত্ত করে বসে আছে। বেশ শান্ত নিরীহ গলায় বললে, তুই চল্ না এবার ঘরে ফিরে। সত্যি বলছি আর আমি চুরি করব না। তোর জন্যই তো এ সব করি, আর শেষে তুই-ই—

মেয়েটা বললে, থাম্ আর বকিসনি। কার জন্যে চুরি করিস সে কি আমি জানি নে। সুখার বাড়িতে সারারাত ফুরতি চলে, ভালো ভালো কাপড় গয়না সবই তার পায়ে ঢেলে বসে থাকা হয়। যেদিন কিছু জোটে না, সেদিন যত ফাঁকা ভালবাসা নিয়ে—মরি, মরি, কি আমার রসের সোয়ামি রে— !

কটা চোখের আগুন আরো তীব্র, আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। যথাসময়ে সে যে স্ত্রীর মাথার একগাছি চুলও উপড়ে ফেলতে বাকি রাখবে না এটা মনশ্চক্ষে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমি। কিন্তু গলার স্বরে যেন সোহাগের মধু শতধারায় উছলে পড়ল তার : কী যে পাগলামি করিস ফুলী, কিছু ঠিক নেই তার। তুই চল্ না এইবার ঘরে ফিরে। শেষে যদি—

—কী, কী হবে ঘরে গেলে? সোনার পাটে বসিয়ে পূজো করবি, না? বেড়ার চাঁছা বাখারীগুলো তা হলে কী কাজে লাগবে? দোহাই মামাবাবু, তুমি যদি এর একটা ব্যবস্থা করে না দাও তো আত্মঘাতী হতে হবে আমাকে।

অনেকক্ষণ ধরে ফুলীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলুম আমি। কালো হলেও কুরূপা নয়, স্বাস্থ্য আর লাবণ্যের দীপ্তি সমস্ত শরীরে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে; নাকের ডগাটা কাঁপছে রোষস্ফুরিত উত্তেজনায় আর সেখানে চিক চিক করছে ছোট্ট একটা রূপার ফুল। এমন মেয়ে আত্মঘাতী হলে সংসার যে সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ কথা আমার মনে না পড়ে গেল না।

বললুম, সত্যিই তো। বছরের মধ্যে তুই ছ'মাস জেল খাটবি, বেরিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে আবার চুরি করবি, তোকে নিয়ে কোন মেয়ে ঘর্ বেঁধে থাকতে পারে তুই-ই বল্ তো মাখনা।

মাখনা এইবারে কেঁদে ফেলল। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না যে

পুরুষমানুষ কখনো ওভাবে কাঁদতে পারে। পিচুটি চিহ্নিত দুটো চোখের কোল বেয়ে তার টপ টপ করে জল পড়তে লাগল, আর মুখভঙ্গি যা হয়ে উঠল তা দেখে কুইনিন-চিবানো শিম্পাঞ্জীরও লজ্জা হবে। কাঁদবার সময় মানুষমাত্রকেই অবশ্য অত্যন্ত বিশ্রী দেখায়, কিন্তু সে বিশ্রী যে কতখানি হওয়া সম্ভব, তা মাথনাকে দেখেই অনুধাবন করা গেল। হেঁচ্‌কি ওঠার মতো শব্দ করে মাথনা কাঁদতে লাগল। তার চোখের এবং নাকের সম্মিলিত ধারার নিঃস্রাব দেখে গায়ের মধ্যে শিরশির করে উঠল আমার।

সে কান্নায় পাষাণও বোধ করি গলে তরল হয়ে যেতে পারত, কিন্তু দুলী পাষাণের চাইতেও কঠিন। কালো মুখে মারাত্মক একটা ভঙ্গি করে বললে, আর ডাক ছেড়ে মড়া-কান্না কাঁদতে হবে না তোর। সুখী তো আছেই, অমন হাউ হাউ করছিস কিসের দুঃখে!

প্রহসনের যবনিকাপাত না করলে গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারব না, মান রাখাও কঠিন হবে। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বললুম, আচ্ছা যা, এখন যা। আমি ভেবে দেখি কিছু করতে পারি কিনা।

হেঁচ্‌কি তুলতে তুলতে এবং নাক ঝাড়তে ঝাড়তে মাথনা বললে, দোহাই বাবু, আপনি যদি—

আমি ততক্ষণে এক লাফে ঘরের দরজার কাছে এসে পড়েছি! একটু হলেই খানিকটা নাসিকা-রস আমার চটিটাকে অভিষিঞ্চিত করে দিত। ত্রস্ত স্বরে বললুম, যা, যা, সে হবে এখন।

সত্যি ভাবনার কথা। উচ্চবর্ণা আর্যকন্যা হলে নানারকম অস্ত্র ছিল হাতে। দামী দামী নৈতিক উপদেশ, গীতায় থাক বা না থাক গীতার নামে খানিকটা দুর্বোধ্য অনুস্বার বিসর্গ কিংবা আদর্শ পত্নীত্বের উপাখ্যান সম্বলিত দু-চারখানা ভালো ভালো উপন্যাস কাজে লাগাতে পারতুম—চন্দ্রশেখর তো হাতের কাছে ছিলই। কিন্তু দুলী আর্যনারী নয়, ভুঁইমালীর মেয়ে। জীবনের গতিটা সরল এবং প্রত্যক্ষগোচর, পরকাল কিংবা রৌরব-নরকের বহ্নিময় বিভীষিকা দেখিয়ে তাকে নিরস্ত বা নিরস্ত্র করা যাবে না। দৈনন্দিন জগতে আমাদের আত্মঘাতী নেশাগুলোকে এখনো ঠিক মতো আয়ত্ত করতে পারেনি ওরা—তরল অবলেপের তলা থেকে ওদের অনার্য প্রাণশক্তি অনায়াসে নিজেকে অভিব্যক্ত করে; তাই পাহাড়ের উপত্যকায় সমুন্নত সরল গাছের মতো শ্যামল সুস্থতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শাস্ত্রের ঘুণ দিয়ে ওদের ভূপাতিত করা অসম্ভব।

অবশ্য স্বামী হিসাবে মাথনাও এমন কিছু শিবসাক্ষাৎ পুরুষ নয়। নামকরা চোর। পাকাপাকি বন্দোবস্ত জেলখানাতেই, তবে মাঝে মাঝে হাওয়া বদলাবার জন্য দর্শন দেয় বাইরের পৃথিবীতে। আর সেই কটা দিনেই সে বিশ্বসংসারকে উদ্ব্যস্ত করে তোলে।

দড়ির ওপর থেকে কাপড় নেই, ঘাটে ভিজানো বাসন নেই, এমন কি দিনে দুপুরে বাইরের ঘরের টেবিল থেকে থ্রী-ক্যাসলের প্রায় আস্ত টিনটাই নেই। শেষ ট্র্যাজেডিটা ঘটেছিল আমারই কপালে। অমন দামী ভার্জিনিয়া তামাক, নিশ্চয় গাঁজার কল্‌কেতেই টেনে মেরে দিয়েছে হতভাগা।

এই সব কারণে মাখনার ওপর আমি যে সুপ্রসন্ন হয়েছিলুম এমন মিথ্যে বলতে পারব না। কিন্তু নালিশ যখন এসেছে তখন একটা বিহিত করা তো নিশ্চয় দরকার। তা ছাড়া চিরন্তন নিয়ম অনুসারে স্বামী যতই দুর্বৃত্ত হোক না কেন, পুণ্যবতী স্ত্রী তার ঘর করবে, পদসেবা করবে এবং পদাহত হবে—এই হচ্ছে মনু, পরাশর, রঘুনন্দন কোম্পানির অনুশাসন।

এম.-এ. পরীক্ষার পরে তিন মাস দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। উত্তর বাংলার অজ পল্লীগ্রামের চক্ররেখা অবধি প্রসারিত ধানের ক্ষেত, চিহ্নহীন বিল আর প্রচুর বুনো হাঁস—লাল শর, কালো শর, দীঘলি, কোদালঠোঁটি, সরালী, চখাচখী, কাদাখোঁচা, রাজহাঁস। বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে সিগারেট পুড়িয়ে এবং অবসর সময়ে বিলে আর নদীতে পাখীর বংশ নির্বংশ করে কাটাব এই ছিল সংকল্প। কিন্তু এই অতি কঠিন দাম্পত্য সমস্যা আপাতত আমাকে চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল। আরো বিশেষত মাখনার কথাগুলো ঠিক এক কথায় উড়িয়ে দেবার মতো নয়, রীতিমতো কঠিন সোস্যালিজমের প্রশ্ন।

—খেতে না পেলে কী করব বাবু, চুরি করব না?

ঠিক এই প্রশ্নই বঙ্কিমচন্দ্রের বিড়াল কমলাকান্তকে জিজ্ঞাসা করেছিল। মনে এল, চুরি করাই উচিত, কিন্তু থ্রী-ক্যাসেলের শোকটা তখনো ভুলতে পারিনি। তা ছাড়া তুলীর দিকটাও বিবেচনা করতে হবে, একতরফা ডিগ্রী দিলে চলবে না। বাস্তবিক যে কোনো মেয়ের পক্ষেই চোরের ঘর করা কঠিন—তা সে ভুঁইমালীই হোক আর নমঃশূদ্রই হোক। কাজেই নারীত্ব বনাম ধনসাম্যবাদের এই সংঘর্ষে মধ্যস্থ আমি—ত্রিশঙ্কুর মতো কেবল অশ্রান্তভাবে চা আর সিগারেট ধ্বংস করে চললুম।

দিদি একদিন চটে উঠল: সব সময়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবিস কী রঞ্জন? ওদের ভাবনায় ভাবনায় তুই-ই যে সারা হয়ে গেলি দেখছি।

বললুম, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না দিদি। দাম্পত্য জীবনের কত বড় জটিল একটা—

দিদি বোমার মতো ফেটে পড়ল: হয়েছে, হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের জটিলতা কত সমাধান করে ফেলেছিস তুই। ও মুখপোড়াদের যেমন সমাজ, তেমনি স্বভাব। বিয়ে নেই, নিকে নেই, যার সঙ্গে খুশি ভিড়ে যায়। ওদের ভাবনা ভেবে মিথ্যে মাথা খারাপ করছিস কেন?

সত্যি মাথা খারাপ আমাকে আর করতে হল না। শাস্ত্র আর ন্যায়ের সর্পিল পথে ওদের ভাবনা এগিয়ে চলে না, কাজেই সমস্ত সমস্যার সমাধান ঘটাল দুলী নিজেই।

সকালবেলায় ভালো করে ঘুমটা ভাঙেনি তখনো। বাইরের জানলা দিয়ে খানিকটা সোনালি রোদ এসে বিছানার উপর পড়েছে, জানালার ওপারে সেই রোদের রঙ লেগে ঝিলমিল করছে নিমগাছের কচি কোমল পাতা। আচ্ছন্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে অর্ধচেতনভাবে ভাবছি পিগ্‌ম্যালিয়ানের কথা। দুলীকে যদি বার্নার্ড শ'র ফ্লাওয়ার গার্লের মতো আধুনিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত করে কলকাতার সভ্য সমাজের আওতায় নিয়ে ফেলা যায়, তা হলে আর কিছু না হোক তিন মাসের মধ্যেই ও যে বাংলা দেশে নতুন করে একটা সাফ্রেজিস্ট আন্দোলন অন্তত শুরু করে দেবে—এইরকম একটা কল্পনায় স্নায়ুগুলো বেশ উত্তপ্ত আর উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। শুধু সাফ্রেজিস্ট নয়—যে কোনো বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব। অনায়াসে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে লুক্সেমবার্গের মতো বলে বসতে পারত : সোস্যালিজম! ইটস্ ইন মাই ব্লাড!

কিন্তু উঠোনে শোনা গেল মাখনার তারস্বরে আর্তনাদ, আর সঙ্গে সঙ্গেই তন্দ্রার লঘু আচ্ছন্নতা, প্রগাঢ় এই সব তত্ত্বজিজ্ঞাসা—হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গেল। কেউ ওকে ধরে ঘা কয়েক লাগিয়েছে নাকি? একটা চাদর জড়িয়ে বাইরে আসতেই মাখনা হাঁউমাউ করে আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়ল।

দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বললুম, কি রে, হয়েছে কী?

সেই অপরূপ কান্না আর অমানুষিক খানিকটা ধ্বনিবিন্যাস। অনেক কষ্টে তার মর্মোদ্ধার করা গেল, দুলী চলে গেছে বাবু।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় গেছে?

—গাঁয়ের বাইরে। বীরুয়ার সঙ্গে।

—বীরুয়া? কোন্ বীরুয়া? ওই যে বাঁদর নাচায়?

—হাঁ বাবু।

কী আর বলা যায়। অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবু মাখনার অসহায় করুণ মূর্তিটা দেখে সহানুভূতি এল আমার। বললুম, চলে গেছে—তা হলে আর কী করবি। থানায় গিয়ে একটা ডাইরী করিয়ে আয় বরং, তোর বউকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।

—থানায়?—মাখনা অপ্রসন্ন আর নিরুত্তর হয়ে রইল। থানায় যাবার পরামর্শটা অবশ্য তার তেমন পছন্দ হওয়ার কথা নয়। পুলিসের সঙ্গে সম্পর্কটা লোকত শ্বশুরকুল ঘটিত হলেও ওখানকার জামাই-আদরের পদ্ধতিটা মাখনা সমর্থন করে না। তা ছাড়া আশেপাশে ঘটি বাটি চুরিরও কামাই নেই আজকাল এবং দারোগা ক্ষুধার্ত হাঙ্গরের মতো একেবারে মুখিয়ে আছে।

যাওয়ার আগে মাখনা আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল : ওকে খুন করে আমি ফাঁসি যাব বাবু।—এক ইঞ্চি প্রমাণ ময়লার কোটিং দেওয়া লাল দাঁতগুলো মুখের ভিতর থেকে যেন তাড়া করে এল আমার দিকে।

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বগতোক্তি করলুম, তাই যা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বীরুয়া!

দুলীর রুচিকে প্রশংসা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল আমার পক্ষেও। বীরুয়াকে ভাল করেই চিনি। দূর গ্রাম থেকে এসেছে, জাতে মুণ্ডা। ছিপছিপে পাতলা চেহারা, গায়ের রঙ যেন বার্নিশ করা কালো। একমাথা বাবরী চুল, চুলের সম্পর্কে ভারী সজাগ দৃষ্টি আছে তার, পথ চলতে চলতে ট্যাঁক থেকে একটা ছোট্ট চিরুনি বের করে সযত্নে আঁচড়ে নেয় মাথাটা। গলায় লাল কাঁচের মালা, দু হাতে দুটো চাঁদির বালা ঝোড়ো মেঘে বিদ্যুতের মতো কালোর পটভূমিতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। একটা ছোট্ট কঞ্চি দুলিয়ে তারই তালে তালে বানর নাচায়, গুনগুন করে গান গায় :

'আগন মাসে ধান কাটে ফাগুন মাসে বিয়া,
বুধু, নাচ করো—'

ফাল্গুন মাসে বিবাহের শুভ-সম্ভাবনায় আনন্দে বুধুর নৃত্যকলা উদ্দাম হয়ে ওঠে। পায়ের ঘুঙুর বাজতে থাকে, পরনের লাল নীল ঘাগরাটা কখনো ঘোমটার ভঙ্গিতে মাথায় তুলে দেয়, কখনো সেটাকে হাতে ধরে যাত্রার সখীর মতো নাচে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে পটাপট গায়ের এখান ওখান থেকে উকুন ধরে উদরসাৎ করে। তারপর চৌকিদার হয়, বুড়ো সেজে তামাক খায়, বীরুয়ার হাতের কঞ্চিটা একলাফে ডিঙিয়ে হনুমানের মতো লঙ্কা পার হয়। অবশেষে নতজানু হয়ে বাবুদের কাছে ভিক্ষা চায়, খাবার চায়।

আমাদের বাড়িতেই তো বীরুয়া কতবার আসে বানর নাচাতে। একে ভিনদেশী লোক, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি। বাংলায় একটা শব্দ উচ্চারণ করতে তিনবার হোঁচট খায়। তা ছাড়া বানর নাচিয়ে যা রোজগার করে তাতে ওর নিজের পেটই চলে কিনা এ বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। কী সুখের আশায় দুলী গিয়ে ওর সঙ্গে ঘর বাঁধল।

মনে মনে বললুম, ভালোবাসার ধর্মই তো এই। চূড়ান্ত আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই উদ্‌যাপিত হয় তার অতি কঠিন ব্রত। মাখনার কাছে থাকলে অন্নবস্ত্রের ভাবনা ছিল না কিন্তু সেখানে ওর নারীত্ব পদে পদে খর্ব হত, লাঞ্ছিত হত। তাই সমাজ-সংসার-জাতি-ধর্ম সব বিসর্জন দিয়ে সর্বত্যাগের মধ্যে ওর নারীত্ব মুক্তির পথ খুঁজে নিয়েছে।

আর্যকন্যা এবং আর্যবধূ দিদিকে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করেও পারা গেল না। একটু ফলাও করে জিনিসটা বিশদ করবার চেষ্টা করতেই সে আমাকে একগাছা লাঠি নিয়ে তাড়া করলে, মন্তব্য করলে : অমন নারীত্বের গলায় দড়ি।

দুলীর কিন্তু লজ্জা নেই, সঙ্কোচও নেই ; জীবনে যাকে সে বরণ করে নিয়েছে, অত্যন্ত অনায়াসেই দু দিনের মধ্যেই সে তার যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠল। কালোপাড় শাড়িটাকে বিসর্জন দিয়ে পরলে বেদের মেয়েদের মতো রঙচঙে বাহারে কাপড়, গায়ে পাতলা ওড়না। বেণীটাকে ইরাণী মেয়েদের মতো ঝুলিয়ে দিলে পিঠের ওপর। গলায় পরলে কাঁচের মালা, হাতে কাঁচের চুড়ি। এমন কি বাংলা বলার কায়দাটাকে অবধি রপ্ত করে নিলে বীরুয়ার মতো।

অত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, স্বামী ছেড়ে বাসা বাঁধল একটা সমাজহীন, গোত্রহীন যাযাবরের সঙ্গে কিন্তু কোনোখানে এতটুকু চিহ্নও পাওয়া গেল না তার। শেষে একদিন আমাদের বাড়িতে বানর নাচাতে এল। একাই।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে পা তুলে আরাম করে বসে আমি তখন একটা পৃথুলকায় পূজা সংখ্যা পড়ছিলুম। টুমটুমির শব্দে চমকে বই সরিয়ে দেখলুম দুলীকে। নতুন বেশেবাসে তন্বঙ্গী মেয়েটাকে চমৎকার মানিয়েছে। স্বচ্ছ ওড়নার অন্তরালে রাঙা কাঁচুলির আভাস, ঘাগরার মতো করে পরা ছাপা শাড়িটা নেমে এসেছে পায়ের পাতা পর্যন্ত। আমাকে দেখে কালো মুখের ভেতর থেকে একঝলক শুভ্র সুশ্রী হাসি ঝরিয়ে বললে, বানর নাচ দেখবি মামাবাবু ?

গা জ্বলে গেল। বললুম, লজ্জা করে না তোর ?

দুলী একবার একগাল হাসল। বললে, লজ্জা ভদ্দরলোকের, লজ্জা করলে কি আমাদের পেট চলে ?

বললুম, হলই বা চোর। কিন্তু তোর সোয়ামী তো বটে। তাকে ফেলে একটা ভবঘুরের সঙ্গে—

কথাটা শেষ করবার আগেই দুলী প্রবল শব্দে টুমটুমি বাজাল—টুম্ টুম্ টুমটাম্। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ততক্ষণে চারিদিক থেকে এসে ভিড় জমিয়েছে বানর নাচ দেখবার জন্য। আমার কথাটাকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বললে, বুধু, নাচ করো।

বললুম, মাখনা কী বলেছে জানিস ?

দুলী এবার দুষ্টুমিভরা তরল চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপর বুলিয়ে নিয়ে হাসিমুখে গান ধরলে, 'আগন মাসে ধান কাটে, ফাগুন মাসে বিয়া—'

আমি বললুম, ফাগুন মাসে তো বুধুর বিয়ে হবে, কিন্তু মাখনা বলেছে তার আগেই তোকে খুন করে সে ফাঁসি যাবে।

ডুলী অপরূপ ভ্রূভঙ্গি করলে, তার চোখে সেই দুষ্টুমিভরা কৌতুক ঝলমল করছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে যা বলতে যাচ্ছিলুম সব খেই হারিয়ে গেল! আবার মনে পড়ল বার্নার্ড শ'র সেই পিগ্‌ম্যালিয়ন। কালো হলেও কৃষ্ণকলি, আর চোখের দৃষ্টিটা হরিণীর নয়, ব্যাধের। সভ্য সমাজের আওতায় গিয়ে পড়লে ও যে দুদিনেই সেখানে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র রইল না।

টুমটুমির তালে তালে গান চলতে লাগল। ঢংটা বীরুয়ার, কিন্তু এমন মধুক্ষরা কণ্ঠ বীরুয়া কোথায় পাবে। মনে হল ডুলীকে পাঠিয়ে বীরুয়া বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। আগের চাইতে এখন তিনগুণ রোজগার হবে নিশ্চয়।

বুধু নেচে চলেছে পরমানন্দে। শুধু আগন মাসে ধান আর ফাগুন মাসে বিয়েই নয়, ঘর-সংসার পেতে বসলে আরো ঢের ভালো ভালো জিনিসের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে :

'হাটের চুচুরা মাছ, বাড়ির বাইগন,
তাই খায়্যে বুড়াবুড়ীর নাচন কোন্দন,
বুধু নাচ করো—'

হাটের চুচুরা মাছ আর বাড়ির 'বাইগনে' নিশ্চয় চমৎকার তরকারী রান্না হবে। কিন্তু তার চাইতেও বানর যে নাচাচ্ছিল, তাকেই বোধ করি বুধুর পছন্দ হয়েছিল বেশি। অন্তত আমার তাই মনে হল। নাচের ভঙ্গিটা অত্যন্ত প্রসন্ন আর স্বাভাবিক, বীরুয়ার হাতের যে উদ্যত কঞ্চি তাকে নৃত্যকলায় প্রবুদ্ধ করে, তার সঙ্গে এই 'কঙ্কণ-ঝঙ্কৃত' নাচের কোথায় যেন একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে।

নাচ এবং নানা রকমের খেলা দেখিয়ে বুধু নতমস্তকে আমার সামনে হাত পাতল। নীলচে চঞ্চল চোখ দুটো অদ্ভুতভাবে মিটমিট করছে।

ডুলী বললে, বুধুকে বকশিশ দাও বাবু।

পকেট থেকে একটা সিকি ডুলীর গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললুম, নে, পালা।

চটুল চোখের দৃষ্টিটা আরো তরল, আরো মদির করে ডুলী বিচিত্র ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল। তারপর দড়িসুদ্ধ বুধুকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, চলি মামা-বাবু, সেলাম।

পরধর্ম গ্রহণ করবার ক্ষমতাটা মেয়েদের বিস্ময়কর। আগে বলত, প্রণাম।

পনেরো দিন, এক মাস, দুই মাস। সব সহজ হয়ে এল। যেদিন খুশি আসে, বানর নাচায়, দাবি করে বেশি বকশিশ নিয়ে যায়। কোনোদিন বীরুয়া সঙ্গে আসে, কোনোদিন একা।

মাখনাও অবশ্য বিব্রত করে যায় মাঝে মাঝে, ডুলীর আশা ছাড়তে পারেনি

এখনো। কিন্তু দিন কয়েক আগে সিঁদ কাটতে গিয়ে ধরা পড়েছে এবং কোমরে দড়ি পরে সদরে চালান হয়ে গেছে। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে দিয়েই সদরের রাস্তা। যাওয়ার আগে হতভাগা হাতকড়াবাঁধা অবস্থায়ই আমাকে একটা প্রণাম জানিয়েছে, একগাল হেসে বলেছে, দিন কয়েক বেড়িয়ে আসতে চললাম, মামাবাবু, আপনি একটু দুলীকে বুঝিয়ে বলবেন।

দুলীকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা অবশ্য করিনি। তবে নিশ্চিন্ত হয়েছি একদিক থেকে। থ্রী-ক্যাসেলের টিনটা নির্ভয়ে বাইরের বারান্দার টেবিলেই রাখতে পারি আজকাল। তা ছাড়া সকালে উঠেই মাখনার সেই বিলাপ ও বিক্ষোভ শুনতে হবে, এটা প্রায় রাত্রের দুঃস্বপ্ন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রণামের বিনিময়ে মনে মনেই আশীর্বাদ জানালুম, দোহাই ঈশ্বরের, জেল থেকে তুমি আর এ যাত্রা ফিরে এসো না বাপু।

কিছুদিন পরে দুলী একাই আসে বানর নাচাতে, বীরুয়াকে আর সঙ্গে দেখি না। ঠাট্টা করে একদিন বললুম, কিরে, বীরুয়া সঙ্গে এলে বুঝি রোজগার ভাল হয় না?

ইঙ্গিতটা কিন্তু দুলী লক্ষ্য করলে না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ভারী গলায় জবাব দিলে, মরদটার বিমার হয়েছে বাবু।

—অসুখ হয়েছে? কী অসুখ?

তেমনি ভারী গলায় দুলী বললে, তা জানি না বাবু। রোজ বোখার হয় আর ভারী দুব্‌লা হয়ে গেছে। রহিম কবিরাজের দাওয়াই তো খিলাচ্ছি, তবু—

বললুম, যেমন মাখনাকে অকূলে ভাসিয়ে চলে এসেছিস, তেমনি মাখনার শাপে—

দুলী চোখ দুটো বড় বড় করে আমার দিকে তাকাল। দেখলুম, সে চোখে তির্যক তীক্ষ্ণ কটাক্ষচ্ছটা নেই, স্নায়ুকে উদ্বেল করে তোলবার কোন আমন্ত্রণ নেই। শুধু দু ফোঁটা জল তার দুই প্রান্তে টলমল করছে।

নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। তারপর বুধুকে কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, চল্।

কেমন একটা বিশ্রী অস্বস্তি আর অনুতাপে বিস্বাদ হয়ে গেল মন। ভাবলুম, ওকে ডাকি, একটা টাকা বকশিশ দিয়ে খুশি করে দিই। কিন্তু দুলী তখন হন হন করে অনেকটা এগিয়ে গেছে, তার রঙীন শাড়ির আঁচলটা বাতাসে উড়ছে পলাতক প্রজাপতির প্রসারিত পাখনার মতো।

তারই দিনকয়েক বাদে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে দিদি এসে দর্শন দিলে।

—রঞ্জন, এর তো একটা বিহিত করতে হয় ভাই।

চমকে বললুম, কিসের বিহিত করতে হবে?

—বন-বিড়ালের। কবুতরগুলোকে সব শেষ করে দিলে। বিয়াল্লিশটা ছিল, আজ খান

খাওয়ার সময় গুণে দেখি মোটে চব্বিশটা।

ব্যাপারটা অত্যন্ত ক্ষোভেরই বটে। কবুতরের প্রতি দিদির অত্যন্ত পক্ষপাতিত্ব—এমন কি নিজের ছেলেমেয়েদের চাইতেও। বাইরের বারান্দায় অসংখ্য ঝুড়ি, ভাঙা কলসী আর কেরোসিন কাঠের বাক্স ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর দিদির পোষা কবুতরেরা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সেই সব ঝুড়ি কলসীর রাজ্যপাট ভোগদখল করে আসছে। দিদির মেজ ছেলে পার্থসারথি ওরফে খোকা সেই রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক। রোজ সকালে মই বেয়ে উঠে সে প্রজাবর্গের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। আর সচিৎকারে ঘোষণা জানায়ঃ মা, আরো তিনটে ডিম হয়েছে ছিটকপালীর বাক্সে। চাঁদা গলীর (গলায় চাঁদ যে কবুতরীর) বাচ্চা দুটো বোধ হয় দু'তিনদিনের মধ্যেই উড়তে পারবে--

সকালে খবরের কাগজ পড়বার মতো কবুতরদের খবরাখবর নেওয়া দিদির প্রাত্যহিক নেশায় দাঁড়িয়েছে। বাড়ির আর সবাই যে এই বিষয়ে সহানুভূতি পোষণ করে এমন মনে করবার কারণ নেই। বিশেষ করে বাইরের দেওয়াল এবং বারান্দাটার যে অবস্থা তারা করে রেখেছে তা আদর্শ গৃহস্থালীর অনুকূল নয়। কিন্তু কেউ যে এতটুকু প্রতিবাদ জানাবে তার সাধ্য কি? দিদির ধারণা ওরা লক্ষ্মীর বাহন এবং যতদিন ওরা থাকবে ততদিন লক্ষ্মীও অচলা এবং অনড়া হয়ে থাকবেন। সেইজন্যই রোজ সকালে আধ সের ধান খাইয়ে এবং যথাসাধ্য পরিচর্যা করে ওদের খুশি রাখবার চেষ্টা চলছে।

জামাইবাবু যেমন শক্তিমান, তেমনি মাংসাশী পুরুষ। পায়রা পোষবার ব্যাপারে বিশেষ আপত্তি নেই, তবে সামান্য একটু সংশোধন প্রস্তাব তাঁর ছিল। সেটা গুরুতর কিছু নয়, মাঝে মাঝে দু-চারটেকে ধরে ব্রাহ্মণ-সেবায় লাগালে ধানের অন্তত কিছুটা প্রতিদান পাওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া বংশবৃদ্ধির ব্যাপারে তো দেখা যাচ্ছে ওরা মহাভারতোক্ত সগর রাজাকেও পাল্লা দিচ্ছে, অতএব—

অতএব অতিশয় প্রচণ্ড এবং আমাদের পক্ষে অতিশয় উপভোগ্য একটা দাম্পত্য কলহের মধ্যে ব্যাপারটার পরিণতি হয়েছে। মাংসলোভী স্বামীর অভব্য বুভুক্ষা দেখে দিদি চটে-মটে সেই দিনই একটা মহাকায় খাসী আনিয়ে তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে। অখণ্ড মনোযোগ সহকারে এবং নীরবে একাই সের তিনেক মাংস নিঃশেষ করে জামাইবাবু দিদিকে আশীর্বাদ করেছেন, হে সাধ্বি, আশীর্বাদ জানাচ্ছি তুমি রাজ-মহিষী হও।

রাগের ওপরেও দিদি হেসে ফেলেছে, আশীর্বাদ আমাকে, না নিজেকেই?

—একই কথা। 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে'।

দিদির নাম সতী।

সেই কবুতর—ইতিহাসখ্যাত সেই কবুতরগুলো দিনের পর দিন কমে আসছে। এক-আধটা নয়, বেয়াল্লিশটা থেকে চব্বিশটায় দাঁড়িয়েছে—অর্থাৎ বন-বিড়াল হানা দিচ্ছে

রাত্রিতে। এতগুলো সবই যে বন-বিড়ালে খেয়েছে তা নয়, বেশির ভাগই ভয় পেয়ে পালিয়েছে। অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা না করলে দিদির ঝুড়ি-কলসীর রাজ্য তিনদিনেই জনশূন্য, মতান্তরে আপদশূন্য হয়ে যাবে।

দিদি প্রায় কাঁদবার উপক্রম। বললে, একটা ব্যবস্থা কর রঞ্জন। গত বছরেও এমনি উপদ্রব শুরু করেছিল। তারপর থানায় হাঁস খেতে গেলে দারোগাসাহেব সেটাকে গুলি করে মারে। সেই থেকে এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলুম। হতভাগা আবার কোথা থেকে এসে জুটেছে, এটাকে না মারলে তো আর—

নারীর অশ্রু দেখে বীরত্ব জেগে উঠল। বললুম, আচ্ছা ব্যবস্থা করছি।

যে কথা, সেই কাজ। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বাইরের বারান্দায় এসে গুটিসুঁটি হয়ে বসলুম। সিগারেটের টিন, গায়ে মোটা ওভারকোট। হেমন্তের শিশিরস্নাত আকাশ থেকে বেশ শীতের আমেজ নেমেছে। তা ছাড়া ওপারেই দিগন্তপ্রসারিত শূন্য মাঠ—সেখান থেকে হু হু করে বাতাস আসছিল।

গ্রীনারের বন্দুকটা হাতের কাছেই তৈরি আছে। অন্ধকারে ঝক্ ঝক্ করছে ব্যারেলের দামী ইস্পাত। দুটো নলেই টোটা পুরে রেখেছি—বুলেট নয়, বী-বী। বুলেট মিস করতে পারে, কিন্তু বী-বীর দু-চারটে ছর্‌রা অন্তত লাগবেই এবং একটা বন-বিড়ালকে ঠাণ্ডা করতেই ছর্‌রাই যথেষ্ট।

বন্দুকের কুঁদোটা মাঠের খোলা হাওয়ায় যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে আছে। ওভারকোটে পা ঢেকে ইজি-চেয়ারে ঘনীভূত হয়ে বসলুম। বাড়ির সব ঘরগুলো অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গেছে, শুধু হিন্দুস্থানী চাকর মিশিরের নাসিকা-মন্দ্র নিদ্রা-জগৎ থেকে কী একটা বাণী বহন করে আনছিল। আমারও দুই চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে, কিন্তু ঘুমোনোর জো নেই। দৃষ্টিকে সজাগ আর প্রখর করে রেখেছি—বন-বিড়াল একবার এলেই হয়। একটা সিগারেট টানবার দুর্জয় প্রেরণাতেও গলাটা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে, কিন্তু আগুনের সামান্য একটু দীপ্তি দেখলেও বন-বিড়াল এদিকে আর পা দেবে না। শেয়ালের চাইতেও সতর্ক এবং ধূর্ত—সামান্য ইঙ্গিত পেলেই বাতাসের মতো নিঃশব্দে মিলিয়ে যাবে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। একটুকরো চাঁদ আকাশের সীমান্ত রেখায় কখন ডুব মেরেছে, কালো রাত্রির পর্দায় সমস্ত ঢাকা। অন্ধকারে সজাগ চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছি কবুতরের বাক্সগুলোর দিকে। কখনো কখনো বক্‌বকম স্বরে বিহ্বল কূজন শোনা যাচ্ছে, কখন বা আকস্মিক পাখার ঝট্‌পটি। চম্‌কে বন্দুক তুলেই নামিয়ে রাখছি, উত্তেজনায় ছলকে উঠছে বুকের রক্ত।

ঢং ঢং করে বাড়ির ভেতরে ক্লক সাড়া দিয়ে উঠল। দুটো। তাহলে আজ আর বন-

বিড়াল আসবে না, রাত জাগাই বৃথা। এইবারে উঠে শুয়ে পড়া যাক।

কিন্তু ও কী!

অন্ধকারে কী একটা চতুষ্পদ জীব এগিয়ে আসছে নিঃশব্দে। যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, তাতে তো বন-বিড়াল বলে মনে হচ্ছে না। তবে কি শেয়াল? কিন্তু এ তো শেয়ালের চাইতেও বড়। তবে—তবে কি চিতাবাঘ?

ভয়ে সারা গা ছমছম করে উঠল। বাঘ আসা আশ্চর্য কী। কয়েক মাইল দূরেই তো সিংহাবাদের হিজলবন, বাঘ আর সাপের আস্তানা। ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম জানোয়ারটা তেমনি নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। শুনেছিলুম, অন্ধকারে বাঘের চোখ আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলে, কিন্তু এর চোখ তো এতটুকুও জ্বলছে না। তা হলে?

উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, হিম হয়ে গেল বুকের রক্ত। কম্পিত হাতে বরফের মতো ঠাণ্ডা বন্দুকটা হাতে তুলে নিলুম—গ্রীনারের অগ্নি-গর্জন এক মুহূর্তে জাগিয়ে দিলে বাড়িটাকে।

এক গুলিতেই পড়েছে জানোয়ারটা—চিৎকার করে উঠেছে মর্মান্তিক যন্ত্রণায়। কিন্তু বাঘের গর্জন তো নয়, এ যে মানুষের গলা।

—দুলী!

হ্যাঁ, ব্যাপারটা যত অবিশ্বাস্যই হোক, দুলীই বটে।

গুলিটা ভাগ্যে বুকে লাগেনি, নইলে আমাকে ফাঁসি যেতে হত। কিন্তু বাঁ হাতখানা এমন জখম হয়েছে যে সারা জীবন তা অকর্মণ্য হয়ে থাকবে। বন্দুকের লক্ষ্য আমার সত্যিই ভালো নয়, কিন্তু সেজন্যে আপাতত অনুতাপ বোধ হচ্ছে না।

বীরুয়ার অসুখ খুব বেশি। কবুতরের সুরুয়া নিয়মিত খাওয়াতে পারলে গায়ে বল পারে এই হচ্ছে রহিম কবিরাজের বিধান। তাই দুলী এইভাবে রোজ রাত্রে বীরুয়ার জন্যে কবুতর সংগ্রহ করতে আসত।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। মাখন চোর বলে দুলী তার ঘর ছেড়েছিল, আর বীরুয়ার জন্যে চুরি সে নিজেই করতে এল। তা হলে সেটা কি মাখনকে ছেড়ে আসবার একটা সাময়িক ছুতো মাত্র? অথবা বৃহত্তর প্রেমের কাছে সে নিজের সমস্ত আদর্শকেই আজ নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে বসে আছে?

পাঁচ সের চুনের বায়না। ভোমরার হাতখানা একটু বেশি পরিমাণে ছুঁয়েই এক টাকার নোটখানা গুঁজে দিয়েছে হরিলাল। চমকে ভোমরা তিন পা পিছিয়ে গেছে, নোটখানা উড়ে গেছে হাওয়ায়। মৃদু হেসে সেখানা কুড়িয়ে এনে চালের বাতায় রেখে দিয়েছে হরিলাল। তির্যক কটাক্ষ হেনে বলেছে, মনে থাকে যেন, সাতদিন পরেই কিন্তু বিয়ে।

হরিলাল গ্রামের তালুকদার। জমি আছে, পয়সা আছে। কারবার তো আছেই। যুদ্ধের বাজারে আরো কতদূর কী করেছে ভগবানই জানেন। সুতরাং কুড়ি টাকার চালের দিনেও সে ভালো করেই মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। অনেক বরযাত্রী আসবে, গাঁয়ের বহু লোকের পাত পড়বে তার বাড়িতে। পাঁচ সের চুনের কমে এত বড় একটা ক্রিয়াকাণ্ড হওয়া শক্ত। সের প্রতি আট আনা দর সে দিতে চায়, সুতরাং ভোমরাকে একটু বেশি করে স্পর্শ করবার অধিকার তার নিশ্চয় আছে।

কিন্তু ভোমরা ছেলেমানুষ। অধিকার অনধিকারের ব্যাপারগুলো এখনো সে ভালো করে বুঝতে পারে না। হরিলালের লোলুপ চোখ আর অনুভূতিপ্রখর স্পর্শে তার সমস্ত শরীর শিরশির করে শিউরে উঠল। খেতু বাড়িতে নেই,দূরের ইস্টিশানে সোয়ারী নামিয়ে দিতে গেছে। এমন সময় হরিলালের আবির্ভাবটা তার ভালো লাগল না। সংকীর্ণ জীর্ণ কাপড়ের প্রান্ত আকর্ষণ করে ঘোমটা দেবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলে।

হরিলাল চেহারায় খাটো। হালে ঠিক ব্রহ্মতালুর ওপরে চিকচিকে একটা টাক নিশানা দিয়েছে। মোটা আর ছোট ছোট হাত পা—আঙুলগুলো সব সময়ে চঞ্চল, কখনো স্থির থাকতে পারে না। মনে হয় তারা যেন সদা-সর্বদা কী একটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টায় আছে। একবার পেলে আর ছাড়বে না, লোলুপ মুষ্টির ভেতর নিঃশেষে সেটাকে নিষ্পেষিত করে ফেলবে। এক হিসাবে অনুমানটা নির্ভুল। হরিলালের হাতের ভেতর যা একবার এসে পড়েছে তাকে আর কখনো সে ছাড়েনি—খত নয়, জমি নয়, নারীও নয়।

হরিলাল চলে গেলে ভোমরা আরো কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এ গাঁয়ের অন্যান্য ভুঁইমালী মেয়েদের মতো চুন সেও তৈরি করে কিন্তু আর সকলের মতো কখনো হাটে বিক্রি করতে যায় না। খেতুই যেতে দেয় না তাকে। ভোমরাকে বিয়ে করেছে এই সেদিন, এখনো নেশা কাটেনি। একহাট লোকের ক্ষুধিত দৃষ্টির সামনে বসে সে বেচাকেনা করবে, ভুঁইমালীর ছেলে খেতুও এটাকে বরদাস্ত করতে পারে না।

কিন্তু পাঁচ সের চুনের বায়না তাকে নিতেই হবে। ধানের দর এবারেও গত বৎসরের

মতো বেড়ে চলেছে ধাপে ধাপে। এ জেলাটা পুরোপুরি দুর্ভিক্ষের এলাকায় পড়ে না, তবু ঘটিবাটি আর রূপার খাড়ু বিক্রি করে গত বছর পেটের দাবি মিটাতে হয়েছে। খেতুর জমি নেই, আধিও নেই, সোয়ারী বয়ে দিন কাটে। গাড়িভাড়া পাঁচ থেকে দশ টাকায় উঠেছে বটে কিন্তু জিনিসপত্রের দামও বেড়েছে পাঁচগুণ। যথাসর্বস্ব বিক্রি করে দিয়ে গেল বছর ওরা বর্ষাকালের ধকল সামলে নিয়েছে, কিন্তু সে দুর্দিন যদি এবারেও দেখা দেয় তা হলে প্রাণ বাঁচাবার কোনো পথই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সোয়ারী বয়ে খেতু যখন গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌছল, বেলা তখন দুপুর। শান দেওয়া ছুরির মতো রোদ ঝলকাচ্ছে মাথার ওপর। নির্মল আকাশে প্রখর রোদ যেন সমস্ত পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে—হঠাৎ তাকালে চোখে ধাঁধা লেগে যায়, মনে হয় পূব থেকে পশ্চিম অবধি সবটা যেন জ্বলন্ত একটা কাঁসার পাত দিয়ে মোড়া। জ্যৈষ্ঠ শেষ হয়ে যায় অথচ মেঘের চিহ্ন নেই কোথাও। দূরে বাবলা গাছগুলোর অপ্রচুর পাতা রোদের তাপে ঝলসে ঝরে পড়েছে—যেন আগুনে পোড়া কতগুলো এলোমেলো ডালপালা শস্যহীন মাঠের মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

ময়লা গামছায় কপালের ঘাম মুছে প্রাণপণে 'শাঁটা' হাঁকড়ালে খেতু। 'ডাঁ-ডাঁ-ডড়াঁহিন'। অস্থিসার গোরুর পাতলা চামড়ার ওপর শাঁটার দগদগে রক্তচিহ্ন ফুটে উঠেছে একটার পর একটা। বাঁ দিকের গোরুটার কাঁধের ওপর জোয়ালের ঘষায় অনেকখানি জায়গা নিয়ে ঘা হয়ে গেছে, সেখান থেকে এখন ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে রক্ত। ডাঁশের দল সেখানে পরমানন্দে ভোজের আসর বসিয়েছে, আর মর্মান্তিক যন্ত্রণায় গোরুটা এক একবার থমকে থেমে দাঁড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করছে।

কিন্তু গোরুর প্রতি দরদের চাইতে প্রয়োজনের তাগিদ অনেক বেশি। ভোরবেলা সোয়ারীকে ইংরেজ বাজারের রেলগাড়িতে তুলে দিয়ে খেয়েছে চার পয়সার 'লাহরী', আর খেয়েছে টাঙ্গন নদীর একপেট জল। অসহ্য ক্ষিদেয় পেটের নাড়ীভুঁড়িগুলো জড়াজড়ি করছে একসঙ্গে। রাত্রিজাগরণক্লান্ত চোখের পাতাদুটো অস্বাভাবিক ভারী হয়ে উঠেছে। আড়ষ্ট একটা আচ্ছন্নতায় শরীর ঢুলে পড়তে চাইছে, কিন্তু ডাঁশ তাড়াবার জন্যে ব্যগ্রকাতর গোরুর লেজের ঘা চটাস্ চটাস্ করে চাবুকের মতো পায়ে লাগতেই চটকা ভেঙে যাচ্ছে। স্বপ্নের মতো মনে পড়ছে ঘরে ভোমরা ভাত-বেড়ে নিয়ে তার প্রতীক্ষায় পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

'ডা-ডা-ডড়াঁহিন মহামাই'—শাঁটা উদ্যত করেই খেতুর হাত নেমে এলো আপনা থেকে। সত্যিই কষ্ট হয় গোরু দুটোর দিকে তাকালে, দু'বছর আগে কী চেহারা ছিল ওদের, আর কী হয়ে গেছে। খেতে পায় না। যে গোরু আগে এক দমে পনেরো ক্রোশ

পথ অক্লেশে পাড়ি দিয়ে যেত, তারা আজকাল তিন ক্রোশ রাস্তা না হাঁটতেই এমন করে ঝিমিয়ে আসে কেন তার খবর খেতুর চাইতে বেশি করে আর কে জানে!

সামনে তালদীঘি। আমের বন, মহুয়ার গাছ, তালের সারি। এতক্ষণে যেন চোখ জুড়িয়ে গেল। তালদীঘির কালো জল। অপরিসীম স্নিগ্ধতায় যেন ডাকছে হাতছানি দিয়ে —ঠিক যেন ভোমরার শান্ত দুটি কালো চোখের মতো। জল আর ছায়ার ছোঁয়ায় বাতাসের স্পর্শও মধুর আর শীতল হয়ে উঠেছে। এইখানে গাড়িটাকে খানিকক্ষণ জিরেন দিলে মন্দ হয় না। অন্তত বলদ দুটোকে একটু জল খাওয়ানো দরকার।

একপাশে মুচিপাড়া। এখানে এসে খেতু মাঝে মাঝে আড্ডা দিয়ে যায়, নীলাই মুচির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব বহুকালের। এখানে এসে গাড়ি থামানোর পিছনে সে আকর্ষণটাও আছে, অন্তত এক ছিলিম তামাক টেনে যাওয়া চলবে।

জোয়াল নামিয়ে প্রথমে বলদ দুটোকে ছেড়ে দিলে খেতু। তারপর বালতি করে জল নিয়ে এল তালদীঘি থেকে। গোরুগুলো এক নিঃশ্বাসে সে জল নিঃশেষ করে দিলে—বুকের ভেতরটা তৃষ্ণায় যেন শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে ওদের। ততক্ষণ গাড়ির পেছন থেকে কয়েক আঁটি পোয়াল টেনে নামিয়েছে খেতু, কৃতজ্ঞ এবং বেদনার্ত চোখে তার দিকে একবার চেয়ে অনিচ্ছুকভাবে ওরা খড় চিবুতে শুরু করে দিলে। ভাবটা এই, শুকনো খড় যে এখন গলা দিয়ে নামতে চায় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল খেতুর। খইল, ভুষি, কলাই ডালের খিচুড়ী—সে সব এখন গত জন্মের স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষই না খেয়ে মরে যাচ্ছে তো গোরু। আস্তে আস্তে সে এসে মুচিপাড়ায় পা দিলে।

ঘরের দাওয়াতেই নীলাই বসে আছে। মাথার চুলগুলো বড় বড়, চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। বললে, মিতা যে, আয় আয়। তালদীঘির পাড়ে দেখলাম গাড়ি থামল একখানা। তোর গাড়ি যে, বুঝতে পারিনি।

আশ্চর্য নিরুৎসুক কণ্ঠ নীলাইয়ের। কথা বলছে যেন নিজের সঙ্গে—নিজের মনে মনেই। তার কথার কোন লক্ষ্য বা উপলক্ষ নেই। সে খেতুর দিকে তাকিয়ে আছে কিংবা তার পেছনে তালদীঘির দিকে অথবা তারও পেছনে রৌদ্র-ঝকিত দিগন্তের দিকে, কিছুই স্পষ্ট করে বোঝা যায় না যেন।

সবিস্ময়ে খেতু বললে, তোর কী হয়েছে মিতা।

—আমার? অত্যন্ত শূন্য খানিকটা হাসি হাসল নীলাই।—আমার কিছু হয়নি।

—কিছু হয়নি তো অমন করে বসে আছিস কেন?

নীলাই আবার তেমনিভাবে তাকাল খেতুর দিকে—অথবা খেতুর ভেতর দিয়ে লক্ষ্যহীন সীমাহীন অনিশ্চিত কোনো একটা দিগন্তের দিকে। বললে, ঘরে একরত্তি চামড়া

নেই, কাল থেকে হাঁড়ি চড়েনি। বউকে পাড়ায় পাঠিয়েছি চালের চেষ্টায়। আর বসে বসে ভাবছি মানুষ না হয়ে যদি গোরু ঘোড়া হতাম তা হলে মাঠের ঘাস পাতা খেয়েও বেঁচে থাকা চলত।

একছিলিম তামাক চাইবার কথা খেতুর আর মনে পড়ল না। তার ঘরে আজও খাবার আছে, কিন্তু—দু'দিন পরে তার অবস্থাও যে এমন দাঁড়াবে না কে বলতে পারে! ধানের দর তো বেড়েই চলেছে। নীলাইয়ের পাশে বসতে তার ভয় করতে লাগল। কী অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে নীলাই—যেন মরা মানুষের চোখ। সে চোখ দুটো ক্রমাগত বলছে—

খেতু দাঁড়িয়ে উঠল। কোনো কথা তার মনে এল না, একটা সান্ত্বনা নয়, একটা আশ্বাসের বাণীও নয়। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে বললে, আমি যাই।

—যাবি? দুটো টাকা দিয়ে যা মিতা। সোয়ারী বয়ে এলি, ভাড়ার টাকা নিশ্চয় পেয়েছিস। কাল শোধ দিয়ে দেব, আজই কিছু চামড়া আসবার কথা আছে।

চামড়া আসবে কিনা অথবা কাল টাকা সে সত্যিই শোধ দেবে কিনা সে জিজ্ঞাসা খেতুর মনে এল না। আপাতত যেন এই লোকটার হাত থেকে সে নিষ্কৃতি চায়। ট্যাঁক থেকে দুটো টাকা বের করে নীলাইয়ের হাতে তুলে দিলে খেতু।

কালো কালো ময়লা দাঁত বের করে নীলাই খানিকটা নির্জীব হাসি হাসল। বললে, বাঁচালি মিতা। কাল ঠিক শোধ দিয়ে দেব কিন্তু।

—দীঘির পাড়ে দুটো বলদ কার? তোর বুঝি?

—হাঁ, আমার।

—ঈ-স, কী চেহারা ও দুটোর!

নীলাইয়ের ধোঁয়াটে মৃত চোখ দুটো যেন পলকে জীবন্ত হয়ে উঠল: ওরা তো আর বেশিদিন বাঁচবে না। যদি মরে যায়, চামড়া দুটো আমাকে দিস তাহলে। ভুলে যাসনি যেন। দিবি তো?

মুহূর্তের মধ্যে ক্রোধে আর আতঙ্কে খেতুর সমস্ত শরীরটা শক্ত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হল, যে টাকা দুটো দিয়েছিল থাবা দিয়ে তা নীলাইয়ের হাত থেকে কেড়ে নেয় আর শাঁটা দিয়ে শপশপ করে ঘা কতক বসিয়ে দেয় অলক্ষুণে লোকটার মুখের ওপর।

কিন্তু খেতু কিছুই করল না। সোজা শন্ শন্ করে হেঁটে এল, জোয়ালে জুড়ে দিল গোরু। নীলাইয়ের চোখের আওতা থেকে পালাতে হবে, যত তাড়াতাড়ি হোক যেমন করে হোক। বলদ দুটো হাঁটতে চায় না। থেমে থেমে দাঁড়ায়, কাঁচা'মাটির পথের ধারে যে অপরিপূর্ণ বিবর্ণ ঘাস উঠেছে কালো কালো শীর্ণ আর লম্বা জিব মেলে সেগুলো খাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু খেতুর এবার আর রাগ হল না, বিরক্তি হল না এতটুকুও। কী চেহারা

হয়ে গেছে এমন নতুন আর জোয়ান গোরুর, ওদের দিকে তাকাতেও ভয় করে এখন। হয়ত একবার হাঁটু ভেঙে পড়লে আর উঠতেই পারবে না। হাতের উদ্যত পাঁটা পাশে নামিয়ে সে পরম যত্নে গোরুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, কোমল শান্ত গলায় আদর করতে লাগল—লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার।

যেমন করে হোক মণখানেক খইল এবার যোগাড় করতেই হবে।

বাড়ির দরজায় ফিরে সে 'শিকপায়া' মেরে গাড়ি থামাল। আর ওদিকের ডোবার ঘাট থেকে ভিজে কাপড়ে সামনে এসে দাঁড়াল ভোমরা।

অপ্রসন্নতায় ভারী হয়ে উঠল খেতুর মন। বিশ্বাস নেই ভোমরার রূপকে। ভিজে কাপড়ের নেপথ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে অপরূপ দেহকান্তি—যার চোখে পড়বে সঙ্গে সঙ্গে তারই নেশা ধরে যাবে।

—এখন আবার চান করলি যে? এই অবেলায়?

—ঝিনুক কুড়ুতে গিয়েছিলাম।

—ঝিনুক কুড়ুতে!—খেতুর কপাল উঠল রেখাসংকুল হয়ে, আরো বেশি অস্বস্তিতে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।—আজকে ঝিনুক দিয়ে কী হবে?

—হরিলাল টাকা দিয়ে গেছে। পাঁচ সের চুনের বায়না।

হরিলাল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিরক্তি ঝিমিয়ে পড়ল, ধুলোপড়া-খাওয়া সাপের মতো মাথা নত করল যা কিছু উত্তেজনা। নামটার যাদু আছে। হরিলাল দাস এ গ্রামের শুধু মণ্ডল নয়, মণ্ডলেশ্বর; মহারাজ চক্রবর্তী বললেও অত্যুক্তি হবে না কথাটা। উপকার কী করে বলা শক্ত, তবে অপকারের ক্ষমতা যে তার সীমানাহীন এ সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ-প্রয়োগই দরকার হয় না। এ হেন হরিলাল ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দেবে—উপচার অনুষ্ঠানে এতটুকুও ফাঁক রাখবে না কোথাও। পাঁচ সের চুনের বায়না না নিয়ে উপায় কী।

—ওঃ। কিন্তু তুই যে খেটে মরে যাবি বউ।

ভোমরা মৃদু হাসল, বিষাদ নিরানন্দ হাসি। তারপর কাপড় ছাড়বার জন্যে চলে গেল ঘরের ভেতর। অসীম ক্লান্তিতে দাওয়ার একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ল খেতু।

—খিদেয় মরে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি দুটি খেতে দে ভোমরা।

একটা মাটির ঘটিতে করে জল আর কচুপাতায় খানিকটা নুন এনে ভোমরা রাখল খেতুর পাশে। সেদিকে তাকিয়ে আপনা থেকেই খেতুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। কাঁসা আর পিতল যা ছিল সব বন্ধক গেছে, ঘরের লক্ষ্মী আর কোনোদিন ঘরে ফিরবে না।

ওদিকে রান্নাঘরের ঝাঁপ খুলেই ভোমরা থেমে দাঁড়াল। পা আর নড়ে না।

—কিরে, হল কী?

কী জবাব দেবে ভোমরা। পেছন দিকের জিরজিরে বেড়া ফাঁক করে কখন ঘরে ঢুকেছিল কুকুর। হাঁড়ি কলসী সব ভেঙে একাকার করে দিয়েছে, রাশি রাশি ভাত আর ডাল ছড়িয়ে রয়েছে ঘরময়। ডাল মেশানো কর্দমাক্ত মাটিতে এখনো ফুটে রয়েছে কুকুরের নোংরা পায়ের এলোমেলো থাবার দাগ। ঝিনুক আনতে যখন সে বিলের দিকে গিয়েছিল, সেই ফাঁকেই কখন—

ব্যাপারটা দেখে খেতুও স্তব্ধ হয়ে রইল। দোষ নেই কারোরই—পাঁচ সের চুনের বায়না দিয়ে গেছে হরিলাল। ভোমরাকে কষে একটা লাথি মারবার জন্যে হিংস্র একটা পা তুলেই নামিয়ে নিলে খেতু। এক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থেকে বললে, বেশ।

বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ভোমরা বললে, তুমি বোসো। আমি আবার চারটি—

—থাক, থাক, চাল সস্তা নয় অত। কত লোক না খেয়ে মরে যাচ্ছে খবর রাখিস তার ?

মনের সামনে নীলাই এসে দেখা দিলে। মড়ার মতো দুটো দৃষ্টিহীন অথচ অদ্ভুত দূরপ্রসারী দৃষ্টি মেলে যেন কিছু একটা বলবার চেষ্টা করছে—যেন তার সর্বাঙ্গ ঘিরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একটা অশুভ অভিশাপের ইঙ্গিত। এ কি সেই জন্যেই ?

ট্যাঁকে টাকা আছে তিনটে, তাড়ির দোকানও খোলা আছে এখনো—যেখানে সমস্ত ক্ষুধাতৃষ্ণার নির্বাণ, যেখানে অনায়াসে সমস্ত শ্রান্তি ক্লান্তিকে ভুলে থাকা চলে। হন্ হন্ করে খেতু বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

ঘরের খুঁটি ধরে আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইল ভোমরা। সারাদিন তার পেটেও কিছুই পড়েনি ; নদীর ধারের গরম বালিতে পায়ের নিচে ফোস্কা পড়ে যায়, বিলের ওপরে রৌদ্রতপ্ত আকাশ যেন হাড়-মাংস একসঙ্গে সেদ্ধ করতে থাকে। খেতুর জন্যে না হয় তাড়ির দোকান খোলা আছে, কিন্তু তার ? ভোমরার চোখ ফেটে জল নয়—মনে হল টপ টপ করে কয়েক বিন্দু টাটকা রক্ত গড়িয়ে পড়বে।

উঠোনে স্তূপাকার ঝিনুক। খানিকটা স্যাঁৎসেঁতে আঁশটে গন্ধ খালি ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

রাত্রেই আবার সব সহজ হয়ে গেল। তাড়ির নেশা অদ্ভুতভাবে বদলে দিয়েছে খেতুকে। স্নেহ আর আবেগে সমস্ত মনটা কোমল আর আবেশবিহ্বল হয়ে উঠেছে। সোহাগে সোহাগে ভোমরাকে অস্থির করে দিয়ে জড়িত গলায় বললে, রাগ করিসনি বউ, রাগ করিসনি ; তোকে কত ভালোবাসি আমি।···

পরের দিন বেলা উঠবার আগেই বাড়ি থেকে খাওয়াদাওয়া করে বেরোল খেতু। রোহনপুরের হাটে কিছু মাল পৌঁছে দিতে হবে। মণ প্রতি বারো আনা দর ধরে দিয়েছে

মহাজন। আধ সের চালের ভাত খেয়ে পরম পরিতৃপ্তিতে একটা বিড়ি ধরাল, তারপর অনেকক্ষণ ধরে সপ্রেম চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ভোমরাকে।

—তোর জন্যে হাট থেকে কাপড় কিনে আনব বউ।

ভোমরা মৃদু ক্লান্ত রেখায় হাসল। কালকের জের আজও শরীরের ওপর থেকে মেটেনি। কোনখানে যেন আনন্দ নেই, উৎসাহ নেই এতটুকুও।

—ফিরবে কখন ?

—ভোরের আগেই। সাঁঝ রাত্তিরে ওখান থেকে গাড়ি জুড়ে দিলে এ ক' কোশ ঘাঁটা আর কতক্ষণ। তুই কিন্তু তাই বলে রাত জেগে বসে থাকিস নে।

খেতু গাড়ি নিয়ে চলে গেল। রান্নাঘরের ভাঙা জায়গাটা পিঁড়ি আর ইট দিয়ে বন্ধ করে ভাতের হাঁড়িটা শিকেয় তুলে রেখে ভোমরাও উঠোনে এসে দাঁড়াল। আরো অন্তত দু-তিন সাজি ঝিনুক দরকার। কাল থেকেই পোড়ানো শুরু করতে হবে।

—খেতু বাড়িতে আছিস ?

হরিলালের গলা। ভোমরা ত্রস্ত হয়ে ঘোমটা টেনে দেবার আগেই হরিলাল বাড়ির ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে।—খেতু নেই বাড়িতে ?

ভোমরা মাথা নেড়ে জানালে, না। হরিলাল কিন্তু চলে গেল না। নিজেই একটা চৌপাই টেনে নিয়ে জাঁকিয়ে বসল ঘরের দাওয়াতে : চুনের কথা ভুলে যাসনি তো ?

—না।

—ভুলিসনি। তোর ওপর ভরসা করে বসে আছি। বিয়ের দিন যাবি কিন্তু আমার বাড়িতে। খেটেখুটে আর খেয়েদেয়ে আসবি।

ভয় আর অস্বস্তিতে ভোমরা চঞ্চল হয়ে উঠল। হরিলাল বড় বেশি তীব্র আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে। গলার স্বরে বড় বেশি কোমলতার আমেজ লেগেছে। পুরুষের ঐ চোখ আর কণ্ঠস্বরের অর্থ বুঝতে এক মুহূর্তের বেশি সময় লাগে না মেয়েদের। সঙ্গে সঙ্গে কী একটা যোগাযোগে ভোমরার অপাঙ্গ চোখ গিয়ে পড়ল হরিলালের হাতের ওপর। মোটা মোটা আঙুলগুলো যেন কিছু একটাকে আঁকড়ে ধরতে চায়, নির্মমভাবে নিষ্পেষিত করে ফেলতে চায় তাকে।

—একটা পান খাওয়াতে পারিস খেতুর বউ ?

—না।—চাপা শক্ত গলায় ভোমরা জবাব দিলে, পান নেই।

হরিলাল মৃদু হাসল—চোখ দুটো ঝলক দিয়ে উঠল এক মুহূর্তের জন্যে। তৈলাক্ত গোলাকার গালের ওপর দুটো বৃত্ত ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। মুখে সামনের পাটিতে একটা তীক্ষ্ণধার গজদন্ত চকিতের জন্যে আত্মপ্রকাশ করলে।

—তবে থাক, পানের দরকার নেই।

হরিলালের হাতখানা কঠোরভাবে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠল : খেতুকে বলে দিস ঋণ সালিশীর মামলাটায় ওর জন্যে বোধ হয় কিছু করা যাবে না।

ভোমরার বুকের ভেতর ধড়াস করে যেন ভারী একখানা পাথর এসে পড়ল। হরিলালের হাতে শাণিত খড়্গ হত্যার উল্লাসে ঝক ঝক করে উঠেছে। রামসই ঋণ সালিশী বোর্ডের সে প্রতিপত্তিশালী সদস্য, চেয়ারম্যান তার খাতক। আর বলদ কিনবার জন্যে ইদ্রিস মিঞার কাছ থেকে যে বায়ান্ন টাকা ধার করেছিল খেতু, সে মামলা এখনও ঝুলে রয়েছে রামসই ঋণ সালিশী বোর্ডেই। হরিলালের একটি মাত্র ইঙ্গিতে বলদ দু'টি বিক্রি করে দিয়ে কালকেই হয়ত কিস্তি শোধ করতে হবে খেতুকে। আরও কত কী হতে পারে একমাত্র হরিলালই তা জানে।

—বসুন, পান দিচ্ছি।

হরিলাল আবার হাসল। বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ—একটি মাত্র অস্ত্র দেখিয়েই জয়লাভ। এমন অসংখ্য অগণ্য অস্ত্র আছে হরিলালের যা খেতু কোনো দিন কল্পনাও করতে পারে না।

—নাঃ থাক। আমারও কাজ আছে, উঠতে হবে। খেতু বাড়ি আসবে কখন?

—ভোর রাতে।

হরিলাল এগিয়ে এল অসংকোচে এবং নির্ভয়ে। বিস্তারিত ভূমিকা বা ভণিতা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক এখন—সে কাজের মানুষ। নীরব আর নির্জন বাড়ি। ঝাঁ ঝাঁ রোদে ঝিমিয়ে পড়েছে সমস্ত। পেছনের আমগাছে একটা পাখী ডাকছে, বৌ কথা কও।

লোলুপ আর কঠিন মুষ্টি একখানা মাংসাশী-থাবার মতো ভোমরার হাত আঁকড়ে ধরলে। মট করে উঠল এক গাছা কাঁচের চুড়ি, দু'টুকরো হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। চাপা রুদ্ধ গলায় হরিলাল বললে, সন্ধ্যের পরে আমি আসব। কোনো ভয় নেই তোর।

ভোমরার সর্বাঙ্গে যেন একটা বিষধর সাপ পাকে পাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, মুখ দিয়ে কথা ফুটতে চায় না। শুধু তার আতঙ্কবিহ্বল মুখের ওপর সাপের প্রসারিত ফণা দুলছে, লাল টকটকে চোখ দুটো জ্বলছে যেন আগুনের বিন্দু। কিন্তু চোখ সাপের নয়, হরিলালের।

—কোনো ভাবনা নেই। টাকা-পয়সা, কাপড়-চুড়ি, যা চাস। কিন্তু সন্ধ্যের পরে আমি আসব।

ভোমরার মুখ দিয়ে কথা ফুটল না।

না ফুটল, কী আসে যায় তাতে। নিপুণ ঘাতক হরিলাল, তার অস্ত্রের আঘাত অব্যর্থ আর অনিবার্য। বায়ান্ন টাকার মামলাটা ভুলে থাকা এত সহজ নয় খেতুর পক্ষে। আরো একটু প্যাঁচ কষালে খেতুই উপযাচক হয়ে ভোমরাকে তার ঘরে পৌঁছে

দিয়ে যাবে। এমন সে অনেক দেখেছে। কিন্তু কী দরকার অতটা করে। হাঙ্গামা তার ভালো লাগে না।·সকলের সঙ্গে যথাসম্ভব ভালো ব্যবহার করতেই সে ভালোবাসে—লোক একেবারে খারাপ নয় হরিলাল।

একখানা বড় মাঠ পেরোলেই সামনে মুচিপাড়া। আকাশের রোদ যেন আগুনের মতো গলে গলে পড়ছে। ময়লা গামছায় খেতু কপালটা মুছে ফেললে। চারিদিকের মাঠে ঘাটে চলেছে অদৃশ্য অগ্নিযজ্ঞ। এখনো মেঘ দেখা দিল না, বৃষ্টি নামল না এক পশলা! কবে যে লাঙল পড়বে মাঠে! ধান রোয়ার সময় চলে গেল, অসময়ে বৃষ্টি পড়লে ফসল বুনেই বা কী লাভ। ধানে 'ঝুলন' লাগবে না, হাজা ধরে শুকিয়ে যাবে সমস্ত।

কেমন একটা অশুভ আশঙ্কায় মনটা ভারী হয়ে উঠল খেতুর। পথের পাশে আলোর ওপর সাদা ধবধবে একটা নরকপাল; দৃষ্টিহীন চোখের কালো গহ্বরের ভেতর দিয়ে ওর দিকে যেন প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে। কোনো গোরস্থান থেকে শেয়ালে টেনে এনেছে নিশ্চয়ই।

—ডাঁ-ডাঁ-ড্ডাঁহিন।

গোরুর লেজে মোচড় লাগল, আকস্মিক ভাবে ছুটতে শুরু করলে গাড়িটা। বাঁ দিকের বলদটার রক্তাক্ত কাঁধের ওপর ডাঁশগুলো ভন ভন করে উড়তে লাগল।

মুচিপাড়ার সামনে আসতেই মনে পড়ে গেল টাকা দুটোর কথা। আজকেই শোধ দেবার কথা বলেছিল নীলাই। কিন্তু নীলাইয়ের সেই মুখখানা কল্পনা করতেই গায়ের মধ্যে কেমন করে উঠল। কালকের দিনটা কি সেই জন্যেই কাটল অনাহারে!

হাঁক দিতেই নীলাই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। খুশি হয়ে বললে, মিতা যে! কোথায় চললি আবার?

—মাল নামাতে যাব, রোহনপুরে। টাকা দুটো দিবি বলেছিলি।

—টাকা? সে হবে। আয় বোস্, তামাক টেনে যা এক ছিলিম।

নীলাইয়ের চেহারায় অনেক পরিবর্তন চোখে পড়ছে আজকে। কথার ভঙ্গিতে আবার যেন পুরোনো মিতাকে খুঁজে পাওয়া গেল। হয়তো চামড়া পেয়েছে কিছু অথবা সেই দুটো টাকাই এমন রূপান্তর ঘটিয়েছে তার। কিন্তু কারণ যাই হোক, মনের ওপর থেকে মস্ত একটা ভার যেন নেমে গেল খেতুর।

—কিন্তু এখন গাড়ি বাঁধতে পারব না। মাল আছে সঙ্গে।

—রেখে দে তোর মাল।—নীলাই ভ্রূভঙ্গি করলে: আধ ঘণ্টা বসে গেলে এমন কী হবে। যা রোদ্দুর, গোরু দুটোকেও একটু জিরোন দে বরং। কালকে তুই এলি অথচ

তোকে একটু তামাক খাওয়াতে পারলাম না—ভারী খুঁত খুঁত করছে মনটা।

সত্যিই অসম্ভব রোদ। বেলাটা একটু ঠাণ্ডা না হলে গাড়ি হাঁকানো শক্ত। বলদগুলোর ভারী ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে,দেখলেও কষ্ট হয়। তা ছাড়া কী চমৎকার নীলাইয়ের ঘরের দাওয়াটা। মহুয়া গাছের ছায়া পড়েছে, ঝির ঝির করে গান গাইছে পাতা। তালদীঘি থেকে ভিজে হাওয়া উঠে আসছে। শুধু বসা নয়, খানিকটা গড়িয়ে নিতেও ইচ্ছে করে। বলদ দুটোকে ছেড়ে দিয়ে খেতু এসে বসল।

—পেলি চামড়া ?

—নাঃ। নীলাইয়ের বুকের ভেতর থেকে ঝোড়ো হাওয়ার মতো শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল : আজও এল না ব্যাপারীরা। এবারে কপালে কী আছে কে জানে। সকালে ঘোষগাঁয়ে ঢোল বাজিয়ে এলাম, আট গণ্ডা পয়সা দিলে। কিন্তু এভাবে ক'দিন চলবে। আচ্ছা, যুদ্ধ কবে থামবে বলতে পারিস ?

মহুয়ার ঝিরঝিরে হাওয়াটা বড় আরাম বুলিয়ে দিচ্ছে শরীরে। চোখে যেন ঘুম জড়িয়ে ধরে। কিন্তু নীলাইয়ের কথাগুলো এই নিশ্চিন্ত প্রশান্তির মাঝখানে সাঁওতালী তীরের মতো এসে বেঁধে, বিষ বর্ষণ করে। মনে পড়ে যায় ওর মামাতো ভাই বিষ্টুকে বুনো শূয়োরে গুঁতিয়ে মেরেছিল—পেটের চামড়া ছিঁড়ে নাড়ীভুঁড়িগুলো ঝুলে পড়েছিল বাইরে ; চৌকিদার আলী মহম্মদকে ডাকাতেরা ধরে জবাই করে দিয়েছিল, রক্তাক্ত গলাটা আধ হাত ফাঁক হয়েছিল একটা রাক্ষুসে হাঁয়ের মতো। নীলাইয়ের সর্বাঙ্গ ঘিরে যেন যত অপঘাত, যত অপমৃত্যু আর যত অভিশাপ এসে প্রেতের মতো ছায়া ফেলেছে।

—যুদ্ধ কবে থামবে ? ভগবান জানেন।

—তা বটে। ভগবান জানেন—ভগবান! হিংস্রভাবে কথাটার প্রতিধ্বনি করলে নীলাই।

ঘরের ভেতর থেকে তামাক সেজে নিয়ে এল ওর বউ। চকিতের জন্যে মিতানের সরু সরু পা দুটো চোখে পড়ল খেতুর। কী অসম্ভব রোগা—এত রোগা হয়ে গেছে বউটা। মুখের দিকে তাকাতে ভরসা হয় না, অকারণে চেতনাকে চমকে দিয়ে মনে হল ওর মুখে হয়তো সেই মড়ার খুলিটার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে। ভোমরা এখনো তাজা আছে, এখনো যৌবনের ঐশ্বর্যে টলমল করছে সে। কিন্তু—

দা-কাটা তামাকের উগ্র গন্ধটা লোভনীয়। কিন্তু হুঁকোতে একটা টান দিয়েই খেতু সেটা বাড়িয়ে দিলে নীলাইয়ের দিকে।

—না, মিতা, খা তুই। কিছু ভালো লাগছে না আমার।

ভালো লাগছে না কারোই। ভালো লাগবার কথাও নয়। অন্যমনস্কভাবে নীলাই কলকেটাকে উবুড় করে দিলে। তারপর তাকিয়ে রইল দূরে খেতুর অস্থিসার বলদ দুটোর

দিকে। যা চেহারা হয়েছে ওদের, বেশিদিন আর বাঁচবে না। ওই দুটো গোরুর চামড়া পেলে—

খেতু বললে, নাঃ, উঠি এবার। চার ক্রোশ ঘাঁটা যেতে হবে।

—বোস্ মিতা বোস্। এত তাড়া কিসের? তুই তো সুখী মানুষ, একদণ্ড নয় এখানে বসেই যা। ঘরে ঠাণ্ডা আছে, গলাটা একটু ভিজিয়ে যাবি নাকি?

—ঠাণ্ডা? তাড়ি?—মুহূর্তে সমস্ত মনটা যেন নেচে উঠল। কিন্তু তাড়ির নেশায় ধরলে সব কাজ একেবারে পণ্ড। বহু টাকার মাল রয়েছে গাড়িতে। রাতবিরেতে সাঁওতাল পাড়ার পথঘাট আজকাল একেবারেই ভালো নয়। অভাবের তাড়নায় লোক-গুলো ক্ষেপে রয়েছে হন্যে কুকুরের মতো। কায়দায় পেলে লুটেপুটে নেওয়া আদৌ অসম্ভব নয়।

—এত গরমে একটুখানি ঠাণ্ডা পেলে তো বেঁচে যাই। কিন্তু নেশা হয়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে রে। পথ ভারী খারাপ আজকাল।

—একটুখানি গলা ভিজিয়ে যাবি, নেশা হবে কেন।

—তা তা মন্দ নয় কথাটা।—সলোভে খেতু চাটল ঠোঁট দুটো।

মাটির ভাঁড়ে করে এল গাঁজিয়ে ওঠা তালের রস। আর কটুগন্ধী সেই অম্লমধুর অমৃত পেটে পড়তেই খেতু ভুলে গেল সমস্ত। রোহনপুরের ইস্টিশান, মাল বোঝাই গাড়ি, রাত্রির অন্ধকারে শংকাসংকুল সাঁওতালপাড়া···কোনো কিছুই আর মনে রইল না। ভাঁড়ের পর ভাঁড় উজাড় করে নেশায় আর ক্লান্তিতে খেতুর সর্বাঙ্গ ঝিমিয়ে এল অতি গভীর অবসাদে। কী ঠাণ্ডা ছায়া পড়েছে নীলাইয়ের দাওয়ায়—আর কী মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে মহুয়ার কচি কোমল পাতাগুলো।···

তারপরে বেলা গড়িয়ে এল—সূর্য নামল পশ্চিমের দিগন্তে। মহুয়া পাতার ফাঁক দিয়ে বিকেলের রাঙা আলো বাঁকা হয়ে খেতুর মুখের ওপরে এসে পড়তেই যেন আচমকা ভেঙে গেল ঘুমটা। ধড়মড় করে উঠে বসল খেতু। তাই তো, বেলা একেবারে নেমে পড়েছে যে। রাতদুপুরের আগে আর ইস্টিশানে পৌঁছোনো চলবে না।

সামনে বসে নির্বিকার মুখে বিড়ি খাচ্ছে নীলাই।

—ঈস! কী ঘুমটাই ঘুমোলি মিতা। বেলা একেবারে কাবার।

হাত পা কাঁপছে, মাথাটার ভার যেন বইতে পারা যায় না। হঠাৎ নীলাইয়ের ওপর একটা বিজাতীয় ক্রোধে খেতুর মনটা বিষাক্ত হয়ে উঠল।

—তুই তো আমাকে এই ফ্যাসাদে ফেললি। কতদূরে যেতে হবে এই রাত্তিরে—ত্থাখ্ তো। ও কি!

ভয়ে বিস্ময়ে খেতুর চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল আর পাথরের মতো শক্ত হয়ে উঠল

নীলাইয়ের মুখ—বলদ দুটো অমন করছে কেন ?

দ্রুত পায়ে খেতু ছুটে এলো বলদের কাছে। একটা তখন হাত পা ছড়িয়ে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে, দুটো চোখের ওপর নেমেছে সাদা পর্দা, সারা গায়ে ভন্ ভন্ করে উড়ছে মাছি। আর একটা অন্তিম চেষ্টায় আকাশের দিকে মুখ তুলে নিশ্বাস টানছে, জিভ বেরিয়ে এসেছে, কালো দীর্ঘায়ত চোখের কোণায় টলমল করছে অশ্রুর বিন্দু।

—আমার বলদ মরে গেল !—আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে খেতু আছড়ে পড়ল বলদের গায়ে। চর্মসার প্রকাণ্ড পাঁজরার হাড়গুলো মটমট করে উঠল বুকের চাপে।

নীলাই নিরাসক্ত গলায় বললে, যে গরম, সর্দি-গর্মি—

—সর্দি-গর্মি ?—ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো খেতু বিদ্যুৎবেগে দাঁড়ালো সোজা হয়ে। সামনে একটা মাটির পাত্রে ভুষি মেশানো হলুদ রঙের খানিকটা দুর্গন্ধ জল। এই জল কে খেতে দিয়েছিল বলদকে, কে দিয়েছিল ?

—সর্দি-গর্মি ! শা—লা, চামড়ার লোভে আমার গোরুকে বিষ খাইয়েছিস, বিষ খাইয়েছিস তুই। শালা গো-হত্যাকারী, আমি খুন করব, খুন করে ফেলব তোকে।—খেতুর গলা চিরে আকাশের বাজ গর্জে উঠল : আজ যদি তোর রক্ত না দেখি তা হলে ভুঁইমালীর বাচ্চা নই আমি।

বেলা গড়িয়ে এল, সন্ধ্যার ঘন ছায়া নিঃশব্দে নামল মাটিতে। কালো রাত্রির ভেতরে গা ঢাকা দিয়ে হরিলাল খেতুর দরজায় এসে দাঁড়াল। হরিলাল জানে ভোমরা তাকে ফেরাতে পারবে না, নিজেকে বাঁচাতে পারবে না তার কঠিন মুষ্টির নিষ্ঠুর নিষ্পেষণ থেকে। তার হাতে যে খড়্গ উদ্যত হয়ে আছে, খেতুকে বধ করতে তার একটিমাত্র আঘাতই যথেষ্ট।

অন্ধকারের বুক বিদীর্ণ করে বহু দূরে উত্তরের আকাশটা বিচিত্র রক্তিম ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন ছড়িয়ে পড়ল সদ্যোনিহত একটা মানুষের টাটকা খানিকটা তাজা রক্ত। কোথাও আগুন লেগেছে নিশ্চয়।

মমি

একটা চোখ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে কুৎসিত ব্যাধিতে, অস্বাভাবিকভাবে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে নাকটা। শরীরের সমস্ত মাংস শুকিয়ে যেন ছিবড়ে রূপ নিয়েছে। মোটা হাড়গুলো চামড়ার আবরণ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। লিভারে সিরোসিস দেখা দিয়েছে—মধ্যে মধ্যে সুতীব্র বেদনায় এক-একটা অসহ্য তরঙ্গ উঠে যেন আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিয়ে যায়।

এক কথায় কক্ষচ্যুত উল্কা। আভিজাত্যের অগ্নিজ্বালায় নিজেকে নিঃশেষে দাহন করে প্রতীক্ষা করছে অন্তিমের। আর প্রতীক্ষা করছে মণীন্দ্র। কিন্তু রত্নেশ্বর রায় এমনি করেই বেঁচে আছেন—পাঁচ বছর ধরে বেঁচে আছেন। অবশ্য এ বাঁচার মূল্য নেই কিছু, রত্নেশ্বর নির্বাক, অপটু, প্রায় স্থবির। তবুও কোথায় যেন বাধে মণীন্দ্রের। এ যেন মিশরের 'মমি'—জীবন নেই অথচ জীবনাতীত একটা সত্তা অশুভ অভিশাপের মতো তাকে বেষ্টন করে আছে। কোন সচেতন—সজ্ঞান ইচ্ছাশক্তি নয়, একটা বিচিত্র অলক্ষ্য শাসন থেকে থেকে মনের ওপর মেঘের মতো ছায়া ফেলে যায়।

বস্তুবাদী মণীন্দ্র জিনিসটাকে উড়িয়ে দিতে চায়—নিজের সংশয়ের কুসংস্কারকে আঘাত করে বারে বারে। কিন্তু অনেক রাত্রে নিজের ঘরে বসে লেখাপড়া করতে করতে হয়তো আচমকা চোখ চলে যায় ওপরের মহলে, রত্নেশ্বরের ঘরের দিকে। বিরাট বাড়িটা ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নিবিড় প্রসুপ্তি; শুধু একটা ক্ষীণ আলো জ্বলছে রত্নেশ্বরের ঘরে আর তারই সঙ্গে মনে হয়, কে যেন ছায়ামূর্তির মতো নিঃশব্দে পদচারণা করছে সেখানে। আর মনে হয়, যেন সেই ছায়ামূর্তিটা অস্বাভাবিক রকমের আকার নিয়ে বেড়ে উঠছে—বেড়ে উঠছে—তারপর বাইরের অতলান্ত কালো অন্ধকারে তার দেহটা মিলিয়ে যাচ্ছে অনন্তের মধ্যে।

স্পন্দিত বুকে বেরিয়ে আসে মণীন্দ্র—চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে আত্মস্থ করবার চেষ্টা করে নিজেকে। হঠাৎ যেন ঘোর ভেঙে যায় একটা। কলমে কালি পুরে নিয়ে মণীন্দ্র নতুন করে লিখতে বসে :

'সমাজে ও রাষ্ট্রে পূর্ণরূপ বিপ্লব সৃষ্টির জন্য ধনতন্ত্রকে জোড়াতালি দিয়া সারাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে না। তাহাকে নির্মূল করিতে হইবে—ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। যে দস্যুতার উপর ভিত্তি করিয়া পুঁজিবাদ—'

মন জেগে ওঠে—জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে চোখ। নতুন—পৃথিবী—সূর্যালোকিত দিগদিগন্ত। ফ্ল্যাণ্ডার্সের রণক্ষেত্রে অস্ত্রের অট্টহাসি নয়—গুচ্ছে গুচ্ছে আঙুর, জলপাই পাতার ঘন শ্যামলতায় মৃদু মর্মর; ট্যাঙ্ক নয়—ট্রাক্টারের চাকায় লক্ষ বিঘার জমিতে যৌথ মানুষের সোনার ফসল প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে।

রত্নেশ্বর রায় কি মণীন্দ্রকে বুঝতে পারেন ? কে জানে।

অন্তত বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। হাতে একটা লাঠি নিয়ে তিনি ঠুক ঠুক করে ঘরের বারান্দায় পায়চারি করে বেড়ান। চোখে ভালো দেখতে পান না, তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিও আজ সীমাবদ্ধ হয়েছে দশহাত জমির মধ্যে। শুধু কি চোখ ? হয়তো মনও। তাঁর নিজের ছোট ঘরটি—যেখানে সাদা পাথরের টেবিলে ব্রোঞ্জে

তৈরী ভেনাসের একটা নগ্নমূর্তি, আর দেওয়ালের গায়ে বিরাট গুম্ফ-পাগড়িতে শোভিত রামেশ্বর রায়ের একখানা বিবর্ণ তৈলচিত্র—দৃষ্টি আর মনটা যেন তারই ভেতরে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। ভেনাস তাঁর উন্মত্ত যৌবনের প্রতীক আর রামেশ্বর রায় তাঁর আদর্শ পিতৃপুরুষ—উচ্ছৃঙ্খল আভিজাত্যের দিক্-জ্যোতিষ্ক।

নীচে মণীন্দ্রের ঘর থেকে তুমুল কোলাহল শোনা যায় মধ্যে মধ্যে। ইংরেজী-বাংলায় মেশানো সমুত্তাল আলোচনা। টুকরো টুকরো কথা কানে আসে, আসে আকাশ কাঁপানো অট্টহাসি। সে হাসির শব্দে রত্নেশ্বরের বুকের ভেতরটা যেন চমকে ওঠে। একটা অতি তীব্র আশংকার মতো মনে হয়, ভালো কাজ করছে না মণীন্দ্র—মণীন্দ্র চলছে না তার বংশের নির্দিষ্ট বাঁধা সড়ক দিয়ে। এত লোক এসে তার কাছে ভিড় করে কেন, কী চায় তারা? মণীন্দ্র মদ খায় না, নিশিরাত্রে তার ঘর থেকে নিঃশব্দচরণে কোন অভিসারিকা বেরিয়ে যায় না কখনো। কিন্তু কেন মদ খায় না মণীন্দ্র, কেন সে যাপন করে মূর্খের মতো অতি-সংযত, অতি-নিয়ন্ত্রিত জীবন? রত্নেশ্বরের মনে হয়, কোথায় যেন সুর কেটে গেছে—বংশধারার ক্রমিক-শৃঙ্খলের একটা আংটা মাঝখান থেকে খসে পড়েছে কোথাও। উচ্ছৃঙ্খল হোক মণীন্দ্র—অসংযত হোক—নিজের অস্তিত্বটাকে একটা অতি তীব্র দীপশিখার মতো বিস্তীর্ণ আর বিকীর্ণ করে দিক।

দেয়ালের গায়ে রামেশ্বর রায়ের তৈলচিত্রে কীটের আবির্ভাব টের পাওয়া যায়। ব্রোঞ্জের তৈরী ভেনাসের মূর্তি কালো হয়ে আসে তার উদ্ধত স্তনাগ্রে মাকড়সারা জাল বুনে চলে। যেন নিরাবরণতাকে ঢেকে দেবার জন্যে একটা মসলিনের কাঁচুলি দিয়েছে পরিয়ে। রত্নেশ্বর রায়ের মনে হয়, মণীন্দ্রের ভেতরেও কোথাও এই কঞ্চুকের বিস্তৃতি ঘটছে—অসংকোচ লালসা আর নগ্নতার দিন কি শেষ হয়ে গেল!

ধীরে ধীরে টিপয়টার দিকে এগিয়ে আসেন রত্নেশ্বর। টুকিটাকি বিচিত্র সরঞ্জাম সেখানে। ছুটো হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ। অ্যালকোহলের ভেতরে ডোবানো একরাশ ছুঁচ। কাঁচের ছিপি-আঁটা নীল রঙের শিশিতে মরফিয়া। লিভারে কীটদষ্ট ক্ষত বহন করে মদ খাওয়া আজ তাঁর নিষিদ্ধ। কিন্তু রক্তের মধ্যে যখন অভ্যস্ত নেশা তার দাবী জানায় তখন সে দাবী মেটাতে হয় মরফিয়া ইনজেকশনের সাহায্যে। সিরিঞ্জটা ঠিক করে মরফিয়া পুরলেন রত্নেশ্বর, তারপর বাহুতে তার তীক্ষ্ণাগ্র বিদ্ধ করে চাপ দিলেন পিস্টনে। মুখের একটি রেখারও স্থানচ্যুতি ঘটল না, কোথাও ভাবান্তর দেখা দিল না এতটুকু। সামান্য একটা কাঁটার আঁচড়ে বেদনা বোধ করবার রীতি রায়বংশের নয়।

মুহূর্তের মধ্যে সজাগ হয়ে উঠল রক্ত। মুহূর্তের মধ্যে মনে হল, শ্লথ শিরা-উপশিরার পথে যেন অপহৃত যৌবনের বিদ্যুৎ খেলা করে গেল। একদৃষ্টিতে ভেনাসের ব্রোঞ্জ মূর্তিটার দিকে তাকালেন রত্নেশ্বর। দেড়ফুট একটা মূর্তিকে আশ্রয় করে লালসার

বহ্নিময় তীব্রতা ফুটিয়ে তুলেছে ভাস্কর। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের নিয়ে একদা যখন তিনি বাগানবাড়িতে রাত কাটাতেন—সেই সব দিনে সাহেবী দোকান থেকে কেনা এই মূর্তি। উঃ—কী যে সব দিনগুলো! তারা কি কখনো আর তাঁর জীবনে ফিরে আসবে না, ফিরে আসা এতই কি অসম্ভব?

দরজায় বেজে উঠল লঘু পদধ্বনি।

—কে?

—আমি জয়া।

জয়া। অতীত যৌবনের মধ্যে জেগে উঠতে গিয়েই যেন একটা প্রবল আঘাতে রত্নেশ্বর আবার ঝিম মেরে গেলেন। সে জয়া আর নেই। যে-সব রাত্রে তরুণী জয়ার দেহ জ্বলত মশালের মতো, সে-সব রাত প্রভাত হয়ে গেছে! জয়া আজ সম্পূর্ণ নির্বাপিত —বরফের মতো শীতল আর নিরুত্তাপ। অথচ কী আশ্চর্য, মণীন্দ্রের মা মারা যাওয়ার পরে তাঁর বহির্মুখী যৌবন অনেকটা জয়ার মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল। জয়ার ভেতরে কী ছিল রত্নেশ্বর আজ তা ভুলে গেছেন—কিন্তু যা ছিল তা যে তাঁকে অনেকখানিই এক-চারণার পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল, একথা আজও মনে আছে।

সেই জয়া। কী কুৎসিত দেখাচ্ছে তাকে! শরীর মেদবহুল, দাঁতে মিশি। রত্নেশ্বরের দেওয়া আড়াই ভরির তাগা বাহুতে যেন কেটে বসেছে। অস্বাভাবিক মোটা কোমরের কাপড়ের ফাঁক দিয়ে ভারী একছড়া রূপোর গোট দেখা যাচ্ছে। জয়া হাসল। কিন্তু সমস্ত মনকে আকুল আর বিহ্বল করা হাসি সে নয়—কালো আর বীভৎস হাসি।

—কী চাই জয়া?

—তোমাকে বিরক্ত করতাম না, জানি তোমার শরীর খারাপ: জয়া যেন বিনয় করবার চেষ্টা করল খানিকটা। রত্নেশ্বরের মুখে সকৌতুক ব্যঙ্গের আভাস দেখা দিল—জয়াও বিনয় করে! অথচ একদিন কাপড় গয়না পাওয়ার জন্যে সে না করেছে এমন ব্যাপারই নেই। যা দিয়েছে তার দশ গুণ সুদে আসলে উসুল করে নেবার চেষ্টার ত্রুটি করে নি সে।

—ভদ্রতা করতে হবে না, যা বলতে এসেছিলে বলো।

জয়া অতীতের মতো আবার সেই মোহিনী হাসি হাসবার চেষ্টা করলে, চোখে আমেজ দিতে চাইল সেদিনকার সেই মাদকতার। কিন্তু কিছুই ফুটল না—ব্রোঞ্জের মূর্তিটার সঙ্গে তুলনা করে রত্নেশ্বরের মন সংকোচে পেছিয়ে গেল যেন।

রত্নেশ্বরের বিছানার একপাশে বসে পড়ে জয়া বললে, এতদিন পরে এলাম, একবারটি বসতেও বললে না?

রত্নেশ্বর তিক্তভাবে হাসলেন: বসতে না বললেও তুমি বসবে, এ আমি জানতাম।

জয়া ঠোঁট ফোলাবার একটা প্রাণান্তিক প্রয়াস করলে অর্থাৎ কালো ঠোঁট দুটোয় রূপায়িত হল একটা বীভৎস ভঙ্গি।

—এখন তো আমাকে মনেই ধরবে না, কিন্তু এমন দিনও ছিল যখন এই গোয়ালার মেয়ের পা দুখানা তুমি মাথায় করে রাখতে চাইতে।

—কিন্তু সে আমি আর বেঁচে নেই, সে তুমিও শেষ হয়ে গেছ অনেক কাল আগে। বিরক্তিভরে রত্নেশ্বর চোখ ফিরিয়ে নিলেন: কী হবে সে-সব কথা বলে। আমার শরীর ভালো নয়, যা বলবার আছে তাড়াতাড়ি বলে চলে যাও।

—যাচ্ছি যাচ্ছি! এবারে সত্যিই অভিমানবিদ্ধ হয়ে জয়া উঠে দাঁড়াল, সে-দিনের সেই যৌবন-দর্পিতা চকিতের জন্যে মনের মধ্যে জেগে উঠল হয়তো: কিন্তু একটা কথা বলতে এসেছিলাম। একদিন তো ঢের অনুগ্রহ করেছিলে, আজ আমি না খেয়ে মরব নাকি?

—না খেয়ে মরবে! কেন?

জয়ার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল: আমার মাসোহারা তুমি বন্ধ করে দিয়েছ। আজ আমার যৌবন নেই বলেই কি—

—মাসোহারা! বন্ধ হয়ে গেছে!—রত্নেশ্বর চমকে উঠলেন।—কেন, মণি টাকা দেয় না তোমাকে?

—নাঃ।—জয়া করুণভাবে হাসল: বাপের খেয়ালের খেসারত দেবার মতো দায় তার নেই। ও টাকা দিয়ে অনেক কাজ করবার আছে—এই কথাই আমাকে সে জানিয়েছে।

বাপের খেয়ালের খেসারত দেবার দায় আজ মণীন্দ্রের নেই! মরফিয়ার বিষাক্ত স্পর্শে সমস্ত রক্তটা বিষ-জ্বালার মতো জ্বলে উঠল রত্নেশ্বরের। দেওয়ালের গায়ে রামেশ্বর রায়ের ছবিখানার ওপর গিয়ে পড়ল তাঁর চোখের দৃষ্টি। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে খানিকটা রোদ এসে যেন রামেশ্বরের মুখখানাকে জীবন্ত করে তুলেছে একটা অশরীরী দীপ্তিতে। আর কোলাহল শোনা গেল মণীন্দ্রের ঘর থেকে। ইংরেজী-বাংলায় মেশানো তুমুল তর্ক ওখানে উতরোল হয়ে উঠেছে। গ্রামের যত বেকার আর আড্ডাবাজ ছোকরার ভিড়।

রত্নেশ্বর বিছানার ওপর হেলে পড়লেন।

—আচ্ছা যাও তুমি, আমি দেখছি।

জয়া চলে গেল। এতদিন পরে যেন অনুভব করলেন রত্নেশ্বর, কী অসহায় তিনি—কী পরিমাণে অক্ষম আর শক্তিহীন। লিভারের বেদনাটা বিদ্যুতের মতো সুতীক্ষ্ণ চমক দিয়ে উঠছে মুহূর্তে মুহূর্তে। আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি চকিতের জন্যে শোনা গেল নিভৃত প্রাণকোষের ভেতর। কিন্তু না-না-না—নিজের মধ্যেই একটা তীব্র আর্তনাদ করে রত্নেশ্বর উঠে বসলেন। তিনি মরবেন না, এখনো সময় হয় নি তাঁর। আজও তিনি ফুরিয়ে

যান নি—জলবার মতো ইন্ধন দেহমন থেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়নি এখনো। মণীন্দ্র কি মনে করে, একেবারেই অসহায় তিনি---এখনো তাঁর পরিত্যক্ত রাজদণ্ড তিনি হাতে তুলে নিতে পারেন না ?

কিন্তু আজ আর রত্নেশ্বরের বিশ্রাম নেই। একজনের পর আর একজন।

এইবারে বুড়ো সদর নায়েব এসে দাঁড়াল।

—তুমি, ত্রিভুবন ? তোমার আবার কী চাই ?

সদর নায়েব, কিন্তু কোনো দীনতা বা বিনয়ের আভাস নেই ত্রিভুবনের ব্যবহারে। একসঙ্গে দু'জনে উন্মত্ত রাত কাটিয়েছেন বহুবার। বাইজীর স্খলিত বস্ত্র বিহ্বল নৃত্য-লীলার সঙ্গে সঙ্গে যখন জড়িত কণ্ঠে বাহবা দিয়ে গেছেন তিনি, তখন দুহাতে পাগলের মতো তবলা ঠুকেছে ত্রিভুবন। নেশার প্রগাঢ় আচ্ছন্নতায় পরস্পরকে জড়িয়ে একই ফরাশের ওপর দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ত্রিভুবনও আজ বুড়ো হয়ে গেছে, কিন্তু রত্নেশ্বরের মতো অথর্ব হয়ে পড়েনি অতটা। হয়তো তাঁর মতো রাজকুল-সম্ভূত নয় বলেই রাজব্যাধিটা অমন ভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি সে। স্থির অকম্পিত গলায় ত্রিভুবন বললে, এবার আমাকে বিদায় দিন বাবু।

—বিদায় ? তোমাকে ? কেন ?

—জমিদারীর যা-কিছু, প্রজার জন্যে বিলিয়ে দিলে আমার থাকা না থাকা সমান কথা। এখন মানে মানে বিদায় নেওয়াই তো ভালো।

নির্বাক দীর্ঘায়ত চোখে রত্নেশ্বর তাকিয়ে রইলেন।

—মনিবের কাজ করেই মাইনে নিই আমরা।—পুরো পাঁচ হাত লম্বা ত্রিভুবন দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা কঠিন সরল রেখায়। তিনটে খুন, দু'টো আগুন দেওয়া আর পাঁচটা দাঙ্গার মামলায় যে আসামী হয়েছিল, এ সেই লোক।--আজ যদি আমাদের কাজ ফুরিয়ে থাকে তো বলুন আমরা চলে যাই। এখন কৃষক-সমিতির প্রজারা এসেই জমিদারী দেখা-শোনা করুক। মহালে মহালে কাছারি রেখেই বা কী লাভ ? সেখানে এখন সব ইস্কুল বসিয়ে দিন, লাইব্রেরি করে দিন। লেখাপড়া শিখে দেশের লোক সব চতুর্ভুজ হয়ে উঠুক।—ত্রিভুবন যেন হাসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু সত্যিই কি হাসল সে ? খাঁচায় বন্দী বাঘের মতো একটা চাপা গর্জন যেন বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

—যাও—যাও—যাও।—রত্নেশ্বর এবার চিৎকার করে উঠলেন।—আমি মরিনি, মরিনি এখনো। আমি মরব না। আমি বেঁচে উঠবই। তুমিও অপেক্ষা করো ত্রিভুবন, ধৈর্য হারিয়ো না।

—বেশ, ভাল কথা।—কুটিল আর অবিশ্বাসের দৃষ্টি রত্নেশ্বরের মুখের ওপর ফেলে

বেরিয়ে গেল ত্রিভুবন। আর নিচের তলায় মণীন্দ্রের ঘর থেকে উচ্ছ্বসিত হাসির প্রবল তরঙ্গ কাঁপিয়ে দিলে সমস্ত বাড়িটা। রামেশ্বর রায়ের ছবির ওপর থেকে রোদের দীপ্তিটা কখন সরে গিয়েছে, ভেনাসের নগ্ন বুকের ওপর হাত পা ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে বসে আছে একটা হলদে রঙের কুৎসিত মাকড়সা—জন্ম-মৃত্যুর নিঃসংশয় সংকেত যেন।

রত্নেশ্বর আবার উঠে এলেন টিপয়টার দিকে, নীল রঙের শিশিটা থেকে সিরিঞ্জে পুরে নিলেন মরফিয়া। আবার তার তীক্ষ্ণাগ্রটা বিদ্ধ হল ত্বকের মধ্যে, ছড়ালো মৃত্যু-রূপী জীবন-বিদ্যুৎ। কিন্তু আশ্চর্য, রত্নেশ্বর রায় এবার বেদনা বোধ করলেন, যেন অতীত তীব্র একটা বেদনা। রত্নেশ্বর কি ভেঙে পড়েছেন, তাঁর মনের মধ্যেও কি শিকড় মেলেছে নিভৃত দুর্বলতার বীজ?

অনেক রাত্রে ঘরে ফিরল মণীন্দ্র। গ্রামে গ্রামে সভা—দিকে দিকে একতার সুনিশ্চিত সোনার সম্ভাবনা। যে নতুন ফসল এতদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে, তাকে ঘরে তুলবার আশায় শান পড়েছে কাস্তের ফলাতে। মহামানবের মহানগরী গড়ে উঠবে লোহায়-লক্কড়ে, কারখানার আকাশস্পর্শী ঔদ্ধত্যে। নেহাইয়ের ওপর ঝন্ ঝন্ করে ঘা দিচ্ছে কামারশালার কঠিন হাতুড়ি—আর ভেতর দিয়ে শোনা যাচ্ছে অদূরাগত কালের সুনিশ্চিত প্রতিধ্বনি:

আশায় আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে মন। নতুন পৃথিবী। শঙ্কামুক্ত—সংশয়মুক্ত। রণক্ষেত্রে মৃত্যু-ঈগলের মতো করাল পাখা মেলে উড়ে আসে না বোমারু। সিগফ্রিড্ আর ম্যাজিনোর ব্যবধান পরস্পরের দিকে বিদ্বেষ-বিষাক্ত দৃষ্টিতে মারণাস্ত্র উদ্যত করে প্রতীক্ষা করে না—বিস্তীর্ণ দিক-প্রান্তরের ঐক্যবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর ফসল, রাশি রাশি ফসল। সমৃদ্ধি আর কল্যাণ।

'কাস্তেটারে দিয়ো জোরে শান'—গুনগুন করে গাইতে গাইতে টেবিলে এসে বসল মণীন্দ্র, জ্বালালো ল্যাম্পটা। সমস্ত ঘরটা অসম্ভব অগোছালো হয়ে আছে, বই খাতা কাগজপত্র এলোমেলোভাবে চারদিকে ছড়ানো। তার এই ঘরটাই আজকাল পার্টি-অফিস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলমে কালি ভরে নিয়ে লিখতে বসল মণীন্দ্র। অনেক রাত হয়ে গেছে—এত বড় বাড়িটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে অদৃশ্য নিদালির স্পর্শে। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে একটানা, দেউড়িতে একটা নেড়ী কুকুর চিৎকার করছে নিতান্ত অকারণে—হয়তো বাদুড়ের ছায়া দেখেছে। মণীন্দ্রের আত্মমুখী মনটা নিজের মধ্যেই কখন তলিয়ে গেল সেটা টেরও পেল না সে। কলমের মুখে আশা আর আনন্দের অক্ষর মূর্তি নিয়ে লেখা ফুটতে লাগল:

"যাহারা বাধা দিতেছিল, তাহারা আজ একে একে জনতার দাবি মানিয়া লইতেছে।

তাহারা একথা নিঃসংশয় ভাবে বুঝিতে পারিতেছে যে যতদিন তাহারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবে, ততদিনই—"

—মণি !

মণীন্দ্র ভয়ানকভাবে চমকে উঠল, হাত থেকে কলমটা খসে পড়ল মেঝের ওপর। রাত্রির এই নিঃশব্দ প্রহরে জীবনের পরপার থেকে একটা অপদেবতার আবির্ভাবের মতো তার দরজার গোড়াতে এসে দাঁড়িয়েছেন রত্নেশ্বর রায়। জীবন নয়—জীবনাতীত যেন অশরীরী সত্তা।

—বাবা ?—মণীন্দ্র বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইল। আজ পাঁচ বছর ধরে সে সম্ভাষণ করেনি রত্নেশ্বরকে, চোখ তুলে তাকায়নি তাঁর দিকে। এই মুহূর্তে সে যেন তাঁকে নতুন করে দেখল, দেখল অভিশাপের মতো একটা অশুভ আবির্ভাবকে। মণীন্দ্রের ভয় করতে লাগল। মরফিয়ার প্রভাবে রত্নেশ্বরের চোখ দুটো জলছে—আরো বেশী করে জলছে অন্তর্নিহিত কী একটা প্রেরণায়। যাদুকরের দৃষ্টিতে মানুষ যেমন সম্মোহিত হয়ে থাকে তেমনি করেই মণীন্দ্র তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

—তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

অস্পষ্ট অস্ফুট গলায় মণীন্দ্র বললে, বলুন।

—এখানে নয়, আমার সঙ্গে এসো।

রত্নেশ্বরের সর্বাঙ্গ ঘিরে যেন রহস্যের কালো রন্ধ্রহীন আবরণ। সেই আবরণের ভেতর দিয়ে বস্তুবাদী মণীন্দ্রের চোখ কোনো কিছুকে দেখতে পাচ্ছে না—কোনো কিছুর অর্থবোধ করতে পারছে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মমির সঙ্কেতে উঠে দাঁড়াল

—চলুন।

বিস্তীর্ণ উঠোনটা ঘন অন্ধকারে মূর্ছিত। সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তারা হেঁটে চলল। মণীন্দ্র কিছু দেখতে পাচ্ছে না, অথচ প্রায়-অন্ধ রত্নেশ্বর রায় তার ভেতর দিয়ে পথ খুঁজে পাচ্ছেন কী করে! তাঁর হাতের লাঠিটা বাজছে খট খট করে। আর সেই শব্দতরঙ্গটা নিস্তব্ধ বাতাসের বুকে অনুরণন জাগিয়ে তুলছে। মণীন্দ্রের ক্রমাগত মনে হতে লাগল এই রাত্রে—এই অন্ধকারে অসংখ্য ছায়ামূর্তি নেমে এসেছে এই অভিশপ্ত বাড়িটার ওপরে। রামেশ্বর রায়, যদুনন্দন রায়—কুখ্যাতকীর্তি তার প্রাক-পুরুষের দল। বিস্মৃতনামা আরো কত কে।

দুজনে হেঁটে চলল। রত্নেশ্বরের মহলে নয়—মহল ছাড়িয়ে দূরে, অনেকটা দূরে। মণীন্দ্রের যেন চেতনা নেই, যেন তার সমস্ত শক্তিকে হরণ করে নিয়েছেন রত্নেশ্বর। শুধু রত্নেশ্বর একাই নন, তাঁর সঙ্গে আরো অনেকে, আরো কতজন।

মণীন্দ্রের যখন চমক ভাঙল তখন দেখা গেল ওদের সামনে কুলদেবতার মন্দির। কালী। মন্দিরের দরজা খোলা—একটা ছোট্ট প্রদীপ জ্বলছে মিট মিট করে আর তার আলোতে দেখা যাচ্ছে নৃমুণ্ড আর খড়্গ-কৃপাণ-ধারিণী বিভীষণা মূর্তি। তাঁর রক্তাক্ত জিভ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত—তাজা রক্ত যেন গড়িয়ে পড়ছে। কুলদেবতা।—রত্নেশ্বরের পূর্বপুরুষেরা কার্তিকী অমাবস্যায় এখানে নরবলি দিতেন বলে প্রসিদ্ধি আছে।

পেছন ফিরে অকস্মাৎ যেন বজ্রকঠিন মুষ্টিতে রত্নেশ্বর মণীন্দ্রের একখানা হাত চেপে ধরলেন—তাঁর অবশিষ্ট অন্তিম শক্তিতে। চোখ দুটোতে প্রতিফলিত হচ্ছে প্রদীপের আলো। মমির চোখ। জীবন নয়—শুধু আগুন।

—তুমি রায়বংশের ছেলে। প্রতিজ্ঞা করো, এই বংশের মর্যাদা তুমি রাখবে। তোমার পূর্বপুরুষেরা যে-পথে চলেছেন, সে-পথ ছাড়া আর কোনো পথ তোমার নেই। প্রতিজ্ঞা করো, প্রতিজ্ঞা করো এই কুলদেবতার সামনে!

নিজের মধ্যে একটা তুমুল সংগ্রাম চলেছে। মণীন্দ্র জেগে ওঠবার চেষ্টা করছে—প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে বলতে চাচ্ছে : না, না, এমন প্রতিজ্ঞা সে কখনো করতে পারবে না। তার পথ আলাদা, তার জীবনের গতি স্বতন্ত্র। সত্যকে সে চিনেছে, উপলব্ধি করেছে তাকে।—না—না—না।

কিন্তু কোনো কথা সে বলতে পারল না। রত্নেশ্বর রায়ের ব্যক্তিত্ব, শুধু ব্যক্তিত্ব নয়—জীবনাতীত শক্তি তাকে অভিভূত করে ফেলছে। জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম চলে, কিন্তু যেখানে জীবন নেই, সেখানে? সেখানে কী করবে, কী করতে পারে সে?

—প্রতিজ্ঞা করো।

হয়তো প্রতিজ্ঞাই করে বসত, কিন্তু প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির বলে নিজেকে সংযত করলে মণীন্দ্র। কালীর হাতে খড়্গ কৃপাণ ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছে—লক্ লক্ করছে লালায়িত জিহ্বা। মণীন্দ্র এ সব কিছু মানে না, কিছু বিশ্বাস করে না, মানুষের কোন অন্ধতাকে আশ্রয় করে দেবতা জন্ম নিয়েছে—এ তথ্যও সে জানে। কিন্তু এই মুহূর্তটা অদ্ভুত—এই মুহূর্তটা সমস্ত যুক্তি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাইরে। অভিভূতের মতো মণীন্দ্র ভয়ার্ত চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল, তার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল থর থর করে।

—করবে না, করবে না প্রতিজ্ঞা? তুমি রায়বংশের ছেলে, রায়বংশের নাম ডোবাবে?—অকস্মাৎ, অত্যন্ত অকস্মাৎ হু হু করে কেঁদে ফেললেন রত্নেশ্বর। মমির আগ্নেয় চোখ নিবিয়ে দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়তে শুরু করল।

আর সঙ্গে সঙ্গে বেঁচে গেল মণীন্দ্র। বেঁচে উঠল তার সমস্ত মৃত্যুমগ্ন জীবনী-শক্তি, তার কর্মী মন, জেগে উঠল বৈজ্ঞানিকের চোখ। রত্নেশ্বর রায় মমি নন, তিনি

অস্বাভাবিক অসাধারণ কিছু একটা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নন, তিনি মানুষ। এ জল মানুষের চোখের, মানুষের দুর্বলতার, মানুষের অসহায়তার।

সর্বাঙ্গে একটা ঝাঁকানি দিয়ে মণীন্দ্র দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলে। কালীর খড়্গটা টিনের তৈরি, প্রসারিত জিভটায় গাঢ় লালরঙের প্রলেপ, সেখানে রক্তের আভাস খুঁজতে যাওয়া পাগলামি ছাড়া আর কী হতে পারে!

সহজ সুস্থ গলায় বললে, এই রাত্রে কী ছেলেমানুষি করছেন বাবা! ঘরে চলুন। আমি রায়বংশের ছেলে তা আমি জানি, তার চাইতে বড় পরিচয় যে আমার আছে, সে-ও আমি জানি। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না— চলুন।

রত্নেশ্বর মণীন্দ্রের কথা শুনতে পেলেন কি-না কে জানে। তিনি তখন নিতান্ত অসহায়ের মতো মন্দিরের রকের ওপর বসে পড়েছেন—মরফিয়ার অবসন্ন প্রতিক্রিয়া। প্রায়-অন্ধ চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে বুকের ওপর।

ধরা গলায় রত্নেশ্বর বললেন, কোথায় যাবো? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—সমস্ত অন্ধকার।

বলিষ্ঠ মুষ্টিতে রত্নেশ্বরের শিরাসর্বস্ব হাতখানা ধরলে মণীন্দ্র—এবার তার পালা। তারপর গভীর সহানুভূতির স্বরে বললে, কোনো ভয় নেই বাবা, আপনি আমার সঙ্গেই চলুন।

ডিম

নদীর ওপারে বড় জংশনটার পাশে মিলিটারী কলোনী। আগে প্রায় ষাট-সত্তর বিঘে জুড়ে ধূ ধূ করত অনাবাদী জমি—প্রকৃতির অভিশাপ লাগা মরা মাটি। ধান-পাট দূরে থাক, একমুঠো কলাই বুনেও ওখান থেকে কেউ ঘরে তুলতে পারত না। তবু পৃথিবীতে যাদের প্রাণশক্তি সব চাইতে বেশি, সেই ঘাসের বিবর্ণ আর কুশের আগার মতো তীক্ষ্ণ অঙ্কুরগুলো ইতস্তত ভাবে সমস্ত মাঠখানাকে আকীর্ণ করে রাখত। হাড় বের করা গোরুর পাল ক্ষিদের জ্বালায় ওখানে খাদ্যের সন্ধান করত; ধারালো ঘাসের আগায় মুখ কেটে গিয়ে টপ টপ করে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ত আর তৃষ্ণার্ত মাটি চোঁ চোঁ করে এক চুমুকে সেই রক্ত শুষে নিত।

সেই মাঠ। বিশ্বকর্মার হাতুড়ির ঘা পড়েছে। দেহাতী মানুষগুলো দূর থেকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। একপাল চখা-চখীর মতো সাদা সাদা তাঁবু আর খড়ের চালাগুলো

যেন ঝাঁক বেঁধে আকাশ থেকে উড়ে পড়েছে ওখানে। রাত্রে বিদ্যুতের ঝলমলে আলো। মায়াপুরী।

ওদেরই দাবি। সামগ্রিক যুদ্ধের দাবি। রোজ পাঁচশো করে ডিম যোগাতে হবে। কোথায় পাওয়া যাবে এত ডিম? পেটের দায়ে লোক হাঁস-মুরগী বেচে খেয়েছে—তিনখানা গ্রাম ঘুরলে এক কুড়ি যোগাড় করা যায় না। মেজাজ যেদিন চড়ে যা। সেদিন প্যারীলাল ভাবে, মানুষ কেন ডিম পাড়তে পারে না? আর ঘোড়া? তা হলে পাঁচশোর জায়গায় পঞ্চাশটা দিয়েই ওদের রাক্ষুসে পেটগুলো ভরানো চলে।

বড়দিন আসছে—হ্যাপি নিউ ইয়ার। ক্রিসমাস কেক চাই, আর চাই নব বর্ষের প্রীতিভোজ। সুতরাং পাঁচশ ডিমের দাবি দাঁড়িয়েছে এক হাজারে। প্যারীলাল বিড় বিড় করে বকতে লাগল। ডিম যেন তার দিনরাত্রের দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে, আকাশে তারা নেই—শুধু রাশি রাশি জ্যোতির্ময় ডিম ওখানে আলোক বিস্তার করছে। মাটি দিয়ে মানুষ চলছে না, শুধু হাত-পাওয়ালা একদল ডিম মিলিটারী ভঙ্গিতে মার্চ করে চলেছে: রাইট, লেফট, অ্যাবাউট টার্ন—কুইক মার্চ।

ক্ষেপে গিয়ে প্যারীলাল হাত পা ছুঁড়তে লাগল। কী হয় একরাশ চিল-শকুনের ডিম সাপ্লাই দিলে? কামান আর বোমা যারা অক্লেশে হজম করতে পারে, শকুনের ডিম তো তাদের কাছে নস্য বিশেষ। কিন্তু তাই বা পাওয়া যাবে কোথায়? রেল লাইনের ধারে বসে যে শকুন কাটা-পড়া সাপ আর কুকুরের মাংস নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করত, কিংবা টেলিগ্রাফের তারে যে-সব চিল নিচের জলা থেকে মাছের আশায় ধ্যানস্থ থাকত, মিলিটারী টার্গেট প্র্যাকটিসের চোটে তারা প্রায় নির্বংশ হয়েছে। এখন—এই দুর্দান্ত দুঃসময়ে মানুষে যদি কিছু কিছু ডিম পাড়তে পারত, তা হলে এই মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতো প্যারীলাল।

মেজর সাহেব পিঠ চাপড়ে দিয়ে প্যারীলালকে যেন জল করে দিলে।

—ট্রাই, ট্রাই গুড বয়—ট্রাই এগেন।

সাহেবের সামনে নিতান্তই 'ক্রাই' করা যায় না, তা হলে কাপুরুষ বলে বাঙালী জাতির দুর্নাম হবে। ডিমের সন্ধানেই যাত্রা করতে হল।

শীতের বিকেল। সমস্ত আকাশটা যেন মূর্ছিত হয়ে আছে মেঘের চাদর মুড়ি দিয়ে। টিপ টিপ করে মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়বার চেষ্টা করছে—আবার কন্‌কনে হাওয়ায় জলের বিন্দুগুলো উড়ে যাচ্ছে দিগন্তে। পায়ের নিচে পালা-পড়া ঘাসে, যেন তুলোর আঁশ জড়িয়ে রয়েছে। মনে হয় অসহ্য ঠাণ্ডায় শরীরের হাড়মাংসগুলো সব আলাদা হয়ে যাবে।

পায়ে দুটো মোটা মোটা মোজা পরলে প্যারীলাল। দু হাতে পুরু দস্তানা। মাফলার-

টাকে কানে আর গলায় শক্ত করে জড়িয়ে একটা গেরো বাঁধলে বুকের ওপর। তারপর গায়ে চড়ালো ফিকে নীল রঙের মোটা ওভারকোটটা। ব্যাস—শীতের সাধ্য কি এইবারে তার কাছে ঘেঁষতে পারে।

ওভারকোটের ওপর সস্নেহে একবার হাত বুলিয়ে নিলে প্যারীলাল। সত্যিই খাসা জিনিস। কাশ্মীরী ফার, যেমন মোলায়েম, তেমনি গরম। একবার গায়ে ওঠাতে পারলে বাংলা দেশের শীত তো দূরের কথা, উত্তর মেরুতে গিয়ে অবধি নিশ্চিন্ত থাকা চলে। এই যুদ্ধের বাজারে দুশো টাকা ধরে দিলেও এখন এমন একটা কোট পাওয়া যাবে না। মিলিটারী মাল—একটু কাঁচা বা খেলো কারবার নেই কোনখানে।

কোটটা পরতে পরতে প্যারীলালের মন অকারণেই অত্যন্ত খুশি হয়ে উঠল। জীবনে কোন দুঃখই অবিমিশ্র নয়—সব কিছু বিড়ম্বনারই সান্ত্বনা আছে একটা। মেজর সাহেবের বিশ্বগ্রাসী ডিমের ক্ষুধা তাকে বিব্রত করে তোলে বটে, কিন্তু এ কথাটাও কোনো মতে ভুললে চলবে না যে, এই কোটটা তিনিই তাঁকে বকশিশ করেছেন। তাঁর কাছে প্যারী-লালের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

কিন্তু কোথায় ডিম? আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্যটা যদি এখন তার সামনে এসে দাঁড়ায় তা হলে একটি মাত্র প্রার্থনাই তার করবার আছে। ঐশ্বর্য নয়, ধন-সম্পত্তি নয়, চীন দেশের বোঁচা নাক রাজকন্যাও নয়। ডিম দাও প্রভু, ডিম দাও। যোগাড় করতে না পারো, পেড়ে দাও। একটা নয়, দুটো নয়, এক কুড়ি নয়, পাঁচ কুড়িও নয়। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,অর্বুদ অর্বুদ—এমন একটা ডিমের পাহাড় খাড়া করে দাও যে, তার চূড়োটা যেন মাউন্ট এভারেস্টের চূড়োকেও ছাড়িয়ে ওঠে। হায় আলাদীন! রক্ পাখীর ডানার সঙ্গে সঙ্গে সে দিনগুলোও উড়ে গেছে চিরকালের মতো!

একটা কাতর দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্যারীলাল বেরিয়ে এল।

শীতার্ত অনুর্বর মাঠ। ঘাসের তীক্ষ্ণ মুখ ঠাণ্ডায় যেন ছুরির ফলার মতো ধারালো হয়ে আছে। মানুষের খালি পা পড়লে কেটে ফেটে একরাশ হয়ে যাবে। তবু ওর ভেতর দিয়ে খালি পায়েই হেঁটে যায় মানুষ। তাদের পায়ের তলায় হুক-ওয়ার্মের ক্ষতচিহ্ন, চামড়ার রঙ পোড়া কাঠের মতো কালো, নখগুলো যেন হাতুড়ি দিয়ে ছেঁচে দিয়েছে কেউ। এই মাঠের ভেতর দিয়ে তারা হেঁটে যায়, ধারালো ঘাসের আগায় কালো রক্ত শুকিয়ে থাকে।

প্যারীলাল ওরই মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। তার পায়ে দামী পেটেন্ট লেদারের জুতো, হাঁটু পর্যন্ত টানা পশমী মোজা। পুরু ওভারকোটটার গায়ে হিমের কণা জমছে। ওপরে মেঘলা আকাশটা থম থম করছে যেন ভেঙে পড়বার সূচনায়।

একফালি টানা পথ ধরে প্রায় মাইলটাক এগিয়ে এলে গ্রাম। অথবা আগে গ্রাম ছিল। মন্বন্তরের ঝাপটা এখনো মিলিয়ে যায়নি। ধ্বসে-পড়া চালা, পোড়ো ভিটে। মরা

মানুষের দীর্ঘশ্বাসেই যেন রাশি রাশি বাঁশের পাতা উড়ে পথটাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

—রজনী, ও রজনী! আছো নাকি বাড়িতে?

একটা ছোট চালার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে প্যারীলাল। মাটি দিয়ে মসৃণ করে লেপা পুরু দেওয়াল—তার ওপর গেরিমাটির রঙে আঁকা শঙ্খ, পদ্ম, লতা। একদিন সমৃদ্ধি যে ছিল সে কথাই ঘোষণা করছে প্রাণপণে। ওদিকে শন ঝরে যাওয়া চালের ওপর দিয়ে আকাশ উঁকি মারছে, আর সেই ফাঁকগুলোর ওপরে খানিকটা ধোঁয়া কিংবা কুয়াশা কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। ঘরের ধোঁয়াটা বাইরের ভারী হিমার্ত বাতাস ঠেলে বেরুতে পারছে না অথবা বাইরের কুয়াশা সবগুলো একসঙ্গে ভেতরে ঢোকবার জন্যে ঠাসাঠাসি করছে।

—বলি, রজনী আছো নাকি?

—ঠিকাদার বাবু ডাকছেন।—ভেতর থেকে সারদার গলা।

—আছি বাবু, আছি।—সাড়া দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এল বুড়ো রজনী। অনাহারশীর্ণ উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। হলদে রঙের চোখ দুটো যেন ঘুরছে। থুতনীর নিচে খানিকটা বিশৃঙ্খল পাকা দাড়ি, সারা গায়ে একটা শতচ্ছিন্ন ধোকড়া জড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে। শীতটা সত্যিই বড্ড বেশি পড়েছে এবার। বুড়োর হাতের আঙুলগুলো কী অস্বাভাবিক নীল।

—তারপরে, ভালো আছো তো? একটা চুরুট ধরাতে ধরাতে প্যারীলাল জিজ্ঞেস করল। এটা ভদ্রতার ব্যাপার, আলাপের ভূমিকা।

—ভালো?—রজনী হাসবার চেষ্টা করল: আমাদের আর ভালো। এখনো মরিনি—এইটুকুই যা ভালো বলতে হবে।

—ওসব কথা কেন ভাবছো!—একটা পা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে প্যারীলাল চুরুটের ধোঁয়া রিং করতে লাগল: যুদ্ধ থেমে যাবে, আবার ফসল উঠবে, সুখশস্তিতে ভরে যাবে দেশ। প্যারীলালের কণ্ঠ যেন দেবদূতের মতো উদাত্ত: তখন আবার এই বাংলা হবে সোনার বাংলা।—কথাগুলো প্যারীলালের নিজের কানেই যেন ভালো লাগতে লাগল—বাস্তবিক মাঝে মাঝে সরস্বতী এসে যেন বাণী দেন তাঁর গলায়। একটা স্বর্গীয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রজনীকে সে অভিভূত করে দেবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু রজনী তবু হাসে। দাঁত-ঝরে-যাওয়া মাড়ির ভেতর দিয়ে খানিক কালো হাসি বেরিয়ে এল: সোনার বাংলা? কবে ছিল? বুকের রক্ত জল করে আর চোখের জল না ফেলে দুমুঠো ভাত কোনোদিন জোটেনি—দশ বছর আগেও নয়। বেগার ছিল, থানার দারোগা ছিল, উচ্ছেদের নোটিশ ছিল। বাড়তির মধ্যে এবার দুঃখের পাত্র পূর্ণ করে দিয়ে দুমুঠো ভাতও অদৃশ্য হয়েছে। সেই লজ্জা আর অপমান মেশানো রাঙা বাগ্‌ড়া চালের ভাত আর লাফা শাকের তেতো চচ্চড়ি এই কি সোনার বাংলার রূপ? হয়তো হবে।

কিন্তু ঠাণ্ডায় আর দাঁড়াতে পারছে না রজনী। মাঠের ওপার থেকে হাওয়া আসছে, হাড়ের ভেতর বাজছে ঝনঝনানি। গায়ের ধোকড়াটাও যেন বরফে তৈরি। অথচ সামনে দাঁড়িয়ে প্যারীলাল বক্তৃতা দিচ্ছে সোনার বাংলার সোনালী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। চুরুটের ধোঁয়া চাকার মতো গোল হয়ে তার মাথার চারদিকে যেন স্বর্গীয় দীপ্তিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, ফার কোটের রোঁয়ার ওপরে জমেছে হিমের কণা—চিক চিক করে জ্বলছে—যেন অশরীরী জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

—তারপর, কিছু ডিমের যোগান দিতে হবে যে।

—ডিম! ডিম এখন পাওয়া বেজায় শক্ত বাবু।

—তা হলে তো চলবে না—স্বর্গদূত আবার একটা মহিমময় দৃষ্টি প্রক্ষেপ করে রজনীকে বশীভূত করবার চেষ্টা করলে: দামের জন্যে আটকে থাকবে না।

—কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে?—দাঁতে দাঁত ঠক ঠক করে বাজিয়ে রজনী বললে: আর যে শীত। ঘর থেকে বেরুতে গেলে হাত পা যেন ফেটে যায়। বৃষ্টিও পড়ছে।

—ওই তো, ওই তো।—প্যারীলাল ভ্রূভঙ্গি করল: গায়ে অত বড় একটা চটের ধোকড়া, আবার শীত কিসের রে? ব্যাটারা বাবুয়ানি করেই গেলি। নে, আড়াই টাকা করে ডজন পাবি। কাল অন্তত তিন ডজন যোগাড় রাখবি—যেখান থেকে হোক, যেমন করে হোক।

কোটের জ্যোতির্ময় ধোঁয়াগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে যেন ধোঁকা লেগে যায় রজনীর। শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলো অসাড় হয়ে এসেছে, চোখের সামনে ঘুরছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

—চেষ্টা করব বাবু।

—চেষ্টা নয়, চাই-ই চাই। মনে থাকে যেন। ভারী জুতোর শব্দ করে প্যারীলাল চলে গেল।

ঘরের মধ্যে সারদা ছেলেমেয়ে নিয়ে বিব্রত হয়ে আছে। বছর আটেক ছেলেটার বয়েস—ম্যালেরিয়ায় চুষে নিংড়ে খেয়েছে তাকে। পেটের পিলেটা এমন ফুলেছে যে, আশংকা হয় একদিন ওটা তাকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ক্যাল্‌শিয়ামের অভাবে অপুষ্ট হাড়গুলো প্যাকাটির মতো শীর্ণ—হঠাৎ একটুখানি ঘা লাগলে যেন মট করে ভেঙে যেতে পারে। একটা ছেঁড়া চট জড়িয়ে সেও থর থর করে কাঁপছে—মাঝে মাঝে মাটির একটা মালসা থেকে খানিক শুকনো ভাত থাবায় থাবায় মুখে পুরছে। ম্যালেরিয়ার পথ্যই বটে।

কঙ্কালসার বুকের মধ্যে কাশছে মেয়েটা। মায়ের বুক শুকনো, চুষলে দুধ তো দূরে থাক একবিন্দু রক্তও বেরিয়ে আসে না বোধ করি। ছেঁড়া কাপড়ের আঁচলে সারদার শীত

কাটছে না—তবু গায়ের গরম দিয়ে সে কোনোমতে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। রজনীর পুত্রবধূ সারদা। ছেলে নিবারণ শহরে গেছে রিকশা টানতে। আধিতে যা পেয়েছিল তাতে দু-দিনও পেট চলে না। তাই শহর তাকে টেনে নিয়ে গেছে আজ দু মাস। এ পর্যন্ত কোনো খবর নেই।

ঘরে ঢুকে একটা বিড়ি ধরালো রজনী। ধোকড়ার নিচে পরলে ছেঁড়া জামাটা। তবু শীত কাটে না।

—এক মাল্সা আগুন করবি বউ? শীতে যে জমে গেলাম।

—আগুন? কী দিয়ে জ্বালব?—সারদা ঝলসে উঠল।

—ওই তো খড়ি আছে, ঘুঁটে আছে—

—খড়ি আছে, ঘুঁটে আছে!—সারদা ভেংচে উঠল—শ্বশুরের সম্মান রাখবার মতো গলার আওয়াজটা তার নয়: দিনে সব পুড়িয়ে শেষ করে দিলে রাত্তিরে কী হবে তখন। বাচ্চাকাচ্চাগুলো একটাও বাঁচবে না।

দুর্বল স্থবির দেহে যতটা সম্ভব শিখায়িত হয়ে ওঠবার চেষ্টা করলে রজনী:

—কেন, বসে বসে নবাবী না করলে চলে না? দুটো খড়ি কুড়িয়ে রাখতে পারিস নে হারামজাদী!

ভাঙা কাঁসরের মতো গলায় অদ্ভুত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল সারদা, যেন প্রেতিনীর আর্তনাদ: খড়ি! খড়ি আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়, তাই না! তুমি মরলে চিতেয় দেবার জন্য খড়ি কুড়িয়ে রাখব।

—বটে, বটে!

অসহ্য ক্রোধে রজনী কাঁপতে লাগল, একটা কিছু করে ফেলবে—একটা কোনো ভয়ানক কাণ্ড। কিন্তু কিছুই করলে না, শুধু ধোকড়াটা গায়ে জড়িয়ে শিথিল গতিতে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

—এখন কোথায় চললে আবার?

—মরতে।—রজনী চলে গেল। দরজার ওপার থেকে বললে, চিতার কাঠ যোগাড় রাখিস।

বাইরে শীত পাথরের মতো পৃথিবীর বুকে চেপে বসেছে। মেঘলা আকাশে ধোঁয়ার মতো আরো মেঘ জমে উঠছে—পাণ্ডুর অন্ধকার যেন ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। আড়ষ্ট পায়ে রজনী এগিয়ে চলল, ফাটা পা থেকে রক্ত চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়তে লাগল ক্ষুধার্ত বন্ধ্যা মাটিতে।

রজনী ফিরল যখন, তখন সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়েছে। সন্ধান বৃথা হয়নি। তিনখানা গ্রাম

ঘুরে দু-কুড়ি ডিম যোগাড় হয়েছে। ঠিকাদার বাবুর নামের মহিমা আছে। হাঁস-মুরগীগুলো পর্যন্ত খুশি হয়ে ডিম পাড়তে লেগে যায় যেন। ডজন প্রতি তিন গণ্ডা পয়সাও যদি প্যারীলাল তাকে কমিশন দেয় তা হলে কমসে কম অন্তত দশ আনাতে এসে দাঁড়ালো।

দশ আনা পয়সা। তিন-চারটি প্রাণীর একবেলার খোরাক। প্যারীলালের অনুগ্রহ আছে তার ওপরে, অস্বীকার করলে অধর্ম হবে। মাঝে মাঝে বাঁকা চোখে সারদার দিকে তাকায়, তা নইলে আপত্তি করবার বিশেষ কিছুই ছিল না।

কিন্তু দশ আনা পয়সা। তার জন্যে অনেকখানি খেসারত দিতে হয়েছে। পা দুটো :মে অসাড় হয়ে আছে—শুধু ফাটা জায়গাগুলো থেকে এক একটা তীব্র জ্বালা বিদ্যুৎ-চমকের মতো শিউরে দিচ্ছে সমস্ত শরীরকে। ঠাণ্ডায় নাক দিয়ে জল পড়ে মুখটাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গে চোখের জলও হয়তো মিশে :য়েছে খানিকটা।

ঘরে ঢুকেই কিন্তু মনটা খুশি হয়ে উঠলো।

গন্‌গনে আগুন জ্বালিয়েছে সারদা। বাইরের জগতের শীত-জর্জর ি-ষ্ঠুরতার হাত থেকে যেন স্বর্গলোকে প্রবেশ। একটু আগেকার কুশ্রী কলহের কথা মনেও রইল না। লোভীর মতো আগুনের পাশে বসে পা দুটোকে মেলে দিলে রক্তিম শিখাগুলোর ওপরে।

টকটকে লাল আগুন। রক্তের মতো রঙ। মানুষের বুক থেকে যে রক্ত শুকিয়ে গেছে তা রূপায়িত হয়েছে আগুনে। সমস্ত ঘরটা লাল ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে—সারদার মুখটাকে দেখাচ্ছে অদ্ভুত আর অপরিচিত। পা দুটোকে আগুনের ওপর ধরে দিয়ে চুপ করে বসে রইল রজনী। অন্য সময় হলে পুড়ে ফোসকা পড়ে যেত, কিন্তু এখন এত বড় আগুনটাকেও যেন মনে হচ্ছে যথেষ্ট গরম নয়।

সারদা জিজ্ঞেস করল আস্তে আস্তে : পেলে ডিম?

—হ্যাঁ, দু-কুড়ি। ভালো করে রেখে দে—সকালে ঠিকাদারকে দিতে হবে। দশ আনা পয়সা মিলবে।

ম্যালেরিয়াজীর্ণ ছেলেটা এক কোণ থেকে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে উঠল।

—মা, আমি ডিম খাবো।

—খবর্দার, খবর্দার!—রজনী হঠাৎ বাঘের মতো গর্জে উঠেছে : ডিম খাবে! একটা ডিম ছুঁয়েছিস কি মাথা ভেঙে দুখানা করে দেব।

ছেলেটার ঘ্যানঘ্যানানি তবু থামে না। অসুখে ভুগে ভুগে অসম্ভব লোভ বেড়ে গেছে। চোখ দুটো জ্বলছে ক্ষুধার্ত শেয়ালের মতো।

—মা, আমি ডিঁম খা—বো—

সারদা ছেলেকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে এলো সস্নেহে : না বাবা, ডিম খায় না। গরীবের ডিম খেতে নেই। রজনী চুপ করে রইল। মনটা ভারী হয়ে গেছে।

গরীবের ডিম খেতে নেই। শুধু ডিম? কিছুই খেতে নেই। গরীব যদি খেতে পায় তা হলে পৃথিবী চলবে কেমন করে? সব ওলটপালট আর বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে যে।

ছেলেটা তবু কাঁদছে। রজনীর হাত নিস-পিস করে। একটা কিছু করতে চায়। ইচ্ছে গলা টিপে ওটাকে থামিয়ে দেয় একেবারে। খেতে চায়, কেন খেতে চায়? কার কাছে খেতে চায়? শুকিয়ে মরে যেতে পারে না নিঃশব্দে? নিজেও বাঁচে, পৃথিবীরও হাড় জুড়িয়ে যায়।

একটা মালসায় করে খানিকটা কড়কড়ে ভাত আর শাকচচ্চড়ি নিয়ে এল সারদা: খেয়ে নাও।

ঠাণ্ডা আধপচা ভাত—তেতো শাকের ঘণ্ট। গলা দিয়ে একগ্রাস নামে তো পেটের ভেতর থেকে শীতের প্রচণ্ড শিহরণ উঠে মাথা পর্যন্ত ঝাঁকিয়ে দেয়—দাঁতে দাঁতে খট খট করে বাজতে থাকে। কেন কে জানে, ডিমগুলোর ওপরে দুর্দান্ত একটা লোভ এসে রজনীর মনকেও আচ্ছন্ন করে দিলে। কতদিন সে ডিম খায়নি।

কিন্তু—না। ঠিকাদার বাবুর যোগান। সাহেবদের নতুন বছর আসছে, তাদের উৎসব হবে, খানাপিনা হবে। ওদিকে দৃষ্টি দিলেও মহাপাতক। খাবায় খাবায় অখাদ্য ভাতগুলো গলার মধ্যে ঠেলে দিতে লাগল রজনী। অসহ্য শীতে পেটটা মোচড় দিচ্ছে, ঠেলে বমি উঠে আসছে যেন।

ছেলেটি আবার প্যানপ্যান করে উঠল: ডিম—

কোথা থেকে কী হয়—রজনীর মাথার মধ্যে রক্ত চড়ে গেল। ভাতের মালসাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে, তারপর বিদ্যুতের মতো দাঁড়িয়ে উঠল। নিজের অতৃপ্ত লোভের জ্বালাটা বিস্ফোরকের মতো ফেটে পড়েছে, একটা অবলম্বন পেয়েছে সে।

দাঁতে দাঁতে পিষে রজনী বললে, ফের ডিম! আজ তোকে খুন করে ফেলব।

মুহূর্তে একটা হ্যাঁচকা টানে রজনী ছেলেটাকে কাছে টেনে নিয়ে এল, তারপর নীল একটা হিমার্ত থাবা ছেলেটার গলায় বসিয়ে দিলে নির্মম ভাবে। মেরে ফেলবে।

আর্তকণ্ঠে সারদা চিৎকার করে উঠল: কী করছ?

লাল আগুনে রজনীর চোখ ভয়ংকর দেখাচ্ছে। আগুনের চাইতেও বেশি করে জ্বলছে সেটা: শেষ করে দেব।

—ছাড়ো, ছাড়ো, মরে যাবে যে।

—মরুক।

কঠিন হাতের চাপে ছেলেটার চোখ বেরিয়ে যাচ্ছে। পাগলের মতো ছুটে এল সারদা, ঘরের কোণ থেকে লোহার শাবলটা তুলে নিয়ে প্রাণপণে ঘা বসালো রজনীর মাথায়। অস্ফুট একটা কাতর আর্তনাদ। ছেলেটাকে ছেড়ে দিয়ে রজনী তিন হাত দূরে

ছিটকে পড়ল—ছিটকে পড়ল আগুনের ওপর। সমস্ত ঘরময় আগুন ফুলঝুরির মতো ছড়িয়ে গেল।

সারদা দাঁড়িয়ে রইল বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে। কী করবে কিছু বুঝতে পারছে না। ছেলেটা নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে মাটিতে, আর আগুনের শয্যায় মাথা রেখে তেমনি নিঃসাড় হয়ে শুয়ে আছে রজনী। গায়ের ধোকড়াটা জ্বলে উঠেছে—মরা সাপ পুড়বার সময় যেমন অন্তিম আক্ষেপে মোচড় দেয় শরীরটাকে, তেমনি ভাবে একটা অসহায় চেষ্টা করেই রজনী স্থির হয়ে গেল। সারদা হতবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, রজনীর দাড়িটা পুড়ছে—ফটাস করে একটা শব্দ হয়ে খইয়ের মতো ফুটে উঠেই গলে গেল তার বিস্ফারিত ডান চোখটা। মানুষ-পোড়া গন্ধ কি বিশ্রী।

মাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে প্যারীলাল দেখতে লাগল, সমস্ত গ্রামটা জ্বলছে, এই দারুণ শীতে আগুন পোয়াচ্ছে যেন! আর এতদূরে দাঁড়িয়েও হঠাৎ তার অত্যন্ত গরম লাগতে লাগল—কাশ্মীরী ফারের কোটটা বড় বেশি গরম।

পাইপ

আপনারা পড়েছেন কিনা জানি না, কিছুদিন আগে খবরের কাগজে এক টুকরো সংবাদ বেরিয়েছিল। পদার্থবিদ্যায় অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পি. কে. চৌধুরী একটা অগ্নিকাণ্ডে মারা গেছেন। রাতে ঘুমোবার আগে বিছানায় শুয়ে তিনি পাইপ খাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই পাইপের আগুন ছিটকে পড়ে মশারির গায়ে, তারপর—

সংক্ষিপ্ত খবর। যুদ্ধের নানা রণাঙ্গন, নানা রাষ্ট্রিক বিতণ্ডার ভিড়ে ওর জন্যে বেশি স্থান দেওয়া হয়নি। তার দিনতিনেক পরে কাগজে দেখেছিলাম অধ্যাপক চৌধুরীর গুণমুগ্ধ ছাত্রদের উদ্যোগে দেরাদুনে একটা শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারপর গান্ধী-জিন্না বৈঠক, পূর্ব প্রুসিয়ায় জার্মান ব্যূহভেদ, হল্যাণ্ডে কঠিন সংগ্রাম, মস্কোতে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন। রয়টারের মারফৎ বিশ্ববার্তার ঝঞ্ঝাগর্জন অধ্যাপক চৌধুরীর মৃত্যুটাকে এক মুহূর্তে ঝরা পাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

কিন্তু আমি এত সহজে জিনিসটাকে ভুলতে পারছি না—

সুনন্দাদির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পার্টি অফিসে।

কথা বলেন কম, মিষ্টি করে হাসেন বেশি। প্রথম প্রথম ভারী সংকোচ লাগত, একটু দূরত্ব রেখেই চলা-ফেরা করতাম। তাঁর শ্যামবর্ণ দীর্ঘ চেহারাতে এমন একটা

মনীষার দীপ্তি ছড়িয়ে ছিল যে, কিসের একটা সশ্রদ্ধ শঙ্কায় মনটা আপনা থেকেই পিছিয়ে আসত।

কিন্তু সংকোচ ভেঙে দিলেন সুনন্দাদি নিজেই।

শীতের রাত, প্রায় নটা বাজে। তিন-চারজনে মিলে পার্টি অফিসে নিদারুণ তর্ক জমিয়ে তুলেছি। পেছন থেকে সুনন্দাদি এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন।

চমকে গেলাম।

সুনন্দাদি স্নিগ্ধ হেসে বললেন, থাক ভাই, আর তর্ক করতে হবে না! তোমার পরীক্ষা আসছে, লক্ষ্মী ছেলেটির মতো এখন বাসায় ফিরে চলো।

সসংকোচে বললাম, এই যাচ্ছি।

সুনন্দাদি বললেন, যাচ্ছি বললে তো হবে না, এখুনি যেতে হবে। মানে আমাকে একটু এগিয়ে দিতে হবে। তুমি তো আমাদের পাড়াতেই থাকো।

তর্কটা অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়তে হল। বললাম, চলুন।

দুজনে ট্রাম থেকে নামলাম সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে। শীতের আকাশ থেকে বরফের কুঁচির মতো হিমের গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছে, দু'পাশের বাড়িগুলো এর মধ্যেই যেন মাথা গুঁজে ডুব দিয়েছে কালো ঘুমের স্তব্ধতার মধ্যে। সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের যে আলোগুলো এককালে কৃত্রিম জ্যোৎস্নার সৃষ্টি করে বাসন্তী পূর্ণিমার আমেজ দিত, কালো রঙের গাঢ় প্রলেপের ফাঁকে তাদের দেখা যাচ্ছে মড়ার চোখের মতো। মধুচ্ছন্দা টু-সীটারকে নির্বাসিত করে রাক্ষসের মতো ছুটছে ঝাঙ্গী ট্রাক—হেড লাইটের তীব্র আলোয় জ্বলছে শিশির-ভেজা কালো পীচের পথ।

আমি ডান দিকে যাব, সুনন্দাদি বাঁয়ে। দেখি তিনি ট্রাম স্ট্যাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছেন। বললেন, আর দু'পা এগিয়ে দিতে তোমার কি অসুবিধা হবে রঞ্জন? সোলজারগুলো এ সময়ে মাতাল হয়ে রাস্তায় ঘোরে—

বললাম, চলুন চলুন, বাড়ি পর্যন্তই পৌঁছে দিই আপনাকে।

—আবার কষ্ট করবে। তবে বেশি দূর যেতে হবে না, একটু এগোলেই আমাদের বাড়ি।

সত্যিই বেশি দূর নয়। সামান্য এগিয়ে ছোট একটা বাঁক, প্রায় তার মুখেই নতুন একখানা একতলা বাড়ি। বললাম, সুনন্দাদি, তা হলে আমি যাই।

সুনন্দাদি বললেন, এলে যখন, বোসো না, একটু চা খেয়ে যাও।

বললাম, না না, এত রাতে আর—

—রাত কোথায়, এই তো সাড়ে ন'টা। ভয় নেই, দশ মিনিটের বেশি তোমায় আটকে রাখব না।

দরজাটা ভেজানো ছিল। আলগোছে ধাক্কা দিয়ে আলোকিত ড্রয়িংরুমের মধ্যে চলে এলাম আমরা। সুন্দর করে সাজানো ঘর। আলমারিতে রাশি রাশি বই ঝক ঝক করছে। ছোট টেবিলে কতগুলো বিজ্ঞান-সম্পর্কিত মাসিকপত্র। হাতীর দাঁতের কতগুলো খেলনা যেখানে সেখানে সাজানো রয়েছে। একধারে একটা মোটা ওভারকোটে সর্বাঙ্গ ঢেকে এক ভদ্রলোক ধ্যানস্থ হয়ে আছেন ডেকচেয়ারে। প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি —মাথার পাকা চুলে বিদ্যুতের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

সুনন্দাদি চাপা গলায় বললেন, ইনি আমার বাবা। দেরাদুনে প্রফেসারী করতেন, এখন প্যারালাইজ্‌ড।

আমাদের পায়ের শব্দে ভদ্রলোক চোখ মেলে তাকালেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে চমকে গেলাম আমি। কী অদ্ভুত চোখ। বন্যজন্তুর দৃষ্টির মতো একটা তীব্র আলোয় জ্বলজ্বল করছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত শরীরের সমস্ত শক্তি যেন এসে সংহত হয়েছে তাঁর চোখে। অমন তীক্ষ্ন আর জ্বলন্ত দৃষ্টি আমি জীবনে দেখিনি। অধ্যাপক পি. কে. চৌধুরী।

সুনন্দাদি বললেন, বোস ভাই রঞ্জন, বাবার সঙ্গে একটু গল্প করো। আমি ততক্ষণ চা নিয়ে আসি।

বললাম, উনি অসুস্থ—ওঁকে বিরক্ত করা—

—না না, তাতে কী। বাবা গল্প করতে ভয়ানক ভালোবাসেন। তুমি বোসো, সংকোচ কোরো না—হাল্কা চটির শব্দ করে সুনন্দাদি ভেতরে চলে গেলেন।

অধ্যাপক চৌধুরী আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন নির্নিমেষ প্রখর দৃষ্টিতে। কেমন ভয় করছিল, কেমন একটা অস্বস্তির অনুভূতিতে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছিল আমার। চৌধুরী অত্যন্ত শান্ত—প্রায় নিঃশব্দ গলাতে আমাকে বললেন, বোসো।

চোখের সঙ্গে কণ্ঠস্বরের কোনো সাদৃশ্য নেই। স্নেহ আর প্রশান্তি যেন উপচে পড়ছে। বললেন, কী করো?

—এম. এ. পড়ছি। পরীক্ষা দেব এবারে।

—আর কী করো? পার্টি ওয়ার্ক?

মৃদু হেসে মাথা নিচু করে রইলাম।

—না, না, ডিসকারেজ করছি না আমি। জীবনে একটা ডেফিনিট লাইন বেছে নেওয়াই উচিত। ভালো হোক, মন্দ হোক, অন্তত পথ চলবার শক্তি আসে। ওই নন্দাকে আমি বাধা দিইনি।

কী আর বলব। শুধু বললাম, তা ঠিক।

চৌধুরী নড়েচড়ে বসবার চেষ্টা করলেন। দেখলাম, একটুখানি নড়বার উপক্রম

করতেই তাঁর শরীরে একটা অমানুষিক প্রয়াসের আভাস। মুখ লাল হয়ে উঠেছে, ডান হাতের আঙুলগুলো করুণভাবে কাঁপছে থরথর করে। পক্ষাঘাত। নিজের দেহের ওপর এতটুকু কর্তৃত্ব নেই। ভারী বেদনা বোধ হল।

কয়েকটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে চৌধুরী মাথার ওপরে আলোটার দিকে তাকালেন। ঝকঝক করে উঠল অত্যন্ত উজ্জ্বল আর দীপ্তিমণ্ডিত চোখ দুটো। তারপরে তেমনি নিঃশব্দ, প্রায় চাপা গলাতেই বললেন, মনে করো, ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। তারপরে কী হবে?

তারপরে কী হবে? প্রশ্নটা জটিল। ঠিক কেমন উত্তর দিলে চৌধুরী খুশি হবেন আমি বুঝতে পারলাম না। বললাম, সব রকম উন্নতির চেষ্টা—

—কী রকম উন্নতি?

আবার বিপদে পড়ে গেলাম। বললাম, এই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল, এগ্রিকালচারাল—

—ব্যাস থামো থামো।—শোনা যায় না এমনি নিঃশব্দ গলাতে উত্তেজনার স্বর স্পষ্ট হয়ে উঠল: হাঁ ইণ্ডাস্ট্রি, ইণ্ডাস্ট্রি চাই। কলকারখানা ফ্যাক্টরী। ভারতবর্ষকে যদি বাঁচতে হয় তা হলে কলকারখানা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

বললাম, সে কথা ঠিক।

—প্রমিথিয়ুস কে জানো?

—জানি। প্রথম বিদ্রোহী মানুষ, যে পৃথিবীতে আগুন নিয়ে এসেছিল।

—ঠিক বলেছ, প্রথম বিদ্রোহী।—অধ্যাপক চৌধুরী আবার নড়েচড়ে বসবার একটা প্রাণান্তিক প্রয়াস করলেন। এত নিঃশব্দ গলায় এমন তীব্রতা সঞ্চারিত হয়ে গেল যা আমি কল্পনাই করতে পারি না। আর সেই চোখ। প্রমিথিয়ুসের আগুন যেন সেই চোখে।

—আমরা তারই বংশধর। এই আগুন নিয়ে এসেছে আশীর্বাদ আর অভিশাপ। এই আগুনে আমরা প্রথমে কাঁচা মাংস পুড়িয়ে খেয়েছি; যজ্ঞের আহুতি দিয়েছি, আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী পুড়িয়েছি। বার্নারে আর ফার্নেসে এই আগুনে হবি দিয়েছি বিজ্ঞানের দেবতাকে, আবার এই আগুন দিয়েই তৈরি করেছি ইন্‌সেন্‌ডিয়ারী বম্ব। বলো, সত্যি কিনা?

অভিভূত হয়ে বললাম, খুব সত্যি।

চৌধুরী বললেন, পঁচিশ বছর অ্যাপ্লায়েড ফিজিক্সের চর্চা করেছি আমি। পজিট্রন, নিউট্রন কিংবা মিসিট্রনের তত্ত্ব আমার ভালো লাগে না। থিয়োরীর দাম নিশ্চয় আছে, কিন্তু আমি বুঝি বাস্তবকে, অতি বাস্তব এই পৃথিবীকে। আর পৃথিবীর সব চাইতে বড় সত্য আমি কী জেনেছি জানো? সে হচ্ছে আগুন।

—আগুন?

—হাঁ, আগুন। আগুন ছাড়া আর কী আছে? ল্যাবোরেটরীতে যাও, আগুন জ্বলছে; এঞ্জিন ছুটছে আগুনে; ডাইনামোতে আগুন; বিদ্যুতের আগুন ধরা পড়েছে মানুষের হাতে। লোহালক্কড় সব আগুনে গলে গিয়ে রূপ নিচ্ছে তার প্রয়োজনের। মানুষের জীবনে যা কিছু গতি আর প্রগতি সব আগুন দিয়ে। ধ্বংস করছে আর গড়ে তুলছে। একাধারে রুদ্র আর শিব।

আমি চুপ করে রইলাম। কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্য আদৌ আছে কিনা অথবা কী পরিমাণে আছে জানি না। কিন্তু অধ্যাপক চৌধুরীর সেই চোখ আর কণ্ঠস্বর। বাইরে শীতের কালো রাত্রি—টপটপ করে শিশির পড়বার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। হিমেল হাওয়া কাঁচের জানলায় করাঘাত করে যাচ্ছে। লেকের পথে ঝান্সী ট্রাকের উদ্দাম গতিছন্দ। আর ঘরের মধ্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বৈজ্ঞানিক—তাঁর জ্বলন্ত আগ্নেয়দৃষ্টি। আমি মূঢ়ের মতো তাঁর দিকে তেমনি ভাবেই তাকিয়ে রইলাম।

চৌধুরী বলতে লাগলেন: আদিম মানুষ আগুনকে পুজো করত। বৈদিক মানুষ আগুনকে বন্দনা করত সব দেবতার আগে—'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।' কথাটা আজও সত্য। অগ্নিই তো বিজ্ঞানের পুরোহিত, সেই তো 'হোতারং রত্নধাতমম্'। এক হিসাবে আমরা সকলেই অগ্নির উপাসক, সত্যি না কি?

চা নিয়ে সুনন্দাদি ঘরে ঢুকলেন। সহাস্যে বললেন, বাবা, রঞ্জনকে সেই অগ্নিবন্দনা শোনাচ্ছেন বুঝি?

চৌধুরীও হাসলেন। গলার স্বর আবার প্রশান্ত আর কোমল হয়ে এল। বললেন, হাঁ, সেই কথাই একেও বলছিলাম। কিন্তু তুই আমার পাইপটা ধরিয়ে দে তো মা। আগুন সর্বপাবন কিনা, তাঁকে নইলে আমার পাইপ অবধি অচল।

সুনন্দাদি পাইপ ধরিয়ে এনে দিলেন। বিশ মণ ভারী একটা পাথরকে যেমন করে টেনে তুলতে হয়, তেমনি একটা অমানুষিক প্রচেষ্টা করে ডান হাতটা ওপরে তুললেন চৌধুরী—মৃদুমন্দ টান দিলেন পাইপে। বললেন, স্বাধীনতা। স্বাধীনতার জন্যে, মানুষের মুক্তির জন্যে আন্দোলন করছ তোমরা। সে স্বাধীনতা কিসে আসবে? শুধু রাজনীতির অধিকারেই নয়। আমার পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় আমি এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি সে স্বাধীনতা মানুষের যান্ত্রিকতায়, তার কলকারখানায়, তার ফ্যাক্টরীতে। দেশ জুড়ে আগুন জ্বালাতে হবে। বার্নারে, ফার্নেসে, ডাইনামোতে। মানুষের সব চেয়ে বড় পরিচয় তার যন্ত্রে, তার সার্থক জয় হবে যন্ত্রের যজ্ঞে। আর সেই যন্ত্রের দেবতা কে? আগুন। পৃথিবী জুড়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও—দেখবে তোমাদের যা কিছু সমস্যা সব সহজ হয়ে গেছে।

সুনন্দাদি বললেন, নাৎসী জার্মানীর মতো?

—না, না, না।—চাপা গলায় যতটা সম্ভব চিৎকার করা যায় চৌধুরী তাই করে

উঠলেন।—সে তো রুদ্র। তার প্রয়োজন নেই বলছি না, কিন্তু শিবকেও ভুলে যাচ্ছো কেন? সৃষ্টির ধর্মই তো তাই।

চৌধুরীর মুখের সামনে রহস্যের কুহেলি বিস্তার করে পাইপের ধোঁয়া খেলা করতে লাগল। অসাড় পঙ্গু শরীরের সমস্ত শক্তিকে ঘনীভূত করে চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। অনাগত যুগের অগ্নিময় স্বপ্ন আমি তাঁর সর্বাঙ্গে রূপায়িত হতে দেখলাম। আশ্চর্য মানুষ। সংসারের পথে নিতান্ত অচল আর অপ্রয়োজন—অথচ কী বিরাট ভবিষ্যতের কল্পনায় আর কর্মপ্রেরণায় তাঁর সমগ্র চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠেছে।

—আজ যদি আমার শক্তি থাকত—চৌধুরী বলে চললেন—আজ যদি শক্তি থাকত, তা হলে এই মন্ত্র আমি প্রচার করতাম। শুধু কথায় নয়, কাজেও। কী হবে ধান আর পাটক্ষেত দিয়ে? কী হবে রুরাল আফলিফট্‌মেণ্টে? লোহা আর আগুন। প্রগতির এই একমাত্র পথ আর স্বাধীনতার এই একমাত্র লক্ষ্য।

চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সুনন্দাদি আমাকে ইঙ্গিত করলেন। বুঝলাম, এইবারে উঠে পড়া উচিত।

সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নিলাম। অন্ধকার আর হিমাচ্ছন্ন সাদার্ন অ্যাভিনিউ। চোখের পাতার ওপর হিমের কণা এসে জমছে—লেকের দিক থেকে আসছে—ঠাণ্ডা বাতাস। শীতার্ত পা ফেলে চলতে চলতে ভাবতে লাগলাম অধ্যাপক চৌধুরীর কথা। অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং। পৃথিবী জুড়ে আগুন জ্বালিয়ে দাও। আগুনের মধ্যেই মানুষের জয়, মানুষের মুক্তি।

তারপর প্রায় চার বছর পরে কাল সুনন্দাদির একটুকরো চিঠি পেয়েছি।

'তখন আমরা কেউ বাড়িতে ছিলাম না। বাবা বোধ হয় ঝিমুতে ঝিমুতে পাইপ টানছিলেন। তারই খানিকটা আগুন কী করে ছড়িয়ে পড়ে মশারি ধরে যায়। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, কী অসহায় ভাবে বাবা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন সেই আগুন এগিয়ে আসছে—এগিয়ে আসছে—তাঁকে গ্রাস করতে চায়। চিৎকার করবার উপায় ছিল না, সরে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। সমস্ত জাগ্রত চেতনা নিয়ে—ভীতি-বিহ্বল চোখ মেলে তিনি বন্দী শিশুর মতো সেই আগুনের মুখে আত্মসমর্পণ করেছেন। আমার কী মনে হল জানো ভাই? সারাজীবন যিনি আগুনের উপাসনা করেছেন, আজ সেই উপাস্য দেবতার পায়ে নিজেকে বলি দিয়েই তিনি তাঁর ব্রত উদ্‌যাপন করলেন।'

কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। পৃথিবী জুড়ে আগুন জ্বালাবার স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন, একটা সামান্য পাইপের আগুন থেকে তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না কেন?